গল্পলহরী

৩য় বর্ষ

বৈশাখ—চৈত্র

সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

১৩২২

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ { বৈশাখ, ১৩২২। } ১ম সংখ্যা

দেবী না মানবী ?

ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা। দুকুল বহিয়া জল-স্রোত কুলু কুলু রবে প্রবলবেগে সাগর অভিমুখে ছুটিয়াছে। শরতের শুভ্র কৌমুদী-রাশি জাহ্নবী সলিলে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে তীরস্থ পল্লী হইতে শৃগাল কুক্কুরের রব শোনা যাইতেছে। রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর। এমন সময়ে একখানি বজরা গঙ্গাবক্ষ ভেদ করিয়া ধীর গমনে যাইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা পবন হিল্লোলে দুলিতেছে। বজরা-খানি হেলিতে দুলিতে চলিতেছে। বজরার একটি কামরায় একটি যুবক রোগ-শয্যায় শায়িত, নিকটে বসিয়া একটী যুবতী ব্যজন করিতেছে। যুবক অর্দ্ধনিদ্রিত, তাহার গাত্রে এক খানি কম্বল। যুবতীর চিন্তাক্লিষ্ট বদন দেখিলেই অনুমান হয় যুবকের পরিণাম ভাবিয়া সে আকুল হইয়াছে। যুবতী পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। যাহাতে যুবকের কষ্ট না হয়, যাহাতে তিনি একটু আরাম বোধ করেন, তাহাই চেষ্টা। এক জন দাসী আসিয়া ডাকিল—"মা খেতে আসুন"। যুবতী ভ্রূকুটী করিয়া কথা বলিতে বারন করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল "আমি খাবো না"। দাসী বলিল "না খেলে বাঁচবে কেমন করে"? যুবতী বিরক্তির সহিত বলিল "তোর কিছু বলতে হবে না, আমার বিষয় আমি বেশ বুঝি"। দাসী চলিয়া গেল। একটু পরেই একটি বালিকা আসিয়া বলিল "কাকি মা, খেতে এস, আমি তোমার জন্য না খেয়ে আছি"। এবার যুবতী আর তাহাকে ছাড়াইতে পারিল না, বালিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিল, তারপর পার্শ্বের কামরায় গিয়া আহারে বসিল। আহার

নামমাত্র,—কিছুই হইল না, বালিকাকে খাওয়াইয়া নিজে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া একটু জল খাইয়া যুবতী ফিরিয়া আসিল। বালিকা সঙ্গে সঙ্গে আসিল, এবং খুড়ীমাতার নিকটেই শয়ন করিয়া অচিরে নিদ্রিত হইল।

বজ্‌রা গঙ্গার কূলে কূলে যাইতেছিল। এই সময়ে বাহিরে একটু গোলমাল হইল, যুবতী দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিসের গোলমাল?" দাসী বলিল "একটা লোক বুঝি ডুবে ম'ল"। যুবতী কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া জানালা খুলিয়া দেখিল সম্মুখে একটী বালিকা স্রোতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার বোধ হইল বালিকা যেন জীবিতা—একটু একটু নড়িতেছে। তখনই মাঝিদের সেই স্থানে বজ্‌রা রাখিতে আদেশ করিল। বালিকা নৌকার পাশ দিয়াই যাইতেছিল, যুবতী বলিল "যে ওকে তুল্‌বে তাকে বক্সিস দিব"। সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, একজন মাল্লা সাহসী ছিল, সে অর্থের লোভে জলে ঝাপাইয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। তখন সকলেরই বোধ হইল যে বালিকার নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতেছে। বজ্‌রায় ডাক্তার ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নানারূপ প্রক্রিয়া ও ঔষধ দিতে লাগিলেন। বালিকার বস্ত্র ছিল না, তৎক্ষণাৎ একখানি বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। যুবতী ডাক্তারকে বলিল "আপনি যদি একে বাঁচাতে পারেন, আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব"। ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন "পুরস্কারের প্রয়োজন নাই, ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" প্রায় এক ঘণ্টা পরে বালিকার চৈতন্য হইল, সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল এক নূতন স্থানে আসিয়াছে, তখন কোন বিষয় তাহার স্মরণ হইতেছিল না। যুবতী বলিল "বালিকাকে আমার কামরায় লইয়া এস।" বালিকাকে বাহির হইতে ভিতর কামরায় আনা হইল, যুবতী স্বয়ং নিকটে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, ডাক্তার বাবু ঔষধ সেবন করাইলেন। অবশেষে বালিকার মোহ দূর হইল, সে ধীরে ধীরে বলিল "আমি কোথায়?" ডাক্তার বাবু বলিলেন "তুমি ভাল স্থানেই আছ। চুপ কর এখন কথা বলো না।" বালিকা আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

২

"পাখি, একবার পড়।" একটি বালিকা একটি কাকাতুয়া হস্তে লইয়া এই কথা বলিতেছিল। কাকাতুয়া শিক্ষামত বলিল "সরোজ! সরোজ!" বালিকা হাতে তালি দিয়া হাসিয়া উঠিল এবং পাখির চঞ্চুতে চুম্বন করিল। হঠাৎ একজন লোক এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিলেন "বকুল,

পাখিকে কি শিখাচ্ছ ?” বালিকার ভারি লজ্জা হইল, তাহার মুখখানি রক্তবর্ণ ধারণ করিল, তারপর সে পাখিটী লইয়া আর একটা দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। আগন্তুক কিছু না বলিয়া কিছুক্ষণ ঐ স্থানে দাঁড়াইলেন, কি যেন ভাবিলেন, তারপর অগ্রসর হইতে যাইতেছেন এমন সময়ে কে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল “বকুলের সঙ্গে কি হচ্ছিল ?” যুবক হাসিয়া উত্তর করিলেন “বকুল কাকাতুয়াটাকে নিয়া দিন রাত্রি আছে, কি পড়ায় তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম।” যুবতী যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া অন্য একটী ঘরে লইয়া গেল। সেই ঘরে অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর ছবি, চারিদিকে কৌচ সাজান। যুবতী বলিল “বকুলের এখন কি করা যায়, একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। বড় হ’য়েছে অধিক দিন আর ঘরে রাখা যায় না। ওর পরিচয় কি পেয়েছ ?” যুবক বলিলেন “আমি ত অনেক জিজ্ঞাসা করেছি, কোন উত্তর পাই না। কেবল কাঁদে। তুমি যদি কোন কথা বের কত্তে পার।” যুবতী ঈষৎ হাসিল, যুবক বলিলেন “এখন যা কত্তে হয় তুমি কর।” যুবতী বলিল “আমি এ বিষয়ে কোন আলাপ করি নাই, এবার আলাপ করবো। তবে মেয়েটা বড় ভাল, দেখিতেও বেশ, সর্ব্বগুণসম্পন্না। আমি ওকে বড় ভালবাসি। ছাড়তে প্রাণ চায় না। আমাকে ‘দিদি’ বলে ডাকে, প্রকৃত দিদি হলেই ভাল হত।” এই কথা বলিয়াই যুবতী যুবকের দিকে ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে চাহিল। যুবকের মুখখানি রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন “আমি এখন যাই, তুমি বকুলের কাছে যাও।” যুবক দাঁড়াইয়া উঠিলেন, যুবতী তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর দৃশ্য ! যুগল মিলন। যুবতীর মুখ ভরা হাসি।

গঙ্গারামপুর গ্রামে সরোজকুমার নামে একজন ধনী ব্রাহ্মণ যুবক বসতি করেন। সরোজকুমারের স্ত্রীর নাম কমলা, কমলা প্রকৃতই কমলা। দেখিতেও বেশ সুন্দরী। কিন্তু কমলার কোন সন্তান হইল না, এই সকলের দুঃখ। কমলার মুখে সর্ব্বদা হাসি। গ্রামের সকল লোকে তাহাকে ভালবাসে। সরোজকুমারও সকলের প্রিয়পাত্র। কাহারও কোন বিপদ হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি তথায় উপস্থিত হন। সরোজকুমার অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে বজরা করিয়া সস্ত্রীক গঙ্গায় বেড়াইতে যান, সেই সময় বকুলকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পান। বকুল তাহার আত্মপরিচয় প্রদান করিল। শিবপুর গ্রামে শিবনাথ ভট্টাচার্য্যের সে প্রথম পক্ষের সন্তান। তাহার মা নাই, এখন বিমাতা গৃহে বিরাজমানা। বিমাতা আসাবধি তাহাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করে, পিতাও সেজন্য কোন প্রতিকার

করেন নাই। বরং তিনি স্ত্রীর পক্ষ হইয়া কন্যাকে তিরস্কার করিতেন। বকুল নির্জ্জনে বসিয়া এক এক দিন কাঁদিত। অবশেষে অত্যাচার এত দূর বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিত, কোন সময়ে বা সামান্য আহার কুকুর বিড়ালের মত দিত। এক দিন বিমাতা বকুলকে ধরিয়া মারিল। সেই দিন কষ্ট অসহ্য হওয়াতে বকুল কাঁদিতে কাঁদিতে জাহ্নবী সলিলে প্রাণ জুড়াইতে ডুব দিল। তারপর অজ্ঞানাবস্থায় কমলা দেবী তাহাকে নিজের বজরায় তুলিয়া লন।

সরোজকুমার শিবনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট লোক পাঠাইলেন। শিবনাথ বলিলেন তিনি এ কন্যাকে আর গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব বকুল কোথায় যাইবে, সরোজকুমারের বাড়ীতেই বকুল থাকিল। এত বড় মেয়ে—কমলা কিন্তু বিবাহের যোগাড় করিল না, তাহার মনের ভাব কি সেই জানে। কিন্তু বকুলের প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত হইল। এক দিন কমলা বকুলের চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিল "বকুল তুই আর ত আমার কাছে বেশী দিন থাকতে পার্‌বি না—শীঘ্রই তোর বিয়ে দিতে হবে। তোকে ছেড়ে থাক্‌তে মন চায় না—আমার বড় কষ্ট হবে।" বকুল তৎক্ষণাৎ সরলভাবে উত্তর করিল "কেন? আমি চিরদিনই তোমার কাছে থাক্‌বো। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, তুমিই আমার মালিক, আমার উপর আমার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।" কমলা হাসিয়া বলিল "বোন্, সে কেমন ক'রে হবে। চিরকাল কি আইবুড় থাক্‌বে?" বকুল উত্তর করিল "তাতে দোষ কি? তোমার জন্য এ প্রাণ দিতে পারি।" কমলা সে মুখখানির দিকে তাকাইল, দেখিল সরলতা মাখা—তখন তাহার ওষ্ঠ যুগলে একটি মধুর চুম্বন করিল. বকুল বড় লজ্জিত হইল। কমলা বলিল "না তোর আর আমাকে ছেড়ে যেতে হবে না, তার উপায় আমি কর্‌বো।" বালিকা এই কথায় বড় সন্তুষ্ট হইল. তাহার গলা জড়াইয়া বলিল "দিদি, চির-দিন যেন তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারি।"

বকুল বড় সুন্দরী, সরোজকুমার তাহার মুরুব্বি, অতএব অনেক সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু কমলা সে সব কথায় কর্ণপাত করিত না। এক দিন কমলা স্বামীকে বলিল "আমার একটা কথা রাখতে হবে। এতদিন আমাকে ভালবেসেছ, কখনও অনাদর কর নাই, আমার একটি ভিক্ষা আছে।" সরোজকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "তোমাকে অদেয় কি আছে? যথা সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়াছি। এখন বল কি কর্ত্তে হবে। কমলা বলিল "আমাকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর আমি যা বল্‌বো তা শুন্‌বে।" সরোজকুমার বলিলেন "তোমার

নিকট কথা বলাই আমার প্রতিজ্ঞা, আর অন্য প্রতিজ্ঞা অনাবশ্যক।" কমলা স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "আমার কোন ছেলে হ'ল না, অথচ বংশ রক্ষা করা চাই, আমার শ্বশুরের বংশ লোপ পাবে ইহা কখনও আমি হ'তে দিব না। তুমি আর একটি বিবাহ কর—এই আমি চাই।" সরোজকুমারের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন "কমল, আর সব কথা রাখতে পারি; ইহা পারবো না। তোমাকে যে কষ্ট দিব তা এ জীবনে হবে না।" কমলা বলিল "এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করলে, আমি যা বল্‌বো তোমায় শুনতে হবে। আমার কথা অন্যথা করতে পারবে না। আমার এ অনুরোধ রাখ্‌তেই হবে।" সরোজকুমার বলিলেন "তা বিবেচনা করা যাবে।" কমলা কোন কথা শুনিল না, সে জেদ করিতে লাগিল। অবশেষে সরোজকুমার বলিলেন "আচ্ছা ঘটক ঠাকরুণ, একটা সম্বন্ধ স্থির করুন, দেখি পাত্রী মনের মত হয় কি না, তোমাকে ভুল্‌তে পারি কি না, তার পর দেখা যাবে।" কমলা হাসিয়া বলিল "পাত্রী আমি ঠিক করেছি, মনের মতন হবে, এমন সদ্বংশজাত ও সুন্দরী মেয়ে বিরল।" সরোজকুমার বলিলেন "বটে? তোমার ভগ্নী নাকি?" কমলা হাসিয়া উত্তর করিল "আমি ভগ্নি বটে, নইলে কি এমন লোকের সঙ্গ দিয়ে মাথতে আসে।" কমলা আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, সত্বর অন্য গৃহ হইতে বকুলকে টানিতে টানিতে তথায় উপস্থিত করিল, এবং স্বামীর হস্তে তাহার হস্ত দিয়া বলিল "স্বামিন্! আমার ভগ্নি বকুলকে তোমার হস্তে সমর্পন করলেম। এত দিন আমার ছিলে—এখন তুমি দুজনেরই। বকুলের মত মেয়ে পাওয়া দুর্লভ। ওকে আমি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি, তাই মনে করলেম ছাড়াছাড়ি হই কেন, দুজনে ভাগাভাগি ক'রে লই। বকুল এখন দিন রাত্রি আমার কাছে থাক্‌বে।" তারপর বকুলের দিকে তাকাইয়া বলিল "ভগ্নি, আমার বড় আদরের জিনিস তোমাকে দিলেম, যত্ন করো। স্বামী স্ত্রীর বড় আদরের ধন—বড় আদরের জিনিস। কখনও তাচ্ছল্য করো না—চিরকাল পদসেবা করবে—চিরদিন স্বামীর মনতুষ্টি করবে—চিরকাল স্বামীর সুখের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে। নিজের সুখ দুঃখ নাই—সব স্বামীতে অর্পণ ক'রে নিশ্চিত হ'য়ে ব'সে থাকবে। স্বামীই স্ত্রীর দেবতা—সেই দেবতার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে—সেই দেবতাকে প্রাণ দিয়া পূজা করবে।" কমলার চক্ষে সে সময় এক বিন্দু জল দেখা গেল, সে বেগে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

* * * * * * *

শুভ দিনে সরোজকুমারের সঙ্গে বকুলের বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। উভয়েই

সুখী হইল, বিবাহের উদ্যোগ—বিবাহের যত সব—কমলা একাকিনী করিল। এক দিন বকুল কমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "দিদি, তুমি দেবী না মানবী?" তাহার চক্ষে জল আসিল, কমলা সে অশ্রু মুছাইয়া বকুলকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

প্রায়শ্চিত্ত।

মোহিত ও নগেন দু'জনেই এক কাগজে লেখে, তবে মোহিত লেখে গদ্য ও নগেন লেখে পদ্য।

মোহিত একটু নেশা করে, তার নেশা না করলে কবিতা বেরোয় না; নগেন মদকে বিষ ঠাওরায়, এমন কি তামাক-টা পর্য্যন্ত খায় না।

নগেন ও মোহিতের চেহারাটা অনেকটা এক রকমের, দুজনেই সুপুরুষ—তবে নগেন একটু ফর্সা, মোহিত একটু কাল। লোকে সেইজন্য নগেনকে সাদা-মোহিত ও মোহিতকে কাল-নগেন বলিত।

মোহিত ছিল বিবাহিত আর নগেন অবিবাহিত। মোহিত বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় অল্প একটু নেশা করিয়া গিয়াছিল—শ্বশুর মস্ত বড়লোক, সেথাকার জমিদার, তাহাকে নাকি সেইজন্য অপমান করিয়াছিলেন, কি মোহিত রাগ করিয়া রাত্রের ট্রেনেই ফিরিয়া আসে। সেই অবধি মোহিত আর শ্বশুরবাড়ী যায় না। তাঁরাও ডাকিতে আসেন না।

নগেন মাঝে মাঝে সুবিধা পেলে রাত্রে বাড়ী থাকিত না। সুতরাং মোহিত বিবাহিত হইয়াও অবিবাহিত, আর নগেন অবিবাহিত হইয়াও বিবাহিত।

নগেনের চরিত্রটা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কলঙ্ক-যুক্ত; মোহিতের চরিত্রটা পূর্ণচন্দ্রের জোৎস্নার ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল।

দার্শনিকেরা বলেন পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের উদ্বাহ হইলে তবে অবিনশ্বর ভালবাসার সৃষ্টি হয়, প্রমাণ যথা—এই ধরুন, স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই তুল্যগুণ সম্পন্ন, দুজনেই সমান কলহ কুশলী; তবে তাহাদের ভিতর ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আসিয়া পড়ে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন যদি নির্ব্বিবাদে সকল বহন করে, তবে কলহের কোনও কারণ থাকে না। ভালবাসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

অতএব নগেন ও মোহিতের ভিতর যে নিবিড় বন্ধুত্ব হইবে ইহা ন্যায়ানুমোদিত ও অবশ্যম্ভাবী—হইলও তাহাই।

মোহিত প্রতিদিন আফিস হইতে আসিয়া নগেনের বাড়ী যাইত, নগেনকে আফিস যাইতে হইত না, সে সমস্ত দিন বাড়ী থাকিত।

মোহিত বলিত, "নগেন! সবই যখন কচ্ছ তখন মদটা খেতে দোষ কি?

নগেন বলিত, "আজ বেশ চাঁদ্‌নি রাত্রির আছে, চল না একটু গান শুনে আসা যাক।"

বলা বাহুল্য কেহ কিন্তু কাহারও প্রসঙ্গে রাজী হইল না।

২

এইরূপ করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল নগেন 'বহু-বিবাহ' 'প্রতিভা' ও 'উন্মাদ', "মনুসংহিতা" ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়াছে, "সুরাপানের অপকারিতা" লেখা চলিতেছে; মোহিতের ১২শ ভাগ কাব্য গ্রন্থাবলী দপ্তরীর কাছে স্বর্ণমণ্ডিত হইতেছে, এমন সময় নগেনরা কলিকাতার বাড়ী পূর্ণ সংস্কার করিবার জন্য বেলগাছিয়ার বাগানে উঠিয়া গেল।

মোহিতের আর আফিস হইতে আসিয়া অতদূর যাইবার সুবিধা হইত না। নগেন প্রায়ই মোহিতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিত।

ইতি মধ্যে নগেনের দু'তিনটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়া জুটিল।

মোহিতের শ্বশুর দিন কতক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কোনও বন্ধুর বাগানে থাকেন, একদিন মোহিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নগেন বিবাহ করিতে রাজী হইল না। মোহিত শ্বশুর বাড়ীর লোককে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল।

৩

হঠাৎ একদিন কবিতা-রাণী দ্বিতীয়-পক্ষের তরুণী ভার্য্যার ন্যায় নগেনের স্কন্ধে

আশ্রয় লইলেন। এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য নগেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল না, নিধিরাম সর্দ্দার হইলে কি হয়, তাহার হস্তে ছন্দোবদ্ধ-রূপ ঢাল তরওয়াল নাই, সুতরাং তাহাকে একখানি বাঁধান খাতা কিনিয়া মোহিতের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইল।

নগেন তাহার মনের ভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে কবিতায় ব্যক্ত করিতে পারিত না, মোহিত তাহার বন্ধুর ছড়ান ভাবগুলি কাটিয়া ছাটিয়া এমন করিয়া তুলিত, যে নগেন যাহা বলিতে চাহিত তাহাই ফুটিয়া উঠিত। এইরূপ করিয়া মোহিত নগেনের কল্পনা-স্রোত মুখের প্রস্তর-খণ্ড ঈষৎ ঠেলাইয়া দিল, আর নগেনের রুদ্ধবেগ ভাব-তরঙ্গগুলি নাচিতে নাচিতে ছুটিল—নগেন একটু লিখিতে শিখিল।

বন্ধুর এই হঠাৎ কবিতা প্লাবন দেখিয়া মোহিত বড় বিস্মিত হইয়াছিল। এই বিরহ বিধুর, মিলন মধুর কবিতাগুলি কাহার উদ্দেশ্যে লিখিত, একদিন জিজ্ঞাসা করিল। নগেন যদি কবি হইত ত বলিত হৃদয়ের মানসী প্রতিমার উদ্দেশে, কিন্তু সে কবি নহে সুতরাং ধরা পড়িল। সে একদিন মোহিতকে চুপি চুপি সব কথা খুলিয়া বলিল।

সেই দিন হইতে মোহিত দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেই লিখিতে আরম্ভ করিল; নগেন লিখিতে পারিলেও তাহাকে লিখিতে দিত না। সে কেবল সৌখীন চিঠির কাগজে নকল করিত মাত্র।

তারপর একদিন কথায় কথায় মোহিত বলিল,—"একটু খাও, তা না হ'লে কবিতা বেরুবে না। নগেন অম্লান বদনে রাজী হইল। মোহিত কাহারও কাছে বাধ্য বাধকতা রাখিতে ইচ্ছুক নহে – সে সেই রাত্রেই গান শুনিতে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল।

এই অভূত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে দু'জনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমে বড়ই লজ্জিত হইল। অচিরে কিন্তু উভয়েই কবি-উচ্ছৃঙ্খল ও মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। তাহাদের ভিতর আর বিভিন্নতা রহিল না।

গভীর রাত্রে নগেন মোহিতকে আসিয়া ডাকিল। মোহিত পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, দুজনে বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়ীখানা নগেনদের পাশের বাগানের কাঁটালতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুদ্বয় গাড়ীর ভিতরে বসিয়া রহিল।

সপ্তমীর চাঁদ একটু একটু করিয়া জামরুল গাছ ছাড়াইয়া উঠিল। মোহিত

চাঁদের দিকে মাঝে মাঝে দেখিতেছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হে আজ আস্‌বে না, শুধু কাদা ঘাঁটাই সার হ'ল। নগেন খুব জোরের সহিত বলিল, নিশ্চয়ই আস্‌বে, সে যখন আমায় এই কাঁঠালতলায় রাত্রি একটার সময় আসিবে লিখিয়াছে, তখন তাহার কথার নড় চড় হইবে না।"

মোহিত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিল, সে কেমন দেখতে, নগেন বলিল এলেই দেখতে পাবে।

মোহিত এই কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল এমন সময় সেই বাগানের গেট খুলিবার মত মৃদু আওয়াজ হইল। মোহিত ও নগেন উৎকর্ণ হইয়া শুনিল।

একখণ্ড মেঘ চাঁদের বুকে ভাসিয়া আসিল। চারিদিকে ছায়ালোক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই ক্ষীণ আলোকে নগেন ও মোহিত দেখিল একটী রমণীমূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গে বসনাবৃত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

নগেন বলিল,—ওই আসিতেছে।

মোহিত বলিল,—হুঁ।

*　　•　　*　　•　　*

গাড়ী ছুটিয়া ছুটিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া মোহিতের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। তিনজনেই একে একে অবতরণ করিয়া মোহিতের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। উপাদানের উপর একটি কেরোসিনের আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল, মোহিত তাহা বাড়াইয়া দিল, চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ঘড়িতে দেখিল তখন দুইটা বাজিয়াছে।

ভিত্তিগাত্রে রবি বর্ম্মার একখানি ছবি লম্বিত ছিল। রমণী কি জানি কি ভাবিয়া চমকিয়া দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইয়া মোহিত বলিল ভিতরে আসুন; রমণী পুত্তলিকাবৎ শয্যাপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নগেন ও মোহিত বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিতে বাহিরে গেল।

নগেন বাহিরে গিয়া মদ খাইল। মোহিত আজ মদ খায় নাই, তখনও খাইল না। অল্পক্ষণ পরেই দু'জনে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

তাহারা দেখিল যুবতী পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছে—নির্ব্বাক, নিশ্চল; মাঝে মাঝে শুধু পদদ্বয় ঈষৎ আলোড়িত হইতেছিল, নগেন ভাবিল আনন্দে। তাহাদের অলক্ষ্যে যুবতীর অবগুণ্ঠনের ভিতর অজস্রধারে অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতেছিল; তাহা তাহারা জানিতে পারিল না, মোহিত একখানি ইজি চেয়ারে বসিল, নগেন যুবতীর পার্শ্বে শয্যার উপর বসিল।

তবুও কোনও ভাবান্তর হইল না দেখিয়া নগেন ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিল। এবার কে যেন সেই মর্ম্মর পুত্তলিকাবৎ যুবতীমূর্ত্তিকে আহতা মৃত-সিংহিনীর প্রাণ দিয়া সজীব করিয়া তুলিল; যুবতী সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনখানি মুখ হইতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল। ফুল্লারবিন্দবৎ সুন্দর মুখখানি আরও বিকশিত হইয়া উঠিল। বক্ষঃস্থল আরও স্ফীত হইয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল মস্তক একবার একটু বামে টলিল—তারপর দক্ষিণ হস্তে দ্বার নির্দ্দেশ করিয়া বলিল দূর হও; স্বর স্থির অবিচল সুস্পষ্ট। সেই শব্দ এই নিশীথ নিশার অনেকদূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল।

নগেন দেখিল তাহার নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে। সেই রণরঙ্গিণী চামুণ্ডামূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, প্রহৃত কুক্কুর পলাইল।

মোহিত সে দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। আর একটি অমনি আয়ত লোচনা বালিকার কথা মনে পড়িল।

যুবতী আবার অবগুণ্ঠনখানি টানিয়া শয্যাপ্রান্তে পুনরায় বসিল। কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থ হীরকাঙ্গুরীয় আলোককণায় শতধা বিচ্ছুরিত করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মোহিত যে ক্ষীণ অস্পষ্ট স্মৃতিরেখা মনে মনে আনিবার শত চেষ্টা করিতেছিল, চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় মনে পড়িল। সেই স্বর্ণ সর্প মস্তকস্থিত হীরকখণ্ডের আলোক-কণা যেন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল; সেই অগ্নি প্রবাহ তাহার শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার তখনই মনে হইল যেন পৃথিবীটা একটা বিস্ফোরক গোলার ন্যায় দ্বিধা হইয়া গেল--মস্তক ঘুরিয়া আসিল—টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মোহিত ডাকিল 'সরযূ'। স্বর কঠোর ও গম্ভীর। যুবতী নির্ব্বাক নিষ্কম্প প্রদীপবৎ নিশ্চল।

মোহিতের আবার নিজের নষ্ট চরিত্রের কথা মনে পড়িল, শত ধিক্কারে হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিল, অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে ডাকিল 'সরযূ'।

সেই করুণাপূর্ণ বাষ্পরুদ্ধ কোমল কণ্ঠ তাহার কর্ণে যেন স্বপ্নশত চির পরিচিত দেবতার স্বরের ন্যায় বাজিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া মোহিতের পদদ্বয় প্রাণপণে হৃদয় মাঝে চাপিয়া ধরিল, অনুতাপাশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "স্বামী-প্রভু-দেবতা আমি

কলঙ্কিণী আমি পাপিয়সী আমায় ক্ষমা”—* * * আর বলিতে পারিল না কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

* * * * * * *

মোহিতের শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল। সরযু তখন ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া দূর গগনের দিকে চাহিল। দেখিল পূর্ব্বদিক অরুণাভ হইয়া আসিতেছে।

অঞ্চল-প্রান্ত হইতে কিসের শ্বেত চূর্ণ একটী পান পাত্রে জলের সহিত মিশাইয়া নিঃশেষে পান করিল। অধর প্রান্তে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উটিল। তারপর ধীরে ধীরে স্বামীর চরণ মস্তকে রাখিয়া শয়ন করিল।

তাহার উষ্ণ অশ্রুজল স্পর্শে মোহিতের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পত্নীকে পদতলে দেখিয়া বুকের উপর টানিয়া লইল। স্বামীর সোহাগ পাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল কিন্তু পারিল না, ফিরিয়া আসিল।

সরযু তাহা দেখিতে পাইল না। সে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মৃত্যুলোকের কথা ভাবিতেছিল। স্বামীর কোমল কর স্পর্শে তাহার মনে হইল যেন তাহারা দুটীতে মৃত্যুর পারে কোন্ স্বপ্নলোকে আসিয়া পড়িয়াছে।

সহসা কি ভাবিয়া একবার স্বামীর বাহু পাশ মুক্ত করিয়া প্রাণপণ বলে দাঁড়াইয়া উঠিল পরক্ষণেই ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় স্বামীর চরণ প্রান্তে পড়িয়া গেল।

বাতায়ন পথে সূর্য্যের প্রথম কিরণ জ্যোতির্ম্ময় রেখার মত তাহার মুখে আসিয়া পড়িল, মোহিত দেখিল, মুখ নীলবর্ণ. সভয়ে গায়ে হাত দিয়া দেখিল অনেকক্ষণ হিম হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

-:**:---

উপেক্ষিতা।

১

"ফণী দাদা, যাই তবে" বলিয়া মৃণ্ময়ী ঢিপ করিয়া ফণীভূষণকে প্রণাম করিয়া সজল চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

ফণীভূষণ বলিল—"কেঁদ না বোন, আবার এই আসচে লক্ষ্মীপূজার সময় আন্‌ব। কি করবে ভাই, সকলেরই এমনি হয়। দেরী ক'রনা চল দিদি, কতক্ষণ থেকে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

"আর কি আমায় আসতে দেবে দাদা?"

"আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

মৃণ্ময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

নীরজা বলিয়া দিল—"দেখিস্ মিনু, শরীরের যেন অযত্ন করিস্‌নে মা—রাত দিন কাঁদিস্‌নে, দিন কতক থাকতে থাকতেই মন বসে যাবে, নতুন নতুন অমন সকলেরই হয়। শিশিরের কথা শুনিস্ মিনা, সাবধানে থাকিস্ মা।"

মৃণ্ময়ী একে একে সবার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

মৃণ্ময়ী স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের একমাত্র সন্তান, আট বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় এতদিন তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই। পিতামাতাকে হারাইয়া পিত্রালয়ের সম্পর্ক জনমের মত উঠাইয়া দিয়া আজ অভাগিনী মৃণ্ময়ী শ্বশুরালয়ে চলিল।

ফণীভূষণের উপর মৃণ্ময়ীর সামাজিক কোন দাবী দেওয়া ছিল না; ছিল কেবল স্নেহের দাবী। সে ফণীভূষণকে 'দাদা' বলিত, ফণীভূষণও তাহাকে বড় ভালবাসিত।

মৃণ্ময়ীর কখনও বালসুলভ চপলতা ছিল না, তাহার স্বভাবটী বেশ কোমল, সরল ও মৃদু, বুদ্ধিটীও বড় মার্জ্জিত। মৃন্ময়ীর বয়স চৌদ্দ বৎসর, তাহাকে সকলেই ভালবাসিত।

মতিগঞ্জের একজন জমিদার শিশির কুমারের সহিত মৃন্ময়ীর বিবাহ হইয়াছে।

শিশির উচ্চ শিক্ষিত নহে, দেখিতে বেশ সুশ্রী সুন্দর, লম্বা ধরণের একহারা চেহারা, মুখখানি বেশ হাসি হাসি ; চক্ষু দু'টী বড় বড়, ভাসা ভাসা ; নাকটীও বেশ মানান সই। বয়স বছর চব্বিশ পঁচিশ। মাথার কোঁকড়ান কাল কাল চুলগুলির মধ্যে সিঁথি কাটা। মোট কথায় শিশির একজন সৌখিন নব্যবাবু।

শান্তিপুরের ধুতি পরিয়া, ঘড়ি চেন ঝুলাইয়া ফিনফিনে পাতলা চাদরখানি উড়াইয়া, এসেন্স মাখিয়া ছড়ি হাঁকাইয়া রাস্তায় বেড়ানটী প্রতি দিন শিশির কুমারের চাই-ই চাই। সম্প্রতি সে পিতৃহীন হইয়া বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

এক মাস হইল মৃণ্ময়ী শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, এই বয়সেই বেচারিকে স্বামীর ঘর করিতে আসিতে হইয়াছে ; শ্বশুরবাড়ী শাশুড়ী নাই, ননদ নাই; দেখিবার ও যত্ন করিবার কেহই নাই।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া অবধি মৃণ্ময়ীর একটী সখী জুটিয়াছে—সরলা। সরলা তাহার প্রতিবাসী কন্যা ; মৃণ্ময়ী তাহাকে ঠাকুরঝি বলে। সে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে মৃণ্ময়ীর কাছে আসিত, কখনও বই পড়িত, কখনও গল্প করিত, কখনও আবার তাহার সংসারের কার্য্যে সাহায্য করিত।

আজ যখন সরলা আসিল, মৃণ্ময়ী তখন একাকিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সরলা আসিয়া হাসিয়া বলিল—"কি বসে বসে কার ধ্যান করা হচ্ছে ?"

মৃণ্ময়ী বলিল—"বেশ যা হোক। কাল সারাদিন তোমার আশায় বসেছিলুম, তুমি এলে না। তোমার দোষ কি আমার কপালই মন্দ। মনে কর্‌তুম তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাস তা' এখন দেখছি সেটা আমার বোঝার ভুল।"

সরলা নিকটে আসিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া সাদরে বলিল—"কাল কি সাধে আসি নি সই ? ঠাকুর মা বাড়ী থেকে বেরুতে দেয় নি। কাল পঞ্চাশ-বার চুল আঁচড়ে আঁচড়ে আমার মাথায় ব্যথা করে দিয়েছে।"

"ও কাল বুঝি হালিসহরের রায়েরা ক'নে দেখতে এসেছিল ? কে কে এসেছিল ভাই ?"

"কে কে এসেছিল কি করে বলব? আমি কি তাদের সকলকে চিনি নাকি? দশ বার জন লোক ত ছিল।"

"বর নিজে এসেছিল? পছন্দ হ'ল? কি বল্লে সই?"

"ওমা কি জানি পছন্দ হ'ল কিনা; আমি কি তাকে জিজ্ঞেস করতে গেছলুম নাকি?

"না, না, আর রাগ করতে হবে না;" বলিয়া মৃণ্ময়ী সরলার হাত ধরিল।

মৃণ্ময়ী দুই চারিটী কথার পর আবার বলিল—"দেখিস্ ভাই শ্বশুর বাড়ী গিয়ে যেন আমাদের ভুলে যাস্‌নে, আমার কিন্তু তোর জন্যে বড় মন কেমন করবে।

"ফের সেই কথা আরম্ভ করলে?"

"আহা-হা ভুলে গেছলুম, আর বল'ব না। আচ্ছা ঠাকুরঝি একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি বলবে?" বলিয়া মৃণ্ময়ী দুষ্টামির হাসি হাসিতে আরম্ভ করিল।

সরলা বলিল—"তোমার কাছে কবে মিথ্যা বলেছি?"

"বলছি বিয়ে হয়ে গেলে কি তোমার দাদাকে এখনকার মতন ভাল-বাস্‌বে?"

"ভাইকে কে করে না ভালবাসে?"

"দাদার চাইতে তখন নিশ্চয় আর একজনকে বেশী ভালবাসবে।"

"না ভাই তোমার সঙ্গে আর পারলুম না; কেবলই তোমার আমাকে অপ্রস্তুত করবার ফিকির। দেখ, তুমি যদি এ রকম ক'রে আমায় বিরক্ত করবে, তা হলে আমি শিশিরদাকে বলে দেব।"

লজ্জায় মৃণ্ময়ীর গণ্ডস্থল রক্তাভ হইয়া উঠিল, সে বলিল—"না ঠাকুরঝি, মাপ কর ভাই।"

"আর বলবে না?"

"না।"

"কখনও না।"

"কখনও না।"

"ঠিক বলছ' আর আমার কাছে বিয়ের কথা তুলবে?"

"না।"

"কেমন জব্দ।" বলিয়া সরলা হাসিয়া আপনার বাহু বল্লরী দিয়া মৃণ্ময়ীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহার কোমল কপোলে একটী চুম্বন করিল।

সহসা সরলার হাসি মাখা মুখখানি গম্ভীর হইয়া গেল, কি যেন একটা দুঃখের ছায়া আসিয়া তাহার আনন্দটুকু ঢাকিয়া ফেলিল। সে নীরবে মৃণ্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃণ্ময়ী আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সাদরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল ভাই? হঠাৎ এমন হয়ে গেলি কেন?"

সরলা নিশ্বাস ফেলিয়া, ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"কি বলি ভাই, রোজ ঠাকুর মা বল্‌তে বলে। না বল্লেও নয়, আবার কেমন করেই বা বলি।"

মৃণ্ময়ী আগ্রহাকুল ভাবে বলিল—"বল না ভাই, ভাবছিস্ কেন? কি কথা বল?"

মাটীর দিকে চোখ নামাইয়া বিষন্ন বদনে সরলা বলিল—"ঠাকুর মা বলে—বৌমাকে একটু বলিস্ যে সে ছেলে মানুষ, কিছু জানে না। বলিস্ তাকে লজ্জা ছেড়ে শিশিরকে একটু বারণ টারণ করতে; যদি একটু শোনে।—আমি রোজই ভুলে যাই—"

মৃণ্ময়ী চমকিয়া উঠিল, বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—"কি বারণ করব' ভাই? কি হয়েছে?"

"কি আর বলব ভাই, শিশির দাদার চরিত্র একেবারে বিগড়ে গেছে। শেষে মহা মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে, এরি মধ্যে জমিদারীটা বিক্রী করে ফেলেছে। আবার নাকি এই বাড়ীখানাও শীগগির বাঁধা দেবে। সে দিন আমাদের রকে দাঁড়িয়ে তোমার ফণীদাদা শিশিরদাকে কত বোঝাচ্ছিলেন, সে কি শোনে? কোন কথাই গ্রাহ্য কর্‌ল না—দিন্‌কে দিন বেড়েই যাচ্ছে, তাই ঠাকুরমা তোমায় বল্‌তে বলেছে—তুমি ভারি বোকা মেয়ে, রকম সকম দেখে একটুও বুঝতে পার'না, যা হোক তুমি একটু তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল'—বারণ করো।"

"ফণীদাদা কবে এসেছিলেন? আমার সঙ্গে তো দেখা হয় নি!"

"শিশিরদা' দেখা করতে দেয় নি। তিনি হিতোপদেশ দিলেন কি না, তাই ফণীদাদার উপর তার রাগ হ'ল। বড়দা বলছিল শিশির লেখা পড়া জানে না—জমিদারীর আয়েই সংসার চল্‌ত', তা জমিদারী বেচে ফেললে। কি যে হবে শেষে, তা ভগবানই জানেন।"

মৃণ্ময়ী বহুক্ষণ নীরব রহিল ; তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি কি করব, সব ভগবানের ইচ্ছা, তোমার বড়দাকেই এক একটু বোঝাতে।"

সরলা মৃণ্ময়ীকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

মৃণ্ময়ী নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিল ; তাহার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িল। সখীর নীরব অশ্রু সরলাকে বড় ব্যথিত করিল, সেও কাঁদিল।

২

যেদিন মৃণ্ময়ী জানিল—তাহার স্বামী মাতাল, বারবনিতারত, সেই দিনই তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ-আশাতারাটিকে কোথা হইতে একখানি নিরাশার মসী মাখা কালো মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিল। মৃণ্ময়ীর জীবনের সুখ-সাধ আনন্দ সব ফুরাইল। তাহার শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর মুখখানিতে অব্যক্ত বিষাদের ক্ষীণ ছায়া যেন আধা লুকাইয়া রহিয়াছে।

মৃণ্ময়ী লজ্জায়, ভয়ে কখনও স্বামীর সম্মুখে কোনও কথা উত্থাপন করিতে পারিত না ; প্রতিদিন ভাবিত আজ বলিব, আজ মদ খাইতে বারণ করিব। কিন্তু বলিবার সময় কোথা হইতে এক রাশ লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিত,—আর বলা হইত না।

একদিন শয়নকক্ষে একাকিনী অশ্রুনয়না মৃণ্ময়ী বসিয়া রহিয়াছে। ভিত্তি-গাত্রে লম্বিত জাপানী ঘড়ীতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। মৃণ্ময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"দু'টো বাজল,' এখনও এলেন না!"

এমন সময় শিশিরকুমার টলিতে টলিতে আসিয়া পালঙ্কে শয়ন করিল।

মৃণ্ময়ী নীরবে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিল। হঠাৎ মৃণ্ময়ীর এক বিন্দু অশ্রু শিশিরকুমারের পায়ের উপর পড়িল!

শিশির জিজ্ঞাসা করিল—"মৃণ্ময়ী, ওকি তুমি কাঁদচ' কেন ?"

আজ মৃণ্ময়ীর কাণে তাহার নাম বড় মধুর শুনাইল। সে কথা কহিতে পারিল না।

শিশিরকুমার এবার একটু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল—"কেন কাঁদচ বল না ? কি হয়েছে ? খুলে বল।"

মৃণ্ময়ী লজ্জা জড়িত মৃদু কণ্ঠে বলিল—"তুমি রোজ রোজ " আর বলিতে পারিল না, লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিল।

"কি রোজ রোজ আমি কি করি বল না ?"

আপনার মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃণ্ময়ী বলিল—"মদ খাও।"

রুক্ষ স্বরে শিশির বলিল—"আমার খুসী।"

"ও বড় খারাপ জিনিষ, তুমি খেও না—মদ বেশ্যা ছেড়ে দাও, ছিঃ লোকে নিন্দে করে—বড় পাপ হয়।"

"করে নিন্দে করুক, আমি নিজের পয়সায় খাই, লোকের বাপের তাতে কি ?"

"শুনলুম নাকি জমীদারীটা বিক্রী করেছ, সব টাকা নষ্ট করেছ' তার পর শেষে কি হবে ? সরলা ঠাকুর-ঝি বল্লে, বাড়ীটাও বিক্রী করবে ?—

ছি ! না এমন ক'রো না।"

"দেখ বেশী বক্ বক্ ক'রো না—তুমি ঘরের বউ ঘরে থাক ; বাহিরের খবরে তোমার দরকার কি ?"

মৃণ্ময়ী শিশিরকুমারের ক্রুদ্ধ ভাব ও তাহার রক্তজবার মত লাল চক্ষু দেখিয়া আর একটী কথাও বলিতে সাহস করিল না। নীরবে স্বামীর পদ সেবা করিতে লাগিল।

শিশির কুমার অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল। মৃণ্ময়ী পালঙ্কের উপর হইতে নামিয়া শিশিরকুমারের মস্তকের নিকট দাঁড়াইল।

জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া শিশিরকুমারের মুখের উপর পড়িতেছিল।

মৃণ্ময়ী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে স্বামীর মুখখানি দেখিল. ভাবিল—ইনি আমার স্বামী ? আমার স্বামী বড় সুন্দর ! কিন্তু মাতাল— আমার স্বামী মাতাল ! আমি মাতালের স্ত্রী ? একজন মাতালকে স্বামী বলিয়া পূজা করিব !

সহসা মৃণ্ময়ী চমকিয়া উঠিল, যেন কি এক স্বর্গীয় প্রতিভায় তাহার বালিকা জীবন প্রতিভাসিত হইল। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল—"স্বামী বৃদ্ধ, আতুর, মাতাল যাহাই হউক সতীর তিনি পূজ্য। স্বামী পরম পাতকী হইলেও হিন্দু রমণীর নিকট তিনি দেবতার ন্যায় পূজনীয়।"

মৃণ্ময়ী বুঝিল—স্বামীকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিয়া বড় অনুচিত কার্য্য করিয়াছে। অস্ফুটস্বরে মৃণ্ময়ী বলিল—"না আর কখনও এরূপ পাপ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিব না—স্বামীকে আর কখনও ঘৃণা করিব না ; অন্যের নিকট

যাহাই হউন আমার নিকট ইনি পরম পবিত্র দেবতা! আমি চিরদিন ইঁহাকে ভালবাসিব, ভক্তি করিব।"

তখন চাঁদের আলো শিশিরের মুখের উপর হইতে সরিয়া আসিয়াছিল, নিদ্রাঘোরে শিশিরকুমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

মৃণ্ময়ী লজ্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, মনে করিল—বুঝি স্বামী জাগিয়াছেন।

৩

শিশির কয়দিবস হইতে মতিগঞ্জের বাটীখানি বিক্রয় করিয়া আসিয়া সুলতান গঞ্জের একটী অপরিস্কার গলিতে একটী পুরাণো জীর্ণ এক তালা বাড়ী ভাড়া লইয়া রহিয়াছে। এখন মৃণ্ময়ী ও একজন ঝি সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করে।

শিশিরের সারাদিনের মধ্যে বড় দেখা সাক্ষাতই কেহ পায় না, কেবল দুপুরে একবার খাইতে আসে. রাত্রে সবদিন তাহাও আসে না।

রাত্রি প্রায় দুইটা। পল্লীপথ এখন নিস্তব্ধ মাঝে মাঝে দূর হইতে শিশু কণ্ঠের অস্ফুট রোদন ধ্বনি ও দুই এক খানা ভাড়াটে গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী পেচক চীৎকার করিতেছে। রাত্রি অন্ধকার।

রান্নাঘরের র'কে দেওয়াল ঠেস দিয়া মৃণ্ময়ী বসিয়া আছে; সম্মুখে বামী ঝি অকুল শয্যায় গাঢ় নিদ্রিতা। এমন সময়ে সদর দরজায় কে হাঁকিল

"কোই হায়?"

মৃণ্ময়ীর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সদর দরজায় আবার করাঘাত করিয়া ডাকিল—"কোই হায়?"

মৃণ্ময়ী ঝিকে উঠাইল।

ঝি শশব্যস্তে উঠিয়া চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে বিরক্তভাবে কতকগুলি কি অস্পষ্ট কথা বলিল। আবার দরজায় ঘা পড়িল এবং রূঢ় কণ্ঠে ডাকিল—"এঃ এঃ বাড়ী মে——কোই হায়?"

বামী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিল, দেখিল, একজন পাহারাওয়ালা। পাহারাওয়ালা জানাইল—শিশিরকুমার মাতাল অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকায় তাহাকে সুলতানগঞ্জের থানায় লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছে; ভদতার অনুরোধে সে শুধু সংবাদ দিতে আসিয়াছে মাত্র।

পাহারাওয়ালা চলিয়া গেল, মৃণ্ময়ীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কতক্ষণ সে চুপ করিয়া থাকিল, কি করিবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ঝি ত পাহারাওলাকে দেখিয়া অবধি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে ছিল—এ কি বিপদ! এখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"বৌ ঠাকরুণ, সেই ফণীদাদাকে এক বার খবর দাও না কেন?"

মৃণ্ময়ীর মাথায় এতক্ষণ এ সহজ কথাটা আসে নাই বলিয়া সে মনে মনে বড়ই দুঃখিত ও লজ্জিত হইল।

ফণীভূষণের বাটীর অল্প দূরেই শিশিরের বাটী। ঝিকে তৎক্ষণাৎ ফণীভূষণের বাটী পাঠাইয়া দিল, এবং বলিয়া দিল সে যেন গিয়া ফণীভূষণকে এই কথা জানাইয়া চলিয়া আসে।

ঝি চলিয়া গেলে মৃণ্ময়ী কত কি ভাবিতে লাগিল, হয় ত শিশিরকে হাজতে পুরিয়াছে। কনেষ্টবলেরা তাহাকে কত পীড়ন করিতেছে, শিশির নিরুপায় শিশুর মত কাঁদিতেছে—আর মৃণ্ময়ীকে ডাকিতেছে। তাই হয়ত পাহারাওয়ালার দয়া হইয়াছে, সে খবর দিয়া গিয়াছে। এমনই কত কি ভাবনা তাহার মনে আসিতে লাগিল—যদি ফণীভূষণ বাড়ীতে না থাকে, তবে কি উপায় হইবে? কিম্বা যদি ফণীভূষণ এত রাত্রে যাইতে অস্বীকার করে? কিম্বা ঝি যদি এত রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে মৃণ্ময়ীর চিন্তা স্রোত প্রবল বেগে চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পাগলের মত মৃণ্ময়ী রাস্তার প্রত্যেক শব্দটীকেই দাসীর প্রত্যাগমন ভাবিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। ক্রমে দ্বারে আঘাত এবং বামীর পরিচিত কণ্ঠ শ্রুত হইল। মৃণ্ময়ী ছুটিয়া গিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল।

বামী জানাইল—"ফণীভূষণ শুনিবামাত্র থানায় গিয়াছেন। যাহা হয় আসিয়া জানাইয়া যাইবেন।"

* * * * * * *

সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায়, অসাড় দেহ শিশিরকুমারকে অতি কষ্টে পাল্কী হইতে ফণীভূষণ ও বেহারারা নামাইয়া তাহার শয্যায় শোয়াইয়া দিল।

ফণীভূষণ মৃণ্ময়ীকে শিশিরের মাথায় বাতাস করিতে ও ঘুমাইতে দিতে বলিয়া গৃহে ফিরিলেন।

সে রাত্রে মৃণ্ময়ীর আর খাওয়া হইল না। বিনিদ্র নয়নে স্বামীকে সারা রাত্রি বাতাস করিয়াই কাটাইয়া দিল।

৪

পরদিন শিশিরকুমার প্রাতরাশে বসিয়াছে,, নিকটে অবগুণ্ঠিতা মৃণ্ময়ী দাঁড়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে।

ফণীভূষণ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

মৃণ্ময়ী লজ্জিত হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

ফণী আসিয়া শিশিরের পার্শ্বে একখানি বেতের চেয়ারে উপবেশন করিল।

শিশির গত রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ফণীভূষণের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিল না।

স্নেহশীল ফণীভূষণ সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"আজ তোমার লজ্জা হয়েছে দেখে আমি পরম সুখী হলুম. যতক্ষণ মানুষ কুকর্ম্মে লজ্জা বোধ না করে, ততক্ষণ সে তাহা ত্যাগ ক'রতে পারে না, আজ তোমার লজ্জা হয়েছে দেখে মনে হচ্চে তুমি ভাল হবে॥ ভেবে দ্যাখ শিশির, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ! আর আমি বেশী কি বল্‌ব, তুমি ত তেমন নও, একটু ভাবলেই বুঝ্‌তে পারবে যে তুমি তোমার কি সর্ব্বনাশ করেছ এবং করিতেছ। ছিঃ শিশির! তোমার কি অপমান বোধ হয় না? সকলে তোমাকে মাতাল, বেশ্যাসক্ত বলে ঘৃণা করে। শিশির, গুলজার জানের মুখ তুমি আর দেখো না. সে যত দিন তোমার টাকা আছে, ততদিনই তোমায় আদর যত্ন করবে—টাকা ফুরালেই তার ভালবাসা ফুরুবে, সে তোমায় ভাল বাসেনা শিশির, সে তোমার টাকাকে ভালবাসে।

আমি তোমাদের শত্রু নই—মনে করে দেখ কত দিন তুমি আমায় কত কুবাক্য বলেছ—কত অপমান করেছ—আমি সে সব একটী দিনের তরেও গ্রাহ্য না করে তোমাকে সৎপরামর্শ দিয়েছি। তুমি জান শিশির, আমি মৃণ্ময়ীকে সহোদরার অধিক ভালবাসি—মৃণ্ময়ীর দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। তুমি কি একবারও তাহার কথা ভাবনা? জগতে তুমি ছাড়া তার যে আর কেহই নেই—তুমি যদি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর—তাকে এমন করে কষ্ট দাও—শিশির তবে সে কি করে জগতে থাকবে? কার কাছে আশ্রয় নেবে?

কার বুকে মাথা রেখে জগতের জ্বালা জুড়াবে ? পশু পক্ষী পর্য্যন্ত মৃণ্ময়ীকে ভালবাসে, আর তোমার কি একটুও দয়া হয় না ?

"শিশির, আমি তোমায় বড় ভালবাসি ছোট ভাইয়ের মত দেখি, আমি আবার বল্‌ছি—ও সব কু-অভ্যাস ত্যাগ কর। আমি তোমাকে তিনহাজার টাকা দিচ্ছি, তুমি একটা কিছু ব্যবসা কর। যদি তাহাতে অবস্থার উন্নতি করিতে পার—আমার টাকা দিও—আর না হয় দিও না।"

শিশির একটীও কথা কহিল না, অবনত শিরে বসিয়া রহিল।

বাটী যাইবার সময় ফণীভূষণ শিশিরের হাত ধরিয়া বলিল—"শিশির আমি তোমার বড় ভায়ের তুল্য, তুমি আমার হাতে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনও মদ খাবে না, সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসী গুলজারের মুখ দেখবে না ?"

শিশির কুমার কিছু না বলিয়া হাত সরাইয়া লইল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ফণীভূষণ বলিল—"আর আমি কি করব।"

ফণীভূষণ বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রবাহের স্রোত কে ফিরাইবে ? মধ্যাহ্নকালে আহার করিয়া শিশিরকুমার গুলজারের বাটী গমন করিল।

একটী দিন মাত্র বাটী থাকিবার জন্য মৃণ্ময়ী কত অনুরোধ করিল, শিশির সে দিকে দৃকপাতও করিল না।

দেখিতে দেখিতে সে দিন রাত্রি কাটিল, পরদিন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, তখনও শিশিরের দেখা নাই।

মৃণ্ময়ী কাঁদিতেছে। বামী ঝি গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় ফণীভূষণ আসিল, সে মৃণ্ময়ীকে কাদিতে দেখিয়া বড় চিন্তিত হইল, ভাবিল আবার কি বিপদ ঘটিল। ফণী জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে মিনু।"

দাসী বলিল—"আর কি বলব, জানি না আবার কি সর্ব্বনাশ হ'ল, সেই কাল দুপুরে দাদাবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়েছে—এখনও আসে নি।"

ফণীভূষণ তাহার একজন ভৃত্যকে গুলজার জানের বাটীতে শিশির আছে কি না সংবাদ লইয়া আসিতে পাঠাইল।

অল্পক্ষণ পরে চাকর আসিয়া খবর দিল—"হুজুর গুলজার জানের বাড়ী তালা বন্ধ—কেউ নেই। পাড়ার লোকেদের জিজ্ঞেস করলুম তারা বল্লে কাল

বিকেলে শিশির বাবুর সঙ্গে অনেক জিনিষ পত্তর নিয়ে গুলজার কোন বিদেশে চলে গেছে।"

ফণীভূষণ চুপ করিয়া রহিল, কি বলিয়া সে মৃণ্ময়ীকে বুঝাইবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃণ্ময়ী শিশুর মত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ফণীভূষণ বহুক্ষণাবধি নীরবে কি ভাবিল, তাহার নেত্র-পল্লবও অশ্রুসিক্ত হইল।

এ অবস্থায় অনাথিনী অসহায়া বালিকা মৃণ্ময়ীকে ফেলিয়া সে চলিয়া যাইবে কি করিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া ফণীভূষণ বলিল—"মিনু, যা হবার হয়েছে, এখন চল বোন্, যতদিন না শিশিরের সংবাদ পাওয়া যায় ততদিন মার কাছে থাকবি, এখানে এমন অবস্থায় তোমার মতন মেয়ের থাকা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। চল মৃণ্ময়ী—মার কাছে থাকবি।"

মৃণ্ময়ী বলিতে যাইতেছিল- "না আমার যা হয় হোক, আমি এই বাড়ীতেই থাকব।"

সে বহুদিনের কথা, যে দিন রাত্রে তাহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন সেই দিন মৃণ্ময়ী স্বপ্নে দেখিয়াছিল যেন তাহার স্বর্গীয় জননী দেবী তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"মৃণ্ময়ী, ফণীর কথায় কখনও প্রতিবাদ করোনা, সে যা বলে তাই করিও। জগতে সেই তোমার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী।" আজ সহসা সেই বহুদিন দৃষ্ট স্বপ্নের স্মৃতি মৃণ্ময়ীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, তাই আর বলিল না।

মৃণ্ময়ী ফণীভূষণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল—"ফণীদাদা, তুমি যা বলবে তাই করব, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে দাদা?"

ফণীভূষণ অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে—"আয় বোন" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠাইল।

অশ্রু প্রতিমা মৃণ্ময়ীকে আনিয়া ফণীভূষণ জননীর হস্তে সমর্পণ করিল।

৫

হেমন্ত কাল। প্রভাতের তরুণ-অরুণালোকে দিল্লী নগর উদ্ভাসিত। বৃক্ষ পত্র কাঁপাইয়া প্রভাত পবন ধীরে ধীরে বহিতেছে। ফিরিওয়ালারা উচ্চ স্বরে নানাবিধ দ্রব্যের ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে।

একটী অশ্বত্থ গাছের সম্মুখে একখানি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে গুলজার উপবিষ্টা তাহার পার্শ্বে দিল্লীর নবাব পুত্র মহরুণ বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছে।

আজ দুই মাস শিশির কুমার গুলজারকে লইয়া দিল্লীতে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া কেবলমাত্র দুইটী সপ্তাহ শিশির গুলজারের ভালবাসা পাইয়াছিল, তাহার পরই গুলজার জানের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিশিরকে দেখিলে পূর্ব্বে যেমন গুলজারের প্রসন্নভাব হইত, এখন আর তেমন হয় না। শিশিরকে দেখিলে সে বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লয়, যতক্ষণ শিশির বাড়ী থাকে ততক্ষণ তাহার মুখে হাসি দেখা যায় না।

শিশির কুমার প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যমুনাতীরে বেড়াইতে যাইত, সেই সময় গুলজারের নিকট মহরুণ আসিত

কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর মহরুণ বিদায় গ্রহণ করিল।

শিশির বাটী আসিল।

সন্ধ্যা হইল, চুমকি বসান নীলাম্বরী সাড়ী পরিয়া দিগ্‌বালা বদনভরা হাসি হাসিলেন।

আজ সারাদিন গুলজার শিশির কুমারের সহিত কথা কহে নাই।

গুলজার বসিয়া আছে: শিশির দুঃখিত ভাবে বলিল—"গুলজার তুমি আজকাল আমার সঙ্গে এমন কর কেন? রোজ মনে করি আজ গুলজার হাসবে—আজ সেই আগেকার মতন কথা কইবে—কিন্তু কই তুমি ত আর একদিনও আমার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার কর না। তোমার সুখের জন্য,তোমার পরামর্শে—আমি কি না করেছি? বিষয় সম্পত্তি সব হারিয়েছি—দেশত্যাগ করেছি—তোমার জন্য আমি পথের ভিখারী: সেই তুমি—কি দোষে আমার সঙ্গে এরূপ করছ।"

ভ্রূকুটী কুঞ্চিত চোখে গুলজার শিশিরের পানে চাহিয়া বলিল—"যাও, যাও তুমি আর বেশী বকিয়ে আমার মাথা ব্যথা করিও না। আমার সঙ্গে আর তুমি কথা কহিও না।"

শিশির চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

গুলজার বলিল—"দাঁড়িয়ে কেন? এখান থেকে চলে যাও।"

এতদিন শিশির যে গুলজারকে দেবীর মত দেখিয়া আসিয়াছে; আজ চাহিয়া দেখিল—যে ভীষণ রাক্ষসী! শিশির আর দাঁড়াইল না, তড়িৎ বেগে ছুটিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

আজ শিশির তাহার জীবনের বিষম ভুল বুঝিতে পারিল। অনুশোচনার সহস্র বৃশ্চিক তাহাকে একই কালে দংশন করিতে লাগিল। তরঙ্গের মত একটার পর একটী করিয়া সমস্ত অতীত কাহিনী তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। ফণীভূষণের স্নেহপূর্ণ দুর্লভ উপদেশগুলি মনে পড়িল, তিনি বলিয়াছিলেন—“গুলজার তোমাকে ভাল বাসে না, তোমার টাকাকে ভাল বাসে। টাকা ফুরাইলেই তাহার ভাল বাসা ফুরাইবে।” আজ শিশির বুঝিল তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

অনাদৃতা উপেক্ষিতা মৃণ্ময়ীর কথা আজ তাহার মনে হইল। তাহার বাষ্পপূর্ণ কৃষ্ণ-তারক-চক্ষু দুটীর সকরুণ চাহনি যেন শিশিরকুমারের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃণ্ময়ী কোথায়? তাহার কি হইল? নিশ্চয় সে আত্মহত্যা করিয়াছে—নয়ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বেদনার দারুণ কাঁটা চারিদিক হইতে শিশিরকে বিঁধিতে লাগিল; শোকে অভিভূত হইয়া কতবার আকুল-আহ্বানে মৃত্যুর আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিন্তু কই পাইল না ত’? ত্রিভুবনে শিশির কি নিরাশ্রয়? তাহার দুঃখে কি কেহ কাঁদিবে না? জগতে তাহার ব্যথার ব্যথী কেহই কি নাই? হাঁ আছে একজন।—— মৃণ্ময়ী!

শিশির পাগলের মত বলিয়া উঠিল “মৃণ্ময়ী দেবী আমার! তুমি কোথায় গেলে? যেখানে থাক একবার দেখে যাও—তোমার স্বামীর আজ কি অবস্থা. সে তোমাকে এখন কত ভালবাসে! মৃণ্ময়ী, আমার মত পাপিষ্ঠ নরাধমকে তুমি কি স্বামী বলিয়া ভক্তি করিবে? ভাল বাসিবে?

শিশিরের ভৃত্য হোসেন দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত বিলাপবাণী শুনিতেছিল, তাহারও দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; কিন্তু পাষাণী গুলজারের ভ্রূক্ষেপ নাই।

হোসেন গিয়া গুলজারকে বলিল—“শিশিরবাবু বুঝি পাগল হইয়া গেলেন।”

গুলজার হাসিল। বলিল—“না পাগল হয় নি, তুই যা।”

তখন নওরঙ্গের আসিবার সময় হইয়াছিল. সে ত জানে না আজ শিশির বেড়াইতে যায় নাই। কি হইবে? শিশির যে তাহাকে দেখিতে পাইবে?

গুলজার খানিকক্ষণ কি ভাবিল, তারপর শিশিরের দরজার নিকট আসিয়া বলিল—“খোল ত দরজা একবার, কি হয়েছে তোমার? এমন ক’রে চেঁচাচ্ছ কেন?”

শিশির দরজা খুলিল।

গুলজার তাহার হস্তে এক গ্লাস সুরা প্রদান করিয়া বলিল—"এইটে খেয়ে একটু ঘুমোও দেখি।"

শিশির বলিল—"আবার আমাকে মদ খাওয়াচ্ছ। আচ্ছা দাও, আর কি। সবই ত হারিয়েছি। দাও খাই—খুব খাই"। গুলজারের হস্ত হইতে গ্লাস লইয়া শিশির এক নিশ্বাসেই সবটা খাইয়া ফেলিল। আরও চাহিল।

গুলজার ত তাহাই চায়।

অতিরিক্ত সুরাপানে শিশির চেতনা হারাইয়া যখন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, গুলজার তখন মহানন্দে বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিয়া কক্ষান্তরে বসিয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে মহরুণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

৬

মহরুণ আসিলে গুলজার তাহাকে জানাইল—আজ আর কোনও চিন্তা নাই।

বিস্মিত হইয়া মহরুণ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন শিশির বাবু কোথায় গিয়েছেন?"

গুলজার সহাস্যে সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিল।

শিশিরের বাটীতে কে কে আছে, দিল্লী কেন আসিল ইত্যাদি জানিবার জন্য মহরুণ কৌতূহল প্রকাশ করিল।

গুলজার শিশিরের জমিদারীর কথা, একাকিনী মৃণ্ময়ীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে লইয়া দিল্লীতে আসিবার কথা সমস্ত তাহাকে বলিল। যখন গল্প শেষ হইল, তখন রাত দুইটা

জগত সুষুপ্তির কোলে আশ্রয় লইয়াছে, কেবল মাত্র কক্ষ মধ্যে মহরুণ ও গুলজার জাগিয়া, আর দরজার পাশে হোসেন—বিনিদ্র নয়নে বসিয়া সব শুনিতেছে।

মহরুণ বলিল—"চল একবার দেখে আসি, সে কি রকম।"

গুলজার তাহার হাত ধরিয়া যে কক্ষে অচেতন শিশির কুমার পড়িয়াছিল, সেই কক্ষে আসিল।

মহরুণ দাঁড়াইয়া নীরবে ভাবিতে লাগিল 'বারাঙ্গনার প্রেমের কি বিষময় পরিণাম।

গুলজার বলিল—"হতভাগা আমাকে জ্বালাতন করে মেরেছে, কোন রকমে যদি একে মেরে ফেলতে পারি, তবেই আমার নিষ্কৃতি।"

শিশিরের কথা শুনিয়া অবধি গুলজারের উপর মহরুণের ঘৃণা জন্মিয়াছিল। গুলজারের কথা শুনিয়া সে ক্রোধে হুতাশনের মত জ্বলিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মহরুণ রোষকষায়িত লোচনে গুলজারের প্রতি চাহিয়া বলিল—"রাক্ষসী যে তোর জন্য সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে তুই কিনা তার প্রাণনষ্ট কর্‌তে চাস্। খোদা পাপের প্রতিফল দেন। আজ খোদা মহরুণকে তোর প্রতিফল দিতে পাঠিয়েছেন।"

মহারুণের কথা ও তাহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া গুলজার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, কিন্তু এক পা'ও নড়িতে সাহস হইল না।

মুহূর্ত্ত পরেই মহরুণের শাণিত ছোরার আঘাতে গুলজারের মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে লুটাইল।

এই দারুণ হত্যাকাণ্ড অন্য কেহই দেখিল না, কেবল দুয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হোসেনি সব দেখিল।

শিশির অচেতন, কিছুই জানিল না।

ছোরাখানা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া প্রাণের ভয়ে মহরুণ তৎক্ষণাৎ হোসেনিকে পাঁচখানি নোট দিয়া কাহারও নিকট এ সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিল।

হোসেনিও তৎক্ষণাৎ রজনীর অন্ধকারের সহিত মিশাইয়া গেল।

পরদিন বেলা দশটা বাজিল, তখনও শিশির অচেতন। শিশিরের কোনও সাড়া শব্দ না পাইয়া একজন পরিচারিকা কি হইয়াছে দেখিতে আসিল, দেখিল অচেতন অবস্থায় শিশির পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার নিকটেই একখানা তীক্ষ্ণ ধার ছোরা রহিয়াছে, অদূরে গুলজারের দেহ শোণিতস্রোতে ভাসিতেছে, তাহার পরিধেয় বস্ত্রগুলি রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। শিশিরের বস্ত্রও রক্তে রঞ্জিত।

সে ছুটিয়া গিয়া সকলকে সংবাদ দিল, অনতিবিলম্বে দলে দলে পুলিশ আসিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

মধ্যাহ্নকালে শিশির কুমারের চেতনা হইল, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখা, পুলিশ প্রহরীতে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া সে ভীত হইল। অকস্মাৎ গুলজারের ছিন্ন মস্তকের প্রতি শিশিরের দৃষ্টি পড়িল, শিশির চমকিয়া উঠিল—একি! গুলজারকে

খুন করিল কে? আবার দেখিল তাহার পার্শ্বেই একখানি সুতীক্ষ্ণ ছোরা পড়িয়া রহিয়াছে। ভয়ে বিস্ময়ে শিশির কুমার একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। আকাশ পাতাল অনেক ভাবিল--কিন্তু কোনও কিনারা করিতে পারিল না।

তাহার পর পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আরম্ভ করিল। সে কোন কথারই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল বলিল—"আমি কিছুই জানি না।" কিন্তু এরূপ স্থলে পুলিশের সন্দেহ শিশির কুমারের উপরেই বদ্ধমূল হইল।

পুলিশ গুলজারের শবদেহ ও শিশিরকুমারকে থানায় লইয়া গেল, এবং যতদিন বিচার না হয় ততদিন শিশিরকুমারকে হাজতে বন্ধ রাখা হইল।

৭

আজ তিন দিন কোনও কার্য্যোপলক্ষে ফণীভূষণ সপরিবারে দিল্লী আসিয়াছে, বলা বাহুল্য মৃণ্ময়ীও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে।

শিশির কুমার যে দিল্লীতে আছেন, এ সংবাদ তাহারা কেহই অবগত নহে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর! দুগ্ধ ফেননিভ শ্বেত শয্যায় ফণীভূষণের জননীর পার্শ্বে মৃণ্ময়ী শায়িতা!

নীরজা গাঢ় নিদ্রিতা; মৃণ্ময়ী জাগিয়া চিন্তা করিতেছিল—শিশির কোথায় গেল? দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে—সে নিরুদ্দেশ ফণীদাদা এত অন্বেষণ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার ত' কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। তিনি কি বেঁচে আছেন? হয়ত তিনি নাই। চোখের জলে মৃণ্ময়ীর বুক ভাসিয়া গেল।

হঠাৎ মৃণ্ময়ীর মনে হইল, আচ্ছা একবার আমি নিজে খুঁজিয়া দেখি না কেন? কোন সন্ধান পাই কি না। কিন্তু একা স্ত্রীলোক পথে কেমন করিয়া চলিব? নানা বিপদের সম্ভাবনা! সেই সময়ে পথ বাহিয়া একজন ভিখারী স্ত্রীলোক গাহিয়া যাইতেছিল।

"কেনরে তোর এত হতাশ পরাণ
জান নাকি সতীর সহায় স্বয়ং ভগবান?"

সেই গান সহসা চাকতের মত মৃণ্ময়ীর প্রাণে বাজিল। সে সাহসে বুক বাঁধিল, বলিল "ভয় কি? ভগবান আমার সহায় হইবেন। তবে আজই যাই, যদি ফণীদাদা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে তাহা হইলে, আর যাওয়া হইবে না।"

হৃদয়ের বেগে মৃণ্ময়ী উন্মত্তের মত শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর এক টুকুরা কাগজে পেনসিল লইয়া খোলা জানলার সম্মুখে দাড়াইয়া চন্দ্রালোকের সাহায্যে লিখিল।

শ্রীচরণেষু

ফণী দাদা! জীবনে তোমার স্নেহ, তোমার মমতা কখনও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আজ বড় দুঃখে, বড় যন্ত্রণায় নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।

আমি আমার স্বামীর অনুসন্ধানে চলিলাম। আমার জন্য ভাবিও না, ভগবান আমার সহায় হইবেন।

যদি কখনো ভগবান সুখের দিন দেন, তবেই স্বামীর সহিত ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিব—নচেৎ এই শেষ।

দাদা, আমি জানি আমার এ সঙ্কল্প তুমি জানিতে পারিলে, কখনই ইহা সিদ্ধ হইত না, তাই তোমাকে না জানাইয়া চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করো যেন কৃতকার্য্য হই।

ফণী দাদা! তোমার অপার্থিব স্নেহের অনুরোধে অভাগিনী বোনের অপরাধ ক্ষমা করিও।

ইতি—

তোমার চির দুঃখিনী বোন

মৃণ্ময়ী।

পত্র খানি খামে মুড়িয়া তাহার উপর লিখিল শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ রায়। ধীরে ধীরে পত্র খানি নীরজার শয্যা তলে রাখিয়া দিয়া মৃণ্ময়ী কি ভাবিয়া শয়ন কক্ষ, হইতে বাহির হইয়া, হিন্দুস্থানী যুবকের বেশ ধারণ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইল। দাস দাসী সকলেই ঘুমাইতেছিল, কেহই মৃণ্ময়ীকে দেখিতে পাইল না।

নিস্তব্ধ নিশীথে হিন্দু কুলবধূ মৃণ্ময়ী একাকিনী নিঃশঙ্ক হৃদয়ে স্বামীর অনুসন্ধানে চলিল।

মৃণ্ময়ী ক্লান্ত হইয়া আসিয়া যমুনা পুলিনে বসিল।

অকস্মাৎ যমুনার অনতি দূরস্থ বৃক্ষান্তরাল হইতে কাহার কণ্ঠস্বর মৃণ্ময়ীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বিস্মিত হইয়া মৃণ্ময়ী উঠিয়া গাছের নিকট গিয়া দেখিল একটী লোক বসিয়া আপন মনে কত কি বকিতেছে। মৃণ্ময়ী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, সে বলিল টাকায় লোকে খুন করে বেঁচে যায়, টাকাই জগতে সব চেয়ে বড়! মহরুণ খুন ক'রে বেঁচে গেল, আর ফাঁসি যাবে নির্দ্দোষী শিশির। আমি স্বচক্ষে দেখেছি মহরুণ গুলজারকে খুন করেছে, আর খুনী হ'ল কি না শিশির, যে কিছু জানে না!!

না না বলব না মহরুণ ধরা পড়ে যাবে, সব টাকা কেড়ে নেবে। বলব না বাবা, আর বলব না।"

পাগল একটু থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল-"সব জেনে শুনে পাঁচ শো টাকার জন্য আমি চুপ করে থাকব? নির্দ্দোষী লোকটা ফাঁসী যাবে? না, না, তা' হবে না—চাইনা টাকা। ভোর হলেই মহরুণের টাকা ফেলে দিয়ে আসব, আর পুলিশকে বলে দেব মহরুণ খুন করেছে; শিশির মদের নেশায় অচেতন ছিল, সে কিছুই জানে না।—না টাকা ফিরিয়ে দেবনা; সারা মাস হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাই কেবল চারটী টাকা। একটা কথার জন্য পাঁচ শো টাকা পাওয়া কি সহজ কথা? যাক্ আমার কি? আমি কেন মাঝে পড়ে পাঁচশ টাকা হারাব? ফাঁসীর হুকুম হবে কাল, শেষ সময়ে একবার যাব, শেষ দেখা দেখে আসব—আহা "নিমক্ খেয়েছি শিশির বাবুর। না না বাবা, যাবনা যাবনা, যদি কেউ সন্দেহ করে। সব টাকা কেড়ে নেবে—শাস্তি দেবে, যাবনা লুকিয়ে থাকব।"

মৃণ্ময়ী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাগলের কথা গুলি শুনিতেছিল, তাহার নয়ন হইতে মুক্তার মত অজস্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

পাগলের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না।

মৃণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল তোমার নাম কি? মহরুণ কে? কোথায় থাকতে তুমি?"

"আমার নাম হোসেনি। গুলজারের বাড়ীতে চাকর ছিলুম. কোথাও তিষ্টিতে পাচ্ছিনা. কেবল সেই সব কথা মনে পড়ছে, রক্ত মাখা সেই লাল চক্‌চকে ছোরা খানা যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি। মহরুণ নবাবের ছেলে, তার পর টাকা। বলব না বাবা—কিছু বলব না।"

"কার ছোরা? কবে তুমি গুলজারের বাড়ী থেকে চলে এসেছ।"

"কবে এলুম? সেই সেদিন যে দিন মহরুণ গুলজারকে খুন করলে। আমায় পাঁচ শ টাকা দিয়ে কারুকে বলতে মানা করে দিয়াছে, প্রাণ গেলেও প্রকাশ করব না। ছোরা? সেই মহরুণের ছোরা যা দিয়ে গুলজারকে খুন করেছে। বলব না।"

"শিশির বাবু এখন কোথায়?"

"হাজতে—কাল তার ফাঁসীর হুকুম হবে।"

"মহরুণ কোথায়?"

"না না কিছু প্রকাশ করব না, সে ধরা পড়ে যাবে এখানে থাকা হল না, পালাই বাবা" বলিতে বলিতে পাগল তীর বেগে ছুটীয়া পালাইল।

৮

বিচারালয়ে বিচারপতি বসিয়া শিশিরকুমারের বিচার করিতেছেন।

কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া শিশির কত কি ভাবিতেছে, তাহার অশ্রুহীন চক্ষু দুটী হৃদয়ের অব্যক্ত অসীম ক্রন্দনের পরিচয় দিতেছে।

বিচার শেষ হইল. শিশিরকুমারই খুনী বলিয়া প্রমাণিত হইল. লেখনী লইয়া জজ সাহেব তাহার ফাঁসীর হুকুম লিখিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন হিন্দুস্থানী যুবক বিদ্যুৎবেগে জনতা ভেদ করিয়া বিচারালয়ের সম্মুখে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"হুজুর আমি গুলজারকে খুন করেছি, যাকে আপনী ফাসী দিতে যাচ্ছেন সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

বিচারপতি কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া একদৃষ্টে যুবকের মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন।

বন্দী শিশিরকুমার কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিচারপতি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল দুখীদাস।

তাহার পর গুলজারের সহিত সে কিরূপে পরিচিত হইয়াছিল, এবং কেন সে গুলজারকে খুন করিল ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করা হইল।

দুখীদাস স্থিরভাবে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া গেল। তার পর বলিল— হুজুর প্রাণের ভয়ে শিশির বাবুর কাছে ছোর খানা ফেলিয়া পালাইয়াছিলাম, আজ একটী নিরপরাধীর ফাঁসী হচ্ছে শুনে হঠাৎ আত্মগ্লানিতে আমার বুক ভ'রে গেল—তাই আপনি এসে ধরা দিলাম।

বিচারালয়ে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, শিশিরকুমারের বিস্ময় উপর্য্যুপরি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জজ, উকিল, পুলিশ সকলের মধ্যে একটা বিষম জটলা বাধিয়া গেল। বাহিরে আরও কি একটা গোলমাল হইতেছিল। সে জনতা ক্রমে আদালত গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন--ব্যাপার কি ?

একটা পাগলকে ধরিয়া লইয়া সেই সময় পুলিসের লোক বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত করিল—সে সেখানে আসিয়াই বলিল—"আজ্ঞে হুজুর ধর্ম্মাবতার সব কথাই সত্য।"

মুহূর্ত্তকাল সকল কোলাহল নিস্তব্ধ হইল

আবার এ কি! নবাবজাদা মহম্মদ লতিফ মহরুণ পুলিশ পরিবেষ্টিত হইয়া আদালত কক্ষে উপনীত হইলেন। খোদা মেহেরবান্, উপর হইতে সবই দেখিতেছেন, সব কথাই সত্য। এই বলিয়া নবাবজাদা বিচারপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

আদালতে একটা বড় বিষম কোলাহল পড়িয়া গেল।

বিচারপতি একটু চিন্তা করিতে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গোলমাল একটু শান্ত হইলে তিনি নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

৯

পাঠক পাঠিকার নিকট সে দিনের ঘটনাটা প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; যখন হোসেনী যমুনা তীর হইতে পাগলের মত নানারকম বকিতে বকিতে ছুটীয়া পলাইতেছিল তখন চৌমাথার মোড়ে একটা পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া গেল: তাহার হাতে ৫০০৲ টাকার নোট ও সে নানারূপ হিজিবিজি বকিতেছে দেখিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। সে মৃণ্ময়ীর নিকট যেমন হাজার বার গোপন করিয়া কথাটা অনেকবার বলিয়াছিল তেমনি পুলিশের কাছেও করিল। শেষে তাহার পায়ে ধরিয়া বলিল "তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। এই টাকাটা বড় কষ্টের টাকা—দোহাই তোমার—ছেড়ে দে বাবা আমি পালাই।

পুলিশ হোসেনিকে ছাড়িল না। তাহাকে থানায় লইয়া গেল। ভীষণ মূর্ত্তি দারোগার কাছে হোসেনী যাহা যাহা বলিল তাহা হইতে দারোগা মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে নবাব পুত্র লতিফই প্রকৃত খুনী। এত বড় একটা শীকার পাইয়া দারোগা মহাশয়ের বুকের মাঝে নানা-ভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। কিন্তু দারোগা প্রবর সহসা একটা কিছু করিতে সাহস পাইলেন না। তাহার পরদিবস প্রভাতে পাঁচ ছয় জন কনেষ্টবল নবাব প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

নবাব প্রাসাদের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কি চাও।"

কনেষ্টবলের মধ্যে একজন একখানা পত্র বাহির করিয়া রক্ষীদের হাতে দিল এবং নিম্নস্বরে বলিল এই পত্রখানি নবাবজাদার কাছে পৌছিয়া দাও।

সেই সময়ে চার পাঁচটী কুকুরের সঙ্গে আট দশ জোড়া জুতার মস্‌মস্‌ ধ্বনি তোরণ পথে পথে শোনা গেল। রক্ষীর সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল; স্বয়ং নবাবজাদা আসিতেছেন।

একজন আভূমি নত হইয়া পত্রখানি নবাবজাদার হাতে দিল। সহচরগণ বলিল, কি কি? এ কাঁহাসে আয়া।

নবাবজাদা পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন—পত্র পাঠ শেষ হইলে মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, নবাবজাদা বলিলেন—হ্যাঁ ঠিক হইয়াছে, আমিই খুনী, তোমরা আশঙ্কা করিও না। চল তোমাদের সঙ্গে থানায় যাই। সহচরগণ ব্যাপারখানা বুঝিবার পূর্ব্বেই নবাবজাদা পুলিসের সহিত থানায় চলিয়া গেলেন।

নবাবজাদা দারোগাকে বলিলেন—আপনাকে ধন্যবাদ আজ একটা গুরুতর পাপ হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। এই লউন আমার হীরকাঙ্গুরীয়—আপনার পুরস্কার।

লতিফ অঙ্গুরী খুলিয়া দিলেন।

দারোগা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক রকম সান্ত্বনার কথা ও কৌশলের কথা বলিতে লাগিলেন।

নবাবজাদা বলিলেন—বিচারের দিন কি আজই?

দারোগা বলিলেন—হাঁ নবাবজাদা!

লতিফ জিজ্ঞাসা করিলেন—কখন বিচার আরম্ভ হইবে?

দারোগাবাবু একটু চমকিত হইয়া বলিলেন, বোধ হয় বিচার এতক্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আপনারা এখনও নীরব। আসুন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন। নবাবজাদা দারোগা ও কনেষ্টবল প্রভৃতির সহিত আদালতাভিমুখে চলিলেন।

আদালতে আসিয়া নবাবজাদা বলিলেন আমি খুনী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—আর সকলে নির্দ্দোষী।

বিচারপতি মহা সমস্যায় পড়িলেন, দুঃখীদাস অবাক হইয়া নবাবজাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে কথা সরিতেছিল না। রোসেনীও অবাক।

হোসেনী এই সব ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, ইয়া আল্লা, ইহা মেহেরবান্ বলিয়া চীৎকার করিয়া গোলমালের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল, কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। এ দিকে বিচারপতি চিন্তাকুলভাবে বিচারে বসিলেন। নবাবজাদাকে আরও দু'চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে নবাবজাদাই প্রকৃত দোষী।

এ দিকে এইরূপ ব্যাপার, অপর দিকে আদালতের কাটগড়ায় যে হিন্দুস্থানী যুবক দাঁড়াইয়া ছিল সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। প্রহরীরা গোলমাল করিয়া উঠিল। জজ সাহেবের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কাটগড়ার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। অনেকে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। চখে মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে যুবকের পর-চুলা খসিয়া পড়িয়াছে—একি, এ যে স্ত্রীলোক! সকলের বিস্ময়ের আর অবধি নাই।

ক্রমে ক্রমে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তখন সকলে তাহার উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়াছে বুঝিয়া মৃণ্ময়ী বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। জজ সাহেব সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে নিজের খাস কামরায় লইয়া গেলেন ও সরকারী উকীলকেও সঙ্গে লইলেন। সেখানে অনেক জিজ্ঞাসার পর মৃণ্ময়ী পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা জজ সাহেবের নিকট অকপটে বলিল। জজ সাহেব তাহার পতিভক্তি দেখিয়া ও পতির জীবনের জন্য নিজের জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, ও তৎক্ষণাৎ শিশিরকুমারকে ডাকাইয়া যথেষ্ট ভৎর্সনা করতঃ মুক্তি দিলেন এবং পুলিশ ইন্স্পেক্টরকে ডাকিয়া মৃণ্ময়ীর সহিত শিশিরকুমারকে ফণীভূষণের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হুকুম দিলেন।

উপসংহার।

যথাসময়ে ফণীভূষণের সহিত শিশিরকুমার ও মৃণ্ময়ী দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন আর সে শিশির নাই। শিশির এখন নিজের ভুল বুঝিয়াছে। তাহার স্বভাব আর সেরূপ নাই। সে এখন ফণীভূষণের প্রদত্ত মূলধন লইয়া ব্যবসা করিয়া সুখে সংসার করিতেছে। মৃণ্ময়ীর সুখের সীমা নাই। এক দিন শিশিরকুমার মৃণ্ময়ীকে আদর করিয়া বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—তুমিই আমার সেই "উপেক্ষিতা" তুমি না থাকিলে এতদিন আমাকে ফাসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইত।

মৃণ্ময়ী লজ্জায় মুখ নত করিয়া বলিল—আমি কিছুই করি নাই, সমস্তই সেই করুণাময় ভগবানের দয়া ও ফণীদাদার অনুগ্রহ।

শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী।

এক পয়সায় পাঁচ রকম।

সওদাগরের ধন দৌলতের সীমা নাই, লোক জনের অভাব নাই। কিন্তু ছেলেটী একটি হস্তী মূর্খ, নীরেট বোকা। তার না আছে একটু আক্কেল সরম, না আছে একটু যত্ন চেষ্টা। সওদাগর কত পণ্ডিত, কত মাষ্টার রেখে দিলেন, দিনরাত কত করে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লনা। সে সব তার এক কাণ দিয়ে ঢোকে আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সওদাগর দেখে শুনে হাল ছাড়লেন, ছেলের সব আশা ভরসা ছেড়ে দিলেন। এখন তার নাম শুনলেই হয়ত চটেন। কিন্তু হাজার হলেও মায়ের প্রাণ—সওদাগরের স্ত্রী এখনও আশা করেন তাঁর ছেলে নিশ্চয়ই ভাল হবে। তার কোনও অন্যায় কাজের কথা হলেই বলেন—"ও ছেলেমানুষ, বড় হ'লে সব সেরে যাবে।

মা ষষ্টীর কৃপায় ছেলে দিন দিন বাড়তে লাগলো। সওদাগরের স্ত্রী এক দিন সওদাগরকে বল্লেন—"ওগো ছেলের এমন বয়স হয়েছে, বিয়ে থাওয়া দাও, ঘরে একটী টুকটুকে বউ আসুক, দেখে চোখ জুড়োই।" সওদাগর শুনে বল্লেন—সে না তোমার ছেলে! অমন লক্ষীছাড়া নীরেট মুর্খকে কে মেয়ে দিবে? আমি কোন্ মুখে এ কথা লোকের কাছে বলব? সে আমাকে দিয়ে কিছুতেই হবে না। সে কথায় সওদাগরের স্ত্রী বল্লেন—"ওমা, সেকি কথা গা? ছেলে কি চিরকাল আইবুড়ো থাকবে? সকলের ছেলেই কি সমান বুদ্ধিমান হয় গা? আমার বাছার এমনকি বয়েস হয়েছে যে বুঝে শুঝে সব কাজ করতে পারবে? আর ওর যে একেবারে বুদ্ধি শুদ্ধি নেই তাও ত নয়। অনেক সময় ও বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজ করে, তুমিত সব খবর রাখনা?"

সওদাগর তখন বলেন—"তোমার ওসব ঘ্যানঘ্যানানী রেখে দাও। তোমার কাছে ওকথা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আমি কাজে তার কিছুই দেখিনি। তোমার ওসব কথার কাণা কড়া মূল্য নেই। মা কি আর নিজের ছেলের দোষ দেখতে পায়? যাক্, আমি এবারে তাকে একবার শেষ পরীক্ষা করে দেখছি। তাকে এখনি ডেকে পাঠাও, আর তার হাতে তিনটী পয়সা দিয়ে বাজারে যেতে বল। এই তিন পয়সার একটা দিয়ে যেন তার নিজের জন্য কিছু কিনে, আর একটা যেন নদীতে ফেলে দেয়, আর বাকি যেটা থাকবে তা দিয়ে 'খাউন, চুন, তা ত্রাকুন, তা ওয়ারী ওয়ায়ুন, তা গো খাউত খোরাক'* (অর্থাৎ যার কিছু খাওয়া যাও, কিছু পানকরা যায়. কিছু চিবান যায়, কিছু বাগানে বোনা যায় আর কিছু গরুর খোরাক হয়) এই পাঁচ রকম জিনিষ কিনবে।"

সওদাগরের স্ত্রী তখন ছেলেকে ডেকে এনে তার হাতে তিনটী পয়সা দিয়ে সওদাগর যা যা বলেছিলেন সব বলে দিলেন। ছেলে বাজারে গিয়ে এক পয়সার মিঠাই কিনে খেল। তারপর নদীর ধারে গিয়ে পয়সাটা ছুড়ে ফেল্‌বে এমন সময় হঠাৎ বলে উঠলো—"আমি কি বোকা? পয়সাটা জলে ফেলে দিলেত আমার আর একটা মাত্র পয়সা থাকবে। তা দিয়ে মা যে বলে দিলেন, খাওয়া পিয়ার জিনিস ও আরও কত কি কিন্‌তে হবে তা হলে তা কি করে হবে? অথচ পয়সাটা যদি জলে ফেলে না দিই তা'হলে তাঁর কথার অমান্য করা হয়।"

নদীর ধারে একলা একলা দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বকছে এমন সময় সে দিক দিয়ে যাচ্ছিল এক কামারের মেয়ে। সওদাগরপুত্রকে ওরূপ বকতে দেখে সেই মেয়ে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কিগো, তুমি কি বল্‌ছ?" সওদাগরপুত্র তখন তার মা যা যা কর্‌তে বলেছেন সে সব সেই মেয়েকে বল্লে। সেই সঙ্গে একথাও বল্লে যে, সে এখন কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না।

তখন সেই মেয়ে বল্লে—"কি কর্‌তে হবে আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। তুমি বাজারে গিয়ে একটা পয়সা দিয়ে একটা তরমুজ কিনে নিয়ে যাও। আর একটা পয়সা নদীতে ফেলে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দাও। যে পাঁচটা জিনিষ তোমায় কিন্‌তে বলেছে সে সবই তরমুজের ভিতর আছে। যাও,

* কাশ্মিরী ধাঁধা।

একটা তরমুজ নিয়ে গিয়ে তোমার মাকে দাও। তখন সওদাগরপুত্র তাই করলে।

সওদাগরপুত্র তখন তরমুজটা তার মার হাতে এনে দিয়ে বল্লে—"এই নাও মা, এক পঁয়সায় পাঁচ রকম এনেছি।" তখন সওদাগরের স্ত্রী ভাবলেন যে তার ছেলে বাস্তবিকই কেমন বুদ্ধিমান। তাঁর মনে তখন বড়ই আহ্লাদ হ'ল। তিনি তখন ছুটে গিয়ে সেই তরমুজটা সওদাগরকে দেখিয়ে বল্লেন—"ওগো, এই দেখ তোমার ছেলের বুদ্ধি আছে কি না।" সওদাগর তা দেখে খুবই আশ্চর্য্য হ'লেন। তারপর তার স্ত্রীকে বল্লেন—"তোমার ছেলের ঘটে যে এত বুদ্ধি আছে এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই অপর কেউ ওকে বলে দিয়েছে।" এই বলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"হ্যাঁরে তোকে তরমুজ কিনতে কে বলে দিলে?"

ছেলে বল্লে—"এক কামারের মেয়ে।" সওদাগর তখন তার স্ত্রীকে বল্লেন—"দেখলে? আমি আগেই বলেছি ওর মত বোকার অতটুকু বুদ্ধি গজাবে এ কিছুতেই হতে পারে না। যাক ওকে বিয়ে দিতে চাচ্ছ, দাও। তবে আমি এই বল্‌ছি যে তোমার যদি মত হয় আর ও যদি ইচ্ছা করে তা'হলে এই কামারের মেয়ের সঙ্গেই ওর বিয়ে হ'ক। এই মেয়েকে খুব চালাক চতুর বলে মনে হচ্ছে আর তা ছাড়া তোমার ছেলের উপর মেয়ের বেশ টান দেখা যাচ্ছে।" এ কথায় সওদাগরের স্ত্রী বল্লেন—হাঁ, হাঁ, বেশ বলেছ। এই সব চেয়ে ভাল হবে।"

কয়েকদিন পরই, যে কামার কন্যা সওদাগরপুত্রকে বুদ্ধি দিয়েছিল, সওদাগর সেই কামারের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লেন। বাড়ীতে পা দিতেই কামার কন্যাকে সামনে দেখতে পেলেন। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—"বাছা, বাড়ীতে কে আছে?"

মেয়ে—"আমি একলাই আছি।"

সওদাগর—"তোমার মা বাপ কোথা?"

মেয়ে—"বাবা এক কড়ার চুণ কিনতে গিয়েছে; আর মা কথা বেচতে গিয়েছে।" সওদাগর মেয়ের কথা বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তোমার বাবা, মা, কোথায় গিয়েছে বল? আমি তোমার হেয়ালি বুঝতে পাচ্ছি না।"

তখন মেয়ে বল্লে "বাবা এক কড়ার চুণ কিনে আনতে গিয়েছে, মানে

প্রদীপের জন্য এক কড়ার তেল আনতে গিয়েছে। মা কথা বেচতে গেছে মানে একজনের বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক করতে গিয়েছে।"

মেয়ের বুদ্ধি দেখে সওদাগর অবাক হ'য়ে গেলেন। তখন মনে মনে তার খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। খানিক পরই কামার ও কামারণী বাড়ী ফিরে এল। তারা ত তাহাদের কুঁড়ে ঘরে সেই সওদাগরকে দেখে অবাক। তখন তাঁকে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"গরীবের বাড়ী মহাশয়ের পায়ের ধুলো পড়েছে কেন?" সওদাগর যখন বল্লেন যে তার ছেলের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে ঠিক করতে এসেছেন; তখন তারা ত প্রথমে সেকথা বিশ্বাসই করতে পারলো না। তারপর অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলাতে যখন বুঝলো যে সওদাগর বাস্তবিকই তাদের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে চান তখন তাদের আনন্দ দেখে কে? তারপর বিয়ের দিন স্থির করে সওদাগর বাড়ী ফিরে এলেন। সওদাগরের স্ত্রী যখন শুনলেন যে সে মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে তার মা বাপ বিয়ে দিতে রাজী হয়েছে তখন তিনি বাড়ীতে খুব ঘটা লাগিয়ে দিলেন।

সওদাগরপুত্রের বিয়ের কথা বাতাসের আগে পাড়াময় ছুটে গেল। সে কথা শুনে সকলে বলাবলি করতে লাগলো—"বাবারে সওদাগরের কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! ছেলেটাকে কিছুতেই বিয়ে করাবে না। শেষকালে কিনা একটা কামারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলো"! কেউবা এত দূর গেল যে সওদাগরপুত্রকে কান ভাঙ্গানী দিতে ছাড়লোনা। তারা তাকে শিখিয়ে দিল যে তার বাপ যদি নিতান্তই কামারের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেয় তাহালে সে যেন তার স্ত্রীকে রোজ সাত ঘা জুতোর বাড়ি মারে। তারা মনে ভেবেছিল যে একথা কামারের কাণে গেলেই সে ভয় পেয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। তারা একথাও বল্লে যে কামারের পো যদি নিতান্তই নাছোড়বান্দা হয়ে বিয়ে দেয় তাহ'লে রোজ এমনি করে স্ত্রীকে মারলে সে স্বামীর বশে থাকবে। সেই বোকচন্দ্র ছেলে ভাবলে—এ অতি ভাল বুদ্ধির কথাই বলেছে। সে তখন মনে মনে ঠিক করলো যে সে রোজ তার স্ত্রীকে একবার করে জুতোপেটা করবে।

একথা যখন কামারের কাণে গেল তখন সে তার মেয়েকে ডেকে বল্লে—"মা, অমন বিয়েতে কাজ নেই। জুতো খাওয়ার চাইতে আইবুড়ো থাকবে তাও ভাল।" সে কথা শুনে মেয়ে বল্লে—"বাবা, তুমি এত ভয় পাচ্চ কেন?

কোনও দুষ্ট লোক ওকে অমন শিখিয়েছে। আমি গিয়ে সব ঠিক করে নেব এখন, তোমাকে সে জন্ত মাথা ঘামাতে হবে না। পুরুষ মানুষরা অমন অনেক কথাই বলে, কিন্তু কাজের বেলায় ভেড়া ব'নে যায়। তুমি একটুও ভয় খেওনা, বাবা!"

তারপর শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে বর-কনে বাসর ঘরে গেল। নিশুতি রাতে যখন সকলে ঘুমে অচেতন তখন বর চুপি চুপি উঠে পায়ের জুতো খুলে যাই কনেকে মারতে যাবে এমন সময় সে চোখ চেয়ে বল্লে—"ওগো, কর কি? বিয়ের রাত্রিতে কি অমন করতে আছে? ওতে যে কুলক্ষণ হয়। আজ কি ঝগড়াঝাটী করতে আছে? যদি তোমার ইচ্ছা হয় বরং কাল মেরো, আজকার দিনটা থেমে যাও।"

পরদিন রাত্রিতে সওদাগরপুত্র ঠিক আবার জুতো খুলে মারতে গিয়েছে এমন সময় কনে বল্লে—"ওগো, বিয়ের প্রথম হপ্তায় স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করা বড়ই কুলক্ষণের কথা। তোমাকে বার বার করে বলছি, আজকের দিনটা মাপ কর। তুমি অতি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর আমি বেশি কি বলব? সাতটা দিন অপেক্ষা করে আট দিনের দিন তোমার যত খুসী মেরো।" সওদাগরপুত্র ভাবলে—ঠিক কথাই ত বলেছে। তখন হাত থেকে জুতো ফেলে দিল। কাশ্মীরের দেশাচার মতে কনেকে সাত দিনের দিন বাপের বাড়ী চলে যেতে হয়। কাজেই কন্যার বিয়ের পর ছয় রাত্রি শ্বশুর বাড়ী থেকে সাত দিনের দিন সে বাড়ী চলিয়া গেল।

কিছুদিন যায় এক দিন সওদাগরের স্ত্রী ভাবলেন ছেলের বিয়ে-থাওয়া হয়েছে, এবার ওকে সংসার ধর্ম্ম শিখতে হবে। এই ভেবে এক দিন সওদাগরকে বল্লেন—"ওগো, এখন ছেলেকে আর বসিয়ে রাখা কি ঠিক? কাচ্চা বাচ্চা হবে, তাদের খাওয়া পরা দিতে হবে। ওকে এখন কিছু টাকা কড়ি হাতে দিয়ে বাণিজ্য করতে পাঠিয়ে দাও।" শুনে সওদাগর বল্লেন—"তুমি কি ক্ষেপেছ? ওর হাতে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। হাতে টাকা পেলে ও দু'হাতে উড়োবে বৈ ত নয়?" সওদাগরের স্ত্রীও ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি কোমর ধরে বসলেন, ছেলেকে বাণিজ্য করতে পাঠাতেই হবে। হাতে টাকা না পেলে ও শিখবেই বা কি করে? সাঁতার শিখে তবে জলে নামবে এও কি কখনও হয়? হাতে টাকা হলেই টাকার মর্ম্ম বুঝতে পারবে। একবার দিয়েই দেখ না গা?

হাতে টাকা পেয়ে যদি খুইয়ে বসে' তাহ'লে দুঃখ কষ্ট পেয়ে পরে যখন আবার টাকা হাতে হবে তখন তার মর্য্যাদা বুঝতে পারবে। যে কর্ম্ম হ'ক, হাতে কলমে না শিখলে যে চিরকাল অকর্ম্মা হ'য়ে থাকবে ?”

সওদাগর আর কি করেন ? রাতদিন স্ত্রীর ঘ্যান ঘ্যানানী আর কত সইবেন। শেষ কালে তাঁকে রাজী হ'তে হ'ল। তখন ছেলেকে ডেকে এনে তার কাছে কিছু টাকাকড়ি আর সঙ্গে সব জিনিসপত্র ও লোকজন দিয়ে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। যাওয়ার সময় বার বার সাবধান করে দিলেন—টাকা পয়সা যেন হিসাব করে খরচ করে।

সওদাগরপুত্র লোকজন সঙ্গে নিয়ে বিদেশে চলেছে, রাস্তায় যেতে যেতে এক যায়গায় দেখে একটা বাগান, তার চারিদিকে খুব উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। দেখে সওদাগরপুত্র সঙ্গের লোকজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—“ঐ পাচিলের ভিতর কে আছে ?” এই বলে তাদের একজনকে ভিতরে গিয়ে দেখে আসতে বল্লে। তারা দেখে এসে বল্লে যে একটা অতি সুন্দর খুব উঁচু প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। সে কথা শুনে সওদাগরপুত্র নিজে তখন বাগানের ভিতর গেল। সেখানে গিয়ে সেই প্রকাণ্ড বাড়ী দেখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে এমন সময় দেখতে পেলে যে জানালার পাশে একটী অতি সুন্দরী মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে সওদাগরপুত্রকে দেখতে পেয়েই হাত ছাউনি দিয়া ডাকলো। সওদাগরপুত্র কাছে যেতেই তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। তারপর যখন সেই মেয়ে মানুষটী জানতে পারলো যে এ একজন সওদাগরপুত্র, সঙ্গে অনেক টাকা কড়ি নিয়ে এসেছে তখন রাত্রিতে তাকে নিয়ে সে পাশা খেলবে এই ঠিক হ'ল।

মেয়ে মানুষটী ছিল অতি পাকা এক জুয়াড়ী। লোকের টাকা কড়ি ঠকিয়ে নেবার সে অনেক ফিকির জানতো। তার মধ্যে একটী চাতুরী এই ছিল যে খেলবার সময় তাহার পাশে একটা বিড়াল রাখতো। তাকে শিখিয়েছিল যে সে ইঙ্গিত করবামাত্র বিড়ালটা আলোর এমন কাছ দিয়ে ঘেঁসে যেত যে তাতে আলোটা নিভে যেত। খেলায় যখন তার হার হব হব হ'য়েছে ঠিক এমনি সময় সে বিড়ালটাকে ইসারা করতো। এই করে সে কত টাকাই না ঠকিয়ে নিয়েছিল। সওদাগরপুত্রের সঙ্গে খেলতে গিয়েও সে তার বিড়ালের চাতুরী খেললো। সওদাগরপুত্র বাজীতে একে একে সঙ্গের টাকা কড়ি জিনিষপত্র ও লোক জন যা

ছিল সবই একে একে হেরে গেল। শেষকালে নিজেকে বাজী রেখে সেবারেও হেরে গেল। যখন তার আর কিছুই রহিল না তখন তাকে জেলে যেতে হল। সেখানে তার কত কষ্ট হতে লাগলো। বেচারা আর কি করে? রাত দিন কেবল ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো।

এমনি করে সওদাগরপুত্র জেলে পচতে লাগ্‌লো। একদিন সে জেল-খানার একটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় তার পাশ দিয়ে একটী লোককে যেতে দেখে সে কোথা থেকে আস্‌ছে তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে। সওদাগরপুত্রের বাড়ী যে দেশে সে লোকটী সেই দেশের নাম করে বল্লে যে সে অমুক দেশ থেকে এসেছে। সে কথা শুনে সওদাগরপুত্র বল্লে—"ভালই হ'ল। ভাই, তুমি দয়া করে আমার একটী কাজ করবে? আমি এখানে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে বন্দী দশায় আছি। যতক্ষণ ঋণ শোধ করতে না পারব ততক্ষণ আমার খালাস হবার কোনও উপায় নেই। আমি দুখানা চিঠী দিচ্ছি, একখানা আমার বাবাকে আর একখানা আমার স্ত্রীকে দিও। তুমি যদি দয়া করে এই কাজটুকু কর তাহ'লে চিরকালের মত তোমার নিকট ঋণী হয়ে থাকব।" লোকটী তখন রাজী হ'য়ে চিঠি দুখানা নিয়ে তার কাজে চলে গেল।

চিঠি দুখানার একখানা ছিল সওদাগরের নামে। তাতে সওদাগরপুত্র তার বাপের কাছে সকল বিপদের কথা খুলে লিখেছে। আর একখানা ছিল তার স্ত্রীর নামে। তাতে লেখা ছিল যে সওদাগরপুত্র অনেক টাকা কড়ি নিয়ে দেশে ফিরে আসছে. আর দেশে এসেই তার স্ত্রীকে আগে কার কথামত জুতো পিটবে। সে লোকটী দেশে ফিরে গিয়ে সে চিটি দু'খানা দিতে গেল। এখন, সে ছিল নিরক্ষর মূর্খ। লেখাপড়া কিছুই জানতো না। তাই সওদাগরপুত্রের বাপের চিঠি দিল তার স্ত্রীর কাছে, আর তার স্ত্রীর চিঠি দিল সওদাগরের কাছে।

ছেলে এত টাকা কড়ি নিয়ে ঘরে ফিরছে—সওদাগর ও চিঠি পড়ে মহা খুসী। তবে চিঠি খানা বউয়ের নামেই বা লিখেছে কেন? আর বাড়ী ফিরে বউকে জুতো পেটা করবে বলে ভয়ই বা দেখিয়েছে কেন, এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না। এদিকে সওদাগর পুত্রের স্ত্রী সে চিঠিতে তার স্বামীর বিপদের কথা জেনে মহা ভাবনায় পড়লো। আর চিঠিখানা শ্বশুরের হাতে দিল। তখন দুখানা চিঠিতে দুরকম লেখা দেখে তাদের বিষম সমস্যায় পড়তে হ'ল।

অনেক ভেবে চিন্তে সওদাগরের বউ নিজে গিয়ে তার স্বামীকে ছাড়িয়ে আন্‌বে ঠিক কর্‌লো। সওদাগরও সে কথায় রাজী হয়ে তার পথ খরচের জন্য সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে দিলেন। সওদাগর পুত্রের স্ত্রী পুরুষের বেশ ধরে খুঁজে খুঁজে সেই উচু পাঁচিল ঘেরা বাগানের ভিতর গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে গিয়ে সে জুয়াড়ী মেয়ে মানুষটির কাছে নিজেকে এক ধনী বণিকপুত্র বলে পরিচয় দিল। তখন সেই মেয়ে মানুষটী তাকেও পাশা খেলবার ফাঁদে ফেলাবার জন্য সেই খেলার কথা পাড়লো। তারপর তাদের মধ্যে ঠিক হ'ল যে সেই রাত্রিতে খেলা আরম্ভ হবে।

এদিকে বণিকপুত্র সেই জুয়াড়ী মেয়ের চাকরাণীদের কাছে গিয়ে কি করে সে সকলকে হারিয়ে দেয় তার সন্ধান বলে দিতে বারবার বল্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমে তারা কিছুতেই কোন কথা বল্‌তে রাজী হ'ল না। তারপর যখন সেই বণিকপুত্র তাদের হাতে চক্‌চকে আসরফি গুলি গুঁজে দিল, তখন আর তারা সে লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লো না। তারা তখন জুয়াড়ীর সকল চাতুরীর কথা একে একে বলে দিল। সে রাত্রিতেও বিড়ালের চাতুরী খেল্‌বে সে কথাটীও তারা বল্‌তে ভুললে না।

সন্ধ্যা হওয়া মাত্র বণিক পুত্ররূপী সওদাগরের পুত্রের স্ত্রী তার আংরাখার ভিতরে করে একটী ইন্দুর নিয়ে এসে খেলা আরম্ভ কর্‌লো। খেলার প্রথম থেকেই বণিকপুত্রের জিৎ হ'তে লাগলো। তখন বেগতিক দেখে সেই জুয়াড়ী মেয়ে তার বিড়ালকে ইঙ্গিত কর্‌লো। বিড়াল প্রদীপের দিকে যাচ্ছে দেখে বণিকপুত্র তার ইন্দুরটাকে ছেড়ে দিল। তখন ছাড়া পেয়ে ইঁদুর ঘরময় ছুটো-ছুটি কর্‌তে লাগলো আর বিড়ালটাও তার পিছন পিছন তাড়া কর্‌তে লাগলো।

জুয়াড়ী মেয়ে খেলা থামিয়ে ইঁদুর-বিড়ালের লাফালাফি দেখ্‌ছে দেখে বণিক পুত্র বল্লে—"থাম্‌লে যে? বেড়াল ইঁদুরকে তাড়া কর্‌ছে এর জন্য খেলা বন্ধ করে কি হবে?" জুয়াড়ী মেয়ে তখন অপ্রস্তুত হ'য়ে আবার খেল্‌তে লাগলো। তখন জুয়াড়ী মেয়ে একে একে যথা সর্ব্বস্ব হার্‌তে লাগ্‌লো। কয়েকবাজী খেলা হ'তেই সওদাগরপুত্রের স্ত্রী তার বোকা স্বামী যা যা হেরেছিল সে সব ত ফিরে পেলই, তাছাড়া জুয়াড়ী মেয়ের সেই প্রকাণ্ড বাড়ী, লোকজন ও ক্রমে তাকে শুদ্ধ জিতে নিল।

তারপর সমস্ত ধন দৌলত বাক্সোপূরে বণিকপুত্ররূপী সওদাগর পুত্রের স্ত্রী

কারাগারের কয়েদিদের সব খালাস দিতে হুকুম দিল। তখন অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে তার স্বামীও জেল থেকে বের হয়ে এল। সকলকে বিদায় দিয়ে তাকে তখন সে তার সর্দ্দার করে নিল। তরপর সওদাগরপুত্রের জেলের চীরকুট পোষাক খুলে নিয়ে তাকে নূতন কাপড় চোপড় পর্‌তে দিল। আর জেলের পোষাকগুলি একটা বাক্সের ভিতর পূরে চাবি বন্ধ করে সে চাবি তার নিজের কাছে রেখে দিল। অপর সব জিনিষপত্র বড় বড় বাক্সে বন্ধ করে সে সকলের চাবি সর্দ্দারের জিম্মা করে দিল। তারপর সমস্ত ঠিক করে সেই জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে দেশ ফিরে গেল।

সওদাগরপুত্রের বাড়ীর কাছে এসে সেই বণিকপুত্র তাকে বল্লে—"সর্দ্দার, আমার একটা বিশেষ দরকারে আমি অন্য দিকে যাচ্ছি। তুমি সব জিনিষ-পত্র নিয়ে তোমার বাড়ী যাও। আমার জন্য ভেবোনা, আমি যদি তিন সপ্তাহের মধ্যে ফিরে না আসি তাহ'লে সব জিনিষপত্র তোমার হবে। আমি তোমায় বিশ্বাস করে আমার সব জিনিষপত্র ও লোকজন সব তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি।"

সওদাগরপুত্রের স্ত্রী তখন অন্য পথে তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। এদিকে সওদাগরপুত্র সব বাক্স ও লোকজন সঙ্গে করে তার বাড়ীতে গিয়া হাজির হ'ল। তারপর তার বাপকে গিয়ে বল্লে যে এ সব ধনদৌলত লোকজন সে বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে। তার বাপ্‌কে এ কথাও বল্লে যে এসব জিনিষ-পত্রের কথা যেন কাউকে বলা না হয়।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই সওদাগরপুত্রের স্ত্রী তার শ্বশুর বাড়ী ফিরে গেল। তাকে দেখেই পূর্ব্বের কথামত সওদাগরপুত্র তাকে জুতা মার্‌তে গেল। তা দেখে তার বাপ মা বলে উঠ্‌লেন—"কি করিস, কি করিস? মেয়ে মানুষের গায়ে হাত! এ বাড়ীতে এ সব ইতরামি কর্‌তে পার্‌বিনে। ভাগ্যে আমাদের এই লক্ষ্মী বউ ছিল তাই আজ তুই জেল থেকে উদ্ধার হয়ে এলি। আর তুই কিনা সেই বউকে জুতো মার্‌তে যাচ্ছিস?"

একথা শুনে ছেলে মনে মনে ভাব্‌লে—একি, এরা কি করে এ সব কথা জান্‌লো? মুখে বল্লে—"কে আমায় উদ্ধার করেছে? মেয়ে মানুষকে আর অত বাহাদুরী কর্‌তে হবে না।" তখন তার স্ত্রী বল্লে—"বটে? তোমার সব বিদ্যে টের পেয়েছি, আর বেশী চালাকী কর্‌তে যেওনা।" এই বলে যে বাক্সে সওদাগরপুত্রের জেলের পোষাক রেখে দিয়েছিল সেই বাক্স খুল্‌তে বল্লো।

তখন বাক্স খুল্‌বামাত্র যখন সব বের হয়ে পড়্‌লো তখন সওদাগরপুত্রের মুখখানা চুণ হয়ে গেল। কিছু বুঝ্‌তে না পেরে সে তার স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার স্ত্রী তখন বুঝ্‌তে পেরে, কি করে সে ধনী বণিকপুত্রের বেশ ধরে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছে, সব তাকে খুলে বল্লো। সে সব কথা শুনে সওদাগরপুত্র তার স্ত্রীর বুদ্ধির খুব প্রশংসা করতে লাগ্‌লো; আর সেই থেকে সে তার এমনি বশ হয়ে রইলো যে তার কথায় ওঠে বসে, সকল কাজে স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে চলে।

শ্রীশ্যামাচরণ দে।

রঙ্গ বারিধি।

১ম তরঙ্গ।

ভোলার বুদ্ধি।

আমি শ্রী সুধাংশুভূষণ রায়, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, কল কব্জার বিষয় বেশ শিখিয়া আসিয়াছি। দেশে খুব ভাল একজন মেক্যানিক বলিয়া বিখ্যাত হইব এরূপ সদিচ্ছা আমার মস্তিষ্কে চিরকালই খেলিত, তাই দেশ ছাড়িয়া ইংলণ্ড গিয়াছিলাম। কল কব্জার খুঁটিনাটি বিলক্ষণ রকম অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি। দেশে ফিরিয়া একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়িলাম না। কারণ আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব আমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ মূলধন ও আহারের সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। বিলম্ব করিবার আবশ্যক ছিল না, অতি শীঘ্র গোটা দুই তিন পেটেণ্ট কল বাহির করিলেই আপাততঃ মার্টিন কোম্পানী না হইয়া, চলন সই বড় লোক হওয়া অসম্ভব হইবে না। সম্প্রতি একটি সহকর্ম্মিণীর প্রয়োজন। সহকর্ম্মিণী অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আমাকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিবেন ও সর্ব্বকর্ম্মেই আমার সহ থাকিবেন। সেরূপ অদ্ভুত জীব হিন্দুদের মধ্যে পাইলাম কই? মেম সাহেবদের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু বেল পাকিলে কাকের, বিশেষ আমার ন্যায় দাঁড় কাকের কোনই উপকার হওয়া সম্ভবপর নহে। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত না হইলে বুদ্ধি কার্য্যে পরিণত হয় না, বোধ হয় সেই জন্যেই ভগবান নির্জ্জনে বসিয়া সিগারেট সৃজন করিয়াছেন। তাহারি প্রসাদে আমার কার্য্যকারী

শক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিল। প্রথমেই একটী বাড়ীর প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের গোধন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ আমা অপেক্ষা আরও অধিক ঘোর—খাইবে কম, গোবর বেশী দিবে, অথচ মূল্য পাঁচ টাকার অধিক না হয়; এরূপ সুবিধা কোথায় পাইব? ভাবিলাম ভূতুড়ে বাড়ী ব্যতীত কম টাকায় বড় বাড়ী পাওয়া যায় না। তাই দালালদের ডাকিয়া ভূতুড়ে বাড়ীর সন্ধানে নিযুক্ত করিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর অবিনাশ বাবু, কাঠি দালাল, তাহার শারিরীক পরিসর অনুযায়ী তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল; ল্যান্সডাউন রোডের দক্ষিণ ধারে একটী লাল বর্ণের ভূতুড়ে বাড়ী সস্তায় কিনিয়া দিলেন। বৌ বাজারের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড তৈজস পত্রের দ্বারা বাড়ীটিকে অর্দ্ধ সাহেবীয়ানা ও অর্দ্ধ বাঙ্গালীয়ানা রকমে সাজাইলাম। কিছু দিনের মধ্যে দুই তিনটী কল নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলাম। একটী এক সেকেণ্ড মধ্যে চাকর ডাকিবার কল। বিজ্ঞাপনের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার আশায় অনেক বন্ধুগণ সেই কলটী কিনিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়টী অদ্ভুত রকমের, ঘরে আগুন লাগিলে গৃহের উত্তপ্ত বায়ু কলটীকে পরিচালিত করিয়া দেয়! এই কলটী নির্ম্মাণ করিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমি কলটি শয়ন কক্ষে লাগাইবার পর আমার পূজনীয় খুড়া মহাশয় এক রাত্রের জন্য আমার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। বহু যত্নে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ শয়ন কক্ষে তাঁহাকে রাত্রের নিমিত্ত স্থান দিলাম ও আমি বৈঠকখানায় শুইলাম। বলা বাহুল্য খুড়া মহাশয় পুত্রহীন ধনী, উইলে আমার বিষয়ে বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়াছেন শুনিয়াছিলাম, এবং তিনি নিজেও কখন কখন সে কথা বলিয়া থাকেন। অতএব আতিথ্য সৎকারের ত্রুটি হইবে কেন? খুড়া মহাশয়ের কিন্তু একটী কু অভ্যাস ছিল। আলো নিভাইয়া ঘুমাইতে পারিতেন না, বলিতেন অন্ধকারে স্বপ্ন দেখিতে কষ্ট হয়, বয়স হইয়াছে কি না! মনে ভাবিলাম যদি চুরুটের অগ্নি মশারিতে লাগিয়া খুড়া মহাশয়ের বিপদ হয় তাই সযত্নে অগ্নি ভয় নিবারণী কলটী শয্যায় লাগাইয়া দিলাম ও নিশ্চিন্ত মনে বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া খুড়া মহাশয়ের লোহ সিন্দুকের স্বপ্ন দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ খুড়া মহাশয়ের আর্ত্তস্বরে নিদ্রাভঙ্গ হইল; ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি মুক্তকচ্ছ খুড়া মহাশয় প্রাণপণে চীৎকার করিয়া আমাকে গালি দিতেছেন ও উভয় হস্তে সজোরে কাছাটি কল হইতে ছাড়াইবার জন্য টানিতেছেন। ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, বুঝিলাম খুড়া মহাশয় অভ্যাসবশতঃ

ডবল উইক হিঙ্কের রিডিং ল্যাম্পের আলো না কমাইয়াই ঘুমাইয়া ছিলেন, সেই ভীষণ উত্তাপে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া কলের কাঁটা খুলিয়া যায়, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে কলটি খুড়া মহাশয়ের কাছা ধরিয়া তাঁহার ভয়ানক অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিড় হিড় করিয়া টানিয়া নিরাপদ উদ্যানের অনিচ্ছালব্ধ স্নিগ্ধ বায়ু সেবনে রত করিয়াছে, প্রাতে যাইবার সময় খুড়া মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে আমার অতি শীঘ্র বিবাহ করা প্রয়োজন এবং যতদিন বিবাহ না করি ততদিন তাঁহার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও পাইবার আশা যেন না করি, তবে তাঁহার জীবদ্দশায় আমার বিবাহ ক্রিয়া সমাধা হইলে আমার নামের পরিবর্ত্তে উইলে আমার স্ত্রীর নাম থাকিবে। তিনি আরও বুঝাইয়া দিলেন যে আমার এই অদ্ভুত কলের দৌরাত্ম্যে অচিরাৎ তিনি সাংঘাতিক রোগে শয্যা লইবেন। বিষম চিন্তার কথা, হঠাৎ এখন কোথায় বিবাহ করি? আমার প্রাত্যহিক গম্য স্থান এসিয়াটিক মিউজিয়াম, আলিপুরের চিড়িয়াখানা,—এ উভয় স্থানেই যে স্ত্রী লাভের পক্ষে সুবিধাজনক নয় তাহা আপনাদের অবিদিত নাই।

বৈঠকখানায় বসিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলাম এমন সময়ে বাহিরে মোটরের শব্দ পাইলাম, বোধ হইল আমার দ্বারে দাঁড়াইল। দ্রুত পদে বাহিরে আসিয়া দেখি মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ, চালক মাটিতে শয়ন করিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে ইঞ্জিন দেখিতেছে, দুই একজন রাজ মিস্ত্রি ছিন্ন ছাতা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে দাঁড়াইয়া মোটরাধিকারী মিঃ বৈকুণ্ঠ রায় ও তাঁহার পঞ্চাশ্নবর্ষ অতিক্রান্ত উত্তমার্দ্ধের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে ও অদূরে একটি যুবক. হয়ত আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, কিন্তু যতদূর বুঝিলাম তাহাই বলিতেছি—পথিক, তাহার ছাতাটি নূতন, চশমার উপরের ফাঁক দিয়া মোটরস্থিত মিস রায়ের দিকে বিহ্বল নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। এ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া আমি বিনীত নিমন্ত্রণে বিলাত প্রত্যাগত বৃদ্ধ মিঃ রায়কে সপরিবারে বৈঠকখানায় লইয়া আসিলাম। শোফার মহাশয় সার্দ্ধ এক ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া যখন খবর দিলেন যে তিনি মোটরটীকে বশে আনিয়াছেন, আমি তখন বুঝিলাম মোটর বশ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার হস্তপদাদি সম্পূর্ণ অবশ। বিশেষ নয়নদ্বয় ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের আর বিলম্ব নাই ; ইহাতে বুঝিলাম যে মিস্ মেলিনা রায় আমার মস্তকটী চর্ব্বণ করিয়া চলিলেন। মেলিনা যখন আমার প্রদত্ত চায়ের পেয়ালা লইয়া কুঞ্চিত ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা উষ্ণ চা চুম্বন করিতে করিতে নয়নযুগল এই হতভাগ্যের দিকে স্পর্শজ্যাবৎ দৃষ্টিরেখা প্রয়োগ করিলেন, তখন ভাবিলাম ইউক্লিডের নিয়মানুসারে

চক্ষে অনন্ত ভালবাসা না দেখাইলে সে দৃষ্টি কিরূপে নিজনয়নে আবদ্ধ করিব। চেষ্টা করিয়াছিলাম বুঝি কৃতকার্য্যও হইলাম। আবার যখন আমার বাড়িটী দেখিবার জন্য মাতা কন্যা চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন, তখন আমার পুরাতন ভৃত্য ভোলা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে পশ্চিম দিকের কক্ষে একটী ভূত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে ও তাহাতেই বাড়ীটি এতদিন পড়িয়াছিল। উৎসুক নয়নে যখন মেলিনা আমার মুখ হইতে স্বয়ং সেই গল্প শুনিতে চাহিলেন তখন যে আমি কত কি বলিলাম, হলপ করিয়া বলিতে পারি, তাহার একটিও দু মিনিট পরে আমার মনে রহিল না। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আজগুবি ভূতের গল্প সৃষ্টি করা বিশেষ কঠিন নয়, তাহা শীঘ্রই পাঠক মহাশয়েরা দেখিবেন, কারণ আজকাল ভাল সিগারেট না পাওয়াতে কম দামী সিগারেট অত্যধিক ব্যবহার করিতেছি। মেলিনাকে বুঝাইলাম যে এই পৃথিবীতে যত প্রকার ভূত আছে তাহারা সকলেই এই বাড়ীকে দার্জ্জিলিং কিম্বা সিমলার পাহাড় মনে করে। গল্প-গ্রাসের ধরণে বুঝিলাম খুড়া মহাশয়ের টাকার বুঝি এইবার একটা গতি হয়। প্রত্যাগমন কালে মিঃ বৈকুণ্ঠ রায় আমাকে পর দিবস চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

যথাকালে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অতিথ্যের সদ্ব্যবহার করিলাম। সকলে বৈঠকখানায় বসিলে মিস্ মেলিনা মাতার নিষেধসত্ত্বেও পিতাকে আমার কথিত ভূতের গল্পগুলি শুনাইতে লাগিলেন এবং বুঝাইলেন যে ভূতগণ আমার নিতান্ত অপরিচিত নহে। ঘৃণার হাসি হাসিয়া সুশিক্ষিত রায় মহাশয় কন্যাকে কহিলেন—মেলিনা তুমি কি এখনও শেখ নি যে ভূত বলে কিছু থাকা একেবারেই অসম্ভব।

মে—না, বাবা সত্যিই ওঁর পশ্চিমের ঘরে একটা ভূত মাঝে মাঝে উৎপাত করে।

বৈ—সুধাংশু বাবু, আপনি একটা ফাঁদ পাতিলেই দেখতে পাবেন যে হয়ত একটা বাদুড় কিম্বা চামচিকা। আচ্ছা, আপনার ভূত কি রকম উপদ্রব করে বলুন ত? বিষম বিপদ অমানুষিক ধৈর্য্য সহকারে উত্তরের আয়োজন করিতে লাগিলাম; কি কি গল্প করিয়াছিলাম কিছুই মনে পড়িল না, উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া বলিলাম—আজ্ঞে রকমারি উপদ্রব করে।

বৈ—ভূতে যে রকমারী উপদ্রব করে তাত শুনিনি; তারাত বাপ পিতামহের আমল হতে এক রকই করে আসছে।

আ—আজ্ঞে, তাইতেই ত আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

বৈকুণ্ঠ বাবুর বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটীর রেখা দৃষ্টে আর অধিক অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম না। মিউনিসিপাল কমিশনর নির্ব্বাচনের কথা পাড়িলাম লেডিরা কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বুঝিলাম এই সুযোগ—যদি এই সুযোগে আমার জীবন মরণের সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারি ত পারিলাম,—নতুবা হায়, খুড়া মহাশয়ের টাকা তুমি যে কাহার স্কন্ধে চাপিবে তাহা আমার বাড়ীর ভূতগণ ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না। অনেক ভনিতা করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে তা, মিঃ রায়, এই বল্‌ছি যে আমি—মিস্ মেলিনা——" বাধা দিয়া মিঃ রায় বলিলেন—হাঁ, তুমি যা বল্‌বে তা বুঝেছি ; (উঃ শ্বশুরগণ যে এতই কঠিন হয় তাহা কখনই জানি নাই) আমার যদিও কোন বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার চরিত্রের সব দিকটা সাদা নয় বলে বোধ হয়।

হায় আমি! হায় খুড়া মহাশয়ের টাকা—আমাদের উভয়েরই গতি অজ্ঞাত পথে বৃদ্ধের কঠোর নিয়মে পরিচালিত হয়। হতাশায় কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল, অতি কষ্টে বলিলাম "মিঃ রায় আমি আপনার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।"

বৈ। বুঝ্‌লে না ? তুমি যে বল্‌লে যে তোমার বাড়ীতে একটা ভূত আছে, এমন কি তার সঙ্গে তোমার আলাপও আছে,—এ রকম মিছে কথা বলে যে মেয়েদের ভোলাতে চেষ্টা করে, মেলিনার সঙ্গে বিবাহে সহজে সে আমার সম্মতি পাবে, তা মনে করা মূর্খতা বই আর কি ?

ওঃ এতক্ষণে বুঝিলাম, এ ছাই ভূতের গল্প না বলিলে কি ক্ষতি ছিল? হায় খুড়া মহাশয়—তোমার সম্পত্তি বুঝি আমার বাড়ীস্থ বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের কার্য্যেই লাগে—কি বলি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম—"আজ্ঞে, ভূত একটা আছে বৈকি—"

বৈ। বটে ? তাহলে আমাকে এক দিন দেখাও।

আ—তা, তা, সে যে কখন দেখা দেবে তার ত ঠিক নেই, তবে চেষ্টা করা যেতে পারে। হায়, আর কি কোনও আশা আছে ? ইচ্ছা হইতে লাগিল স্বয়ং মরিয়া ভূত হইয়াও মিঃ রায়ের কৌতূহল—হায় মেলিনা, এ জীবনে তুমি আমার হইবে না।

বৈ।—দেখ সুধাংশু (সজোরে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত হইল) আমি এক রাত্রি তোমার সেই ভুতুড়ে ঘরে থাকব, আর যদি এমন কোনও জিনিস দেখ্‌তে পাই যে তার শরীরে পিস্তলের গুলি না ঢোকে, তাহলে আমি তোমাদের বিয়েতে আপত্তি করব না—কিন্তু যদি বুঝি যে আমাকে ঠকাচ্ছ—তাহলে এই পর্য্যন্ত—তোমার সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিল সে কথা পর্য্যন্ত আর কখনও মনে করতে পাবে না—বুঝ্‌লে—আমি কাল রাত্রেই তোমার সেই ঘরে থাক্‌ব।"

"যে আজ্ঞা"—আর যে আজ্ঞা, আমি ত আর আমাতে নাই, উঃ কোথায় তুমি কাঠি দালাল, কেন এই গল্পমাথা বাড়ীটা কিনিয়া দিয়াছিলে, হায় খুড়া মহাশয়, তুমি বা কেন এমন কঠিন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ—? আর যদিই বা করিয়াছিলে ত সম্প্রতি পীড়িতই বা হইলে কেন? যদি কোনও কারণে হঠাৎ তোমার শ্বাস রোধ হয় ত টাকাগুলির উপায় কি হইবে? বজ্রাহত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। চেয়ারে উপবেশন করিয়া প্রস্ফুটিত সর্ষপ পুষ্পের উদ্যান চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। বুঝিলাম মিঃ রায় ভূত বিশ্বাস না করুন ক্ষতি নাই—কিন্তু আমি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সেই শ্রেণীভুক্ত হইব—সে বিষয়ে সন্দেহ করা বৃথা। সন্ধ্যার পর মিঃ রায়ের মোটরের শব্দ আমার মস্তকে লগুড়াঘাত করিতে লাগিল, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইল, জিহ্বা নিষেধসত্ত্বেও মিনিটে দুইবার কখনও বা তিন বার সর্পজিহ্বার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। উভয়ে নীরবে আহারে বসিলাম, বৃদ্ধ পরিতোষ রূপে আহার করিতে লাগিলেন ও বক্রদৃষ্টিতে আমার অভুক্ত খাদ্যপাত্রের দিকে চাহিতে লাগিলেন, ক্রূর হাসিতে মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতে লাগিল, আমি খাইব কি, মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম, "হে হে ভগবান তুমি ত আর পুরাতন ভগবান নও যে পঞ্চভূত লইয়া ঘর কর, এখন ত তোমার অসংখ্য ভূত বর্ত্তমান। হে সেই অসংখ্য ভূতনাথ, একবার এ দীনের প্রতি চাও, যেমন আমার স্কন্ধে তোমার সেই বাহকগণের একটীকে চাপাইয়াছ, তেমনি কৃপা করে ভাবী শ্বশুর মহাশয়কেও একটি দেখাইয়া দাও, একটা ফাল্‌ত ভূত দিলেও চলিবে প্রভু, নতুবা মেলিনা—হায়! তৎসঙ্গে আমার খুড়ামহাশয়ের টাকা—"দেখ সুধাংশু একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, হঠাৎ যদি কোনও আকৃতি আমার সম্মুখে আসে ও আমার ছ'নালা পিস্তলের একটা গুলিও আমি রেখে কথা কইব না।" শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম "যে আজ্ঞে"!

তাঁহাকে তাঁহার শয়নকক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আমি নিজ শয্যায় শয়ন করিতে গেলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া নিঃশব্দে মিঃ রায়ের ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া বৃদ্ধের নিশ্চিন্ত নাসিকা গর্জ্জন শুনিয়া বড়ই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, মনে ভাবিলাম যায় প্রাণ যাক্, ভিক্ষা মাগিয়া দিনপাত করিব, বৃদ্ধকে--নিতান্ত পক্ষে আত্মহত্যা করিয়াও ভূত দেখাইব, তাই কিরূপে সহজে আত্মহত্যা করা যায় তাহারি নিমিত্ত একটী কলের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। প্রায় কল নির্ম্মাণের আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছি—এমন সময়ে এক ভীষণ চীৎকারে সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। হস্তের পেন্সিল টেবিলের উপর পড়িয়া গেল. ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল—গুড়ুম শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইল; বুঝিলাম সবে মাত্র একটি গুলি ছুটিয়াছে, ত্রস্তে দ্বারের দিকে ছুটিলাম। মনে পড়িল এখনও পাঁচটী গুলি বাকী আছে, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। ক্রমে উপর্য্যুপরি সে পাঁচটী গুলিও ব্যয়িত হইল। হায় এ আবার কি বিপদ হইল, বুঝিলাম আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। দ্রুতহস্তে মিঃ রায়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম, বর্ত্তিকা প্রজ্জলিত, ঘরময় বালিস ছড়ান, অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় মি রায় কম্পিত শরীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন; আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন। "সুধাংশু! তুমি অতি পাজী—এই ভূতুড়ে ঘরে আমাকে একলা রেখে কেমন করে ঘুমুচ্ছিলে বল ত?"

বুঝিলাম বিপদ একলা আসে না। গুলিকৃত অর্দ্ধভগ্ন জানালা দিয়া শীতল বায়ু আসিয়া আমার মস্তিষ্কে লাগিল; কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম— "কি হয়েছে মিঃ রায়? ভূত দেখেছেন নাকি?"

রৈ। না, দেখি নি তবে অনুভব করেছি বটে, চল সব কথা বল্‌ছি, —আগে এ ঘর থেকে বেরুই ত। সে যা হক মেলিনার বিবাহ সম্বন্ধে আর আমার কোন আপত্তি নেই।

দন্তের খটাখট শব্দে বুঝিলাম, মিঃ রায়ের দন্তপাটী উড্ রেন্‌স্কার কোম্পানীর দোকানের, নতুবা বাঙ্গালীর দোকানের হইলে এতক্ষণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উদরে প্রবেশ করিয়া আর এক বিপদের সৃষ্টি করিত। আমার শয়নকক্ষে আসিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিলেন। "আমি সবে শুয়ে চোখ্ বুজেছি আর কি—(আমি কি তবে স্বপ্নে নাসিকা গর্জ্জনের শব্দ শুনিতেছিলাম?) আমার বোধ হল বিছানার চাদরের নীচে কি

যেন নড়ছে, তারপর আস্তে আস্তে একটা গরম পা আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঘসতে লাগল, পা খানা চেপ্টা, আমি সেটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে কিছুতেই সরে না, তার পর গরম পাখানা যখন আমার মুখে ঠেক্‌ল তখন আমি চীৎকার করে উঠলাম, তবুও কি সে শোনে! শেষে সম্মুখ ছেড়ে আমার পিঠে ঘস্‌তে লাগল, প্রাণ যায় আর কি! পিস্তলটা টেনে বার পাঁচ ছয় গুলি করতেই সেটা সরে পড়ল। এইবার বুঝেছি কেন তুমি তার চেহারাটা বল্‌তে পার নি। মিসেস্ রায় শুন্‌লে মূর্চ্ছা যাবেন।"

আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত অথচ পুলকিতাঙ্গ, ভূতই হউক, আর যাই হউক আমার বড়ই উপকার করিয়া গেল, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? প্রাতে মিঃ রায় চলিয়া গেলে ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য ভোলাকে ডাকিলাম; উঃ, তখন বুঝিলাম পুরাতন ভৃত্যের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বেই এ যাত্রা আমি রক্ষা পাইলাম। ভোলা বুঝিয়াছিল যে মিঃ রায় যখন আমার ভাবী শ্বশুর তখন তাঁহাকে আমার বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাই সে আমার উদ্ভাবিত পেটেণ্ট গরম জলের বোতলের কলটা অতি যত্নে তাঁহার শয্যায় লাগাইয়া রাখিয়াছিল। কলের গুণ এই যে শয্যায় শয়ন করিলেই সেটি ধীরে ধীরে শয্যাশায়ীর সমস্ত শরীর মর্দ্দন করিয়া দেয়। হয় ত কোনও কারণে কলটি শুইবার সময় আটকাইয়া গিয়াছিল শেষে মিঃ রায়ের পদ দ্বারা চালিত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছে ও সেই সঙ্গে খুড়া মহাশয়ের টাকারও একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়াছে। এ সংবাদ কিন্তু এ জীবনে প্রকাশ করিব ভাবি নাই, এক দিন প্রেমের আতিশয্যে মেলিনাকে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বড়ই আমোদ পান ও অনুমতি করেন যে এখন আর এ কথা প্রকাশ করিবার বাধা নাই—কারণ খুড়া মহাশয়ের টাকা ত অনেক দিন যাবৎ আমার হস্তগত হইয়াছে। আর মিঃ রায় এখন স্বর্গলোকে,—তাই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম, কিন্তু সেই অবধি কল কব্জার কারখানা ছাড়িয়া দিয়াছি। মেলিনার ভয়, পাছে এই সব ভুতুড়ে কল কোন দিন বা তাঁহার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। এখন পৈত্রিক অর্থে ঘরের খেয়ে বন্য মহিষ তাড়না করি, অর্থাৎ আমি এখন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।

শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার।

রত্নময়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল! চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগময়-আভা গগন গাত্র হইতে ধীরে ধীরে মুছিয়া গিয়া তাহা ক্রমশঃ মসীলিপ্ত বর্ণ ধারণ করিতেছে। সেখানে যে সূর্য্য ডুবিয়াছে—একটু আগে সেই স্থান যে রক্তাম্বুদ শোভিত ছিল, তাহার কোন চিহ্নই নাই!

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইয়াছে। সে দিন শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। আকাশে ক্ষীণ চন্দ্র উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা মেঘাচ্ছন্ন;—কাজেই অন্ধকারের হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে ছিল।

এই অন্ধকারে,—সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পরে একখানি শিবিকা, নারায়ণপুর গ্রামের "তেপান্তরের" মাঠের পার্শ্ববর্ত্তী মেটে রাস্তা দিয়া অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে ছিল। বাহকেরা পথশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত;—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে প্লাবিত। তাহারা ইতিপূর্ব্বে সওয়ারী লইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়াছে;—কিন্তু 'তেপান্তরের' মাঠের নিকট আসিয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় বাহকদের শিবকাবহন-শক্তি যেন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, সেই মাঠে বড়ই ডাকাতের ভয়।

তখন নবাব সায়েস্তাখাঁর আমল। দিল্লীর তক্তে তখন বাদশাহ আলমগীর বা ঔরঙ্গজেব।

সায়েস্তাখাঁ খুব দাপটে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ডাকাতদের সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে জলে ও স্থলে সমানভাবে ডাকাতের উৎপাত;—জলে বোম্বেটে মগ, জঙ্গলে ডাকাত। ইহাদের লইয়া সায়েস্তাখাঁ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। আরাকানী মগ দস্যুদের দমনের জন্য নিজে সসৈন্যে কয়েকবার তাহাদের পশ্চাতে ধাওয়া করেন। তাহাতে তখনকার মত উপদ্রবের শান্তি হয়।

কিন্তু বঙ্গদেশের নানাস্থানে তখন ডাকাতের বড়ই প্রাদুর্ভাব। এই 'তেপান্তরের' মাঠে তখন প্রায়ই ডাকাতি হইত। সেই জন্য এই মাঠ দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই লোক চলাচল বন্ধ হইয়া যাইত। রাত্রে সহস্র জরুরী প্রয়োজন হইলেও কেহ কখনও এ প্রান্তরের ত্রিসীমানায় আসিত না।

"তেপান্তরের" মাঠ নামটী ত্রিপান্তরের মাঠ নামের অপভ্রংশ। তিনটী বড় বড় দেড় ক্রোশী মাঠ পাশাপাশি থাকার ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

মাঠটী সপ্তগ্রাম পরগণার মধ্যে। সপ্তগ্রাম এক সময়ে মোগলের শাসন-কেন্দ্র ছিল; কিন্তু সরস্বতী মজিয়া যাওয়ার পর বাঙ্গালার মোগল-কেন্দ্র হুগলীতে উঠিয়া আসে। ইহার পর হইতে হুগলী ক্রমশঃ জাঁকিয়া উঠে।

এই হুগলী এখন একটী সদর কেন্দ্র। এখানে মোগল সুবাদার নবাব উল্‌মুলুক সায়েস্তাখাঁ বহাদুরের একজন অধীনস্থ ফৌজদার বাস করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মীর আলিখাঁ বলিয়া একজন মোগল স্থানীয় ফৌজদার বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

ফৌজদার তাহার খাজনা আদায় করিয়া সুবাদারের নিকট পাঠাইতেন। কখনও বা সুবাদারের আদেশে দিল্লীতে খাজনা চালান হইত। একবার সুবাদার সায়েস্তাখাঁর নিকট ঢাকাতে ত্রিশ হাজার টাকা খাজনা চালান যাইতেছিল, কিন্তু এই "তেপান্তরের" মাঠ পার হইবার সময় প্রায় পঞ্চাশ জন ডাকাত নবাবের সিপাহিদের ঘোরাও করিয়া সেই খাজনা লুঠ করিয়া লয়।

নবাব মীরখাঁ ডাকাত ধরিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, মোটা মোটা ষণ্ডা-গুণ্ডা জোয়ান, বেকার ও চরিত্রহীন লোকদের মধ্য হইতে দুষমন চেহারার লোক বাছিয়া বাছিয়া অনেককে কারারুদ্ধ করিলেন,— অনেককে শাস্তি দিলেন, কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত অপরাধী বাহির হইল না।

নবাব সায়েস্তাখাঁকে তিনি এই ডাকাতির সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু নবাব তাঁহাকে রেয়াৎ করেন নাই। সয়েস্তাখাঁ তাঁহাকে যে জবাব লিখিয়া পাঠান তার সার মর্ম্ম এই—"মোগল বাদসাহের যিনি ফৌজদার, আলমগীর বাদসাহের প্রতিনিধিরূপে যিনি জেলা শসান করিতেছেন,—যার সেনার অভাব নাই,—লোকজনের অভাব নাই, তাহার সিপাহীদের নিকট হইতে সামান্য ডাকাতে সরকারী খাজনা লুঠ করিয়া লইয়াছে এ বড় কলঙ্কের কথা;—এ কথা লিখিতেও কি আপনার লজ্জা বোধ হইল না? বাদসাহ হইলে, এই গাফিলির জন্য আপনাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন;—কিন্তু আমি আপনার প্রতি সেরূপ কোন ব্যবস্থা করিলাম না। তবে এজন্য আপনাকে খেসারৎ পুরণ করিতে হইবে। সরকারী খাজনার সমস্ত টাকা কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত দিতে আপনি বাধ্য।"

বলা বাহুল্য মীর সাহেবকে বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের তহবিল হইতে টাকা

গুণিয়া দিতে হইয়াছিল। এবং সেই অবধি তিনি এই "তেপান্তরের" মাঠের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন ; ইহার ফলে মাস কয়েকের জন্য ডাকাতি থামিয়া যায় বটে, কিন্তু ডাকাতেরা পুনরায় আবার অতি সতর্কতার সহিত ডাকাতি করিয়া পথিকদের মনে ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। কথাটা মীর আলির কাণে পৌছিল না। কারণ তাঁহার অধীনস্থ সদর কোতোয়াল বা থানার সর্ব্বময় কর্ত্তা ভয়ে তাঁহাকে এ সংবাদ আদৌ জানিতে দিলেন না। তাহাতে ফল এই দাঁড়াইল ডাকাতেরা পুনরায় যথেষ্ট সাহসী হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিল।

যে পাল্কী লইয়া বাহকেরা সেই অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার পর সেই ভয়ানক "তেপান্তরের" মাঠে উপনীত হইয়া কম্পিত প্রাণে ধীর পদে অগ্রসর হইতে ছিল, সে পাল্কীখানি, কমললোচন রায় চৌধুরী মহাশয়ের।

রায় কমললোচন চৌধুরী মহাশয় নবাবী আমলে জাহানাবাদ তরফের একজন কর্ম্মচারী। তিনি হুগলীর ফৌজদার মীর আলী খাঁ ও নবাব সায়েস্তাখাঁর নিকট পরিচিত। পদ গৌরবে তিনি একজন আমিলদার। লোকটা খুব রাশ ভারি, তাহার অধীনে একশত বরকন্দাজ সর্ব্বদাই সঙ্গীন লইয়া খাড়া থাকিত ; লাঠীয়ালও অনেক ছিল—নামের ডাকও কম ছিল না। দোল দুর্গোৎসব দান ধ্যান তিনি যেমন করিতেন, আবার অন্যপক্ষে অনাথা বিধবার, সহায়হীন নাবালকের সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেও সেইরূপ সুদক্ষ ছিলেন। কমললোচন দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠানে বিরত ছিলেন না। নবাব সরকারের প্রাপ্য খাজানা তিনি কড়ায় গণ্ডায় যথা সময়ে চুকাইয়া দিতেন বলিয়া দরবারেও তাহার প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। তাহার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত।

এই শিবিকার মধ্যে রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রত্নময়ী। রত্নময়ী শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলেন। সঙ্গে পাল্কী বাহক আটজন 'কাহার, আর চারিজন মাত্র দরোয়ান। কমললোচন জানিতেন যে, "তেপান্তরের" মাঠে ডাকাতের ভয় আছে আবার অন্যদিকে তাঁহার মনে এমন একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসও ছিল যে, ডাকাতেরা তাঁহার নামের ভয়ে কাঁপিত। এইজন্য তিনি কন্যার সঙ্গে চারিজন দরোয়ান ছাড়া আর বেশী লোক দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

ভবিতব্যকে কেহ কখনও লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। যাহা ঘটিবার তাহা নিশ্চয় ঘটিবে--প্রাক্তনের-লিপি অখণ্ডনীয়। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বহুবার নররূপে লীলাচ্ছলে ধরণীতে আবির্ভূত হইয়াছিলন, তাঁহাকেও এই প্রাক্তনের লিপির অধীন হইয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। দৈবপুরুষ সকলের অপেক্ষাই সমধিক শক্তিবান। মানুষ ক্ষমতায়, অর্থে, পদগৌরবে যত বড় হউক না কেন, পুরুষকারের উপর যতটা বিশ্বাস থাকুক না কেন, তাহাকে অদৃষ্টের পদানত হইতেই হইবে। সহসা সমাগত ঝঞ্ঝার ন্যায়, অদৃষ্টের শক্তি অতি প্রবল বেগে আসিয়া পুরুষকারের উজ্জল প্রভাকে মুহূর্ত্তে নিভাইয়া দেয়।

এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। কমললোচন রায় দাম্ভিক, নিজের শক্তিতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী, সেই জন্য দৈব তাহার প্রতিকুলতা করিল। তিনি "তেপান্তরের" মাঠ, সেখানে ডাকাতের ভয় এ সব কথা, একেবারেই কাণে না তুলিয়া চারিজন মাত্র দরোয়ান সঙ্গে দিয়া সেই ভয়ানক দুর্দ্দিনে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়াছেন।

রায় মহাশয় শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। তিনি কুলীন জামাতা করিয়াছিলেন। কুলীন মাত্রেই প্রায় অর্থহীন হয়। দরিদ্র জামাতা কুলীন শ্রেষ্ঠ হরপ্রসাদ বড়ই আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান পূর্ণ। তিনি কোন মতেই শ্বশুরের অন্নদাস হইয়া শ্বশুর বাটীতে থাকিতে বা পরিবারকে শ্বশুর বাড়ী রাখিতে রাজী নহেন।

হরপ্রসাদের সংসারে তাহার বৃদ্ধা মাতা বই আর কেহ নাই। বৃদ্ধার তিনটী ছেলে। তাহারা হরপ্রসাদের অগ্রে জন্মিয়াছিল; কিন্তু শমনরাজ তাহাদের বেশী দিন এ জ্বালাময় মর্ত্তে থাকিতে দেন নাই। বৃদ্ধার শেষ সন্তান এই হরপ্রসাদ; সুতরাং সে মার অতি আদরের।

বুড়ীর বড় ইচ্ছা যে তাহার এক মাত্র "বেটার বৌ" আসিয়া তাহার সংসার করে, তাহার সেবা করে, তাহার অন্ন পাক করে, তাহার পূজ্য দেবতা শালগ্রামের পূজার জোগাড় করিয়া দেয়, মরাই হইতে ধান পাড়ে; চাউল প্রস্তুত করে, রন্ধনশালাতে অন্নপূর্ণা রূপে বিরাজ করে, কিন্তু বৃদ্ধার এ সাধ আদৌ পূর্ণ হয় নাই। কারণ তাহার বৈবাহিক ধনী জমিদার কমললোচন রায় একমাত্র কন্যাকে এরূপ দরিদ্র জামাতার গৃহে পাঠাইতে রাজী নহেন।

দোষটা খালি যে রায় মহাশয়ের তাহা নহে। রায় মহাশয় যেমন দাম্ভিক তাহার পত্নী আবার ততোধিক। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমার মেয়ে গোবর দিয়া ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে, ঝি ও রাঁধুনীর কাজ করিবে;—

এজন্য সে আমাদের ঘরে জন্মায় নাই।" পিতামাতার এইরূপ কুশিক্ষায় দোষে কন্যারও মতি গতি সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রায় মহাশয় জামাতা হরপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু! যখন আমার জামাতা হইয়াছ তখন জানিও তোমার ভাগ্য অতি প্রসন্ন। আমার আর সন্তানাদি নাই, ঐ একমাত্র কন্যা। আমার দেহান্তের পর তুমিই এই বিষয়ের অধিকারী হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান তুমি, জমিদারীর কাজের কিছুই জান না। আমি তোমাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া কাজ শিখাইতে চাই,—এজন্য তোমার এখানে থাকা প্রয়োজন। আমি তোমার পর নই, "যস্য কন্যা বিবাহিতা" এই সূত্রানুসারে আমি তোমার পিতৃতুল্য। এস্থলে আমার কথা শোনাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি কৌলিন্যের বড় পক্ষপাতি; তাই তোমার মত গৃহস্থ ঘরের ছেলেকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি।"

শ্বশুরের কথাগুলি স্বাধীন প্রাণ, উন্নতচেতা হরপ্রসাদের বড় ভাল লাগিল না। কাজেই তিনি বলিলেন, "জমিদার হইবার আমার কোন আকাঙ্খাই নাই। গরীবের ছেলে গরীবের ঘরে জন্মিয়াছি,—যে কাজে প্রজা পীড়ন করিতে হয়, প্রজার অর্থ শোষণ করিতে হয়, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা জীবনের সঙ্গী করিতে হয়, সে কাজে আমি প্রস্তুত নহি। যে পবিত্র উপদেশের মধ্যে আকাঙ্খা বর্জ্জিত গৃহকেন্দ্রে আমি আজন্ম পালিত, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের যে শিক্ষায় আমার প্রাণ অনুপ্রাণিত, তাহার অন্যথা আমি জীবন থাকিতে করিতে পারিব না।"

এই উত্তর পাইয়া দাম্ভিক কমললোচন রায় জামাতার উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন কুলীন হইলে কি হয়, একটা গণ্ডমূর্খকে তিনি জামাতা পদে বরণ করিয়াছেন। অন্য শ্রেণীর মূর্খদের অজ্ঞতার একটা সীমা আছে, এর তাও নাই। এ হাতের লক্ষ্মী পায়ে করিয়া ঠেলিতে চায়। সুতরাং এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন জামাতার সাহচর্য্যে আমি আমার আদরিণী কন্যাকে দুঃখভোগ করিতে দিতে প্রস্তুত নহি।

ইহার পর আর একটী কারণ ঘটিল—যে জন্য অভিমানী হরপ্রসাদ চিরদিনের জন্য শ্বশুরালয়ের নিকট বিদায় লইলেন।

একদিন রাত্রে হরপ্রসাদ আহারে বসিয়াছেন,—স্ত্রী-রত্নময়ী নিকটস্থ পালঙ্কে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। হরপ্রসাদের আহারের স্থান মেঝের উপর হইয়াছে।

আত্মসম্মান গর্ব্বিত হরপ্রসাদ দেখিলেন যে, বড় মানুষের মেয়ে রত্নময়ী, তাহার ধর্ম্ম-পরিণীতা ভার্য্যা খট্টাঙ্গের উপর বসিয়া পা দোলাইতেছেন—আর তিনি নীচে বসিয়া আহার করিতেছেন। এ অবজ্ঞাটা তিনি উপেক্ষার ভাব বলিয়াই ধরিয়া লইলেন।

তিনি আহার বন্ধ করিয়া একটু রুষ্টস্বরে ডাকিলেন, "রত্নময়ী!"

রত্নময়ী বলিল, "কি ?"

"তোমাকে কালই আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে।"

"কেন ? কোন অপরাধে ?"

"অপরাধ কিছুই নহে। তুমি আমার ধর্ম্ম-পত্নী। আমি অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া নারায়ণ সম্মুখে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি।"

"এ কথা তো তোমার মুখে বহুবার শুনিয়াছি,—শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল।"

"যতদিন বাঁচিব, যতদিন আমি তোমায় পত্নীরূপে স্বীকার করিয়া চলিব, ততদিন তোমায় একথা শুনিতে হইবে।"

বলা বাহুল্য—খাদ্যপাত্রে সজ্জিত নানাবিধ সুখাদ্য আহারীয় কণামাত্রও হরপ্রসাদ খাইতেছিলেন না। তাঁহার হস্তধৃত লুচির টুকরা এক ভাবেই তাঁহার অঙ্গুলীদ্বয় মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পত্নীর ধৃষ্টতাময় এইরূপ উত্তরে তাঁহার আহার স্পৃহা একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। যে তাহার ধর্ম্মপত্নী, শাস্ত্রমতে আজ্ঞার অনুগামিনী, সেবার দাসী, হুকুমের বাঁদী, তাহার মুখে এই ভাবের উত্তর! দিবাভাগ হইলে রত্নময়ী দেখিতে পাইত, হরপ্রসাদের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহার চক্ষুদ্বয় ব্যাঘ্রের মত জ্বলিতেছে। আত্মসংযম বলিয়া একটা প্রবৃত্তি তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন ছিল,—কাজেই তিনি ধৈর্য্য ধারণে রত্নময়ীর বাক্যজ্বালা সহ্য করিতেছিলেন।

হরপ্রসাদকে আহার গ্রহণে বিরত দেখিয়া রত্নময়ী বলিল, "খাওনা আগে, তারপর যা বলবার তা বলো।"

ক্রুদ্ধ হরপ্রসাদ বলিল, "আগে কথাটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক্ তার-পর অন্ন গ্রহণ করবো।"

কেন? কোন অপরাধে? —ব্রহ্মময়ী ৩৬।

The Cherry Press Ltd.

রত্নময়ী বলিল, "দুই কথায় তো এ ব্যাপারের মীমাংসা হইতে পারে, এক "হাঁ" ও "না"র মধ্যেই এর মীমাংসা হয়।"

"তাই বলিতেছি তুমি আগামী প্রভাতে আমার সহিত ছন্দপুরে যাইবে কিনা ?"

ছন্দপুর কমললোচন রায়ের আবাসস্থান হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে। এই স্থানেই হরপ্রসাদের বাটী।

রত্নময়ী বলিল, "পিতার অনুমতি ভিন্ন আমি যাইতে পারি না।"

"তোমার পিতা আমার হাঁটু ধরিয়া তোমায় সম্প্রদান করিয়াছেন। এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার আজ্ঞার অধীন।"

রত্নময়ী এ কথায় বড় রাগিল। সে মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোরী। হাঁটু ধরিয়া তোমার পিতা আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন." এ কথায় সে বড়ই রুষ্ট হইয়া বলিল, "তাহা না করিলে আজ তুমি জমিদারের জামাই হইতে না। ছাপরখাটে, দোতালার উপর থাকিতেও পারিতে না। যাই বাবাকে গিয়া তোমার গুণের কথাগুলি বলি। জানিও কুম্ভকার মাথায় করিয়া মাটী বহিয়া আনিয়া আবার সেই মাটীকেই পায়ে করিয়া থ্যাত্লায়।"

রত্নময়ী চলিয়া গেল। হরপ্রসাদ "নারায়ণ! এ সব কি? কি শুনি? এ না আমার পরিণীতা ভার্য্যা! না এ পাপ অন্ন আর গ্রহণ করিব না। এ গৃহে আর একরাত্রিও বাস করিব না। এখনই এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইব।"

হরপ্রসাদ অভুক্ত অবস্থায় উপস্থিত অন্নত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ক্ষুণ্ণহৃদয়ে আচমনাদি করিলেন। তৎপরে একমাত্র উত্তরীয় লইয়া চটি জুতা জোড়াটী পায়ে দিয়া কক্ষের বাহিরে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন—তাঁহার শ্বশুর কমললোচন রায় তাঁহার সম্মুখে।

কমললোচনের মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা তাঁহাকে লাগাইয়াছে।

কমললোচন রুষ্টভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি হরপ্রসাদ? উত্তরীয় লইয়া এ রাত্রে কোথায় যাইতেছ?"

হরপ্রসাদ আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "ধনীর প্রাসাদে আমার স্থান হইবে না। ধনীর মুখরা কন্যাকে বিবাহ করায় আমার জীবন বিষময় হইয়াছে। ধর্ম্মপত্নীর অযথা বাক্য গঞ্জনা সহ্য করিয়া এ গৃহে অন্ন ভোজন

করিতে যাহার একটু মাত্র আত্ম-সম্ভ্রম আছে সেত পারে না। আপনি আমায় বিদায় দিন।"

কমললোচন হরপ্রসাদের এ স্পষ্টবাদিতায় বড়ই রুষ্ট হইলেন। অন্য কেহ হইলে হয়তো বুঝিত, হরপ্রসাদ উচিৎ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আত্মগরিমা-লিপ্ত, ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বিতচিত্ত, জমিদার কমললোচন জামাতার মর্ম্মবেদনা তিল মাত্র না বুঝিয়া রুষ্টস্বরে বলিলেন, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে কারয়া যে ঠেলিয়া ফেলে, তাহার মত ঘোর মূর্খ এ জগতে আর নাই। এরপর দেখিতেছি হয় ডাকাতি চুরি করিয়া, না হয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তোমায় দিন গুজরাণ করিতে হইবে। তোমার মত দাম্ভিক ভিক্ষুককে কন্যাদান করিয়া কৌলিন্যের ছলনায় ভুলিয়া আমি দেখিতেছি মহাভ্রম করিয়াছি। কিন্তু এ ভ্রম আর শোধরাইবার উপায় নাই। নিশ্চয় জানিও হরপ্রসাদ, একদিন দারুণ দুর্দ্দশায় পড়িয়া পেটের জ্বালায় জ্বলিয়া তোমাকে আবার আমার দ্বারস্থ হইতে হইবে। আমি আমার আদরে পালিত, স্নেহের ধন একমাত্র কন্যাকে কখনই তোমার জীর্ণ পর্ণকুটীরে পাঠাইব না।"

দাম্ভিক হরপ্রসাদ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দেখা যাউক কত-দূর কি হয়! তবে আপনিও একথাটা মনে রাখিবেন যে এমন দিন আসিবে, যে দিন আপনি আপনার কন্যাকে স্বেচ্ছায় আমার জীর্ণকুটীরে পৌছাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন।"

উল্লিখিত ঘটনার পর ছয় বৎসর কাটিয়াছে। কমললোচন হরপ্রসাদের আর কোন সন্ধানই পান নাই;—তাহা বলিয়া তিনি যে, জামাতার অনুসন্ধানের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই এরূপ নহে। এখনও সেই চেষ্টা চলিতেছে।

রত্নময়ী ছয় বৎসর পরে পূর্ণ যৌবনাবস্থায় উপনীত। সময়ের মত সুশিক্ষক আর নাই। সময়ই অভিজ্ঞতার জনক। সময়ই মানুষের অপরিপক্ক বুদ্ধি পাকাইয়া দেয়। এই সময়ের শিক্ষাবলে, এ সংসার-চক্রের মধ্যে পড়িয়া যে বরাবর হারিয়া আসিয়াছে সে জিতের পথ চিনিয়া লয়,—যে বরাবর জিতিয়া আসিয়াছে সে বাজী হারিতে থাকে। সহৃদয় সরল উচ্চপ্রাণ হওয়ার জন্য যাহারা প্রতিপদে এই দুষ্ট দুনিয়ার লোকের দ্বারা নানা বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছে তাহারা নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে।

এই সময়ের শিক্ষাবলে মূর্খ পণ্ডিত হয়,—পাপী পাপ পথ ত্যাগ করিয়া পুণ্যমার্গ অবলম্বন করে,—প্রতারক পরোপকারী হয়,—কারণ সময়ের গুণে

সকলেই বুঝিতে পারে, এ সংসারে কোন পথে চলিলে প্রকৃত সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারা যায়।

রত্নময়ীর সেই অবস্থা দাঁড়াইল। ছয় বৎসরের ন্যায় এ দীর্ঘ সময় তাহাকে অনেক শিক্ষা দিল। সে বুঝিল পিতৃগৃহে রাজভোগ অপেক্ষা দরিদ্র স্বামীর গৃহে দাসীবৃত্তিও তাহার সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

তাহার প্রাণে যে একটা পূর্ণতা ছিল, তাহা যেন এই ছয় বৎসরে শূন্য হইয়া গিয়াছে। তাহার যেন বোধ হইল,—যে তাহার নিতান্ত আপনার,—যে তাহার হৃদয় মন্দির আলো করিয়া ছিল,—যে তাহার হৃদয়রূপ মানমন্দিরে উজ্জ্বল দীপ, সে যেন জন্মের মত তাহার হৃদয় আঁধার করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই,—ভোগে সুখ নাই—দাস দাসীতে সুখ নাই,—মাতা পিতার মিষ্ট বাক্যে সুখ নাই,—বহুমূল্যবান রত্নালঙ্কারে দেহ সাজাইলেও সুখ নাই,—একখানা ভাল কাপড় পরিলেও সুখ হয় না।

এই সব বুঝিয়া প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া অনুতাপ বিদগ্ধচিত্তে সে তাহার জননীর নিকট একদিন অতি সংকোচে, অতি ধীরভাবে, গুছাইয়া তাহার সমস্ত মনের কথা বলিল। গৃহিণীও দশগুণ ভনিতার সহিত কর্ত্তাকে বুঝাইলেন। কর্ত্তা গৃহিণীর অঞ্চলে বাঁধা। এ সংসারে অনেক কর্ত্তারই দশা এই! কর্ত্তার মত করিতে, সুতরাং বেশী দেরী হইল না।

সেই জন্য কমললোচন চৌধুরী, বাচস্পতি মহাশয়কে ডাকাইয়া শুভদিন দেখাইয়া কান্যকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইলেন। পাল্কি যখন "তেপান্তরের" মাঠে,—অন্ধকারে যখন বিশ্বগ্রাস করিতেছে,—বেহারারা যখন অগ্রসর হইতে না পারিয়া এক বৃহত বট বৃক্ষের নিম্নে পাল্কি নামাইয়াছে,—সেই সময় সহসা ঝুপ্ ঝাপ করিয়া প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন ডাকাত সেই গাছের উপর হইতে পড়িয়া মহা হুঙ্কারে পাল্কি ঘেরিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডাকাতে পাল্কীর চারিধার ঘেরাও করিলে, বাহকেরা সেই মাঠের মধ্যে পাল্‌কী ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যে যেদিকে পারিল—পলাইয়া গেল। ডাকাতেরা তাহাদের ধরিবার চেষ্টাও করিল না। তাহার কারণ এই, সম্মুখেই এক খরস্রোতা নদী; সে নদীতে আর এই মাঠের সন্নিকটস্থ ঘাটে আজ কাল কোন মাঝিই ডাকাতের ভয়ে নৌকা লইয়া আসে না। খেয়া এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে। ডাকাতেরা মনে মনে ভাবিল, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের জঙ্গল ত আমাদের দখলে। শালারা যাইবে কোথায়? সম্মুখে নদী—পারেরও কোন উপায় নাই। তাহারা যেখানেই যাক্ না কেন—আবার আমাদের লোকের হাতে ধরা পড়িবে।

আর একটা কারণ, যে চারিজন ডালরুটী-ভোজী সিপাহী পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন এই ডাকাতের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া তখনই জমী লইল। তাহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, আর যে দুজন ছিল, তাহারা পলায়নের চেষ্টা করায় তখনই ডাকাতদের হস্তে বন্দী হইল!

মোটের উপর কথা হইতেছে এই, অতি সহজেই কাজটা শেষ হইয়া গেল। রত্নময়ী পাল্কীর দ্বার খুলিয়া এই সব ব্যাপার দেখিতেছিল। প্রহরিগণকে ঝুঝিতে দেখিয়া, প্রথমে তাহার একটু সাহস হইযাছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পরিণাম দেখিয়া সে বড়ই ভয় পাইল।

ডাকাতের সর্দ্দার দলবল সমেত পাল্কীর নিকট আসিতেছে দেখিয়া, রত্নময়ী সেই ভয়ানক অবস্থাতেও সাহস সঞ্চয় করিয়া পাল্কীর মধ্য হইতে বাহির হইল।

কি ভুবনমোহিনী রূপ! ডাকাতেরা কাছে আসিয়া দেখিল, চম্পক-রাগ-লাঞ্ছিত সে দেহজ্যোতিঃতে চারিদিক যেন আলো হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুকৃষ্ণ তারকাময় চক্ষে যেন অগ্নিজ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। সেই স্ফুরিতাধর ভয়ে আতঙ্কে মৃদুবেগে স্পন্দিত হইতেছে। সে রূপ দেখিলে মনে হয়—মহেশমোহিনী গৌরী যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই প্রান্তরক্ষেত্র আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ডাকাতের সর্দ্দার নিকটস্থ হইয়া রূঢ়স্বরে বলিল—"কে তুমি?" রত্নময়ী প্রথমে ভাবিল, প্রকৃত পরিচয় দিয়া কাজ নাই, একটা মিথ্যা পরিচয় দিই। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিল—তাহার পিতা ফৌজদার সাহেবের দক্ষিণ হস্ত।

তাঁহার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তাঁহার নাম করিলে ডাকাতেরা ভয় পাইয়া ছাড়িয়া দিতেও পারে।

কিন্তু রত্নময়ী যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা ঠিক নয়। ডাকাতগণ জানিয়া শুনিয়াই এই পাল্কী আটক করিয়াছিল। তবু এ ব্যাপারে তাহাদের সন্দেহটা একেবারে নিরসন করিবার জন্য রত্নময়ী বলিল—"আমি জমিদার কমললোচন রায়ের কন্যা।"

"ঠিক বলিতেছ? কোনরূপ প্রতারণা করিতেছ না?"

"না, সামান্য দস্যুর সহিত জমিদার কন্যা রত্নময়ী মিথ্যা কথা বলিতে ইচ্ছা করে না।"

ডাকাতের সর্দ্দার তাহার এক সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তা ভালই হইয়াছে। আমাদের যে টুকু সন্দেহ এখনও আছে—তাহা সেই বন্দী সিপাই দু'বেটার দ্বারা মিটাইয়া লইলেই চলিবে।

দস্যুদলপতির আদেশে সেই দুইজন সিপাহী আবদ্ধাবস্থায় স্থানান্তরে নীত হইয়াছিল। দলপতি তাহার একজন সঙ্গীর কাণে কাণে বলিয়া দিল—"যাও তাহাদের নিকট হইতে কথাটা একবার ভাল করিয়া জানিয়া আইস।"

লোকটা চলিয়া গেলে, রত্নময়ী দস্যুদলপতিকে সম্বোধন করিয়া নির্ভীক স্বরে বলিল—"তুমি কি চাও? যদি এই ডাকাতির উদ্দেশ্য আমার গাত্রের এই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলিই হয়, তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দে তাহা তোমাদের দিতেছি। বরঞ্চ আমার বাক্সের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা দিতেও অস্বীকৃত নই। তোমরা আমায় ছাড়িয়া দাও। আমার বাহকগণকে ফিরাইয়া আন।"

দস্যুদলপতি বিদ্রূপের সহিত বলিল—"তোমায় ছাড়িয়া দিবার জন্য আমরা এতটা পরিশ্রম করি নাই। তোমার অলঙ্কারের জন্য এ ডাকাতি হয় নাই। আমি তোমাকেই চাই। তোমার পিতা জমিদার কমললোচন রায়, তাহার জমিদারীর মধ্য হইতে আমার বাড়ীর চাল কাটীয়া আমায় উঠাইয়া দিয়াছে। আমার গৃহ দাহ করিয়াছে। আমার দলের লোককে ফৌজদারের সিপাহীর সহায়তায়, এই বৎসরাধিক কাল হায়রাণ করিয়া আসিতেছে। শুনিয়াছি তাহারই পরামর্শে ফৌজদার আমার মস্তকের মূল্য পাঁচ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে। আর তোমার পিতাই

আমার কাঁচা মাথাটা ফৌজদারের হাতে তুলিয়া দিয়া সুনাম কিনিবার আর ঐ পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু তাহার সেই চেষ্টা আমি বিফল করিব বলিয়া দুই মাস কাল তোমাদের গ্রামে গোয়েন্দা রাখিয়াছিলাম। আজ তাহার ফল ফলিয়াছে। আমার এখন সখ হইয়াছে যে তাহার একমাত্র কন্যার কাঁচা মাথাটাই তাহাকে উপহার পাঠাইয়া দিই।"

"যদি আমার অলঙ্কার না চাও, তাহা হইলে আমাকে লইয়া কি করিতে চাও ?"

আমরা তোমাকে মা কপালিনীর নিকট আগামী অমাবস্যায় বলি দিব। তিন দিন পরে অমাবস্যা। আর তিনদিন তোমার পরমায়ু। একটা পণ্ডিত গোছের ব্রাহ্মণ জোগাড় হইলে তোমার দফা সাবাড় হইবে। কমললোচন রায়ের পুত্র নাই। একমাত্র কন্যা তুমি, দেখি কে তার পাপার্জ্জিত বিষয় ভোগ করে।"

রত্নময়ী একথা শুনিয়া বড়ই ভয় পাইল। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে বহুক্ষণ ভাবিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। তত্রাচ সে অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"যদি আমি তোমাদের সঙ্গে না যাই !"

দস্যুদলপতি পিশাচের ন্যায় বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"স্পর্দ্ধাও তোমার কম নয় ! এত লোক আমরা, আর তুমি আমাদের মধ্য হইতে চক্ষে ধুলি দিয়া পলাইবে ? সামান্যা নারী হইয়া আমাদের মধ্যে জঙ্গী জোয়ানের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে ! স্পর্দ্ধাও ত তোমার কম নয় ! আমরা তোমার হাত মুখ বাঁধিয়া লইয়া যাইব !"

"নারী হত্যা মহাপাপ। সতীর অঙ্গস্পর্শে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে ! সেই আগুণে তোরা সবাই দগ্ধ হইবি।"

সে কথা পরে বুঝা যাইবে। মা কপালমালিনী বড়ই রুধির-প্রয়াসী হইয়াছেন। সে দিন তিনি আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন নারীরক্ত ভিন্ন তাঁহার রুধির পিপাসা কিছুতেই তৃপ্তি হইবে না। তোমায় পাইয়া আমাদের সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। আর এই সঙ্গে প্রতিহিংসাটাও চরিতার্থ হইবে।"

"আমি ব্রাহ্মণ কন্যা ! ব্রাহ্মণ-পত্নী ! তোমাদের মাতৃস্বরূপা, কন্যা স্বরূপা। তোমরা ভ্রান্ত, মা কপালমালিনী নারীরূপে, প্রকৃতিরূপে, শক্তিরূপে, ধরায় অবতীর্ণা। নিজের রক্ত তিনি কখনই পান করিবেন না। আমায় ছাড়িয়া

দাও। তোমাদের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমায় পিতামাতায় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে দাও। আমি জীবনে কখনও কোনও পাপ করি নাই। একদিন কেবল স্বামীর অবমাননা রূপ এক মহাপাপ করিয়াছিলাম। সেই পাপেই আজ আমার এ লাঞ্ছনা—এ দুর্দ্দশা—এ নিগ্রহ! আমি তোমাদের এই অলঙ্কার ও আরও বহু সহস্র মুদ্রা দিব। আমার পিতাকে তোমাদের জন্য, তাঁর পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিব। তাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যা আমি, তিনি নিশ্চয়ই আমার বিনিময়ে তোমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।"

দলপতি বলিল—"না—না, ও সব ছাঁদা কথায় আমাদের ভুলাইতে পারিবে না। স্বয়ং ভবানী চেষ্টা করিয়া তোমাকে আমাদের হাতে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার আদেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আর আমরা বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে চাই না। ঐ পাল্কীতে এখনই উঠিয়া বসো। কোনরূপ বদমায়েসী করিলেই তোমার বিপদ ঘটিবে।"

দস্যুদলপতি যে রহস্য করিতেছে না—তাহা রত্নময়ী তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল। সে আরও বুঝিল, ইহাদের সহিত বাদানুবাদে আরও অনিষ্ট হইবে। তার চেয়ে এদের সঙ্গে নির্ব্বাবাদে যাওয়াই উচিত। মা কপালিনী—নিশ্চয়ই এমন একটা উপায় করিয়া দিবেন—যাহাতে আমি অতি সহজেই নিষ্কৃতি পাইব। আমি যদি সতী হই—তাহা হইলে সেই আদ্যাশক্তি কালিকাই আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

যে দুইজন লোক দলপতির আদেশে সিপাহীদের নিকট রত্নময়ীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে গিয়াছিল, তাহারা বহুপূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া সর্দ্দারের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সর্দ্দারও এতক্ষণ রত্নময়ীকে লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কিহে! কি শুনিলে?"

তাহাদের একজন বলিল—"সর্দ্দার! এই স্ত্রীলোক মিথ্যা বলে নাই। সত্যই এ কমললোচন রায়ের কন্যা।"

সর্দ্দার তখন রত্নময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"যাও এখনই এই পাল্কীতে গিয়া উঠিয়া বসো।"

এই সময়ে রত্নময়ীর মনে আর একটা নূতন আশা বর্ষার আকাশে বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল, যে দুইজন দরোয়ান ইতিপূর্ব্বে

পলাইয়া গিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার পিতাকে গিয়া এই দুঃসংবাদ দিবে। তিনি নিশ্চয়ই সিপাহী পাঠাইয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন।

এই আশায় উৎফুল্লচিত্ত হইয়া রত্নময়ী শিষ্ট শান্ত বালিকার মত পাল্কীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

বাহকের জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। যে চারজন বাহক, ইতিপূর্ব্বে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা বনের অপর প্রান্তস্থিত দস্যুদলের কয়েক জনের দ্বারা ধৃত হইয়া সেই স্থানে আনীত হওয়ায়, তাহাদের দ্বারাই বাহকের কাজ চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

এই কি উমেশ বাবুর বাড়ী ?

বেয়াড়া বিভ্রাট

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ { ২য় সংখ্যা

বধূর-তত্ত্ব।

(১)

উপর্য্যুপরি পাঁচবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে পর, বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিয়া পরবর্ত্তীবারেও যখন গেজেটে উত্তীর্ণ ছাত্র-তালিকায় রমেশের নাম প্রকাশিত হইল না, তখন সে আত্ম-হত্যা করিয়া কলঙ্কিত জীবনের দ্রুত অবসান করিবার সঙ্কল্প করিল।

নিশিথে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার উদ্দেশে গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী মসীকৃষ্ণ সুগভীর পুষ্করিণী-গর্ভে রমেশ যখন আকণ্ঠ অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় ক্ষণ-প্রভার ন্যায়, তাহার রূপলাবণ্যবতী যুবতী ভার্য্যা প্রমীলার প্রফুল্ল আননের সুখময় স্মৃতি চমকিয়া উঠিল। সন্তরণপটু রমেশ, জলমগ্ন হইয়া জীবনের অব-সান করিতে পারিল না। সে প্রবল উত্তেজনা বশে গভীর রাত্রে একাকী সমগ্র পুকুর তোলপাড় করিয়া অবসন্ন দেহে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল।

রমেশ দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক। শ্মশ্রুদল প্রবল প্রতাপে তাহার মুখমণ্ডলে আধিকার বিস্তার করিয়া বর্ষার তৃণের ন্যায় দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে। এমতাব-স্থায় তাহার আর অল্পবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু ছাত্রগণের সহিত একত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষতঃ যে সকল ছাত্রকে সে, সেদিনমাত্র সামান্য গুণ-ভাগ শিখাইয়াছে, তাহারাই আজ তাহার সহপাঠী রূপে একত্র বসিয়া অধ্যয়ন করিবে, এ চিন্তা তাহার পক্ষে একান্ত অসহনীয় হইয়া পড়িল।

রমেশের সম্পন্ন পিতা রাজপুর নিবাসী চণ্ডীচরণ বাবু, তিনি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। রমেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, এ আশা

তিনি কখনই করিতেন না—করিবার আবশ্যকতাও ছিল না ; নিজের জমিদারী বৈষয়িক ব্যাপার বুঝিয়া লইতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু, অপরে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকে, তখন পুত্র রমেশ, অবিরত চেষ্টা করিয়াও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে কেন না পারিবে না ?—এইরূপ চিন্তা করিয়া চণ্ডীবাবু তাহাকে পুনরায় অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করিলেন। সপ্তমবারের শেষ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না, এই ধারণা তাঁহাকে সমধিক আশান্বিত করিয়া তুলিল।

এবার চণ্ডীবাবু রমেশকে স্কুলে ছাত্রদের সহিত একাসনে বসিয়া লজ্জানুভব করিতে দিলেন না—প্রাইভেট্ ছাত্ররূপে পরীক্ষা দিবে বলিয়া পূর্ব্বকার মত ছাত্রাবাসের পরিবর্ত্তে, দেবগ্রামে পৃথক বাসায় গৃহশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যাহাতে রমেশ নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারে, তজ্জন্য পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রমেশকে শ্বশুরবাড়ী যাইয়া সময় নষ্ট করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিলেন।

রমেশের স্ত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাতকারের পথ রুদ্ধ করিয়া চণ্ডীচরণবাবু পিতার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিলেন ভাবিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। যে প্রমীলার মোহন-স্মৃতি রমেশকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, সেই প্রেমময়ী যুবতী পত্নীর দীর্ঘ্য বিরহ সহ্য করিবার মত, পুত্র রমেশের যথেষ্ট শক্তি আছে কিনা, তিনি তখন তাহা বুঝিয়া দেখিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না।

(২)

কিছুকাল গত হইলে চণ্ডীচরণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার খাতায় খরচ পড়িলে বা তাঁহার ইচ্ছা হইলেই যে আরব্ধ কার্য্য সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে, তাহার কোন বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। বাগানের বৃক্ষরোপণের পর, কেবল, মাত্র মালির বেতন দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলে, কালে রোপিত বৃক্ষের পরিপুষ্টির পরিবর্ত্তে আগাছারই অযথা বৃদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে—পরন্ত, সমধিক সম্ভাবনা। পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে অর্থের সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত ও সঙ্গত বিনিময় প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর—এ কথার যাথার্থ্য এখন তিনি বিশেষরূপ অনুভব করিলেন।

আবশ্যাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া তিনি একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন—ভাবিতে ছিলেন, রমেশচন্দ্র এবার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেছে— গৃহশিক্ষক, তাহার বেতনের অনুরূপ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে রমেশকে রীতিমত

ভাবে অনভ্যস্ত বা অনধীত বিষয়ে অগ্রসর হইবার জন্য যথেষ্টরূপ সহায়তা করিতেছে এবং যাহাতে সে বিপথ গামী হইয়া স্খলিতপদ না হয়, তদ্বিষয়েও তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার কর্ণগোচর হইল, গৃহ-শিক্ষক রমেশের যথেষ্ট খেয়ালের প্রশ্রয় দিয়া ও দু'বেলা গল্প গুজব করিয়া মাসান্তে পুরাবেতন লইতেছেন এবং রমেশ, অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে পিতার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রায়ই স্থানান্তরে গমন করিয়া সময়ের অপব্যবহার করিতেছে, তাহা শিক্ষক মহাশয়, ছাত্রের পিতাকে অবগত করিয়া নিজ অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করা অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম বোধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন।

চণ্ডীচরণবাবু তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর নিকট যখন শুনিলেন যে রমেশ প্রায়ই তাহার অভিভাবক গৃহ শিক্ষককে বাটী আসিবার ছলনায় গোপনে স্থানান্তরে গিয়া তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, তখন তিনি রমেশের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজ অদূরদর্শিতার জন্য অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কেননা, তাঁহার ধারণা, যে ব্যক্তি আপন সন্তানের দুষ্টস্বভাবের কেন্দ্রগত মূল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাকালে তদুৎপটনে প্রয়াসী না হয়, তাহার সন্তানের জনক বা পিতা হওয়া বিড়ম্বনা ও অতিশয় কলঙ্কের কথা।

চণ্ডীচরণবাবু যখন এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়াছেন, সেই সময় রমেশের নামে একখানি পত্র দেবগ্রাম হইতে রাজপুরে তাঁহার ঠিকানায় প্রতি-প্রেরিত হইয়াছে। পত্রখানির মোড়কের উপর 'বিশেষ জরুরী' লিখিত আছে। চণ্ডীচরণের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সে দেবগ্রামের বাসায়, রাজপুরে আসিতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই কোথায় সখ মিটাইতে চলিয়া গিয়াছে—তাই এই 'বিশেষ জরুরী' অঙ্কিত পত্র খানি, গৃহশিক্ষক মহাশয় এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। 'বিশেষ জরুরী পত্রে কি জানি কাহারও অসুখ সংবাদ থাকে, ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ইতঃস্ততের পর খুলিয়া ফেলিলেন—দেখিলেন, পত্রখানি বামাহস্তের লিখিত, তারিখ ও ঠিকানা বিহীন অতি সংক্ষিপ্ত রচনা। পত্রে কেবল মাত্র লেখা আছে—

"পত্র পাঠ এখানে চলিয়া আসিবেন। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে আমার মুণ্ডপাত অনিবার্য্য।" ইতি—কুসুম।

চণ্ডীচরণবাবু পত্রখানি পড়িয়া একবারে বসিয়া পড়িলেন। ইহারই জন্য এত অর্থ ব্যয়! পরনারীর গুপ্তপ্রণয় প্রয়াসী এই কুলাঙ্গার সন্তানের সহিত অনন্য সাধারণ পরম রূপলাবণ্যবতী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কন্যার বিবাহ সংঘটন করিয়া

কি পাপের কর্ম্মই না করিয়াছি—স্বর্গের পারিজাত, বান্দরের গলায় দিয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্মই না করিয়াছি! নিরাহ ভদ্রলোক বৈবাহিক মহাশয়কেই বা কত অন্যায় ভাবে প্রতারণা করিয়াছি!—এবম্বিধ চিন্তাপ্রবাহ, তাঁহাকে স্রোতমুখে মুক্ত-তরনীর ন্যায় উৎক্ষিপ্ত ও উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

তাঁহার একমাত্র বংশধরের এ কলঙ্ক কি অপনোদিত হইবে? পুত্র মূর্খ হউক, নির্ব্বুদ্ধি বা স্থূলবুদ্ধি হউক, সে অপবাদ সহ্য হয়; কিন্তু পুত্র অসংযত স্বভাব, পুত্র অস্বচ্চরিত্র,—এ কলঙ্ক যে পিতার যশোখ্যাতি কলুষিত ও জনকত্বের অনুপযুক্ততাই বিঘোষিত করে! রমেশের দ্বারা তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও পুরুষপরম্পরায় অর্জ্জিত বংশগৌরব কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, আশঙ্কা করিয়া তিনি অতিশয় শোকাকুলিত হইলেন। তিনি এরূপ কুলাঙ্গার পুত্রের পিতা, এই বেদনাকর লজ্জা, আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীচরণকে একান্ত অভিভূত করিয়া তুলিল।

(৩)

রমেশ এই কয় মাস যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে এখন তাহার পক্ষে স্থিরচিত্তে অধ্যয়নরত হওয়া একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত-ব্যাপার এরূপ অত্যল্পকাল মধ্যে প্রচারিত হইয়া একবারে হাতে কলমে পিতার নিকট ধরা পড়িবে, ইহা সে স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার চঞ্চলচিত্ত আরও উদ্‌ভ্রান্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

কেমন করিয়া এই আগন্তুক বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, কেমন করিয়া সকল দিক্ রক্ষা করিতে পারিবে, অপরিণত বুদ্ধি চঞ্চলমতি যুবক, বিশেষরূপ চিন্তা করিয়াও কোন কুল কিনারা করিতে পারিতেছে না; তাহার উপর পিতার কঠোর শাসনের প্রচণ্ড ব্যবস্থা, তাহার মস্তকের উপর উদ্যত দণ্ডের ন্যায় আশু নিপতিত হইবার আসন্ন আশঙ্কায় প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাকে অভিভূত করিয়া দিতেছে—অগত্যা, তাহাকে আত্মকৃত অযথা কার্য্যের জন্য মর্ম্মন্তুদ তীব্র অনুশোচনায় বিপর্য্যস্ত হইতে হইল।

রমেশ পিতৃ অনুশাসন অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায়, চণ্ডীচরণবাবু তুল্যরূপ দুঃখিত, অনুতপ্ত ও অপমানিত হইয়াছেন। পাপের অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে গিয়া কি জানি তিনি মাত্রা অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে হঠকারিতার জন্য নিন্দাভাজন হন, এই আশঙ্কায় তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ জন্য, জামাতা ননীলালকে আহ্বান করিলেন। অচিরে ননীলাল সস্ত্রীক রাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হঠাৎ আহ্বানে, ননীলাল অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিল ; এখন অবস্থা শুনিয়া ততোধিক বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। শ্বশুর মহাশয় অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইয়াছেন,—তাঁহাকে সদ্য বাধা দিবার উপক্রম করিলে তিনি আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবেন, অথচ কোন মতে সময় ক্ষেপণ করিতে না পারিলে এই দারুণ ক্রোধ শান্তির উপায়ান্তর নাই,—এই নিমিত্ত দেবগ্রাম হইতে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ননীলাল, চণ্ডীচরণকে কোনরূপ চরম মীমাংসায় উপনীত হইতে সানুনয় নিষেধ প্রার্থনা করিল—তিনিও জামাতার সাগ্রহ অনুরোধ অবহেলা করিয়া রমেশকে কোন বৈষয়িক অধিকারে বঞ্চিত করিতে আপাততঃ নিরস্ত হইলেন।

(৪)

ননীলাল অতর্কিতে দেবগ্রামে রমেশের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার পড়িবার ঘরখানি ছাত্রের অধ্যয়ন-কক্ষ বলিয়া ধারণা করিবার কোন নিদর্শন নাই। নিষ্কর্ম্মা সৌখীন বাবুর পারিপাট্য ও অনাবশ্যক বিলাস দ্রব্যাদির বিচিত্র সমাবেশে, রমেশের মনোভাব দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছিল। রমেশের টেবিলে পত্রাধারে বিচিত্র বর্ণের সচিত্র চিঠির কাগজের সংগ্রহ দেখিয়া ননীলাল মনে মনে তাহার ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং ভাবিতে লাগিল, রমেশ এই সকল ব্যাপারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার শতাংশ মাত্রও যদি অধ্যয়নে নিয়োজিত করিত, তবে নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি হইলেও অনায়াসে এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়া নিজবংশ ও পিতাকে ধন্য করিতে এবং স্বয়ং গৌরবান্বিত হইতে পারিত।

এটা ওটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে ননীলাল দেরাজমধ্যে সযত্ন সংরক্ষিত তাহারই সহস্তলিখিত শিরোনামা বিশিষ্ট একতাড়া চিঠির সন্ধান পাইলেন—দেখিলেন, সমস্তগুলিই একই মহিলা রচিত—কিন্তু কোনটিই নাম সাক্ষর যুক্ত নহে। পত্রশেষে কেবলমাত্র লেখা আছে—'একমাত্র তোমারই—আমি'।

ননীলাল পত্রগুলি অতি সন্তর্পণে নিবিষ্টমনে একে একে পড়িয়া যাইতে-ছেন, এমন সময়, রমেশ সান্ধ্য ভ্রমণের পর বাসায় ফিরিয়া একবারে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—'বলিহারি! বাবা বুঝি, মশাইকে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার তদন্ত করাবার জন্য ডিটেক্টিভ্ করে পাঠিয়েছেন! কিন্তু মশাই, অনুগ্রহ করে পত্রগুলি ছেড়ে দিন দেখি'—এই বলিয়া সেগুলি ননীলালের নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ অপসারিত করিয়া লইল।

'চোর নইলে চোর ধরতে পারে না—এসেই একবারে সোজাসুজি চুরি আরম্ভ করে দিয়েছেন! থাক্,—কতক্ষণ এলেন—মুখ হাত ধুয়েছেন ত'?—এই কথা বলিয়া রমেশ পরিচারকদিগকে ননীলালের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিবার জন্য আদেশ দিল।

ননীলাল—বোস বোস, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি যখন বিনা আহ্বানে তোমার নিকট এসেছি, তখন তোমায় পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। আমি, শুধু চুরি করতে নয়, চোরের উপর বাট্‌পাড়ী করতেও জানি। ও:—এত চিঠি কি করে একা লেখ হে! আমায় খবর দিলে, এতদিন এসে যে তোমার অনাহারী প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কাজ করতাম!

রমেশ—আমি কারও সাহায্য চাই না মশাই—আমি একাই একশ'।

ননীলাল—তা আর বলতে?—'একা হনুমানে যেন দহিলেক লঙ্কা'!

রমেশ—ও:—আবার লঙ্কাকাণ্ড করেন কেন?

ননীলাল—তোমার স্বরূপ বোঝাবার জন্য, তোমার রূপ না ধরলে উপায় কি?—ডিটেক্‌টিভের বহুরূপ ধরবার অভ্যাস ত থাকেই।

রমেশ—কিন্তু এত রামসীতার মিলন নয় যে হনুমানের রূপধরে দূতীগিরি করবেন? ওরূপ বদ্‌লে ফেলুন—মালিনীর রূপ ধরতে হবে, মুখে কালি না মেখে দাঁতে মিসি দিতে হবে—হাতে কলার বদ্‌লে ফুলের সাজি নিতে হবে—অনেক ঝঞ্ঝাট্—পারবেন ত?

ননীলাল—বল—কিহে! এতদূর নাকি?—সুড়ঙ্গ খোঁড়নি ত?

রমেশ—যখন নেমেছেন, তখন পাতাল পর্য্যন্ত না গিয়ে ত আপনিও ছাড়বেন না। তবে, দেখবেন মশাই, আমায় যেন আর বলি দিবার জন্য মশানে নিয়ে যাবেন না। আপনিই এখন আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—আমার ভাগ্যবিধাতা!

ননীলাল—সুন্দর বক্তৃতা করতে শিখেছ ত। তোমার এমন উন্নতিতে আমার শ্বশুর মহাশয়ের খুবই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত—শুধু পাশ নিয়ে কি ধুয়ে খেতে হবে?

রমেশ—গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণং—আপনার জয় হোক, মশাই, আপনার জয় হোক্।

আহারান্তেও শ্যালক-ভগ্নীপতি মধ্যে পুনরায় কথোপকথনের ধারা বহুরাত্রি পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

(৫)

'তবে তাই হোক্—চল, কালই কাশী চলে যাই'।

বিহারীলাল, রাত্রে নিভৃত শয়ন কক্ষে বসিয়া পত্নী হরসুন্দরীকে এই কথা বলিলে সে উত্তর দিল—'আমি ত তোমায় এই কয়দিন ধ'রে, যা হয় শীঘ্র একটা কিছু ব্যবস্থা করবার জন্য বলে আস্‌ছি।'

বিহারীলাল—তবে কালই রওনা হওয়া যাক্?

হরসুন্দরী—হাঁ, পূজার বন্ধে, বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার চরণে মাথা খুঁড়্‌তে যাচ্ছি বলে, কালই রওনা হওয়া যাক্। তার পর সেখানে দু এক সপ্তাহ থেকে, আদালত খুললে তুমি চলে আসবে, আর আমরা পরে সময় মত ফিরে আসব।

এই ব্যবস্থাই স্থিরতর হইলে, পরদিন প্রভাতে, সন্ধ্যার ট্রেণে কাশী যাত্রার প্রায়োজন চলিতে লাগিল। প্রমীলা মা'র সঙ্গে যাইতে পাইবে জানিয়া অসঙ্কোচে মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা—মাতা উভয়েই বক্র দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর অবগত প্রায়। বিছানা পত্র, বাক্স প্যাটরা ইত্যাদি নানাবিধ লগেজ বান্ধাই করিবার জন্য বিশেষ তাড়া পড়িয়াছে। চাকরেরা সকলেই ছুটাছুটি করিয়া হুকুম প্রতিপালনে তৎপর রহিয়াছে; আর ধীরে ধীরে পদচারণা করিয়া বিহারীলাল তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এমন সময় পনের যোলজন ভারবাহী লোক, তাঁহার সদর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তাহারা সকলেই 'তত্ত্বের' বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ ভার স্কন্ধে লইয়া দণ্ডায়মান। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কার বাড়ী খুঁজ্‌ছো?'

ভারবাহী সকলেই সমস্বরে বলিল—'আজ্ঞে, আপনার এখানেই এসেছি'।

বিহারীলাল—তোমরা ভুল করেছো; আমার এখানে কোনরূপ 'তত্ত্ব' আসবার ত কোন কথা নেই। তোমরা কোথা হতে আস্‌ছো—কার বাড়ী আস্‌ছো জানত?

ভারবাহীদের মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তি বলিল—'আজ্ঞে বাবু, তা আর জানিনা! আপনি আমাদের আজপুরের জমীদার বাবুর বেহাই—রমেশ বাবুর শ্বশুর। বৌমার পাঁচমাসের তত্ত্বের ভাজাপত্র, মাছ, কলা, দই সন্দেশ নিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে পত্র নিয়ে যে লোক আসছিল, সে জিনিষ-

পত্র নিয়ে আগে আমাদের গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে শেষে নিজে আর গাড়ীতে চাপ্‌বার সময় পেলে না—এই পরের ট্রেণেই আসছে।

বিহারীলাল যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—তাঁহার শরীরের বন্ধন যেন শিথিল হইয়া গেল—তাঁহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি কোনমতে অপ্রস্তুত না হইয়া তাহাদিগকে ভারমুক্ত করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। অন্দরে প্রবেশ করিতেই গৃহিণী বলিলেন—

'এ আবার কি গো! একথা বৈবাহিকের কানে এরি মধ্যে কেমন করে হাওয়ায় উড়ে গেল? তুমি অনর্থক কাল বিলম্ব করে এই ব্যাপারটাকে এতদূর টেনে আনলে'?

বিহারীলাল—এখন কি করা যায়?—বৈবাহিকের পত্র না দেখে ত আর রওনা হওয়া চলে না।

হরসুন্দরী—তা আর কেমন করে হয়?

বিহারীলাল—'তুমি কোনরূপ চঞ্চল হয়ো না। দেখা যাক্, মানীর মান ভগবানের হাতে। তিনি সবই করতে পারেন। এই কথা বলিয়া বিহারীলাল সেদিনকার মত কাশীযাত্রার আয়োজন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়া বহির্বাটীতে বৈবাহিকের পত্রের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার সময় ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া ভদ্রবেশী একজন পত্রবাহক, বিহারীলালের নিকট একখানি পত্র দিয়া প্রণাম করিল। রাজপুরের বৈবাহিক প্রেরিত লোক জানিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং পত্রখানি হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। হরসুন্দরী চকিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে বিহারীলাল পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন——

'সবিনয় নমস্কার নিবেদন—বৈবাহিক মহাশয়, প্রেরিত লোকসহ বধূমাতার পঞ্চমমাসের ভাজার তত্ত্ব পাঠাইলাম। আমার সংবাদ পাইতে বিলম্ব হওয়ায় এতদিন তত্ত্বের দ্রব্যাদি পাঠাইতে পারি নাই। সংবাদ পাইয়া সুবিধা-মত দ্রব্যাদি সংগ্রহ জন্য আর কালগৌণ করিতে পারিলাম না। প্রার্থনা করি, আপনারা উভয়েই আমার প্রেরিত দ্রব্যাদির ন্যূনতা জন্য ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

'আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি—আমার সংবাদ মিথ্যা নহে—আপনারা প্রতারিত হইয়াছেন; নচেৎ, এতদিন আমাকে এ সুখের সংবাদ দিতে' পারেন নাই কেন?

মশাই, অনুগ্রহ করে পত্রগুলি ছেড়ে দিন দেখি

'অধ্যয়নে ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি রমেশকে আপনার বাটী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম—একথা আপনি জানেন। কিন্তু বাবাজীবন, পড়-শুনায় আদৌ মনোযোগী হইতে পারে নাই। আপনার বাটীর কুসুম নাম্নী পরিচারিকার সহায়তায় আপনাদের সকলেরই অজ্ঞাতে রমেশ আপনার বাটী যাতায়াত করিত। বধূমাতা অন্তর্বর্তী হইলে, কুসুম রমেশের নামে 'বিশেষ জরুরী' পত্র দেয়। ঐ পত্র আমার হস্তগত হইলে, আমি অন্যরূপ ভাবিয়া রমেশের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণে সচেষ্ট হই এবং আমার জামতার সহায়তায় এবিষয়ে প্রকৃত তথ্যোদ্ঘাটনে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আপনারা নিশ্চিন্ত হইলে সুখী হইব।

'আমি আর রমেশের পরীক্ষার সুফলের প্রয়াসী নহি। আমার বৃদ্ধবয়সের খেলার সাথী, ননীর পুতলির মত একটি 'ভায়া' কোলে লইয়া বধূমাতা কবে আমার গৃহ আলোকিত করিতে আসিবেন, এখন হইতে আমি সেই শুভদিনের সুসময়ের চিন্তায় উৎফুল্ল হইয়া সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতে লাগিলাম।

'নিয়ত আপনাদের কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন। অত্রস্থ কুশল। নিবেদন ইতি—'

একান্ত বিনীত—শ্রীচণ্ডীচরণ রায়।

পত্রখানি শুনিয়া হরসুন্দরীর জিহ্বা, প্রতিমার কালীমূর্ত্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক বিলম্বিত হইয়া পড়িল। আর, বজ্রাহত প্রায় নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ বিহারী-লালের লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টি, তাঁহার লোল-জিহ্বা স্ত্রী-মূর্ত্তির দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল!

শ্রীশিবরতন মিত্র।

পরিত্যক্তা।

(১)

পৌষমাসের রাত্রি। কন্‌কনে শীতে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া সকলে শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। আকাশে বিদ্যুৎ হানিতেছে, গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে বৃষ্টি পড়িয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দিতেছিল। হুগলীর এক ক্ষুদ্র পল্লীতে নিমাইচরণ দে রোগ শয্যায় শায়িত,—তাহার পার্শ্বের ঘরে তাহার স্ত্রী নূতন ঝিয়ের উপর স্বামীর সেবার ভার দিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঘরে একটি আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছে। প্রদীপের সেই অস্পষ্ট আলোকে শুশ্রূষাকারিণী রোগীর রোগক্লিষ্ট পাংশু মুখের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া আছে।

(২)

নিমাইচরণ হুগলী কোর্টের একজন আমলা। তাহার পরিবারের মধ্যে অষ্টাদশবর্ষীয়া পত্নী সুধামুখী ও একটি শিশু পুত্র। নিমাইচরণের বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হইবে, সুধামুখী তাহার দ্বিতীয় সংসার। সুধামুখী একে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাহার উপর পরমাসুন্দরী, তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের নিমাইচরণকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিয়া যেন বড়ই নিঃস্বার্থপরতা দেখাইয়াছেন, এমনি ভাব দেখাইতেন। পত্নীর আদর যত্ন নিমাইচরণের ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই; তিনি দীর্ঘ্য দুই বৎসরের মধ্যে একথা বেশ বুঝিতে পারিয়া ভাগ্যের সহিত একরূপ বোঝাপড়া করিয়া লইয়া ছিলেন। অভিমান বা ক্ষোভ এখন আর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় বিচলিত করিতে পারিত না। কিন্তু আজ দুই মাস হইল আর এক নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে একটি সিঁদুর পরা সধবা কায়েতের মেয়ে নিমাইচরণের সংসারে দাসীর কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্তা হইয়াছে। তাহার রং ময়লা, বয়স তেইশ চব্বিশ হইবে,—পূর্ণ যুবতী। সে এই একমাসের মধ্যে নিমাইচরণের বিশৃঙ্খল সংসারে শৃঙ্খলা আনিয়াছে। গৃহকার্য্য হইতে রন্ধন কার্য্য পর্য্যন্ত সে সমস্তই এক হাতে শেষ করিয়া, আবার শিশু ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকে। নিমাইচরণ কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিলে নিমেষ মধ্যে সে কোথা হইতে আসিয়া হাত-পা ধোবার জলটি পর্য্যন্ত দিয়া যায়, কাছারীর কাপড় ছাড়াইয়া অন্য কাপড় জোগাইয়া দেয়, তারপর জলখাবার সাজাইয়া দিয়া, কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে হয়ত একবার রন্ধনশালা হইতে

ঘুরিয়া আসিয়া, জলখাবারের কোন অংশ পরিত্যক্ত থাকিলে, শতবার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। নিমাইচরণের আহারের সময় সে কোথাও এক পা নড়িতে চায় না। নিমাইচরণের শরীর একটুকু অসুস্থ হইলে, সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করে। সাধারণ ঝিয়ের পক্ষে এতটা আদর যত্ন অত্যন্ত বাড়াবাড়ী কিনা নিমাইচরণ সে কথা ভাবিবার সময় পাইত না। সে এই আদর যত্নের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা আরাম পাইয়াছিল। কিন্তু এই আদর যত্নের তুলনায় তাহার স্ত্রীর উদাসীনতা বড়ই ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই উদাসীনতা এখন তাহাকে যেমন ভাবে আঘাত করিত, পূর্ব্বে কোন দিন তাহাকে এমন কঠিনভাবে আঘাত করিতে পারে নাই ইহাই নিমাইচরণের এক নূতন উপসর্গ।

(৩)

আজ নিমাইচরণ সংক্রামক বসন্তরোগে আক্রান্ত। সুধামুখী আপনার শিশু পুত্রকে লইয়া যথা সম্ভব স্বামীকে দূরে দূরে রাখিয়া থাকে। ঘরের মধ্যে সে কদাচিৎ প্রবেশ করে, বাহির হইতেই স্বামীর সংবাদ লইয়া থাকে। নূতনঝিই এখন নিমাইচরণের শুশ্রূষাকারিণী। দিনের বেলা সহস্র গৃহ কর্ম্মের মাঝখানে সে শতবার সময় করিয়া নিমাইচরণের তথ্য লইয়া থাকে, সমস্ত রাত্রি নিমাইয়ের পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করে, নিতান্ত আত্মীয়ার মত অসংস্কুচিত ভাবে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়। রমণীর হৃদয়ে এত স্নেহ যত্ন থাকিতে পারে, নিমাইচরণ পূর্ব্বে তাহা কোন দিন ভাবে নাই। সে ভাবিত "এই রমণী কে? ইনি কি চান? সামান্যা দাসী কখন কি এত যত্ন করিতে পারে? তাহার দেহে সধবার চিহ্ন রহিয়াছে। তাহার স্বামী কোথায়? এই দুই মাসের মধ্যে কেহত তাহার তথ্য লইল না।" নিমাইয়ের রুগ্ন মস্তিষ্ক এই দুরূহ প্রশ্নগুলির কোন সমাধান করিতে পারিত না।

(৪)

নূতনঝিয়ের সেবায় নিমাইচরণ আরোগ্যলাভ করিল বটে, কিন্তু কালরোগ ঝিয়ের উপর প্রতিশোধ লইতে ভুলিল না। রাত্রিজাগরণে ও কঠিন পরিশ্রমে ঝির শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রোগ সময় বুঝিয়া নিমাইচরণকে ছাড়িয়া ঝিকে আক্রমণ করিল। ডাক্তার আসিয়া রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। সুধামুখী পূর্ব্ব হইতেই অত বাড়াবাড়ির জন্ত ঝির উপর একটু চটিয়াছিল, কেবল তাহার কর্ম্মপটুতার জন্ত তাহাকে কিছু

বলিত না। এখন তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সে স্বামীকে তাহাকে হাঁস-পাতালে পাঠাইবার উপদেশ দিল। নিমাইচরণ সে কথার কোন উত্তর দিল না।

(৫)

রাত্রি এগারটা, নিমাইচরণ ঝিকে ঔষধ খাওয়াইতে ছিল। দিন কতক পূর্ব্বে এমনি সময়ে ঝি একদিন নিমাইচরণের রোগশয্যায় বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছে। আজও সেই গৃহে সেই দুই জন,—মুমূর্ষা ও নিমাইচরণ, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। বাহিরের আকাশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইয়া মরণের আগমন পথ আলো করিয়া দিতেছিল।

ঝি ডাকিল "বাবু, আলোটা উস্কে দাও, আমার মুখে একটু গঙ্গাজল দাও। আমার সময় হইয়া আসিতেছে। আমি মরিলে সিন্দুর দিও, নখে আলতা ছোঁয়াইও স্বামীর সব কাজ ক'রো। আজও কি তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না। আমি তোমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কমলা"—নিমাইচরণ শিহরিয়া উঠিল। "কমলা" নিমাইচরণ ভাবিল সেই কমলা, যাহাকে কুলটা জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহার এই ব্যবহার! "না না, অসম্ভব!" নিমাইচরণ প্রদীপের আলো বাড়াইয়া দিয়া রোগিণীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল!

"কমলাইত বটে, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কেন তুমি বিপথে গিয়া, তোমার স্নেহ যত্ন হইতে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিলে?" এই বলিয়া নিমাইচরণ আত্মহারা হইয়া তাহাকে আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইল। ঝি উত্তর করিল, আমি অসতী নহি, তুমি মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া আমায় ত্যাগ করিয়াছ। জগৎ আমাকে অসতী বলিয়া জানিয়াছে, কিন্তু একজন আছেন, যিনি সব কথা জানেন; আজ আমি তাঁহার নিকটে যাইতেছি, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন না। আমার জীবনের সব কথা আমার বাক্সে একখানা কাগজে লেখা আছে, যদি সে কথা জানিবার ইচ্ছা হয়, কাল পড়িয়া দেখিতে পার।" নিমাইচরণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

(৬)

আজ সব শেষ হইয়া গেছে। ঝিয়ের শরীর পুড়িয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। নিমাইচরণ আজও বড় বিমর্ষ। সে আজ ঝিয়ের সেই কাগজ খানি পড়িতেছিল।—আট দশ বৎসরের আগেকার কথা আজ তোমার স্মরণ হইবে

কি? তুমি যে দিন আমায় বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া গেলে সেই দিন কি অশুভক্ষণে গৃহের বাহির হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। মা বৌ দেখিতে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, আমি তাঁহার বিষনয়নে পড়িলাম। তুমি আমার স্বামী, জীবন মরণের সঙ্গী, আমি তোমারও মনমত হইতে পারিলাম না। আমার তেমন রূপ ছিল না, আমি কুরূপা, সেই জন্য তোমরা মাতা পুত্রে আমাকে দেখিতে পারিলে না। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমি প্রত্যহই আশা করিতাম, আজ তোমার দর্শন পাইব, কিন্তু সে আশা কোন দিন পূর্ণ হইল না। এই সময়ে দেশে আমার বাপের সহিত জমিদারের মামলা বাধিল। পিতাকে কোনরূপে আঁটিয়া উঠিতে না পারায় জমিদারের আক্রোশ আমার উপর পড়িল। তিনি আমার শ্বশুরালয়ের সন্ধান লইলেন। দুষ্ট লোক দিয়া, তোমাদের বাটীর ঠিকানায় এমন ভাবে আমার নামে চিঠি পাঠাইতে লাগিলেন, যেন কোন লোকের সহিত আমার অবৈধ প্রেম ছিল, আর আমি তাহার সহিত এখনও পত্র ব্যবহার করি। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না, কিন্তু সেই সব পত্র যখন তোমার হাতে পড়িল, তখন তুমি কিছুতেই সে কথা অবিশ্বাস করিলে না, তুমি আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমায় পরিত্যাগ করিলে। স্বামী পরিত্যাগ করিলে, স্ত্রীলোকের দাঁড়াইবার স্থান নাই, একথা তখন জানিতাম না। আমি অভিমান করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। জমিদার সকল সংবাদই রাখিত, কুলটা কন্যাকে গৃহে স্থান দিবার জন্য সে পিতাকে একঘরে করিল। আমি পিতার একমাত্র আদুরে কন্যা, সুতরাং তিনি আমায় পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু আমি কালসাপিনী তাঁহাকে দংশন করিলাম। আমার পিতা বড় অভিমানী ছিলেন। গ্রামে সমাজচ্যুত ও অপমানিত হওয়ায়, তাঁহার হৃদয়ে সে আঘাত বড় লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। দীর্ঘ রোগ ভোগ করিয়া, তিনি আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। আমি দারুণ বিপদে আত্মহারা। এদিকে আবার জমিদারের লোক ঢোল পিটিয়া বাস্তুভিটা বিক্রয় করিতে আসিল। আমি একা স্ত্রীলোক, কি বুঝি; গৃহ ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময়ে আত্মহত্যা করা ভিন্ন উপায় ছিল না। কিন্তু আজ তোমার ক্রোড়ে মরিবার সুখ আমার কপালে রহিয়াছে; আত্মহত্যা করিতে পারিলাম না। গ্রামান্তরে গিয়া দাসীপণা করিব। পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম সুপথে থাকিলে অর্দ্ধরাত্রেও ভগবান আহার জোটান। সেই আশায় বুক বাঁধিয়া

গ্রামত্যাগ করিলাম। এদিকে রব উঠিল গ্রামের একটী দুশ্চরিত্র যুবককে লইয়া আমি গ্রাম ত্যাগ করিয়াছি।”

আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের দাঁড়াইবার স্থান হয় শ্বশুরালয় না হয় অভাবে পিত্রালয়। যাহার এই দুই পথই বন্ধ তাহার মরাই ভাল। নতুবা তাহাকে রমণীর মহার্ঘধন সতীত্ব বিকাইয়া পোড়া পেট ভরাইতে হয়।

দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও আমাদের দেশে পেট চলে না। আমার যৌবন আমার কাল হইল। ভাল গৃহস্থ গৃহে আমায় স্থান দিতে চায় না, অনেক চেষ্টায়ও যদি কোথাও স্থান করিয়া লই, তবে আমাকে কুপথে আনিবার জন্য কত চেষ্টা কত ষড়যন্ত্র চলে, তাহা আর কি বলিব। দিনের বেলা কোন রকমে কাটান যায়, কাল রাত্রি আর কাটে না। শত উপদ্রবে সহস্রবার নয়নের জলে আমি প্রত্যেক রাত্রি কাটাইয়াছি। সে সব দুঃখের কথা শুনিয়া আর কি করিবে? এইরূপে কটা বৎসর দীর্ঘযুগের ন্যায় কাটিয়াছে। তার পর একদিন মনে করিলাম, যদি দাসীবৃত্তিই করিতে হয়, তবে আমি আমার স্বামীর গৃহে যাই না কেন? তিনি এতদিনের পর আমায় কি আর চিনিতে পারিবেন? যদি দাসী বলেও তিনি আমায় গ্রহণ করেন তাহা হইলেও আর আমার ভয় নাই। তাই তোমার সংসারে দাসী রূপে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার মন বা শরীর কোনরূপে অপবিত্র হয় নাই। একথা তুমি বিশ্বাস করিবে কিনা “জানি না। যদি বিশ্বাস কর তাহা হইলে আমার মরণের পরেও কি স্ত্রী বলিয়া আপনার মনে মনে গ্রহণ করিবে না?”

এই ঘটনার পর দিন সুধামুখী স্বামীকে বলিল “নূতন ঝির মৃত্যুর পর হইতে তোমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। না হয় অল্প বয়স দেখিয়া আর একটা ঝি রাখ না!” এই শ্লেষে নিমাইচরণের শান্ত স্বভাবটিও বিচলিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল “নূতন ঝি—ঝি নয়, কমলা। কমলা আমার প্রথম পক্ষের সতী স্ত্রী। তাহার পবিত্র নামের উদ্দেশে এত লঘুভাবে কথা কহিও না।”

তাহার কণ্ঠ আর্দ্র—চক্ষে দর দর ধারা।

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মিত্র।

অনুতাপ।

শারদীয় পূজা নিকটবর্ত্তী। আজ আশ্বিনের অমাবস্যা। আর সাত দিন পরেই বাঙ্গালার লুপ্ত গৌরব, হীনৈশ্বর্য্যে, ভক্তপ্রধান হিন্দু আনন্দময়ী মার অর্চ্চনা করিবে, তাই বাঙ্গালার হিন্দু পুলকভরে হাসিতেছে—আনন্দময়ীর আশু আগমন আশায় সমস্ত বাঙ্গলায় কেন, সমস্ত ভারতে আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে। সকলেই এক অভিনব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে অগ্রসর। এই কর্ম্মচঞ্চল, কর্ম্মনগরী কলিকাতার কর্ম্মকোলাহল যে স্বাভাবিক মাত্রায় ছাপিয়া উঠিবে এবং আনন্দের পূর্ব্বলক্ষণ যে এখানে পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হইবে ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইবার লেশমাত্রও কারণ নাই।

রাত্রি সাতটা বাজিবার উপক্রম। কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীট দিয়া অপরিসীম জনস্রোত বহিয়া যাইতেছে। রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থ বিপুল দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালায় পরিশোভিত বিপণিসমূহ রাজপথগামী নরনারীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল। ৺পূজার বাজার—শস্তাদর, বন্ধুবান্ধব দিগকে উপহার দিবার অভিনব সুযোগ—গৃহলক্ষ্মীর মনস্তুষ্টি করিবার বিপুল আয়োজন—প্রভৃতি কথা বড় বড় অক্ষরে লিখিত প্লাকার্ড বিপনীসমূহের গায়ে ঈষৎ বায়ুসঞ্চালন হেলিয়া দুলিয়া পথবাহী জনগণের মনে এক অপূর্ব্বভাবের লহর তুলিয়া দিয়াছে। বিবাহিত যুবকবৃন্দ নবপরিণীতা স্ত্রীর—স্মিত আনন, আজানু-লম্বিত কুন্তলরাজি ও কমনীয় অবয়ব স্মরণ করিতে করিতে ভিনোলিয়া পাউডার, এইচ্ বসুর কুন্তলীন ও জড়ির কারুকার্য্য খচিত জ্যাকেটের ফর্দ্দ করিয়া লইল। বৃদ্ধদের মধ্যে কাহার কাহার গৃহ পৌত্র পৌত্রী পরিবৃত হইলেও এই শেষ বয়সে গৃহীনীর যৌবনের ফুল্ল অধর মানসনেত্রে দর্শন করিয়া দু একটী সখের বায়না পূরণ করিতে মতলব করিল। সংসার ক্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে ছোটপুত্রের জন্য অল্পদামের রঙ্গিন সার্ট; দৌহিত্রীর জন্য গোলাপী রঙ্গের পেনী ও গৃহীণীর জন্য মোটা কালপেড়ে সাড়ী ক্রয় করা সঙ্কল্প করিল। এইরূপ বিভিন্ন লোক তাহাদের বিভিন্ন প্রয়োজনানুবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন দোকানগৃহের জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইতে লাগিল ও আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ব্যস্ততার সহিত অগ্রসর হইল।

এই বিপুল জনপ্রবাহের মধ্যে বিংশতি বর্ষীয় যুবক প্রমোদ কুমার ২।৩টী বন্ধু

পরিবৃত হইয়া একখানা সজ্জিত ষ্টেসনারী দোকানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল ও তাহার নবপরিনীতা ভার্য্যা প্রভাবতীর জন্য মনোমত শারদীয় উপহার ক্রয় করিয়া বন্ধুদের সহিত তাহাদের ভাবী সুখমিলনের গল্প করিতে করিতে হ্যারিসন রোডস্থিত মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রমোদ কুমারের পূর্ণ নাম প্রমোদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সে মজঃফরপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত প্রভুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রমোদ কুমার প্রেসিডেন্সী কলেজের বি এ ক্লাসের ছাত্র। সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী ছিল। কৃতিত্বের সহিত মজঃফরপুর কলেজ হইতে আই, এ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়াছিল। প্রমোদ বাল্যকাল হইতেই আমোদ প্রমোদ প্রিয় ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত দূরদর্শী পিতার কড়া দৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া বিশেষ একটা স্ফূর্ত্তির মধ্যে গা ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। তাই অল্পবিস্তর পড়াশুনা করিয়াই নিজের বুদ্ধি ও মেধার প্রভাবে পূর্ব্বের পরীক্ষাগুলি প্রশংসনীয় ভাবেই পাস করিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া অবধিই প্রমোদ অভিভাবক শূন্যভাবে বাস করিতে লাগিল। কলিকাতা ভারতের প্যারিস—সৌখিনতার লীলাভূমি, তাই কলিকাতায় স্বয়ং কর্ত্তাভাবে থাকিয়া পূর্ব্ব পরীক্ষার ফলে আত্ম কৃতিত্বে অহঙ্কারী প্রমোদ কুমার বি, এ পরীক্ষাকে সহজ ব্যাপার মনে করিয়া নিজের স্বভাবিক সৌখিন প্রবৃত্তির অনুশীলনে ব্যস্ত রহিল, সুতরাং পড়াশুনা বিশেষ করা হইল না। কলেজের পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্ত্তে ইংরাজী ও বাঙ্গলা নাটক নভেলের শ্রাদ্ধ করিল। কলেজের লেক্‌চার শুনিতে অমনোযোগী হইলেও টাউনহলে বক্তৃতা শুনিতে বাধা রহিল না—ছুটীর দিন অধ্যয়ন না করিয়া বন্ধুদের সহিত গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করিত। এইরূপ কার্য্যের সহিত অধ্যয়নের সম্পর্ক তত ঘনিষ্ট নয়, তাই অবশেষে প্রমোদ পরীক্ষায় প্রমাদ গণিল। পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে আবশ্যকীয় পাঠ্য পুস্তকের পাতাগুলি কোনরূপে উল্টাইয়া প্রমোদ বি, এ পরীক্ষা দিল। পরীক্ষান্তে প্রমোদ পিতৃসকাশে গমন করিল, পিতার বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও আদরিণী পিতামহী ও স্নেহময়ী জননীর একান্ত অনুরোধ রক্ষার্থে বৈশাখের এক শুভদিনে প্রভাবতী নাম্নী একরূপবতী পঞ্চদশী সরলা বালিকার পানিগ্রহণ করিল।

প্রভাবতী সরলতার ছবি—পবিত্রতার আধার। এ সংসারের কুটিলতা রমণী সুলভ সরলতাকে পরাজিত করিয়া এখনও তাহার হৃদয়রাজ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

প্রভাবতী গরীবের মেয়ে—সে স্বামীর অপরিসীম ভালবাসা, শ্বশুরের অযাচিত স্নেহ ও শাশুড়ীর অপর্য্যাপ্ত আদর পাইয়া নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিল বটে, কিন্তু আহ্লাদে আটখানা হইয়া স্বকীয় সরলতা ও মাধুর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া আধুনিক সমাজের আদরিণী গরবিণী হইয়া দাঁড়াইল না। তাহার প্রীতিকর অকপট ব্যবহারে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রত্যেকেই মুগ্ধ হইল এবং নববধূকে সকলেই প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিল।

এইরূপ আদরে দুমাস কাটিয়া গেল এবং বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। সংবাদ পত্রগুলি ও গেজেট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজিয়াও প্রমোদের নাম পাওয়া গেল না। আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রমোদের পরীক্ষার ফলে বিস্মিত হইল। বিচক্ষণ প্রভুদাস বাবু মনে মনে পুত্রের অমনোযোগিতা ও স্বাভাবিক সৌখিনতার পরিণামে এইরূপ ফল ফলিয়াছে এবং বৃদ্ধমাতার ও অপরিপক্ক বুদ্ধি স্ত্রীর খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে অসময়ে বিবাহ দিয়া এমন কি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও রুদ্ধ করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি পুত্রকে পুনরায় অধিকতর পরিশ্রম ও যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়া শীঘ্রই কলিকাতা পাঠান স্থির করিলেন।

(২)

প্রমোদ সর্ব্বদাই ভাবভরে ভরপুর থাকিত—দুঃখ হউক, সুখ হউক, সন্দেহ হউক, সম্প্রীতি হউক—যে ভাবই প্রমোদের অন্তঃকরণে একবার প্রবেশ লাভ করিত সে ভাবের প্রাবল্যে প্রমোদ সতত পরিপূর্ণ থাকিত। প্রভা কিন্তু হৃদয়ের ভাবরাশি লুকায়িত রাখিতেই ভালবাসিত। প্রভা আজকালকার চপলা মেয়েদের মত এক কথায় দশ কথা বলিতে জানিত না। ভাবহীন হৃদয় লইয়া সে ভাষার উৎস প্রবাহিত করিতে শিখে নাই, তাই আধ আধ কথায় তাহার হৃদয়ের বেদনা প্রমোদকে জ্ঞাপন করাইত এবং মনে মনে নিজের অদৃষ্টের উপর প্রমোদের অকৃতকার্য্যতার জন্য দোষারোপ করিল। তাহার স্বামী পূর্ব্বের পরীক্ষাগুলি সসম্মানে পাশ করিয়াছে, এবার তাহার ন্যায় মন্দভাগিনীকে বিবাহ করিয়াই এইরূপ অকৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া প্রভা গোপনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। এখন আর প্রমোদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার মুখে হাসিরেখা ফুটিত না। প্রমোদ এই ভাষাহীন ভাব, দুঃখের অভিব্যক্তি বুঝিয়া পত্নীর প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচয় পাইল এবং দুঃখের প্রথম আস্বাদেও অনেকশান্তি বোধ করিল। কয়েকদিন পরে পিতার আজ্ঞানুযায়ী ভালদিন দেখিয়া সাশ্রুনয়নে

বিষণ্ণা পত্নী ও ব্যাথিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রমোদ কলিকাতা ফিরিল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। পত্নীর মলিন বদন স্মরণ করিয়া, চেষ্টার সহিত যতটা পড়া যায় প্রমোদ এবার তাহাতে ক্রুটী করিল না। এইরূপ ভাবে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র তিন মাস কাটিয়া গেল। আশ্বিনের আগমনে প্রমোদের হৃদয়ে আশার উদয় হইল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্বগৃহে আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হইবে ও বিয়োগ-বিধুরা স্ত্রীর মলিন বদনে হাসির রেখা ফুটাইবে ভাবিয়া আশ্বিন মাসের প্রথম কয়েকদিন অতি আনন্দেই প্রমোদ কাটাইল। ৺পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রভুদাস বাবু পুত্রকে পত্র লিখিলেন।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। আমার এখানে আসিলে তোমার পড়ার বিশেষ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। ছুটীর সময়টা কলিকাতা থাকাই তোমার পক্ষে অনুকূল হইবে, সুতরাং সেখানেই থাকিও। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে অধিক লেখা বাহুল্য। আমাদের প্রভাসের নিকট হইতেই (প্রভাস প্রভুদাস বাবুর কলিকাতাস্থ দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়) তোমার সংবাদ লইব। এবার সসম্মানে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। ইতি

তোমার পিতা।

(৩)

আমরা আখ্যায়িকার প্রারম্ভে প্রমোদকুমারকে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে তাহার আদরিণী স্ত্রীর জন্য ৺পূজার উপহার ক্রয় করিয়া সন্ধ্যার পর হ্যারিসন্-রোডস্থ মেসে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। প্রমোদ মেসে আসিয়াই চিঠির বাক্স অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন চিঠি পাইল না। বিষণ্ণ-চিত্তে প্রমোদ যখন দ্বিতলের সিঁড়িতে অন্যমনস্কভাবে এক এক পা ফেলিয়া আস্তে আস্তে উঠিতেছিল তখন পশ্চাৎ হইতে ভৃত্য ডাকিল "প্রমোদ বাবু আপনার দুখানা পত্র আছে। আমি আপনার ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিয়াছি।" ভৃত্যদত্ত সংবাদে প্রমোদের মনে অপার আনন্দ উপস্থিত হইল। সে দ্রুত পদ-বিক্ষেপে দ্বিতলে নিজের কক্ষে উপস্থিত হইয়া আলো জ্বালাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ের মধ্যে তাহার মনে যে কত চিন্তার তুফান বহিয়া গেল কে তাহা

বর্ণনা করিবে ? অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রভা তাহাকে পত্র লেখে নাই—হয়তঃ সে আজ কত কথা লিখিয়াছে, বিচ্ছেদের জন্য কত দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছে—ভাবী সুখের জন্য পথপানে চাহিয়া আছে—উভয়ের মিলনের জন্য ভগবানকে কত ডাকিতেছে—এইরূপ অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার কক্ষের আলোটী জ্বালাইল ; কিন্তু আলোর সাহায্যে পত্রের হস্তাক্ষরগুলি তাহার উৎগ্রীবনয়নে প্রতিভাত হইলে, তাহার কল্পনা বৃথা ব্যথিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। পত্রদ্বয় তাহার মাতা ও পিতা লিখিয়াছেন। পিতার পত্র আমরা আমূল পূর্ব্বে দিয়াছি। মাতা অনেক কথা লিখিয়াছেন, নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়াছেন। নববধু ঘরে —বৃদ্ধা শাশুড়ী হয়তঃ আগামী বৎসর আর ইহলোকে থাকিবেন না—বিবাহের প্রথম বৎসর ৺পূজার সময় পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়া কত আমোদ প্রমোদ করিবেন; কিন্তু কর্ত্তা তাহাতে একান্ত নারাজ। তিনি উপসংহারে কর্ত্তার মত লইবার চেষ্টায় আছেন—পুত্রকে জানাইয়াছেন। মাতা, সমস্ত ছুটী মজঃফরপুর থাকা অহিতকর হইলে পুত্রকে না হয় লক্ষ্মীর পূজার পরই কলিকাতায় পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন ; তাই তিনি পুত্রকে অল্প কয়েক দিনের জন্য মজঃফপুরে আসিতে লিখিয়াছেন। প্রমোদ পিতার পত্র প্রাপ্তে অনেক ভাবিল, কিন্তু কোন ক্রমেই প্রভার বিদায় কালীন অশ্রুপূর্ণ আঁখি দুটী ভুলিতে পারিল না, পরে সিদ্ধান্ত করিল স্নেহময়ী জননী যার সহায়, পিতার ক্রোধে তাহার ভয় কি ?

প্রমোদ কুমার আজ তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজন সমাপন করিল—এবং তাম্বুলাদির কথা ভুলিয়া গিয়া ভোজনান্তেই লেখার আসবাব লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। প্রমোদ মাতার নিকট কোন পত্র লিখিল না কারণ সে জানিত যে মাতার মন পরিবর্ত্তিত হইবার নহে,তাহার পত্রোত্তর না পাইলেও উকিল পিতার নিকট মাতা ওকালতী করিতে ভুলিবেন না, ইহা বুঝিয়াই প্রমোদ মাতা সম্পর্কে মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ করিল ; কিন্তু পিতার পত্রের উত্তরে উপযুক্ত কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় প্রমোদ পিতাকে লিখিল যে ছুটীতে তাহার মেস বন্ধ থাকিবে। অন্য কোথাও থাকার সুবিধা নাই—প্রভাস দাদাও দেশে যাইবেন। সুতরাং হয়তঃ বাধ্য হইয়া তাহার পিতৃসকাশে যাওয়া হইতে পারে। উপসংহারে প্রমোদ পিতাকে লিখিল যে তাহার মজঃফপুর যাওয়ার বিশেষ মত নাই এবং অন্যত্র থাকিবার সুবিধা অন্বেষণ করিতে সে কোনক্রমেই ত্রুটী করিবে না। এইরূপে পিতার সন্দেহ নিবারণ করিয়া ৺ পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মজঃফরপুর যাইয়া উপস্থিত হইবে স্থির করিল।

পিতার পত্র সমাপন করিয়া প্রমোদ প্রভাকে পত্র লিখিবার কথা ভাবিল। ভাবকে বেষ্টন করিয়া প্রমোদের মনে নানা চিন্তার উদয় হইল। কেন যে প্রভা বহুদিবস পর্য্যন্ত পত্র লিখিতেছে না, সে বুঝিল না। তাহার উন্মত্ত মন কেমন যেন প্রভাকে দোষী করিতে চাহিল। কেমন যেন প্রমোদের মন প্রভার ভালবাসা সম্পর্কে সন্দিহান হইল। কেন যেন প্রমোদ প্রভার পূর্ব্বদৃষ্ট সরলতাকে হৃদয়ের ভাবের লঘুত্ব পরিচায়ক বলিয়া মনে করিল; কিন্তু ক্ষণকালের অধিক সে ভাব তাহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে স্থান পাইল না। প্রভার বিদায়কালীন বিমর্ষ মুখখানি ও আধ আধ কথায় ব্যক্ত হৃদয়ের সহানুভূতির স্মৃতি প্রমোদের ভাব ভ্রমাত্মক বলিয়া দিল। তাই প্রমোদ নিজকেই দোষী করিল। ভাবিল প্রভা হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছে—প্রভা স্বামীর নিকট হইতে তাহাদের মিলনের আশ্বাস পাইবার আশায় আছে, তাই বুঝি সে মুখ ফুটিয়া স্বামীকে যে কথা লিখিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। এইরূপ কল্পনার সাথে সাথে প্রভাকে দোষী করিবার ভাব প্রমোদের মন হইতে তিরোহিত হইল। প্রভাকে হৃদয়ের তীব্র বেদনা জ্ঞাপন করিতে ও আশু মিলনের আশ্বাস দিয়া প্রমোদ এক পত্র লিখিল। প্রভার পত্রের মধ্যে প্রমোদ তাহার নবম বর্ষিয়া ছোট ভগ্নি প্রফুল্লময়ীর নিকটও এক পত্র দিল, কারণ প্রফুল্ল দাদার পত্র পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে বড় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিত। পত্র সমাপন করিয়া—স্বামী সন্দর্শন প্রার্থী স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ পত্র পাইবার আশায় আশ্বস্থ হইয়া সে রাত্রি প্রমোদ সুখ-নিদ্রায় কাটাইল।

(৪)

প্রভুদাস বাবু অনেকটা সাবেক ধরণের লোক, তাই প্রাচীন বর্ষীয়দের মত তিনি আধুনিক কর্ত্তব্যবিরোধী যুবকযুবতীর প্রেমাভিনয় ক্রুর দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি স্নেহ-প্রবণ ছিলেন, কিন্তু পরিবার মধ্যে কেহ তাঁহার উপদেশ বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ভুলিতেন না। তিনি তাঁহার পুত্রবধু-দিগকে তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেন। প্রমোদকে ৺পূজার পর বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখার পর তিনি প্রভাকে একদিন উপ-দেশ ছলে বলিয়াছিলেন "মা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য বড় গুরুতর। স্বামীর কর্ত্তব্যসাধনে সহায়তা করাই স্ত্রী জীবনের সফলতা। এইরূপ স্ত্রীই জীবনসঙ্গিনী পদবাচ্য। মা, কখনও সাময়িক সুখের জন্য স্বামীর কর্ত্তব্য পালনে বাধা দিও না। প্রভুদাস বাবু এই সাধারণ উপদেশ দানে ক্ষান্ত না হইয়া, স্বর অধিকতর

মন্ত্রীভূত করিয়া নিজের পুত্রের কথা তুলিলেন এবং প্রভাকে বলিলেন "মা, প্রমোদ বড় চঞ্চল এবং পড়াশুনায় বড় অমনোযোগী, তাই তুমি পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহাকে পত্র লিখিও না। পাঠ্যাবস্থায় স্ত্রীচিন্তা আসিলে কর্ত্তব্যের বড় ব্যাঘাত হয়।" তিনি নিজের উপদেশ সমর্থন মানসে একটী সংস্কৃত শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

"অসমাপ্তাধ্যয়নস্ত স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ।
অনাক্রম্য জগৎ কৃৎস্নং ন সন্ধ্যাং ভজতেরবিঃ॥"

শ্লোকটী পুত্রবধূকে বুঝাইয়া দিয়া সে দিনকার তরে তাহাকে বিদায় দিলেন। প্রভা শ্বশুরের নিকট নিজের স্বামী সম্পর্কীয় কথা শুনিয়া লজ্জায় ম্রিয়মানা হইল এবং সর্ব্বদা স্বামীর মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত থাকিবে সঙ্কল্প করিল।

যথাসময়ে প্রভা প্রমোদের পত্র পাইল। পত্র পড়িয়া প্রভা ভীষণ সমস্যায় পড়িল। বিবাহের পর মাত্র ২ মাস তাহার স্বামীসঙ্গ লাভ ঘটিয়াছে। সে একত্র অবস্থানের শেষভাগে তাহাদের মনে যে দাগা লাগিয়াছে তাহা এখনও তাহার স্মৃতিতে জাগরুক। বিদায় কালীন পরস্পরের অশ্রুপূর্ণ আঁখি বিনিময় মনে করিয়া প্রভার চিত্ত ব্যথিত হইল। এতদিন পরে তাহাদের আবার মিলনের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে; কিন্তু বিধির ইচ্ছায় তাহা বুঝি হইবার নহে—এই ভাবিয়া প্রভা আকুল হইল। এখন সাক্ষাৎ না ঘটিলে আর সুদীর্ঘ ৬ মাস পরে পরীক্ষার পর সাক্ষাৎ হইবে—কিন্তু কি করিবে? তাহার সূক্ষ্মদর্শী শ্বশুর তাহার পত্র লিখিবার সংবাদ কোন ক্রমে পাইলে, অশুভ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাই সে শিহরিয়া উঠিল। পরন্তু শ্বশুরের উপদেশানুযায়ী স্বামীর কর্ত্তব্যপথে কণ্টক হইতে ইচ্ছা করিল না। সাময়িক সুখকে তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্খা, প্রগাঢ় ভালবাসা, প্রভা হৃদয়েই লুক্কায়িত রাখিল কিন্তু সে লুকায়িত প্রেমবীণা কি প্রমোদের কর্ণে ঝঙ্কার করিবে? স্বামীর মনস্তুষ্টি, স্বকীয় কর্ত্তব্যপালন এবং শ্বশুরের আদেশ রক্ষণ মানস করিয়া প্রভা উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিতা রহিল; সুতরাং বালিকা প্রফুল্লময়ী তাহার দাদার নিকট পত্র লিখিতে বউদিদির পরামর্শ চাহিলে প্রভা প্রফুল্লকে দিয়া পত্রের ভাষা এরূপ লিখাইল যে তাহার মনোগত ভাব স্বামীর নিকট প্রকাশ পায়। এইরূপে প্রভা উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার প্রয়াস পাইল। আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য প্রফুল্লময়ীর লিখিত পত্রের আবশ্যকীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দাদা, আপনার পত্র পাইলাম। বাবার নিকট শুনিলাম তিনি আপনার পড়ার সুবিধার জন্যই আপনাকে ৺পূজার ছুটীর সময় দেশে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন! আমরা সকলে আপনার মঙ্গলপ্রার্থী তাই সাময়িক সুখ অপেক্ষা ভবিষ্যৎ অনেক মূল্যবান মনে করি। আপনি পরীক্ষার পর গৃহে ফিরিলেই আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ ভুলিয়া যাইব। ইত্যাদি……

সেবিকা

আপনার স্নেহের প্রফুল্ল।

প্রভা মনে করিল স্বামী এই পত্রেই তাহার মনোগত ভাব বুঝিবেন কারণ প্রমোদ জানিত যে প্রফুল্ল সর্ব্বকার্য্যই তাহার বউদিদির জ্ঞাতসারে করে। প্রভা বুঝিল না যে, মিলনের উন্মত্ত বাসনা তৃপ্তির জন্য প্রমোদকে যন্ত্রণা দিতেছে—সে বুঝিল না তাহার ঐ কৌশল প্রমোদের জাগ্রত বাসনাকে শান্ত করিতে পারিবে না। বরং তাহার প্রিয়তম স্বামী তাহার ভালবাসায় সন্দিহান হইবে। 'মানুষ ভাবে এক, বিধি করে আর'।

(৫)

৺ পূজার দুই দিন বিলম্ব আছে। সকল স্কুল কলেজ ছুটী হইয়াছে। প্রমোদের মেসের প্রায় সকলেই দেশে চলিয়া গিয়াছে। প্রমোদ মজঃফরপুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল কিন্তু প্রভার পত্র আসে কৈ? উপযুক্ত সময়ে উত্তর দিলে দুই দিন পূর্ব্বে পত্র আসিত—তাহাতে এত বিলম্ব? প্রমোদ অন্যমনস্কভাবে যখন সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠাগুলি একে একে উল্টাইতে ছিল তখন ডাক পিয়ন আসিয়া সেলাম করিয়া প্রমোদের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "বাবু, সববাবু আমায় ৺ পূজার পার্ব্বণী দিয়াছেন, আপনি কিছু দিন" প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল—"আমার পত্র আছে?"

ডাক পিয়ন—হ্যাঁ আপনার চাকরের নিকট দিয়া আসিয়াছি, সে উপরে আসিতেছে।

প্রমোদ ব্যগ্রতার সহিত টেবিলের কোণে যে অর্দ্ধ রৌপ্য মুদ্রাটী ছিল তাহা ডাকপিয়নকে দিয়া ভৃত্যকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। পিয়নের ভাগ্য ভাল যে পত্র পাঠের পূর্ব্বে পার্ব্বণী পাইয়া বিদায় লইয়াছে, নতুবা পার্ব্বণীর পরিবর্ত্তে প্রহারের ব্যবস্থা হইত কি না জানিনা। ভৃত্য আসিয়া পত্র দিল।

পত্র দৃষ্টে প্রমোদ ভাবিল হয়তঃ প্রভা প্রফুল্লের পত্রাভ্যন্তরে নিজের পত্র দিয়া থাকিবে, কিন্তু পত্র খুলিয়া সে বিস্মিত হইল। প্রভার পত্র কোথায়? সে কল্পনা করিল পত্নী ইচ্ছা করিয়াই তাহার পত্রের উত্তর দেয় নাই। পিতার আদেশ, ভগ্নীর উপদেশ ও পত্নীর অবমাননা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। যে স্ত্রীকে সে মূর্ত্তিমতী প্রেম বলিয়া জানিত—যে স্ত্রীকে সে তাহার সমস্ত হৃদয়খানি দিয়া ভাল বাসিয়াছে—যাহার অস্ফুটবাক্য সে অগাধ প্রেমের আভাস বলিয়া মনে করিয়াছে সে যে তাহার জন্য ব্যাকুল নহে, এ কথা প্রমোদের আজ প্রথম হৃদয়ঙ্গম হইল। সরলতা প্রভৃতি প্রভার গুণ আজ প্রমোদের নিকট লঘুত্বব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। প্রমোদ বুঝিল না যে প্রভার মৌনতা ইচ্ছাকৃত নহে। সে বুঝিল না যে তাহা অপেক্ষা সরলা প্রভা অনেক নিঃস্বার্থ-ভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছে। প্রভার হৃদয়ের অস্ফুটস্বর প্রমোদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। প্রভার কৌশল ব্যর্থ হইল। যেখানে লোক যতটা প্রত্যাশা করে তাহার বিন্দুমাত্র কম পাইলেও ঈর্শায় জর্জ্জরিত হয়। প্রমোদ কড়ায় গণ্ডায় তাহার ভালবাসার প্রতিদান চাহিল, প্রভা যে প্রতিদান দিতে অনিচ্ছুক ছিল তাহা নহে, সে উপযুক্ত অবসর খুঁজিল। প্রমোদ সে প্রার্থনা মানিল না—তাই বুঝি এই সমস্যা।—

প্রমোদ ব্যথিত চিত্তে মজঃফপুর যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল এবং যে প্রভার চিন্তা তাহাকে এতদিন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল তাহা সবলে ছিন্ন করিতে যত্নবান হইল! যাহার সন্দর্শনেচ্ছায় পিতার আদেশ অমান্য করিতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, সে স্ত্রীর ব্যবহারে তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া গেল। বাস-নার জ্বালাময়ী শিখা প্রমোদের চিত্তে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রভার মৌনতায় সে বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবার উপাদান পাইল না। প্রমোদ বহির্মুখী—প্রভা অন্তঃ সলিলা।

এই ঘটনার পর ৩ মাস কাটিয়া গেল। প্রমোদ একান্ত প্রয়োজন হইলে পিতার নিকট পত্র লিখিত, কিন্তু প্রভাকে কোন সংবাদ দিত না। প্রভা ভাবিল স্বামী অধ্যয়নরতঃ তাই তাহাকে পত্র লিখিবার অবকাশ পাইতেছেন না। প্রভা ও শ্বশুরের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল এবং তাঁহার নিকট লিখিত পত্রে স্বামীর কুশল সংবাদ অবগত হইয়া ভাবীসুখ ও মিলনের আশায় দিনাতিপাত করিতে লাগিল। সন্দেহ কীট প্রমোদের মনে প্রবেশ করিয়া আস্তে আস্তে প্রভার অঙ্কিত মূর্ত্তি কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রমোদ স্ত্রীর কল্পিত কাঠিন্য

হইতে সে কীটের আহার সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। প্রভা এ দুঃসম্বাদ পাইল না।

দেখিতে দেখিতে প্রমোদের পরীক্ষা শেষ হইল। প্রভা দিনরাত ভগবচ্চরণে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিল। প্রমোদ পরীক্ষান্তে শারীরিক অসুস্থতার ভান করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে গমন করিল। প্রভার ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হইল না। স্বামীর অসুস্থতার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া সরলা প্রভা সহজ ভাষায় ২।৩ খানা পত্র লিখিল; সে পত্র প্রমোদের হৃদয় স্পর্শ করিল না। প্রমোদ প্রভাকে ভাবহীন, প্রেমহীন, তাহার অযোগ্যা স্ত্রী বলিয়া মনে করিল। প্রভা তাহার আরাধ্যদেবতার অপ্রত্যাশিত নিস্তব্ধতায় শঙ্কিত হইল।

(৬)

প্রমোদের পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময় হইল কিন্তু সে দেশে ফিরিল না। শারীরিক কুশল জ্ঞাপন করিয়া প্রমোদ পিতাকে পত্র দিল কিন্তু এ কাজ সে কাজের ভাণ করিয়া বিদেশে রহিল। প্রভা শঙ্কিত চিত্তে স্বামীকে ক্রমান্বয় পত্র লিখিতে লাগিল, অবশেষে গভীর বিরক্তিব্যঞ্জক ভাষায় প্রমোদ উত্তর দিল "যাহাকে এতদিন ভুলিয়া রহিয়াছ তাহাকে চিরদিনের তরে ভুলিয়া যাও।"

এই সময়ে অকস্মাৎ প্রভুদাস বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা প্রফুল্লময়ীর আকস্মিক ব্যারামে প্রভা ভীতা হইল এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সেবা করিতে লাগিল। এই শারীরিক পরিশ্রম, আহার নিদ্রার অনিয়মের মধ্যে প্রমোদের পত্র পাইয়া প্রভা মৃত্যুসম যন্ত্রণা বোধ করিল। মাতার ন্যায় শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া কোমল হস্তে প্রফুল্লের গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া ম্লান ওষ্ঠ মৃদু হাসির কম্পনে কাঁপাইয়া প্রভা ধীর গম্ভীর স্বরে এক দিন প্রফুল্লকে বলিল, "বোন্! তোর ব্যামো আমায় দিয়ে তুই সেরে ওঠ্!"

ভগবান প্রভার বেদনাপ্লুত হৃদয়ের কাতোরোক্তি শুনিলেন। প্রফুল্ল অচিরে আরোগ্যলাভ করিল। কিন্তু ব্যথিত প্রভার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। সে জ্বরাক্রান্ত হইল। মর্ম্মন্তুদ মানসিক চিন্তা শারীরিক ক্লেশ অপেক্ষা তাহাকে অধিকতর যন্ত্রণা দিল; যে জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বকিয়া উঠিত। "দেব, আমায় বলিয়া দেও, আমি কি অপরাধে অপরাধী" বিশেষ যত্নের সহিত প্রভুদাস বাবু লক্ষ্মিস্বরূপিণী পুত্রবধূর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করাইতে লাগিলেন এবং পুত্রকে পুত্রবধূর ব্যারামের সংবাদ দিয়া অচিরে মজঃফপুর আসিতে পত্র লিখিলেন।

আজ প্রভার জ্বর কম হইয়াছে, তাই সে শয্যায় বসিয়া প্রফুল্লের সহিত আলাপ করিতেছিল। এমন সময় প্রভুদাস বাবু শশব্যস্তে গৃহে আসিয়া সংবাদ দিলেন "প্রমোদ সম্মানের সহিত পাশ করিয়াছে। এ শুভ সংবাদ শ্রবণে পুলকভরে প্রভার শরীর স্পন্দিত হইল। সে আজ তাহার শারীরিক যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। অন্ধকার গৃহে দুরাগত আলোক-রেখার মত তাহার মলিন আননে আজ হাসির রেখা দেখা দিল, কিন্তু তীব্র মানসিক বেদনার অনুভূতি সে ঈষদ্দীপ্ত বদনখানিকে আবার কালিমায় ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার স্মৃতিপটে আজ বিচ্ছেদকালীন সকল ঘটনা জাগিয়া উঠিল। নিজের দুঃখ ভুলিয়া গিয়া স্বামীর চরণে অজ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে প্রভার চিত্ত ব্যাকুল হইল। রোগগ্রস্থ শরীরের ও চিন্তাকীর্ণ মনের সম্পূর্ণশক্তি একত্রীভূত করিয়া প্রভা আজ প্রাণের বেদনা স্বামীর চরণে নিবেদন করিবার জন্য লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করিল। অনেক চেষ্টায় স্বামীকে লিখিল—

"শ্রীশ্রীচরণেষু—

দেব! তোমার চরণে আমি কি দোষে দোষী জানিনা কিন্তু আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সেই অপরিজ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—ক্ষমা করিবে কি?

এতদিন সাক্ষাৎ হইবার ক্ষীণ আশা হৃদয়ে পুষিতেছিলাম কিন্তু আজ আর তাহা নাই। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে ঐ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতেছি এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিব—জানিনা সে পূজা তুমি গ্রহণ করিবে কি না?

পূজ্যপাদ শ্বশ্রুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ও তোমার আধ্যয়নিক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অনেক দিন নিজকে পত্র লেখার সুখ হইতেও বঞ্চিত করিয়াছি—কিন্তু আজ শেষ চেষ্টা।

আমি আর অধিক দিন তোমাকে ত্যক্ত করিবার অবসর পাইব না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার আশীর্ব্বাণী না শুনিলে আমার মরণ সুখের হইবে না। ইতি—

সেবিকা—

হতভাগিনী প্রভা"

শেষ প্রার্থনা স্বামীর চরণে নিবেদন করিয়া প্রভার হৃদয়ের ভার লঘু হইল। সে প্রফুল্লকে পত্রখানা ডাকে দিতে বলিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। এতদিন এটা ওটা করিয়া মাতা পিতাকে বলিয়া বিদেশে ছিল, এখন কি উপায় অবলম্বন করিবে প্রমোদ ভাবিতেছিল এমন সময়ে পিতার পত্রে পত্নীর অসুখের সংবাদ আসিল। এ সংবাদে তাহার কঠিন প্রাণ কাঁদিল কি না জানি না, তবে একটু উদ্বেলিত হইল—দীর্ঘকাল পরে আবার স্ত্রীর কথা মনে আসিল—।

পিতার পত্র পাওয়া অবধি প্রমোদের মন একটু চঞ্চল হইয়াছে। সে আজ নিভৃত কক্ষে বসিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিন্তা করিতেছিল, বোধ হয় যাকে এক দিনের তরেও সমস্ত হৃদয়খানি দিয়া ভালবাসা যায়, শত চেষ্টার পরও তার স্মৃতি সম্যক মুছিয়া ফেলা যায় না। প্রভার চিন্তা অতর্কিতভাবে আজ প্রমোদের চিত্ত ব্যথিত করিল। সান্ধ্য প্রকৃতির শান্তিময় সংসর্গে প্রমোদের অশান্ত মন আজ বেসুরো বাজিয়া উঠিল। বাহিরে স্নিগ্ধকর মৃদু মলায়ানিল—অনন্ত আকাশের অপূর্ব্ব মহিমা—অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণচ্ছটা—আর প্রমোদের মনে অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রজ্জ্বলিত বহ্নি। বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে তাহার অন্তর মিশিতে চাহিল তাই তাহার মনের ও জড়-জগতের অসামঞ্জস্য আজ প্রমোদের নিকট বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল। চিন্তাস্রোতে যখন প্রমোদের মন এইভাবে মগ্ন, এমনি সময়ে প্রভাবতীর মর্ম্মস্পর্শী পত্র তাহার হস্তে পড়িল। পত্রপাঠের জন্য তাহার আগ্রহাতিশর্য্য দেখিয়া প্রমোদ নিজেই বিস্মিত হইল। পত্রপাঠে প্রমোদ শিহরিয়া উঠিল। পতিগত প্রাণা স্ত্রীর ব্যথিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি আজ তাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিল। আজ সে প্রভার কল্পিত অবমাননার কারণ খুঁজিয়া পাইল। শ্বশুরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া এবং স্বামীর মঙ্গল মানসে যে প্রভা মৌন ছিল এতদিন পরে প্রমোদ আজ তাহা বুঝিল। বহু আয়াসে আত্মসংবরণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার ব্যথিত চিত্ত আজ কোন প্রবোধ মানিল না। অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া প্রমোদ পরদিবস প্রত্যুষের গাড়ীতে মজঃফপুর রওনা হইল।

রাত্র দুইপ্রহরের সময় গাড়ী মজঃফপুর পৌছিল, ষ্টেসন হইতে ২।৩টী পথ দিয়া প্রমোদের বাড়ীতে যাওয়া যাইত, তন্মধ্যে শশ্মানের গাত্র সংলগ্ন পথটী অধিকতর সহজ। অন্যদিন এত রাত্রে একাকী ষ্টেসন হইতে গৃহে যাইতে হইলে প্রমোদ সহজ হইলেও সে পথ দিয়া যাইত কি না সন্দেহ, কিন্তু আজ দেবী দুর্লভ প্রভার স্মৃতি, ব্যথিত প্রমোদের প্রাণে এতই প্রবল ছিল যে সে সেই পথ অবলম্বন করিয়াই দ্রুত পদ বিক্ষেপে চলিতে লাগিল। শশ্মানে জন-

শব্দ শ্রবণে প্রমোদ ভীতচিত্তে অন্তর্য্যামীর নিকট প্রভার মঙ্গল কামনা করিল। শশ্মানের নিকটবর্ত্তী হইলে পরিচিত কণ্ঠস্বর প্রমোদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অপ্রত্যাশিত আশঙ্কায় প্রমোদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে দ্রুত গতিতে শশ্মানে উপস্থিত হইল এবং আলোর সাহায্যে প্রভার মৃত দেহ দর্শন করিয়া বিষজর্জ্জরিত সর্পদংষ্ট ব্যক্তির মত ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিল "দেবী আমি স্ত্রী ঘাতী—আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই।" সেই চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল এবং প্রকৃতির নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি হইল "নাই—নাই—নাই"॥

শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—০—

আমার চসমা।

(১)

বহু বৎসর পূর্ব্বে "দর্শন মাত্র প্রেমে পড়ার" কথা লোকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। কিন্তু যাহারা ইহার ভুক্তভোগী তাঁহারা ইহার অস্তিত্ব কখনই অস্বীকার করিবেন না। নবযুগের অনেক নব্যযুবক একবার মাত্র দেখিয়াই হৃদয়ে তাহার আকস্মিক বৈদ্যুতিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। এরূপ বাস্তব প্রেমোন্মাদনার গভীরতার পরিমাণ করা মানব বুদ্ধির অতীত। আমার নিজ জীবনের অত্যদ্ভুত কাহিনীই ইহার জলন্ত প্রমাণ।

আমার এই কল্পনালেশ বর্জ্জিত আখ্যানটী বিস্তারিত রূপেই বর্ণনা করিতেছি। আমি মিষ্টার সিম্পসন তখন সবেমাত্র একবিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাবিংশতি বর্ষে শুভ পদার্পণ করিয়াছি। তবে সত্য কথা বলিতে কি, আমার পৈতৃক নাম কিন্তু সিম্পসন নয়; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দূরসম্পর্কীয় জনৈক আত্মীয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়ায় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়ের নামানুযায়ী আমার নামেরও এই ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আখ্যানটীতে যখন কিছুমাত্র অপূর্ণতা রাখিতে ইচ্ছা নাই, বিশেষতঃ আমাদের বংশের অত্যাশ্চর্য্য নামসাদৃশ্য বর্ণনা করার প্রলোভনটাও যখন কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়াই আমাকে সকল কথা পাঠকের গোচর করিতে হইল।

আমার নাম নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ক্রৈসার্ট, পিতার নাম মসুর ক্রৈসার্ট ব্যাঙ্কার ক্রৈসার্টের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমার ষোড়শবর্ষীয়া জননী শ্রীমতী ক্রৈসার্টের বয়স বিবাহের সময় ছিল মাত্র পনের। ভিক্টর ভৈসার্টের জ্যেষ্ঠা কন্যাই আমার মাতামহী, পরিণয়কালে বয়স ছিল তাঁর ষোল। আমার প্রমাতামহী শ্রীযুক্তা মৈসার্ট অতি শৈশবকালেই উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধা হন। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন আমার বৃদ্ধা প্রমাতামহী বিবাহের দশ মাস পরেই অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বৎসরে শুভপদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত শ্রীযুক্তাকে কন্যারত্নরূপে অঙ্কে ধারণ করেন। এরূপ বাল্যবিবাহ প্রথা ফরাসী দেশে সচরাচরই প্রচলিত, সুতরাং পাঠক মহাশয়ের অত হাসিবার কারণ কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি হাসেন ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনার বৃদ্ধা প্রমাতামহী আপনার প্রমাতামহীকে দ্বাদশ বর্ষে—দ্বাদশ কেন দশম বর্ষেই যে কন্যারত্নরূপে লাভ করেন নাই, একথা কি আপনি সাহস করিয়া বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন? তবে আপনি যদি তখন সেখানে উপস্থিত থাকিতেন ত সে আলাদা কথা। আর সুন্দরী পাঠিকাকুল, আপনারা যথার্থই মধুর হাসিতে মুক্তার মালা ছড়াইতে পারেন, আর ঐ কুঞ্চিত অলকারাশি এলাইয়া ঈষৎ বঙ্কিম নয়নে চহিলে আমার ন্যায় বৃদ্ধেরও মুণ্ড ঘুরাইতে পারেন। কিন্তু আপনাদিগকেও জিজ্ঞাসা করি—থাক, আর জিজ্ঞাসার দরকার নাই, সেটা আপনারা নিজেরাই মীমাংসা করিয়া লইবেন।

যাক্ সে কথা। আমার চেহারা খানি কিন্তু নিখুঁত ছিল। বর্ণ ঠিক দুধে আলতায় না হইলেও বড় বেশী তফাৎ ছিল না। শতকরা নব্বই জনই মুক্তকণ্ঠে আমার সুন্দর মুখখানির প্রশংসা করিত। আমি খর্ব্বকায় ছিলাম না, লোকে আমাকে দীর্ঘই বলিত; একদিন মাপিয়া দেখিলাম—পাঁচ ফিট্ এগার ইঞ্চি। আমার ঘন, কৃষ্ণ, কুঞ্চিত কেশরাশি অতি যত্নে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। নাসিকাটী 'তিলফুল জিনিয়া' না হইলেও সুন্দর। নয়ন দেখিয়া খঞ্জন না পলাইলেও উহা বেশ বৃহৎ এবং ধূসর। এবং বেশ মনোযোগের সহিত দেখিলেও কেহই বলিতে পারিতনা যে ইহার শক্তি নিতান্তই খর্ব্ব। এজন্য কিন্তু আমাকে সময়ে সময়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত হইতে হইত। নানা প্রকার ঔষধাদি ব্যবহারেও সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়া পাইলাম না, অথচ এই যৌবনজোয়ারের প্রাক্কালে, এই ঈষদোদ্ভিন্ন মসীচিত্রিত গুম্ফদ্বয়ের উপরিভাগে, এমন সুদৃশ্য সরল নাসিকাটীর মধ্যস্থলে তুচ্ছ দুই খণ্ড কাচস্থাপন করার সঙ্কল্পটা যেন আমি জীবন থাকিতে সহ্য করিতে পারিতাম না। চোখের এই

সামান্য একটী দোষে এমন সুন্দর মুখখানাকে কুৎসিৎ করিব? এমন সৌন্দর্য্য-চ্ছটা কি বিচ্ছুরিত হইতে না হইতেই স্বেচ্ছায় আবরণে ঢাকা দিব? অসম্ভব! কাজেই অমন দু'চক্ষের বিষ আমি স্পর্শও করিলাম না।

থাক্, এ সমস্ত ত গেল নগণ্য বাহ্য সৌন্দর্য্যের কথা। আমি কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা জানিবার জন্য হয়তঃ আপনাদের উৎসুক্য হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয় আমি কেবল এক কথায় নিষ্পন্ন করিতে চাহি, আমার স্বভাব সরল, কিন্তু কিছু উদ্দাম, তেজ ও প্রতিজ্ঞা বাঞ্জক, এবং সর্ব্বোপরি আমি আজীবন প্রকৃতির অপূর্ব্বসৃষ্টি নারীজাতির একটী আশ্চর্য্য উপাসক।

(২)

শীতকাল। অথচ চারিটা বাজিতেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। শীত-শিকর সম্পৃক্ত কন্‌কনে বাতাস সশব্দে দরজা জানালা কাঁপাইয়া গায়ে কাঁটা বিঁধাইতেছিল। আমি নিতান্ত জড়সড় ভাবে একখানা বই খুলিয়া বসিলাম। এমন সময় বন্ধুবর ট্যালবট সশরীরে উপস্থিত হইলেন। আমি পুস্তক বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হে ব্যাপার কি? এত দুর্য্যোগে যে?

ট্যালবট একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল, 'চল আজ থিয়েটার দেখে আসি।'

'পাগল, এত ঠাণ্ডায় কি আর বের হওয়া যায়?'

'কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে। আজ ষ্ট্রাগর্ডে থিয়েটারে খুব ধুমধামের সহিত নূতন নাটক 'প্রেমের রাজ্য' অভিনীত হবে। কিন্তু সাবধান, প্রেমের রাজ্য দেখতে দেখতে আবার প্রেমের ফাঁদে পা দিস্‌নে যেন।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'তোমার অযাচিত উপদেশকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার আজ বেরুতে ইচ্ছা নাই।'

মুখ হইতে একরাশ চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করিয়া ট্যালবট বলিল, 'তোকে আলবৎ যেতে হবে। বক্স ভাড়া করা হ'য়ে গেছে, এখন আমি অনর্থক দণ্ড দেব নাকি? বিশেষতঃ আজ সেখানে প্যারীর সুন্দরী শিরোমণিদের বাজার বসিবে, আর তুই মূর্খ এখানে একা বসিয়া কোন্ চঞ্চল নয়নার আরাধনা করবি?'

আমি মহা উৎসাহে বলিলাম, 'বটে, বটে তা হ'লে ত সেখানে যেতেই হচ্ছে, তুই মূর্খ, এতক্ষণ এ কথাটা বলিস্ নি কেন?'

(৩)

চমৎকার অভিনয়। এত সুন্দর, এত প্রাণস্পর্শী যে সেই বিরাট জনসঙ্ঘ, সেই সহস্র সহস্র দর্শক একেবারেই নির্ব্বাক নিস্তব্ধ—সকলেই উদগ্রীব।

'অসামান্যারূপসী ডিউক কন্যা এডিথ আজ পতি মনোনীত করিবেন। অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী যুবরাজের জন্য এডিথকে প্রার্থনা করিতেছেন; এদিকে জর্ম্মানীর নৌসেনা-পতি, টুস্‌ক্যানির ডিউক প্রভৃতি অনেকেই এডিথের প্রেমার্থী, স্থির হইল এডিথ যাঁহাকে পতি মনোনীত করিবেন তিনিই এডিথকে লাভ করিবেন। কিন্তু এডিথ কাহারও কথা শুনিলেন না, কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না; সামান্য কৃষকপুত্র জোসেফ যেখানে অতি সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়াছিলেন, সেই খানে যাইয়া নিঃশব্দে তাঁহারই গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন। অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, টুস্‌ক্যানির ডিউক এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। এমন কি পিতা পর্য্যন্ত কন্যাকে ভয়ানক অভিসম্পাত করিয়া উঠিলেন। সুন্দরী এডিথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জোসেফকে বাহুপাশে বাঁধিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন। অঙ্ক শেষ হইল। পট পতিত হইল।

আমি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এতক্ষণ দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিয়া যাইতেছিলাম, এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম পটমণ্ডপ অসংখ্য নরনারীর মৃদুগুঞ্জনে মুখরিত। এত সুন্দরীর সমাবেশ আমি আর রঙ্গালয়ে কখনও দেখি নাই, ঠিক যেন চাঁদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত সুন্দরীর মধ্য হইতেও আমার মানস মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী কল্পনাময়ী দেবীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। হতাশ হইয়া মুখ ফিরাইতেই অদূরস্থিত রিজার্ভবক্সের প্রতি দৃষ্টিপতিত হইল। সে দিন, সেই মুহূর্ত্তে যাহা দেখিলাম সহস্র বৎসর জীবিত থাকিলেও তাহা ভুলিতে পারিব না। দেখিলাম, এক লোকললামভূতা পূর্ণযৌবনাসুন্দরী আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া অর্দ্ধশয়নাবস্থায় উপবিষ্টা। আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না—অতৃপ্ত নির্ণিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলাম। ঠিক যেন স্বপ্ন-রাজ্যের কোন্ অদৃষ্টপূর্ব্বা মোহিনীমূর্ত্তি যেন নরলোকে সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরী। আমার এতদিনের মানসপ্রতিমাকে আজ খুঁজিয়া পাইলাম।

আমি চাহিয়াই রহিলাম—যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মোহিনীশক্তি প্রভাবে আমি হঠাৎ প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছি। 'দৃষ্টি মাত্র প্রেমে পড়ার' সত্যতা এইবার অমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে অপলকনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুন্দরী লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু অর্দ্ধদণ্ড যাইতে না যাইতেই তিনি আবার আমার দিকে চাহিলেন। আবার আমার দৃষ্টির সহিত তাঁহার

দৃষ্টি মিলিত হইল। এবার তাঁহার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমি সেই প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহাকে ভাল বাসিয়া ছিলাম, এক্ষণে সেই ভালবাসা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। যেরূপেই হউক তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম, সেই বিপুল জনসমুদ্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া যদি সম্ভবপর হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই সুরসুন্দরীর নিকটস্থ হইতাম। অগত্যা তাঁহার রূপমাধুরী সুস্পষ্ট দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার দৃষ্টি শক্তি তেমন প্রবল নহে, কাজেই একখানা দুরবীণের জন্য পার্শ্বোপবিষ্ট ট্যালবটের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, সে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন সে এ জগতেরই নয়। আমি তাহার এই গভীর ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিলাম, বলিলাম, "ট্যালবট শীঘ্র আমাকে তোমার দূরবীণ খানা দাও"।

'দুরবীণ?' ট্যালবট বিস্মিত হইয়া বলিল, "দূরবীণ? না, আমি দুরবীণ আনি নাই" এই বলিয়াই সে অধীর ভাবে পুনরায় রঙ্গমঞ্চের দিকে মুখ ফিরাইল।

আমি দক্ষিণহস্তে তাহার স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, 'আঃ, শোনই না! ঐ বক্সের দিকে তাকাও দেখি—ঐ—ঐদিকে—না, ওর পরের টা—হাঁ অমন সুন্দরী তুমি আর কখনও দেখিয়াছ কি?'

'হাঁ, খুবত সুন্দরী, তাহে কোনও সন্দেহ নাই।'

'আমি কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেছি। কে ইনি?'

'সেকি? এমন সুন্দরীকে তুমি চেননা?'

'না, চিনিনা, কিন্তু কে ইনি?

'ইনিই সেই বিখ্যাতা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা ম্যাডাম ল্যালান্দী। সমগ্র সহরেই যে আজ কাল এঁর কথা! অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী—তায় আবার বিধবা—যদি কখনও বিবাহ করিতে হয় ত ইঁহাকেই! এই অল্প দিন হইল প্যারী হইতে আসিয়াছেন।'

'তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?'

'হাঁ, সে সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে বটে।'

'আমাকে পরিচিত ক'রে দেবে?'

'নিশ্চয়ই, খুব আনন্দের সহিত; কখন?'

'কাল, একটার সময়। আমিই তোমার বাসায় যাব।'

'বেশ। কিন্তু যদি পার ত জিভ্‌টাকে এখন একটু বিশ্রাম করাও।'

আমাকে বাধ্য হইয়াই ট্যালবটের পরামর্শ মানিয়া চলিতে হইল। কারণ সে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত অভিনয়ে চিত্ত নিবিষ্ট করিল, আমি যত কথা বলিলাম, তাহার এক বর্ণও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা সন্দেহ। অগত্যা আমিও চুপ করিয়া অভিনয়ে মন দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারেই নয়ন দুইটী ম্যাডাম ল্যালান্দীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, বক্সে তিনি একা নহেন, সঙ্গে আরও দুইজন—একজন পুরুষ, অপরটী যুবতী। যুবতী অতুলনীয়া সুন্দরী। যদি আমি ল্যালান্দীকে না দেখিতাম তাহা হইলে আমার উদ্দাম হৃদয়ের সমস্ত প্রেম নিশ্চয় ইহারই চরণে বিলাইয়া দিতাম। কিন্তু তাহা হইল না, বিধাতার সে উদ্দেশ্য নহে বলিয়াই অতুল রূপৈশ্বর্য্যশালিনী ল্যালান্দী আমার মন হরণ করিলেন। আমি আত্মহারা হইয়া তাঁহার সেই রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলাম। এমন সময় ল্যালান্দী আবার মুখ ফিরাইলেন, আবার সেই ইন্দীবর নয়ন যুগল আমার নয়নের সঙ্গে মিলিত হইল। এই বার আমি তাঁহাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। হঠাৎ যেন আমি একটু অস্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম। যেন মনে হইল এত রূপের মধ্যেও কি যেন কি একটু অভাব রহিয়া গেছে, কিন্তু কি যে সেটুকু তাহা কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না—যেন দুর্ব্বোধ্য একটা কিছু। কিন্তু এত রূপেরও ত্রুটী আছে? এ কি সম্ভব! বুঝিলাম, আমার প্রেমের এই অভাবণীয় আকুল আগ্রহে হঠাৎ আমার মস্তিষ্কটা বড়ই উত্তেজিত হইয়াছে, এই অদ্ভুত আশঙ্কা তাহারই ফল—অথবা আমার দৃষ্টিশক্তির অসাধারণ খর্ব্বতাই ইহার অন্যতম কারণ।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুন্দরী তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে আমাকে দেখিতেছিলেন,—সে দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে মনে হইল তিনি দর্পণের ন্যায় আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতেছেন। আমি বড়ই বিচলিত হইলাম। হঠাৎ আমি চমকিয়া উঠিলাম, সম্মুখে কাকড়া বিছা দেখিলে, কিংবা ভীষণ অজগর সর্পের উদ্যতফণা দেখিলে, অথবা পাদমূলে বজ্র পতিত হইলে, মানুষ যেরূপ সহসা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, আমিও সেইরূপ অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, সেই রূপসী—আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত মানস-প্রতিমা—আমার এতদিনের সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্বা স্বপ্নসুন্দরী আপন পার্শ্বে ঝুলান ডবল চসমা জোড়া চোকের কাছে ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকারে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি বড়ই অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলাম। যদি অন্য কোন রমণী হইত, তাহা হইলে আমি আপনাকে নিরতিশয় অবমানিত বোধ করিতাম। কিন্তু ল্যালান্দী অতি উচ্চ-

বংশের পরিচায়ক গাম্ভীর্য্য ও স্থিরতার সহিত এতটুকু ইতস্ততঃ না করিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এমন ভাবে চসমা উদ্যত করিয়া রহিলেন যে, আমি রাগ করিবার কিছুই পাইলাম না, পরন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচে বড়ই মুষড়িয়া গেলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইয়া গেল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু পারিলাম না। যেন কোন যাদুকরের যাদু প্রভাবে আমি নিশ্চল নিথর হইয়া গেলাম। আমার পলকহীন দৃষ্টি উদ্যতই রহিয়া গেল।

আমেরিকার একটা বিখ্যাত রঙ্গালয়ের মাঝখানে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে একটা মৃদু কোলাহল উত্থিত হইল। সেই যুগপৎ ফিস্‌ফিস্ শব্দে ও চাপা হাসিতে আমি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। কিন্তু ল্যালান্দী তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। পূর্ণ পাঁচ মিনিট সময় অতিবাহিত হইল। ল্যালান্দী ধীরে ধীরে চসমা নামাইলেন। মৃদু হাসিতে তাঁহার কমনীয় কান্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আরক্তিম গণ্ডস্থলে যেন সন্তোষের রেখা প্রকটিত হইল। ধীরে ধীরে তাঁহার নয়ন যুগল আপনিই অবনত হইয়া আসিল। তিনি মুখ ফিরাইলেন। বুঝিলাম, এবার তিনি অভিনয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়াও যখন দেখিলাম তিনি আর মুখ ফিরাইলেন না, তখন আমিও অগত্যা রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকাইলাম।

ল্যালান্দী নিবিষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতেছেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার মুখ রঙ্গমঞ্চের দিকেই আছে বটে, কিন্তু তিনি বক্র-নয়নে আমাকেই দেখিতেছেন। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড আমাকে এইরূপ বক্র-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি সঙ্গী যুবকের সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভাবভঙ্গিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমিই তাঁহাদের উপলক্ষ্য। কথা শেষ করিয়া ল্যালান্দী পুনরায় সেই সাক্ষাৎ বিষধর তুল্য চসমা তুলিয়া সেই ধীর স্থিরভাবে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অমন সুন্দরীর এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহারেও এবার কিন্তু আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলাম না, বরং অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিলাম। ভালবাসায় আমাকে এমনই অন্ধ করিয়া ফেলিল যে, আমি স্থান, কাল, পাত্র সমস্ত ভুলিয়া গেলাম—আমার নয়ন সমক্ষে কেবলই ভাসিতে লাগিল ল্যালান্দীর সুন্দর মুখখানি। ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মস্তক অবনত হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই

অবনত মস্তকে করস্পর্শ করিয়া আমি ল্যালান্দীকে আমার হৃদয়ের সুগভীর প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ সর্ব্বপ্রথম অভিবাদন করিলাম।

লজ্জায় ল্যালান্দীর গণ্ড ও কপোলদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তার পর সঙ্গীর দিকে ঝুকিয়া পড়িলেন।

বুঝিলাম, আজ এই প্রথম মুহূর্ত্তে, এই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে ল্যালান্দীও আমার অপরিসীম ভালবাসার প্রতিদান করিলেন। হাঁ, নিশ্চয়ই বলিতে হইবে ল্যালান্দীও আমাকে ভালবাসিয়াছেন। নতুবা আমার সেই অসভ্যজনোচিত ব্যবহারে নিশ্চয়ই তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। আজ 'দৃষ্টিমাত্র প্রেমে পড়ার' অস্তিত্ব এইবার আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম। যাঁহাকে জীবনে কখনও দেখি নাই—স্বপ্নেও যাঁহাকে দেখিবার কোন আশা করি নাই—ভ্রমেও যাঁহার নাম কোন দিন আমার কর্ণকুহর চরিতার্থ করে নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম; দেখিয়াই ভালবাসিলাম। কি গভীর সে ভালবাসা! তায় আবার সেই ভালবাসার প্রথম মুহূর্ত্তেই প্রতিদান! আর ভাবিতে পারিলাম না। আমি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম।

(৪)

রজনী অবসান প্রায়। উপরে হীরক খচিত অনন্ত নীলাকাশে চন্দ্র হাসিতেছিল। প্রশস্ত রাজপথের শীতলসমীর স্পর্শে আমার উত্তেজিত মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হইল। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। আমি আপন মনে সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

এমন সময় ট্যালবট সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "কি হে, ব্যাপার কি? তোমাকে অত চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন?"

আমি চলিতে চলিতে বন্ধুর হাত আপন হাতে লইয়া বলিলাম, "মনে থাকে যেন ট্যালবট, আজ একটার সময় তুমি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবে।"

ট্যালবট একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার কাছে?"

বন্ধুর কথায় আমি বড়ই বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "সে কি? এর মধ্যেই ভুলিয়া গেলে? কেন, তুমি কি আমাকে ম্যাডাম ল্যালান্দীর সহিত পরিচিত করিয়া দিবে না?"

"ওঃ, তুমি এখনও সেই কথাই ভাবিতেছ? আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝিবা অভিনয়ের চমৎকারিত্বে তোমার মনে এই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।"

তার পর সে আপনমনে বলিতে লাগিল, "আঃ, কি চমৎকার অভিনয়ই দেখিলাম। কিন্তু জোসেফের কি অন্যায়! এমন প্রেমময়ী পত্নীকেও কষ্ট দিতে হয়? জোসেফ—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম "যথেষ্ট হইয়াছে, আর সে ছোট লোকটার কথা মুখে আনিও না। এমন সুন্দরী, এমন গুণবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যে নগণ্যা পতিতা রমণীকে লইয়া পলায়ন করে সে পাষণ্ডের নাম মুখে আনিলে ও পাপ হয়। আর তা'রই বা দোষ কি? চাষার ছেলে সুন্দরী পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমের মহিমা কি বুঝিবে? বানরে কি কখনও মুক্তার কদর বোঝে?

"তুমি বল কি? বানর? কে বানর? জোসেফ—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "যাক্, সে কথা ছাড়িয়া দাও। শোন, আমার কথার উত্তর দাও। ল্যালান্দী প্যারী হইতে কবে আসিয়াছেন? তাঁহার সঙ্গে কতজন লোক? যেরূপ ধনী তাহাতে নিশ্চয়ই একটা খুব সুন্দর বড় বাড়ীতে আছেন? সে বাড়ীটা কোথায়? এখানে হইতে শীঘ্র ফিরিবেন না ত? হাঁ, ভাল কথা। তুমি না বলিয়াছিলে তিনি বিধবা? কিন্তু ইতিমধ্যে আর কেহ তাঁর মন হরণ করে নাই ত?"

হাসিয়া ট্যালবট উত্তর করিল, "আঃ, তুমি দেখি আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে একেবারেই ডুবাইয়া দিলে। আমি ত আর ভারতের উপন্যাস বর্ণিত শেষ নাগ নই যে একসঙ্গে সহস্র মুখে তোমার সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিব?" এক এক করিয়া বল তোমার প্রশ্নের যথা সম্ভব সদুত্তর দিতেছি।"

"আচ্ছা, এখন বল, ল্যালান্দী কবে এখানে আসিয়াছেন?"

"এই প্রায় এক সপ্তাহ হইল তিনি শুভ পদার্পণে এই সহরকে ধন্য করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, যদিও আমেরিকায় সুন্দরীর অভাব নাই, তথাপি ম্যাডাম ল্যালান্দীর কাছে তাহাদের রূপ নিতান্তই নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হয়।"

"হাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। ল্যালান্দী আশ্চর্য্য সুন্দরী। এমন সুন্দরী আমি আর কখনও দেখি নাই। তিনি এখন কোথায় থাকেন?"

'১৭ নং গ্যালভিন স্কোয়ারে। স্কোয়ারের ঠিক পশ্চিমদিকের সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ীটাই তাঁর—যে বাড়ীটার সম্মুখেই একখানা অতি সুন্দর ফুলের বাগান।'

'তাঁহার সঙ্গে আর কে কে আছেন?'

'লোক বেশী নয়। একজন বৃদ্ধা আত্মীয়া অভিভাবিকা, আর জন কয়েক

পরিচারক পরিচারিকা। আঃ থিয়েটারে যে এঁরা এক জায়গায়েই বসিয়াছিলেন? তুমি কি দেখ নাই?"

'না আমার দৃষ্টি অন্যদিকে বড় ছিল না। আমি কেবল ল্যালান্দীকেই দেখিতেছিলাম।

ট্যালবট ছড়া গাঁথিয়া -সুর করিয়া বলিল, বুঝিয়াছি, "এতদিনে পা দিয়েছ বন্ধু প্রেমের ফাঁদে।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'ওহে, থাম, থাম। রহস্যের সময় এ নয়, শোন, আমাকে পরামর্শ দাও, কিসে এ রমণীরত্ন লাভ করা যায়? শেষে আমার বামনের চাঁদ ধরিতে যাওয়ার মত নিস্ফল চেষ্টা হইবে না ত?' আমি বেশ জানিতাম যে ল্যালান্দীও আমাকে ভালবাসিয়াছেন, তবু যে এ কথাটী বলিলাম, তা শুধু বন্ধুর মন বুঝিবার জন্য।

ট্যালবট সাহাস্যে উত্তর করিল, 'না হে কোনো ভয় নাই। সুন্দরী শিক্ষিতা ও বেশ রসিকা, তিনি তোমার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-উপাধি প্রাপ্ত সুন্দর ধনাঢ্য যুবককে কখনই নিরাশ করিবেন না। প্রায় তিন বৎসর হইল বিবাহের ছয় মাস পরেই তিনি বিধবা হইয়াছেন। তদবধি ঝাঁকে ঝাঁকে ভৃঙ্গ সেই প্রস্ফুটিত কমলের মধুপানে ব্যগ্র হইলেও তিনি এ যাবত কাহাকেও সে অধিকার দেন নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।'

'দেখি কতদুর কি করিতে পারি। কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই আবার এখান হইতে চলিয়া যাইবেন না ত?'

'আরে না না। তাঁহারা এই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় পা দিয়াছেন। অন্ততঃ দু একমাস তাঁহারা এখানে অবশ্যই থাকিবেন। অত উতলা হইতেছ কেন? আগামী কল্য একটার সময় আমার ওখানে যাইও। জোসেফ যেরূপ অশ্বারূঢ়া ভয়াবিহ্বলা এডিথকে একবার দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তুমিও যে দেখি ঠিক সেইরূপ দৃষ্টিমাত্রই ল্যালান্দীর রূপে মুগ্ধ হইলে!'

আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, 'আরে রেখে দাও তোমার জোসেফ। সেই বদ্‌মায়েসটার সঙ্গে শেষে কি আমার তুলনা করিলে?'

নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ট্যালবট বলিল 'বদমায়েস! সেকি? জোসেফ বদমায়েস? তা'হলে এ জগতে প্রেমিক কে? নিশ্চয়ই তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, আর না হয়ত তুমি অভিনয় দেখই নাই।"

"না, না আমার মস্তিষ্ক কেন বিকৃত হইতে যাইবে? তবে সত্য কথা বলিতে কি আমি অভিনয়ে আদৌ মনোযোগ দেই নাই। ছদ্মবেশী যোদ্ধা এডিথকে শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর যে কি হইয়াছে তাহা আমি কিছুই জানি না।'

"বটে? 'আপন প্রেমে আপনি পাগল', তুমি দেখবে কি?' তোমার হৃদয় ল্যালান্দীর স্বর্গীয়রূপে মুগ্ধ তখন কি আর অভাগিনী এডিথের কথা মনে থাকে? হাঁ, আমারই ভুল হইয়াছে। এ সহজ কথাটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

তখন পূর্ব্বাকাশ লোহিত-রাগরঞ্জিত হইয়া উষা সুন্দরীর আগমন ঘোষণা করিয়া দিল। পক্ষীগণ কলরবে কুলায় ত্যাগ করিতে লাগিল। আমি বন্ধুর কাছে বিদায় লইয়া—বিদায়কালে ল্যালান্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া ভিন্ন পথে বাটী প্রত্যাগমন করিলাম।

(৫)

কি নিদারুণ উদ্বেগেই যে সময় কাটাইলাম, তাহা আর লিখিয়া পাঠকগণের বিরক্তি আকর্ষণ করিতে চাহিনা, ফল কথা বারোটা বাজিতেই পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। তারপর ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, সাড়ে বারোটা বাজিতে তখনও দশ মিনিট বাকী। অগত্যা চিরুণীখানা লইয়া মুকুরে মুখ দেখিতে লাগিলাম। নানা কৌশলে, নানা ছাঁদে কেশগুচ্ছ পরিপাটীরূপে দ্বিধা বিন্যস্ত করিলাম। তার পর অধীরভাবে গৃহের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলাম।

সাড়ে বারোটা বাজিতেই ছড়িগাছটা হাতে লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। আমার মনে তখন আশা ও নিরাশা সমভাবে স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে কুহকিনী আশাই জয়লাভ করিল।

ভাবিতে ভাবিতে ট্যালবটের বাটীর সম্মুখে আসিয়া আমার চিন্তাস্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িল। দেখিলাম ভিতর হইতে বাটীর দ্বার অর্গলবদ্ধ। এ সময়ে দ্বার বন্ধ কেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ আমি যে এ সময় এখানে আসিব তাহাত আর ট্যালবটের অজ্ঞাত নহে! যাহাই হউক সন্দিগ্ধভাবে ঘণ্টা বাজাইতেই একজন চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

আমি ট্যালবট কোথায় জিজ্ঞাসা করিতেই লোকটা দীর্ঘ এক সেলাম ঠুকিয়া উত্তর করিল, 'আজ্ঞে তিনি বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন।'

আমি চমকিত হইয়া দুই পদ পিছাইয়া গেলাম, বলিলাম, 'বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন ? অসম্ভব ! আজ আমার ঠিক একটার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসার কথা, আর তুমি বলিতেছ সে বাটী নাই। নিশ্চয়ই সে এখানে আছে।'

'না মহাশয়, আমি মিথ্যা বলিতেছি না। তিনি প্রাতরাশের পরেই অশ্বা-রোহণে 'সিফালকো' চলিয়া গিয়াছেন, আর বলিয়া গিয়াছেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আর বাড়ী ফিরিবেন না।'

রাগে ও দুঃখে আমি প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া গেলাম। আমি কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া, মনে মনে ট্যালবটকে জাহান্নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া নিতান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাটীর দিকে ফিরিলাম। আমি স্পষ্টই বুঝিলাম, ট্যালবট আপনার প্রতিজ্ঞার কথা মুহূর্ত্ত পরেই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে ত আর কোনো দিন কথার খেলাপ করিতে দেখি নাই! বুঝিলাম আমার অদৃষ্টবৈগুণ্যে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

চলিতে চলিতে পথে আমার পরিচিতদের মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিলাম সকলকেই ম্যাডাম ল্যালান্দীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম ল্যালান্দী সকলের নিকটেই পরিচিতা, কিন্তু দুঃখের বিষয় ল্যালান্দীর সঙ্গে তাহাদের কাহারও পরিচয় নাই। সকলেই কিন্তু একবাক্যে তাহার অপরিসীম রূপগুণের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। ঠিক এমন সময় দেখিতে পাইলাম একখানা প্রকাণ্ড খোলা জুড়ি গাড়ী আমাদের দিকে আসিতেছে। দেখিলাম গাড়ীর মধ্যে আমারই প্রাণপ্রতিমা—সঙ্গে কল্যকার সেই অল্পবয়স্কা সুন্দরী। গাড়ী-খানা নিকটবর্ত্তী হইলে বুঝিলাম ল্যালান্দী আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মধুর ওষ্ঠে আবার সেই চাপা হাসি দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা আমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলেই মুক্তকণ্ঠে ল্যালান্দীর রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। একজন বলিল, কি সুন্দর, ঠিক যেন সৌন্দর্য্যের রাণী! যেন শাপভ্রষ্টা স্বর্গবিদ্যাধরী!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, সঙ্গিনীও কিন্তু বড়ই চমৎকার সাজিয়াছেন। পোষাকের গুণে তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে।'

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আরে রেখে দাও। কৃত্রিম বেশভূষার চটকে খাঁটী মানুষ কখনও ভুলে না।'

প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'কিন্তু তা বলিয়া তিনিও যে খুবই সুন্দরী এ কথা কিন্তু অস্বীকার করার যো নাই।

এইরূপে প্রত্যেকেই আপনাপন মত প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। বুঝিলাম আমাকে অগত্যা ট্যালবটেরই প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

(৬)

কিন্তু ট্যালবট ফিরিল না। পত্রে জানাইল তাহার ফিরিতে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ লাগিবে। এদিকে আমিও আর আমার উদ্দামহৃদয়ের প্রেমরাশি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। আমি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলাম। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল হয়ত বা ল্যালান্দী হঠাৎ আমেরিকা ত্যাগ করেন; অথবা আমার বিলম্ব দেখিয়া আমাকে অপ্রেমিক মনে করিয়া অন্য কাহাকেও হৃদয় দান করিয়া ফেলেন। দুশ্চিন্তার তাড়নে আমি একান্ত অধীর হইয়া পড়িলাম। অবশেষে ঠিক করিলাম অযাচিতভাবেই তাঁহাকে পত্র লিখিব।

আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, আমার সমস্ত চিন্তা একটীর পর একটী করিয়া সাজাইয়া পত্রখানি লিখিলাম। পত্রে কিছুমাত্র কপটতা—বিন্দুমাত্র অপ্রকাশ রহিল না। কিরূপে আমি তাঁহাকে দেখিয়াই ভাল বাসিয়াছি—সে ভালবাসা কত গভীর! তার পর আমি বুঝিয়াছি তিনিও আমাকে ভালবাসিয়াছেন—সেই চসমা দিয়া আমাকে নিরীক্ষণ—আমার অভিবাদন—তাঁহার প্রতিদান প্রভৃতি সকল কথাই আমি সুন্দর ভাষায় সরলভাবে বর্ণনা করিলাম। তারপর চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া দিয়া আশা-নিরাশোদ্বেল-হৃদয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে উত্তর আসিল। হাঁ, সেই কোমলকরাঙ্কিত অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত ক্ষুদ্র লিপি অবশেষে সত্য সত্যই আমার হস্তগত হইল। আমি অধীর ভাবে আনন্দে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলিয়া পাঠ করিলাম। পত্রখানা এইরূপ:—

"আমি এই সবে মাত্র এ দেশে আগমন করিয়াছি, এখনও এ দেশের ভাষা আমি শিখিয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং আমি যে এই সুন্দর ভাষা উত্তমরূপে লিখিতে পারিলাম না, আশা করি মসুর সিম্পসন সেজন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

সিম্পসনের অনুমান সম্পূর্ণ সত্য, একথা অস্বীকার করিতে আমি অক্ষম। বোধ হয় আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। যাহা বলিবার নয় তাহাও কি আমি বলি নাই?

ইউজিনী ল্যালান্দী।"

চিঠিখানি আমি সহস্র বার চুম্বন করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। ল্যালান্দীও যে আমাকে ভালবাসিয়াছেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া ট্যালবটকে চিঠি লিখিলাম, যেন সে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও একবার এখানে ফিরিয়া আসে। শীঘ্রই তাহার উত্তর পাইলাম। সে পেন্সিল দিয়া আমারই চিঠীর অপর পৃষ্ঠে এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছে,—

"বিশেষ কার্য্যে লিপ্ত—'সিফালকো' ত্যাগ করিলাম, কোথায় থাকিব বা কবে ফিরিব স্থিরতা নাই—আমাকে ক্ষমা কর। তাড়াতাড়িতে ইতি। ট্যালবট।"

বুঝিলাম আর হতভাগার প্রতীক্ষা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। কিন্তু কিরূপে, কোন ছলে ল্যালান্দীর সহিত দেখা করিব ভাবিয়া স্থির করিত পারিলাম না। অবশেষে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম ল্যালান্দী প্রত্যহ অপরাহ্নে একজন নিগ্রো দাসকে সঙ্গে লইয়া স্কোয়ারে ভ্রমণ করেন।

পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সেই স্কোয়ারে একটী ক্ষুদ্র কুঞ্জের সম্মুখে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। ল্যালান্দীর ইঙ্গিতে নিগ্রোটা দূরে সরিয়া গেল। তখন আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। প্রেমের গুঞ্জনে পরস্পর পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলাম। ল্যালান্দী ভাল ইংরেজী বলিতে পারেন না বলিয়া আমরা ফরাসী ভাষায়ই কথোপকথন করিতে লাগিলাম। আমাদের কথা আর ফুরায় না! দূরাগত সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় ল্যালান্দীর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। আমি তাঁহাকে শীঘ্র বিবাহে অনুমোদন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এত তাড়াতাড়ি কেন? তাড়াতাড়ি বিবাহের পরিণাম কখনও ভাল হয় না। বিশেষতঃ এখনও তুমি জানিতে পার নাই আমি কে, আমার অবস্থা কিরূপ, আমি ভদ্রকুলোদ্ভবা কিনা এবং সর্ব্বোপরি আমার স্বভাব কি প্রকার! এ সকল কি অগ্রে তোমার জানিয়া লওয়া উচিত নহে?'

আমি আবেগভরে বলিতে লাগিলাম, 'আমি শুধু এই মাত্র জানি তুমি ইউজিনী ল্যালান্দী, তুমি আমার ইহকাল, পরকাল—তুমি আমার সর্ব্বস্ব।

আমি আর কিছুই জানিতে চাহি না। তুমি ধনীই হও আর দরিদ্রই হও, অতি উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাক অথবা নীচকুলোদ্ভবই হও, তাহাতে আমার কিছুই যায় আসে না, তুমি যাহাই কেন হওন. ইউজিনি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়ানন্দদায়িনীই থাকিবে।

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিবাহে কিছু অসামঞ্জস্য থাকিবে না ত?'

আমি বুঝিলাম ল্যালান্দী পরোক্ষে বয়সের কথা তুলিতেছেন। এ কথাকে আর ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বয়সের তারতম্য অবশ্যই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। জগতের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, 'স্বামীর বয়স, স্ত্রীর বয়স অপেক্ষা কয়েক বছরের বড় হওয়া একান্ত আবশ্যক। এমন কি স্বামী যদি পনের কিংবা বিশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠও হন, তাহাও বরং ভাল।' কিন্তু ল্যালান্দী বলিলেন, 'অন্ততঃ স্ত্রীর বয়স স্বামীর চেয়ে বেশী না হয় এটা অবশ্যই দেখা উচিত। কিন্তু তোমার বয়স এই বাইশ বছর—তা হউক। সিম্পসন, তোমাকে পাইবার জন্য আমি কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহি।'

ল্যালান্দীর গুণাবলী দর্শনে আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, ল্যালান্দী আমাপেক্ষা বয়সে কিছু বড় হইবে, নতুবা এ কথা বলিত না। আমি প্রেমাপ্লুত-হৃদয়ে গদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলাম, 'ইউজিনি, প্রাণাধিকা ইউজিনি, তুমি একি বলিতেছ? জগতে ত প্রতিনিয়তই এইরূপ বিবাহ সংঘটিত হইতেছে। সত্যবটে আমার বয়স বাইশ বছর কিন্তু তা বলিয়া তুমি—তুমি—তুমি আমার চেয়ে—আমার চেয়ে—না হয় আমার চেয়ে এই বড় জোর—'

আমি একটু থামিলাম, ভাবিলাম, ল্যালান্দী নিজের বয়স নিজেই বলিবেন। কিন্তু ফরাসীরমণীগণ মুখে বড় সহজে কোন প্রশ্নের উত্তর দেন না, উত্তরস্বরূপ প্রায়ই তাঁহারা হাতে কলমে কোন কিছু করিয়া থাকেন। তাই ল্যালান্দীও মুখে কিছু বলিলেন না। বসনাভ্যন্তর হইতে আপনার একখানা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বাহির করিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন, বলিলেন, 'এইটী গ্রহণ কর, আমার অনুরোধে এই সামান্য জিনিষটী গ্রহণ কর। এখন অন্ধকার হইয়াছে, বাসায় যাইয়া অবসরক্রমে দেখিও—তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।'

আমি ফটোখানা একবার দুইহাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তার পর ধীরে ধীরে পকেটে রাখিলাম। ল্যালান্দী বলিলেন, 'এস মশুর, আজ সন্ধ্যাটা না হয় আমার ওখানেই কাটাইলে? দুই চারিটা গান শুনাইয়া তোমাকে একটু খুশী

করিতে পারিব বোধ হয়। ফরাসীরমণীগণ তোমাদের ন্যায় অত বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকে না। তাহারা অবসর ক্রমে একটু গান বাজনাও শিক্ষা করিয়া থাকে।'

এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে আমার বাহু আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলাম।

কি সুন্দর সে প্রাসাদ তুল্য বাড়ীখানা! যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাচিত্রিত একখানা মনোহর দৃশ্যপট! বাড়ীখানা এমন সুসজ্জিত যে তাহাতে ক্রটী ধরিবার মত কিছুই পাইলাম না।

আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকার হইতে হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোকে প্রবেশ করায় আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ল্যালান্দী হাসিয়া আপন হস্তে আলোটা অত্যন্ত মন্দীভূত করিয়া দিলেন! আমি রুমালে চোখ মুছিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। আমার হৃদয় ল্যালান্দীর প্রতি অগাধ প্রেমে পূর্ণ।

সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এমন সুন্দর সঙ্গীত আমি বহুদিন শুনি নাই। দেখিলাম ল্যালান্দীর সঙ্গিনীগণ সকলেই সুগায়িকা।

আমাদের একটু দূরেই ল্যালান্দীর সেই রূপসী সঙ্গিনীটি অপর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি দেখিলাম যুবতী অতুলনীয়া রূপসী। সে স্থির, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের দিকে স্বভাবতঃই চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়! আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ল্যালান্দী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এক দৃষ্টে ও কি দেখিতেছ?'

আমি চুপি চুপি বলিলাম, 'তোমার সঙ্গিনীটিও দেখিতেছি আশ্চর্য্য সুন্দরী। এতরূপ আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই।' তারপর ল্যালান্দীর দিকে প্রেম পূরিত নয়নে চাহিয়া বলিলাম, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে সেজন্য তুলনা হয় না।'

ল্যালান্দী যেন একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। এইবার ল্যালান্দীর গাহিবার পালা আসিল। অগত্যা তিনি উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই রূপসী সঙ্গিনী ও অপর দুই তিন জন মহিলা উঠিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে পরদার অন্তরাল হইতে পিয়ানোর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া ল্যালান্দী সকলের কর্ণে অমৃতসিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

সে কণ্ঠ এত মিষ্ট যে আমার ভ্রম হইতে লাগিল যেন ল্যালান্দীর স্বাভাবিক

স্বর এত মিষ্ট এত সুধাবর্ষী নহে। তাঁহার কণ্ঠ যেন আর একটু মোটা—আর একটু চাপা। ফল কথা, এমন চমৎকার এমন চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত—এমন মিষ্ট কণ্ঠ আমি আর জীবনে কখনও শুনি নাই। তারপর কত বছর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সুমিষ্ট কণ্ঠ—সেই 'প্রাণের তারে বাঁধিয়া তারে' আজও আমার হৃদয়তারে ঝঙ্কার দিতেছে। আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত সুধা পান করিতে লাগিলাম।

সঙ্গীত থামিয়া গেল! ল্যালান্দী পুনরায় আমার পার্শ্বে আপন আসন অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সুমিষ্টকণ্ঠ আমার প্রাণে তখনও এমন মিষ্ট বাজিতেছিল যে আমি কি বলিয়া যে তাঁহার প্রশংসা করিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম।

তারপর আমরা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বারান্দায় আসিয়া পদচারণা করিতে লাগিলাম। ল্যালান্দী নানা কথার অবতারণা করিলেন। আমিও প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আমার অতীত জীবনকাহিনী সমস্ত বিবৃত করিলাম। কিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের পর বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছি, তারপর দৈন্যতা প্রযুক্ত আমি চাকরী লইতে বাধ্য হই—কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় আমি ক্রোধে কর্ম্ম পরিত্যাগ করি—কিরূপে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ি—কিরূপে দূর সম্পর্কীয়া জনৈকা আত্মীয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়া আমি আবার সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছি—তারপর আমার ক্ষুদ্র বৃহৎ দুষ্কার্য্যের কথা, আমাদের বংশানুক্রমিক বাতরোগের কথা, প্রভৃতি সমস্তই আমি তাঁহাকে অকপটে জানাইলাম। কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি যে তেমন প্রবল নহে তাহা আমি কিছুতেই প্রকাশ করিলাম না।

ল্যালান্দী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'মন্থুর, তোমার এই পুরুষানুক্রমিক রোগের কথাটা আপত্তিজনক বটে, কিন্তু তুমি কি দেখ নাই আমারও একটা বিষম শারীরিক ক্রটী আছে? দেখ নাই কি সেদিনকার সেই রঙ্গালয়ে—'

ল্যালান্দী এইখানে একটু থামিলেন, লজ্জায় তাঁহার কপোল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তারপর তিনি সেই ডবল চসমা জোড়া বাহির করিয়া বলিলেন, 'মন্থুর, মনে পড়ে কি?'

এতক্ষণে আমার সকল ঘটনা মনে পড়িল। বুঝিলাম ল্যালান্দীর দৃষ্টিশক্তি ও তেমন প্রবল নহে। আমার বড়ই লজ্জা হইতে লাগিল, এমন সরলারমণীর

কাছেও আমি আমার চোখের কথা গোপন করিয়াছি? আমি অনুতপ্তস্বরে বলিতে লাগিলাম, 'তাহাই যদি বলিলে ল্যালান্দী, ত শোন, আমার দৃষ্টিশক্তিও বড়ই খারাপ হইয়াছে। আমি এতক্ষণ তোমাকে এ কথা বলি নাই, আমাকে মার্জ্জনা—'

আমাকে বাধা দিয়া ল্যালান্দী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'মস্থর, প্রাণাধিক, আগামী কল্য তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও। ভাল তাহাই হইবে। কিন্তু—কিন্তু তুমি কি বিনিময়ে আমার একটা অনুরোধ—একটা সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিবে না?'

আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, 'বল, বল প্রিয়তমে, ইউজিনী আমার, বল, তুমি কি চাও? আমি প্রাণ দিয়াও তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব।'

'আমি জানি—জানি প্রিয়তম, তুমি আমার জন্য সকলই করিতে পার। শোন তবে। যখন একটা রোগ মানুষের শরীরে দেখা দেয়, তাহা ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, আর বাড়িতে না দিয়া তখনই তাহার মূলোৎপাটিত করিয়া ফেলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমার আগেই সন্দেহ হইয়াছিল তোমার দৃষ্টি শক্তি কমিয়া গিয়াছে, এখন তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ। অথচ এ রোগ উপেক্ষা করিয়া তুমি বাড়াইয়াই তুলিয়াছ। কিন্তু আর ইহার প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। শোন, শোন প্রাণাধিক, আজ আমার অনুরোধে—আমার প্রতি তোমার যে অগাধ প্রেম—সেই প্রেমের দোহাই দিয়া বলিতেছি, মস্থর, প্রাণাধিক, তুমি আজ হইতে এই চসমা জোড়া পরিধান কর। শোন, বাধা দিও না। এ অনুরোধ রক্ষা না করিলে বুঝিব তুমি আমাকে যথার্থই ভালবাস না।'

আমি আর ইতস্ততঃ করিতে পারিলাম না, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু আজ নয়। ঐ দেখ, উপরে ঐ উদার উন্মুক্ত অনন্তনীলাকাশ, নিম্নে এই শস্য শ্যামলা অনন্তবিস্তৃতা বসুন্ধরা। আজ প্রকৃতির এই উন্মুক্ত চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া আমি শপথ করিতেছি যে, যে শুভ মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে আমার প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব সেই মুহূর্ত্তে—সেই দিন প্রাতঃকাল হইতেই আমি এ চসমা আজীবন পরিধান করিব। আজ এ চসমা তোমার নিকটেই থাক।'

এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা হইল না। আমরা আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে

নানা পরামর্শ করিতে লাগিলাম। আমার বাগদত্তা পত্নীর নিকট শুনিলাম ট্যালবট এই মাত্র ফিরিয়াছেন। স্থির হইল, বিবাহে কোনো সমারোহ করা হইবে না—গোপনেই নিষ্পন্ন হইবে। আমরা ট্যালবটকে লইয়া একজন পাদ্রীর বাড়ী যাইব। সেইখানেই আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইবে। তারপর ট্যালবটকে ছাড়িয়া আমরা দুইজনে বিশ মাইল দূরস্থ পিটার্স হোটেলে গমন করিব। সেইখানে কয়েকদিন কাটাইয়া বাটী ফিরিয়া আসিব।

পরামর্শ ঠিক হইল। আমি ল্যালান্দীর নিকট বিদায় লইয়া ট্যালবটের বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হঠাৎ মনে হইল ল্যালান্দীর সেই প্রতিকৃতি খানা এখন ও দেখা হয় নাই। তাড়াতাড়ি পথপার্শ্বস্থ একটা হোটেলে প্রবেশ করিয়া পকেট হইতে ফটোখানা বাহির করিলাম! সেই সুন্দর মুখ—সেই গ্রীসীয় উন্নত নাসিকা—সেই ইন্দীবর নয়ন যুগল—সেই স্কন্ধ বিলম্বী ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলোকদাম! সবই সেই! এতটুকু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। ঠিক যেন ল্যালান্দী সশরীরে দণ্ডায়মানা! ছবিখানা উল্টাইলাম। দেখিলাম লেখা আছে,—'ইউজিনী ল্যালান্দী—বয়স সাতাশ বছর সাত মাস।'

(৭)

বিবাহ হইয়া গেল। বিনা আড়ম্বরে চুপি চুপি সে বিবাহ নিষ্পন্ন হইল। পুরোহিত ও বন্ধুবর ট্যালবট ছাড়া সে বিবাহের কথা অন্য কেহ জানিল না। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা—আমি ও আমার প্রিয়তমা পত্নী—বিবাহের পরই সেই হোটেলে আসিয়া একখানা সুন্দর ঘর অধিকার করিয়াছি।

সমস্ত দরজা জানালা উন্মুক্ত করিয়া আমরা দুইখানি আরাম কেদারায় পরস্পর মুখোমুখী হইয়া উপবেশন করিলাম। উন্মুক্ত বাতায়নপথে স্নিগ্ধ সমীর আসিয়া ইউজিনীর পৃষ্ঠ বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে উড়াইয়া তাঁহার চোখে মুখে ফেলিতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়া গেলাম। উঠিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'ইউজিনি, প্রিয়তমে, এতদিনে তুমি আমার হইলে। আজ আমার মত সুখী পৃথিবীতে আর কে আছে?'

ম্যাডাম সিম্পসন তাঁহার সেই সুগোল কমনীয় বাহু দ্বারা আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সিম্পসন, প্রাণাধিক সিম্পসন, দেখিলে আমি আমার কথা রক্ষা করিয়াছি। তোমার আগ্রহাতিশয্যে আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার সেই অনুরোধটী—তোমার

সেই সামান্য প্রতিজ্ঞাটী কি তুমি এখন রক্ষা করিবে না ? তুমি বলিয়াছিলে—হাঁ, আমায় বেশ মনে পড়িতেছে তুমি বলিয়াছিলে, 'ঐ দেখ, উপরে ঐ উদার উন্মুক্ত-অনন্ত-নীলাকাশ, নিম্নে এই শস্যশ্যামলা অনন্ত বিস্তৃত বসুন্ধরা। আজ প্রকৃতির এই উন্মুক্ত চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া আমি শপথ করিতেছি যে, যে শুভ মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে আমার প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব সেই মুহূর্ত্তে—সেই দিন প্রাতঃকাল হইতেই আমি এ চসমা আজীবন পরিধান করিব। আজ এ চসমা তোমার নিকটেই থাক।' প্রিয়তম, ইহাই না তুমি বলিয়াছিলে ?"

'হাঁ, তোমার স্মরণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ। ঠিক ইহাই আমি বলিয়াছিলাম। এই দেখ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি।' এই বলিয়া তাহার নিকট হইতে আমি চসমা গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলাম ! ততক্ষণে ম্যাডাম সিম্পসন টুপি খুলিয়া বাহু যুগল বক্ষঃদেশে সন্নিবদ্ধ করিয়া সোজা হইয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

চসমা চোখে দেওয়ার পর মুহূর্ত্তেই আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'ভগবন্, একি করিলে ? চসমায় কি যাদু মাখানা রহিয়াছে !' আমি চসমা খুলিয়া রেশমী রুমালে উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় চোখে আঁটিলাম।

কি দেখিলাম ? যাহা দেখিলাম তাহা আজ এই পঞ্চাশ বছর পরেও স্মরণ করিতে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। কি দেখিলাম ? ইউজিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ক্রমে সেই বিস্ময় গভীর হইতে গভীরতর হইয়া অবশেষে মহা আতঙ্কে পরিণত হইল। যাহা দেখিলাম —ওঃ, এখনও স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠে—আমি আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই কি—এই কি সেই—একি একটা কুহকী ? এও কি সম্ভব ? এই কি সেই—সেই—ইউজিনী ল্যালান্দী ? আমার—সেই—সেই প্রিয়তমা পত্নী ? একি—একি কোথায় গেল সেই মুক্তাদন্তপাতী ? ভগবন, শেষে একি করিলে ! আমি চসমাটা টানিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। তারপর এক লাফে গৃহের মধ্য স্থলে মিসেস সিম্পসনের সম্মুখে কটিদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম। ক্ষোভে দুঃখে ও ক্রোধে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ম্যাডাম ইউজিনী ল্যালান্দী—অর্থাৎ মিসেস সিম্পসন ভাল ইংরেজী বলিতে পারিতেন না বলিয়া সচরাচর ফরাসী ভাষায়ই

কথোপকথন করিতেন। কিন্তু রাগের মাথায় স্ত্রীলোকে সকলই করিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সেই অপূর্ব্ব ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'কি মস্যুর, কি হইয়াছে? তুমি যে রোমোলা বাইজীর ন্যায় নাচিতে আরম্ভ করিলে! আমাকে ভালবাসিতে পারিবে না ত, দেখিয়া বিবাহ করিয়াছিলে কেন?'

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'দূর হ পিশাচী ডাইনী বুড়ী কোথাকার!'

'কি বলিলে? বুড়ী? এখনও তত বুড়ী হই নাই। বিরাশী বছরের এক-দিনও বেশী নয়।'

'বি—রা—শী!' আমি কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, কেন ফটোর নীচে ত লেখা ছিল সাতাইশ বছর সাত মাস!'

'নিশ্চয়ই! সেত সত্য কথা! কিন্তু তা যে পঞ্চান্ন বছর পূর্ব্বের তোলা। বিধবা হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় আমি প্রথম স্বামী মস্যুর মৈসার্টের ঔরসজাত আমার কন্যার জন্য সেই ফটো তোলাই।'

অমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'মৈসার্ট!'

আমার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া সে বলিল, 'হাঁ মৈসার্ট। কেন, তুমি তাহার কি জান?'

'কিছুই জানিনা পাপিষ্ঠা। তবে আমার একজন পূর্ব্বপুরুষের ঐ নাম ছিল।'

'ঐ নাম ছিল? বেশ সুন্দর নাম! আর ভৈসার্ট নামটাও খুব সুন্দর। আমার কন্যা শ্রীমতী মৈসার্টের সঙ্গে মস্যুর ভৈসার্টের বিবাহ হয়।'

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'কি? মৈসার্ট আর ভৈসার্ট? সে কি? তুই বলিস্ কি?'

'কি বলি? আমি বলি মৈসার্ট আর ভৈসার্ট, কাজেই আমাকে আরও বলিতে হইল ক্রৈসার্ট এবং ফ্রৈসার্ট। আমার দৌহিত্রী শ্রীমতী ভৈসার্ট, মস্যুর ক্রৈসার্টকে পতিত্বে বরণ করে। আর তাহার মেয়ে শ্রীমতী ক্রৈসার্ট মস্যুর ফ্রৈসার্টকে বিবাহ করে। কিহে, এ নামগুলি বুঝি তোমার তেমন মনে ধরিল না?'

আমার সংজ্ঞা তিরোহিত হইতে লাগিল আমি কষ্টে জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, 'মৈসার্ট—ভৈসার্ট—ক্রৈসার্ট আর ফ্রৈসার্ট! কেন—কেন তুমি এ বিদ্রূপ করিতেছ?'

মিসেস সিম্পসন বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'বিদ্রূপ? না, আমি সত্যই বলিতেছি। এই ক্রৈসার্ট একটা প্রকাণ্ড মূর্খ—তোমারই মত একটা আস্ত গাধা। নতুবা কে অমন সুন্দর ফরাসী দেশ ছাড়িয়া এই মেড়ুয়াবাদী-দের দেশে—এই অসভ্য আমেরিকায় আসে? আমেরিকায় আসিয়াই তাহার মৃত্যু হয়। শুনিয়াছি তাহার একটা অসভ্য, আকাটমূর্খ কাটখোট্টা গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে আছে—অবশ্য আমি কিংবা আমার সঙ্গিনী ম্যাডাম ষ্টিফেন ল্যালান্দী কেহই সেটাকে দেখি নাই। শুনিয়াছি সেটার নাম নাকি নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ক্রৈসার্ট। কিহে এ নামটা তোমার কেমন মনে হয়?

কথা শেষ হইল। মিসেস সিম্পসন ক্রোধাবেগে চেয়ার ছাড়িয়া উন্মত্তের ন্যায় লাফাইতে লাগিলেন। সেই বন্ধনোমুক্ত-দন্তপাতী পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিলেন—বাহুযুগল ইতস্ততঃ ছুড়িয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন—আস্তিন গুটাইয়া আমার মুখের উপর এক ঘুসি বসাইয়া দিলেন—মাথা হইতে টুপি ও সেই সুন্দর কৃত্রিম কেশগুচ্ছ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—তারপর মুখে এক অব্যক্ত অস্ফুট আনন্দ ধ্বনি করিয়া পৈচাশিক ক্রোধে তাণ্ডব বেগে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আমার মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। পায়ের নীচে পৃথিবী আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল। আমি আর দাঁড়াইতে পরিলাম না। ঘুরিতে ঘুরিতে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। তারপর ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে বলিলাম, 'মৈসার্ট—ভৈসার্ট—ক্রৈসার্ট—ক্রৈসার্ট—তারপুত্র নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ক্রৈসার্ট—সেইই আমি —আমিই সেই—শোন্ নাগিনী শোন্, আমি যথাসাধ্য চীৎকার করিয়া বলিলাম, আমিই সেই—আমিই নেপোলিয়ান বোনাপার্টি! ভগবন! আমি যদি আমার বৃদ্ধা প্রমাতামহীকে বিবাহ করিয়া থাকি ত চিরদিনের জন্য আমার সংজ্ঞা লুপ্ত কর।'

তার পর আর কিছু আমার মনে নাই। আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম।

উপসংহার।

ম্যাডাম ইউজিনী ল্যালান্দী যাঁহাকে আমি কিছু পূর্ব্বে সিম্পসন আখ্যা দিয়াছি—তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল মৈসার্ট। তিনি সত্য সত্যই আমার বৃদ্ধা প্রমাতামহী। যৌবনকালে তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন, এমন কি এই বিরাশী বছর বয়সেও তিনি পূর্ব্বের সেই উচ্চতা—সেই ভাস্কর খোদিত মস্তকের সীমা রেখা—সেই আকর্ণ-বিস্ফারিত-নয়নযুগল—সেই গ্রীসীয় সমুন্নত নাসিকা প্রভৃতি কিছুই হারান নাই। তার উপর আবার গণ্ডদেশে রং ফলাইয়া কৃত্রিম কেশ, দন্ত ও সাজ সজ্জার নিপুণতায় তিনি সুন্দরী সমাজে সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন। দ্বিতীয়বার নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইয়া আমাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর দুরসম্পর্কীয় জনৈক আত্মীয়ার সঙ্গে ফরাসী হইতে এই সুদূর ইউনাইটেড্ ষ্টেটে আগমন করেন। সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী ম্যাডাম ষ্টিফেন ল্যালান্দীই তাঁহার আত্মীয়া ও সঙ্গিনী।

তিনি এই সহরে আসিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে আমি এই সহরেই আছি। কিন্তু তখনও তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। তারপর রঙ্গালয়ে তিনি আমার দেহে তাঁহার বংশের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিতে পান। সেই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য তিনি সঙ্গী যুবককে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। যুবকটী আমাকে চিনিতেন, সুতরাং সহজেই ল্যালান্দী আমার পরিচয় পাইলেন। তারপর আমি যখন তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম, তখন তিনি মনে করিলেন যে, যে কোন উপায়েই হউক, আমিও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমি যে তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছি, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

আমি যখন তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ট্যালবটকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, তখন ট্যালবট ভাবিলেন যে আমি সুন্দরী যুবতীটীর কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, বৃদ্ধা ল্যালান্দীর কথা নহে। সুতরাং তিনিও সরলভাবেই আমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন। অথচ 'আমি যে তিমিরে, সে তিমিরেই' রহিয়া গেলাম।

পর দিবস প্রাতঃকালে রাস্তায় হঠাৎ আমার বৃদ্ধা প্রমাতামহীর সঙ্গে ট্যাল-বটের সাক্ষাৎ হয়। প্যারীতেই তাঁহাদের পরস্পর আলাপ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ট্যালবটকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কথায় কথায় তিনি আমার দৃষ্টি শক্তি হ্রাস হওয়ার কথা জানিতে পারেন। ট্যালবট তাঁহাকে আরও জানাইলেন যে, আমি ষ্টিফেন ল্যালান্দীর প্রেমে পড়িয়াছি। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, আমি তাঁহারই প্রেমে পড়িয়াছি। একটা রঙ্গালয়ের মাঝখানে সহস্র সহস্র লোকের জলন্ত-দৃষ্টির সম্মুখে একজন অপরিচিতা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের প্রতি প্রেম প্রকাশ করায় আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তিনি ট্যালবটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিলেন। ট্যালবটও এই জন্য ইচ্ছা করিয়াই বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন রাস্তার উপর সেই তিনজন ভদ্রলোক ম্যাডাম ষ্টিফেন ল্যালান্দীরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বরং ইউজিনীর ছদ্মবেশেরই আলোচনা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিশেষতঃ দিনের বেলায় আমি তাঁহাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিবারও অবসর পাই নাই। আবার তাঁহাদের বাটীতে সেই যুবতী সুন্দরীকেই গান গাহিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। যখন তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে উঠিলেন, তখন আমার সন্দেহ বদ্ধমূল করিবার জন্যই আমার বৃদ্ধা প্রমাতামহী তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া গেলেন। ফলতঃ ম্যাডাম ষ্টিফেন ল্যালান্দীর সঙ্গীতই আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়াছিল। রঙ্গালয়ে ইউজিনী ল্যালান্দীর রূপ আর ষ্টিফেন ল্যালান্দীর সঙ্গীত এ দুয়েই আমার মনে বিষম খটকা বাধাইয়া ছিল! কিন্তু মূর্খ আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝি নাই!

পরিশেষে আমাকে কঠোর তিরস্কার করিবার জন্যই তিনি ছলে আমাকে চসমা উপহার দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমার বয়সের উপযুক্ত একজোড়া চসমা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন।

যে পুরোহিত আমাদের বিবাহ দিয়াছিল যে প্রকৃত পক্ষে পুরোহিত নহে, ট্যালবটেরই অপর একজন বন্ধু। আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া পুরোহিত মহাশয় ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া ট্যালবটের সঙ্গে অন্য পথে পিটার্স হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যখন ক্ষোভে দুঃখে ও অপমানে আর্ত্তনাদ করিতেছিলাম তখন আমার সহৃদয় বন্ধুদ্বয় পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠের অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষপথে আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া সমবেদনাভরে হাসিয়া খুন হইতে ছিলেন!

ফলকথা আমি যে 'আমারই বৃদ্ধা প্রমাতামহীর' স্বামী নাহি ইহাতেই আমি

পরম সুখী। তার উপর আবার তাঁহারই কৌশলে ও চেষ্টায় আমি অবশেষে ম্যাডাম ল্যালান্দীকে—ম্যাডাম ষ্টিফেন ল্যালান্দীকেই বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিশেষতঃ আমার বৃদ্ধা প্রমাতামহী মৃত্যুকালে—যদি বাস্তবিকই তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, আমাকে তাঁহার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন।

তারপর আজ এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অবধি 'আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে' সকল সময়েই সেই চসমাজোড়া আমার চিরসাথী হইয়াই রহিয়াছে।

শ্রীঅমূল্যনারায়ণ সেন।

——০

রঙ্গ-বারিধি।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বেয়াড়া-বিভ্রাট।

দার্শনিক পণ্ডিত উমেশবাবু চিন্তা ও পুস্তক রচনার সুবিধা বিবেচনায় সংসারের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া সহরের প্রান্তভাগে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। নিকটে কাহারও বাস ছিল না। আজ তাঁহার একমাত্র চাকর হোলি খেলিতে ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করিয়া সবে মাত্র নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন,—ঠিক সেই সময়ে বাহিরের দ্বারের কড়া মহাশব্দে নিনাদিত হইয়া উঠিল। এত রাত্রে কে আবার আসিল দেখিবার জন্য তিনি সত্বর নিচে আসিয়া বাহিরের দরজা খুলিলেন। দ্বারে দণ্ডায়মান একটী ভদ্রলোক; অঙ্গে আপাদ মস্তক আবরিত কাল রংএর অলেষ্টার কোট, হস্তে গ্লাডষ্টোন ব্যাগ।

উমেশবাবু দ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র আগন্তুক বলিল, "আপনিই বোধ হয় বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত উমেশবাবু?"

উমেশবাবু কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে পুনরায় বলিল,—"এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করায় আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত; কিন্তু একটা গুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্য আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আর সময় নাই, কাল প্রত্যুষেই আমাকে এখান হইতে রওনা হইতে হইবে। আশা করি এই রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করায় আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি আপনার "ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে" পুস্তক পাঠে বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আপনার দার্শনিক যুক্তি সকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আপনার ন্যায় পণ্ডিত দর্শনশাস্ত্রে সত্যই বিরল। আপনার মাথা সাধারণ উপাদানে গঠিত নহে। কিন্তু কয়েকটা যুক্তির সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম, এক্ষণে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার মনের সন্দেহ দূর করেন তো চিরবাধিত হই।"

উমেশবাবু দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে পাইলে আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন; তাঁহার দিন রাত্রি জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার মতের সহিত আগন্তুকের মতের মিল হয় নাই শুনিয়া, তাঁহার সহিত দর্শনশাস্ত্রের তর্ক করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল, তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আসুন, আমি আনন্দের সহিত আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার মনের সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা পাইব।"

উমেশবাবু আগন্তুককে তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে লইয়া আসিলেন। উমেশবাবু বসিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিল; উমেশবাবু তাহার সম্মুখেই অপর একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত আমার পূর্ব্বে আর কখনও আলাপ হয় নাই; আপনি কি এই স্থানেই থাকেন?"

আগন্তুক তাহার পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে মস্তক নাড়িয়া বলিল, "না, আমার বাসের কোনরূপ স্থিরতা নাই; আমি যে কখন কোথায় থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; তবে আমি অধিকাংশ সময়েই শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকি। আপাততঃ এক্ষণে আমি হিমালয় হইতে আসিতেছি।"

আগন্তুকের কথায় উমেশবাবু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "হিমালয় হইতে আসিতেছেন? আপনার নামটা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"একশো বার পারেন! আমার নাম আশুতোষ রায়; আমি গবিন্দপুরের জমিদার। কিন্তু বিষয় সম্পত্তিতে বিশেষ কোনরূপ আশক্তি না থাকায়, সে সমস্তই ত্যাগ করিয়া অন্য নামে দেশে দেশে দর্শন আলোচনায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তবে প্রায়ই অধিকাংশ সময়ই শূন্যে অবস্থান করি।"

উমেশবাবু ভীরু বা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন আগন্তুকের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত। পাগল সম্বন্ধে তিনি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক যে সম্পূর্ণ উন্মাদ, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। নিশীথ রাত্রে জনশূন্য গৃহে এরূপ দারুণ উন্মাদের সহিত একাকী অবস্থানে তিনি যে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই! আগন্তুক উমেশবাবুর মনোভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য, আপনিও আমাকে তাহাই স্থির করিলেন! আমি ইহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না, কেন মানুষ, আমি কোন কথা কহিবামাত্রই আমাকে উন্মাদ স্থির করিয়া লয়। সেই কারণই আমি আপনার নাম শুনিবামাত্রই আপনার দ্বারা আমার মাথার নিশ্চয়ই উপকার হইবে জানিয়া আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি!"

পাগলকে উত্তেজিত করা কোন মতেই উচিত নহে ভাবিয়া উমেশবাবু যথাসাধ্য মনের অবস্থা মনেই গোপন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনার ভুল হইয়াছে; আমি ডাক্তার নই এবং ডাক্তারী সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। আপনি ডাক্তার বাবুর নিকট যান, তিনি এই রাস্তার একটু আগেই থাকেন। আসুন আমি আপনাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া উমেশবাবু উঠিতে যাইতেছিলেন কিন্তু ভদ্রলোক ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল, বসুন আপনি, আমার কথা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। যদি ঔষধে—আমার রোগ আরোগ্য হইত তাহা হইলে বহু পুর্ব্বেই আমি রোগ মুক্ত হইতে পারিতাম। এ রোগ ঔষধে সারিবার নহে। আমি বহু সুচিকিৎসককে দেখাইয়াছি, কিন্তু সকলেই শেষে বলিয়াছেন, ঔষধে আপনার রোগ মুক্ত হইবার আশা নাই। আপনার রোগ মুক্তির একমাত্র উপায় আছে, সে কেবল কোন গভীর ও বিচক্ষণ মস্তিষ্কের সহিত আপনার মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন করা,—দ্বিতীয় উপায় নাই। আপনার মস্তিষ্কের ন্যায় বিচক্ষণ মস্তিষ্ক খুব কমই আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না।"

আগন্তুকের কথায় উমেশবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। এই পাগলের হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার মস্তক একেবারে আলোড়িত হইয়া গেল। কিন্তু কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমার এ সামান্য মস্তিষ্ক আপনার একেবারেই উপযোগী নহে।"

তাঁহার কোন কথায়ই কর্ণপাত না করিয়া আগন্তুক বলিল, "আমি এতদিন ধরিয়া যেরূপ মস্তিষ্ক খুঁজিতে ছিলাম এতদিন পরে ঠিক তাহাই পাইয়াছি। আমার মাথার সহিত আপনার মাথা পরিবর্ত্তন করিলে আপনার উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইবে না।"

উমেশবাবু হতাশভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ অতিশয় স্থূল হওয়ায় শক্তির পরিণাম অতি অল্পই ছিল; তিনি বেশ বুঝিলেন এ উন্মাদের সহিত বল প্রয়োগে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, বরং হিতে বিপরীত হইবে। পাগলকে কোনরূপে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তাহার সায়ে সায় দিয়া কোন ক্রমে বিদায় করিতে হইবে—অন্য উপায় নাই। তিনি তাঁহার মনের বিচলিত ভাব কিয়ৎপরিমাণ দমন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ ভাল কথা। যদি ইহাতে আপনার উপকার হয়, তবে পরোপকারের জন্য আমার এ কার্য্য সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।"

উন্মাদ গম্ভীরভাবে বলিল, "এই তো উন্নত মস্তিষ্কবান লোকের কথা। তবে আর অনর্থক কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই।"

সে তাহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগ চেয়ারের কাছেই মেজের উপর রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহা টেবিলের উপর তুলিয়া ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিল, পরে তাহার ভিতর হইতে একখানা প্রকাণ্ড ছোরা বাহির করিয়া টেবিলের উপর সানাইতে সানাইতে বলিল, "এখন আসুন, আমি কেবল আপনার মাথার খুলিটা তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে ঘিলুটুকু বাহির করিয়া লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া উন্মাদ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাঃ বাঃ বেশ! আপনার মাথায় চুল না থাকায় এ কার্য্যে বিশেষ কোনই কষ্ট পাইতে হইবে না।"

উন্মাদের এই ভয়াবহ কার্য্যে ও কথায় উমেশবাবুর প্রায় বাক্য রোধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে হৃদয়ে বল আনিয়া বলিলেন, "বসুন, বসুন! এ সব কার্য্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। দাঁড়ান—আপনার সাহায্যের জন্য দুই একজন লোক ডাকিয়া আনি।"

তিনি উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া নিমিষ মধ্যে উঠিয়া তীর বেগে গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন, কিন্তু উন্মাদ তাঁহার পূর্ব্বেই দ্বারের নিকট আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া বলিল,—"কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি একাই একশো। আপনার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আপনি বসুন আমি সব ঠিক করিয়া লইতেছি।"

উমেশবাবু মনে মনে বলিলেন,—"ইচ্ছা করিয়া যমকে ডাকিয়া আনিয়াছি, এখন উপায় ? তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে মানবের মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা যিনি সে অবস্থায় না পড়িয়াছেন তাঁহার ধারণা করা অসম্ভব। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন ;—প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। সহসা একটা কথা তাহার মনে উদয় হওয়ায়,তিনি উন্মাদের নিকট হইতে পরিত্রাণের জন্য শেষ চেষ্টায় বলিলেন, একটু অপেক্ষা করুন, আজ আমার এক আত্মীয় বর্দ্ধমান হইতে আমাকে কিছু সীতাভোগ ও মিহিদানা পাঠাইয়াছেন। আপনি যখন অনুগ্রহ করিয়া অমার বাটীতে পদধূলি দিয়াছেন তখন প্রথম আপনার কিছু জলযোগ করা উচিত।"

উন্মাদ ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিল, "তাহা হইলে আপনি একটু তৎপর হউন। আমাকে এখনই আবার আপনার মস্তিষ্ক লইয়া হিমালয় রওনা হইতে হইবে।"

উমেশবাবু উন্মাদ যে এত শীঘ্র তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে দিবে তাহা একবারও ভাবেন নাই : এক্ষণে এই ভয়াবহ উন্মাদের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় হইয়াছে ভাবিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কতকটা আশস্ত হইয়া, "শীঘ্রই আসিতেছি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে একবার গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেই একেবারে ছুটিয়া সদর রাস্তায় যাইয়া উপস্থিত হইবেন। তৎপরে লোকজন ডাকিয়া উন্মাদটাকে বাটীর বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু তিনি যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহা ঘটিল না, তিনি গৃহের বাহির হইয়া দেখিলেন উন্মাদও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তিনি বেশ বুঝিলেন, এক্ষণে বাটীর বাহির হইবার চেষ্টা করিলেই উন্মাদের হস্তস্থিত সেই প্রকাণ্ড ছোরা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিবে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল ; তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইতেছিল। বৈঠকখানা গৃহের পার্শ্বেই একটা ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, তিনি ছুটিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই গৃহের অর্গল আঁটিয়া দিলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াও তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। গৃহের দ্বারে অর্গল আবদ্ধ করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এখনি উন্মাদ আসিয়া সবলে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, যদি

কোন ক্রমে অর্গল ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর তাঁহার জীবনের কোন আশা নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উন্মাদ দ্বারে আঘাত করিল না। সে বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বার বার বলিতে লাগিল,—"বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন, আপনার মস্তক আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

উন্মাদের প্রত্যেক চীৎকার উমেশবাবুর মর্ম্মে যাইয়া আঘাত করিতে লাগিল। উমেশবাবু কতক্ষণ এই ভয়াবহ চীৎকার শুনিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলিতে পারেন না, তিনি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে স্তম্ভিতভাবে স্পন্দিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। পদ শব্দে বুঝিলেন পাগল আবার তাঁহার বৈঠক-খানা গৃহে প্রবেশ করিল। তিনি দরজা খুলিতে সাহস করিলেন না। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তথায় জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থান করিবার পর যখন দেখিলেন, চারিদিক নীরব হইয়াছে; আর কোথাও কোন শব্দ নাই, তখন তিনি ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন সদর দরজা খোলা, বুঝিলেন উন্মাদ তাঁহাকে না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি হাপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্তের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে বলিলেন, "আজ কি ভয়াবহ বিপদই আমার উপর দিয়া গেল।" তিনি তথাপি পা টিপিয়া টিপিয়া বৈঠকখানার দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিলেন। কোথাও কেহ নাই। তিনি বাহিরের দ্বার আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে উপরে গিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে আর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। দেখিলেন টেবিলের উপর তাঁহার ক্যাশ বাক্স উন্মুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, আংটী সমস্ত টাকাকড়ি কিছুমাত্র নাই। একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগে যাহা কিছু ধরিতে পারে তাহা সমস্তই গিয়াছে। টেবিলেরউপর একখানা ক্ষুদ্র কাগজ পড়িয়া আছে;—তাহাতে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা :—

প্রিয় দার্শনিক উমেশবাবু।

আমার শত সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কারণ আমি যখন আমার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম তখন আপনি আমাকে বিরক্ত না করিয়া অন্য গৃহে অর্গল আবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম আমার মস্তিষ্কের সহিত মহাশয়ের মস্তিষ্ক পরিবর্ত্তনের কোনই প্রয়োজন নাই। আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে আমার মস্তিষ্ক আপনার মস্তিষ্ক হইতে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আপনার অপদার্থ মস্তিষ্ক আমার নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বিদায় হইলাম। ইতি :—

উমেশবাবুর মুখে বাক্য নাই; তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সংসারে এমন জুয়াচোরও আছে, তাঁহাকে গাধা বনাইয়া তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া গেল। এ বিশ্ব বিচিত্র-স্থান। উমেশবাবুর দার্শনিক-ভাব মাথায় উঠিল।

রত্নময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সম্মুখে আশেপাশে ঊর্দ্ধে, অধঃ, বিটপীশীর্ষে, নভোগাত্রে চারিদিকেই মসীময় ভাবের প্রকট-লীলা। একে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, তাহাতে আবার আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎস্ফূরণ হইতেছে। ক্ষণপ্রভার সেই ক্ষণিকোজ্জ্বল তীব্র জ্যোতিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে মেদিনীবক্ষের সূচীভেদ্য অন্ধকার বিলুপ্ত হইতেছে। প্রকৃতির এই স্তব্ধভাব দেখিয়া বোধ হয় শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে,—না হয় ঝড় উঠিবে।

এই ভীষণ সময়ে, এক নিশীথ পান্থ স্বেদপ্লুত কলেবরে, সেই মাঠের মধ্য দিয়া, অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া চলিয়াছেন। একাধিক ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়া, তাঁহার বড়ই ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। তিনি বহু কষ্টে কেবল উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ধকারময় প্রান্তর পথে চলিতেছেন।

অন্ধকারের মধ্য দিয়াও উপন্যাস লেখক দৃষ্টি চালাইতে সক্ষম, এজন্য পাঠক এ কথাটিও জানিয়া রাখুন—এই নিশীথপান্থ উজ্জ্বল গৌরকান্তি এক ব্রাহ্মণ যুবক, গলদেশে লম্বমান অতি শুভ্র যজ্ঞোপবীত। স্কন্ধে উত্তরীয়। শিখায় আবদ্ধ দেবনিবেদিত পুষ্প। মুখে তেজ ও প্রতিভা, মাংসপেশী সবল ও সুদৃঢ়। সে সুগঠিত মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় তিনি প্রচুর শক্তিশালী।

ব্রাহ্মণের হাতে একটী ক্ষুদ্র ক্যাম্বিসের ব্যাগ। সেই ব্যাগের গায়ে একখানি গামছা বাঁধা। হাতে একগাছি যষ্টি।

অতি সাহসী হইলেও, ব্রাহ্মণ যেন একটু ভয় পাইয়াছেন। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি যে মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছেন, তাহার পূর্ব্বদিকেই সেই "তেপান্তরের মাঠ।" মাঠে দস্যুভয় যে যথেষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন।

ব্রাহ্মণ শিষ্য বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ নহেন। কোন ধনী ব্রাহ্মণ শিষ্যপুত্রের উপনয়ন দিয়া নিজগ্রামে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সেই ব্যাগের মধ্যে কয়েকখানি বস্ত্র, আর দশটী টাকা নগদ ছিল। আর ছিল চারি ভরি অহিফেন। ব্রাহ্মণ নিজে অহিফেন সেবী নহেন তিনি তাঁহার বৃদ্ধা জননীর জন্য শিষ্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কারণ তিনি জানিতেন এই দশটী টাকা অপেক্ষা তাঁহার বৃদ্ধা মাতার নিকট এই অহিফেনটুকু বহুমূল্য বিবেচিত হইবে। সেকালে অহিফেন বড়ই দুষ্প্রাপ্য ছিল। আর টাকাগুলির জন্যও তাঁহার একটু ভাবনা হইল।

যে কোন উপায়ে আর আধক্রোশ পথ চলিতে পারিলেই, তিনি গ্রামে উপস্থিত হন। কিন্তু প্রকৃতির সেই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি, আর ডাকাতের ভয়, অত সাহসী ব্রাহ্মণের মনেও যেন একটু ভয় সঞ্চার করিয়া দিল।

ব্রাহ্মণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "জননীর ব্রতোদ্যাপনের জন্য শিষ্যবাড়ী পরিশ্রম করিয়া দশটী টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। ডাকাতেরা কি এত নরাধম যে আমার কষ্টার্জ্জিত এই ব্রহ্মস্ব কাড়িয়া লইবে? আর ডাকাতই বা কোথায়? কেন আমি বৃথা ভয়ে আকুলিত হইতেছি? বিপত্তিকালে মধুসূদনকে স্মরণ করি। তিনিই আমায় বিপন্মুক্ত করিবেন।"

কবি জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র ব্রাহ্মণের অতি প্রিয়। তিনি অস্ফুটস্বরে সুরের সহিত গাহিতে লাগিলেন—

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং
কেশবধৃত মীনশরীর! জয় জগদীশ হরে॥ (১)
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতিতবপৃষ্ঠে,
ধরণী ধরণকিণ চক্রগরিষ্ঠে।
কেশবধৃত কূর্ম্মশরীর! জয় জগদীশ হরে॥ (২)
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি-কলঙ্ক-কলেবনিমগ্না।
কেশবধৃত বরাহরূপ জয় জগদীশ হরে॥ (৩)

তব করকমল বরে-নখমদ্ভুত শৃঙ্গম্
দলিতহিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্ ;
কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ (৪)
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীর জনিত জনপাবন।
কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ (৫)

সহসা এই সঙ্গীত-তরঙ্গে বাধা পড়িল। কথায় আছে 'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।' সহসা চারিজন লোক সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রেতমূর্ত্তির মত বাহির হইয়া ব্রাহ্মণকে ঘেরিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে একজন রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"কে তুমি ?"

ব্রাহ্মণ সাহসের সহিত উত্তর করিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ-পথিক।"

"প্রণাম দেবতা" বলিয়া তাহাদের একজন অগ্রসর হইয়া বলিল—"দেবতার নিবাস ?"

"কুন্দ গ্রামে। কিন্তু তুমি কে ?"

"আমি ভৈরব।"

"ভৈরব ! তেপান্তর মাঠের দস্যুদলপতি ভৈরবানন্দ !"

"হাঁ প্রভু ! আপনার গমন হইয়াছিল কোথায় ?"

"শিষ্যবাড়ী হইতে আসিতেছি।"

"তাহা হইলে কিছু প্রণামীও সঙ্গে আছে।"

"ব্রাহ্মণে মিথ্যা কথা বলে না। তোমরা চারিজন—আমি একা। বল প্রকাশেও অাত্মরক্ষা করিতে পারিব না। কিন্তু সামান্য এ দশটী টাকা লইয়া কি হইবে তোমার ভৈরব ?"

"ঠাকুর ! আমি তোমার টাকা চাহি না। বরঞ্চ তোমায় আরও কিছু কাঞ্চনমুদ্রা প্রণামী দিব। আমাদের সঙ্গে এস।"

"কেন ?"

"একটা পূজার অনুষ্ঠান আছে। আমরা একজন সৎব্রাহ্মণের চেষ্টায় কাল হইতে ফিরিতেছি। কিন্তু পাই নাই। কপালিনী তোমায় মাঠের মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছেন।"

"আমি শূদ্রের যজন করি না। শূদ্রের দান গ্রহণ করি না।"

"মা ত ব্রাহ্মণও নন, শূদ্রও নন। দেবতার পূজা করিবে, তাতে আবার

শূদ্র অশূদ্র কি ঠাকুর ? আর যত দূর আমরা জানি, এ কালী মূর্ত্তি নরোত্তম ঠাকুর বলিয়া এক ব্রাহ্মণেরই প্রতিষ্ঠিত। মারীভয়ে গ্রাম জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। মার পায়ে ফুল ও জল দিবার কেহই নাই, তাই আমরা দিই। কখনও ব্রাহ্মণ পাই, কখনও বা পাই না। কিন্তু ঠাকুর মন্দিরের মধ্যে আমরা এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করি নাই।"

"আমি যদি না যাই।"

"তোমায় বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।"

এই সাহসী ব্রাহ্মণের মনে তখন এটা কৌতূহল হইল। এ ব্রাহ্মণ আর কেহই নহেন, আমাদের হরপ্রসাদ। কমললোচন রায়ের জামতা, আর ডাকা-তের হস্তে আবদ্ধা রত্নময়ীর-স্বামী।

ডাকাতেরা যে তাহার স্ত্রীকেই বলি দিবার জন্ত, তাহাকে পুরোহিত নিযুক্ত করিতেছে, তাহা ত তিনি জানেন না। সহসা তাঁহার একটা কথা মনে পড়িল, এই ডাকাতের আড্ডার এ পর্য্যন্ত কেহই সন্ধান পায় নাই। তাঁহার শ্বশুর কমললোচন রায়ের জমীদারীর মধ্যে এই ডাকাতের দল আছে বলিয়া, ফৌজদার সাহেব, তাঁহারই হস্তে ইহাদের ধরিবার সরাসর ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন। হরপ্রসাদের একটা কৌতূহল হইল, যে একবার ইহাদের সঙ্গে গিয়া ব্যাপারটা কি দেখিয়া আসিনা কেন! যখন পলাইবার চেষ্টা করিলেও পারিব না, তখন বৃথা সে চেষ্টা করিয়া জীবনকে বিপন্ন করিই বা কেন!

তিনি যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন—সেই সময়ে ডাকাতের সর্দ্দার ভৈরব বলিল—"ঠাকুর! আর আমরা দেরি করতে পারি না। হা—কি—না একটা শীঘ্র জবাব দেও।"

হরপ্রসাদ বলিলেন, "চল আমি তোমাদের সঙ্গেই যাইতেছি। কাল আমাবস্যা। কাল আমাকে ছাড়িয়া দিবে এরূপ প্রতিজ্ঞা কর।"

"তাহাই করিতেছি—এখন অগ্রসর হও।" এই বলিয়া ভৈরবানন্দ ও তাহার সঙ্গীরা হরপ্রসাদের চারিদিক ঘিরিয়া চলিল। আর তিনি ভবিতব্যবশে অদৃশ্য ঘটনা-চালিত হইয়া এক ভীষণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরপ্রসাদ বাটী ফিরিয়া কোথায় জননীর চরণ বন্দনা করিয়া সুখী হইবেন, যাতায়াত ও পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করিবেন, তাহা না হইয়া ভবিতব্যবশে তাঁহাকে ডাকাতের হাতে বন্দী হইতে হইল।

প্রায় পোয়াটাক পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিবার পর, ভৈরবানন্দ তাঁহার একজন সঙ্গীকে আদেশ করিল—"শীঘ্র মশাল জ্বালিয়া লইয়া আইস। এ পথ আমাদের পরিচিত হইলেও এ ব্রাহ্মণের পক্ষে অপরিচিত। ইঁহার বড় কষ্ট হইতেছে।"

ডাকাতেরা সেই বনেরই রাজা। গভীর বনান্তরালে এক ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরের মধ্যে তৈরী মশাল, চকমকি ও শোলা প্রভৃতি সবই ছিল। শুষ্ক লতাগুল্ম পোড়াইয়া শীঘ্রই মশাল ধরান হইল; সেই মশালের আলোকে বেশ পথ দেখা যাইতেছে। আরও অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া হরপ্রসাদ দেখিলেন, সম্মুখেই একটা ভগ্ন দ্বিতল বাড়ী।

সে বাড়ীর কতকাংশ পড়িয়া গিয়াছে। কোথায়ও বা প্রাচীরের গাত্র হইতে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের চারা জন্মিয়াছে। কোথায়ও জানালা ও গরাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কোথাও দেয়ালের বালী চূণকাম খসিয়া যাওয়ায় বৃষ্টির জলে সে স্থলে শেওলা জমিয়াছে।

জনরব এই, এই ভগ্নপ্রায় বাটীটি নরোত্তম ঘোষাল বলিয়া এক ব্রাহ্মণের আবাসস্থান ছিল। ব্রাহ্মণ যে বেশ অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার এই ভগ্নপ্রায় বাটী হইতেই পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ এই গ্রামের জমীদার ছিলেন। গ্রামখানিও বড় ছোট ছিল না। কিন্তু সহসা ভীষণ ভাবে বিসূচিকার প্রকোপ হওয়ায় গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িল। লোকে গ্রামত্যাগ করিয়া বাস্তভিটা ফেলিয়া পলাইল! নরোত্তম ঠাকুরও সবংশে নিপাত হইলেন। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রাম আগাছা ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া ভীষণ বনস্থলীতে পরিণত হইল! এখন এখানে ডাকাতের আড্ডা হওয়ায়, প্রাণভয়ে আর কেহ এ গ্রামের দিকে আসে না।

নরোত্তম ঠাকুরের এই ভাঙ্গাবাটীর উপরতলের কয়েকটী কক্ষ এখনও মেরামতের অবস্থায় আছে। সেখানে নিত্য সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে, ঝাঁটপাট হয় বলিয়া কক্ষ কয়েকটী এখনও বাসযোগ্য। একস্থলে একটী ক্ষুদ্র দেবমন্দির

বা দালান। এই দালানের মধ্যে এক প্রস্তরময়ী কালী-প্রতিমা আছেন দালানও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ভৈরবানন্দ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে মহাসমাদরে বসিবার জায়গা করিয়া দিল। তাহার হাত মুখ ধুইবার জন্য স্বহস্তে এক অব্যবহৃত মৃৎপাত্রে জল আনিয়া সেই দালানে রাখিয়া বলিল—"ঠাকুর! আমি ডাকাত হইলেও নীচ জাতি নহি। জাত্যংশে আমি কৈবর্ত্ত। আমার তোলা জলে—আপনি অনায়াসে মুখাদি প্রক্ষালন করিতে পারেন। আপনার পানের জন্য—মায়ের মন্দিরে এক মৃৎকলসে গঙ্গাজল রহিল। আজ রাত্রে আপনি কেবল দুধমাত্র সেবা করিয়া থাকিবেন। কারণ কাল আপনাকে উপবাস করিতে হইবে। আমাদের এখানে এক ব্রাহ্মণ কন্যা আছেন। কোন বিশেষ কারণে, তাঁহাকে আমরা আটক করিয়া রাখিয়াছি। তিনি আপনার দুধ গরম করিয়া দিবেন।"

সেই দেবী-মন্দিরে একটী ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছিল। নিত্যই এইরূপ জ্বলিয়া থাকে। উপায়ন্তর না দেখিয়া হরপ্রসাদ ব্যাগের মধ্য হইতে বস্ত্রাদি বাহির করিয়া কাপড় ছাড়িলেন। সেই জল দিয়া মুখ হাত ধুইলেন। তৎপরে দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিবার পর তিনি পুনরায় দালানে আসিয়া বসিলেন। দেখিলেন তাঁহার সম্মুখেই এক কাংস্য পাত্রে একঘটী দুধ রহিয়াছে। তিনি তখন বড়ই শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহ। দুগ্ধ পানের পর যেন তাঁহার দেহে একটু বলসঞ্চার হইল।

হরপ্রসাদ সেই দালানে বিছান এক কম্বলের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু কোন মতেই তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তাঁহার ব্যাগের মধ্যে তাঁহার চিরপ্রিয় গ্রন্থ জয়দেবের "গীতগোবিন্দ"খানি ছিল। তিনি মন্দির মধ্যস্থিত প্রদীপটী একটু সরাইয়া আনিয়া সেই আলোকে পুঁথি পাঠের চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে ভৈরবানন্দ আসিয়া বলিল—"ঠাকুর! আজ তাহা হইলে আপনি এই স্থানেই বিশ্রাম করুন। আপনার কোন ভয় নাই। আমরা সদলবলে এখন একটু কাজে যাইতেছি, চারি ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিব। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যান। কিন্তু সাবধান! পলাইবার চেষ্টা করিবেন না। তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। এই বাটীতে আমাদের লোক চৌকি দিতেছে, এ কথাটা যেন মনে থাকে।"

হরপ্রসাদ অগত্যা শিরঃ-সঞ্চালনে এই উক্তির সমর্থন করিয়া গীতগোবিন্দ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ডাকাতেরা মশাল ধরাইয়া সেই বাটী হইতে

বাহির হইয়া গেল। অন্ধকারময় শ্মশানের নির্জ্জনতা পূর্ণ সেই ডাকতের আশ্রয়কেন্দ্র আবার অন্ধকারময় হইয়া পড়িল।

তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—ইহারা বলিল এখানে এক ব্রাহ্মণ কন্যা আছে! কে সে? তাহাকে কি একবার দেখিবার সুযোগ ঘটিবে না।

ব্রাহ্মণ মনের অস্থিরতা বশতঃ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাকাতেরা চলিয়া যাইবার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—একবার বাটীর চারিদিকটা দেখিয়া আসায় ক্ষতিই বা কি? আবার পরক্ষণেই তাঁহার মনে পড়িল—ডাকাত-সর্দ্দার ভৈরবানন্দ বলিয়া গেল এ বাটীতে পাহারা আছে। কাজ কি এ সব হাঙ্গামে। পুঁথিখানিই পাঠ করি। এত উৎকণ্ঠায় সহজে নিদ্রা আসিবে না। রাত্রি একটু গভীর হইলে—শয়নের পূর্ব্বে না হয় এ চেষ্টা করা যাইবে।

নিরুপায় হইয়া তিনি পুনরায় পুস্তক পাঠে মনোযোগ দিলেন। একটীর পর আর একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার সম্মুখে যেন কাহারও সাবধান ন্যস্ত পদশব্দ শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক স্ত্রীমূর্ত্তি।

হরপ্রসাদ এই ঘটনায় বিস্মিত হইয়া একটু ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন "কে তুমি?"

সেই রমণীমূর্ত্তি মুখের অবগুণ্ঠন একবারে খুলিয়া দিয়া বলিল—"আমি কে তুমি চিনিতে পারিতেছ না! আমি রত্নময়ী—তোমার ধর্ম্ম-পত্নী।"

"রত্নময়ী! তুমি! তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে! কি অদ্ভুত রহস্য! কি প্রহেলিকা! কি ভয়ানক ব্যাপার!"

রত্নময়ী বলিল—"চুপে চুপে কথা কও। সব তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি। ডাকাতেরা বহির্বাটীতে জাগিয়া আছে। আমি সদর দরজার দ্বারে খিল দিয়া আসিয়াছি। সবই তোমায় সংক্ষেপে বলিব। আমার জীবন বিপন্ন।"

এই কথা বলিয়া রত্নময়ী অতি সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় সমস্ত ঘটনাগুলি খুব ভাল করিয়া তাহার স্বামীকে বুঝাইয়া বলিল। তার পর বলিল—"আমায় বলি দিবার জন্য ইহারা তোমায় ধরিয়া আনিয়াছে। ইহারা তোমার প্রকৃত পরিচয় ও আমার সহিত কি সম্পর্ক, তাহা জানিলে বোধ হয় এরূপ ব্যবস্থা করিত না। একথা ইহারা জানিতে পারিলে তোমার প্রাণ থাকিবে না। প্রয়োজন হইলে ইহারা ব্রহ্মহত্যাতেও কুণ্ঠিত নয়। আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তুমি উপায় চিন্তা

কর। ভাবিয়া দেখ কি করিলে আমরা দুজনে প্রাণে বাঁচিতে পারি। আমি আর বেশীক্ষণ এখানে থাকিব না। এই কালী মন্দিরের পার্শ্বে, যে ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তাহার পাশেই একটা কামরা। আমি সেই ঘরেই আছি, প্রয়োজন হইলে—পলায়নের সুবিধা করিতে পারিলে আমায় ডাকিয়া লইও। আমি অতি পাপিষ্ঠা—মহাপাপ করিয়াছি তাই আজ আমার এ লাঞ্ছনা। আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে।”

রত্নময়ী আর কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে মন্দিরের মধ্য দিয়া সেই গুপ্তকক্ষে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

"দে মাগী সিন্দুকের চাবি দে"

—পৃঃ,

শিশু প্রেস

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ আষাঢ়, ১৩২২ ৩য় সংখ্যা

নীল-কুঠি

অনুকূলের সঙ্গে এক কলেজে, এক শ্রেণীতে পড়িতাম। সে মধ্যবিৎ জমিদারের ছেলে—বৎসরে দশ বার হাজার টাকা জমিদারীর আয়। এতদ্ব্যতীত ধানের কারবার ও তেজারতী আছে; কাজেই দেশের মধ্যে তাহারা খুব বড় লোক বলিয়াই গণ্য। অনুকূল অনেকবার আমাকে তাহাদের বাটী যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে কিন্তু কলেজ পরিত্যাগের পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তথাপি আমার যাইবার সময় হয় নাই। বড়দিনের ছুটি হইল; হাতেও দেখিলাম বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম নাই, এই সময় আমি অনুকূলের দেশে যাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম। একদিন দিনের গাড়ীতে অনুকূলের দেশে রওনা হইলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষুদ্র ষ্টেশনে নামিলাম; আশ্চর্য্যের বিষয় যে ষ্টেশনে আমিই একমাত্র যাত্রী গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, আর একজনও নামিল না। গাড়ী মহাবেগে নিজ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। মাঠের মধ্যে ষ্টেশন, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই মাঠ, কোনদিকে কোন স্থানে মানব বসতির চিহ্ন মাত্র নাই। ষ্টেশনে বাবুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম, অনুকূলকে সকলেই বড়লোক বলিয়াই জানে। আমাকে তাহার বিশেষ বন্ধু জানিয়া সকলেই আমাকে বিশেষ যত্ন আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যে এখানে পাল্কী কি গাড়ী পাইবার কোনই উপায় নাই, জমিদার বাড়ী হইতে পাল্কী না আসিলে, হাটিয়া যাইতে হইবে। জমিদার বাড়ী ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পথ।

তিন ক্রোশ পথ অধিক নহে, আমি হাটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। ষ্টেশনের বাবুরা সঙ্গে একজন লোক দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি বলিলাম, "মিছে কেন, আমি একলাই যাইতে পারিব। সোজা পথ—ভয় কি?"

আমি তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া দ্রুতবেগে অনুকুলের বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, তবে সূর্য্য পশ্চিমগগনে ডুবিয়াছেন, চারিদিক ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য! সহরের লোক একদিন পল্লিগ্রামে আসিলে তাহার মন অপার আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। আমার হৃদয়-মন যেন আকাশে উড়িতে লাগিল, আমি পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া ধরাইলাম। তাহার পর চুরুট টানিতে টানিতে পল্লিগ্রামের সুবিমল বায়ু সেবন করিতে করিতে পক্ষিগণের মধুর কাকলি শুনিতে শুনিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কত কথাই মনে আসিতে লাগিল, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিয়া আমার চিত্ত এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে কখন পথ ছাড়িয়া অন্য পথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা আমার জ্ঞান ছিল না, সহসা আমি দেখিলাম যে আমি যে পথে আসিতেছিলাম, সে পথ ছাড়িয়া ক্ষুদ্র অপরিসর মাঠের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিকেই মাঠ—কেবলই মাঠ, আর কিছুই দেখা যায় না। বিশেষতঃ তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছিল, স্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছিল না।

আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। একবার ভাল করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, অন্ধকারে ভাল কিছুই দেখা গেল না। রাত্রি যত অধিক হইতেছিল অন্ধকার যেন ততই আরো গাঢ়তর হইতেছিল। আমি কোন দিকে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ফিরিলাম, বড় রাস্তা ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলাম; কিন্তু বহুক্ষণ চলিয়াও বড় রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলাম না। আর এই রাত্রে যে বড় রাস্তা খুঁজিয়া পাইব তাহার বিশেষ কোনরূপ আশা দেখিলাম না। তখন কতবার আমার মনে হইতে লাগিল যে কি কুক্ষণেই ষ্টেশন হইতে লোক আনিলাম না; কিন্তু এক্ষণে আর অনুশোচনায় ফল কি? যে কোন গতিকে প্রাণরক্ষা করিয়া এই মাঠে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। কিন্তু আবার ভাবিলাম, এই মাঠের পথের নিশ্চয়ই একটা শেষ আছে, নিশ্চয়ই এ পথ কোন না কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে। কোন গ্রাম পাইলে নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে আশ্রয় পাইব, বিশেষতঃ এ সকল সমস্তই অনুকুলের জমিদারী। সকলেই তাহার প্রজা। কোন গ্রামে উপস্থিত

হইতে পারিলে নিশ্চয়ই গ্রামবাসিগণ আমার কথা শুনিলে তখনই আমায় মহা-সমাদরে জমিদার বাড়ী লইয়া যাইবে। এই সকল ভাবিয়া আমি দ্রুতপদে অন্ধকারে চলিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম সম্মুখে কি একটা রহিয়াছে। অন্ধকারে সেটা যে কি, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পরে নিকটে যাইয়া দেখিলাম যে সেটা একটা ভাঙ্গা বাড়ী, বোধ হয় এক সময়ে এখানে কাহারও বাসস্থান ছিল, কিন্তু এক্ষণে এই বাড়ীর অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। একটা ভাঙ্গা দরজাও আছে। আমি সেই ভাঙ্গা দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে গিয়া দেখিলাম, একটা ঘর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার আছে। ঘরের মেজে ঘাসে পরিপূর্ণ। দরজা জানালা কিছুই নাই। তবে ছাদ এখনও পড়ে নাই। হাটিয়া হাটিয়া আমি নিতান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; এই রাত্রে, এই অন্ধকারে যে কোন গ্রামে উপস্থিত হইতে পারিব তাহারও বিশেষ কোন আশা নাই; সুতরাং এই ঘরে কোন ক্রমে রাত্রিটা কাটাইয়া দিব স্থির করিলাম।

(২)

জানিনা কখন আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে যে অবস্থা তাহার বর্ণনা হয় না; কতক যেন সুষুপ্তি, কতক যেন জাগরিত ভাব, আমার ঠিক সেই অবস্থা হইল। অথচ আমি কোথায় আছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এই মাত্র বুঝিলাম যে আমি কোথায় ঘাসের উপর শয়ন করিয়া আছি, জ্যোৎস্না আমার মুখে ক্রীড়া করিতেছে, চারিদিক জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে, আর অন্ধকার নাই, চাঁদ উঠিয়াছে।

সহসা আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল, আমি উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু সম্মুখে যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম সেই ভাঙ্গা ঘরের ভাঙ্গা দরজার সম্মুখে এক যুবতী মেম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাকে উঠিতে দেখিয়া তিনি ফিরিলেন, হস্ত দ্বারা তাঁহার পশ্চাতে যাইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। আমি অনুকূলের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তাহাদের দেশে অনেক নীলকুঠি আছে। তাহাই এই রাত্রে এখানে এই মেমকে দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না। ভাবিলাম নিকটে নিশ্চয়ই কোন নীল কুঠি আছে, আমি পথ হারাইয়া সেই নীলকুঠির কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। এই মেম নিশ্চয়ই সেই নীল কুঠির মেম। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে মেম যে বাহিরে

হাওয়া খাইতে বাহির হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমার ভদ্র বেশ ছিল, আমাকে এরূপ স্থানে এই রাত্রে আশ্রয়হীন দেখিয়া তিনি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া রাত্রের মত আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতে ডাকিতেছন। আমি নীরবে মেম সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

সহসা সম্মুখে দেখিলাম একটী সুন্দর পুষ্প উদ্যান, তাহার মধ্যে সুন্দর অট্টালিকা। দূরে নীল প্রস্তুতের কুঠি। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই, আমি এক নীল-কুঠিতেই আসিয়া পড়িয়াছি।

মেম সাহেব নীরবে আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন ; অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া একবার আমার দিকে ফিরিয়া ইঙ্গিত করিলেন। আমায় যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর যাইতে আহ্বান করিলেন। আমিও কোন কথা না কহিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ সেই সুন্দর অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড হল্-ঘর, ঐ ঘরের পার্শ্ব দিয়া সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। প্রাচীরে একটী বড় ঘড়ি সমস্বরে টিক্ টিক্ করিতেছে। এদিকে সেদিকে নানা আসবাব সজ্জিত রহিয়াছে। এই হল ঘরের সম্মুখেই একটী দ্বার, ঐ দ্বারের সম্মুখে একটী সুন্দর পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। মেম সাহেব বাম হস্তে পর্দ্দা সারাইয়া দক্ষিণ হস্তে আমায় সেই গৃহে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটী অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত। প্রাচীরে ভাল ভাল ছবি ঝুলিতেছে। হরিণের শিং, মহিষের মস্তক, ব্যাঘ্রের চর্ম্ম প্রভৃতি নানা শিকার-চিহ্ন গৃহ মধ্যে বিন্যস্ত রহিয়াছে। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা কোন ইংরাজের বাসস্থান ছিল। সিঁড়ির নিকট একটা বড় আলো জ্বলিতেছিল তাহারই আলোতে দেখিলাম, অতি নিকটেই স্তূপাকার পাট জমা রহিয়াছে। সকলই নূতন পাট ; আলোতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, বুঝিলাম সাহেব পাটের চাষও আরম্ভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত মেম সাহেব আমার সহিত একটীও কথা কহেন নাই, অধিকাংশ সময়ই আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু এই গৃহ মধ্যে আসিয়া তিনি প্রথমে আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কেন জানি না, আমার বোধ হইল যেন আমার শিরায় শিরায় বরফ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিলাম মেম সাহেবের ওষ্ঠ—মানুষ কথা কহিলে যেমন উন্মুক্ত হয় ঠিক সেইরূপে উন্মুক্ত হইতেছে, অথচ কোথা হইতে কে যেন আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি এই অভিশপ্ত স্থানে কিরূপে আসিলে ? তুমি কে,—এখানে আসিলে মানুষ জ্বলিয়া

পুড়িয়া মরিতে থাকে। তোমার কি এই মরণের দ্বারে নিদ্রা যাইতে বিন্দুমাত্র ভয় নাই। আমি অনন্তকালের জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।"

সহসা হৃদপিণ্ড পাষাণে পরিণত হইলে লোকের যে ভাব হয় আমারও ঠিক সেই অবস্থা হইল। আমি জীবিত আছি না মরিয়াছি, তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। আমি স্তম্ভিত! মেম সাহেবের ঠোঁট নড়িতেছে স্পষ্ট দেখিতেছি—কিন্তু কই আমার কাণে তো তাঁহার কোন কথাই প্রবেশ করিতেছে না। অথচ আমি শুনিলাম,—তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি! এ সকল কথার অর্থ কি? ইহা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

একবার মনে হইল আমি তখন নিদ্রিত রহিয়াছি, যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি সমস্তই স্বপ্ন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, না আমি সম্পূর্ণই জাগ্রত রহিয়াছি, স্পষ্টতই মেম সাহেবের সহিত নীলকুঠিতে আসিয়াছি, তবে এই মেম সাহেব যে উন্মাদ রোগগ্রস্থ তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না, আমি মনে মনে বলিলাম,—"এইজন্যই এত রাত্রে জ্যোৎস্নায় মাঠের মধ্যে গিয়াছিল।"

সহসা আমার আর একটা কথা মনে হইল। বাড়ীটা অতি নীরব নিস্তব্ধ; এই বাড়ীতে যে জন মানব আছে তাহা মনে হয় না। কুঠিয়াল সাহেব কোথায়? তিনি কি এই মেমের স্বামী? এত বড় কুঠিয়াল সাহেবের নিশ্চয়ই অনেক চাকর লোকজন আছে, তাহারাই বা কোথায়? সম্ভবতঃ অনেক রাত্রি হইয়াছে; নিশ্চয়ই সাহেব ও লোকজনেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল মেমের মাথা গরমের জন্যই এত রাত্রে মাঠে মাঠে বেড়াইতেছিলেন। আমি ইংরাজিতে অতি বিনয়-নম্র-স্বরে বলিলাম,—"আমি পথ হারাইয়া মাঠে আসিয়া পড়িয়াছিলাম; এই প্রথম আমি এ দেশে আসিয়াছি, পথ ঘাট চিনি না। যদি অনুগ্রহ করিয়া এই রাত্রির জন্য এখানে থাকিতে দেন, তবে বড় উপকৃত হইব।"

"মেম সাহেব কোন কথা না কহিয়া আমায় সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম, তিনি আর একটী দরজার পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"যাও, ভিতরে যাও—বিশ্রাম কর?"

আমি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি পর্দ্দা টানিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। দেখিলাম গৃহের মধ্যস্থলে কয়েকখানি চেয়ার এবং একটা টেবিল রহিয়াছে;

টেবিল ধপধপে সাদা চাদরে ঢাকা, তাহার উপর কাচের বাসনে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, কয়েকটা গেলাসে সুপরিস্কৃত জলও রহিয়াছে। বহুক্ষণ কিছু উদরে পড়ে নাই; যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, চিরকাল হোটেলে খাওয়া অভ্যাস, আমি আহার আরম্ভ করিলাম, আহার করিতেছি, চক্ষুও ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছে এই সময় সহসা বাহিরে মনুষ্য কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গিল। পর্দ্দাটা আমার হাতের কাছেই ছিল সহসা বাহিরে কে কথা কহিতেছে দেখিবার জন্য আমি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পর্দ্দাটা সরাইয়া দিলাম। হল ঘরের বড় আলোটাকে আরোও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে,—তাহার সতেজ আলোকে চারিদিক বিভাসিত হইতেছে; আগে যেন সকলই অস্পষ্ট দেখিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে এই বড় ল্যাম্পের আলোকে সকলই স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম সেই মেম একটী সাহেবের সহিত কথা কহিতেছেন,কিন্তু তাঁহার আর সেই সৌম্য স্থির ভাব নাই, ক্ষিপ্ত সিংহিনী মূর্ত্তি যদি কেহ কখনও দেখিয়া থাকেন তবে এই মেমের এখনকার মূর্ত্তির কতকটা ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তিনি স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মানা, মস্তকের কেশ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। আমি এরূপ ভয়াবহ মূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

(৩)

পূর্ব্বে আমি মেমকে ছায়ার মতন দেখিয়াছিলাম, তখন কিছুই দেখিতে পাই নাই, এক্ষণে দেখিলাম তাঁহার বয়স ১৮।১৯ বৎসরের উর্দ্ধ নহে, তিনি পরমা সুন্দরী, তবে তাহার মুখ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যেন কি এক দুঃখের কীট তাঁহার হৃদয়কে কাটিয়া কাটিয়া শতধা করিতেছে। যে সাহেবটী আসিয়াছেন, তিনিও সুপুরুষ যুবক, ২৫।২৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন। বেশ ভূষা দেখিলে সম্ভ্রান্ত সাহেব বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সাহেবের হস্তে একটা ছড়ি। তিনি প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে ছড়ি দিয়া জুতায় আঘাত করিতেছেন, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত মেমের কোন কথারই উত্তর প্রদান করেন নাই। পূর্ব্বে তাঁহারা কি কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমি শুনিতে পাই নাই। এক্ষণে শুনিলাম মেম বলিতেছেন,—"এত দিন পরে আসিয়াছ?" এই কয়টা কথা মেম এরূপ ভাবে বলিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল যেন কোন বিষধর সর্প-গর্জ্জন করিতেছে, তাহার লোলজিহ্বা হইতে বিষ উদ্গিরীত হইতেছে। মেম কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনঃরায় বলিতেছে,

"আমি জানিতাম তুমি আসিবে, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আসিবে। আমি দিনের পর দিন একাকিনী কি কষ্টে কাল যাপন করিতেছি তাহা কি বুঝিবে ?"

আমার বোধ হইল মেম যেন সাহেবের উপর পতিত হইবেন, কিন্তু তিনি আত্ম-সংযম করিলেন, পুনর্ব্বার স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মানা হইলেন। সাহেব তখন অতি গম্ভীর ভাবে অতি কঠোর স্বরে বলিলেন,—চুপ ! আমি এখানে থাকিবার জন্য আসি নাই,—কেবল একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এরূপ ভাবে অধীর হইও না; ইহাতে কোনই ফল নাই। তোমায় অনেক কথা বলিবার আছে, তাই সেই সকল বলিতে আজ এখানে আসিয়াছি,—স্থির হইয়া শুনিবে কিনা তাহাই আমি বিশেষরূপে জানিতে চাই।"

সাহেবের গম্ভীর স্বরে মেম তাঁহার নিকট হইতে কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন,—সাহেবের এরূপ কথা বোধ হয় মেম কখনও আশা করেন নাই,—তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন সহসা কে তাহার বুকে সবলে আঘাত করিল,—মেম দুই হস্তে তাহার বুক চাপিয়া ধরিলেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব, তাহার পর মেম ধীরে ধীরে অতি কাতরতাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"এই জন্যই কি এই বিজন বনে আমি এতদিন আশায় আশায় অপেক্ষা করিতেছিলাম, এই জন্যই কি—

সাহেব হস্ত ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে নীরব হইতে কহিলেন,—বলিলেন "সিবিল ! আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। আমরা বাল্যকাল হইতে একত্রে লালিত পালিত হইয়াছি, একত্রে এক সঙ্গে বড় হইয়াছি; কিন্তু তুমি তো সকলই জান, যে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। তুমি ইহাও জান যে আমি তোমায় সহোদরা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করি। যখন তোমার মার মৃত্যু হইল—যখন তুমি অসহয়া হইলে—

মেম সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"হাঁ, তুমি আমায় পথের কাঙ্গাল দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে ;—হা—বল—বল—আর কি বলিবার আছে বল ?

আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিলাম। দেখিতেছি মেম আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন ; তিনি যে আমাকে আহারের ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার একেবারেই স্মরণ নাই। আর সাহেব, তিনি এই মাত্র এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তিনি আমার কথা কিছুই অবগত

নন। আমি ইংরাজি জানি, ইহাদের সকল কথাই বুঝিতে পারিতেছি; আমার তাঁহাদের ঘরের কথা কিছুতেই শোনা উচিত নয়—কিন্তু উপায় কি? আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কাষ্ঠেই সেই চেয়ারে নিস্পন্দ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলাম;—সম্মুখে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য সংঘটিত হইতে লাগিল।

সাহেব কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"সিবিল, স্থির হও, তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি অবুজ নও। যখন আমি এই নীল-কুটি কিনি তখন তুমি ইচ্ছা করিয়াই কলিকাতা ছাড়িয়া একাকী এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই। তোমার কোন ইচ্ছাতেই আমি কখনও না বলি নাই। তুমি যখন যাহা চাহিয়াছ, আমি তখনই তাহা দিয়াছি, তোমাকে কলিকাতা বা দার্জ্জিলিংয়ে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছি, বিবাহ করিতেও পীড়াপিড়ী করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার সে সব কথার কোন কথাই শোন নাই। তুমি ইচ্ছা করিয়া একাকী এই নীল-কুটিতে বাস করিতেছ। এরূপ একাকী থাকায় তোমার মাথার ঠিক নাই, তুমি কি বলিতেছ তাহা তুমি জান না। না—আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়, কলিকাতায় কিম্বা দার্জ্জিলিংয়ে যাও। এখানে আর থাকিলে তুমি পীড়িত হইয়া পড়িবে।

মেম কেবল ঘাড় নাড়িলেন কোন কথা কহিলেন না। সাহেব বলিলেন, "আমি তোমায় একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

মেম তবুও কোন কথা কহিলেন না, কাতরে দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিলেন। আমি এরূপ কষ্ট আর কখনও কাহারও দেখি নাই। তাঁহার দুই চক্ষু ভেদ করিয়া জল স্রোত আসিতেছিল কিন্তু তিনি তাহা চক্ষেই দমিত রাখিয়াছিলেন, এক বিন্দুও জল চক্ষু হইতে বাহির হইতে দেন নাই।

সাহেবের উপর আমার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম বাল্যকাল হইতেই এই মেম, এই সাহেবকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, কিন্তু সাহেব ইহাকে সেরূপ ভালবাসিতে পারেন নাই। যে কোন কারণেই হউক ইহাকে তিনি বিবাহ করেন নাই;—বিবাহ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহার জন্য যে তিনি বিশেষ দুঃখিত তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। মেমের কাতরতা দেখিয়া তিনি যে বিশেষ প্রাণে বেদনা পাইতেছেন তাহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। তিনি হতাশ ভাবে পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

আবার কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। এ দৃশ্যের উপসংহারে কি ঘটিবে! আমার কি আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকা কর্ত্তব্য? কোথায় বাল্যবন্ধুর বাড়ী যাত্রে আমোদ প্রমোদ করিব, না এ কোথায় আসিয়া কি দেখিতেছি,—কি শুনিতেছি!

আবার সাহেব কথা কহিলেন! তিনি অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে আবার মেমের দিকে ফিরিলেন,—বলিলেন, "সিবিল, বাল্যকালের সকল কথা ভুলিয়া যাও। এক্ষণে আমি তোমাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই শোন। তুমি সে কথা শুনিলে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইবে তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ যত্ন করি তাহার কোনই ব্যতিক্রম হইবে না।"

এই কথায় মেমের এক অভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। নিমিষে তাঁহার সাদা মুখ একেবারে রক্ত শূন্য হইয়া মৃত ব্যক্তির মুখের ন্যায় দেখিতে হইল, তিনি দুই হস্তে প্রাচীর ধরিলেন, নতুবা নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন। সাহেব চমকিত হইয়া চেয়ার হইতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন, অতি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,— "একি! একি! তোমার অসুখ হইয়াছে! তুমি একাকী এখানে থাকিয়া পীড়িত হইয়াছ। আমি যত শীঘ্র হয় তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইব। অন্যে আসিলে তোমার আর এখানে থাকা হইবে না"

মেম অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া সাহেবের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বলিলেন,—"এ্যা! তবে কি তুমি এই কুঠি বেচিয়া ফেলিয়াছ?"

সাহেব বলিলেন,—"তাহাই বলিবার জন্য আজ আসিয়াছি। তোমাকে আমার নিজেই বলা উচিত বলিয়া, আমি নিজেই আসিয়াছি?"

মেম অতি ব্যগ্রভাবে উন্মাদিনীর ন্যায় বলিলেন,—"কি—কি বল?"

অতি উদ্‌গ্রীভ ভাবে মেম প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। সাহেব ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সিবিল, আমি বিবাহ করিয়াছি।"

মেম বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ফিরিলেন;—আমি স্পষ্ট তাহার নিশ্বাসধ্বনি শুনিতে পাইলাম। চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মেমের নিশ্বাস ধ্বনি ও প্রাচীরস্থ ঘড়ীর টিক টিক শব্দ শ্রুত হইতেছে; সাহেব অতি বিস্ময়ে মেমের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া মেমের যে এরূপ ভাব হইবে তাহা তিনি মনে ভাবেন নাই। তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ছিলাম,—যেন আমার স্বাধীনতা, নিজ শক্তি, নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চৈতন্য সমুদিত হইল। আমার জ্ঞান আসিল, দেহে বল দেখা দিল আমি লম্ফদিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমি কি দেখিলাম? দেখিলাম,— মেম সহসা পকেট হইতে এক ক্ষুদ্র পিস্তল বাহির করিয়া, সাহেবের দিকে লক্ষ্য করিলেন। সাহেব অবনত মস্তকে অতি হতাশ বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিলেন এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না। মেম গর্জ্জিয়া বলিলেন, "না তাহা হইতেছে না। তোমাকেও আমার সঙ্গে মরিতে হইবে। প্রাণ থাকিতে তোমায় অপরকে দিব না।"

আমি ছুটিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই চারিদিক পিস্তলের শব্দে আলোকিত হইয়া উঠিল, ধূমে চারিদিকে পূর্ণ হইয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলাম, আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এ কি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল! এ কি সর্ব্বনাশ! এই দূর বিদেশে আসিয়া শেষে কি ভয়াবহ নর হত্যায় জড়িত হইলাম! আমি স্তম্ভিত, নিশ্চল, নিস্তব্ধ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম, আমার নড়িবার বা শব্দ করিবার শক্তি নাই।

ধূম কতকটা বাতাসে উড়িয়া গেলে দেখিলাম সাহেব ভূপতিত হইয়াছেন, চেয়ারখানা উল্টাইয়া পড়িয়াছে। সাহেবের বুক হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। আমি কি করিব জানি না, এই সময় আবার পিস্তলের আওয়াজে সেই অন্ধকার রাত্রি আলোড়িত হইয়া গেল। আবার ধূমে চারিদিক পূর্ণ হইল। আমি সেই ধূম মধ্যে দেখিলাম, মেম সাহেবের বুকের উপর গিয়া পড়িলেন; উভয়ের দেহ হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল।

লোমহর্ষণ ব্যাপার! এ বাড়ীতে কি লোকজন কেহ নাই? চাকর বাকরেরা কোথায়? এই পিস্তলের আওয়াজে তাহাদের কি নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তবে কি এই মেম যথার্থই একলা এই কুঠিতে বাস করিতেছিলেন! তিনি আজ কি সর্ব্বনাশ করিলেন! আমিই বা কোন নিয়তির লিখনে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া, এই ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিলাম। এক্ষণে আমার কি করা উচিত তাহাই ভাবিতেছি, এই সময় আর এক ভয়ানক কাণ্ডে আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। আমি এরূপ ভয়ানক ব্যাপার আর কখনও দেখি নাই। মেম পড়িবার সময় নিশ্চয়ই কোন গতিকে যে বড় আলোটা সিঁড়ির

কাছে ছিল তাহা উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই আলো পার্শ্বস্থ স্তূপাকার পাটের উপর পড়িয়াছে, তাহার আগুনে পাট জ্বলিয়া উঠিয়াছে ;—ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। মেম সাহেবের পোষাকেও আগুন ধরিয়াছে, পাটের আগুন নিমিষে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ জানালা,—কাঠের সিঁড়ি ধরিয়া উঠিয়াছে। ধূমে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আগুনের ঝল্‌কা আমার মুখে লাগিয়া মুখ ঝলসিয়া যাইতেছে। বাহিরের দরজা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে! উপরের কড়ি, বরগায় আগুণ লাগিয়াছে। আর আমার বাহির হইবার উপায় নাই, পুড়িয়া মরি। আমি ছুটিলাম, আমি কি করিলাম,—আমার কিছুই জ্ঞান নাই। এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে, আমি কোন ক্রমে প্রাণ রক্ষা করিয়া সেই ভয়ানক প্রজ্জলিত অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম! তাহার পর কখন আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহা আমার জ্ঞান নাই।

* * * * *

যখন আমার জ্ঞান হইল,—দেখিলাম প্রখর রৌদ্রের তেজে, আমার মুখ পুড়িয়া যাইতেছে, অনেক বেলা হইয়াছে। আমি কোথায়? কিয়ৎক্ষণ কিছুই মনে করিতে পারিলাম না। আমার মস্তিষ্ক যেন কিসে আলোড়িত হইয়া গিয়াছে! আমার স্মরণশক্তি, চিন্তাশক্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি ক্ষীণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। দেখিলাম আমি একটা অর্দ্ধ ভগ্ন ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছি। তখন আবার বিদ্যুৎবেগে রাত্রের সকল কথা মনে হইল। কি ভয়ানক লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়াছি! কি হত্যাকাণ্ড! কি অগ্নিকাণ্ড! কিরূপে যে সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি হইতে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে তাহা আমি জানি না। এখনও যেন সেই ভীষণ ধূমে আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে,—সেই বিভীষিকাপূর্ণ আগুনে মুখ ঝলসাইয়া যাইতেছে। সহসা আমার মনে হইল কাল রাত্রে অন্ধকারে পথ ভুলিয়া এইখানেই আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পর এই স্থান হইতে মেমের সহিত কুঠিতে গিয়াছিলাম। কুঠিতে আগুণ লাগিলে, প্রাণ রক্ষার জন্য ধূমের ও আগুণের মধ্য দিয়া আমি উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিলাম। এ সব আমার বেশ মনে পড়ে,—তাহার পর যে কি হইয়াছিল, তাহার কিছুই আমার স্মরণ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আমি আবার সেই ভাঙ্গা ঘরে আসিয়া পড়িয়াছি।

সাহেব ও মেমের কি হইল! সাহেব যে হত হইয়াছিল তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ;—মেম যে আত্মহত্যা করিয়া সাহেবের বক্ষে পড়িয়াছিলেন তাহাও

আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি। নিশ্চয়ই তাহারা দুইজনে নীলকুঠিতে পুড়িয়া মরিয়াছে। নীল-কুঠির এখন কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিবার জন্ম আমি বাহিরে আসিলাম,—কিন্তু যাহা দেখিলাম—তাহাতে একেবারে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

আশ্চর্য্য! আমি কাল মেমের সহিত যে কুঠিতে গিয়াছিলাম তাহার কোন দিকে কোন চিহ্ন নাই। যতদুর দৃষ্টি যায় চারিদিকে মাঠ,—বিস্তৃত মাঠ! ইহা কি সম্ভব যে আমি কুঠি হইতে ছুটিতে ছুটিতে বহুদুর আসিয়া পড়িয়াছি, না,—তাহা কখনই সম্ভব নহে। যতদুর আমার মনে হয়, আমি অধিক দূর ছুটি নাই—বিশেষতঃ আমি মাঠের মধ্যস্থ যে ভাঙ্গা ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম,—এক্ষণে আবার সেই ঘরেই রহিয়াছি! এটা আমার বেশ মনে হয় যে আমি এই ঘর হইতে ৫।৭ মিনিটেই কুঠিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কোন দিকে কুঠির কোন চিহ্ন নাই।

ইহাতে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা বলা বাহুল্য। আমি বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কাল যাহা দেখিয়াছি তাহা এখনও জলন্ত ভাবে আমার চক্ষের উপর রহিয়াছে। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি—না কিছুতেই স্বপ্ন নহে; আমি কাল রাত্রি যাহা দেখিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জাগ্রত অবস্থায় দেখিয়াছি আমি আর তিলার্দ্ধ তথায় অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না,—বন্ধুর বাড়ীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিলাম।

সেজন্য আমায় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। আমি আসিবার সময় অনুকুলকে একখানা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম। টেলিগ্রাফ পাইবামাত্রই সে লোকজন ও পাল্কী ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিল। তাহারা ষ্টেশনে আমার কথা শুনিয়া তখনই আমার সন্ধানে ফিরিয়াছিল কিন্তু জমিদার বাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়াও আমার সন্ধান না পাইয়া সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভোর রাত্রে অনুকুল নিজে বহু লোকজন লইয়া আমার সন্ধানে বাহির হইয়াছিল সুতরাং শীঘ্রই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনুকুল বলিল, ব্যাপার কি,—কোথায় রাত্রে ছিলে?"

আমি বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলাম—অন্ধকারে পথ ভুলিয়া মাঠে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। অনেক চেষ্টাতেও পথ খুঁজিয়া পাই নাই। রাত্রে ঐ ভাঙ্গা ঘরটায় শুইয়াছিলাম—করি কি?" অনুকুল হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তোমার যেমন কাণ্ড।"

*

আহারাদির পর আমি ও অনুকুল একত্রে শয়ন করিয়া আছি। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনবরত আমার মনে কাল রাত্রের কথা উদিত হইতেছে। আমি কিছুতেই তাহা মন হইতে দূর করিতে পারিতেছি না। অনুকুল আমার অসামঞ্জস্য ভাব দেখিয়া বলিল—"সকাল হইতেই তোমাকে অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন ?"

আমি বলিলাম,—"ভাই আমি কাল রাত্রে যেখানে ছিলাম সে জায়গাটাকে কি বলে ?"

অনুকুল আমার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল,—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল,—"হাঁ তখন ততটা লক্ষ্য করি নাই, তুমি কাল রাত্রে পড়ো কুঠিতে ছিলে,—"কিছু দেখিয়াছ কি ?"

আমি বলিলাম,—"কেন ? সেখানে কি কিছু দেখিবার আছে ?" অনুকুল বলিল,—"সত্যি মিথ্যা জানি না ; লোকে বলে পড়ো কুঠিতে ভূত আছে, তুমি সমস্ত রাত্রি সেখানে কাটাইয়াছ, কি দেখিয়াছ বল।"

আমি বলিলাম,—"আমি যাহা দেখিয়াছি সবই বলিব,—কিন্তু লোকে কিসের জন্য এখানে ভূত আছে বলে—বলিতে পার ?"

অনুকুল বলিল,—"আমি যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটা নীলকুঠি ছিল। জন লিষ্টার নামে একজন সাহেব ঐ কুঠিটা কেনেন, কিন্তু তিনি বড় কুঠিতে থাকিতেন না—কখন কখন আসিতেন মাত্র। কুঠিতে তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় ভগিনী বাস করিতেন,—শুনিতে পাই তাহার নাম ছিল সিবিল। তিনি একাকী কুঠিতে থাকিতেন আর কোন মেম সাহেব কুঠিতে ছিলেন না। লোকে বলে এই সিবিল জন লিষ্টারকে বড় ভাল বাসিতেন তবে সত্য ও মিথ্যা জানি না। সিবিল খুব ভাল মেম ছিলেন, তাঁহার প্রশংসা এখনও এদেশের অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। জন সাহেব বিবাহ করিয়া সিবিলকে সেই সংবাদ দিবার জন্য একদিন অনেক রাত্রে কুঠিতে আসেন। ষ্টেশনের লোকে তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়াছিল। তাহার পর কি হইয়াছিল, কেহ জানে না। হঠাৎ রাত্রে কুঠিতে আগুন জলিয়া উঠে ; চাকর লোকজনেরা ছুটিয়া আইসে, কিন্তু কিছুতেই আগুন নিবাইতে পারে না, কুঠি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সাহেব ও মেম দুইজনকেই আর পাওয়া যায় না ; তাহাতেই লোকের বিশ্বাস তাঁহারা দুজনই কুঠিতে পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। লোকে বলে যে

মেম নাকি ভূত হইয়া পড়ো কুঠিতে আছে। রাত্রে সময় সময় অনেকে নাকি এক মেমকে এই পড়ো কুঠিতে দেখিয়াছে। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু এ দেশের সকল লোকেরই বিশ্বাস যে কুঠিটায় ভূতের দৌরাত্ম্য আছে।”

আমি বলিলাম, ভাই, জন সাহেব ও এই সিন্থিলের মৃত্যু সম্বন্ধে জগতের বোধ হয় কেহই কিছু জানে না, আমি তাহাই জানিতে পারিয়াছি। আমি তাহাদের মৃত্যু দৃশ্য চক্ষের উপর দেখিয়াছি।”

অনুকুল অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “সে কি ?”

তখন গত রাত্রে আমি যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম সমস্তই অনুকুলকে বলিলাম, সে বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহা কি স্বপ্ন ? যদি তাহাই হয় তবে এরূপ স্বপ্ন আমার মস্তিষ্কে আসিল কিরূপে ? অথবা ইহা প্রকৃতই ভৌতিক কাণ্ড ? এটা স্থির, সংসারে যাহা ঘটে তাহা কখনই বিলুপ্ত হয় না, তাহার ফটোগ্রাফ যেন বাতাসে অঙ্কিত হইয়া থাকে। সময় বিশেষে কেহ কেহ সেই ছবি দেখিতে পায়। কাল রাত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা কি এইরূপ ছবি মাত্র ? কে তাহার মীমাংসা করিবে!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

গৃহ-লক্ষ্মী।

হরিবিলাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, “ভাই বড় বিপদ, টাকা তো পাওয়া গেল না। দলিলে নাকি গোল বেরিয়েছে, তারা দিদি তীর্থ থেকে না ফিরলে টাকা কিছুতেই পাওয়া যাবে না।”

“অ্যাঁ কি বলচ !” বলিয়া হেমেন্দ্র পাষাণ-মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না এবং বিশ্বাস করিতেও তাহার মন সরিল না। হেমেন্দ্র ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সে জাগিয়া আছে কিম্বা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। আজ সন্ধ্যার সময় যে তাহার একমাত্র কন্যা আদরিণীর বিবাহ! বহুকষ্টে একটি ভাল পাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, তাই সে ভিটাটি অবধি বন্ধক রাখিয়া কন্যাটিকে পাত্রস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এখন যদি বিবাহ না হয় তবে তাহা হইলে তাহার জাত যাইবে, এ গ্রাম ছাড়িয়া তাহাকে পলাইতে হইবে। অবশেষে হয়ত ;—সে আর ভাবিতে পারিল না।

এগার বৎসরে পড়িতে না পড়িতে আদরিণীর জন্ম পাত্রের অনুসন্ধান করা হইতেছে। দীর্ঘ তিন বৎসর অনুসন্ধানের পর মনোমত পাত্রটি পাওয়া গিয়াছে। আদরিণীও চতুর্দ্দশ উত্তীর্ণ হইয়া পনোরে পা দিয়াছে। গ্রামের মোড়লেরা কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে হেমেন্দ্রকে নানা প্রকারে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, তাহার কন্যাকে এত বড় করিয়া রাখিয়া সে ভাল কাজ করিতেছে না, এবং এই পাপের জন্ম তাহাকে হয়তো শীঘ্রই ফলভোগ করিতে হইবে।

নির্ব্বিবাদী সদা-প্রফুল্ল হেমেন্দ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির আর একটী লোক হইয়া গেল। সে বসিয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল;—দুইটী কম্পিত হস্ত দিয়া হরিবিলাসের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল, "হরি!"

হরিবিলাসও এতক্ষণ কেবলই চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু টাকা সংগ্রহ করিবার কোন উপায়ই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হেমেন্দ্রের দুঃখে তাহারও অন্তর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, সে যে হেমেন্দ্রের ছেলেবেলার বন্ধু; মুখের দুটো মিষ্ট কথার বন্ধু নহে, অন্তরের বন্ধু। সেও হেমেন্দ্রের মত সামান্য চাকরী করিয়া স্ত্রীপুত্রের অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে।

এই বিপদে দুইজনে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলে সবই একেবারে পণ্ড হইয়া যাইবে এই ভাবিয়া হরিবিলাস যথাসাধ্য আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া হেমেন্দ্রকে কহিল,—"এখন থেকে হাত পা ছেড়ে দিলে তো চলবে না, চল দুজনে গ্রামের লোকের হাতে পায়ে ধরে দেখি, যদি কিছু টাকা ধার করতে পারি।"

হেমেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল, "তাই চল।" তার পর জানালার উপর একটী ছোট ঘড়ীর দিকে চাহিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। দশটা বাজে। এতক্ষণ প্রায় সব লোকই আপিস চলিয়া গিয়াছে। তবু তাহারা বাহির হইয়া গেল। এক ঘণ্টা অবিরত ঘুরিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এখনি স্যাকরা গহনা লইয়া আসিবে। দুই শত টাকা তাহাকে 'অগ্রিম' দেওয়া হইয়াছে এবং বাকি প্রায় সমস্ত টাকাই তাহাকে শোধ করিয়া দিতে হইবে। টাকা না পাইলে গহনা তো সে দিবেই না, অধিকন্তু অগ্রিম দুইশত টাকাও আর ফেরত পাইবার কোন আশা রহিবে না। দেড় হাজার টাকার গহনা বাদে, আরও পাঁচশত নগদ দিতে হইবে। এতগুলি টাকা এই অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব! অথচ আজ সন্ধ্যার সময় বিবাহ!

হরিবিলাসের স্ত্রীও আজ দুই দিন হইতে হেমেন্দ্রের বাড়ী আসিয়া বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। সে হেমেন্দ্রের বিপদের কথা শুনিয়া স্বামীকে ডাকাইয়া দুই হাতে দুই গাছি শাঁখা রাখিয়া তাহার যে দুই তিনখানি মাত্র অলঙ্কার ছিল, তাহা খুলিয়া দিল। হরিবিলাসের বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। অলঙ্কার কয়খানি হাতে লইয়া নিঃশব্দে সে বাহির হইয়া গেল।

বেলাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল; মাথার উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সেই রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ উভয় বন্ধুর ক্ষুব্ধ অন্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অন্তর ও বাহিরকে সমভাবে দগ্ধ করিতেছিল।

হরিবিলাসের পত্নীর অলঙ্কার কয়খানি বন্ধক রাখিয়া অনেক ধরাধরি করিয়া সাড়ে চারিশত টাকা মাত্র জোগাড় হইয়াছিল। দুই হাজার টাকার কাজ এই সামান্য কয়টি টাকায় চালাইতে হইবে। স্বর্ণকার গহনা ফেরত লইয়া গেল, উপরন্তু অপমান করিয়া শাসাইয়া গেল যে, আদালতের সাহায্যে সে তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবে। শেষে যখন আর ভাবিবারও কোন সময় রহিল না তখন হরিবিলাস একটা মতলব ঠাওরাইয়া হেমেন্দ্রকে কহিল, "এ ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই, বিয়ে দিতেই হবে, শেষে যা হয় হ'বে। নগদ পাঁচ শো টাকার মধ্যে চার শো টাকা দিয়া পাত্রের পিতার হাতে পায়ে ধরেও নিরস্ত করা যাবে, আর ঐ বাকী পঞ্চাশ টাকায় এক কাজ করা যাক," বলিয়া থামিয়া গেল। তাহার গলা যেন কে জোরে চাপিয়া ধরিল, কিছুক্ষণের জন্য তাহার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া গেল। কিন্তু সে আজ দুই হাতে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া ভারি গলায় পুনরায় কহিল, "বাকী পঞ্চাশ টাকায় ঐ ওজনের গিল্টির গয়না কিনে এনে আজকের মত কাজ চালিয়ে দিই, তারপর টাকা পেলে গয়না তৈরী করে দিলেই হবে।"

হেমেন্দ্রের ভালমন্দ চিন্তা করিবার শক্তি অবধি লোপ পাইয়াছিল। সে যেন কলের পুতুলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। চালাইলে তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে চালাইতে পারা যায়—কিন্তু চলিবার শক্তি তাহার নিজের মোটেই ছিল না। তাই হেমেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে হরিবিলাসের কথার প্রতিধ্বনি করিল।

বর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হরিবিলাস গিল্টির গহনা কিনিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল। গহনা আসিল বটে, কিন্তু তাহার এত বড় বয়সের মধ্যে হেমেন্দ্র

গল্প-লহরী

একদিনের জন্যও কাহাকেও ঠকায় নাই, আজ কি করিয়া সে এমন প্রবঞ্চনা করিবে। সে কিছুতেই কন্যাকে ওই গহনাগুলি পরাইতে রাজি হইল না। শেষে হরিবিলাসের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, সে কন্যাকে নিরাভরণ করিয়া সভায় বাহির করিবে। সমস্ত কথা পাত্রের পিতার নিকট অকপটে প্রকাশ করিবে, তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া সময় চাহিয়া লইবে।

কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রের পিতার ব্যবহার হেমচন্দ্রের সমস্ত সঙ্কল্পকে চুরমার করিয়া দিল। নগদ একশত টাকা কমের জন্য সভাস্থ ভদ্রলোক দিগের সম্মুখে হেমেন্দ্রকে দিয়া তিনি হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইলেন। পাত্রের পিতা সুদের কারবার করিয়া থাকেন, একশত টাকা দূরের কথা একটী পয়সা ছাড়িতে হইলে তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠে।

হরিবিলাস আর হেমচন্দ্রের কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। সেই গহনাগুলি দিয়া সাজাইয়া আদরিণীকে বিবাহ সভায় লইয়া আসিল। পাত্রের পিতা গহনাগুলি নিরীক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

পরদিন বর-কণে বিদায় হইবার পূর্ব্বে হেমেন্দ্র আদরিণীকে নিভৃতে ডাকিয়া গদগদকণ্ঠে কহিল, "মা লক্ষ্মী!" পিতার ব্যথিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আদরিণীর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। হেমেন্দ্রের চোখের পাতাও ভিজিয়া উঠিল। আজ হইতে তাহারই জন্য হয়তো তাহার কত সাধের, কত আদরের কন্যাকে গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। এ বাড়ীতে সে যে কোনও দিন কাহারও নিকট একটা কটু কথাও শোনে নাই, পরের বাড়ী অপরিচিতের মধ্যে পড়িয়া সেই আদরিণী কি করিয়া কটু কথা সহ্য করিবে। এই সব চিন্তায় হেমেন্দ্রের বক্তব্যগুলি কিছুক্ষণের জন্য চাপা পড়িয়া গেল। এ দিকে বর-কণে বিদায় হইবার সময় প্রায় হইয়া আসিল। হেমেন্দ্র নিজেকে সামলাইয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—"মা লক্ষ্মী, আমার জন্য তোকে শ্বশুরবাড়ী অনেক গঞ্জনা সইতে হবে। তোর একখানি গয়নাও সোনার নয়,—সব গিল্টির। তোর শ্বশুরের সঙ্গে আমি আজ জোচ্চুরি করেছি, আমার জন্য তোকে তারা শাস্তি দেবে মা, আমার মুখ চেয়ে তোকে তা সয়ে থাকতে হ'বে! বাড়ী বেচে পারি, যেমন করে পারি তোর শ্বশুরের ধার সুধবো। দেড় হাজার টাকার সোণার গহনা তাঁকে বুঝিয়ে দেব।"

হেমেন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিল না, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল। বিলম্ব দেখিয়া হরিবিলাস সেখানে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এ দৃশ্যে

তাহার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। সে হেমেন্দ্রের হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তাহার পত্নী আদরিণীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। আদরিণীর জননী সমস্ত সংবাদই শুনিয়া ছিলেন, কি ভাবে তিনি সময় অতিবাহিত করিতে ছিলেন তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন; সে জ্বালা বাহিরে প্রকাশ হইবার নহে, তুষের আগুণের মত সে জ্বালা রহিয়া রহিয়া আদরিণীর জননীর অন্তরকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

(২)

শঙ্কাকম্পিত হৃদয়ে আদরিণী যে দিন প্রথম শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিল, তাহার শ্বশ্রূ আসিয়া মাতৃস্নেহে তাহাকে ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইলেন। অপরিচিতের মধ্যে থাকিবার যে অসুবিধাটুকু তাহা একদিনের জন্যও আর আদরিণীকে ভোগ করিতে হইল না। সে তাহার শ্বশ্রূমাতার নিকট ভারি আশ্রয় পাইল। আদরিণীকে ঠিক তাহার নিজের মেয়ের মত তিনি দেখিতে লাগিলেন। কন্যা শ্বশুরবাড়ী হইতে কয়দিনের জন্য পিতৃগৃহে বেড়াইতে আসিলে যে ভাবে জননীর নিকট আদর পাইয়া থাকে, আদরিণী তাহার শ্বশ্রূর নিকট ঠিক তেমনি আদর পাইতে লাগিল। সেও সদাসর্ব্বদা বেশ প্রফুল্ল হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু গিল্‌টির গহনার কথা সর্ব্বদা মনের মধ্যে জাগরুক থাকায় মুখখানি ম্লান করিয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত। অপরে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিলেও, তাহার ক্লিষ্ট মুখখানি তাহার শ্বশ্রূর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই; তিনি ভিতরের কথা তো কিছুই জানিতেন না, তাই অনেক ভাবিয়াও, ইহার কোন কারণই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। প্রথমে ভাবিয়া ছিলেন হয়ত পিতা-মাতার বিচ্ছেদে তাহার বধূমাতার মুখখানি এমন ম্লান। কিন্তু দুই তিন দিন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া তিনি এইটুকু বুঝিয়া ছিলেন যে, অন্য কোন একটা চিন্তায় তাহার বধূমাতার সুন্দর মুখখানি এমন মলিন হইয়া থাকে। তাই তিনি একদিন স্নেহ জড়িত কণ্ঠে আদরিণীকে কহিলেন,—"বউ মা, আমি যে তোমার নূতন মা, আমাকে একটা কথা তোমায় বল্‌তে হবে।"

আদরিণী যে কথা এতদিন শ্বশ্রূমাতাকে জানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বলি বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই, কেমন একটা সঙ্কোচ যেন তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত, তাই সেই কথা বলিবার এমন সুযোগ সে ছাড়িল না, অকপটে ও নিঃসঙ্কোচে গহনার কথা তাহার শ্বশ্রূমাতার

নিকট প্রকাশ করিল। আদরিণীর কণ্ঠস্বর, কথা বলিবার ভঙ্গি এবং কাতর দৃষ্টি তাহার শ্বশ্রূমাতার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল, কিন্তু তথাপি তিনি হাসিতে হাসিতে আদরিণীকে কহিলেন, "ছি! তুমি ত ভারী দুষ্ট মেয়ে বাছা, মার কাছে লুকিয়েছিলে! তাই ত ভাবি মেয়ে আমার মুখখানি অমন শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় কেন? আরে পাগলী মেয়ে, তাতে হয়েছে কি? তোমার বাপ মা যা পেরেচেন দিয়েচেন, এখন ত তুমি তাদের একলার মেয়ে নও, তুমি যে আমাদেরও মেয়ে। এখন ত গয়না দেবার ভার আমাদের। তাঁরা তোমাকে কত কষ্টে খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টী করে তুলেছেন, তাহারই দাম কত? ছি! গয়না দেয়নি বলে বুঝি মুখখানি অমন ভার করে থাকতে হয়। আর মুখ ভার করে থাক্‌তে পাবে না!"

আদরিণীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল তাহার শ্বশ্রূমাতা তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া কহিলেন,—"আমি তোমার মা থাক্‌তে তোমার ভয় কি! উনি তোমাকে কিছু বলবেন, তোমার বাপ মাকে অপমান করবেন এই ভয়, আচ্ছা দেখা যাবে ওঁর কত সাদ্দি।"

(৩)

এই ঘটনার পর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। আদরিণী সবে পিতৃগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখনও হেমেন্দ্র গহনার টাকা যোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই তারাদিদি এখনও তীর্থ হইতে ফিরে আসেন নাই এবং তিনি না ফিরিলে কিছুতেই কিছু হইবে না।

শ্বশ্রূর স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় তেমনি সুখে আদরিণীর দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা এমনি একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আদরিণীর সমস্ত সুখের বুঝি একেবারেই অবসান হইয়া যায়।

ভ্রাতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া আদরিণীর শ্বশ্রূ কয়দিনের জন্য সংসারের সমস্ত ভার আদরিণীর উপর দিয়া ভ্রাতার নিকট চলিয়া গেলেন। পাঁচ ছয় দিন আদরিণীর বেশ কাটিল। শ্বশ্রূর অবর্ত্তমানে আদরিণীর শ্বশুর ও স্বামী যাহাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে সে সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিত।

এই সব কার্য্যের মধ্যে সে নিজেকে এমনি ভাবে ডুবাইয়া রাখিয়া ছিল যে, সেই গহনার কথা তাহার আর মনে পড়িত না।

তাই সেদিন সন্ধ্যায় তাহার শ্বশুর আসিয়া যখন তাহার নিকট একখানি

গহনা চাহিলেন, তখন সেই পূর্ব্বের কথা এমনি কঠিন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার মরণ-পথে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সে ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সে কি বলিবে—কি করিবে! তাহার জননীর তুল্য স্নেহময়ী শ্বশ্রূও আজ উপস্থিত নাই, এই বিপদে বুক পাতিয়া কে তাহাকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবে? আজ হইতে তাহার পিতার আর লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না! সে দিন আমাবস্যার রাত্রি। বাহিরের সেই জমাট বাঁধা অন্ধকার তাহার দৃষ্টিশক্তি রোধ করিল তাই কখন যে তাহার শ্বশুর চলিয়া গেলেন সে কিছুই জানিতে পারে নাই।

আদরিণীর শ্বশুর তেজারতি করিতেন এবং এমনি দুই একটা 'দাঁও' আসিয়া মাঝে মাঝে জুটিত। আজ একজন ভারি বিপদে পড়িয়া একশত টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং অনেক কান্নাকাটির পর মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে সুদের হার স্থির হইয়াছে। তহবিলে টাকা না থাকায় এবং গৃহিণী উপস্থিত নাই বলিয়া, আদরিণীর গহনার প্রয়োজন। তাহাই বন্ধক রাখিয়া আজকের মত কাজ চালাইয়া লইবেন, কাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া গহনা ছাড়াইয়া আনিবেন।

পরে আদরিণীর স্বামী আসিয়া যখন তাহার নিকট গহনা চাহিল, তখন সে যেন অনেকটা ভরসা পাইল। সে কাঁদিয়া স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "তুমি বাবাকে বাঁচাও, আমি ভয়ে এতদিন তোমায় কিছু বলিনি, আমার যত গয়না সব গিল্টির—মা একথা জানেন।"

তাহার স্বামী ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা যতগুলি গয়না দিয়েছেন সবই গিল্টির?"

"হাঁ সব গিল্টির। বাবা বলেছেন বাড়ী বিক্রি করে ভাল গয়না তৈরী করে দেবেন। তোমরা তাঁকে মাপ কর,—দয়া কর।"

"ছি ছি, তিনি এম্‌নি জোচ্চোর!"

স্বামীর এই কথায় আদরিণী অন্তরে বড় আঘাত পাইল। তাহারই জন্য আজ তাহার পিতা জুয়াচোর! হে ভগবান, পিতাকে অপমানের হাত হইতে রক্ষা কর!

আদরিণী কাতর কণ্ঠে কহিল,—"আমার বাবা জোচ্চোর নন, তোমার পায়ে ধরে বলছি, তুমি তাঁকে অমন কথা ব'ল না।"

"তিনি জোচ্চোরি কর্ত্তে পারলেন আর আমি বলতে পারব না, এ দেখছি মন্দ নয়। গয়না দিতে পারবেন না, এই কথা বল্‌লেইত হতো, এমন জোচ্চোরি করবার কি দরকার ছিল।"

আদরিণীর স্বামী শ্বশুরের উপর সত্যই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, এম, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে। তাহার নিকট—এরূপ অন্যায় কার্য্য কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে!

আদরিণী কাঁদিয়া কহিল, "এই পোড়াকপালীর মুখ-চেয়ে বাবা এ কাজ করেছেন, না করলে যে আমার বিয়ে হতো না, বাবার যে জাত যেত। ওগো তোমরা তাঁকে দয়া কর—মাপ কর।"

"জোচ্চোরকে দয়া করলে পাপ হয়," বলিয়া বিরক্তমুখে তাহার স্বামী বাহিরে চলিয়া গেল। আদরিণী সেইখানে দুই হাতে বুক চাপিয়া পড়িয়া রহিল। ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল এ বিপদের সময় আমার শাশুড়ীকে ফিরাইয়া আনিয়া দাও ঠাকুর!

সেই রাত্রে পিতাপুত্র স্থির করিলেন, কালই আদরিণীর পিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া গ্রামের দুইটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সম্মুখে গহনাগুলি যাচাই করাইয়া, জুয়াচরি ধরাইয়া দিয়া তাহার পর যেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত তাহা করিতেই হইবে।

আদরিণীও রাত্রে স্বামীর নিকট এ সংবাদ শুনিল। সে অনেক কান্নাকাটি করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার স্বামীর মন টলিল না, শেষে তাহার স্বামী যখন বিরক্ত হইয়া কথার আর উত্তর দিল না, তখন আদরিণীও আর কোন কথা না বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন আদরিণী গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পদে পদে তাহার ত্রুটি হইতে লাগিল, এটা করিতে গিয়া সেটা করিয়া ফেলে, তরকারি কুটিতে আঙ্গুলের খানিকটা কাটিয়া ফেলিল, রক্তে ঘরের মেঝে ভাসিয়া গেল, তাহাতেও তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। শুধু হাতে ভাতের হাড়া, নামাইতে গিয়া কোমল হাতখানি একেবারে পুড়াইয়া ফেলিল, মস্ত একটা ফোস্কা পড়িল। কিন্তু আজ বাহিরের এ সব যন্ত্রণা তাহার অন্তরের যন্ত্রণার তুলনায় এতই সামান্য যে, তাহা সে অনুভব করিতেও পারিল না।

আহারের সময় প্রত্যহ সে শ্বশুর ও স্বামীর অদূরে দাড়াইয়া থাকে, আজও ছিল, অন্যদিন প্রায়ই তাহার শ্বশুর এটা সেটা চাহিয়া লইতেন তাহার স্বামীও ঈঙ্গিতে এটা ওটা চাহিত, কিন্তু আজ কেহ তাহার দিকে একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না এবং যাহা সে প্রথমে পাতে দিয়াছিল তাহাই এক নিশ্বাসে খাইয়া ফেলিয়া মুখ তেমনি নীচু করিয়া উভয়ে উঠিয়া গেল।

আদরিণীর আজ কিছু খাওয়া হইল না। বৈকালে তাহার পিতা আসিবেন, গ্রামের লোকের সম্মুখে তাহাকে অপদস্থ করা হইবে, তাহার পর হয় তো তাহার পিতাকে তাড়াইয়া দিবে, নয় ত পুলিশের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইবে। অভাগিনীর জন্ম তাহার পিতার এত লাঞ্ছনা—সে না থাকিলে তাহার পিতাকে অপমান করে এমন শক্তি কাহার? পিতার এ অপমানের সময় কি করিয়া সে এ গৃহে থাকিবে, একবার তাহার ইচ্ছা হইল আত্মহত্যা করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে সে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু তখনই তাহার পিতার সেই কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল, 'আমার মুখ চেয়ে মা তোকে সব সইতে হবে।' তিনি যে ইঙ্গিতে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন;—তাহার মরা হইল না। পীড়িত আসন্নমৃত্যু সন্তানের শিয়রে বসিয়া মাতা যেরূপ ব্যাকুল হইয়া থাকেন, আদরিণী আজ ঠিক তেমনি ব্যাকুল হইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। সে বড়ই আশা করিতেছিল হয় তো তাহার শ্বশ্রূ আসিয়া পড়িবেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে, তাহার পিতাকে কখনই এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু তাহার পিতা আসিবার সময় হইয়া আসিল। তাহার শ্বশ্রূ তো কৈ আসিলেন না। তাঁহাকে সে কোন সংবাদও দিতে পারিল না। হায়—সে কি করিবে?

(৪)

হেমেন্দ্র একেলা আসে নাই। সঙ্গে হরিবিলাসও আসিয়াছিল। দুই বন্ধুতে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল গহনাগুলি যে গিল্টির তাহা এতদিনে সকলে জানিতে পারিয়াছে এবং হেমেন্দ্র তাহার বৈবাহিকের পরিচয় বিবাহের রাত্রেই বেশ ভাল রকমেই পাইয়াছিল, তাই উভয় বন্ধু পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। তাহাদের বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইবে, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। মেয়েটা হয় তো কত কষ্ট পাইতেছে তাহাই ভাবিয়া তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী! আর একজনের অপরাধে সে যন্ত্রণা পাইবে!

সঙ্কুচিত হইয়া দুই বন্ধু বৈবাহিক ভবনে প্রবেশ করিল। হেমেন্দ্রের বৈবাহিক মৌখিক একটু সৌজন্ম প্রকাশ করিয়া বসিতে বলিলেন। দুইজনে বসিল, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরের ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা ভিতরে শুকাইয়া উঠিল।

অদূরে বিছানার একধারে কষ্টিপাথর হাতে লইয়া একটী লোক বসিয়া আছে এবং আর দুইটী অপরিচিত ভদ্রলোক হেমেন্দ্রের বৈবাহিকের পাশে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। দুই বন্ধুর বুঝিতে আর বাকী রহিল না

যে সেই সমস্ত গহনা যাচাই করিবার আয়োজন হইয়াছে এবং এই দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহারই সাক্ষ্যরূপে আনীত হইয়াছেন। আজ তাহাদের কি অপমানই না ভোগ করিতে হইবে এবং তাহার আদরের মেয়েটা কি যন্ত্রণাই না পাইবে। এর চেয়ে তাহার কন্যার বিবাহ তখন না দিলেই ভাল ছিল, কিন্তু আর এখন ভাবিয়া কোন ফল নাই। যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। উপায় নাই! উপায় নাই!

পিতার আদেশ অনুসারে হেমেন্দ্রের জামাতা সেই গহনার বাক্স বাহিরে লইয়া আসিল। আদরিণী তখন রান্নাঘরের মেঝেয় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। পিতার আগমন সংবাদ সে যথাসময়ে পাইয়াছিল। অভাগিনীর এ দারুণ যন্ত্রণায় সহানুভূতি করিতে কেহ নাই। যন্ত্রণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল!

বাহিরে তখন যাচাই সুরু হইবার আয়োজন হইয়াছে। কাপড়ের খুঁটে কষ্টিপাথরখানিকে ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া স্বর্ণকার একগাছি চুড়ী হাতে লইয়া কষ্টিপাথরের উপর দাগ কাটিতেছে।

এমন সময় আদরিণীর শ্বশ্রূ বাটী ফিরিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহার বধূমাতা রান্নাঘরের মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া ডাকিলেন, "মা লক্ষ্মী।"

আদরিণী চমকিয়া উঠিল। তাহার পর দুই হাতে তাহার শ্বশ্রূর পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "মা বাবাকে বাঁচাও।" আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

তাহার শ্বশ্রূ চাহিয়া দেখিলেন, এ কয়দিনে তাহার বধূমাতা যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার সোনার বরণ কালী হইয়া গিয়াছে। অনবরত কাঁদিয়া তার চোখমুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, কতকটা সান্ত্বনা করিয়া তিনি একে একে সমস্ত কথা জানিয়া লইয়া কহিলেন, তাতে হয়েছে কি, করুক না যাচাই।"

আদরিণী কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "সব যে গিল্‌টির মা।"

"গিল্‌টির গহনা কি কিসের গহনা যাচাই করলে জান্‌তে পারবে। আমার ফিরে আসবারও দেরী সইল না। ও পাড়ার বট্‌ঠাকুর দুজনকে আবার ডেকে আনা হয়েছে। যেমন বাড়াবাড়ি হয়েছে তেমনি জব্দ হোক।"

আদরিণী তাঁহার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না, অবাক হইয়া তাহার শ্বশুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তিনি কহিলেন, "চল আমরা দু'জনে গিয়ে তোমার বাপের জন্ম ভাল করে জলখাবার তৈরী করিগে। তোমার হরি কাকাও এসেছেন, আমাদের কত ভাগ্যি যে দুজনকে আজ এক সঙ্গে পেয়েছি।"

আদরিণী মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার শ্বশুর অনুগমন করিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত সে কিছুতেই হইতে পারিল না। তাহার পিতা হয় তো বাহিরে এতক্ষণ কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতেছেন। তাহার শ্বশুর বোধ হয় সব কথা তলাইয়া বুঝেন নাই। তাই তিনি এ ব্যাপারকে এত সহজভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার পিতার জলযোগের আয়োজন করিতে যাইতেছেন। জলযোগের পরিবর্ত্তে তাহার পিতাকে আজ যে তাড়না খাইয়া এ বাটী হইতে বাহির হইতে হইবে!

স্বর্ণকার গহনাগুলি একে একে যাচাই করিল;—কহিল, "সবগুলিই খাঁটী গিনি সোনার।" স্বর্ণকারের কথায় সকলে অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য হইয়াছিল হেমেন্দ্র ও হরিবিলাস। হেমেন্দ্রের বৈবাহিক অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন, "তুমি খুব ভাল করে যাচাই করে দেখেচ?"

স্বর্ণকার কহিল, "হাঁ মশায়, আমরা গয়না হাতে করেই বলে দিতে পারি;—এ ত যাচাই করে বল্‌চি।"

হেমেন্দ্রের বৈবাহিক ছাড়িবার পাত্র নহেন, কহিলেন, "দেখ তুমি এক কাজ কর, একগাছি চুড়ী কেটে ফেলে যাচাই কর।"

অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহাকে একটু অপটু প্রতিপন্ন করায় স্বর্ণকার মনে মনে ভারি চটিয়া গিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ কাঁচি দিয়া একগাছি চুড়ী কাটিয়া ফেলিল। সকলে উৎসুক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে কষ্টিপাথরখানি হেমেন্দ্রের বৈবাহিকের সম্মুখে আগাইয়া দিয়া কহিল, "আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আপনি মনে কচ্ছিলেন আমি কিছুই জানি না, দেখুন দেখি এ গিনি সোণা কি না? আপনিও ত কিছু বোঝেন।"

হেমেন্দ্রর বৈবাহিক তখন মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, "তাইত, তাইত।"

আগন্তুক ভদ্রলোক দুটী কহিলেন, "এমনি করে বুঝি বেয়াইয়ের সঙ্গে তামাসা কর্‌ত্তে হয়।" তাঁহারা ঠিক করিলেন হেমেন্দ্রর সহিত তামাসা করিবার জন্য এইরূপ আয়োজন করা হইয়াছে।

"তাইত তাইত" বলিয়া হেমেন্দ্রর বৈবাহিক হেমেন্দ্রর হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "ভাই, মাপ কর।"

হেমেন্দ্র যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে বুঝিতে পারিল না, আলাদিনের প্রদীপের সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতার মত তাহার কন্যা আদরিণীর শ্বশ্রূমাতার করস্পর্শে তাহারই প্রদত্ত গিল্টির অলঙ্কারগুলি খাঁটী গিনি সোণায় পরিণত হইয়াছে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

(১)

বুদ্ধুকে পাইয়া অবধি দুর্গা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিল। তার উঠিতে বুদ্ধু—বসিতে বুদ্ধু। বুদ্ধুকে ছাড়িয়া সে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে চাহিল না। তার শৈশব-জীবনের যত কিছু আবদার, উপদ্রব, বায়না সমস্তই বুদ্ধুর শিরে শ্রাবণের ধারার মত অনবরত বর্ষিতে লাগিল! বাপ-মা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দুর্গা বড় দুরন্ত। তার বাপ থানার বড় দারোগা, চোর ডাকাতের যম। কিন্তু হইলে কি হয়, তিন বছরের মেয়ের দস্যিপণার কাছে দারোগা বাবুও হার মানিলেন। গিন্নিরও শরীর তেমন মজবুত নয়, তার উপর বার মাস বিদেশে বিদেশে ঘোরা। সুতরাং দুর্গাকে রাখিবার জন্য একজন উপযুক্ত ভৃত্যের আবশ্যক হইল। সেই সময়ে এক চৌকিদার, কে জানে কোথা হইতে বুদ্ধুকে আনিয়া বাহাল করিয়া দিল। গেঁটা-গোটা কাল জোয়ান, যমের মত ভীষণাকৃতি বুদ্ধুকে দেখিয়া কোথায় দুর্গা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইবে, না যেমন বুদ্ধু আসিয়া "খোকি দিদি" বলিয়া দুই হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইল, অমনি দুর্গা ঝাঁপাইয়া কোলে গিয়া তার প্রকাণ্ড গুম্ফ ধরিয়া টানিতে টানিতে মধুর হাস্যে অমৃতের লহর তুলিল।

নিরক্ষর ভৃত্যের হীন প্রাণের অভ্যন্তরে সেই অমৃতে—কে জানে কোন শূন্য ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিল। অসভ্য বুদ্ধু দুর্গাকে কোলে লইয়া সেই স্বর্গের পরশ

অনুভব করিল। তাহার কঠোর আরক্ত নয়নকোণে দুই ফোঁটা জল দেখা দিল। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া দারোগা বাবু বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে আপন কার্য্যে ও ব্যবহারে বুদ্ধু বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

(২)

কেবল বৃদ্ধা দাসী "বামার মার" সঙ্গে বুদ্ধুর কিছুতেই বনিবনাও হইল না। বামার মা বহু পুরানো বিশ্বাসী লোক। সে ছেলেবেলা হইতে দুর্গার মাকে মানুষ করিয়াছিল, দারোগা বাবুর বিবাহের সময়ে দুর্গার মার সঙ্গে তাহার বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছিল। দারোগা বাবুকে সর্ব্বদাই বিদেশে বিদেশে ঘুরিতে হয় কাজেই তাঁহারও তেমনি একটী লোকের প্রয়োজন। ক্রমে বামার মা দারোগা বাবুর সংসারে গৃহিণীর পদে উন্নীত হইয়াছিল। সে বুড়ী দারোগা বাবুকেও ভয় করিত না এবং দুর্গার মাকেও চোক রাঙ্গাইয়া কথা বলিত।

দুর্গার উপর তার স্নেহের দাবী বুদ্ধুর অপেক্ষা ঢের বেশী। কিন্তু দুর্গা তা মানিত না। সে বুড়ীর কাছে কিছুতেই থাকিতে চাহিত না, দুধের বাটীটা উল্টাইয়া দিয়া ছুটিয়া বুদ্ধুর কাছে পলাইয়া যাইত। কিন্তু বুদ্ধু যখন আদর করিয়া তাহাকে বলিত "খাও খোকি দিদি বিকালে বেড়া'য়ে আনব" দুর্গা তখন বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তার চেয়ে বেশী দুধ অম্লান বদনে খাইত। এ দৃশ্যে বুড়ীর হাড় জ্বলিয়া যাইত। তার হৃদয়ের অখণ্ড স্নেহ ভাণ্ডের উপর যে একটা অচেনা অজানা—কে জানে চোর কি ডাকাত—চাকর আসিয়া ভাগ বসাইবে সেটা তাহার একেবারেই অসহ্য। তার উপর বুদ্ধুর চৌগোপ্পা শোভিত রক্ত-লোচন-যুক্ত বিকট মুখ খানার পানে চাহিলেই বামার মা মনে মনে শিহরিয়া উঠিত। একবার দুর্গার মামার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল—তাদের মুখগুলাও নাকি বুদ্ধুর মত। সুতরাং সে বুদ্ধুকে কিছুতেই ভাললোক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বামার মা যখন তখন কর্ত্তা গিন্নিকে বলত—"তোমরা ছেলেমানুষ, বোঝ না, আমাদের বয়স হল—ঢের দেখেছি; ও চাকর মিন্সে ডাকাত না হইয়া যায় না। এক গা গয়না, কে জানে কখন কি সর্ব্বনাশ ক'রে বসবে।"

কিন্তু বুড়ীর সহস্র নিষেধ ও সতর্কতায়ও কোন ফল হইল না। প্রাচীন বৃক্ষ-হৃদয়ে কোমল বল্লরীর মত বুদ্ধুর বিশাল বক্ষ জড়াইয়া দুর্গা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

(৩)

বুদ্ধুর একটা প্রধান গুণ যে সে মনিবের অবস্থা বুঝিয়া মন যোগাইয়া চলিতে জানিত। অনেক সময়ে দু'একটা জটিল ডাকাতি মোকদ্দমার রহস্য নির্ণয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া দারোগা বাবুর মস্তিষ্ক যখন উত্তপ্ত হইয়া অন্ধকারে ঘুরিত, তখন বুদ্ধুর দু'একটা অযাচিত ইঙ্গিতে দারোগা বাবু আলো দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন—এ বুদ্ধু কে ?

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, তিনিও বুদ্ধুর বুদ্ধি বলে অনেকগুলি ডাকাতি মোকদ্দমার আসামী ধরিয়া সরকারে সুনাম ও উন্নতি অর্জ্জন করিয়া লইলেন। এইরূপে মেয়ের মত বাপও বুদ্ধুর অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। বামার মা বুড়ী অবাক্ হইয়া গেল এবং মনে মনে শঙ্কিত হইয়া ভাবিল—"ডাকাত মিনসে গুণ জানে, হরি রক্ষা করুন, কোন দিন না কিছু সর্ব্বনাশ ক'রে বসে।"

কিন্তু সর্ব্বনাশ করা দূরে থাক সেবার ডাকাত ধরিতে গিয়া বুদ্ধুর কৃপায় দারোগা বাবু প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া আসিলেন।

দারোগা বাবু বুঝিলেন যে বুদ্ধু সহজ লোক নয়। অমন বুদ্ধি, অমন কৌশল, অমন সাহস একটা বড় সর্দ্দারেরও হয় না। কিন্তু বুদ্ধুকে নানারকমে জেরা করিয়াও কোন দিন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে সে কেবল বলিত—"আর কি বলব বাবু আমার ঠিক এমনি এক লেড়কী ছিল, সেই বুঝি দুর্গা হয়ে আপনার ঘরে এসেছে।" একটা বুক ফাটা ব্যাথার চিহ্ন তাহার মুখময় ফুটিয়া উঠিত। রক্ত-চক্ষু-যুগল জলে টলটল করিত। দারোগা বাবু অবাক হইয়া ভাবিতেন 'বুদ্ধু যেই হউক ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা, পাষাণেও প্রাণ আছে।'

ক্রমে দশ বৎসর কাটিল নানাস্থানে নানা মোকদ্দমার কিনারা করিয়া দারোগা বাবু 'ইনস্পেক্টর' হইলেন। সেই বৎসর ধূমধামে দুর্গারও বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন বুদ্ধুও অদৃশ্য হইল। কেহ কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাইল না। দুর্গার মনে বড় আঘাত লাগিল, সে নির্জ্জনে বসিয়া বুদ্ধুর জন্য বড় কান্না কাঁদিল। দারোগা বাবু দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন ভগবান এতদিন তাহার উন্নতির মূল ছেদন করিলেন। কেবল বুড়ী বামার মা মনে মনে সুখী হইল। সে বলিল, হরি তোমাদের রক্ষা করি-

য়াছেন, তোমাদের আপদ গেছে। মিন্সে ডাকাত না হ'য়ে যায় না। আমি তাকে দু তিন দিন নদীর ধারে যমের মত চেহারা তিন চারটে মিন্সের সঙ্গে গুজ গুজ করতে দেখেছি।” কথাটা শুনিয়া দারোগা বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

(৪)

আরো পাচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ইনস্পেক্টর হইয়া দারোগা বাবু গয়ার সদরে বদলী হইয়াছেন।

তাঁহার জামাতা গয়ার এক মহকুমার এক জমীদারের ম্যানেজার হইয়াছেন। দুর্গার একটী দুই বছরের ছেলে হইয়াছে, তাকে লইয়া বুড়ী বামার মা দুর্গার সহিত তাহার শ্বশুর বাড়ীতে রহিয়াছে।

প্রায় বছর খানেক হইতে গয়া জেলার নানাস্থানে ভয়ানক ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছিল। লোকের ধন প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় পুলিশ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই জন্য সরকারের বিশেষ আদেশ ক্রমে ইন্স্পেক্টর বাবু কিছুদিনের জন্য গয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

অনেক বড় বড় ডাকাতি ধরিয়া দারোগা বাবুর সুখ্যাতি ও পদোন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু গয়ায় আসিয়া তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। প্রায় প্রত্যহই এখান সেখান হইতে ডাকাতির সংবাদ আসিতে লাগিল। তিনিও আহার নিদ্রা ও বিশ্রাম ছাড়িয়া নিয়তই চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তবুও কিছুই হইল না। দিন দিন ডাকাতির সংখ্যা বাড়িতেই লাগিল। তিনি প্রায়ই বিমর্ষ হইয়া ভাবিতেন—‘হায় এ সময়ে যদি বুদ্ধু থাকিত?’

একদিন সদরের কাছেই এক মহাজনের গদিতে ডাকাতি হইল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই ইনস্পেক্টর বাবু সদলবলে ছুটিলেন। কিন্তু পুলিস পৌছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ষাট হাজার টাকা লুটিয়া দস্যুদল নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সরকার হইতে ডাকাত ধরিবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইল। উপর হইতে ইনস্পেক্টর বাবুর উপর অনবরত তাড়া আসিতে লাগিল। বুঝি তাঁর মান, সম্ভ্রম, পদ, সব যায়?—হায় বুদ্ধু!

(৫)

দুর্গার স্বামী মধ্যে মধ্যে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। সেদিন ও আসিয়াছিলেন।

শ্বশুর জামাতায় ডাকাতি সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। জামাই বলিল—

"যে রকম সময় পড়েছে তাতে আপনার মেয়ে বলছিলো টাকাকড়ি, গয়না গাঁটি কাছে রাখিতে সাহস হয় না। যদি বলেন ত কাল পরশু সে সব আপনার কাছে রেখে যাই"।

শ্বশুর বলিলেন—"তা ভাল, সাবধানের মার নেই। সেগুলো তুমি কালই আমায় পাঠাইয়া দিও। কিন্তু আজকালের দিনে তোমার বেশীক্ষণ বাসা ছেড়ে বাহিরে থাকা উচিত নয়। তুমি অত বড় একটা ষ্টেটের ম্যানেজার, বদমায়েস-দের নজর পড়া আশ্চর্য্য নয়।"

"আজ্ঞে সে ভয় তত নাই। দশজন নূতন পাক বহাল করিয়াছি পালা করিয়া দিন রাত্তির কাছারীর চারিদিকে পাহারা দেয়, তা ছাড়া বাসাতে চাকর বাকর লোকজন কম নাই। দুটো বন্দুকও আছে।"

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল দেখিয়া জামাতা উঠিলেন। ইনস্পেক্টর বাবু দুইজন চৌকিদার সঙ্গে দিয়া জামাতাকে পৌছাইয়া দিতে বলিলেন। চৌকিদার সঙ্গে লইয়া ম্যানেজার বাবু টমটম হাঁকাইয়া দিলেন।

থানা হইতে জমিদারী কাছারী ক্রোশ দুই আড়াই দূর। পথ ও সকল স্থানে ভাল নয়, তার উপর সন্ধ্যার পরেই মেঘ করিয়া অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছিল। ম্যানেজার বাবু আস্তে আস্তে গাড়ী চালাইলেন।

ক্রোশ খানেক পথ আসিয়াই, ডানদিকে একটা দূর বাগানের মধ্যে হঠাৎ কতকগুলা আলো দেখা গেল। সে স্থানটা তাঁহার কাছারীর সন্নিকট। মাঠের উপর দিয়া গেলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌছান যায়, কিন্তু পাকা রাস্তা ক্রোশ দেড়েক ঘুরিয়া গিয়াছিল।

আলোগুলা—মশালের জোর আলোর মত, একবার জ্বলিয়াই মিনিট দুই পরে আবার নিবিয়া গেল। ম্যানেজার বাবুর মনে কেমন সন্দেহ হইল, তাঁর বুকের ভিতর হঠাৎ ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। তিনি জোরে গাড়ী চালাইলেন।

আধ মাইল পথ আসিয়াই হঠাৎ কিসে ঠোকর লাগিল, ঘোড়া পড়িয়া গেল। গাড়ীখানা উল্টাইতে উল্টাইতে রক্ষা পাইল। বাবুও চৌকিদারদ্বয় লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন। গাড়ীর লণ্ঠনের সাহায্যে তাঁহারা দেখিলেন পথের উপর রাশিকৃত মাঠের ঢেলা কে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ম্যানেজার বাবুর সন্দেহ বাড়িল। সকালে যাইবার সময় ত পথে এরূপ মৃত্তিকা স্তূপ দেখেন নাই। সেই সময়ে দুইটা লোক সেইদিকে লণ্ঠন লইয়া আসিতে-ছিল। কাছে আসিলে ম্যানেজার বাবু দেখিলেন তাহারা কাছারিরই পেয়াদা।

বাবুকে দেখিয়া পেয়াদারা কহিল—"বাবু! আজকার গতিক ভাল নয়, বিকাল বেলা দাসু গোয়ালা কতকগুলো ষণ্ডা জোয়ানকে রায়দের বড় বাগানের ভিতর জমতে দেখেছে। তাদের মধ্যে দু একজন কাছারীর আশ পাশেও নাকি ঘুরে গিয়েছে, তাই শুনে গোমস্তা বাবু আপনার কাছে আমাদের পাঠাইয়াছেন।"

ম্যানেজার বাবুর সন্দেহ দৃঢ় হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই রাস্তা বরাবর বেশ পরিষ্কার দেখে এলি ?"

"না দুই তিন জায়গায় মাটীর ঢিপি।"

তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া চৌকিদারদ্বয়কে বলিলেন "তোরা যত শিগ্‌গির পারিস থানায় যা, শ্বশুর মহাশয়কে খবর দে আজ কাছারীতে বুঝি ডাকাত পড়ে ?"

চৌকিদারদ্বয় থানার দিকে দৌড়িল।

আবার টমটম চলিল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই আবার মৃত্তিকাস্তূপে বাধা পাইল। এইরূপ তিন চারি স্থানে বাধা পাইয়া রাত হইতে লাগিল। এদিকে আকাশের মেঘাড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়া হঠাৎ অত্যন্ত ঝড় উঠিল। দুই পাশে মাঠের মধ্যে রাস্তা, ধারে ধারে বড় বড় বাগান, কোথাও বা গভীর পুষ্করিণী। আশ্রয় স্থান নাই। ক্বচিৎ দু'এক ঘর ইতর জাতীয় চাষার কুঁড়ে।

ম্যানেজার বাবু প্রমাদ গণিলেন। ওদিকে বাটীতে বিপদের সম্ভাবনা, এদিকে ভগবান বাদ সাধিলেন। ঝড়ে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ধূলা উড়াইয়া নাস্তানাবুদ করিতে লাগিল। আর এক পা গমন করাও দুসাধ্য হইল। নিরুপায় ম্যানেজার বাবু পেয়াদা দুইজনের সঙ্গে টম্‌টমের নীচে বসিয়া দুর্গা নাম জপিতে লাগিলেন। ঘোড়াটা ছাড়া পাইয়া তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পাও নড়িল না।

(৬)

সমস্ত দিনটা কাজের ঝঞ্ঝাটে কাটিয়া গেল, কিন্তু বৈকাল হইতে দুর্গার মনটা কেমন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্বামী সকাল বেলাতেই তার পিতার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন এখনও ফিরিলেন না, দুর্গা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল স্বামী ফিরিলেন না। এদিকে আকাশে মেঘ দেখিয়া দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিয়া, সকাল সকাল বাটীর সকলকে খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর স্বামীর ও আপনার খাবার লইয়া শয়ন ঘরে রাখিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। বুড়ী বামার মা খোকাকে লইয়া ইতিমধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঝড় উঠিল, দুর্গা জানালা বন্ধ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল। তারপর একা বসিয়া নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে দুর্গারও ঘুম আসিল, সে মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া শুইল এবং দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

সে কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিল জানে না, হঠাৎ একটা কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তার মাথা ঘুরিয়া গেল।

রাশি রাশি মশালের আলোতে বাড়ী আলোকিত হইয়াছিল। অনেকগুলা যমদূতের মত আকৃতি বিকট চীৎকারের সহিত বাড়ীময় নরকোৎসব আরম্ভ করিয়াছিল। তিন চারিজন পেয়াদা বন্ধন অবস্থায় উঠানে পড়িয়াছিল।

দুর্গা বুঝিল ডাকাত পড়িয়াছে। সর্ব্বনাশ! স্বামী বাটীতে নাই, সে কি করিবে? তাহার মস্তিষ্ক যেন বিকৃত হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দ্বার ভেজাইয়া ঘুমন্ত শিশুকে বুকে তুলিয়া, আঁচলে ঢাকিয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, যথাসর্ব্বস্ব যাউক, তার সমস্ত মাতৃ-স্নেহ ঢালিয়াও সে তার বাছাকে লুকাইয়া রাখিতে চাহিল।

হঠাৎ একটা সজোর ধাক্কায় দ্বার খুলিয়া গেল, সেই সঙ্গে একটা বিকটাকার যমদূত ঘরে ঢুকিয়াই কঠোর স্বরে বলিল, "দে মাগী সিন্দুকের চাবি, গয়না গাঁটী সব খুলে দে, নইলে ছেলে শুদ্ধ জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারবো।"

দুর্গার জ্ঞান লোপ পাইল সে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল "ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি আমার ছেলেকে মেরোনা।"

"ছেলে চাস্‌তো কোথায় কি আছে ঝট্ দে।" দস্যু দুর্গাকে একটা ধাক্কা দিল, দুর্গা দেয়াল ঠেসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—পড়িল না, কষ্টে সমলাইল। দস্যু অত্যন্ত গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাকে চুল ধরিয়া প্রহারে উদ্যত হইল, ঠিক সেই ক্ষণে আর এক জন ভীমকায় গৌটাগোটা লোক ঘরে ঢুকিয়াই প্রথম দস্যুকে ধমকাইল—'হারামি! জেনানার গায়ে হাত? যা ঘাঁটি দেখ।" মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রথম দস্যু দুর্গার চুল ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় ডাকাত বলিল—'ভয় নেই মা, আস্তে আস্তে তোমার গয়না গাঁটী আর টাকা কড়ি যা আছে বার করে দাও। আমার লোক জেনানার গায়ে হাত দিবে না।' ডাকাত ঘরের ভিতর চারিদিকে দেখিতে লাগিল।

দুর্গা চমকিয়া উঠিল। একি? এ কার স্বর? এ স্বর যে নিতান্ত পরিচিত। সে যে জ্ঞান হওয়া অবধি এ স্বর শুনিয়া আসিতেছে! পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুনিয়াছে। আজও সে স্বরের ঝঙ্কার তার কাণে, তার

প্রাণে জাগে, ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল। দুর্গা বেশ করিয়া ডাকাতের পানে চাহিয়া দেখিল। তার পরেই কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিল—'বুদ্ধু দা,—তুমি! তোমার এই কাজ? ডাকাত হয়ে আমাদের মারতে এসেছ?'

হঠাৎ পথিমধ্যে সর্প দেখিলে লোকে যেমন চমৎকৃত হয়, ডাকাতও সেইরূপ চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই দুর্গার মুখের দিকে ভাল করিয়া দেখিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'খোকি দিদি—দুর্গাদিদি, তুমি—তুমি এখানে? মাপ কর—কিছু ডর নেই, পর মুহুর্ত্তেই দস্যু বাহির হইয়া গেল। দুর্গা শুনিল, সে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'ভাই সব—হুসিয়ার, জাল গুটাও, এ হামার বহিনের বাড়ি, এক কৌড়ি বরবাদ না হোয়।"

একজন বলিল—"সর্দ্দার তোম?"

'পিছু মিলবে, সব চলা যাও।' দুর্গা অনুভবে বুঝিল দস্যুরা সকলেই প্রস্থান করিতেছে। তার মনে সাহস ফিরিল, পরক্ষণেই বুদ্ধু আবার ঘরে ঢুকিয়া দুর্গার সম্মুখে নত জানু হইয়া ক্ষমা চাহিল।

(৭)

"বুদ্ধ-দা! তুমি ডাকাত হয়েছ—এমনি করে লোকের সর্ব্বনাশ করছ? আমার বুক ফেটে যায়।"

"মাপ কর দিদি, তিন বছর বয়স থেকে তোকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি। আমি ভাল মানুষ ছিলেম—দেশে ক্ষেত আবাদ ছিল, তোর মত অমনি একটি লেড়কী ছিল। দু'বরষ বর্ষা হল না—ফসল হল না, খাজনা বাকী পড়লো, জমীদারের পেয়াদারা জুলুম করতে লাগলো। কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গেল। নায়েব বেটা যা বল্লে তোর কাছে বলতে সরম হয়—ইচ্ছা হ'ল কুর্ত্তার জিভ টেনে ছিঁড়ে দিই। কুর্ত্তা বল্লে—'তোর খাপসুরুৎ জরুকে দিয়ে দে—খাজনা মাপ হবে, আরো বক্‌সিস পাবি।' আর সইতে পারলুম না। বেটাকে দু লাথি মেরে চলে এলুম; তার পর শত ক্রোশ ভুঁই হেঁটে বাবুর বাড়ী গিয়ে নালিশ করলেম। ফল উল্টা হল। শালা নায়েব কি সল্লা দিলে। সাত দিন বাদে পঞ্চাশ জন লেঠেল এসে, আমার বুক থেকে আমার জরুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—মেয়েটাকে এক লাঠির ঘায়ে শেষ করিয়া দিল। আমি পাগল হলুম।" বুদ্ধু বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বুদ্ধুর জীবন কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুর্গার চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। সে নানা প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধু আবার বলিতে আরম্ভ

করিল। "সেই শালা জমীদারের সর্ব্বনাশ করবার জন্য ডাকাতের দল করলুম। কিন্তু শালার নাগাল পেলাম না। শালা আজ এখানে, কাল সেখানে বেড়ায় আমরাও তাহার পাছে ঘুরিতে লাগলুম। শেষে জানা গেল শালা পাটনায় গিয়েছে। আমরাও পাটনায় গেলেম। ঠিক দাঁওয়ের জন্য কিছুদিন পাটনায় থাকতে হল। দলের লোক নানা কাজে ছড়িয়ে পড়লো—আমি তোমাদের চাকর হলুম। দারোগা বাবু আমায় চিনতে পারেনি, কিন্তু পাকা বুড়িমা ঠিক চিনেছিল, আমি ডাকাত।" বুদ্ধু ঈষৎ হাসিল। দুর্গা 'বামার মার' পানে চাহিল। বুড়ি অবাক হইয়া তাহাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছিল।

"কিন্তু ঈশ্বরের খেলা তোমাকে পেয়ে আমার সে ইচ্ছা দূর হইল। তোমাকে বুকে ধ'রে আমার বুকের জ্বালা নিবলো। তোমাকে আমার সেই মেয়ে ভেবে আমি সব ভুললেম। তার পর তোমার সাদী হল—তুমি শ্বশুর ঘরে চলে গেলে। আমার কাজ ফুরুলো। আমার মন কেঁদে উঠলো, আবার দুনিয়াটা ফাঁকা ঠেকলো; বুকের ভিতর বিচ্ছু কাটতে লাগলো। সেই সময়ে শুনলেম সেই শালা জমীদার গয়ার বাড়ীতে আছে। আমার বুক জ্বলতে লাগলো, সব কথা মনে পড়লো—আমি তোমাদের বাড়ী থেকে পালালুম। আবার দল নিয়ে ডাকাতি সুরু কল্লুম। আমি শোধ নিয়েছি—সে দিন শালার গদি লুটে ষাট হাজার টাকা এনেছি। ইচ্ছা ছিল তলোয়ার খানা তাহার বুকে বসিয়ে দিই। দরকার হল না—টাকার শোকে শালা আপনি মরেছে? ওঃ—দুর্গা দিদি, তুই আমার সেই লেড়কি!" বুদ্ধু আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বুদ্ধুর দুঃখের কাহিনীতে দুর্গার কোমল হৃদয় গলিয়া তাহার চক্ষে ভোগবতীর সপ্তধারা ছুটিতেছিল। সে তাহার শিশুপুত্রকে বুদ্ধুর কোলে দিয়া আপনার আঁচলে তার চক্ষু মুছাইয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুর্গার স্বামী ও পিতা বিস্তর পুলিশ সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকিল এবং অনতিবিলম্বে বুদ্ধুকে বাঁধিয়া ফেলিল। তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্গা পিতার পদতলে লুটাইয়া বলিল "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, 'বুদ্ধুদাকে ছেড়ে দাও'

বুদ্ধু! বুদ্ধু! ইনস্পেক্টর বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

শুষ্ক ফুল।

(১)

এলাহাবাদ সহরে কর্ণেলগঞ্জের নিকট একটী সুন্দর একতলা বাড়ী। চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা ফুলের বাগান, প্রাচীরের নিকটে বড় বড় গাছ। বাহির হইতে কোন লোকের ভিতরের কিছু দেখিবার উপায় নাই। এই বাড়ীতে যদুনাথ রায় বাস করিতেন। যদু বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি স্থানীয় কলেজের প্রোফেসর ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, এক মাত্র কন্যা বিরাজমোহিনী তাঁহার আনন্দের স্থল ছিল। বিরাজমোহিনীর এক বিধবা মাসতুত ভগিনী আছে, সেও এই বাড়ীতে বাস করে, তাহার নাম সুহাসিনী। সুহাসিনীর পৃথিবীতে আর কেহই নাই, তাই বিদেশে আসিয়া ইহাদের নিকট বাস করে। যদু বাবুর বাড়ীর নিকটেই পরেশনাথ বাবুর বাড়ী। পরেশনাথ বাবু যুবক। তিনি বি, এ, পাশ করিয়া স্কুলে মাষ্টারি করিতেছেন। পরেশনাথ বাবু খুব ভদ্রলোক, সর্ব্বদাই যদু বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করেন। বিরাজমোহিনী হারমোনিয়মে গান করে, পরেশ বাবু মনোযোগের সহিত শুনেন। পরেশ বাবু একদিন বলিলেন "বিরাজ, তোমার কি সুমিষ্ট স্বর, এ ফুল নন্দন কাননের যোগ্য।" বিরাজ বড় লজ্জিতা হইল। পরেশ বাবুর সঙ্গে বিরাজের বিবাহ প্রস্তাব হইল। কিন্তু হঠাৎ কলেরা রোগে যদু বাবুর মৃত্যু হইল। বিরাজ তখন আকুল হইয়া কাঁদিল। কিছু নগদ টাকা এবং এই বাটী বিরাজের সম্বল। বিরাজ কয়েক দিন কান্নাকাটি করিয়া, শেষে সংসারের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিল। পরেশ বাবু আসিয়া অনেক সান্ত্বনা দিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আসিতেন। বিরাজ ভগিনীকে বলিল, "দিদি আমার কেহই নাই, তুমি এখন আমার মুরুব্বি, সংসারের ভার তোমার উপর, তুমি দেখে শুনে সব কাজ করবে।" সুহাসিনী বলিল "তোমায় কোন বিষয় ভাবতে হবে না, তুমি সুখে থাক এই আমার ইচ্ছা"। বিরাজের চিরকাল ফুলের গাছে সখ, সে নিজে সেই বাগানে বেল, জুঁই, কামিনী, গোলাপ গাছ রোপণ করিয়াছে। সে একটি ফুল কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না। এই সব ফুলের গাছ যেন তার প্রাণ। পিতাকে হারাইয়া সে এই বাগানে অধিক মনোনিবেশ করিল, এবং আরও সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ রোপণ করিল।

এক স্থানে একটী অশোক গাছ রোপণ করিয়াছিল, তাহার স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিতেছিল। অশোকের চতুর্দ্দিকে গোলাপ; এই কুঞ্জবনে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া বিরাজ সময় সময় কি ভাবিত, আবার সময় সময় মৃদুস্বরে গান করিত।

বিরাজমোহিনী দুইবেলাই বাগানে বেড়ায়, তাহার বিধবা ভগিনী সংসারের কাজ করে। সুতরাং বিরাজের বড় কিছু ভাবিতে হয় না, সে ফুলের মত হাওয়া খাইয়া বেড়ায়। এক দিন বিরাজ বাগানে বেড়াইতেছে, তখন বেলা প্রায় অবসান, সূর্য্য রাঙ্গা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন; ফুর ফুর করিয়া হাওয়া বহিতেছে। বিরাজের এই সময় পরেশ বাবুর কথা স্মরণ হইল! বিরাজ মনে মনে পরেশ বাবুকে ভাল বাসিয়াছে। পরেশ বাবু কি তার মত ভালবাসেন? এই প্রশ্ন তাহার মনে উঠিল। তাহার পিতা পরেশ বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, এখন কি স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে? সে এই সব ভাবিতেছে, এমন সময়ে পরেশ বাবু উপস্থিত হইলেন, মুখখানি মলিন, তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া বিরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, অতি মধুরস্বরে বলিল "কি হয়েছে? মুখখানি বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন?" পরেশ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কিছুই না।" বিরাজও ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিল। পরেশ বাবু বলিলেন "তোমাকে আর কেন কষ্ট দিব? আমার দুঃখ আমিই ভোগ করি।" বিরাজ বলিল "তা হবে না, যদি দুঃখের ভাগী না হ'তে পারি, তবে সুখের ভাগী হবো কেমন করে'? তা হবে না, বলতেই হবে"। পরেশ বাবু কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না, তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার পিতা মৃত্যু সময়ে ঋণ করিয়া যান, এতদিন পরে মহাজনেরা নালিশ ক'রেছে। আমার আর কি নেবে? আমার জিনিস পত্রে সে টাকা শোধ যাবে না, বোধ হয় আমাকে জেলে যেতে হবে"। বিরাজ এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, সে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, তারপর উত্তর করিল "পরেশ বাবু! সম্ভবতঃ আমি আপনাকে এ দায়ে উদ্ধার করতে পারবো, কত টাকার দরকার?" পরেশ বাবু বলিলেন "সুদ ও খরচা সহ পাঁচ হাজার টাকা হবে"। বিরাজ বলিল "আপনি কাল আসবেন, দেখি আমি কি করতে পারি?" পরেশ বাবু কৃতজ্ঞ হইয়া বলিলেন "বিরাজ, তোমার গুণের কথা আর কি বলবো, আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি দেবী!" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে বাগানে আবার সাক্ষাৎ হইল, বিরাজ পাঁচ হাজার টাকার নোট পরেশ বাবুর হস্তে দিল।

তিন চারি দিন গত হইল, পরেশ বাবুর আর কোন খবর নাই। বিরাজ কিছু চিন্তিত হইল। সে এইরূপ চিন্তিত ভাবে বাগানে বেড়াইতেছে, আশা যে পরেশ বাবু আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন, সে আশা বৃথা হইল। একটি বালক আসিয়া একখানি পত্র বিরাজের হস্তে দিয়া চলিয়া গেল। বিরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পত্রখানি খুলিয়া পড়িল।

বিরাজ,

তোমার নিকট আমি চিরঋণী, এ জীবনে ইহা শোধ করিতে পারিব না। যদি এ জীবন দান করিলে ঋণ শোধ হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত। তুমি বোধ হয় এ টাকা দিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছ। এ টাকার বিষয় তোমাকে বলিতে লজ্জা বোধ হয়, বিশ্বাস করিবে কিনা জানি না। আমি বড় হতভাগ্য, তোমার এত সাহায্যেও আমি ঋণমুক্ত হইতে পারি নাই। টাকাগুলি রাত্রে নিজ বাসায় বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিলাম ; দুর্ভাগ্য বশতঃ সে টাকা অপহৃত হইয়াছে, ভোরে উঠিয়া দেখি একখানি নোটও নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। এ মুখ আর তোমাকে দেখাইব না আমি তোমার নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তোমার পরেশ—

বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার ধারণা হইল এ টাকা নিশ্চয়ই চুরি গিয়াছে। পরেশ বাবু কোথায় গেলেন? একবার যাওয়ার সময় সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন না কেন? এ টাকা বিরাজ কত কষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহার এত টাকা ছিল না, সুতরাং নিজ বাটী ও বাগান বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং সেই টাকা পরেশ বাবুকে দিয়াছে। সে টাকায় কোন কার্য্যই হইল না। এখন এ টাকা শোধ করিবে কি প্রকারে? বিরাজের চিন্তা হইল—উপায় নাই। সে নিজ ভগিনীকে সমস্ত বিবরণ বলিল। তাহার ভগিনী বলিল "বুদ্ধিমতীর মত কাজ কর নাই। পরের জন্য নিজের সব নষ্ট করলে কেন? এখন ত কোন উপায় নাই?" এই ভাবে কতক দিন গত হইল, পরেশ বাবুর কোন খবরই পাওয়া গেল না। মহাজন টাকার জন্য তাগাদা করিতে লাগিল, বহু চেষ্টা করিয়াও বিরাজ টাকা শোধ করিতে পারিল না। অবশেষে মহাজন নালিশ করিল এবং বাড়ী ঘর ক্রোক করিল। বিরাজ কাঁদিল, এতদিন পরে

পৈতৃক বাটীও গেল। দুই ভগিনী স্থির করিল, অন্য কোন স্থানে চলিয়া যাইবে। তাহারা জিনিস পত্র বাঁধিতে লাগিল।

বাড়ী ও বাগান নীলাম হইল, কে খরিদ করিল বিরাজ জানিতে পারিল না। বাড়ী ত্যাগ করিবার জন্য উভয়ে প্রস্তুত হইল।

(৪)

বিরাজ ও সুহাসিনী যাত্রার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের উকীল বাবু আসিলেন। তিনি বলিলেন "বিরাজ, আমি তোমার পিতার বন্ধু, তোমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমি দেখি। খরিদদার একজন বাঙ্গালী বড় লোক, তিনি তোমাদিগকে এ বাড়ীতে থাকিতে দিবেন, কুত্রাপি যেতে হইবে না। তোমাদের ভাড়া লাগ্‌বে না তোমরা দুজনে তাঁহার সংসারের ভার গ্রহণ কর্‌বে এই ইচ্ছা, তিনি সত্বরই এ বাড়ীতে এসে বাস কর্‌বেন।" এই কথা শুনিয়া বিরাজ খুব সন্তুষ্ট হইল, দুই ভগিনী ভগবানকে ধন্যবাদ দিল, উকীলবাবুকে তাহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইল। এবং বাড়ীতেই উভয়ে বাস করিতে লাগিল॥

এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কয়েকটী লোক ঐ বাড়ীতে আসিল, সকলেই বুঝিল বাড়ীর খরিদদার আসিয়াছেন। তিনি একজন রোগী, তাঁহাকে সকলে ধরিয়া একেবারে দ্বিতলে লইয়া গেল। মাথায় পাগড়ী বাঁধা, গায় জামা, মুখখানি প্রায় ঢাকা। দুই ভগিনী তাঁহার চেহারা দেখিতে পাইল না। সঙ্গে ৭।৮ জন ভৃত্য। তাহারা বিরাজকে বলিল, "আপনি নিঃসন্দেহে এখানে বাস করুন, বাবু কলিকাতার লোক, তিনি আপনাদিগকে স্নেহ জানাইলেন আর বল্‌লেন যে, ডাক্তার বাবু বলেছেন কথাবার্ত্তা বলিলে অসুখ আরও বাড়িবে, তাই আপনাদিগের সহিত দেখা করিতে পাচ্ছেন না। একটু ভাল হইলেই আপনাদিগকে ডাকাবেন।" বিরাজ ও সুহাসিনী এক তালায় আসিলেন। আহারাদি উহাদের সঙ্গেই হইতে লাগিল। এক দিন বিরাজ রাত্রি ১২টার সময় দেখিল কে একজন বাগানে চুপে চুপে যাইতেছে, তারপর আবার সে ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তৎপর দিবস দেখা গেল বিরাজের সেই সাধের কুঞ্জবনের অশোক ফুল, গোলাপ, বেল, কতকগুলি কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। বিরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তৎপর দিবসও রাত্রিতে ঐরূপ ফুল অপহৃত হইল। তখন বিরাজ সুহাসিনীকে বলিল "দিদি, এবাড়ী ও বাগান এই ভদ্রলোকের, তিনি প্রকাশ্যেই ফুল নিতে

পারেন, এ ভাবে চুরি করে' ফুল নেওয়ার অর্থ কি? সুহাসিনী বলিল, "আমিও বুঝতে পাচ্ছি না।" এই ভাবে কয়েক দিন গত হইল, রোজ বাগান হইতে ফুল চুরি হইতে লাগিল। বিরাজ এক দিন একজন ভৃত্যের নিকট এ বিষয় জানাইল, সে ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এই ভাবে ১ মাস গত হইল, রোগী উহাদিগকে আর ডাকিলেন না উহারা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল। এক দিন রাত্রে হঠাৎ ভারি গোলমাল হইল। চারি দিকে চীৎকার, ডাক্তার ডাকা, ভৃত্যেরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একজন দৌড়াইয়া আসিয়া বিরাজকে বলিল "আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, বাবু এইবার ডেকে পাঠিয়েছেন।" বিরাজ ও তাহার ভগিনী সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উপরের একটি ঘরে রোগী শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, একজন ডাক্তার নীরবে বসিয়া ঔষধ সেবন করাইতেছে, একজন পায়ের নিকট বসিয়া পদ সেবন করিতেছে। বিরাজ গিয়া দাঁড়াইল, বাবু ইঙ্গিত করা মাত্র দুখানি আসন আনিয়া দিল, উভয়ে উপবেশন করিল। বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—"বিরাজ, এত কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, আমাকে কি চিনতে পাচ্ছ? আমার কথা কি স্মরণ আছে? আমি সেই হতভাগ্য পরেশ। তোমার নিকট বিদায় হ'য়ে আমি কল্‌কাতায় যাই, সেখানে একজন মহাজনের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করি, লক্ষ্মী সদয় হয়েন। তখন মনে করলেম তোমার সঙ্গে এসে সাক্ষাত করি ও টাকা শোধ দেই। হঠাৎ আমার পীড়া হয়, ডাক্তারেরা পশ্চিম বেড়াইতে বলিলেন, এখানে আসিয়া শুনিলাম তোমার বাড়ী নীলাম হ'চ্চে। তখনই উকীলের দ্বারা এ বাড়ী খরিদ করলেম। আমার জীবন এখন প্রায় শেষ, আমার উইল ও যা কিছু নগদ সম্পত্তি সব ঐ সিন্দুকে আছে।" বিরাজ কাঁদিতে লাগিল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল।

পরেশ বাবুর মৃত্যুর পর উকীল বাবু আসিয়া উইল পাঠ করিলেন। এই বাটী ও বাগান তিনি বিরাজকে লিখিয়া দিয়াছেন। এবং নগদ সম্পত্তি প্রায় তিন হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ জীবনে সে আর পরেশ বাবুকে ভুলিতে পারিল না। সে আর বিবাহ করিল না। এখন বহু টাকার অধিকারিণী হওয়াতে অনেক সম্বন্ধ হইল, বিরাজ প্রত্যাখ্যান করিল। সে একখানি উইল করিল, একটি ব্রাহ্মণকে মন্দির নির্ম্মাণ ও একটি অতিথিশালার জন্য তাহার বাটী ও নগদ টাকা সব উইল করিয়া দিল। মন্দিরের নাম হইবে "পরেশ মন্দির"।

যে গৃহে পরেশ বাবু রোগ শয্যায় ছিলেন, সে গৃহে বিরাজের একখানা ছবি পাওয়া গেল, এবং চারিদিকে নানা রূপ ফুল শুষ্কাবস্থায় ছিল। একখানি পত্রে লেখাছিল"*** তোমারই মূর্ত্তি রোজ পূজা করিয়াছি, তাই প্রত্যহ বাগান হইতে ফুল আনাইতাম, সে জন্য রাগ করিও না। তোমার ফুল তোমাকেই দিয়াছি।" বিরাজ দেখিল ফুলগুলি সব শুষ্কাবস্থায় পতিত, সে যত্ন করিয়া "শুষ্ক ফুল" গুলি তুলিয়া রাখিল, এবং রোজ একবার দেখিত।

স্নেহের জয়।

(১)

অতি বৃদ্ধ বয়সের পুত্রকে ফেলিয়া সংসার ত্যাগ করিতে তাহাদের স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বিশেষ আপত্তি ছিল; কিন্তু যমের দরবারে তাহাদের মোকর্দ্দমা একেবারেই খারিজ হইয়া গেল;—সজনীর দেড় বৎসর বয়সের সময় পিতামাতা, এক অতি বৃদ্ধা পিসিমাতার কোলে ও খুল্লতাতের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিল।

খুল্লতাতের নাম—রামতারণ। নিঃসন্তান—যেহেতু দার পরিগ্রহ করেন নাই। বৃদ্ধ লোক ভাল; ভ্রাতুষ্পুত্রটি তাহার প্রাণ!

কলিকাতায় ইহাদের বাড়ী। অবস্থা খুব ভাল।—ধনীগৃহে সজনী দিব্য বাড়িয়া উঠিল।

সজনীর বাল্যকালের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই—সুতরাং ভূমিকা এই মহলেই শেষ করা গেল।

যখন সজনী এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলেজে পড়িতে লাগিল, অনেকগুলি দোষ সেই সঙ্গে প্রবেশলাভ করিল। প্রথমে প্রথমে সে খুল্লতাতের অমতে থিয়েটারে যাইত না, শেষে এমন দেখা গেল যে, খানসামা হরিহর ছাড়া আর কেহ সে সংবাদ পাইত না। রাত্রি অতিবাহন করিয়া, রক্তবর্ণ চক্ষুতে অন্নদৃষ্টি লইয়া, কম্পিত-পদে যখন ভোরের বেলা সে গাড়ী হইতে নামিয়া, বাটীর পশ্চাদ্দিকের সোপান বাহিয়া দ্বিতলে উঠিত, তখন উড়িষ্যাদেশবাসী নিরেট মূর্খ হইলেও হরিহর বেশ বুঝিতে পারিত—বাবু—বেশী দামের তাড়ি খাইয়াছে এবং রাত্রে 'ভাল' জায়গায় ছিল না। টাকা জলের মত তাহার হাত হইতে

গলিয়া যায়; ম্যানেজারের উপর কড়া হুকুম আছে—খুড়া মহাশয় না জানিতে পারে,—সেও ভবিষ্যৎ মনিবের আজ্ঞা অমান্য করিবার স্পর্দ্ধা রাখিত না। কিন্তু অনেক দিনের পর একদিন 'চোরে কামারে' সাক্ষাৎ হইল! সজনীর অবস্থা তখন আদৌ ভদ্রজনোচিত ছিল না, তবে খুড়া মহাশয় নাকি খুব শান্ত প্রকৃতির লোক—তিনি কিছুই বলেন নাই! চোর চুরি করিয়াছে—গৃহস্থ দেখিয়াও যদি কিছু না বলে—চোর আপন মনকে সান্ত্বনা দেয়—গৃহস্থ কিছুই দেখিতে পায় নাই। সজনীও ভাবিল—খুড়া মহাশয় টের পাইলে বকিতেন বা মারিতেন নিশ্চয়!—যখন কিছুই হইল না, তখন তিনি যে দেখিতে পান নাই ও সে আজ খুব বাঁচিয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

(২)

ভোর হইয়াছে—দক্ষিণ দিক হইতে ঝুর ঝুর করিয়া শান্ত বাতাস বারান্দার সদ্যঃ প্রস্ফুটিত ফুলগুলিকে নাড়া দিতেছে—সেই স্পর্শে যেন মাতোয়ারা হইয়া তাহারা গন্ধ বিলাইয়া দিতেছিল; দু' একটা পাখী মাঙ্গলিক প্রভাতসঙ্গীত গাহিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—এই সময়ে সজনী বারান্দা দিয়া নিজ কক্ষাভিমুখে চলিতেছে। চরণদ্বয় বিশেষ আপত্তি করিতেছে, যেন তাহারা ঐ শীতল সমীরণ ও মধুর সুবাসের প্রলোভন ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল না—সজনী কোন মতে দেওয়াল ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে; তাহার বেশ অযত্নরক্ষিত;—মস্তকের দীর্ঘ ও কুঞ্চিত কেশদাম বড়ই উস্কো খুস্কো—মুখ অত্যন্ত ম্লান ও অবসন্ন।

অৰ্দ্ধপথে আসিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—সজনী!

সে স্বর যেন ঝনাৎ করিয়া সজনীর বক্ষে গিয়া লাগিল। সজনী দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। স্বর পুনরুচ্চারিত হইল—সজনি, একটু দাঁড়াও।

ক্ষণকাল পরেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নগ্নগাত্রে, নগ্নপদে সজনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একমুহূর্ত্তকাল একদৃষ্টে সজনীর দিকে চাহিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন—এত রাত্রে?

সজনীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সে বসিয়া পড়িল। আগন্তুক ভদ্রলোক বলিলেন—গাড়ী তৈয়ার আছে—যাও, যেখানে রাত্রি বাস করিয়াছ, দিনবাসও তথায় করিও।

সজনীর কণ্ঠ হইতে জড়িতস্বর কম্পিতভাবে নির্গত হইল—'কাকা'!

আগন্তুক সজনীর খুল্লতাত; তিনি নিম্নাবতরণের সোপান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—যাও—”

সজনী কথা কহিতে সাহস করিল না—সে ধীর পদে চলিল। সোপানের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে খুল্লতাত বলিলেন এ বাড়ীতে আর তোমার স্থান নাই; এ মাটীতে আর পা দিও না—এ বাড়ীর কাহাকেও মুখ দেখাইও না।—যাও।

সজনী নামিতে আরম্ভ করিল; হঠাৎ একটা কথা তাহার অধরোষ্ঠে জাগিয়া উঠিল; সে বলিল—আমার টাকা কড়ি ?

খুল্লতাত কর্কশস্বরে বলিলেন—সিকি পয়সাও নয়; এক কপর্দ্দকও তোমার নাই—কিছুই পাইবে না।—

সজনী বলিতে যাইতেছিল—আচ্ছা পাই কি না, দেখিয়া লইব—বলিল না। বৃদ্ধ যেন তাহা বুঝিয়াই একটু হাসির রেখা অধরে ফুটাইয়া বলিলেন—চলে যাও।

বৃহৎ ফটকের সম্মুখে সুদৃশ্য ল্যাণ্ডোলেট অপেক্ষা করিতেছিল, স্খলিতচরণে সজনী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখনি তাহার মনে হইল—এই শেষবার সে তাহার নিজস্ব গাড়ীতে বসিল; এই শেষবার সে তাহার প্রাসাদোপম অট্টালিকার ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। কথাটা মনে হইবামাত্র সঞ্চিত স্নেহে সে যেমন বাড়ীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তাহার খুল্লতাতের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু নামাইয়া লইল। খুড়া কোচম্যানকে বলিলেন হাঁকায়ে যাও—

অশ্বের পৃষ্ঠে কশা স্পর্শিত হইবামাত্র সে ছুটিল।

তখন পাখীরা গান গাহিতেছে; আকাশ নববর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকচক্ষু হইতে আপনাকে লুকাইবার জন্য সে কাঁধের চাদরখানা টানিয়া মুখের উপরে ফেলিয়া দিল।

(৩)

রবি-কর-স্পর্শে সজনীর চেতনা হইলে সে সুপ্তোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—এমন নিঃসহায় নিঃসম্পর্কীয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে যে তাহার চতুর্দ্দিকে, এই বিস্তৃত বিশ্বে যেন তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই; কিছু নাই। ভোর বেলা সে যখন পিতৃব্য কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল, এমন নিদারুণ অবস্থার কথা সে ভাবিতে পারে নাই। গাড়ী তাহার আজ্ঞাক্রমে পূর্ব্বে যেখানে আসিত, এখনও সেইখানেই আসিয়া তাহাকে নামাইয়া

দিয়া গেল,—কোচম্যান সহিস লম্বা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল; সে সেই গৃহেই উঠিয়াছে,—গৃহস্বামিনী তাহার বর্ত্তমান অবস্থা জানিলে বোধ করি স্থান দিত না—সজনী সে কথা বলে নাই।

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। সোনালি রঙের রৌদ্র ক্রমশঃই গাঢ় রঙে পরিণত হইতেছে, সজনীর সেই একই অবস্থা। সজনী ভাবিতেছিল—হয় ত খুড়া মহাশয় ডাকিয়া তাহাকে ফিরাইবেন; রাগ কমিলেই সজনীর খোঁজ হইবে কিন্তু তাঁহার দৃঢ়তার কথা ভাবিয়া সজনী প্রতি মুহূর্ত্তেই নিরাশ হইতেছিল। তাহার খুড়া মহাশয় অল্প কথা কহিতেন, রাগ তাঁহার ছিলই না বলিলে হয়, তবে যখন রাগিতেন একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন—তাই সজনীর হৃৎকম্প হইতেছিল, যদি আর তিনি না ডাকেন!

অতি শীঘ্রই ইয়ার বন্ধু বান্ধব আসিয়া জুটিল। কেহ বিয়ার, কেহ হুইস্কি, কেহ মাংস, কেহ বা ছোলা ভাজা প্রভৃতির ফরমাস করিল—সজনী অতি কষ্টে, রুদ্ধকণ্ঠে তাহার নিদারুণ অবস্থার বিষয় বিজ্ঞাপিত করিল। প্রথমে কেহ তা বিশ্বাস করিতেই চাহে না—সজনীর রঙ্গ-অভিনয়-শক্তির প্রশংসা করিয়া চলিল—কিন্তু তাহার অশ্রুসজল চাহনি, দীন মুখভাব শীঘ্রই তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। চক্রের মধু শেষ হইবার সঙ্গেই যেমন উহাদিগের বহুশ্রম-সৃষ্ট চক্র ত্যাগ করিয়া যাইতে মক্ষিকা আদৌ ইতস্ততঃ করে না—বন্ধুগণ সেইরূপ উপেক্ষার হাসি হাসিয়া সকলেই চলিয়া গেল। তাহারা ত হাসিয়া গেল,—গৃহস্বামিনী হাসিল না—রোষপূর্ণ বাক্যে তাহার গৃহ খালি করিয়া দিতে আজ্ঞা করিল। সজনী দ্বিরুক্তি করিল না।

রাস্তায় বাহির হইয়া সে কোন্ দিকে যাইবে ঠিক করিতে পারিল না। উদাস ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া পরে চলিতে আরম্ভ করিল। যাহার গন্তব্য স্থানের স্থিরতা নাই তাহার চরণের গতিও অস্থির্হিত। অতি ধীরে ধীরে সে গঙ্গাতীর সম্মুখবর্ত্তী পথে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন স্নানার্থিনীর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে কেবল বর্ষিয়সী স্থূলাঙ্গী রমণীগণ বাম হস্তে খাবারের ঠোঙ্গা বগলে সিক্ত বস্ত্রের পুঁটুলি ও দক্ষিণ হস্তস্থিত তুলসীর মালা জপিতে জপিতে ও পুত্রবধূর রন্ধন অপটুতার কথা চিন্তা করিতে করিতে মন্থর গমনে চলিয়াছে; রৌদ্রের তাপ হইতে মস্তকটিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ গামছাখানি ভাঁজ করিয়া মাথায় দিয়াছে—কাহারও কেশরাশি তাহাতেই আবৃত, কাহারও বা একটু ঝুলিয়া পড়িয়া আস্তিত্ব সপ্রমাণিত করিতেছে। সজনী তাহাই

দেখিতেছে। ঠিক এই সময় একটা দুশ্চিন্তা তাহার মনে মনে এক একবার উঁকি মারিতেছিল। পূর্ণাঙ্গী জাহ্নবীর বক্ষোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল আছ্‌ড়িয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গভীর সলিলরাশি মধ্যে ডুবিয়া মরিতেছে, ক্রীড়ার ছলে ভাগীরথীর শীতল বক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে—তাহারও সেই সুশীতল অঙ্কে পড়িয়া দেহ-মন শীতল করিবার জন্য ইচ্ছা হইল।

অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিবার শক্তি তাহার ছিল না—সে অগ্রসর হইল—তাহার সেই ব্যর্থ জীবনকে অতলে ডুবাইবার বাসনা যখন অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখনি তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া অতি কোমল-মধুর, স্মৃতি-পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল—সজনী!

(৪)

যে ডাকিল, সে সজনীর একটী বাল্যকালের বন্ধু। বাল্যের প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য, যৌবনারম্ভে বাধা পড়িয়াছিল,—উভয়ে ভিন্ন পথে চলিয়াছিল—দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ছিল না আজ উভয়ে একত্র স্থানে মিলিত হইল।

তাহার দক্ষিণ হস্ত সংলগ্ন একটী থলিয়া, তন্মধ্য হইতে শাকসবজীর কতকাংশ দেখা যাইতেছিল। এই যুবকের নাম হেমদা। হেমদা সজনীর হাত নিজ হাতের মধ্যে রাখিয়া, ঈষৎ কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—সজনী, তুমি এখানে — এ সময়ে?

সজনী উত্তর করিতে পারিল না; সে একবার হেমদার মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি গঙ্গাবক্ষে স্থির করিল। হেমদার বুঝিতে দেরী হইল না যে নিশ্চয় কোন একটা কারণে সজনী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সে স্নেহসিক্ত স্বরে বলিল—"বাড়ী যাবে না?"

চমকিয়া ফিরিয়া সজনী বলিয়া উঠিল—বাড়ী—কোথায়?

ত্রস্তভাবে হেমদা উত্তর দিল—কাছেই, এস না।—যাবে?

দ্বিধা না করিয়া সজনী বলিল—চল।

হেমদার গৃহে উপস্থিত হইয়া সজনী বৈঠকখানার একটী মুক্তদ্বার কক্ষে ফরাসের উপর শুইয়া পড়িল; হেমদাপ্রদত্ত কিছু খাবার খাইয়া যেন একটু সুস্থ হইল। হেমদা তাহাকে সেখানে বিশ্রাম করিতে বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল।

গ্লাশের পর গ্লাস ব্রাণ্ডি পানে যেমন নূতন করিয়া নেশার মাত্রা জমিতে থাকে, একটি অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে সজনীরও তদ্রূপ মত্ততা আসিল। এই কতক্ষণ, ভগ্ন মনে সে এমন একটি স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, যে

সেথানকার হতাদর ও উপেক্ষা তাহার মনে চিরতরে আসন সংগ্রহ করিয়াছিল এবং সে নিজ মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—এ পৃথিবীতে স্ত্রীজাতির ন্যায় অবিশ্বাসিনী, নেমকহারাম পশু মধ্যেও বিরল। চিন্তার গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারে যখন সে অসহায় বন্দী অবস্থায় ছট্‌ফট করিতেছিল, তখন সম্মুখবর্ত্তী একটি গৃহের ছাদের উপর সজনী একটি বালিকাকে দেখিল—সে কিশোরী। পিঠের অর্দ্ধসিক্ত কাপড়ের উপর একরাশ কালো চুল ছড়াইয়া দিয়া, মাথার সম্মুখভাগে বস্ত্রাংশ স্থাপন করিয়া বালিকা রৌদ্রে কাপড় টাঙ্গাইয়া দিতেছিল; সূর্য্যকিরণ সানন্দে ঝলকিয়া সেই স্ফুট কলিকাসম মুখখানির উপরে পড়িয়া ঝলমল করিতেছিল। সজনী শুইয়াছিল, উঠিল। জানালার ধারে গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে মুগ্ধমোহিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কাপড় টাঙ্গান হইলে বালিকা যখন ফিরিল, তাহার চঞ্চল দৃষ্টি সজনীর পিপাসিত দৃষ্টির সহিত সম্মিলিত হইল। মুহূর্ত্তকাল স্থিরভাবে দেখিয়া বালিকা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তাহার দৃষ্টিটা বুঝি বলিতেছিল—তুমি আবার কে গো?

বালিকা চলিয়া গেল, সজনী তথাপি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; সেই ছাদে পুনরায় একজন কাপড় টাঙাইতে আসিল, সে বেচারী এক বৃদ্ধ;—হতাশভাবে সজনী শুইয়া পড়িল। চিরদিনই তাহার সংযমের বড়ই অভাব—এমন ভাবে সে ছাদের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতেছিল, কেহ দেখিতে পাইলে চোর বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। যে সংসর্গে সে এতদিন ছিল, তথায় সংযম অপেক্ষা অসংযমশিক্ষার সম্ভাবনা বেশী ছিল।

নেশা এই রকমের—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সজনী পূর্ব্বরাত্রের কথা ভুলিতে পারিতেছিল না, আবার এখনি একটি বালিকার রক্তরাগরঞ্জিত অধর, নম্র নেত্র দর্শনে আত্মহারা হইল। কি যেন একটা স্পর্শে সজনী খুল্লতাতের লাঞ্ছনা, গৃহস্বামিনীর কর্কশ ব্যবহার—সব ভুলিয়া গেল। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে যে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিল, এখনই কি এক মোহে বদ্ধ হইয়া সেই ব্যর্থ জীবনেরই অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

হেমদাকে সে গদগদকণ্ঠে কহিল হেমদা, আমরা উভয়ে বাল্যবন্ধু। দু'জনে পৃথিবীটাকে ওলট পালট করিয়াছি; আমাদের বাড়ীতে খাইয়া শুইয়া, পড়িয়া দু'জনে একসঙ্গে কি মধুর বাল্যকালই অতিবাহিত করিয়াছি। সে সব কথা মনে হয় না?

হেমদা বলিল—তা আর হয় না?

সজনী বলিতে লাগিল—মধ্যের বিচ্ছেদ যদিও কিছুকাল আমাদের মধ্যে একটা অন্তরায় আনিয়া দিয়াছে, তবুও আমার মনে হয় বাল্যের সে প্রেম অটুট অভেদ্য! ভাই হেমদা—সব কথা আজ তোমাকে শুনাইব। হয়ত এ পৃথিবীতে তোমাকেই শেষ বলা হইবে।

হেমদা জিজ্ঞাসিল—ওকি, ও কথা কেন বলছ, সজনী?

সজনী বলিল—তাহার স্বর অতি স্থির, ধীর—যে সময়ে গঙ্গাতীরে আমাকে দেখিয়াছিলে, আমি তখন কি ভাবিতেছিলাম জান? আমি ভাবিতেছিলাম গঙ্গার তলদেশে স্থান প্রাপ্ত হইলে কেমন হয়!

এক মিনিট কাল চুপ করিয়া, সে পুনরায় আরম্ভ করিল—ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ আমার জীবনে কি অসীম দুঃখ, কি গভীর শূন্যতা! সে সকল কথা তোমায় বলিব স্বীকার করিতেছি। তুমিও স্বীকার কর, ভাই, যদি কোন মতে তুমি তাহার কোন প্রতিকার করিতে পার, সচেষ্ট হইবে।

হেমদা বলিল—ভাই, সে ত আমার কর্ত্তব্য,—তুমি আমি বন্ধু—বাল্যবন্ধু!

সজনী মাথা নীচু করিয়া বলিল—একদিন সে গৌরব করিতে পারিতাম। যাক, শোন হেমদা বলি, আমার খুড়া মহাশয় আমায় গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন।

"বিতাড়িত করিয়াছেন!"

"হাঁ—বলিয়াছেন, তাঁহার গৃহে আমার আর স্থান নাই।"

"গৃহ কি তাঁহার একার?"

"সম্পূর্ণ একলার। আমার পিতা নিঃস্ব ছিলেন; খুল্লতাত স্বোপার্জ্জিত অর্থে সমস্তই করিয়াছেন।"

"কিন্তু—তাঁহার ত আর কেহ নাই শুনিয়াছি—এক তুমি—"

বাধা দিয়া সজনী বলিল—আমি ছিলাম, এখন আর কেহ নই।

হেমদা বলিল—এ রাগ তাঁহার চিরস্থায়ী হইবে না।

সজনী বলিল—যতদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন স্থায়ী হইবে। তাঁর কথা আর ফিরিবে না।

উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে হেমদা প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—বেশ, পৃথিবীতে সকলেই কিছু ধনবান হয় না—আমিও ধনবান নাই। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই স্বীয় উপার্জ্জনে সংসার চালাইতে পারে।

তুমি যদি রাজী হও, আমাদের আফিসের—বড় সাহেব—আমাকে খুব ভালো-বাসেন, তাঁহাকে বলিয়া আমি তোমার একটা কাজ করিয়া দিই। মাহিনা প্রথমেই বেশী হইবে না—ত্রিশে আরম্ভ, বৎসর খানেক পরে ইনক্রিমেণ্ট দশ টাকা হইবে।

সজনী উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—হেমদা, হেমদা! এ বন্ধুত্ব আমি স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম; মূর্খ আমি, তোমায় ত্যাগ করিয়াছিলাম!

হেমদা বলিল—তুমি ত্যাগ করিলেও আমি তোমায় ত্যাগ করিতে পারি নাই। বাল্যের যে সুখস্মৃতি এখনও আমার মানসগগনে পরিস্ফুট—তাহা তোমাকে লইয়াই পূর্ণ! তুমি আমাদের বন্ধুতা ত্যাগ করিয়াছিলে, তাহাতে দুঃখ হইলেও তোমার পদস্খলনে তাহা অপেক্ষা বেশী কষ্ট হইয়াছিল।"

পূর্ব্বে কথা ভুলিয়া যাও ভাই। মনে কর সে সজনী গঙ্গায় ডুবিয়াছে—আজ হইতে আমি তোমার হস্তচালিত যন্ত্র। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।"

অন্যান্য কথার পর হেমদা বলিল—একবার ওদিকে চেষ্টা করিয়া দেখিলে হইত না?

সজনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কোন দিকে? খুড়া মহাশয়ের কাছে? না—ভাই—দুনিয়ায় সকলেই ধনী হয় না। অর্থের আশায় তাঁহার দ্বারস্থ হইব না। যাহার হেমদা আছে সংসার তাহার কাছে নন্দনতুল্য, স্বর্গ!

সজনী হেমদার আফিসে কাজ করিতেছে—কাজে সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা তাহার মনটা বড়ই ছটফট করে, ক্রমাগত হাই উঠিতে থাকে—কিন্তু সে আর দুশ্চিন্তা মনে স্থান দেয় না। সে হেমদার বৈঠকখানায় বসিয়া থাকে—হেমদা কোথায় ছেলে পড়াইতে যায়—সজনীর দৃষ্টি প্রায়ই সম্মুখের ছাদটির পরে আবদ্ধ থাকে।

যেদিন সে হেমদার কাছে এই ছাদের গোপন রহস্যটুকু বলিয়া ফেলিল,—হেমদা লাফাইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলিল না। সজনী ভাবিল—আবার বুঝি কি অপরাধ করিল। মেয়েটিকে দেখিয়া কুমারী বলিয়াই বোধ হয়—বিবাহিতা ত নহেই—তবে কি করাল বৈধব্য ঐ সিংহাসন শোভিনীর অদৃষ্টে কালটীকা পরাইয়া দিয়াছে! যদি তাহাই হয়—কি দারুণ অপরাধ সে করিয়াছে; সে অপরাধীর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হেমদা জিজ্ঞাসিল—সজনী, একি সত্য কথা?

সজনী স্বর নামাইয়া বলিল—সত্য! সত্য! সত্য! মিথ্যা কেন বলিব?

তখন হেমদা সজনীর হাত ধরিল। ধরিয়া তাহার আঙ্গুলগুলি টানিতে টানিতে বলিল—সজনী, ছবি আমারই এক দরিদ্র আত্মীয়ের একমাত্র কন্যা। আত্মীয়ের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল ছিল; গত বৎসর কয়লার কাজে প্রচুর লোকসান হইয়া গিয়াছে এখন অবস্থা খুব খারাপ। ঐ একটী মাত্র কন্যা—এই পণ মাত্রার মহা মাংসভক্ষণে কন্যাটির বিবাহ দিতে কোনমতেই পারিতেছেন না। ভাই, তুমি যদি দরিদ্রের সে রত্ন দয়া করিয়া গ্রহণ কর—" বলিতে বলিতে হেমদার স্বর আর্দ্র ও ভার হইল। সে উপসংহারে বলিল—ভদ্রলোকের মানসিক অবস্থা এতই খারাপ যে একদিন নাকি [illegible] আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সজনী বলিল—ভাই, ব্যর্থ ও শূন্য জীবন ভার [illegible] দিন তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম সম্মুখে উড়গ পতিত হইলে যে [illegible] নন্দে বিহ্বল হইয়া উঠে,আমিও সেই বালিকার মোহন দৃষ্টি দেখিয়া [illegible] পণ রোপণ করিয়াছি।

হেমদা বলিল—শপথের প্রয়োজন নাই, তোমার কথাই যথেষ্ট।

সেইদিনই হেমদা ছবির পিতার নিকট এই প্রস্তাব করিয়া সম্মতি আনিল। পরে সে সজনীর অজ্ঞাতে তাহার খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি হেমদাকে সজনীর 'ইয়ার' বোলে বিদূরিত করিয়া দিলেন—তাঁহার মুখনিঃসৃত কটূক্তি শুনিয়া সহিস কোচমানও লজ্জিত হইয়াছিল—একথা হেমদা সজনীকে বলিল না।

এদিকে সজনী একপত্রে খুল্লতাতের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। তাহার উত্তরও যথাসময়ে আসিল—ভীষণ!

উভয় বন্ধুতে সে পত্র পাঠ করিল—তাহা এইরূপ।—

"তোমায় যখন গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্কই রাখি নাই। আমার বাড়ীতে ভিক্ষাপ্রার্থী ভিক্ষুকের প্রবেশাধিকার আছে—তোমার নাই; স্মরণ রাখিও। ইতি"

পত্রের কথা অনেকেই শুনিল; যে শুনিল—ছি ছিঃ করিতে লাগিল। সজনী যতই দোষ করিয়া থাকুক, সে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র, সে বালক, আরো সে কুসংসর্গে পড়িয়া খারাপ হইয়াছিল, অন্য উপায়ে তাহাকে শাসন করা চলিত। রামতারণের দুর্নাম দেশব্যাপী হইয়া উঠিল। সজনী কোন কথা বলিল না। সে বিমর্ষভাবেই নিজের মনের ছায়াগুলিকে বিলীন হইবার অবসর দিতেছিল।

হেমদা বলিল—ছ্যাঃ—সে কথা ভাবিয়া আর কি হইবে; খুড়া মাত্রেই ঐ। যতদিন ভাই বাঁচিয়া থাকেন—ব্যস্, তার পরে নিঃসম্পর্ক।

সজনী বলিল—এখন বেশ বুঝিতেছি। উঃ—গাঢ় স্নেহের আবরণ তাঁহার উপরটিতেছিল, ভিতর গরলাক্ত। যদি এই সময় বাবা থাকিতেন!

হেমদা যে একদিন তাহার খুল্লতাতের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, এখন তাহা বলিল; শুনিয়া রোষে, ক্ষোভে সজনী হুতাশনবৎ জ্বলিয়া উঠিল।

(৬)

প্রায় দেড় মাস গত হইয়াছে। হেমদা সজনীর বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে—হেমদার বাড়ী হইতেই হইবে। কাল বিবাহ। নিমন্ত্রণ পত্রে তাহার খুল্লতাতের নাম প্রদত্ত হওয়ায়, তাহার খুল্লতাতের জনৈক প্রসাদভিক্ষু শাসাইয়া গিয়াছে—সজনী বড়ই ভয় পাইয়াছিল, হেমদার ভগ্নীপতি এটর্ণি শ্যামলাল বলিয়াছেন—দেখা যাইবে।

আজ গাত্রহরিদ্রা। বিবাহে বিশেষ ধূমধাম না থাকিলেও কল্যাণময়ী বঙ্গ-ললনাগণের কল্যাণ হস্তস্পর্শে কোন ক্ষুদ্র কার্য্যও নিরুৎসবে সম্পন্ন হয় না—সজনীর গাত্রহরিদ্রার দিনেও হেমদার বাড়ীতে বেশ একটু আনন্দধ্বনি উঠিতেছিল।

কন্যা-পক্ষীয় লোকজন তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছে, সজনী সেইখানেই দাঁড়াইয়া সে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছিল, এই সময়ে মস্তকে বৃহৎ পাগড়ী বাঁধিয়া, পাকা বাঁশের লাঠি হাতে এক ভোজপুরী দ্বারবান আসিয়া তাহাকে বৃহৎ সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে চিনিতে সজনীর দেরী হইল না—সে তাহার খুড়া মহাশয়ের বাড়ীর দারোয়ান লাল সিং। প্রথম মুহূর্ত্তে তাহার উপর সজনীর খুব রাগ হইল, তখনি সামলাইয়া লইল—খুড়া মহাশয়ের কাজের জবাবদিহি করিতে এই বারো টাকা বেতনের খোট্টা পারে না। মনের ভাব দমন করিয়া সজনী বলিল—লাল সিং, খবর ভালো?

লালসিং কাঁদিল না বটে, কিন্তু ফোঁটা দুই অশ্রু আপনিই গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল—আর ভালো, দাদাবাবু! তুমিও আসিয়াছ,—সব গিয়াছে। কর্ত্তার কথায় কথায় খিঁচুনী, চাকরেরা ত মার পর্য্যন্ত খায়—বাড়ী যেন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছে।

সজনী চুপ করিয়া রহিল।

লালসিং বলিল—দাদাবাবু কর্ত্তা ত চাকর ঠেঙ্গাইয়া খিঁচাইয়া বেড়ান, এদিকে সরকার বেটারা আমির হইয়া গেল। কর্ত্তা ত কিছু দেখিতেন না।

সজনী 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিল।

লালসিং বলিল—দাদাবাবু, এ সব আপনারই জন্তে।

সজনী আবার বলিল—হুঁ।

লালসিং তাহার মেরজাইয়ের পকেটে হাত পুরিয়া বলিল—একঠো চিঠি আছে।

সজনী জিজ্ঞাসিল—কে দিয়াছে?

"কর্ত্তাবাবু! আপনাকে"—বলিয়া লালসিং একখানি খাম সজনীর কম্পিত হস্তে অর্পণ করিল।

ধীরে ধীরে আবরণ উন্মোচন করিয়া সে পত্র পাঠ করিল :—

"প্রাণাধিকেষু,

বাবা সজনী, তোমার খুড়াকে তুমি চিনিতে পার নাই—শুধু এই একই কারণে আমরা দুজনেই কষ্ট পাইয়াছি। তুমি ভাবিয়াছ, তোমায় তাড়াইয়া আমি কি নিষ্ঠুরতারই কার্য্যই করিয়াছি; কি সুখেই না দিন যাপন করিতেছি। না বৎস, যে দিন হইতে তুমি এ গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছ, সে দিন হইতে সুখ শান্তি আমার নিকট হইতে একবারে বিদায় লইয়াছে। তথাপি গৃহস্বামী আমি তোমায় ফিরাই নাই। কেন ফিরাই নাই, অন্তে না বুঝিলেও, তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ। বৎস, যে দিন দাদা স্বর্গে গমন করিবার সময়ে তোমাকে আমার বুকের উপর থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—চিরদিন ও'কে ঐ খানেই রাখিস রামতারণ। হায়! আমার দোষে বা অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে তুমি আমার বক্ষঃস্থল হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছিলে—যদি আমি সে সময় তোমায় ডাকিয়া ফিরাইতাম, তাহা হইলে অদ্যকার এ সুখ-ভোগ উভয়ের অদৃষ্টে ঘটিত না।

অযোধ্যাপতি দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে অন্ধ হইয়াছিলেন, তোমাকে দূরে রাখিয়া আমার অবস্থা কি হইয়াছে—তাহা একমাত্র তুমি ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি আমার বুকের এখন সম্পূর্ণ যোগ্য অধিকারী।

যে প্রাতঃকালে তুমি এ বাটী হইতে চলিয়া যাও, তন্মুহুর্ত্তেই আমি তোমার সন্ধানে লোক পাঠাই। যে সমস্ত স্থানে তুমি বাস করিতে, তথায় তোমাকে পাওয়া গেল না;—আমার মনে একটা আতঙ্ক হইল; বক্ষে যেন দাবানল

জলিয়া উঠিল। আমি হাউয়ের মত জলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তারপর, একদিন তোমাকে একটা অফিসের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তুমি সেখানে কাজ কর। সেই আফিসের সহিত আমার কারবার চালিত, তুমি তাহা জানিতে না, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম—তুমি হেমদাকান্ত নামে কোন বন্ধুর আশ্রয়ে আছ, সেই তোমার কার্য্য করিয়া দিয়াছে, শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। একদিন স্বয়ং হেমদার বাটী দেখিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে আমার একটি সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কাছেই শুনিলাম—হেমদা অতি সচ্চরিত্র ও তোমার বিশেষ বন্ধু—শুনিয়া সুখী হইলাম। তিনি বলিলেন—তাঁহার কন্যার সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইবে। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ—অথচ কন্যার পিতা তুমি আমার মত লইলে না? তিনি বলিলেন—লইলে তুমি দিতে না?—আমি কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

এই শুভ মুহূর্ত্ত ভাবিয়া পত্র লিখিলাম—রাজার বিবাহ অরণ্যে হয় না। তোমার গৃহে তুমি ফিরিয়া এস। বৃদ্ধ পিতৃব্যের ত্রুটী ধরিও না, বৎস, ফিরিয়া এস। এই গৃহের প্রত্যেক প্রাণবায়ু তোমার অপেক্ষা করিতেছে—তুমি অবিলম্বে এস।

আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার মঙ্গল করা ব্যতীত এ শেষ জীবনে অন্য কোন কার্য্য নাই।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরামতারণ"

চক্ষের কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু বস্ত্রপ্রান্তে মুছিয়া সজনী লালসিংকে গাড়ী আনিতে বলিল?

লালসিং বলিল,—হুজুর! গাড়ী সঙ্গেই আনিয়াছি। সে তৎক্ষণাৎ হেমদার উদ্দেশে অন্তঃপুরে গমন করিল।

লালসিংএর ইঙ্গিতে চমৎকার ফিটন-গাড়ী হেমদার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল—এ গাড়ী সজনীর খুল্লতাতের।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

রঙ্গ-বারিধি।

তৃতীয় তরঙ্গ।

এক যাত্রায় পৃথক ফল।

রামধন রায়ের নিবাস গোয়াড়ীর নিকট ঘূর্ণীগ্রাম কিছু ভূসম্পত্তি আছে। কন্যা সুশীলা, তার পর পুত্র মহিমচন্দ্র ও ভোলানাথ। মহিম কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যেই এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া পরীক্ষকের দোষে একবার মাত্র এল, এ ফেল হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে একজন সুবিজ্ঞ ও প্রখর বুদ্ধি, এ ধারণা তাঁহার জন্মিবারই কথা। আর তিনি যে কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাধিত হইতে চাহেন না, সেটা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিরই পরিচায়ক। কনিষ্ঠ ভোলানাথের মেধা তাদৃশ নাই, একটু অমনোযোগী, সুতরাং অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম হইলেও এণ্ট্রান্স পাশ করিতে পারেন নাই, কখনও পারিবেন এমন আশাও নাই, তথাপি আপনাকে জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে করিবার কোনও কারণ দেখিতে পান না, তবে ভগবানের দোষে বয়সে হীন হইয়াছেন, কি করিবেন। রামধন রায় পুত্রদ্বয়ের অবস্থা বিলক্ষণ বুঝিতেন। কোন্ পিতা না বুঝেন?

কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে রায় মহাশয় চিৎপুর রোডে একটা বাসা ভাড়া করিয়া আছেন। ছেলেদের কলেজের ছুটি থাকায় তাহারাও আসিয়াছে। সুশীলার স্বামী কলিকাতায় চাকরি করেন, সুশীলা স্বামীর নিকট আছে। ছেলেরা ইতিপূর্ব্বে কখনও কলিকাতা দেখে নাই বলিয়া রায় মহাশয় তাহাদিগকে একাকী বড় একটা বাহির হইতে দেন না, যেখানে যাওয়া হয় নিজেই সঙ্গে করিয়া নিয়া যান। সে দিন কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কন্যা ও জামাতাকে রবিবার তাঁহার বাসায় আসিবার কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন, সঙ্গে পুত্রদ্বয়ও ছিল।

অদ্য রবিবার, বেলা ৭ সাতটা বাজিয়া গিয়াছে এখনও রায় মহাশয়ের পেটের ফিক্-বেদনাটার বিশেষ উপশম হইল না। একটু কমিয়াছে বটে, কিন্তু কন্যা জামাতাকে আনিতে যাইবার ক্ষমতা নাই। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রদের পাঠাইতে হইবে। তিনি মহিমকে বলিলেন,—

"মহিম! সুশীলাকে আনতে পারবে?"

মহিম একটু হাসিয়া বলিল, "পারবনা কেন?"

"সে দিন ত গিয়েছিলে, ১২৮।৩ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, একেলা রাস্তা ঠিক করতে না পার, ভোলাকে সঙ্গে নেও।"

"হুঁঃ ওটাকে নিয়ে কি হবে? ও রাস্তা দেখিয়ে দেবে?"

"বেশ, একেলাই যাও, একটা টাকা সঙ্গে নিও, রাস্তা না চিন্‌তে পার, একখান গাড়ি নিয়ে যাও, এসে ভাড়া দিও।"

"কিছু করতে হবে না, আমি ঠিক যাব।"

"বরাবর ডানদিকে গিয়া বাঁ হাতে রাস্তা।"

"জানি" বলিয়া একটা টাকা লইয়া মহিম বাবু বাহির হইলেন, খানিক গিয়া বামদিকে বীডন ষ্ট্রীট।

'এই রাস্তাটা কি? ডাইনে পুকুর ছিল? কৈনা, একটু আগে যাই।' তারপর রামবাগানের পথ। "অনেকটা এসেছি, এই পথটাই হবে।"

কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে হাল্‌কা হইতে হয়, তা হ'বে না। রামবাগানের ভিতর দিয়া মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িলেন। কলিকাতার পথ অনেক দূর গেলেও হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌছিয়া বড়ই গোলমাল বোধ হইল। কাহাকে জিজ্ঞাসা করা বা ফিরিয়া যাওয়াটা আহাম্মুখের লক্ষণ—চলিতে লাগিলেন। এপথ ওপথ ঘুরিয়া ফিরিয়া একেবারে শেয়ালদহ ষ্টেশন। মনে মনে ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমার ন্যায় বুদ্ধিমানেরও ভুল হয়? কাহাকেও কিন্তু এ কথা জানিতে দেওয়া হইবে না। তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

এদিকে রামধন বাবু বেলা প্রায় নয়টা বাজে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, কনিষ্ঠ পুত্র ভোলানাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভোলা! এদের ত কোনও খবর নেই, মহিম রাস্তা চিনে যেতে পারলে কিনা, বুঝতে ত পারছি না, আমার ফিকটা একটু কমেছে বটে, কিন্তু বেরুলে আবার যদি বাড়ে?"

"বেরিয়ে কাজ কি? দাদা রাস্তা ভুলে ঘুরে বেড়াচ্চে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"বেশ বল্‌লি, আমি নিশ্চিন্ত থাকব?"

"কি করবেন? দিদিকে না হয় আমিই আনতে যাই।"

"তুই আবার কোথায় যেতে কোথায় যাবি?"

"আমি ত দাদার মত শুমুরে নই, রাস্তা না চিন্‌তে পারি জিজ্ঞেস করে নেব।"

"ভাল, না হয় একখান গাড়ি করে নিস্, দুটো টাকা নিয়ে যা, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, ১২৮।৩ নম্বর, বাঁদিকে। মনে থাকবে ত ?"

"১২৮।৩ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, তা আর মনে থাকবে না ?"

"না হয় লিখে নে।"

"দাদার লিখ্‌তে হল না, আর আমার লিখতে হবে ?"

ভোলানাথ বাবু বহির্গত হইলেন, কিন্তু বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে না গিয়া একেবারে বামদিক দিয়া বাগবাজার অভিমুখে চলিলেন।

পথে একজন পাখীওয়ালা বড় বড় খাঁচায় টীয়া ময়না প্রভৃতি পাখী বিক্রয় করিতেছে, তাহার হস্তে বস্ত্রাবৃত একটি ছোট খাঁচায় একটি শালিক পাখী সুন্দর পড়িতেছে। ভোলানাথ দাঁড়াইয়া গেলেন। শালিক পাখীটির দর পাঁচ টাকা চাহিল। ভোলানাথের হস্তে দুইটি মাত্র টাকা, বিষণ্ণ মনে চলিয়া যান, পাখীওয়ালা বলিল, "কত দিতে পারেন ?"

ভোলানাথ স্পষ্ট বলিলেন, "আমার কাছে দুটি বই টাকা নাই।"

একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া পাখীবিক্রেতা তাহাতেই সম্মত হইল। ভোলানাথ খাঁচা সমেত পাখীটি শাকুনিকের নিকট হইতে লইয়া মহা আনন্দে চলিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট তাহার মস্তিষ্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। একটা কি যেন তীর্থস্থান, তারপর কি কায়েস্তের উপাধি। এমন সময় বাম দিকের পথে দেখিলেন, "কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।" ঠিক হইয়াছে; এই বটে।" সেই পথে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গিয়াও ১০০ নম্বর মিলিল না। তখন একটি ভদ্রলোককে ভগিনীপতির নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! অমুকের বাড়ী কোন্‌টি ?"

"নম্বর কত ?"

"১২৩ কি ১৩২ কিম্বা এই রকম একটা কিছু হবে, একশতের উপর বটে।"

"এ রাস্তায় ১০০ নম্বর ত নাই। এই ষ্ট্রীটে বটে ত ?"

"হাঁ রাস্তার নাম এই রকম একটাই বটে।"

লোকটা কৃষ্ণনগর অঞ্চলের, ভাব ও ভাবগতিক দেখিয়া ভদ্রলোকটি বুঝিলেন, বলিলেন "কোথা থেকে আসছেন ?"

"চিৎপুর রোড থেকে।"

"বাসা চিনে ফিরে যেতে পারবেন তো?"

"যদি না পারি।"

"আপনার বাসার নম্বর জানেন?"

"জানি।"

"তবে ঠিকা গাড়ী করে যান।"

"সঙ্গে টাকা নাই যে?"

"বাসায় গিয়ে ভাড়া দেবেন।"

সেই পরামর্শই ঠিক মনে করিয়া স্ফূর্ত্তি সহকারে একখান ঠিকা গাড়ী এক টাকায় ভাড়া করিয়া ফেলিলেন।

গাড়ী বাসা অতিক্রম করিয়া যায়, এমন সময় দেখিলেন, বাসার দ্বারদেশে পিতা ও ভগিনীপতি দাঁড়াইয়া—"এই যে ভোলা" বলিয়া ডাকিলেন। সুশীলা পিতার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বেলা ১০টার পর স্বামীর সহিত পিতৃগৃহে আসিয়াছে।

তাহাদের মুখে পুত্রদ্বয়ের সংবাদ না পাইয়া রামধনবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুত্রকে পাইয়া রামধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদিকে কোথা গিয়েছিলি?"

মহা স্ফূর্ত্তির সহিত ভোলানাথ উত্তর করিল, "শালিক পাখী কিনে এনেছি বাবা, চমৎকার পড়ে।"

"বেশ করেছ বাবা। এখন তোমার দাদা এলে হয় যে"—

"দাদা কোথায় পথ ভুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একখানি ঠিকে গাড়ী করে' এলেই হতো। সে বুদ্ধিটুকুও নাই। গাড়ী ভাড়া এক টাকা দিন।"

রামধনবাবু ভ্যালুপেয়েবেলে সমাগত পক্ষীসহ পুত্রকে টাকা দিয়া লইয়া, কন্যা ও জামাতার-সহ সোদ্বেগে দিনযাপন করিতে থাকুন, এবং ভোলানাথ পক্ষীর আহারাদির ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকুক।

(২)

এ দিকে মহিমবাবু শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এ অবস্থায় বাসায় ফিরিয়া যাওয়া নিতান্ত মূর্খতার পরিচায়ক, তাহা অপেক্ষা একখান কৃষ্ণনগরের টিকিট ক্রয় করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়া পিতাকে একখান এই মর্ম্মে পত্র দেওয়া যে, "লেখাপড়ার ক্ষতি হয় বলিয়া ভগিনীকে

আনিতে না গিয়া বাটী আসিয়াছি, ইহা অতি সহজ কথা, এবং বুদ্ধিমানের কার্য্য।" টীকিটখানি ক্রয় করতঃ অবশিষ্ট যে কয়েক আনা পয়সা রহিল, তাহাতে মিষ্টান্নে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতঃ প্লাটফরমে প্রবেশ করিলেন। ঘণ্টা দিল, সম্মুখে একখানি সজ্জিত ট্রেণ, প্রায় ছাড়ে! দৌড়িয়া গাড়ীর নিকট গেলেন, গার্ড চাবি খুলিয়া দিল, এবং টিকিট দেখিতে চাহিল। টীকিট খুলিয়া গার্ডকে দেখাইতে দেখাইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, কোথাকার টীকিট, দেখান হইল না। মহিম ট্রেণের মধ্যে বসিয়া হাঁফ ছাড়িলেন।

এখন সে ট্রেণখানি সাধারণ সেক্সনের। রাণাঘাটের ট্রেণ ছাড়িতে তখনও একটু বিলম্ব ছিল; ক্রমে ট্রেণ বারুইপুর ষ্টেশনে পৌছিল, যাত্রিগণ সকলেই নামিয়া গেল। মহিমবাবু কৃষ্ণনগর যাইবেন এখানে নাবিবেন কেন? একজন কুলী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, মুটে চাই?"

"আমি কৃষ্ণনগর যাব।"

"কৃষ্ণনগর? এ গাড়ীত আর যাবে না।

"আপনাকে এইখানেই নামতে হ'বে।

মহিমবাবু মহা ফাঁপরে পড়িলেন, দেখিলেন সত্যই সকলে নামিয়া যাই-তেছে। কি করেন, নামিলেন।

বাহির হইবার দ্বারে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। বারুইপুর টীকিট-কালেক্টর কৃষ্ণনগরের টীকিট লইয়া ছাড়িতে চাহে না। মহিমের নিকট পয়সা থাকিলে গোলই হইত না। তদভাবে পুলিসের হস্তে সমর্পিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। একজন উকিল সেই গাড়ীতে বারুইপুর আসিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত অবস্থা দেখিয়া মহিমের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ পুলিসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, কলিকাতার গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব থাকায়, মহিমকে তাঁহার বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। মহিম অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

চূড়ামণি মহাশয়ের বারুইপুরে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। তিনি বিশেষ মজলিসী লোক। ছোট, বড়, যে কোন ক্রিয়া বাড়ীতে তিনি অনুপস্থিত থাকিলে সকলেই তাঁহার অভাব অনুভব করেন। যে আসরে তিনি উপস্থিত থাকেন, সে আসরে আনন্দের অভাব থাকে না। চূড়ামণি মহাশয়ের একটি কন্যা বিবাহযোগ্যা। বিবাহযোগ্যা কেন, বিবাহের কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিলেও চলে। কন্যাটী মূক, সুতরাং কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। অনেক বালক বালিকা বধিরতা-নিবন্ধন, কথা শুনিতে পায় না বলিয়া কথা কহিতেও

শিখে না, চূড়ামণি-দুহিতা সুভাষিনীও বধিরতা নিবন্ধন কথা কহিতে অশক্তা। সুভাষিনীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারি পাঁচ মাসের মধ্যে পঞ্চদশও পূর্ণ হইবে। দেখিতে বেশ সুশ্রী, সুন্দরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর বিবাহ না হইলে চূড়ামণির বহুপুরুষের সঞ্চিত জাতিটি সহসা প্রস্থান করিবে, এই আশঙ্কায় সদানন্দ চূড়ামণি ক্রমে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছেন। তিনি সকলকে আনন্দিত করেন, কেহই তাঁহাকে নিরানন্দ দেখিতে ইচ্ছা করেন না। অথচ সুভাষিনীর বিবাহ দিয়া সেই আনন্দের প্রত্যবায় দূর করিতেও কেহ পারেন না। মূক ও বধির বালিকার বিবাহে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন, কে সে অর্থ দিবে? নিরুপায় হইয়া চূড়ামণি মনে মনে দুহিতার মৃত্যু কামনা করেন। তুলাদণ্ডে জাতি ও কন্যাকে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন, জাতিটা অভাগিনী কন্যার জীবন অপেক্ষা অনেক গুরু; কারণ, জাতি থাকিলে প্রত্যেক ক্রিয়া বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সুলভ থাকে।

অদ্য উকিল বাবুর বাটীতে চূড়ামণি মহাশয় কিয়ৎক্ষণের জন্য দুশ্চিন্তাকে অন্তরে রাখিবার জন্য আসিয়া মহিমের বিষয় সবিশেষ শুনিলেন। সহসা তাঁহার মনে একটা নূতন সঙ্কল্পের উদয় হইল। মহিমের সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। চূড়ামণির মুখ প্রফুল্ল হইল, মজলিসের একজন বলিয়া উঠিলেন, "আপনি রামধন বাবুর পুত্র? আমি আপনার পিতাকে চিনি, তিনি মধ্যে মধ্যে হাইকোর্টে মামলা করিতে কলিকাতায় আসেন?"

চূড়মণি তাঁহাকে টিপিয়া আর অধিক কথা কহিতে নিষেধ করিয়া, উকিল বাবুকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন, এবং হাতে পৈতা জড়াইয়া তাঁহার কন্যার সহিত এই পাত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। উকিলবাবু প্রথমে অনেক আপত্তি উত্থাপন করিলেও শেষে চূড়ামণির রোদন ও কাতরতায় আর্দ্রহৃদয় হইলেন। ক্রমে আরও দুই একজন আসিয়া চূড়ামণির পক্ষসমর্থন করায় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে, পাত্রের এবং পাত্রীর অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন, আপাততঃ চূড়ামণির চলিষ্ণু জাতিটার গতিরোধ করা আবশ্যু কর্ত্তব্য।

মহিমের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে মহিম বলিল,—"সে কি? বাবাকে না বলে বিয়ে করতে পারি?"

উকিল বাবু অনায়াসে বলিলেন,—"এই পাত্রীর সঙ্গেই আপনার বিবাহের কথাবার্ত্তা আপনার পিতার সঙ্গে চলিতেছিল, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। কেবল কন্যার পিতার অর্থাভাব হেতু এমন সুন্দরী কন্যা মনোনীত করিয়াও

আপনার পিতা পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছেন। আপনি লেখাপড়া শিখিয়াও এই কুরীতির প্রশ্রয়দাতা হইতে পারেন কি? একবার কন্যা দেখুন, না পছন্দ হয়, বিবাহ করিবেন না। আর এখানে আমরা বলপূর্ব্বক আপনার বিবাহ দিলেই বা আপনি কি করিতে পারেন? এই বারুইপুর গ্রামে আমরা নিষেধ করিলে কেহই আপনাকে এক পয়সাও সাহায্য করিবে না। পদব্রজেও যাইতে পারিবেন না, বারুইপুরের চারি দিকে বড় বড় বাঘ ভাল্লুকের বাস জানেন ত? অনাহারে অথবা বাঘের মুখে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা বিবাহ করাটা কি মন্দ? আপনার পিতাকে না হয় বলিবেন, আমরা জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছি।"

উকিল বাবুর এতগুলি মিথ্যা কথার ফলে মহিম অর্দ্ধ সম্মত হইল। বক্রী অর্দ্ধেকখানি কন্যা দেখার অপেক্ষায় রহিল। কন্যা দেখা হইলে মহিম বুঝিল যে, পিতার নিকট সম্ভ্রম রক্ষার বেশ সদুপায় হইয়াছে। আমি কন্যার কথা লোকমুখে শুনিয়া এখানে আসিয়া বিবাহ করিয়াছি বলিলে, পিতা আমায় মূর্খ মনে করিতে পারেন না, বরং এমন সুন্দরী পাত্রী মনোনীত করায় আমাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

সেই রাত্রেই বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেল। চূড়ামণি দানসামগ্রী প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, এবং সহজেই সংগ্রহ করিলেন। উকিল বাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিমকে দিয়া তাহার পিতাকে একখানি পত্র লেখাইলেন।

* * * * *

রামধন বাবু পুত্রের পত্র পাইয়া আশ্বস্ত এবং দুঃখিতও হইলেন। পরে বারুইপুরে গিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ আনয়ন করিলেন। তখনও পিতাপুত্রের কেহই জানেনা যে, নববধূ মূক। রায় মহাশয় সুন্দরী বধূ পাইয়া সন্তুষ্টই হইলেন। চূড়ামণি বৈবাহিকের নিকট অনেক মিনতি করিলেন, এবং শেষে বলিয়া দিলেন যে, "আমার কন্যা কখনও কাহারও সহিত কলহ করিবে না, এমন কি মারিলেও কথা কহিবে না।"

কথাটার সোজা অর্থ বুঝিয়া রায় মহাশয় বাসায় ফিরিলেন, এবং সদ্যাই সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। তখন নিরুপায় হইয়া পুত্রকে আপন কর্ম্মফল ভোগ করিবার অবসর দিলেন। ভোলানাথ পিতাকে বলিল,—"বাবা, দাদা বিয়ে করে এলেন বটে, কিন্তু আমার শালিক পাখিটাও কথা কয়।"

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

রত্নময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রত্নময়ীর সহিত সাক্ষাতের পর, হরপ্রসাদ প্রথমটা ধৈর্য্য হারাইলেন বটে, কিন্তু তৎপরেই নিজের ও রত্নময়ীর বিপদ উপলব্ধি করিয়া পুনরায় চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন যে উপায়েই হোক রত্নময়ীকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

হরপ্রসাদ তখন স্থিরচিত্তে সেই দেবীপ্রতিমার নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া মনে মনে বলিলেন—"এ কি করিলি মা কপালিনী! কর্ম্মসূত্রে চালিত করিয়া আমায় পত্নীহত্যার কার্য্যে নিয়োজিত করিলি কেন মা? রত্নময়ী আমার কাছে সামান্য অপরাধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ত আমি বহুদিন পূর্ব্বে ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাকে প্রশান্তচিত্তে মার্জ্জনা করিয়াছি। এ কি ভীষণ কর্ম্মসূত্র সৃষ্টি করিলি মা? মাগো আমায় পথ দেখাইয়া দাও। আমার পত্নী রত্নময়ীর জীবন-রক্ষার উপায় করিয়া দাও।

হরপ্রসাদ উঠিয়া বসিয়া যেন প্রাণে একটু বল পাইলেন। কে যেন তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিয়া দিল, "মাভৈঃ—ভয় নাই।" এ প্রচ্ছন্ন, শব্দহীন, ধ্বনিহীন, বিবেকবাণীর শক্তি বৃথা হইল না। তিনি প্রাণের আবেগে ভক্তির উচ্ছ্বাসে কালিকার সম্মুখে বসিয়া ভক্তিকাতর প্রাণে মহাবিদ্যাস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

নমস্তে চণ্ডিকে চণ্ডী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী।
নমস্তে কালিকে কালমহাভয় নিবারিণী।
শিবে রক্ষ মহাকালীং প্রসীদ হরবল্লভে।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং জগতপালন কারিণীং।
করালাং বিকটাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং
হরার্চ্চিতাং হরারাধ্যাং নমামি হরবল্লভাং।
সিদ্ধাং সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধ বিদ্যাধরগণৈর্যুতাং
প্রণমামি মহামায়াং দুর্গা দুর্গতিনাশিনীং।

নীলাং নীলঘনশ্যামাং নমামি নীলসুন্দরীং
শ্যামাঙ্গীং কৃষ্ণকুন্তলাং শ্যামবর্ণ বিশোভিতাং।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং চন্দ্রশেখরবল্লভাং
শিবদূতীং শিবারাধ্যাং শিবধ্যেয়াং সনাতনীং।
নারায়ণীং বিষ্ণুপূজ্যাং ব্রহ্মাবিষ্ণু হরপ্রিয়াং
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাং কালী কালভয় নিবারিণীং।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং শুম্ভাসুর বিমর্দ্দিনীং
রক্তপ্রিয়াং রক্তবর্ণাং রক্তবীজ বিনাশিনীং
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাং সর্ব্ব বিদ্যামন্ত্রবিনোদিনীং
প্রণমামি জগত্তারাং সরাঞ্চ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।

সেই নির্জ্জন মন্দিরকক্ষ, সেই পাপ নিশ্বাসময় দস্যুনিবাস, এই স্তোত্রাবসানের পর কি যেন এক সঞ্জীবনী মন্ত্রে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই নিস্তব্ধ নিথর নিশীথে, এই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কুমারের গম্ভীর কণ্ঠোচ্চারিত, পবিত্র স্তোত্রধ্বনি, যেন সেই নির্জ্জন স্থানে একটা সজীবভাব আনিয়া দিল। চারিদিক যেন ভৈরব ও নটনারায়ণের গম্ভীর মন্ত্রে প্রকম্পিত হইল। সেই নির্জ্জন মন্দিরকক্ষ হইতে সমুচ্চারিত শ্যামা-স্তোত্র ধ্বনি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়া পার্শ্বস্থ ঘন সন্নিবিষ্ট বিটপী মণ্ডিত বনস্থলীতে ব্যাপ্ত হইল।

একমনে স্তোত্রপাঠে নিবিষ্ট চিত্ত থাকায় হরপ্রসাদ জানিতে পারেন নাই যে ভৈরবানন্দ আসিয়া সেই মন্দির সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে বসিয়া একমনে তাহার স্তোত্র পাঠ শুনিতেছে। হরপ্রসাদ মহাকালীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মন্দির প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিবামাত্রই দেখিলেন—ভৈরবানন্দ মৃত্তিকাসনে বসিয়া তন্ময় চিত্তে কি ভাবিতেছে।

হরপ্রসাদকে সম্মুখে দেখিয়া ভৈরবানন্দ বলিল—"ঠাকুর! এখনও ঘুমাও নাই।"

হরপ্রসাদ বলিলেন—"না ভৈরব! আজ মহাচতুর্দ্দশী। এই সুযোগে মায়ের কাছে স্তোত্র পাঠ করিতেছিলাম।"

ভৈরব। "তোমাদের ব্রাহ্মণের মুখোচ্চারিত মন্ত্রের এত তেজ! এত শক্তি?"

হরপ্রসাদ। কিসে জানিলে!

ভৈরব। আমার মত পাষণ্ডেরও তাহাতে প্রাণ গলিয়াছে। এতক্ষণ

আমি যেন বজ্রনাদের মত কি একটা শুনিতেছিলাম। ঠাকুর! মা কি আমাদের বলী গ্রহণ করিবেন?"

হরপ্রসাদ। ভক্ত আপন ইচ্ছানুসারে বলী প্রদান করিয়া থাকে। জীব-সৃষ্টিকারিণী ভগবতী এই স্থাবর জঙ্গমে সবারই মাতৃরূপিণী। আমি যতদূর জানি, জীবহত্যা করিয়া যে বলি দেওয়া হয়, মা তাহা গ্রহণ করেন না।

ভৈরব। না ঠাকুর! ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। এমন সাংঘাতিক স্থলে আমরা ডাকাতি করিতে গিয়াছি, যেন প্রতিপদেই জীবনের আশঙ্কা ও বিপদের সম্ভাবনা; কিন্তু এই বলীর জন্যই আমরা সেই সংকটস্থলেও কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিয়াছি। নবাবের ফৌজ আমাদের কতবার ঘেরাও করিয়াছে, তবু আমরা তাহাদের সে ব্যূহ ভেদ করিয়া আসিয়াছি। প্রত্যেকবার যাত্রার পুর্ব্বে আমরা বলী দিতাম বলিয়াই আমাদের এইরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।

হরপ্রসাদ। নির্ব্বাক জ্ঞানহীন পশুকে বলি দেওয়া, আর নরহত্যা এ দুইটী পাপের মধ্যে অনেক তফাৎ যে ভৈরব!

ভৈরব। নরহত্যাই যে আমাদের ব্যবসা ঠাকুর। তোমার শাস্ত্র, আর আমাদের শাস্ত্র এক নয়। এই মন্দিরে, এই উঠানে যেখানে আমি বসিয়া আছি, এই মায়ের সম্মুখে কত নরবলি হইয়া গিয়াছে।

হরপ্রসাদ। ভৈরব! এখনও তোমাদের বলিতেছি, নরহত্যার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। নরহত্যার অপেক্ষা নারীহত্যা আরও ভয়ানক পাপ। মা আদ্যাশক্তি নারী রূপে, শক্তির অংশ—এ ধরায় অবতীর্ণা। প্রত্যেক কুমারী শক্তির অংশ বিকাশ, প্রত্যেক বিবাহিতা রমণী কর্ম্মময়ী শক্তি রূপে প্রজাসৃষ্টি করেন, মা আবির্ভূতা ভৈরব। বলী যদি দিতেই হয় তাহা হইলে—

ভৈরব বলিল—"ঠাকুর সবই বুঝি। আবার এমন মোহাচ্ছন্ন জীব আমরা, যে অনেক সময় আদত কথাই আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের নিজের স্বার্থ অনেক সময়ে আমাদের প্রচ্ছন্ন জ্ঞানকে আরও ক্ষীণ দীপ্তি করিয়া দেয়। আজ রাত্রিটা আমায় ভাবিতে দাও। কাল প্রভাতে তোমাকে যাহা হয় বলিব। সত্য আমরা এক নারীর রুধিরে মাকে পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। স্বেচ্ছায় নহে—দেবীর স্বপ্নাদেশে। ভবানী কৃপা করিয়া তাহাকে আমাদের সম্মুখে পর্য্যন্ত আনিয়া দিয়াছেন। যে লোক আমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে, আমাদের বলি দিবার চেষ্টায় আছে, তাহার কন্যা সে। কাজেই এ

প্রতিহিংসার সুযোগ পাইয়া আমরা যে তাহাকে ছাড়িয়া দিব এটা কতদূর সঙ্গত তাহা একবার আমাদিগের ভাবিতে দাও।”

হরপ্রসাদ যখন দেখিলেন—এই হৃদয় হীন পাষণ্ডদের সহিত বাদানুবাদে কোন ফলই নাই—তিনি অগত্যা সেই আসনের উপর আসিয়া বসিলেন। ভৈরবানন্দ আর কোন কথা না বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

হরপ্রসাদ অগত্যা সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি চোখ্ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। তাঁর ধর্ম্মপত্নীর জীবন বিপন্ন—তাঁহার নিজের মহা বিপদ। এ অবস্থায় করা যায় কি? বলপ্রয়োগ কোন কাজেরই হইবে না। বরঞ্চ আরও নূতন বিপদ সৃষ্ট হইবে। তারপর তিনি ভাবিলেন, বলে না হয়, শাস্ত্রকারেরা কৌশলে শত্রু নিপাত করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সে কৌশল কি? কে আমায় বলিয়া দিবে!

দৈববলে বিশেষ বিশ্বাসী সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ দেবে আত্মসমর্পণ করিলেন। যে দেবী তাঁহাকে উপলক্ষ রূপে এখানে আনিয়াছেন—এই ভয়ানক ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়াছেন—তিনিই তাহার উপায় বলিয়া দিবেন।

হরপ্রসাদ বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। তাঁহার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন জগন্মাতা যেন নারীমূর্ত্তি ধরিয়া বরাভয় প্রদান করে তাঁহাকে অভয় দিতেছেন। গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিতেছেন—“ভয় নাই তোর! কার সাধ্য সতীর অনিষ্ট করে? ইহাদের সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত। নারী আমারই অংশ! নিজরক্ত পান করিতে আমি আদৌ ইচ্ছুক নহি। গভীর রাত্রে যখন তুই আমার পূজায় বসিবি তখন তোর মনে যে কল্পনার উদয় হইবে তদনুসারেই কাজ করিস্। তোর আশা সিদ্ধি হইবে।

শক্তির আদেশবাণী সুপ্ত হরপ্রসাদের মর্ম্মদেশ আচ্ছন্ন করিল। তখনই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সে স্বপ্নাদেশের কথা তখনও তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনি হইতেছে। হরপ্রসাদ অন্তরের মধ্যে যেন একটা নূতন শক্তি পাইল। সে আর ঘুমাইল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল।

তখন সকাল হইয়াছে। কাক কোকিল ডাকিতেছে। উষার ধূসর জ্যোতি পূর্ব্ব রাত্রের সেই ভীষণ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন প্রকৃতির উজ্জ্বল মূর্ত্তি লোক লোচনের সম্মুখে পরিস্ফুট করিতেছে। স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু আসিয়া তাহার উত্তেজিত ললাটদেশ স্পর্শ করিল। ললাটে মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইতেছিল,

তাহা সেই স্নিগ্ধ সমীর স্পর্শে ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। হরপ্রসাদ তাহার অবসন্ন দেহে নূতন শক্তি পাইলেন। গত রাত্রের অদ্ভুত দৈববাণী তাহার হৃদয়কে আরও বলীয়ান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। প্রভাত গেল, উজ্জ্বল মধ্যাহ্নও নিজের কর্ত্তব্য করিয়া গোধূলিকে জগতের ভার দিয়া কোনও অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল! আবার সন্ধ্যা আসিল। আলোক ডুবিল। আবার শ্যামল প্রকৃতি—অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইল।

অমাবস্যার রাত্রি। তাহাতে নির্জ্জন বনস্থলী।—নরাঘাতকের আবাস স্থান। অন্ধকার যেন সেইজন্য অতি ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল!

রাত্রি এক প্রহর পূজার আয়োজনে কাটিয়া গেল! দ্বিপ্রহরে পূজা। পূজার আয়োজন অঙ্গহীন নহে; ভৈরব সর্দ্দার সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার আয়োজন করিয়াছে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প চন্দনের অভাব নাই। রাশীকৃত জবা সংগৃহীত হইয়াছে! অসংখ্য অপরাজিতা পুষ্প-পাত্রের উপর সজ্জিত হইয়া নীল জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে। অপরাজিতায় যেন মায়ের গায়ের রং ফুটিয়া উঠিয়াছে—জবায় যেন তাঁহার কোকনদ লাঞ্ছিত চরণের রক্তাভ জ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছে।

খাণ্ডা, খর্পর, যূপকাষ্ঠ—সবই প্রস্তুত। সেই উঠানের মধ্যস্থলে গত রাত্রে ভৈরবানন্দ তাহার সহিত যেখানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, সেইস্থানেই যূপকাষ্ঠ প্রোথিত। ডাকাতের দল সেই ক্ষুদ্র আঙ্গিনার চারিপার্শ্বে বসিয়াছে। অবশ্য প্রধান যাহারা তাহারাই সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। অপর সকলে নানা-স্থানে পাহারা দিতেছিল;

মায়ের সম্মুখে সুবৃহৎ কারণ পাত্র। ইহাতে কতকটা সুরা ঢালা হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে একটী তাম্র কলস। এই তাম্র কলসে প্রচুর সুরা রক্ষিত। ডাকাতের পূজা—ইহার কতক শাস্ত্র সম্মত, কতক বা ইচ্ছা সম্মত। মায়ের প্রথম পূজা হইয়া গেলেই, তাহারা "কারণ-পাত্র" মধ্যস্থ প্রসাদিত সুরা লইয়া আকণ্ঠ পান করে। হরপ্রসাদকে এই জন্য তাহারা বলিয়া দিয়াছিল—যে সুরাটা যেন প্রথম পূজার সঙ্গেই উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়।

হরপ্রসাদ ইহাতে অসন্তুষ্ট নহেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে সেই সুরাপাত্রে এক-ডেলা অহিফেন ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিবার সময়—তাঁহার মনে বিবেকবাণীতে কে যেন বলিয়াছিল—"এ ভিন্ন আর তোমার রক্ষার উপায় নাই। ইহাতে সকলে অজ্ঞান হইবে মাত্র—প্রাণে মরিবে না, অথচ তোর জীবন রক্ষা হইবে!"

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, হরপ্রসাদ শিষ্য বাড়ী হইতে তাহার মাতার জন্য অনেটা অহিফেন লইয়া যাইতেছিলেন। তাহার এই শিষ্যটী অবস্থাপন্ন। নবাব সরকারে চাকরী করেন। তিনি বৎসরে দুইবার এই শিষ্য বাটীতে যান। তাঁহার বৃদ্ধ মাতা অল্প অল্প অহিফেন সেবন করেন বলিয়া, তিনি তাঁহার শিষ্যকে বলিয়া এটুকু তাঁহার বার্ষিকে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন।

উপায়ন্তর না দেখিয়া অন্তরস্থিত অশরীরী ও নির্ব্বাক দৈববাণীর প্রেরণায় হরপ্রসাদ এই অহিফেনের ডেলাটী সেই কারণ-কলসে ইতিপূর্ব্বেই ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

ইচ্ছা করিয়াই দীর্ঘ সময় লইয়াই, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সহিত তিনি পূজা আরম্ভ করিলেন। নৈবেদ্য উৎসর্গ হইয়া গেলে—কারণ-কলসও উৎসর্গ করা হইল। হরপ্রসাদ আনন্দিত চিত্তে সেই কলসটী—ভৈরবানন্দের নিকটে রাখিয়া আসিলেন।

ভৈরবানন্দ ও তাহার সঙ্গীগণ পাত্র পূর্ণ করিয়া মদ্য পান করিল। সকলেই পূর্ণপত্র গ্রহণ করিল। হরপ্রসাদ—গম্ভীরস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উপযুক্ত অব-সরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভৈরবানন্দ তাহার একজন সঙ্গীকে বলিল—"এবারের কারণটা খুব ভাল দিয়াছ। এখনই যেন নেশা বোধ হইয়াছে।"

কথাটা হরপ্রসাদের কাণে গেল। হরপ্রসাদ আরও একটু সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শক্তিপূজার মন্ত্র মধ্যে স্বয়ং সুররূপী ব্রহ্ম অবস্থান করিতে-ছেন। যদি সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের মুখে এই সমস্ত মন্ত্র ও স্তোত্র উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে অতি পাষণ্ডের প্রাণেও একটা উত্তেজনা উপস্থিত হইতে পারে। তাহার প্রমাণ এই ডাকাত সর্দ্দার ভৈরবানন্দ। পূর্ব্ব রাত্রে হরপ্রসাদের মুখোচ্চারিত এই মন্ত্র-শব্দ শুনিয়াই সে একটু মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

হরপ্রসাদের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর। তাঁহার উচ্চারণ প্রণালীও অতি সুন্দর! কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এবার একটা উত্তেজনা

আসিয়া পড়িয়াছে! এ উত্তেজনা যেন আশাবায়ু চালিত হইয়া অতি তেজোময়ী হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে এই গম্ভীর মন্ত্রনাদ পঞ্চম হইতে যেন সপ্তমে চড়িতে লাগিল।

ডাকাতেরা সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। একমনে সেই মন্ত্র পাঠ শুনিতেছে। এমন সময় ভৈরবানন্দ বলিল—"কইরে! সবাই যে মন্তরে মেতে রইলি। কারণ করে কে?"

এই ইঙ্গীত পাইয়াই একজন অগ্রসর হইয়া আবার একটী পূর্ণ পাত্র ঢালিয়া সর্দ্দারকে দিল। তারপর সে বলিল—আমরাত খাইতেছি—যাহারা পাহারায় আছে তাহাদের হইস কই।"

ভৈরবানন্দ বলিল—"যা তোরা বাহিরের উঠানে গিয়া সকলে মিলিয়া এই পাত্রটা খালি করিয়া আন।"

সর্দ্দারের আদেশ পাইয়া তাহারা একটা কোলাহল করিতে করিতে, টলিতে টলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরের দিকে আর একটা ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ছিল, সেই প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহারা এক "চক্র" করিল। দলে যত লোক ছিল—সবাই সে স্থানে আসিয়া জুটিল। কারণ চলিতে লাগিল।

পূজার দালানের সম্মুখের সেই আঙ্গিনায় ভৈরবানন্দ একা বসিয়া ঝিমাইতেছে। হরপ্রসাদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আমার পূজা শেষ হইয়াছে। বলি কোথায়?"

"বলি কোথায়" এই শব্দে ভৈরবানন্দ একটু চমকিয়া উঠিল। সে নেশার ঝোঁকে বলির কথাটা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। একটু ব্যস্তভাবে বলিল—"হাঁ হাঁ বলি! তা সময় হইয়াছে কি?"

হরপ্রসাদ। হইয়াছে বই কি? তাহাকে আজ উপবাসে রাখিয়াছ ত?

ভৈরব। নিশ্চয়ই।

হরপ্রসাদ। অদ্য প্রাতে সে স্নান করিয়াছিল?

ভৈরব। নিশ্চয়ই।

হরপ্রসাদ। রক্তবস্ত্র—পুষ্পমাল্য প্রভৃতি আনা হইয়াছে?

ভৈরব। কোন অনুষ্ঠানেরই ক্রটী হয় নাই ঠাকুর!

হরপ্রসাদ। তাহা হইলে এখনই তাহাকে লইয়া আইস। আমি তোমার সঙ্কল্প কামনায়, তোমার শত্রু নিধন কামনায় সঙ্কল্প করিয়া মার পূজা করিয়াছি। তুমি মার চরণোপরিস্থিত এই নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর।

ভৈরব সেই মন্দিরের লগ্ন সোপানে বসিয়া অতি ভক্তিভরে হরপ্রসাদ প্রদত্ত চরণামৃত পান করিল। তাঁহার প্রদত্ত পুষ্প ও বিল্বপত্র গ্রহণ করিল।

তাহাকে উঠিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া—হরপ্রসাদ বলিলেন—"দাঁড়াও এই কারণবারি মাকে প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিত করিয়াছি। মায়ের মৃত সঞ্জীবনী শক্তি ইহার মধ্যে নিহিত। ইহা পান করিলে তুমি চিরদিন জয়যুক্ত হইবে।"

এই কথা বলিয়া হরপ্রসাদ এক মৃৎপাত্র পূর্ণ করিয়া ভৈরবানন্দকে সেই অহিফেন সিক্ত মদ্য পান করিতে দিলেন। ভৈরবানন্দ দেবীর প্রসাদ লাভ করিয়া টলিতে টলিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেল, তৎপরে এক অবগুণ্ঠীতা রমণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল, তাহার হস্তে একখানি রক্তবর্ণের চেলী।

চেলীখানি রমণীর হস্তে দিয়া ভৈরবানন্দ জড়িতস্বরে বলিল,—"ঠাকুর এইবার যা করিবার তাই কর। আর আমরা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

হরপ্রসাদের প্রাণের মধ্যে এই সময়ে একটা কথা উপস্থিত হইল। তাঁহার ধর্ম্ম পত্নী, বলীর উপহাররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। হরপ্রসাদ মনে মনে ভাবিলেন—"এই সময়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাইলে, দেখিতেছি আমাকে খুব বিপদাপন্ন হইতে হইবে। এই সময়ে সাহসের সহিত কাজ না করিলে ইহাদের মনে সন্দেহ হইবে। মা কপালিনী! আমার হৃদয়ে বল দাও মা! আমার জিহ্বাকে শক্তি দাও মা!"

তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে সে অবগুণ্ঠিতা রত্নময়ীকে বলিলেন—"তুমি আজ স্নান করিয়াছ?"

রত্নময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হাঁ"।

"উপবাসী আছ—"

"হাঁ।"

"ভগবতী তোমার উপর অতি প্রসন্না। মা তোমার রুধির পানের জন্য লালায়িত। তাঁহার খর্পর আজ তোমার শোণিতে পরিপূর্ণ হইবে। তুমি বীজমন্ত্র জান কি?"

রত্নময়ী স্বপ্নাবিষ্ট জীবের ন্যায় অস্ফুটস্বরে উত্তর করিল "না!"

হরপ্রসাদ তখন ভৈরবকে কহিলেন—"তুমি একটু দূরে দাঁড়াও। তোমার বীজমন্ত্র শুনিতে নাই।"

"তার কোন সংবাদই ত জানি না। তবে সে এই বাটীর দরজা পর্য্যন্ত যে আসিয়াছিল তাহা আমি দেখিয়াছি।

হরপ্রসাদ প্রসন্নমুখে বলিলেন—"মা জগদম্বা আমাদের উপর প্রসন্না হইয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন। তুমি বুঝিতে পার নাই, কিন্তু আমি অনুমানে কতক বুঝিতেছি। তোমার সঙ্গের সেই ঝি কোন উপায়ে পলায়ন করিয়া তোমার পিতাকে সংবাদ দিয়াছে। তোমার পিতা হয়তঃ ফৌজদারের নিকট হইতে সেনার সহায়তা লইয়া তোমাকে উদ্ধার করিতে ও এই ভৈরবানন্দকে দমন করিতে পাঠাইয়াছেন।

আমার বোধ হয় তাহা হইলে এখানে এখনি একটা রক্তগঙ্গা হইবে। এই উপযুক্ত অবসরে চল আমরা এখন পলায়ন করিয়া একটু নিভৃত স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকি। এর পরে অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিব। ইহাদের খিড়কীর দ্বারের চাবি আমার সন্ধানে আছে।"

হরপ্রসাদ আর কিছু না বলিয়া রত্নময়ীকে সঙ্গে লইয়া সত্বরপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২২ | ৪র্থ সংখ্যা

আত্মোৎসর্গ।

(১)

সনাতনপুর গ্রামে মণ্ডলদের বাটীতে পাঠশালা। পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অধ্যয়ন করে। রামনিধি মণ্ডল একজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ। তাহার গোশালে ভাল ভাল গরু, মরাই পোরা ধান, বাগানে নানারূপ তরকারি, পুষ্করিণীতে মাছ। অতএব মণ্ডলের অবস্থা ভাল। সে কাহারও চাকরী করে না, অথচ সুখী। রামনিধি মণ্ডল জাতিতে মাহিষ্য। তাহার লক্ষ্মী স্বরূপিণী স্ত্রী, একমাত্র কন্যা বিভাবতী ও দুটি ভৃত্য,—এই সংসারের লোক। রামনিধি প্রাচীন ধরণের লোক, বড় সাদাসিদে, সর্ব্বদাই হাসি হাসি মুখ, লোকের উপকারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সে দেশের উপকারের জন্য পাঠশালা স্থাপন করিয়াছে, এবং একজন কায়স্থ যুবক, শরৎচন্দ্র গুহকে পণ্ডিত রাখিয়া খাইতে দিতেছে। শরৎ বাবুর বাটী ময়মনসিং জেলায়, এখানে মাসিক ১০৲ বেতন ও খোরাকি পাইয়া বিদেশে চাকরী করিতেছেন। শরৎ বাবুর বয়স ২২।২৩ বৎসর মাত্র, দেখিতে সুশ্রী। পেটের দায়ে এত দুরদেশে আসিয়াছেন। শরৎ বাবু এখনও অবিবাহিত। সংসারে বৃদ্ধা মাতা কোনরূপে দিন যাপন করেন, পিতা বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শরৎ বাবু সঙ্গীতে বেশ পরিপক্ব, সন্ধ্যার পর প্রত্যহ একটি এস্‌রাজ লইয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

গ্রামখানি ছোট, অল্প কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বসতি। ব্রাহ্মণ ২।৩ ঘর, কায়স্থ ৪ ৫ ঘর, মাহিষ্য ৮।১০ ঘর, এবং অবশিষ্ট কামার, কুমার, নাপিত, ধোবা, ও মুসলমানের জাতি। রামনিধি মণ্ডলকে সকলেই শ্রদ্ধা ও স্নেহ করে।

কেহ বিপদে পতিত হইলে অর্থ দ্বারা সাহায্য করে। প্রবাদ এই যে রামনিধির ঘরে যথেষ্ট অর্থ। যেমন অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা করে, তেমনি কেহ কেহ তাহাকে হিংসাও করে। গ্রামে বড় রামনামের ছড়াছড়ি, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মণ, রামকুমার বাবু কায়স্থ, রামনিধি মণ্ডল মাহিষ্য। এই তিনজনে বেশ প্রণয়, এবং কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তিনজনে একত্র পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন। গ্রামের পণ্ডিত শরৎ বাবুর সর্ব্বত্রই অবাধ গতি, তিনি সেই গ্রামের অধিবাসীর মধ্যেই গণ্য হইয়াছেন।

(২)

অদ্য রামকুমার বাবুর বাড়ীতে বড় ধূমধাম, তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন। দিনের বেলা সব আহারাদির বন্দোবস্ত, রাত্রে নাচগান হইবে। গ্রামের সকল লোকেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে। শরৎ বাবুর বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ, তিনি খেটেখুটে কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। শরৎ বাবু অদ্য ভোর হইতে সে বাড়ীতে আছেন। রামকুমার বাবু ধনী কুলীন কায়স্থ, সংসারে তাঁহার বুদ্ধিমতী প্রৌঢ়া স্ত্রী ও কন্যা রণদা। রামকুমার বাবু একটি পুত্রের জন্য অনেক যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পুত্র হয় নাই। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে এই পুত্র হইয়াছে, তাই অন্নপ্রাশনে এত ধূমধাম। গৃহিণীর আর আনন্দ ধরে না, তিনি চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শরৎ বাবু আজ খুব পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি স্বয়ং পরিবেশন করিতেছেন। ধনী, দরিদ্র, সকলেই আজ আহার করিতেছে, কেহই ফিরিয়া যাইতেছে না। শরৎ বাবু এক একবার গিয়া গৃহিণীর নিকট হইতে কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছেন। রণদা আজ বেনারসী শাড়ী পরিয়া—নানারূপ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বেড়াইতেছে, সে কাজ কর্ম্মের ধার ধারে না। সমবয়সীরা আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে নানারূপ গল্প করিতেছে। রণদা সুন্দরী, রণদা বড়লোকের মেয়ে—তাই অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। সে গরীবদিগকে বড়ই ঘৃণা করে। রণদার স্বভাব তাহার মাতার ন্যায় নহে, তাহার মাতা দরিদ্রদিগকে নিজ সন্তানের ন্যায় দেখেন।

শরৎ বাবুর সঙ্গে রণদার দুই একবার সাক্ষাৎ হইল, শরৎ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" রণদা একবার তাকাইল, তারপর তাচ্ছল্য ভাবে বলিল "এই এক রকম।" এই বলিয়া সখীদের দলে মিলিয়া গেল, শরৎ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শরৎ বাবু বুঝিতেন, তিনি দরিদ্র বলিয়া

রণদা তাঁহাকে ঘৃণা করে। শরৎ বড় কুলীন কায়স্থ। রণদার মাতা শরৎকে বড় ভাল বাসিতেন, এক একবার মনে করিতেন তাহাকে জামাই করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া কর্ত্তাকে এ বিষয় কিছু বলেন নাই। রণদা সখীদের নিকট বলিত "আমার বিবাহ ধনীর ঘরে হবে, আমি সর্ব্বদা গহনা পরে ব'সে থাক্‌বো, চাকর চাকরাণী সব কাজ করবে। আমি ভাল ভাল কাপড়, জহরতের অলঙ্কার, সর্ব্বদা ব্যবহার কর্‌বো।" পাড়ার মেয়েরা এই কথা লইয়া সর্ব্বদা তাহাকে বিদ্রুপ করিত।

বেলা শেষ হইয়া গেল, সন্ধ্যার পর বাটীর সকলে আহার করিল, শরৎও সেই সঙ্গে খাইলেন। আহারান্তে বলিলেন "মা, আমি এখন যেতে চাই।" রণদার মাতা বলিলেন "কেন বাবা, নাচগান হবে, দেখে শুনে যেও ?" শরৎ বলিলেন "না মা, সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছি, এখন একটু ঘুমোবো।" গৃহিণী বলিলেন "আচ্ছা বাবা, যাও, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও।" এমন সময়ে রণদা আসিয়া ডাকিল "মা, আমি এ বেলা কি পোষাক পর্‌বো।" গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন "শরতের সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছে ? আজ তোর ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে কত খেটেছে।" রণদা তখন কিছু বলিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শরৎ চলিয়া গেলে বলিল "এরা খাট্‌বেইত, খেতে পায় না, কি কর্‌বে।" মা মেয়েকে তিরস্কার করিলেন।

(৩)

বিভাকে শরৎ বাবু লেখাপড়া শিখাইলেন, বিভা সংসারের কাজকর্ম্মও শিখিল। কিন্তু একটি বিষয় সে নিজে বুঝিতে পারিল না, সে শরতের বড় পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা শরৎকে দেখিতে, তাহার সঙ্গে কথা কহিতে তাহার কেমন ভাল লাগিত। শরৎ কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গেলে তাহার কেমন উদাসভাব হইত। রামনিধি মণ্ডল শরৎকে পুত্রের মত ভালবাসিত। শরৎ বাবুর একটি বড় কষ্ট, দুবেলা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতে হইত। রামনিধির স্ত্রী কোন কথার মধ্যেই নাই। বিভা যখন বালিকা তখন সে শরৎ বাবুর নিকট লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করে। এখন সে যৌবনে পদার্পণ করিতেছে, কিন্তু ভাল ঘর ও বর পাওয়া কঠিন, তাই এতদিন বিবাহ হয় নাই। বিভা কিন্তু বিবাহের জন্য একটুও ব্যস্ত নহে। সে ভাবিতেছে বিবাহ না হওয়াই ভাল। শরৎ বাবু বিভাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসেন। শরৎ বিভাকে নাম ধরিয়া ডাকেন, বিভা "মাষ্টার মশায়" বলিয়া ডাকে। শরৎ

শুধু মাষ্টারি করেন না, রামনিধি মণ্ডলের হিসাব লেখেন, তাগাদায় যান, অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম্মও করেন। শরৎ বাবু প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজায় বাটী যান, একমাস অবকাশ ভোগ করিয়াই আবার আসেন। সেই একমাস কাটান বিভার পক্ষে বড় কষ্টকর হইয়া পড়ে।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত—চন্দ্রমা মনের আনন্দে হাসিতেছে, ফুল ফুটিয়া চারি দিকে সৌরভ বিতরণ করিতেছে, এমন সময়ে শরৎ ধীর পাদ বিক্ষেপে রাস্তা দিয়া নদীর দিকে যাইতেছে। গ্রামের নীচেই ক্ষুদ্র তটিনী কুলু কুলু নাদে চলিয়াছে, বর্ষাতে বেশ জল থাকে, শীতকালে নদী শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অদ্য বড় গরম, চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ রাত্রেও কমে না। শরৎ নদীর তীরে বসিয়া কি ভাবিতেছে। তিনি দরিদ্র, তাই তাহাকে সকলে ঘৃণা করে, এমন কি রণদা তাহাকে দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করে। তিনি রণদাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। এক একবার মনে হইতেছে বামন হয়ে চাঁদে হাত কেন? রণদা বড় লোকের মেয়ে। তাঁহার মত দরিদ্রকে ঘৃণা ত করবেই—এই তাঁহার ধারণা। নদীতে স্থানে স্থানে এখনও বেশ জল আছে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খেলা করিতেছে। শরৎ জলে নামিলেন, ইচ্ছা অপর পারে যান। তাঁহার বস্ত্র ভিজিয়া গেল, তিনি মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুই পার্শ্বের সৌন্দর্য্য দেখিলেন। তারপর নদী পার হইয়া প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিলেন। দূরে একটা আলো জ্বলিতেছিল, দ্রুতবেগে সেই আলোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গিয়া দেখিলেন একজন সন্ন্যাসী অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ধ্যানে নিমগ্ন। শরৎ প্রণাম করিয়া বসিয়া থাকিলেন। কতক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন "বাবা কি খবর?" শরৎ বলিলেন—"বাবার নিকট এসেছি, কি আদেশ হয়?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"তোমার কোন চিন্তা নাই, এক্ষণে জ্যোতিষে শুভ দেখছি—গৃহে ফিরে যাও। কামনা সিদ্ধ হবে।" শরৎ বাবু বলিলেন, না বাবা, আমার আর সংসারে স্পৃহা নাই, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, কি অনুমতি হয়?" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সে সময় এখনও হয় নাই। আমার অনুমতিক্রমে বাড়ী যাও, যখন প্রয়োজন হবে, আমাকে স্মরণ করো।" শরৎ বাবু প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

(৪)

দেখিতে দেখিতে এক মাস গত হইল। রামনিধি মণ্ডল কলেরা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহার স্ত্রী ও কন্যার অভিভাবক এখন শরৎ বাবু। গ্রামের

সকল লোকে রামনিধির জন্য দুঃখ করেন। পাঠশালা উঠিয়া গেল, রামনিধির স্ত্রী শরৎকে যাইতে দিল না, পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে বাটীতে রাখিল।

রণদার নানাস্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল, কিন্তু কোন স্থানে তাহার পিতা মত দিলেন না, কারণ সকলেই প্রায় দরিদ্র ও ভাল কুলীন নয়। দরিদ্রের ঘরে কন্যা কিছুতেই যাবে না। গৃহিণী একদিন নির্জ্জনে কর্ত্তাকে বলিলেন "শরতের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেওনা কেন—শরৎ ছেলে ভাল"। রামকুমার বাবু 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন "তোমার কন্যা যে বড় ঘরে বিয়ে করবে, দরিদ্রের ঘরে যাবে না"। গৃহিণী উত্তর করিলেন "তোমার ত যথেষ্ট অর্থ আছে, তবে আর চিন্তা কি?" মেয়ে ও জামাইকে টাকা দিলেই হবে"। রামকুমার বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "না, ও সব কথায় দরকার নাই।" গৃহিণী আর কিছু বলিলেন না।

বিভার ঘরে বেশ অর্থ আছে, সুতরাং, অনেক সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। বিভা কিন্তু বিবাহে অস্বীকৃত। বিভা মাকে বলিল "মা, আমি বিয়ে করবো না, আমার ইচ্ছা চিরদিন কুমারী থাকি"। মা হাসিয়া বলিলেন "দূর পাগলি, তা কি হয়? ভাল একটা সম্বন্ধ পেলেই আমি স্থির করে ফেলবো"। মেয়ে বলিল "না মা, আমাকে বিয়ে দিও না, অন্ততঃ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেও না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করবো"। মা শিহরিয়া উঠিলেন। আর কিছু বলিলেন না।

বৈশাখ মাস—রৌদ্রের প্রখর তেজ। এবার মোটেই বৃষ্টি নাই, কৃষকেরা হাহাকার করিতেছে। আবাদ ভাল হয় নাই। মাঠে ধুলা উড়িতেছে। বেলা এক প্রহরের সময় একদল মেয়ে মাঠ পার হইয়া বনের প্রান্তস্থিত শিবমন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছিল। সকলের হস্তেই ফুল, বিল্বপত্র, ও নৈবিদ্য। রণদা সকলের পশ্চাৎ ভাগে ছিল। সকলেই সাজসজ্জা করিয়া যাইতেছিল। রণদা বলিল "ভাই দাঁড়া, আমি অত তাড়াতাড়ি যেতে পাচ্ছি না"। অন্যান্য মেয়েরা ব্যাঙ্গ করিয়া বলিল "হেঁটে এলে কেন? পাল্কীতে এলেই হ'ত। ভাল বর প্রার্থনায় শিবের নিকট যাচ্ছ, একটু কষ্ট করা দরকার"। হঠাৎ "মা গো, গেলেম", বলিয়া রণদা চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে সে চীৎকারে ফিরিল, দেখিল এক বিষধর সর্প রণদার পদতলে—রণদা চীৎকার করিয়াই ভূমিতে পতিত হইল। মেয়েরাও চীৎকার করিয়া উঠিল। শরৎ সে স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি মেয়েদের চীৎকারে তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া

দেখিলেন রণদা বিষের জ্বালায় ছটফট করিতেছে, তখন মেয়েদের নিকট সব ঘটনা শুনিয়া বুঝিলেন বিষধর সর্পে রণদাকে দংশন করিয়াছে। পদতলে একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিলেন, ক্রমশঃ রণদার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। দুইটি মেয়েকে রামকুমার বাবুর নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইয়া নিজে রণদাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন এবং যে সব প্রক্রিয়া নিজে জানিতেন তাহা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই রামকুমার বাবু উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বুঝিলেন কন্যার আর জীবনের আশা নাই। এই সময়ে শরৎ বাবুর সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ হইল। তিনি দৌড়াইয়া গুরুদেবের আশ্রমে গেলেন এবং সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। সন্ন্যাসী আর বিলম্ব না করিয়া একটা ঝুলি হইতে কয়েকটা ঔষধ গ্রহণ করিলেন এবং শরৎকে বলিলেন "তুমি যাও, আমি যত সত্বর পারি যাচ্ছি, শরৎ বাবু দৌড়াইয়া আসিলেন, দেখিলেন রণদার জ্ঞান নাই। তিনি পুনরায় রণদার মস্তক নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। একটি বৃক্ষপত্রের রস রণদার মুখে দিলেন। সে তাহা গিলিতে পারিল না। তারপর আর একটি তরল পদার্থ তাহার সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে শরীর গরম হইল। আবার ঔষধ সেবন করাইলেন, এবার ঔষধ গলাধঃ হইল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "আর ভয় নাই, এবার চক্ষু মেলিবে"। বাস্তবিকই বালিকা চক্ষুরুন্মীলন করিল,—দেখিল তাহার পিতা পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রামকুমার বাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন "রণদা, কার অনুগ্রহে জীবন পেলে দেখ। এই সন্ন্যাসী ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান্, আর যার উদ্যোগে তুমি জীবিত হইলে, তাঁহার ক্রোড়েই তোমার মাথা আছে। শরৎ বাবু না আসিলে তুমি রক্ষা পাইতে না।" রণদা একবার শরৎ বাবুর দিকে তাকাইল, তার ভারি লজ্জা বোধ হইল, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

* * * * *

শুভদিনে রণদার সঙ্গে শরৎ বাবুর খুব ধূমধামের সহিত বিবাহ হইল। বিভা এ বিবাহে উপস্থিত ছিল, সে প্রায় দুইশত টাকা মূল্যের একখানি স্বর্ণালঙ্কার রণদাকে দিল। রণদার আর সে ভাব নাই, সে শরতের মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে। সে বুঝিল ধনী হইলেই হয় না। গরীবের সহিত বিবাহ হইলেও সুখী হওয়া যায়। রামকুমার বাবু কন্যা ও জামাতাকে পা

হাজার টাকা যৌতুক দিলেন এবং পৃথক্ একখানি পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

বিভা আর বিবাহ করিল না। সে যাহা বলিল তাহাই করিল, চিরদিন কুমারী ব্রতপালন করিল। সে এক দানপত্র করিয়া তাহার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি শরৎকে দিয়া গেল। বিভার মা অল্পদিন পরেই স্বামীর অনুগমন করিল। বিভা কতক দিন দেশে থাকিয়া পরে ৺ বৃন্দাবন ধামে চলিয়া গেল। যাওয়ায় সময় শরৎ বলিলেন "ভগিনি, এ বয়সে তীর্থযাত্রা কেন? আমার ইচ্ছা তোমার সম্পত্তি ফিরিয়া লও ও বিবাহ করে সুখী হও।" বিভার চক্ষে জল আসিল, সে কোন কথা বলিল না, কেবল একবার শরতের দিকে অশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে তাকাইল।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

নতুন বৌ।

(১)

"হ্যাগা বৌমা তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে, তোমার যে দেখছি বড় লম্বাই চওড়াই খরচ; রোজ একটা করে দেশলাই চাই বাপু; এত নবাবী করলে আমি পারবো না" এই বলতে বলতে ক্ষেমঙ্করী তার পুত্রবধূর ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে ছোট কন্যা সুশীলা,—নামটী সুশীলা হইলেও তার মত দুষ্ট মেয়ে সে পাড়ায় আর ছিল না; বিশেষতঃ সে নতুন বৌর কাছে এসেন্স সাবান, খেলনা, তাস প্রভৃতি দ্রব্যের লোভে তার একান্ত শরণাগত ভাব দেখাইলেও, কিসে নতুনবৌ মার কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে সে বিষয়ে তার খুব লক্ষ্য ছিল। নতুনবৌর ঘরে কাটিভরা দেশলাইয়ের বাক্স দেখিলেই সে চুপি চুপি জানালা গলাইয়া কাটিগুলি ফেলিয়া দিয়া ২।৪টী বাক্সতে রাখিয়া দিত এবং মা যখন পুত্রবধূকে সেইজন্য তিরস্কার করিত তখন সুশীলা একটী দুষ্টামিপূর্ণ চাহনীতে তার দিকে চাহিয়া হাসিত। আজও সুশীলাকে সঙ্গে দেখিয়া মলিনা ব্যাপার বুঝিল, কিন্তু শাশুড়ীর কাছে সুশীলার নামে কোন অভিযোগ করিয়া, পিতামাতার উদ্দেশে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মুখনিঃসৃত সুমধুর বাক্যবাণ অর্জ্জন করিতে তার ইচ্ছা হইল না; সে নীরবে গঞ্জনা শুনিতে শুনিতে তার বড় বড় চোখ দুটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল।

সেদিন বীরেন সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিয়াছে। ইলিয়ট সীল্ড পাওয়ার জন্য সেদিন তাদের কলেজ একটায় বন্ধ হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে বই রাখিয়া শোবার ঘরে যাইয়া দেখে মলিনা কাঁদিতেছে, সে জানিত তার মার ও ভগিনীদের—বিশেষতঃ সুশীলার অত্যাচারে শ্বশুরালয়ে মলিনার জীবন প্রেসেডেন্সী জেলে নির্জ্জনকক্ষ-রুদ্ধ কয়েদীর জীবনাপেক্ষা কষ্টকর। মলিনার নিকটে গিয়া তার অলক্ষিতে তাকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার কি ব্যাপার হয়েছে? মলিনার স্বভাব, স্বামীর কাছে কখন কোন অভিযোগ করিত না; তাই সে বলিল, "আমার দোষ হয়েছে দেশলাইয়ের কাটী বেশী নষ্ট করেছি তাই মা বকেছেন, তা সেজন্য ত আমি কাঁদি নাই, চোখে একটা কি পড়েছিল তাই জলে ভরে গিয়েছে।" বীরেন স্ত্রীর উদার হৃদয় দেখে সুশীলার সহিত তার তুলনা ক'রে ভাবিল,—হায় শিক্ষার দোষে সুশীলায় ও মলিনায় কত প্রভেদ—সুশীলার আনন্দ পরনিন্দায়, পরনির্য্যাতনে, আর মলিনার আনন্দ পর সেবায়, পর কুৎসা গোপনে। শাশুড়ী ননদের ব্যবহারের কথা বলিলে স্বামীর মনে অযথা কষ্ট দেওয়া হইবে বিবেচনায় মলিনা প্রকৃত কথা গোপন করিয়াছিল। বীরেন বলিল মলিনা প্রত্যহ কি তোমার চোখে কিছু না কিছু পড়ে, তাই যখনই আমি বাড়ী আসি তখনই চোখ ছল ছল করছে দেখতে পাই; তোমার বড় অদৃষ্ট মন্দ, তাই আমার মত হতভাগ্যের সহিত তোমার বিবাহ হয়েছিল। এ বাড়ীতে এসে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও কষ্টের শেষ হ'ল; কি করবো মলিনা আমি স্বাধীন নই, আর আমি মাকে কোন কথা বলতে পারি না তাত জান, তবে এও বুঝি যে তোমার এত কষ্ট দেখে নীরব থাকাও স্বামীর উচিত হয় না; কিন্তু তবুও নিরুপায়। মলিনা স্বামীর কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ক্ষেমঙ্করী ও বীরেনর বড়দিদি যমুনা সে ঘরে প্রবেশ করিল; বীরেন ও মলিনা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। বীরেন ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলে তার মা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হ্যারে বীরেন, বৌ'র জন্য কি তুই পাগল হবি, কলেজ কামাই করে লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরে পালিয়ে আস্‌ছিস। বৌ কি তোকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। লেখা পড়া না শিখলে খাবি কি? কর্ত্তা যা কিছু রেখে গেছেন তাতে সংসার খরচ অতি কষ্টে চলছে, তার উপর তোমার বৌটী যে রকম নবাবের মেয়ে, তাতে দুদিনে পথে বস্‌তে হবে, ওর রোজ একটা দেশলাই চাই, বিছানার চাদর রোজ ময়লা হয়, সাবান দিতে হবে। যা হয় কর

বাপু, আমি ত আর পারি না।" বীরেন বলিল "মা কলেজ পালিয়ে আসি নাই, ফুটবল খেলায় জেতায় আজ আমাদের সকাল সকাল ছুটী হইয়েছে—তুমি হারু কাকাকে জিজ্ঞাসা কর সত্যি কি না! আর তোমার বৌর সম্বন্ধে তুমি যা ভাল বোঝ করগে, আমার সে বিষয় কিছুই বলবার নাই; এই বলে বীরেন বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল। ক্ষেমঙ্করীও বৌকে লক্ষ্য করে—"ছেলেকে গুণ করতে চায়, পড়তে বারণ করে—" ইত্যাদি বলতে বলতে নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

মলিনার মুখখানি দেখিলে তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তার প্রতি স্নেহের উদ্রেক হয়, সে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নয়; কারণ সৌন্দর্য্যও সকল হৃদয়কে সমানভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না, তবে এক একখানি মুখের সরলতা ও নম্রতা দেখিলে ইচ্ছা হয়, তাকে হৃদয়ে স্থান দিই, তার সুখের জন্য প্রয়াসী হই, তাই মলিনার মুখ দেখে প্রতিবেশিনী সমবয়স্কা ব্রাহ্মণ কন্যা সুরমা মলিনাকে বড় ভালবাসিত। সে অবসর পাইলেই মলিনার কাছে আসিয়া বসিত, গল্প করিত ও তাহার চিরবিষণ্ণ মুখখানিকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত। সেদিন সুরমা বৈকালে আসিয়া দেখিল মলিনা মলিনবদনে বসিয়া আছে, তখনও তাহার গাধোয়া, কাপড় কাচা হয় নাই, জিজ্ঞাসায় সে প্রকৃত কারণ জানিতে পারিল। শুধু সুরমাকে মলিনা তার প্রাণের কষ্ট জানাইত; তার কাছে কোন কথাই গোপন করিত না, কারণ একজনকে প্রাণের ব্যাথা জানাইয়া সহানুভূতি না পাইলে সে কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব। সুরমা আসিয়া বৌর কাছে বসে গল্প করে, তা ক্ষেমঙ্করী, সুশীলা বা যমুনা কেহই পছন্দ করিত না; তবে তার জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল ও হৃদয়ের উন্নতভাব দেখিয়া ভয়ে কেউ তাকে কিছু বলিত না, আর সুরমাও কখন মলিনার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য কাহারও সহিত বাদ প্রতিবাদ করিত না।

সুরমা মলিনাকে বুঝাইল—কি করবে বোন, সহ্য কর, বীরেন দা কিছু চিরদিনই এমন পরাধীন থাকবে না, তার চাকরী হ'লে তোমায় সুখী করবে। স্ত্রীলোকের যা সাররত্ন—স্বামীর নির্ম্মল ভালবাসা, সে সুখেত ঈশ্বর তোমায় বঞ্চিত করেন নাই; সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দাও; তোমার এই কষ্ট শারদ-কুজ্ঝটিকার ন্যায় অচিরে কাটিয়া যাইবে।" মলিনা বলিল, "ভাই তোমার দাদা কেন আমায় স্নেহ করেন, ভালবাসেন, আমার কষ্ট দেখে দুঃখ করেন, তাইত মা দিদি, সুশীলা সবাই ওঁর উপর এত বিরক্ত; কেমন করে উনি এই অভাগিনীর

অদৃষ্টে বেচে থাকবেন তাই আমার ভাবনা।” সুরমা বলিল, “কি পাগলীর মত বক্‌ছো, তিনি তোমার স্বামী, তিনি যদি তোমায় স্নেহযত্ন না করবেন, না ভালবাসবেন তবে তুমি কেমন করে এই জ্বালাময় সংসারে বাঁচবে, তাঁর ঐ ভালবাসাটুকু তোমার এই ক্লিষ্ট জীবনে মৃত সঞ্জীবনী সুধা, তাকি ভুলে যাচ্ছ? দ্যাখ ভাই, আমার মনে হ’চ্ছে, তোমার গর্ভে একটি সন্তান হ’লে কাকিমার বিদ্বেষটা কমবে, তবে তোমার ননদদের গাত্রদাহ ও হিংসা সহজে যাবে না, তাঁহার গহনাগুলি ও নগদ টাকাটা যখন তারা হাত করবে; তখন তারা আর এ মুখো হবে না, তোমায়ও জ্বালাবে না; তা কাকি মা বেচে থাকতে দুটার একটাও তাদের দিতে পারবেন না—এই যা বিপদ।”

দুজনায় কথাবার্ত্তা হ’চ্ছে এমন সময় বীরেন কার্য্য গতিকে অন্দরে এসে সুরমাকে দেখে তাকে ডাকলে ও চুপি চুপি বল্লে “দ্যাখ সুরী, তোর বৌদিদির কাছে মাঝে মাঝে আসিস ও তাকে বোঝাস্ সে যেন না কাঁদে, আর সুশীলা ত তোর যুড়ী, তাকে কেন তুই বৌর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে শেখাস না? সুরমা বল্লে “বীরেন দা যা বলছো, আমি ত করবো, তুমি কেন একবার মাকে বলতে পারোনা যে বউএর অপরাধ কি? তার মেয়েরা সব দোষ তার ঘাড়ে চাপায়, এটা যেন মধ্যে মধ্যে তিনি অনুসন্ধান করেন, তা হ’লে ত বৌদিদির এত গঞ্জনা খেতে হয় না।” বীরেন বলিল হ্যারে সুরী, তুই কি এত দিন আমাদের বাড়ী এসে মাকে, দিদিকে ও সুশীলাকে চিন্‌লি না, তা’বল্লে বৌকে ওরা জীয়ন্তে পুড়িয়ে মারবে।” সুরমা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল “হ্যা বীরেন দা, সত্য বলেছ, জানি না ওরা বৌদিদিকে অমন কেন করে, আমার ত বৌদিদিকে দেখলেই ভাল বাসতে ইচ্ছা করে, বৌদিদির মত মেয়ে লাখে একটা হয়, ওরা এমন বৌকে চিন্‌লেনা, তবে আমার বিশ্বাস দুদিন পরে ওদের এই ব্যবহারে জন্য একদিন ওরা অনুশোচনা করবে।

(৩)

সেদিন দ্বাদশী, মলিনা খুব ভোরে উঠে স্নান করে শ্বাশুড়ীর জন্য মিছরির পানা করেছে, ফল কুট্‌ছে, এমন সময় যমুনা চোক রগড়াতে রগড়াতে ঘুম থেকে উঠ্‌লেন ও যেমন মা গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ঢুকেছেন অমনি তাঁহার কাছে এই অভিযোগ করা হ’ল যে, “বউকে অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও সে আমাকে তোমার জন্য জলখাবার করতে না দিয়ে নিজে জোর করে করতে বস্‌লো, জানিনা মা ওর মনে কি আছে, তুমি গেলেই ত উনি গিন্নি হ’ন”; ক্ষেমঙ্করী

অমনি বলিয়া উঠিলেন ওগো "মা'র চেয়ে যে আপনার হয় তাকেই বলে ডাইন, তা বাছা আমার মেয়েদের চেয়ে ত আর তুমি আপনার নও, ওদেরও দরদ আছে, মার কষ্ট ওরাও বোঝে, তা ওদের জলখাবার না করতে দিয়ে তুমি করলে যে আমার ভয় হয়, পাছে মিছরির পানায় কি মিশিয়ে টিশিয়ে দেবে।" মলিনা শাশুড়ী ননদের মুখে এই মর্ম্মস্পর্শী মিথ্যাপবাদ শ্রবণ করিয়া মরমে মরিয়া গেল; তার নীলোৎপল নয়নদ্বয় বিদীর্ণ হইয়া ঝরণার ন্যায় অবিশ্রান্ত অশ্রুবরিষণ করিতে লাগিল, সে অনেক শপথ করিল, যে তার কোন কু অভিসন্ধি নাই, সেদিনের মত শাশুরী যেন তার প্রস্তুত খাবার খাইতে কুণ্ঠিত না হন, কিন্তু ক্ষেমঙ্করী কথা কহিবার পূর্ব্বেই যমুনা পানাটা ও কোটা ফলগুলি নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দেখ বৌ, মার জন্য তোমার আর অত দরদ দেখাতে হবে না, আমরা যত দিন আছি, মার কোন যত্নের ত্রুটী হবে না, তুমি ততক্ষণ চিঠি লেখোগে, গানের খাতা লেখোগে, না হয় বরের সঙ্গে ছুটো ঠাট্টা তামাসা করগে যে, তোমার কাজ হবে।" মলিনা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বীরেনের সামনে পড়িয়া গেল। বীরেন মলিনাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে সেদিন বাধ্য হইয়া সে সব কথা বলিল, কারণ সেদিনকার অভিযোগ অতি ভীষণ ও কলঙ্কপূর্ণ। শেষে মলিনা বলিল—"জানিনা পূর্ব্ব জন্মে কি অপরাধ করিয়াছিলাম, তাই দেবতুল্য স্বামী পাইয়াও সুখী হইতে পারিলাম না, জীবনে শান্তি পাইলাম না, আমি ত মাকে দিদিকে সুশীলাকে সুখী করিবার ও তাদের মনমত কার্য্য করিবার জন্য নিশিদিন চেষ্টা করি, তারা যেটি বলে তাই করি ও করতে যাই, তবুও কেন তাদের প্রসন্ন করিতে পারি না; এখনই যে কাজটী না করার জন্য তারা আমায় তিরস্কার করে, একটু পরে আবার সেই কাজটী করার জন্য গঞ্জনা দেয়। ওরা কি চায়, আমি যে এত চেষ্টা করেও বুঝতে পারছি না, যদি আমার জীবন গেলে ওরা সুখী হয়, তবে হে ভগবান, তাই হ'ক, আমি যেন তোমার কোলে মাথা রেখে শীঘ্র মরি।" বীরেন বলিল, "দ্যাখ, তোমার ওদের কোন ব্যাপারে থেকে দরকার কি, ছুটি থাবে নিজের ঘরের কাজ করবে, আর যদি কিছু ওরা দয়া করে কর্ত্তে দেয়, বলে ত করবে নইলে ওদের কোন কাজে তুমি থেকোনা, কি করবো মলিনা, তোমার বাপের বাড়ীতে কেউ থাকলে আমি সেখানে তোমায় রেখে আসতুম, এমন করে জীয়ন্তে তোমায় দগ্ধ আর দেখতে পারি না, যদি ভগবান সুপ্রসন্ন হ'ন, তবে তোমার কষ্ট দুর করবার চেষ্টা করবো, নইলে অকর্ম্মণ্য স্বামীর এই অক্ষমতা

নিয়ে আর বেশী দিন বাঁচতে আমার ইচ্ছা হয় না। নলিনা বলিল, "ছি, তুমি কেন কষ্ট কর, মা ত তোমায় ভালবাসেন, আমি পরের মেয়ে আমার প্রতি দয়ামায়া ভালবাসা সেত আমার অদৃষ্ট সাপেক্ষ, তার জন্ম তুমি কি করবে, এবার হ'তে তোমার উপদেশ মতই কাজ করবো, কিন্তু বাড়ীর বৌ কেমন ক'রে কিছু কাজ না ক'রে বসে থাকি বল, কাজ না করলেও যে তাঁরা গঞ্জনা দেবেন তিরস্কার করবেন, করলেও পছন্দ হবে না।"

(৪)

সেবার বীরেন বি, এ, পরীক্ষায় ফেল হইল, বীরেন ছেলে বরাবর ভাল, এণ্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিল, এফ, এ, পাশ করার পর তাহার বিবাহ হয় ও পত্নীর প্রতি মাতা ভগিনীদের দিবারাত্র নির্ম্মম অমানুষিক ব্যবহার দেখে দেখে সে একাগ্রচিত্তে পড়তে পারতো না, তার শুধু মনে হ'ত যে সামান্ত একটী চাকরী গ্রহণ করে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যদি দিনান্তে এক মুষ্টি আহার পায়, তাহ'লেও তারা সুখী হ'বে। নানারূপ সাংসারিক বাধাবিঘ্ন ও মানসিক উদ্বেগে শেষ বৎসর পাঠে তার অতিরিক্ত অবহেলা হইয়াছিল, পরীক্ষার পূর্ব্বে অত্যাধিক মানসিক চিন্তাহেতু শীরঃপীড়াও জন্মিয়াছিল; এই সব নানা কারণে বীরেন ফেল হইল। সে সংবাদ বাড়ীতে পৌছিবামাত্র ক্ষেমঙ্করী পুত্রবধূর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন অলুক্ষণে মেয়ে দেখি নাই; এই দুইবৎসর বাড়ীতে পা দিয়েছেন; তিনটী মকর্দ্দমায় হারলুম, যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তা সব গিয়েছে, গহনাগুলি ক্রমশঃ যেতে আরম্ভ হয়েছে, তার পর ছেলেটী ভাল ছিল, তার মুখাপেক্ষী হয়ে সব ক্ষতি সহ্য করছিলুম, তা ডাইনী বেটী তাকে যাদু করেছে, ছেলে পড়ে না, কলেজ কামাই ক'রে এসে বসে গল্প করে, রাত ১০টা না বাজতেই ঘরে ঢোকেন, পড়াশুনা, বই ছেড়ে এখন বৌএর সুখ দুঃখ নিয়েই ছেলে ব্যতিব্যস্ত; একটু লজ্জাও করে না, দিন রাত স্বামীর কাছে যেতে ও থাকতে। দেখ ত আমাদের যমুনাও আছে, তার বরও ত আসে; কই মা আমার কখনও রাত্রি ১২টার আগে ঘরে যায় না; বিশেষতঃ যতক্ষণ আমি জেগে থাকি সে আমার কাছেই ঘোরে।" পাঠক পাঠিকাকে এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে যমুনার স্বামী আবগারী বিভাগের একজন বিশেষ ভক্ত—রাত্রে তার অবস্থা এমন হয় যে কাহারও তাহার নিকট একাকী থাকিতে সাহস ও প্রবৃত্তি হয় না, তাই যমুনা যতক্ষণ পারিত তাহার নিকট হইতে অন্তরালে থাকিবার প্রয়াস পাইত। ক্ষেমঙ্করী যে তাহা

না জানিতেন তা নয়, তবে পুত্রবধূকে নিন্দা করিতে হইলে তার একটু তুলনার আবশ্যক বিধায় এইরূপ অসত্যের অবতরণা করিয়াছিলেন।

রাত্রে মলিনা বীরেনের কাছে অনেক কাঁদিল, শুধু তার অদৃষ্ট দোষেই যে বীরেন পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে, এ কথা বীরেনের শতযুক্তি খণ্ডন করিয়া তাকে বোঝাইবার চেষ্টা করিল ও তার শত কষ্ট হইলেও তাকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া এবার যাতে সে পাশ হয় তার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পরিশ্রম করিতে কাতর অনুরোধ করিল। বীরেন এবার পাশ না হইলে সে এতকষ্টেও যে পাপ করে নাই বোধ হয় তাহাকে সেই আত্মহত্যা করিতে হইবে। বীরেন পত্নীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে যেমন করিয়া হউক এবার সে পাশ করিবেই।

(৫)

মলিনার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, ছয় মাসের হইলে অন্নপ্রাসনের সময় ক্ষেমঙ্করী আদর করিয়া নাম রাখিয়াছে বিষ্ণুপদ। জানিনা কোন্ অলক্ষ্য দৈবশক্তিপ্রভাবে বীরেনের মাতা পৌত্রটীর প্রতি বড় স্নেহাকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যখন শিশুর সেই প্রফুল্ল উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নয়নদুটী উল্লাসে হাসিতে থাকিত, বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধর হইতে সুধা ঝরিয়া পড়িত, তখন ক্ষেমঙ্করী বধূ-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া পৌত্রকে আদর চুম্বনে প্লাবিত করিয়া দিতেন, মলিনা ভাবিত সুরমা ঠিক বলিয়াছিল যে খোকা হইলে আর তোকে ভাল না বসিয়া থাকিতে পারিবেন না এবং খোকার জন্যই তোকেও একটু একটু স্নেহ করিবেন। ফলে বাস্তবিক তাহাই হইল, মলিনার একটু সর্দ্দি হইলে শাশুড়ী তার ভাত বন্ধ করিয়া লুচি কি রুটী খাইতে দিতেন, পাছে খোকা তার স্তন্যদুগ্ধ খাইয়া পীড়িত হয়। মলিনা সকাল সকাল না খাইলে তাহাকে তিরস্কার করিতেন, সংসারের কাজ কর্ম্মের ভার খোকার জন্য তাকে কম করিয়া দিতেন; কিন্তু যার অদৃষ্ট মন্দ, তার অবস্থা বিপর্য্যয় অচিরেই ঘটিয়া থাকে, মলিনারও তাহাই হইল, মলিনার সন্তান হইবার ৮ মাস পরে যমুনা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল, যমুনা বিষ্ণুপদের আদর যত্ন দেখিয়া হিংসায় মরমে মরিয়া থাকিত, কারণ সে নীচপ্রবৃত্তির কথা কোন ভাবে প্রকাশ করিতে পারিত না, তাই যখন তারও পুত্র সন্তান হইল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল, এবার বউএর দর্প চূর্ণ করবো, ছেলের মা হয়ে গরবে মাটীতে পা পড়ছে না। অন্নপ্রাশনের সময় মার সঙ্গে গোপনে তুমুল ঝগড়া করে বিষ্ণুপদকে যা গহনা দেওয়া হইয়াছিল

তার দ্বিগুণ মূল্যের গহনা আদায় করিল ; মার আর্থিক অবস্থা তখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, তাই ক্ষেমঙ্করী কন্যার এ অন্যায় আব্দার অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর রক্ষা করিলেন। যমুনা ক্রমশঃ তাঁহার মন বিগড়াইতে আরম্ভ করিল ও বিষ্ণুপদের প্রতি তাঁর স্নেহ ভালবাসা উৎকণ্ঠার উৎসটী তাঁর অজ্ঞাতসারে বিদ্বেষ কণ্টকে রুদ্ধ করিয়া নিজ পুত্রের দিকে দ্বিগুণবেগে উৎক্ষিপ্ত করিল। বিষ্ণুপদ এখন "দাদি" "দাদি" ক'রে পিতামহীর দিকে কম্পিতপদে অগ্রসর হইলে, ক্ষেমঙ্করী সাগ্রহ আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন না করিয়া অশুচির ভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, অবোধ শিশু কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে পিতামহীর মনোভাব জানিতে পারিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ক্ষেমঙ্করীর হরিনামের ঝুলি মধ্যস্থিত পয়সা দুয়ানি সিকি এখন বিষ্ণুপদের প্রীত্যর্থে—খেলনার বিনিময়ে বেদে বউএর ঝোলায় প্রবেশ করে না।

পুত্রের প্রতি শাশুড়ীর ব্যবহারে এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও উপেক্ষা মলিনার প্রাণে বিষম বাজিল ও সে নিজ দুরাদৃষ্টকেই ইহার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিল, কিন্তু তার নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কমলটী প্রবল বিদ্বেষজ্যোতিপূর্ণ বাত্যাঘাতে ক্রমশঃ শুকাইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ বিষ্ণুপদের ভেদবমি হইল, ছেলে একেই রুগ্ন ছিল, দু একবার বাহ্যে বমি হওয়ার পর একবারে অসাড় হইয়া পড়িল, মলিনা "ওগো মা ছেলে কেমন হয়ে যাচ্ছে গো" বলে কেঁদে উঠ্‌লো, ক্ষেমঙ্করীর প্রাণ এক অজানা আশঙ্কায় কম্পিত হইল ও কে যেন তার প্রাণে তীব্র কষাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল "তোর হিংসায় ও দোষে আজ স্বর্গের শিশু অকালে চলিয়া যাইতেছে" কষ্টে ঘৃণায়, লজ্জায় ক্ষেমঙ্করী নিজের কক্ষ হইতে বহির্গত হইল, ইচ্ছা গিয়া পৌত্রকে বুকে করিবে, কিন্তু যমুনা মাকে যাইতে দিবে না, সে বলিতে লাগিল, "মা, তুমি গেলে আমার যশোদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘরে ছুটবে ; ও ছোঁয়াচে ব্যারাম, শেষ আমার ছেলেও কি হারাব, খোকা ঘুমাক তবে তুমি যেও ; ও যে সন্ধ্যার পর তোমা ছাড়া কারও কাছে থাকে না। ক্ষেমঙ্করী হঠাৎ এ বাধা পাইয়া যেন কেমন হইয়া গেল। কে যেন কি গুপ্তাঘাতে তার পা ভাঙ্গিয়া দিল। তার হাত পা সব অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রাণের দুর্ব্বিসহ যাতনা ও অনুশোচনা তার মুখে চথে ফুটিয়া উঠিল। মাতার মুখের দিকে চাহিয়া যমুনা শিহরিল। এমন সময়ে মলিনা আর একবার ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওমা একবার এস, বিষ্ণু তোমায়

বুঝি ফাঁকি দিয়ে গেল গো” ক্ষেমঙ্করী পাগলিনীর মত ছুটিতে ছুটিতে বীরেনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিষ্ণুর বিছানায় পড়িলেন ও শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন “দাদা আমার আর আমি তোমাকে অযত্ন করিব না। পিতামহীর স্নেহস্পর্শে শিশুর রক্তহীন মুখের উপর এক ঝলক রক্ত দেখা দিল। আজ শিশু তাহার জীবন মরণের সন্ধিস্থলে পড়িয়া থাকিয়া তাহার মাতার ঘনকৃষ্ণ অদৃষ্টাকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত করিয়া দিল।

শ্রীসুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

ডাক্তারের ভিজিট।

(১)

নিরুপমা তাহার মাতুলের সহিত মাহেশে মাসিমার বাড়ী রথ দেখিতে যাইবে। নিরুপমার মা বয়সাদির উল্লেখ করিয়া, সে অবিবাহিতা, বড় হইয়াছে এখন যেখানে সেখানে যাওয়া উচিত নয় ইত্যাদি কারণ দেখাইয়াও, ভ্রাতা অরুণচন্দ্রের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। নিরুপমার আব্দার, মাতুলের আগ্রহ আতিশয্যে সোনায় সোহাগা হইল। নিরুপমা নির্ব্বিঘ্নে মাহেশে রথ দেখিতে গেল।

মুরারীমোহন মিত্রের নিবাস চন্দন নগর। মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা বেতনে জলপাইগুড়ির উকিল বাবুদের স্বদেশী কীর্ত্তির অন্যতম ‘ফিডারেশন টি কোম্পানি লিমিটেড’ নামক চা বাগানে কেরাণীর কার্য্য করেন। সেখানে নিজের আহার, ঔষধ, বস্ত্রাদির জন্য যতদূর সম্ভব কম খরচ পত্র করিয়া মাসিক ১২৲ বারটী টাকা বাড়ী পাঠাইয়া দেন, সাধ্বী স্ত্রী মনোরমা ইহাতেই মাতা পুত্রীর খরচ পত্র চালাইয়া দু একটী করিয়া টাকা জমা করেন, আশা—কন্যার বিবাহের সময় তিনি নিজে একখানি গহনা দিবেন। দুই বৎসর পর মুরারীমোহন বাড়ী আসিয়াছেন, স্ত্রীর পত্রে কন্যার বিবাহের জন্য সপ্তাহে দুইবার তাগাদা হইলেও এতদিন আসেন নাই, তাহার কারণ—টাকা। কন্যার নামে পোষ্টাফিসে ১৭৬৷৷০ একশ ছিয়াত্তর টাকা আট আনা জমা হইয়াছে, ইহাতে কি হইবে? হঠাৎ একজন নিকট আত্মীয়ের টেলিগ্রাফ পাইলেন, “তোমার স্ত্রী অতিশয় পীড়িতা—শীঘ্র এস”।

একে সমস্ত রাত্রি ট্রেণে জাগরণ, তদুপরি টেলিগ্রাফের সংবাদে মনের উদ্বেগ, বাড়ী আসিয়া মুরারীমোহন সভয়ে ডাকিলেন নিরু। সম্মুখেই স্ত্রীকে দেখিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, একটু ভাল আছ কি? মৃদু হাসির সহিত মনোরমা সংক্ষেপে বলিলেন—আছি। একখানি জল চৌকি পাতা, পাশে গাড়ুর উপর একখানি গামছা,- স্বামীকে বসাইয়া স্ত্রী পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

নিরু কোথায়?

অরুণের সঙ্গে মাহেশে রথ দেখ্‌তে গেছে, কাল আস্‌বে।

মাহেশে! কবে গেছে?

"পরশু"।

জিজ্ঞাস্য থাকিলেও মুরারীমোহন উপস্থিত আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

হাত পা ধোয়া হইলে, তেল মাখিয়া বাড়ীতেই তোলা জলে স্নান করিলেন। আহারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি অসুখ করেছিল তোমার?

"মাছখানা তুলে নাও, ঝোলটুকু ঢেলে আর চারটী ভাত মেখে নাও।"

"তোমার শরীর ত খুব খারাপ বোধ হচ্চে, অসুখটা কি হয়েছিল?"

"কাসুন্দীর অম্বল ফেলে উঠ্‌চো যে?"

"ভুলে গেছি"।

দুধের বাটী, আম-কাঁঠাল ফেলিয়াই মুরারীমোহন উঠিতেছিলেন।

এগুলো ফেলে উঠ্‌চো যে?

এগুলোও ভুলেছিলাম বলিয়া,—সহাস্যে বলিলেন অসুখের সংবাদ জিজ্ঞাসায় ত উত্তর পাইলাম—ঝোল, মাছ, ভাত, কাসুন্দীর অম্বল, দুধ, আম আর কাঁঠাল।

বহুদিন পরে স্বামীর হাসিমাখা সরস বাক্যে মনোরমাও হাসিতে হাসি না মিশাইয়া থাকিতে পারিলেন না।

বিছানার উপর ডিবায় পান রাখিয়া, নলচে নড়া হুকাটি হাতে করিয়া, কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে মনোরমা বলিল, রাত জেগেছ—একটু ঘুমোও।

(২)

মুরারীমোহন ঘুম হইতে উঠিয়া বলিলেন, নিরু মাহেশে কোথায় আছে?

স্বামীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে করিয়া, মনোরমা বলিলেন বিভার বাড়ী।

বিভার বে'র নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলে ত ? বিভার বরটী বেশ হয়েছে। বাপের এক ছেলে, লেখা পড়াত বেশ শিখ্চে, এইবার বি, এ, পাশ করেছে। তোমার আদরের বিভার খবর শুনে অবশ্য তোমার আনন্দ হচ্চে। নিরু আর সে প্রায় এক বয়সী, এক বছরের ছোট বড়। বিভা প্রায়ই লিখ্তো, দিদি, নিরুকে একবার পাঠিয়ে দিও। অনেক ভেবে চিন্তে অরুণের সঙ্গে পাঠিয়েছি। রাগ করেছ বোধ হয়, কালই সে আসবে।

না—রাগ করিনি, তবে এইবার রাগ ক'রব ভাব্চি, অসুখটা কি রকম তাই শুন্তে চাই।

মনোরমা বলিলেন শোন, মেয়ের বয়স তের বছর হ'ল ; দু-একজন মুখের উপরই বল্লে, 'নিরুর বে'র চেষ্টা কচ্চ না ? আর ত নেহাত কচী খুকীটি নাই। লোকে নিন্দে করবে যে'। সেদিন দত্ত মহাশয় এসে নিরুকে ডাক্লেন, নিরু দরজা খুলে দিলে, বাড়ীর মধ্যে এলেন—বল্লেন একটা কথা বল্তে এলুম। তোমার নাম ধরে বল্লেন "নিরুর বে'র কি কর্চ্চ"। বউমা ! তোমার অসুখ বলে আজ তাকে একটা টেলিগ্রাফ করব। এখন এসেছ, ভালই হয়েছে, দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে একবার দেখা কর। খেতে পরতে পায়, শ্বশুর শাশুড়ী থাকে, ছেলেটী একটু লেখাপড়া জানা হয়, এই রকমই দেখে শুনে একটা সম্বন্ধ স্থির কর।

মুরারীমোহন সবই শুনিলেন, অথচ যেন কিছুই শুনিলেন না, এই ভাবে বলিলেন। আমি একবার আজ মাহেশে যা'ব, নিরুকে না দেখে সুস্থির হ'তে পার্চ্চি না। বিভার বরের নাম—মন্মথ—না ? একবার বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া জানা বড় কুটুম্বুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

মন্মথনাথের পিতাকে অনেকেই চিনেন। ভবনাথ বসু অর্থশালী, এজন্য পরিচয় না থাকিলেও, তাঁহার নাম ও বাটী ইতিপূর্ব্বে মুরারীমোহনের জানা ছিল। ভবনাথ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৈঠকখানায় স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়ের মিটিং চলিতেছে। স্থানীয় যুবকবৃন্দ কলিকাতার স্বদেশ-সেবকের সহিত মিশিয়া একযোগে কার্য্য করিতেছেন। ভবনাথ বাবুর পুত্র মন্মথনাথ ইহাদিগকে থাকিবার এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের সুবিধা অসুবিধার সংবাদ লইতেছেন।

বাটীর ভিতর হইতে দুইটি যুবক বৈঠকখানায় উপস্থিত হইবামাত্র, যেন তাঁহাদের মুখে বিশেষ কিছু শুনিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া

রহিলেন। আগত যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন অপরকে বলিলেন, মন্মথ! অবস্থা এতক্ষণ ভালই বোধ হচ্ছিল, কিন্তু আর ভাল বল্‌তে পারি না, এখন মন্দই বোধ হচ্ছে। কলেরা কেস্, অল্প সময়ের মধ্যে ভাল অবস্থা থেকে মন্দ অবস্থা এবং মন্দ অবস্থা থেকে ভালয় দাঁড়ায়। তুমি একবার শ্রীরামপুর থেকে হেমবাবুকে আনবার ব্যবস্থা কর। যুবকগণ যাইবার জন্য সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মন্মথনাথ একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—যতীন! তুমি যাও। যতীন তৎক্ষণাৎ শ্রীরামপুর অভিমুখে রওনা হইল।

মন্মথনাথ শচীন্দ্রকে বলিলেন, মেয়েটির বাপ বিদেশে, বাড়ীতে মা আছেন—এই কথা শুনিবামাত্র "তবে কি আমার নিরু" বলিয়া মুরারীমোহন—আছড়াইয়া পড়িলেন। সমবেত যুবকগণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন আগন্তুক মূর্চ্ছিত, কিয়ৎকাল শুশ্রূষায় মুরারীমোহনের জ্ঞান হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, নিরুকে একবার দেখ্‌ব। মন্মথনাথ বিনয়নম্র-বচনে বলিলেন, দাদা! আপনি চিন্তা করবেন না। নিরু শীঘ্রই আরাম হবে, আপনি নিরুকে দেখ্‌বেন আসুন। কন্যার অবস্থা দেখিয়া মুরারীমোহন কাঁদিয়া ফেলিলেন, মন্মথনাথের প্রবোধ বাক্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ডাক্তার হেমবাবুর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত ভাবে সদর বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শচীনের সহিত হেমবাবু রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন এবং ঔষধাদি যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, শুনিয়া বলিলেন, ঠিক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত ঔষধ এবং শুশ্রূষার গুণে রোগিণীর অবস্থা এখন খুব ভাল। মন্মথনাথ বলিলেন, আমার বন্ধু শচীন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজের ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। গত কল্য রাত্রি তিনটা হইতে আজ এ পর্য্যন্ত বালিকাকে নিজের চিকিৎসাধীনে রাখিয়া ঔষধাদি খাওয়াইতেছে। আরোগ্য হইলে, শচীন্দ্র একাকীই বালিকার জীবন রক্ষা করিয়াছে মনে করিতে হইবে।

মুরারীমোহন সস্নেহে শচীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, শচীন্দ্র কুণ্ঠিত ভাবে মুখ নত করিল।

(৩)

নিরুপমা আরোগ্য হইয়া পিতার সহিত বাড়ী আসিয়াছে। মুরারীমোহন ভদ্রেশ্বরে একটী পাত্র দেখিতে গিয়াছিলেন, আদান প্রদানের কথায় বিলক্ষণ অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, পাছে স্ত্রী দুঃখিতা হয়েন এজন্য বাড়ী আসিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিলেন না।

নৈহাটী একটি পাত্রের সন্ধানে গিয়া শুনিলেন, পাত্রটী পরিষ্কার কলে কাজ করে। লেখাপড়া "গুরু মহাশয়ের পাঠশালা হইতে পলায়ন পর্য্যন্ত"; প্রথমা স্ত্রী জীবিতা, বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলেন—কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া কন্যার পিতৃকুলকে ধন্য করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। একমাত্র স্নেহের কন্যা নিরুপমাকে দেখিয়া শুনিয়া, কিরূপে জলে ফেলিয়া দিবেন—ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছেন না।

নিরুপমা মাতার সব গুণই পাইয়াছে। বাড়ীতে কেহ আসিলে কোমরে কাপড় জড়াইয়া, রান্না, পরিবেশনে ব্যস্ত। নিরুপমা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। মুরারী-মোহন বাড়ী আসায় নিরুপমা নিজে পিতার স্নান, আহার, শয়নের ব্যবস্থা ও কাপড় কোঁচান লইয়াই ব্যস্ত। নিরুপমা মাতার ন্যায়ই সুন্দরী। নাক, মুখ, চোখ সবই মাতার অনুরূপ। মুরারীমোহন এক দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকাইয়া দেখেন, আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন।

(৪)

শচীন্দ্রের পিতা অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নিবাস হালিসহর। উপস্থিত পটলডাঙ্গা—মল্লিকের লেনে একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। মাহেশ হইতে আসিয়া শচীন্দ্র পড়িবার ঘরে বসিয়া একমনে কি ভাবিতেছেন, ভগিনী ইন্দুমতী ডাকিল, দাদা! মা ডাক্‌চেন। শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া মার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা বলিলেন—বাবা শচি! কুমুদ বাবুর স্ত্রী ত খুবই ধরে বসেছেন, কর্ত্তা যা ইচ্ছা বলুন। আমি তোকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, তোর যদি মত হয়, তা হলে আমি মেয়েটি দেখে আসি, ওখানে মেয়ে ভাল না হয়, অন্য জায়গায় দেখ্‌ব, তুই নিজেও দেখিস্, লক্ষ্মী বাবা আমার, তুই এক-বারটী বল "বিয়ে করব"। শচীন কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নত মুখে বলিল, মা! এতদিন যখন অপরাধ লও নাই তখন আর একদিন সময় দাও। আমি কাল উত্তর দিব। মা—মহানন্দে সস্নেহে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ইন্দু আসিয়া ডাকিল, দাদা! শচীন হাসিয়া বলিল—"উত্তর শুন্‌তে এসেছিস্?" ইন্দুমতী হাসিয়া বলিল—"হাঁ"। "এখনই মাহেশে তোর মন্মথ দাদাকে একটা টেলিগ্রাফ করে দে। দাদার অসুখ, শীঘ্র আসুন।" ইন্দুমতী বলিল, "বুঝেছি দাদা, ঘটক বিদায়টা মন্মথ দাদাকেই দিতে চাও।"

বৈকালে মন্মথনাথ আসিয়া দেখিলেন, শচীন্দ্র দিব্য 'খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে' বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে। দুই বন্ধু নির্জ্জন আলাপে

বসিলেন। গত কল্য মাতাঠাকুরাণীর সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা এবং আজ ইন্দুকে দিয়া টেলিগ্রাফের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত মন্মথনাথ সমস্তই শুনিলেন। শচীন বলিল, বাবা ইন্দুর বিয়েতে ছয় হাজার টাকা খরচ করেছেন, আমার দ্বারা তাহার ডবল লইতে চা'ন। ভাই, শেষে লেখাপড়া শিখিয়া, কি কন্যার পিতার গলায় ছুরী দিয়া অর্থ আদায় করিব। যদি কোন গরীবের মেয়ে বিবাহ করিয়া, তাঁহার বিন্দুমাত্র উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে মনে শান্তি পাইব।—তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া মাকে উত্তর দিব, তুমি সাহায্য করিবে বলিয়া তোমাকে আনাইয়াছি।

মন্মথ বলিল—শচীন! আমাদের বাড়ীর তোমার সেই রোগিনীটির পিতাকে উপকৃত কর্ত্তে তোমার অমত হ'বে কি?

ঈষৎ লজ্জিত ভাবে শচীন বলিল, ঐরূপ হইলেই ভাল হয়। উভয় বন্ধুর কথায়, মনে মিল হওয়ায় উভয়েরই মুখে একটু সাফল্যের হাসি দেখা দিল।

মন্মথনাথ ইন্দুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, ইন্দু আসিয়া মন্মথকে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা ভাল ছিলে ত? মন্মথনাথ বলিলেন—হাঁ। এখন তোমার দাদার বিবাহের ব্যবস্থা করতে এসেছি, তোমাকেও সাহায্য করতে হ'বে। ইন্দু! তুমি খুব ভাল বউ চাও, কি কতকগুলি টাকা সমেত অহঙ্কারী অভিমানী বড়লোকের একটী মেয়ে চাও?

ইন্দু বলিল—না দাদা। বউ রূপে গুণে যেন ভাল হয়। টাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাব।

ইন্দুমতী মাতাকে গিয়া জানাইল মন্মথ দাদা এসেছেন, দাদা কাল যে উত্তর দেবেন বলেছিলেন বোধ হয় মন্মথ দাদা সেই উত্তর দিতে এসেছেন। শচীনের মা ব্যস্ততার সহিত মন্মথকে ডাকিয়ে পাঠাইলেন। মন্মথ আসিয়া প্রণামান্তে বলিল—মা! আজ আমি আপনার মন্মথ নই, আমার নাম মন্মথ ঘটক। শচীনের মা সন্তোষের সহিত হাসিয়া বলিলেন, দুটী ছেলেই আমার পাগল, দুটীতে যেন মাণিকজোড়, দেবতাদের নিকট উভয়ের কতই মঙ্গল কামনা করিলেন।

মন্মথনাথ বলিলেন—মা! ঘটককে অনেক মন্দ কথা শুনতে হয় তা জানি। শচীনের বের জন্য আমি মেয়ে দেখে এসেছি, শচীনও দেখেছে, তবে তাঁহারা গরীব, নগদ এবং গহনা পত্রাদিতে দু হাজার টাকার বেশী দিতে পারবেন না। মেয়ে খুব ভাল, কুল মর্য্যাদা দেখতে হইবে না, আমাদের সহিত খুব

নিকট কুটুম্বিতা। শচীনের মা খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি কর্ত্তার মত করাইয়া সংবাদ দিতেছি, তুমি শচীনের ঘরে বসো। যাইতে যাইতে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্য মুখে বলিলেন, এই মাসের ২৮শে ভাল দিন আছে।

শচীন্দ্রের পিতা রামনিধি বসু মহাশয় অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি সাধারণ হইতে যে একটু পৃথক্ হইবেন তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতেছেন। ভৃত্য কেলেশ মাইতি বৈঠকখানায় গিয়া সংবাদ দিল, একবার বাড়ীর ভিতর যাইতে হইবে। কোন লোকজন উপস্থিত না থাকায় রামনিধি বাবু তখনই বাড়ীর ভিতর আসিলেন। হাস্যমুখী গৃহিণীকে সম্মুখে দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের মাত্রা বাড়াইয়া বলিলেন—খবর কি?

রামনিধি বাবুর বিশেষত্ব এইখানে, সামান্য ব্যাপারে অনেক সময় হাসির লহর উঠাইয়া দেন, অথচ প্রকৃত হাসির কারণ ঘটিলে অতি যত্নের সহিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখেন, ইহা অপরে না বুঝুক আজ চব্বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় শচীনের মার নিকট এড়াইবার চেষ্টা বৃথা। গিন্নি বলিলেন, দেখো—হাসি যেন কোন গতিকে না বেরোয়। আমি কোথায় একটা আনন্দের খবর আনলুম আর উনি মুখে সুপারি পুরে দিয়ে উপস্থিত হোলেন, রামনিধি বাবু আজ আর গাম্ভীর্য্য ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, বলিলেন—এখন খবর কি বল দেখি?

"শচীন বে' কর্ত্তে রাজি হয়েছে।"

"কোন বিধবার কন্যা বুঝি, ঘর থেকে খরচ পত্র কর্ত্তে হবে নিশ্চয়?"

"না—গো—না, মেয়ের মা বাপ সবই আছে,—মন্মথদের কুটুম্ব, মেয়েটি নাকি দেখ্‌তে শুন্‌তে কাজ কর্ম্মে খুব ভাল, গহনা পত্রে নগদে দু হাজার টাকার বেশী দিতে পারবে না। ছেলে যদি কোন গতিকে রাজী হয়েছে, তুমি আর অমত করে হাঙ্গামা করোনা।"

রামনিধি বাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, গিন্নির কথাটী অযৌক্তিক নয়। একটী ছেলে, একটী মেয়ে, মেয়েটী ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল ঘরেই পড়িয়াছে, সুখেও আছে। ছেলের যখন মত হইয়াছে, তখন তাহাই হোক। প্রকাশ্যে বলিলেন, তা' হ'লে মেয়ে দেখার বোধ হয় দরকার হ'বে না।

গিন্নি বলিলেন—না, তবে মন্মথর বাপকে লেখ—যেখানে শচীনের বে'র কথা হচ্ছে তাঁদের বংশ মর্য্যাদাদি কিরূপ? ২৮শে ভাল দিন আছে, এই দিনেই শুভকার্য্য হওয়া চাই বলিয়া গিন্নি সত্বর পদে মন্মথকে সংবাদ দিতে গেলেন।

(৬)

মন্মথনাথ বাড়ী গিয়াছেন, মন্মথনাথের পিতা ভবনাথ বাবু পত্রের উত্তর দিয়াছেন, "ঘর খুব ভাল, আমাদের নিকট আত্মীয়।"

মন্মথনাথের মাতামহ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। একমাত্র কন্যা বলিয়া, অনেক টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি মন্মথর নামে, অনেক টাকার কোম্পানির কাগজ মন্মথর মাতাকে দিয়া, বাকী দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। মন্মথনাথ মাতার নিকট আব্দার ধরিলেন, আমাকে দু হাজার টাকা দিতে হইবে।

পুত্র কখনই এরূপ আবদার করে নাই, বিশেষতঃ মন্মথনাথের মাতা যখন শুনিলেন, শচীনের সহিত নিরুপমার বিবাহ ব্যাপারে মন্মথ খরচ করিতে চায়, তখন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, একখানি কাগজ সহি করিয়া দিলেন। নিরুপমা মন্মথদের বাড়ীতে আসিয়া মন্মথর মার নিকট বেশ একটু স্নেহ আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মন্মথনাথ বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত, মাহেশে থাকিয়াই বিবাহ হইবে। গাত্র হরিদ্রার পূর্ব্ব দিনে মন্মথনাথ হঠাৎ চন্দননগর মুরারী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত। মুরারী বাবু কখনও এরূপ বিপদে পড়েন নাই। বড় লোকের ছেলে, তায় উচ্চ শিক্ষিত, কিরূপ আদর অভ্যর্থনা করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। মুরারী বাবুর সে ভাবনা আর ভাবিতে হইল না। গুণবতী স্ত্রী মনোরমা সমস্ত ঠিক করিয়া লইলেন। বিশ্রামান্তে মন্মথনাথ শ্যালিকাকে বলিলেন, আপনার ভগিনীর অসুখ, এজন্য নিরুকে লইতে আসিয়াছি, নিরু কাছে থাকিলে মনটা কিছু ভাল থাকিবে মনে হয়, আমি এখনই যাইব। মাতার আদেশে নিরুপমা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিশেষ চিন্তার সহিত মুরারী বাবু বলিলেন, ভায়া! নিরুকে লইয়া যাও কিন্তু বিভার জন্য বড়ই চিন্তায় থাকিব, প্রত্যহ সংবাদ পাই যেন। সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া মন্মথনাথ গাড়ীতে উঠিলেন, বিভার প্রেরিত বিন্দু ঝি এবং নিরুপমাও উঠিল।

২৮শে আষাঢ় বৈকালে ভবনাথ বাবুর প্রকাণ্ড জুড়ীগাড়ী, চন্দননগর মুরারী মিত্রের ক্ষুদ্র ভাঙ্গা বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। কোচম্যানের নিকট পত্রে সংক্ষিপ্ত লেখা—আপনারা উভয়ে সত্বর আসিবেন।

মনোরমা যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত সাংসারিক জিনিষ পত্র গোছাইয়া রাখিলেন। ম্লানমুখে—উদ্বিগ্নচিত্তে উভয়ে গাড়ীতে উঠিলেন।

(৭)

ভবনাথ বাবুর বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইতেই, মন্মথনাথ হাসিতে হাসিতে আসিয়া, সসম্মানে উভয়কে বিভার নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। বিভা দূর হইতে দেখিয়াই মিত্তির মশাই দেখবেন আসুন, দিদি দেখবি আয়, বলিয়া বিস্মিত নিরুপমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাঁহারা ঘরের মধ্যে গিয়া দেখেন, কন্যা নিরুপমা কজ্জলপত্র মস্তকে বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত। ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করিবার পুর্ব্বেই, অদূরে ব্যাণ্ডের বাদ্য শুনিয়া বর আসিতেছে বলিয়া সকলে ছুটিল। বিভা বলিল—দিদি, পরে শুনিস্ এখন মেয়ের বে'র কাজ কর। মন্মথ বলিল—দাদা! বর আসিতেছে আসুন। রথের সময়ের কলিকাতার স্বদেশ সেবকগণ আজ সকলে বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছেন। স্থানীয় যুবকগণ আজ বিবাহ বাটীতে কোমরে তোয়ালে বাঁধিয়া মহোৎসাহে ছুটাছুটি করিতেছে।

শুভক্ষণে শচীনের হস্তে নিরুপমার হস্ত মিলল; একবাক্যে সকলেই বলিলেন, বর-কনের এমন রূপের মিল কোথাও দেখি নাই।

আজ বরক'নে আশীর্ব্বাদের জন্য গুরুজন সকলে উপস্থিত। হাসিতে হাসিতে নিম্নস্বরে বিভা বলিল, দিদি! আমার যে একটু সম্পর্কের গোলযোগ হইল, দিদি বলিলেন—জামাইকে জামাই আদর করিস্ আর যেটা সম্পর্কে বাধিতেছে (মুরারী মোহনকে দেখাইয়া) তার জন্য ইনি রহিলেন।

শচীন্দ্র বউ লইয়া বাড়ী পৌঁছিল, শচীন্দ্রের মা আজ আনন্দে আত্মহারা। টুক্‌টুকে বউ দেখিয়া রামনিধি বাবুও আজ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী গাম্ভীর্য্য ভুলিয়াছেন। সময় পাইয়া ইন্দু আজ পিতাকে শুনাইয়া হাস্যমুখে বলিল—টাকা নিয়ে আমরা কি ধুয়ে খাব? রামনিধি বাবুও সস্নেহে ইন্দুকে বলিলেন, ঠিক বলেছ—মা!

শ্রীহরিপদ সরকার।

—o—

বিমাতা।

(১)

সুশীল বহু আয়াসে আজি মনটা দৃঢ় করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল আজি সে নিশ্চয় বিমাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। কিন্তু কুমুদ যথা সময়ে স্কুল হইতে বাটীতে আসিয়া তাহার সমস্ত সংকল্প পণ্ড করিয়া দিল। কুমুদ বলিল "ও দাদা! বেড়াতে যাই চল না।"

সুশীল কহিল "না ভাই, আজ আর বেড়াতে যাব না" "কেন দাদা বেড়াতে যাবে না, কেন ?"

"না ভাই মনটা বড় খারাপ হয়েছে, আজ তুই একলা যা না ; একলা কি যেতে নেই ?"

"না দাদা তুমি সঙ্গে না গেলে আমার বেড়ান না বেড়ান দুই সমান।"

কুমুদের এই কথায় সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কুমুদ, তুই এত বড় হলি, তোর এখনও ছেলেমানষি গেল না ? আমি না বেড়ালে তুই বেড়াবিনা ; আমি না খেলে তুই খাবি না ; কেন বল দেখি ; আমার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা ?"

কুমুদ এই কথায় গাল ভরা হাসি লইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার দাদাকে জড়াইয়া ধরিল ; কহিল, না দাদা, তা হবে না, মাষ্টার মশায় বলেছেন, ছায়ার মত দাদার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়িও। দাদা তোমার যাহা না করেন তুমিও তাহা কখনও করনা, তাই দাদা তুমি যেখানে না যাবে, যে কাজ না করবে আমিও তাহা কখনও করব না। বেড়ান কি—তুমি যদি রাত্তিরে ভাত না খাও আমিও খাব না।"

বালক কুমুদ এক নিশ্বাসে এই কথা কয়টা বলিয়া জ্যেষ্ঠের প্রতি অকৃত্রিম অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহার দাদার নিকট অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিল।

সুশীল অবাক হইয়া এতক্ষণ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল। কিন্তু কুমুদের আবেগপূর্ণ শেষকথাগুলি বড় জোরে তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল। সে আঘাতে সুশীল মনে মনে ভাবিল মনটাকে যত বাঁধিতে চাই, প্রাণটা যত ছিনাইয়া লইতে চাই; সবইত কুমুদ পণ্ড করিয়া দেয়। আজি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলাম প্রতিজ্ঞা পালন করিব, কিন্তু এই ত কুমুদের একটা মুখের কথায় সমস্ত পণ্ড করিয়া দিতেছে ! আমি কোন প্রাণে কেমন করিয়া আমার স্নেহ হইতে কুমুদকে বঞ্চিত করি ? কুমুদের এই মুখ কেমন করিয়া ভুলি ?, যে আমার পাশে পাশে ছায়ার মত থাকিতে চায়, কেমন করিয়া তাহাকে ফেলিয়া পলাই ?

সুশীল প্রাণের যন্ত্রণায় কোন কথা কহিল না। কেবল এক দৃষ্টে কুমুদের প্রতি চাহিয়া রহিল। আর তাহার চক্ষু ফাটিয়া দুই ফোটা তপ্ত অশ্রু কুমুদের স্কন্ধে পড়িল। কুমুদ আশ্চর্য্য হইল। ব্যস্ত ভাবে মুখ তুলিতেই সে বুঝিল এ তার দাদার অশ্রুজল। দাদার চক্ষুজল দেখিয়া কুমুদ এতক্ষণ যে সকল

উত্তেজনা ভাব দেখাইতে ছিল, তাহা যেন এক মুহূর্ত্তে কোন ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা তুমি কাঁদছ কেন দাদা? কি হয়েছে?"

সুশীল এতক্ষণ প্রাণের কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল; আর পারিল না, সে কুমুদকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, "ভাই! মা আমায় আজ বাড়ী থেকে চলে যেতে বলেছেন। তোমার সঙ্গে কথা কইতেও নিষেধ করেছেন। তাই মনটা বড় খারাপ হয়েছে। যেতে যদিও পারি, কিন্তু তোমাকে যে না দেখলে থাকতে পারি না। ছোটবেলা থেকে কোলে করেছি, আর আজ মায়ের কথায় তোমাকে কোল থেকে নাবাতে বুক ফেটে যাচ্ছে।"

কুমুদ সুশীলের কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল—"ও দাদা গো—তুমি কোথাও যেও না; আমি থাকতে পারব না।"

কুমুদের মাতা পুত্রকে খাওইবার জন্য একটি গ্লাসে দুধ ও একখানি রেকাবে মিষ্টান্ন লইয়া খাওয়াইতে আসিতেছিলেন; এমন সময় কুমুদের ক্রন্দন এবং ওই প্রকার আকুল উক্তি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দ্রুতপদে তিনি অন্দরের দ্বার দিয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। হৃদয় মধ্যে ক্রোধাগ্নির সহস্র শিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জ্ঞান শূন্যার মত ছুটিয়া গিয়া—একেবারে সুশীলকে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, "ছেলেটাকে মেরে ফেলেছিস্।" সুশীল স্তম্ভিত হইয়া গেল; মুখে বাক্য স্ফুরণ হইল না। সে যেমন কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল তেমনি রহিল।

কুমুদ আবার কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা কি করলে?" মাতা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ করেছি, মারব না! তোকে যে মেরে ফেল্‌ছিল!" কুমুদ কহিল "না মা; দাদা প্রাণ থাকতে আমায় মারবে না। দেখ দিকি দাদার মাথা কেটে রক্ত পড়ছে।" কুমুদ কাঁদিতে লাগিল। মাতা সবেগে তাহাকে সুশীলের ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেলন। হতভাগ্য মাতৃহীন সুশীল রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হইয়া অল্পক্ষণ মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িল।

গৃহিণী কুমুদকে গৃহে আনিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কুমুদ কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিল না। সে ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—"ও মা গো, একবার ছেড়ে দাও; দাদাকে দেখে আসি; দাদার মাথা দিয়া বড় রক্ত পড়ছে"—সে আর বলিতে পারিল না।

মাতা ক্রোধে উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন; অবজ্ঞাভাবে কহিলেন, "কে—তোর দাদা! খবরদার, বলে দিচ্ছি, যদি ওর ছাওয়া মাড়িয়েছ ত মেরে তোর হাড় ভেঙ্গে দেব। দাদা! দাদা! জানো—ওই দাদাই তোমার সুখের জীবনে কণ্টক হবে।

কুমুদ এ সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝিল না। বার বার তাহার দাদার কথা মনে পড়িতে লাগিল। কুমুদ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্নেহময়ী জননীর সুশীতল ক্রোড়ে বসিয়া তাহার দেহটা যেন কম্পিত হইতে লাগিল। রেকাবের খাবার ও গেলাসের দুধ যেমন তেমনি পড়িয়া রহিল।

(২)

হাইকোর্টের নামজাদা উকিল সারদাপ্রসাদের প্রথম জীবনে বড় ঝড় উঠিয়াছিল। আর সেই ঝড়েই তাঁহার চিরানন্দময়ী স্ত্রী অমিয়া ও তাঁহার দুইটী পুত্রকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ সুশীল পড়িয়া রহিল। সারদাপ্রসাদের প্রথম জীবনের নূতন আশা, নূতন উৎসাহ সকলি সেই সঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সংসারে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল, তাই তিনি দিন কয়েকের জন্য সমস্ত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া ক্ষুণ্নমনে মাতৃহীন সুশীলকে বক্ষে করিয়া দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কলিকাতার ঘর বাড়ী, বহু দিনের পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্য বৃন্দাদিনের জিম্মায় রাখিয়া গেলেন।

এমন ভাবে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে সারদাপ্রসাদ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মনটাও ইহাতে কতকটা শোক মুক্ত হইল। দেশে আসিলে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই আবার পূর্ব্বের মত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সারদাপ্রসাদও আবার কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। এই ভাবে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সারাদিন কার্য্যের ব্যস্ততায় কোন রকমে কাটিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিকালে একাকী যখন সুশীলকে লইয়া শুইয়া থাকিতেন, তখন বালক মাঝে মাঝে মা-মা করিয়া ক্রন্দন করিলে, তাঁহার স্মৃতির সাজিটি ভরিয়া উঠিত। সারা রাত্রি তিনি সুশীলকে বক্ষে করিয়া কাটাইয়া দিতেন। কত কথা, কত ব্যথা মনে উঠিত। মনে হইত সুশীলের সর্ব্ব অঙ্গে যেন তাঁহার অমিয়ার আকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি দৃঢ় আলিঙ্গনে শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন, সারদাপ্রসাদ প্রাণের পুত্তলি সুশীলকে এইরূপে আরও বৎসরাধিক প্রতিপালন করিলেন। সারদা-

প্রসাদের ধনসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল.; উপার্জ্জন যাহা হইত তাহাও বড় অল্প নহে। সুতরাং হিতৈষিগণের পক্ষে ইহা চিন্তার বিষয় হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন, সারদাপ্রসাদের বিবাহ দিয়া সকল সম্পত্তির সদ্‌ব্যবহারের উপায় করিয়া দিবেন। সুখের বাসা বাঁধিয়া দিবেন। তখন সকলেই এ কার্য্যের জন্ত বারংবার সারদাপ্রসাদকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সারদা বাবু তখনও অমিয়ার স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি কহিলেন, "বংশ রক্ষার জন্যে বিবাহ—আমার সুশীল বাঁচিয়া থাকলেই বংশ রক্ষা হবে—আর কাজ নেই।" হিতৈষিগণ কহিলেন, তাও কি হয়! শুধু তোমার বংশ রক্ষের জন্যে বলিনি। শুধু তোমার কষ্ট হলে আমরা সহ্য কর্ত্তুম। কিন্তু যে তোমার বংশ রক্ষা করবে তাকে কে দেখে? সুশীলের বড় অভাব। তুমি পুরুষ—সর্ব্বদাই বাইরের কাজে ব্যস্ত থাক; ওকে মায়ের মতন কে দেখবে? তুমি যদি বিবাহ কর, এখনি ওর মায়ের অভাব পূর্ণ হবে, শেষোক্ত কথা গুলায় সারদাপ্রসাদের প্রাণটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। বটেই ত! সুশীলের আমার বড় অভাব—ভাগ্যে বৃন্দাদিন আছে; নহিলে এতদিন কি হত। আমি সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকি; ওর বড় কষ্ট। সারদাপ্রসাদ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

হিতৈষিগণ এ কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। সেদিন রবিবার, সারদাপ্রসাদ শয়নকক্ষে সুশীলকে বক্ষে লইয়া শুইয়া আছেন, আর সুশীল পিতার বক্ষে নাচিয়া কুঁদিয়া খেলা করিতেছে। এমন সময় পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীল তোমার মা চাই? বালক সেই কথায় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাহার আধভাষে কহিল—"বাবা, মা—কই?" সারদাপ্রসাদ পুত্রের কথা শুনিয়া চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিলেন। বালকের কথায় তাঁহার বিসর্জ্জিতা স্বর্ণপ্রতিমা অমিয়ার শোভাময়ী মূর্ত্তিখানি ফুল্ল শতদলের ন্যায় হৃদয় সরোবরে ভাসিয়া উঠিল। তিনি নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিলেন। বালক ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিল না—আশা-বিষাদ-হীন মুক্ত জীবনে সে খেলা করিতে লাগিল। সারদাপ্রসাদ "আয় ঘুমাই" বলিয়া তাহাকে কোলে লইয়া শুইয়া পড়িলেন। অচিরে পিতা পুত্রে নিদ্রিত হইলেন।

(৩)

বহু অনুরোধ উপরোধ প্রত্যহ সারদাপ্রসাদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কেহ অর্থ লোভ, কেহ সৌন্দর্য্যের লোভ, যে যাহা দিতে পারে সেই

তাঁহার মন অভিভূত করিতে লাগিল। সারদাপ্রসাদও নিজে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসি নহেন। সুতরাং বিষয়টাও তাঁহার মনের মধ্যে বার বার তোলপাড় করিতে লাগিল, শেষ মীমাংসায় পুনরায় দ্বার পরিগ্রহ করাই স্থির হইল। যথাসময়ে বিবাহ কার্য্যের আয়োজন আরম্ভ হইল। শুক্লপক্ষের শুভ্র রজনী আবার নূতন আশার সঞ্চার করিয়া দিল।

বৃন্দাদিন সুদূর অযোধ্যাবাসী, সে বহুদিন হইল দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়াছে, কলিকাতার রাজপথ তাহার উপার্জ্জনের স্থান। সে মুটিয়া। একবার একটা মারামারি দাঙ্গা করিতে গিয়া বৃন্দাদিন বিচারপতির দ্বারস্থ হইয়াছিল। সেই সময় সারদাপ্রসাদ বিনা পয়সায় তাহাকে খালাস করিয়া দিয়াছিলেন; তদবধি সে মুটিয়া গিরি ছাড়িয়া, বাবুর উপাসনা করিতেছিল, বহুদিন বাঙ্গালায় থাকায় সে কিছু কিছু বাঙ্গলা বলিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছিল।

এতদিন বৃন্দাদিন গৃহের কর্ত্তৃত্বের ভার লইয়াছিল, সংসারে নব গৃহিণীর আগমনে এক দিকে অল্পে অল্পে সে কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিল, অপর দিকে খোকার যোল আনা ভার প্রাপ্ত হইল।

সারদাপ্রসাদ সবে মাত্র মাস কয়েক বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে সংসারের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন নব গৃহিণীর কোমল সংস্পর্শ ছাড়িয়া, আর সুশীলকে বক্ষে রাখিতে ইচ্ছা হয় না; সুশীলও আর শয্যাপ্রান্তে স্থান পায় না। অধিকন্তু সময় অসময় বালক নিকটে আসিলে বড় বিরক্ত বোধ হয়। আর রাত্রিকালে সারদাপ্রসাদ মাতৃহীন পুত্রকে বক্ষে লইয়া সুখে নিদ্রা যান না। বরং নিশাকালে যুবতী স্ত্রীর সহিত প্রেমলাপ সময় বালক রোদন করিলে ভ্রু কুঞ্চিত করেন। তাহাকে শান্ত করিতে কত সময় নষ্ট হয়। বালক পুরাণ অভ্যাস এখনও ত্যাগ করে নাই, পিতার পার্শ্বে অপরিচিতাকে দেখিয়া বড় রোদন করে, বধূও যেন ইহাতে কত সংকুচিতভাবে তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করেন। অবুঝ বালক অধিকতর ক্রন্দন করে, সারদাপ্রসাদ ইহাতে অত্যন্ত অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিলেন। এক এক দিন বৃন্দাদিনকে ডাকিয়া বলিতেন, "নে যাও, বড় জ্বালাতন কচ্ছে।" এ কথায় বৃন্দাদিনের প্রাণটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিত। সে মনে মনে বলিত—'কলিকাল'; সে কিছু না বলিয়া বালককে লইয়া আপনার খাটিয়ায় পড়িয়া থাকিত। বালক ক্রমে ক্রমে পিতার সঙ্গ একেবারেই ত্যাগ করিল, বৃন্দাদিন সর্ব্বদাই তাহাকে রাখিত, পিতাও এইরূপে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মাতৃহীন পুত্রের স্নেহ পাশ ছিন্ন করিলেন। বালক

এইরূপে বৃন্দাদিনের অঙ্কে স্থান পাইল, সারদার শারদ-হৃদয় ক্রমে ভ্রম অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

এখন গৃহিণীর আদেশে সুশীল আর অন্দরেও আসিতে পারে না—"ভারি বদ ছেলে, বৃন্দাদিন ওকে বাড়ীর ভিতর কেন আন; দেখলে রাগ হয়, সদাই কান্না লেগে আছে, নিয়ে যাও বাহিরে।" বৃন্দাদিন এ অনুমতি এতদিন পালন করিয়াছিল, কিন্তু এখন আর পারে না। কুমুদ এখন বড় হইয়াছে, খোকা সর্ব্বদাই তাহার সহিত খেলা করিতে চায়, বৃন্দাদিনের নিষেধ শুনিতে চায় না। গৃহিণীর ক্রোধ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি নানাভাবে স্বামীর কর্ণগোচর করিলেন, "এমন চাকর দূর করিয়া দাও সে আমার কথা শুনে না।" স্বামী বুঝিয়াও বুঝিলেন না, ভাবিলেন—হবে। হয়ত চাকর বেটা ছেলে মানুষ দেখে গ্রাহ্য করে না।

সারদাপ্রসাদ সত্য মিথ্যার অনুসন্ধান করিলেন না, স্ত্রীর আদেশে ভৃত্য জ্ঞানে তিরস্কার করিলেন, বৃন্দাদিন আশ্চর্য্য হইল—একি! আজ কত বৎসর বাবুর বাড়ী কাটিয়া গেল, কোন দিন স্নেহের কথা ছাড়া ত এমন ধমক খাই নাই—বৃন্দাদিনের সে সমস্ত বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না।

গৃহিণী দেখিলেন বড় বেগতিক, কোন প্রকারে সুশীলকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে, আজি একটি হইয়াছে, তাই সহিতেছি;—কালি আর পাঁচটি হইলে আমার বড় অসুবিধা হইবে। আমার পাঁচ জন যাহা পাইবে আর ও একেলা তাই পাইবে। গৃহিণী বালকের অজ্ঞাতে নানা প্রকার মিথ্যা দোষ কর্ত্তার কর্ণগোচর করিলেন, কর্ত্তাও মনে ভাবিলেন তাইত ছেলেটা বড় পাজি। দুই চারিদিন শাসন করিয়া দিলেন। বালক তখন ব্যাপার ক্রমে বুঝিতে শিখিল; তাহার প্রাণে বড় কষ্ট হইল। বৃন্দাদিনকে কহিল, "বৃন্দা, আমি ত মায়ের সব কথা শুনি, তবে কেন বাবা বকেন, মা রাগ করেন।" বৃন্দাদিন বুঝাইয়া দিত, তোমার বিমাতা—তাই উনি তোমায় ভালবাসেন না, সুশীল বৃন্দাদিনের কথা কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারিত না। ভাবিত তাও কি হয়। মা কুমুদকে ভালবাসেন, আমায় বাসেন না—অসম্ভব। আমার দোষ নিশ্চয় আছে, ঠিক ত—কুমুদ কাছে এলে, খেলা করলে মা বিরক্ত হন, আমি আবার তাই করি;—না, আর যাব না। কুমুদকে নিয়ে আর খেলা করব না। বালক প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু আবার হারিয়া গেল।

গৃহিণী এখন কুমুদের মাতা। মান বাড়িয়া গিয়াছে, আর কেহ এখন

তাঁহার কথায় মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারে না, কেবল বৃন্দাদিন মাঝে মাঝে বড় দোষ দেয়,—বলে তুমি বড় খোকাকে অত বকতে পাবে না। বৃন্দাদিনের দোষ নাই। সে যে বাবুর নিকট একদিন শুনিয়াছিল "খোকা আমার প্রাণ, দেখ বৃন্দাদিন খোকার যেন কোন কষ্ট না হয়।" বৃন্দাদিন আজিও সে কথা ভুলে নাই। তাহার সর্ব্বদাই মনে হয়, ওইটি বাবুর প্রাণ। তাই নির্ভয়ে গৃহিণীকে বলে, বাবুর প্রাণে ব্যথা দিও না। গৃহিণী স্থির করিলেন আজই বিন্দার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, দেখি ও কার জোরে আমায় এমন করে। আজই সুশীল বাড়ী ছাড়া হবে।

(৪)

পনর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সুশীল এখন এফ, এ, পড়ে, কুমুদ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দুই ভাই এক প্রাণ—মাতার আশা সকলি কুমুদ বিফল করিতেছে।

গৃহিণী সুশীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সুশীল স্নেহের আশায় স্কুলের বই ফেলিয়া ছুটিয়া গেল। কোন দিনই এমন সময়ে বিমাতা তাহাকে ডাকেন নাই; তাই আজি তাহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। মাথা হেঁট করিয়া সুশীল উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়া রহিল; বিমাতা বলিলেন, সরে আয়! সুশীল উৎফুল্ল মনে সরিয়া গেল—ধীর গম্ভীর স্বরে বিমাতা কহিলেন, কতদিন হল বলেছি ভবানীপুরে কে তোর মাসি আছে, সেখানে চলে যা। খরচ যা লাগে মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব—তুই কি আমার কথা গ্রাহ্য কর্‌বি না?—সুশীল কহিল "না মা—এমন কথা কি কখন বলেছি।" বিমাতা স্বর রুক্ষ করিয়া কহিলেন, করিস্‌নি ত এখনও বাড়ী আছিস্—সুশীল কহিল, মা আমি আপনার কথা আজই শুনব, এখনি যাব, সুশীল কাঁদিয়া ফেলিল, ভাবিল বড় অন্যায় করিয়াছি—উনি আমার মা, স্বর্গহতে গরিয়সী, আমার প্রতিজ্ঞা, কখন মায়ের অবাধ্য হব না—আবার তখনি মনে পড়িল, আমার দোষ নাই, সে দিন কুমুদকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম, ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল তাই যাই নাই—সুশীল কহিল মা! বাবাকে না বলে গেলে তিনি হয়ত রাগ করবেন, বিমাতা তাচ্ছল্যের স্বরে কহিলেন, যা যা চলে যা, আর অত ভক্তিতে কাজ নেই—তিনি বলেছেন চলে যেতে। সুশীল, আচ্ছা বলিয়া একেবারে বৃন্দাদিনের ঘরে উপস্থিত হইল।

বৃন্দাদিন মুড়ি বাতাসা জলপান লইয়া খোকা বাবুর অপেক্ষায় বসিয়াছিল,

সজল নয়নে সুশীলকে ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কি খোকা বাবু, কি হইসে", "কিছু নয়" বলিয়া সুশীল খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

বৃন্দাদিন খোকার গুণ জানিত, খোকাকে বিনা কারণে গৃহিণী দশটা গালি দিলেও খোকা তাহার জবাব করিত না। অধিকন্তু বলে, মা আমায় ক্ষমা কর। খোকা বিমাতাকে কত ভক্তি করে, বৃন্দাদিন তাহা জানিত, তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও সে কখন বিমাতার দোষ স্বীকার করিবে না। তাহার মাতৃভক্তি উদাহরণ স্থল।

সুশীল বৃন্দাদিন দত্ত জলপান খাইয়া বৈঠকখানায় তাহার পুস্তকাদি গুছাইয়া আনিতে গেল—একখানি অর্দ্ধ মলিন চাদরে আপনার পুস্তকগুলি বাঁধিয়া লইল, আর কুমুদের পুস্তক যেমন ছিল তেমনি পাশে পড়িয়া রহিল, সুশীল স্নেহের কনিষ্ঠের পুস্তকের প্রতি চাহিয়া মনে মনে ভাবিল কুমুদ প্রত্যহ আমার পাশে বসিয়া পড়ে, আজ কাহার পাশে বসিবে—কে তাহার বই খাতা গুছাইবে, আমিত রোজই গুছাই। সুশীল আবার কাঁদিয়া ফেলিল, ভাবিল তাইত কুমুদের মনে কষ্ট হবে, আমার ত কথাই নেই—কি করি আবার মায়ের কথা না শোনাও মহাপাপ। আগে গুরুজনের আজ্ঞাপালন, শেষ নিজের সুখদুঃখ। মনটা দৃঢ় করিয়া পুঁটুলিটা কাঁধে তুলিল, ভাবিল আর নয় এই বেলা পালাই। আবার কুমুদ এসে পড়বে, ওই বুঝি গাড়ির শব্দ হল, সুশীলের প্রাণের ভিতর দুর দুর করিয়া উঠিল। এমন সময় কুমুদ আসিয়া বলিল, দাদা বেড়াতে যাই চলনা।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গৃহিণী কুমুদকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সুশীল পড়িয়া রহিল, এমন সময় বৃন্দাদিন কমুদের রোদন শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে কি করিবে? কে খোকার এমন দশা করিয়া গিয়াছে, তাহাকে সাজা দিবে, না এখন খোকার জীবন রক্ষা করিবে, ভাবিল না আগেই খোকাকে বাঁচান দরকার। ছুটিয়া বাগান হইতে কতকগুলি দূর্ব্বা তুলিয়া আনিল, পরে সে গুলা দাঁতে চর্ব্বণ করিয়া আপনার অর্দ্ধ খণ্ড মলিন বস্ত্র ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল, তখন ক্রোধের সময় নয়। বৃন্দা দেখিল খোকার জ্ঞান নাই, গৃহিণীর নিকট আসিয়া কহিল, "মাজী খোকার শীরমে বড়া চোট লাগা। ডাক্তার বাবু কো বোলানে যায়।" গৃহিণী গর্জ্জিয়া কহিলেন, "আমি জানিনা, যা ইচ্ছে কর্‌গে, ছেলেটার বায়না নিয়ে

এখানে ন্যাকামো কর্ত্তে এলেন, যা কচ্ছিস্ তাই হচ্ছে আমার আবার মত কি ?” বৃন্দাদিন এ সকল কিছুই শুনিল না, সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া তাহার অসুর বলে খোকাকে কোলে করিয়া মেডিকেল কলেজ অভিমুখে ছুটিল, অচেতন সুশীল জানিতেও পারিল না।

চিকিৎসকগণ বুঝিলেন আঘাত বড় গুরুতর তখনি যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সুশীলের জ্ঞান সঞ্চার হইলে সে বুঝিল কেন এখানে আসিয়াছে, কিন্তু কে যে তাহাকে এখানে আনিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না, মনটা ভারি ব্যস্ত হইল।

বৃন্দাদিন সুশীলকে পৌঁছাইয়া দিয়া কর্ত্তাদের আদেশে বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু বাটী আসিল না; সেইখানে পথের ধারে বসিয়া রহিল। এই ভাবে বৃন্দাদিনের রাত্রিটা বসিয়া বসিয়া কাটিয়া গেল। পর দিন যখন চিকিৎসক রোগী দেখিতে আসিলেন, বেলা তখন নয়টা। বৃন্দাদিন গেটের ধারে বসিয়া আছে, সারা রাত্রির অনিদ্রায় চক্ষু দুইটা লালবর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আবার অনাহার; রৌদ্রের উত্তাপ বৃন্দাদিনের চেহারাটাকে বড়ই ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। চিকিৎসক গেটের ধারে বৃন্দাদিনকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। বৃন্দাদিনও তাঁহার প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া রহিল, দেখিল কত লোক আগ্রহ সহকারে তাঁহার সংবৰ্দ্ধনা করিতেছে, তাহার মনে হইল, তবে এ বাবু বুঝি এখানকার কর্ত্তা বিশেষ, যে ছুটিয়া গিয়া বাবুর দুটি পা জড়াইয়া ধরিল এবং রোদন করিতে লাগিল, কহিল “বাবু আপ্ দুনিয়া কো মালিক; হাম ভিতর মে খোড়া যায়েঙ্গে”, চিকিৎসক কহিলেন “সে এখন নয়, এগারটার সময় যেও।” বৃন্দাদিন শুনিল না, সে অধীর ভাবে কহিতে লাগিল হুজুর “কালছে খোকাকো নেহি দেখা।” চিকিৎসক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন না, তবে লোকটার ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি কহিলেন “আও, ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন রোগী কয়দিন এসেছে, বৃন্দাদিন কহিল কাল সাঁজ কো, ডাক্তার বাবু বলিলেন তুমি জান সে কোথায় আছে “নেহি—বাবু—নেহি জানে, বৃন্দাদিন এই বলিয়া আবার একটা সেলাম করিল, ডাক্তার বাবু কহিলেন এস আমি দেখছি। যো হুজুর বলিতে বলিতে বৃন্দাদিন পিছু চলিল, ডাক্তার বাবু প্রথমেই নূতন কেস দেখিতে গেলেন, বৃন্দাদিনও আসিয়া উপস্থিত হইল, সুশীল বৃন্দাকে দেখিয়া আগ্রহ ভরে কহিল কি বৃন্দা তুমি এসেছ। বৃন্দা কিছু বলিতে পারিল না, কেবল খোকার

প্রতি চাহিয়া রহিল, পরে ডাক্তার চলিয়া গেলে, কিরূপে সে তাহাকে কলেজে আনিয়াছে, কালি রাত্রি কোথা ছিল, সমস্ত একে একে বলিতে লাগিল। আবার যথাসময় বৃন্দাদিন বাহিরে আসিল। এক পয়সার ছাতু খাইয়া সারাদিন পথে পড়িয়া রহিল।

পরদিন যথাকালে আবার বৃন্দাদিন খোকাকে দেখিতে গেল, তাহার মনটা বড় চিন্তা পূর্ণ, এখনি আবার চলিয়া যাইতে হইবে, কতক্ষণ আর খোকার মুখ দেখিতে পাইবে না। এমন সময় দেখিতে পাইল, তাহার দেশের একটা লোক সেখানে কাজ করিতেছে, সে তাহার নিকট ছুটিয়া গেল। তখন জাতীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই এখানে তোমার কে আছে, সে কহিল 'কেউ নয়'। বৃন্দা কহিল তবে যে তোমাকে ঢুক্‌তে দিয়েছে?" সে ব্যক্তি কহিল "আমি চাকৃরি করি।" বৃন্দা ভারি খুসি হইল, ভাবিল তবে এখানে চাকৃরি মিলে,আমিও চাকরি করিব। সে আসিয়া ডাক্তার বাবুর পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর দয়ার সীমা নাই, তিনি বৃন্দাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। যে ঘরে সুশীল থাকে, বৃন্দা সেই দালানের ভার প্রাপ্ত হইল। বৃন্দার বড় আনন্দ, এ কাজটা তাহার সুখের। সে এখন সর্ব্বদাই খোকাকে দেখিতে পাইবে।

ডাক্তার বাবু বৃন্দার কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও তোমার কে?" সুশীল কহিল, "ও আমার সব, ও আমার চাকর ও আমার বাপ মা। ওরই জন্তে আমি প্রাণ পেয়েছি" সুশীল কাঁদিয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু বুঝিতে পারিলেন না, সুশীল কেন কাঁদিল। সুশীল ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমায় কত দিন এখানে থাকিতে হবে? তিনি কহিলেন "এখনও একমাস।" "তবে ত বড় ক্ষতি হবে আমার এক্‌জামিন নিকটে" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড়্‌ছ" সুশীল সঙ্কুচিতভাবে কহিল আজ্ঞে এইবার এফ, এ, দিব—তা এই সময়টা নষ্ট হ'ল। ডাক্তার বিস্মিত ভাবে কহি-লেন, সে কি হে, তোমার বয়স কত? সুশীল কহিল "পনর বৎসর।" ডাক্তার বাবু ভারি খুসী হইলেন। একখানা চেয়ারে বসিয়া সুশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য সুশীল কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনার হতভাগ্যের পরিচয় দিল। ডাক্তার বাবু সুশীলের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া চখের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু গুণের পরিচয়ে যৎপরনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তদবধি সকলকেই বলিয়া দিলেন সুশীলের যেন কোন প্রকার অযত্ন না হয়। তিনি প্রত্যহ বাটী হইতে সুশীলের জন্য স্বতন্ত্র খাবার লইয়া আসিতেন। তিনি

সুশীলকে পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ডাক্তার বাবু সুশীল ও বৃন্দাদিনের দুঃখের জীবনে শান্তির প্রবাহ বহাইয়া আনিলেন।

(৫)

বেলা পাঁচটা বাজিল, সারদাপ্রসাদ বাটী আসিলেন দেখিলেন কেহই নাই—কেবল দাসদাসীগণ আজ্ঞা অনুমতি পালন করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। বাবু কহিলেন, এরা সব কোথায় গেল? গৃহিণীর প্রিয় ভৃত্য আগ্রহ সহকারে কহিল—তাঁহারা সকলে বেড়াইতে গিয়াছেন, কর্ত্তা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শ্রান্তি দুর করিয়া, পুনরায় মক্কেল লইয়া বৈঠকখানা মুখরিত করিলেন।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। গৃহিণী সান্ধ্যসমিরণ সেবন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কথায় কথায় রাত্রি বাড়িল, আহার সমাধা হইল—রাত্রি গেল পুনরায় দিন আসিল—হতভাগ্য সুশীলের কেহ নামও করিল না।

কুমুদকে গৃহিণী ধমক দিয়া ভয় দেখাইয়া, যখন কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাহার শরণাপন্ন হইলেন। আদর করিয়া চুম খাইয়া বলিয়া দিলেন—লক্ষ্মী বাবা, কাহারও নিকট একথা বল না, কুমুদ মাতার কাতর অনুরোধে প্রাণের ব্যথা প্রাণে রাখিল, কিন্তু প্রত্যহ স্কুল হইতে বাটী আসিয়া সে বৈঠকখানার সেই জায়গায় উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া কাঁদিত; আহা! তাহার দাদার এইখানেই পদাঘাতে পড়িয়া মাথা ফাটিয়াছিল—কথাটা মনে হইলেই শোকে সপ্ত-সাগর উথলিয়া উঠিত।

এইরূপে মনের ব্যথা মনে রাখিয়া কুমুদ অল্পদিন মধ্যে ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হইল—জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। কত প্রকার চিকিৎসা হইল, কত ডাক্তার কবিরাজ আসিল। সকলে জবাব দিল। গৃহিণী সর্ব্বদাই ঠাকুর দেবতার হোম যাগযজ্ঞ, প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈব চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিছুমাত্র ফললাভ হইল না! শেষে স্থির হইল এ ব্যাধির চিকিৎসা নাই। সদা প্রফুল্ল লাবণ্যময় দেহ দিনে দিনে জীর্ণশীর্ণ শুষ্ক হইতে লাগিল—কর্ত্তার মনে সুখ নাই, গৃহিণীর প্রাণে শান্তি নাই, তথাপি 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন করিয়া কুমুদের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এমন সময় এক দিন কর্ত্তা একখানি কার্ড পাইলেন, তাহা এইরূপ।—

মহাশয় সুশীল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছাত্র, মাসাবধি কলেজে আসে নাই কেন? শীঘ্র সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন।

অধ্যক্ষ।

সারদাপ্রসাদ কার্ডখানি একবার, দুইবার বহুবার পাঠ করিলেন। হ্যাঁ সুশীল আজ মাসাবধি হইল মাসির বাড়ী গ্যাছে, কিরূপ আছে তাও জানি না। এই ত শুনছি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র সুশীল—আবার শুনি চোর সুশীল, বদমায়েস সুশীল—কি জানি কেন এমন হল। ছেলেটাকে নিজে না দেখে বোধ হয় এমন হল। এতদিন শুধু বদমায়েসি করেছে, এই বার চূড়ান্ত হল, কলেজও ছাড়লে, এতটা হত না—সেই হতভাগ্য বৃন্দাদিন আদর দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছে—অজস্র চখের জলে কর্ত্তার হৃদয় ভাসিয়া গেল, ভাবিলেন আর নয়। যে পথে গেছে সেই পথে যাক, তার খোঁজ নিয়ে কি হবে। যদি আসে—খাবে থাকবে—আর না আসে চাই না। কিন্তু বড় আক্ষেপ, আমি তার এই দশা করেছি। কর্ত্তা উঠিয়া বাটীর ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী পীড়িত কুমুদকে লইয়া যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, ধীর মন্থর গমনে তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা সুশীল কবে ফিরবে? কুমুদ পিতার এই বাক্যে চকিতের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কহিল "মা দাদা—" গৃহিণী বিরক্তির সহিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন এইখানেই সকল কথা কহিবে, যাও—কর্ত্তার সাধ্য ছিল না যে প্রতিবাদ করেন—তাই নীরবে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বাইরে আসতে বল্লে—গৃহিণী অধিক রুষ্টভাবে কহিলেন, দেখলে না, রোগা ছেলের ঘুম নষ্ট হয়। সুশীল কবে আসবে না আসবে কি করে জানব। যে গুণধর ছেলে—আমার হার ছড়াটা পর্য্যন্ত চুরি করেছে, তা এতদিন গোপনে রেখেছি, সে কথা তোমায় বলিনি, পাছে তার প্রতি বিরক্ত হও। মা খেগো ছেলে, কোথায় যাবে কি হবে শুধু এই ভয়ে—তা কপালে তাই হলো হতভাগা বাড়ী ছাড়লে। কর্ত্তা কহিলেন শুধু বাড়ী নয়, মাসাবধি কাল কলেজ ছেড়েছে—এতটা হতনা যদি গোড়ায় সতর্ক হয়ে তার প্রতি দৃষ্টি রেখে চলতুম, দোষ তার নয়, দোষ আমার। কর্ত্তা বিষন্নবদনে একখানা কার্ড লিখিয়া দিলেন, আমি জানি না—আপনারা কলেজ হইতে নাম কাটিয়া দিন।

(৬)

মাসাবধি কাল কাটিয়া গেল। সুশীল সুস্থ হইয়া উঠিল, প্রভাতে ডাক্তার বাবু আসিয়া বিদায় দিবেন, গৃহহীন সুশীল আবার কোথায় যাইবে, সারারাত্রি অনিদ্রায় এই চিন্তা করিতে লাগিল, আর বৃন্দাদিন—তাহার কথাও একটা চিন্তার বিষয় হইল। বৃন্দাদিন মাসাবধি কাল চাকর হইয়া কলেজে আছে, সেইবা কি করিবে, কে খাইতে দিবে, কে পড়ার খরচ দিবে—সুশীল আপন মনে

নীরবে ভগবানের উদ্দেশ্যে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল—তিনি এই আশ্রয়হীন হতভাগ্যের প্রতি দয়া করিবেন, নতুবা সুশীলের আর কোন উপায় নাই।

বৃন্দা ডাকিল—"খোকা"। সুশীল কহিল কি বল্‌ছ। "তুমি—কাঁদছ।" "হ্যাঁ বৃন্দা।" কাছে,—"তুমি ঘুম যাও।" "না বৃন্দা আজ ঘুম হবে না।" কেন—ক্যা হুয়া,—"বড় ভাবনা, কাল আমি এখান থেকে জবাব পাব, আমায় চলে যেতে হবে, কোথায় যাব, কি করব—তাই ভাবছি।" বৃন্দা যতক্ষণ বেঁচে আছে—তুমি ভাবনা মৎ করো।—"সে কি বৃন্দা, এইবার একজামিন, ছ মাসের মাইনে আর ফির টাকা একসঙ্গে কলেজে জমা দিতে হবে—তুমি অত টাকা কোথায় পাবে?" বৃন্দা স্নেহ ভরে কহিল, "দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিই দিবে, তুমি হামি কুছ নাহি কর্‌নে ছেকেগা" সুশীল আর উত্তর করিতে পারিল না। তাহার প্রাণের মাঝে বৃন্দার মহৎবাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল—সত্য বটে দুনিয়ার মালিক না দিলে এতদিন সুশীলের দেহটা শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য দ্রব্য হইত। সুশীল একমনে বৃন্দার কথা ভাবিতে লাগিল। বৃন্দা আজি মাসাবধি কাল অনাহারে অনিদ্রায় খোকার কাছে বসিয়া তাহার আজ্ঞাপালন করিতেছে। খোকার যাহাতে কষ্ট না হয়, বৃন্দা তাহাই করিতেছে। সুশীল বৃন্দাদিনের অনুমতিতে শয্যায় শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা তাহার ছায়াও স্পর্শ করিল না। রাত্রি প্রভাত হইল, সুশীল শয্যায় বসিয়া বসিয়া ডাক্তার বাবুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু সকল রোগী দেখিতে দেখিতে যথাসময় সুশীলের নিকট উপস্থিত হইলেন।

আজি সুশীলের বিদায় মুহূর্ত্ত প্রায় নিকটবর্ত্তী, সে সারারাত্রি ভাবিয়াছিল ডাক্তার বাবু আসিলে আজি কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, কিন্তু অন্যদিনের মত আজি সে একটী কথাও কহিতে পারিল না। নীরবে মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল—ডাক্তার বাবু ডাকিলেন সুশীল। সুশীল মুখ তুলিয়া চাহিল, মুখ একেবারে বিবর্ণ, চক্ষু দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার বাবু মনে মনে বিস্মিত হইলেন। আবার কি সুশীলের কোন অসুখ করিল নাকি, ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে তোমার, আজ চেহারা এত খারাপ দেখছি—মুখে কথা নেই—ব্যাপার কি? সুশীল এ কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না। আজি আবার তাহার চক্ষু বহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। ডাক্তার বাবু বড় ব্যাকুল হইলেন, তিনি কত কষ্টে সুশীলের দগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়াছিলেন; আজি সুশীল আবার কেন এমন বিচলিত হইল, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন শীঘ্র বল কি হইয়াছে। হতভাগ্য সুশীল ডাক্তার বাবুর এমন দুর্ল্লভ

স্নেহে আবার সকল কথা ভুলিয়া গেল, কহিল আমার বড় ভাবনা হয়েছে, আবার কোথায় যাব। ডাক্তার বাবু কহিলেন, সুশীল আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে, আর তুমি কোথায় যাবে তাহা এখনও বুঝতে পারনি, চল তুমি যেখানে যাবে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। বৃন্দাদিন বসিয়াছিল, ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া ভাবিল ইনি কে—মানুষ না দেবতা; লেখা পড়াত সকলেই জানে, আমার বাবুও লেখা পড়া জানে। তখনি বৃন্দাদিন আবার ভাবিল, হায়! আমার বাবুও এইরূপ ছিলেন, দোসরা মাজীর বুদ্ধিতে পড়ে আমার বাবুর এই হাল।

ডাক্তার বাবু কহিলেন, বৃন্দাদিন গাড়িতে একটা ব্যাগ আছে নিয়ে এস। বৃন্দার চিন্তার স্রোত ভাঙ্গিয়া গেল, হুজুর বলিয়া বৃন্দা ছুটিল, অল্পক্ষণ পরে ব্যাগটি আনিয়া ডাক্তার বাবুর হাতে দিল। ডাক্তার বাবু ব্যাগ খুলিয়া এক সুট কাপড় লইয়া সুশীলকে কহিলেন এইটে তুমি পর। সুশীল আশ্চর্য্য হইল না, কারণ সে ডাক্তার বাবুর স্নেহ জানে, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা পরিয়া ফেলিল। পরে বৃন্দাদিনকেও এক খণ্ড নুতন বস্ত্র দিলেন। আনন্দে বৃন্দার তাহা পরিবার অবকাশ হইল না, সে তাড়াতাড়ি মাথায় জড়াইয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু হাসিয়া কহিলেন ও কি ক'রলে—ও কাপড় তুমি পর। বৃন্দাদিন তখন নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিল, খোকার সুখে বৃন্দার সুখ, খোকার দুঃখে বৃন্দার দুঃখ, তাই আনন্দ উৎফুল্ল নয়নে ডাক্তার বাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল, হুজুর এই পরেছে, তথাপি ডাক্তার বাবু বলিলেন তুমি পর, বৃন্দাদিন নুতন বস্ত্র পরিধান করিয়া সেলাম করিল।

কলেজের সকলেই ডাক্তার বাবুর দয়া জানিত, তাই কেহ এ ব্যাপারে বিস্মিত হইল না। বৃন্দাদিন অন্যান্য যে সকল পীড়িতগণের সেবা করিত, একে একে সকলের নিকট সেলাম করিয়া বিদায় চাহিল।

(৭)

যথা সময় ডাক্তার বাবু আপনার কার্য্য শেষ করিয়া সুশীলকে ডাকিলেন, এস হে আমার আজ বিশেষ কোন কাজ নেই, এখনি ফিরে যাচ্ছি। বৃন্দার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমিও সঙ্গে চল, বলিয়া ডাক্তার বাবু সুশীলের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। আর বৃন্দাদিনও ডাক্তার বাবুর আদেশে সঙ্গে আসিল। আনন্দে মাহিয়ানাও চাহিল না, সে যে স্বার্থে আসিয়াছিল আজি ভগবান তাহার সে স্বার্থ পূর্ণ করিলেন, ইহাই সে যথেষ্ট মনে করিল। ডাক্তার বাবু ও সুশীল গাড়ির মধ্যে বসিলেন—বৃন্দাদিন ছাদে উঠিল।

মুহূর্ত্তে গাড়িখানি পবন বেগে ছুটিতে লাগিল, ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশীল বুঝতে পেরেছ তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। সুশীল লজ্জিত ভাবে মাথাটি নিচু করিয়া কহিল—হ্যাঁ, আপনার অপার দয়া; বুঝতে পেরেছি আমাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনার দেখা পেয়েছিলুম, তাই আমার সকল বিপদ কেটে গেল। সুশীল কৃতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল। আর সেই সঙ্গেই সুশীল মেডিকেল কলেজে কেন আসিয়াছিল তাহাও মনে পড়িল; তখন সর্ব্বাপেক্ষা কুমুদের অবস্থা চিন্তার বিষয় হইল, হায় কুমুদ কাঁদিয়াছিল,বলিয়াছিল "ওগো দাদা গো, তোমায় ছেড়ে থাকৃতে পারব না।" সুশীলের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছোট ভাইটীর জন্য হৃদয়খানা ভাঙ্গিয়া শতধা হইতে লাগিল, সে নীরবে বসিয়া তাহার জীবনের আদ্যপান্ত ঘটনাগুলি চিন্তা করিতে লাগিল।

যথাসময় ডাক্তার বাবু সুশীলকে লইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, বাটীস্থ পরিবারবর্গ সকলেই আজি মাসাবধি কাল তাহার সকল বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং সকলেই তাহার জন্য উৎকুণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেদিন ডাক্তার বাবুর গৃহে বিশেষ আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, সে আনন্দের উদ্দেশ্য মাত্র সুশীলকে উৎসাহিত করা। ডাক্তার বাবুর স্নেহে সুশীল সে পরিবারস্থ সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, তাহাতে আবার তাহার নিজের গুণও যথেষ্ট ছিল। বৃন্দাদিন সেখানেই রহিল। সুশীল আবার আজি কতদিন পরে তাহার কলেজে চলিল।

এইরূপ মাতৃহীন, পিতৃ স্নেহ বঞ্চিত, বিমাতা কর্ত্তৃক গৃহ তাড়িত, দারিদ্র্য সুশীল ডাক্তার বাবুর স্নেহে অপার সুখ অনুভব করিতে লাগিল, তাহার পিতা মাতার অভাব বিদুরিত হইয়া গেল। পরম সুখে বৃন্দাদিনও সুশীল ডাক্তার বাবুর দয়ায় প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই ভাবে ছয়টি বৎসর জলের মত বহিয়া গেল, সে বৎসর সুশীল ডাক্তারী পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। যে দিন পাশের সংবাদ বাহির হইল, সেই দিন ডাক্তার বাবু মহা আনন্দে সুশীলকে ডাকিয়া কহিলেন "শুনেছ কি তুমি পাশ হয়েছ"; সুশীল লজ্জিত ভাবে কহিল, হ্যাঁ। ডাক্তার বাবু কহিলেন বেশ হয়েছে, কে ফাষ্ট হ'ল। সুশীল বিশেষ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইল।

(৮)

ছয় বৎসর সময় বড় অল্প নহে, কিন্তু কালের গতিকে তাহা জলের মত বহিয়া গেল, কেহ বুঝিতেও পারিল না। কুমুদের আর এখন সে রূপলাবণ্যময়

দেহ নাই, সে আর প্রত্যহ স্কুলে যায় না ; শরীর এখন জীর্ণ শীর্ণ, সর্ব্বদাই বিষাদ কালিমায় মুখ আচ্ছাদিত, সে কুমুদ আর নাই, আর সে লাল আভা ঢল ঢলে মুখাকৃতি নাই, আর সে ফুল্ল কুমুদের মত শ্রীও নাই। আছে মাত্র দেহে প্রাণ,—কুমুদ অন্য সকল জিনিষ তাহার দাদার সঙ্গে বিদায় দিয়াছে।

কর্ত্তার মনেও সুখ নাই, গৃহিণীর প্রাণেও শান্তি নাই, একলা কুমুদকে সকল সম্পত্তির অধিকারী করিতে গিয়া যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে এখন তাহাকে মৃত বলিলেও হয়, কারণ কুমুদ সুশীলের অভাবে মৃতকল্প হইয়া আছে। গৃহিণীর সর্ব্বদাই কুমুদের সেই হৃদয়ভেদি চীৎকার মনে জাগিতেছে, "ওগো দাদা গো, তোমায় ছেড়ে থাকৃতে পারবো না" আর কর্ত্তা—তাঁহার হৃদয় দিবানিশি এখন সুশীলের চিন্তায় দগ্ধ হইতেছে। কেন এমন ঘটিল, কাহার দোষে সুশীল এমন উৎসন্নে গেল, তখনই মনে পড়ে আমারই দোষ, আমি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সুশীলকে এমন অবহেলা করিয়াছি। আজি ছয় বৎসর সে গৃহ হীন, কোথায় আছে কে জানে? কর্ত্তার এরূপ চিন্তার প্রধান কারণ কুমুদের অসুস্থতা ; কারণ যে কুমুদকে দেখিয়াই তিনি সুশীলকে ভুলিয়া ছিলেন, সে কুমুদও জীবন্মৃত হইয়া আছে। সুশীল সম্মুখে থাকিলে কুমুদের এ দুরবস্থায় বোধ হয় চিত্ত কতকটা সংযত থাকিত। একটা ডাল ভাঙ্গিয়া গেলে আর একটা ধরিবার আশা সতই মানব প্রকৃতির স্বভাব, সুতরাং কর্ত্তার প্রাণে অশান্তি উপস্থিত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

কর্ত্তার অশান্তির সঙ্গেই গৃহিণীর অশান্তি জড়ান আছে ; সুতরাং কর্ত্তা মাঝে মাঝে গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে চান। মধ্যে মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে বেড়াইতে যান। এক দিন বেড়াইতে যাইবার সময় সারদা বাবু স্ত্রীকে কহিলেন "কুমুদকে ডাকিয়া আন, সে যদি যায়।"

মাতা আসিয়া ডাকিলেন কুমুদ, চল আমরা বেড়াতে যাই। কুমুদ শিহরিয়া উঠিল, তাহার মনে পড়িল,—হায় বেড়ান! না আর অমন সুখের বেড়ান চাই না, বেড়ানর জন্তেই দাদা আমার লাথি খেয়ে বাড়ী ছাড়া। "না মা আমি আর যাব না—ও কথা আমায় বলো না" মাতা কুমুদের ব্যথা বুঝিতে পারিলেন, নীরবে চলিয়া আসিয়া স্বামী স্ত্রীতে বেড়াইতে চলিয়া গেলেন।

কুমুদ একাকী অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর বহু চিন্তার পর ভাবিল যাই দেখিগে, পথে পথে ঘুরে ঘুরে, যদি একবার দেখতে পাই। তখন সে রাজপথে বাহির হইল। চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে এক বড় রাস্তার ধারে ফুট-

পথের গাছ তলায় বসিয়া তাহার দাদার দুঃখের কাহিনী চিন্তা করিতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে উৎসুক নয়নে পথের দিকে চাহিতে লাগিল। ওই বুঝি তাহার দাদার মত কে আসিতেছে; কিন্তু কেহই ত সে রকম নয়। এইরূপে বেলাটা প্রায় কাটিয়া গেল, কুমুদ ভাবিল, হায় রোজ কত লোক দেখতে পাই এই পথে চলে যায়; কিন্তু কই দাদা ত ভুলেও একদিন এ পথে আসে না; তবে কি দাদা আমার কথা ভুলে গেছে। আবার ভাবিল কি জানি দাদার কি হ'ল, কোথায় কেমন আছে, কুমুদ আর ভাবিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে সেই স্থানে গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় সম্মুখেই একটা মস্ত গোলমাল শুনা গেল। কুমুদ চাহিয়া দেখিল, সেটা ছাত্রদের গোলযোগ, মহা উল্লাসে গোলমাল করিতে করিতে তাহারা ক্রমশঃই কুমুদের সম্মুখীন হইতেছে, তখন সে আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল, এমন সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ী একেবারে কুমুদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল—ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য হতভাগ্য যেই তাড়াতাড়ি একটু অগ্রসর হইল—এ কি—এ যে আমার দাদা! তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি গাছের গুড়িতে ঠেস দিল। চক্ষু দুইটা মুদিয়া গেল, এ কি আমার দাদা—কুমুদ আর চাহিতে পারিল না। বেচারি ভয়ে ওগো—দা-দা-গো বলিতে বলিতে একেবারে গাড়ীর পার্শ্বে ঘুরিয়া পড়িল। সমস্ত জনতা একেবারে এই ব্যাপারে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। আর সুশীল—দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে তাহার প্রাণসম ভ্রাতার কণ্ঠধ্বনিতে চমকিয়া চাহিল, চাহিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহারও সবল দেহটা যেন দুলিয়া উঠিল। এঁ্যা এই আমার সেই কুমুদ! হায়—হতভাগা কি করেছিস্, আমার জন্যে প্রাণ দিয়েছিস্ বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, সকলেই বুঝিল কুমুদের জ্ঞান নাই, তখন ধরাধরি করিয়া, তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া হইল। সুশীল কুমুদকে বক্ষে করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে সে কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। সকলেরই কুমুদের জন্য ভয় হইল।

ডাক্তার বাবুর বাড়ী আসিয়া সুশীল কুমুদকে ডাক্তার বাবুর পায়ের কাছে শোয়াইয়া দিয়া বলিল—যদি দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছেন, তবে আজ আমার কুমুদকে বাঁচিয়ে দিন। ডাক্তার বাবু বুঝিলেন, সুশীল ভায়ের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়াছে; খুব ধমক দিয়া কহিলেন, অত নারভাস হলে

চলবে না। শীঘ্র যাহাতে এর জ্ঞান হয় তাই কর, তখন সুশীল বুঝিল, এখন কান্নার সময় নয়। তাড়াতাড়ি তাহার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আনিতে ছুটীয়া গেল, অল্পক্ষণ পরে কুমুদের জ্ঞান ফিরিল। তখন সুশীল একবার কুমুদ বলিয়া ডাকিল, আর কুমুদ—কুমুদ দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে দাদা দাদা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। বৃন্দাদিন আবার সারারাত্রি সেই ভাবে বসিয়া কাটাইল, আর তাহার তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক, মনিবের বুদ্ধির বহরটা চিন্তা করিতে লাগিল।

(৯)

রাত্রিটা এই ভাবে কাটিয়া গেল। প্রভাতে সুশীল বৃন্দাদিনকে কহিল বৃন্দা, তুমি আজ একবার বাড়ী যাও—মা ও বাবাকে কুমুদের সংবাদ দিয়ে এস, তাঁরা বড় ভাবছেন। বৃন্দাদিন খোকার মনে কষ্ট দিতে পারে না; তাই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখনি আবার মনিব বাড়ী গমন করিল।

কর্ত্তা গৃহিণী বৈকালে বায়ু সেবন করিয়া গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন, কুমুদ তখনও বাটী ফিরে নাই। তাঁহাদের মনে একটু ভয় হইল, এত রাত্রি সে ত কখনও বাটীর বাহিরে থাকে না, তবে আজি এমন কেন হল। গৃহিণীর মনেও ভয় হইল; তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানেও কুমুদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল, গৃহিণী ভাবিলেন হয় ত বেচারা ভ্রাতৃবিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি প্রাণের যন্ত্রণায় স্বামীর নিকট সুশীলের নিরুদ্দেশ, বৃন্দাদিনের নিরুদ্দেশ একে একে সকল কথা প্রকাশ করিয়া শেষে কহিলেন কুমুদ সুশীলের অভাব সহিতে না পারিয়াই এমন রুগ্ন হইয়াছে। কর্ত্তা একেবারে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিলেন, তাঁহার মুখে বাক্য স্ফুরণ হইল না। নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আজি কোথায় সুশীল—সুশীল রামের ন্যায় জননীর আদেশ পালন করিয়াছে, কুমুদ লক্ষ্মণের ন্যায় তাহার অনুগমন করিয়াছে, কর্ত্তার তাহাই মনে পড়িল। আর "গৃহিণী ওগো পরের মন্দ কর্ত্তে গিয়ে আপনার মন্দ আগে হল।" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রি কোন পথে চলিয়া গেল কেহ জানিতেও পারিলেন না। ভোরে বৃন্দাদিন 'হুজুর' বলিয়া সেলাম করিয়া কহিল—ছোটা বাবু ভালা হায়। কোথায় ছোটা বাবু বলিয়া গৃহিণী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তখন বৃন্দাদিন একে একে সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিল। কর্ত্তা দেখিলেন বৃন্দা ত্যাগের আধার, কখনও খোকার সুখ হাসিয়া বর্ণনা

করিতেছে, কখনও খোকার দুঃখ কাঁদিয়া বলিতেছে, খোকাই যেন তাহার জীবনের জীবন।

বাবুর আদেশে মুহূর্ত্তে গাড়ি প্রস্তুত হইল। বৃন্দাদিন ও কর্ত্তা-গৃহিণী গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী পবন বেগে ডাক্তার বাবুর বাটীর দিকে ধাবিত হইল। বৃন্দাদিন পথ দেখাইয়া তাঁহাদের উপরে লইয়া গেল।

যে ঘরে তাঁহারা প্রবেশ করিলেন, সেখানি প্রশস্ত একখানি হল ঘর। তাহা অতি পরিপাটীরূপে সাজান। গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে বুঝিতে পারিলেন না। কুমুদ পালঙ্কে শায়িত, সুশীলের কোলে মাথা রাখিয়া কুমুদ ঘুমাইতেছে, আর সেই মহাপুরুষ ডাক্তার বাবু কুমুদের মুখের কাছে বসিয়া আছেন। এক রাত্রেই কুমুদের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কুমুদের মুখে যেন কত দিনের শান্তির, কত দিনের সুখের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুমুদ যেন মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত দীপ্তিময় হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। গৃহিণীও সুশীলের সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ লাল টক্‌টকে মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, হাঁ ঠিক—ধর্ম্মে সুশীল বর্দ্ধিত—আর অধর্ম্মে কুমুদ ক্ষয় প্রাপ্ত—আমিই সকল অপরাধের মূল।

এমন সময় ডাক্তার বাবু ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া সারদাবাবুকে অভ্যর্থনা করিলেন। অন্দর হইতে পরিবারবর্গ কুমুদের মাতাকে দেখিতে আসিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তাহাতে একটু গোল হইল, কুমুদের ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। কুমুদ পাশ ফিরিয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দাদা! সুশীল উঠিয়া বিমাতার পদধুলি গ্রহণ করিতে গেল, বিমাতা তখন আপনার পাপ বুঝিয়া যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছিলেন; তাই দৃঢ় আলিঙ্গনে সুশীলকে বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাপ আমায় ক্ষমা করবে বল, ওই দেখ কুমুদ আজ কেমন ঘুমুচ্ছে। আমি আজ ছয় বৎসরের মধ্যে একটি দিনের জন্যেও ওর এমন ঘুম দেখিনি। বাবা, তোমার অভাবে কুমুদ প্রাণ দিতে বসেছে। বাড়ী যাবে বল।

সুশীল বিমাতার পায়ে ধরিয়া কহিল, সকল কথা ভুলে যান, বাড়ী যাব বই কি? কুমুদ সুস্থ হলেই বাড়ী যাব, আপনাদের শ্রীচরণ ছাড়া আমার আর প্রার্থনার কি আছে? আপনি ক্ষমা চাইলে আমার অমঙ্গল হবে—আপনি ভিতরে যান।

সারদা বাবু ডাক্তার বাবুর অতুল মহত্ত্বের কাহিনী শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও যোড় হস্তে কহিলেন—ডাক্তার বাবু! কি বলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব তাহা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমি নরাধম, কেমন করে আপনার ঋণ শোধ করিব। ডাক্তার বাবু কহিলেন সে কি মশায়, আপনি অমন করে আমায় লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আমার ছেলের সঙ্গে সুশীলের সঙ্গে কোনই প্রভেদ নেই। সুশীর আপনার—আমার কি নয়? সারদা বাবু এ কথায় ব্যস্ততা সহ বলিলেন, না মহাশয় সুশীল আপনার। আমি নরাধম, এমন সাধু পুত্রের পিতার উপযুক্ত নই—তাই ভগবান যোগ্য পিতার কাছে, যোগ্য পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

শ্রীমতী শীলাবতী দেবী।

ব্যবধান।

(১)

বিনয়কুমার সুশোভিতাকে বিবাহ করিয়া প্রথম যখন ছায়ামণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইল, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বৌ দেখিয়া তখন সমালোচনা আরম্ভ করিল, ‘এমন সোনার ছেলের এ কি বৌ?’ সুশোভিতা কালো বলিয়া শাশুড়ী ‘বরণ’ করিলেন না, আত্মীয় স্বজনেরা কথা বলিল না। ‘বৌ কালো’—একটা বিদ্রূপ-হাস্যে সমস্ত গ্রাম ভরিয়া উঠিল। কিন্তু শুধু অলক্ষ্যে একজনের হৃদয় এ সকল কঠোর উপহাস হইতে দূরে সরিয়া ছিল,—সে নন্দা। নন্দা সুশোভিতার মত কালো—বিধবা। সে বুঝিত, কালো হউক, সুন্দরী হউক, সুখ দুঃখ অনুভবের শক্তি সকলেরই সমান। বর্ণভেদে ঈশ্বর হৃদয় পৃথক করিয়া দেন নাই। নন্দার রাগ হইল পাড়ার লোকের উপর; কেন তারা অকারণ একটী বালিকার জীবন দুঃখময় করিয়া তুলে; সুশোভিতাই কি শুধু কালো!

যখন একে একে সকলে চলিয়া গেল, সুশোভিতাকে একাকিনী পাইয়া নন্দা তাহার কাছে আসিয়া বসিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, সে কাঁদিতেছে। নন্দা বুঝিল, লোকের কথাগুলি, তাহার হৃদয় করাতের মত ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। হায় লোকমত, এক মুহূর্ত্তের জন্য মূল্যবান হইয়া, নিমিষে কতজনার

হৃদয় ভাঙ্গিয়া দাও! নন্দা সুশোভিতার গলা জড়াইয়া ধরিল, আদরে বলিল, "বোন, মেয়েমানুষকে একটু সহ্য করিতে হয়,—মানুষ বড় অবুঝ।"

(২)

বো'য়ের কথা দু'দিন পরে থামিয়া গেল। বিবাহের যৌতুক লইয়া আবার নূতন আন্দোলন আরম্ভ হইল। বিনয়কুমারের মাতা সুশোভিতার পিতাকে প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী বলিয়া খানিকটা খুব গালাগালি করিলেন, শেষে দানাদি সহ পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। লিখিলেন, সমস্ত পাওনা মিটাইয়া না দিলে ছেলের আবার বিবাহ দিব।' বিনয়কুমার সাহস করিয়া মাতাকে কিছু বলিতে পারিত না, পাছে মাতার হৃদয়ে অজ্ঞাত শোক আনিয়া ফেলে। বেদনার সময় আকাশের পানে চাহিয়া শুধু বলিত, আজ যদি পিতা বাঁচিয়া থাকিতেন!'

সুশোভিতার পিতা কত কাতরোক্তি করিল,—সে দরিদ্র, কিছুই নাই, কিন্তু বিনয়কুমারের মাতার বিশ্বাস, সুশোভিতার পিতা ইচ্ছা করিয়া কিছুই দেন নাই, কাজেই কোন আপত্তি টিকিল না।

এক মাস দুই মাস করিয়া এক বৎসর গেল, বিনয়কুমারের বাড়ী হইতে কেহই কোন পত্র তাহার শ্বশুরালয়ে লিখিল না। সুশোভিতার বাড়ীতে সকলে প্রতিদিন কত আশা করিত, আজ পত্র আসিবে,—সে আজ আর আসিল না। কিছুদিন পরে চাকুরী স্থল হইতে বিনয়কুমার মাতাকে পত্র লিখিল, বো'কে এখানে পাঠাইয়া দিবেন, নানা অসুবিধায় পড়িয়াছি। মাতা উত্তরে লিখিলেন বাবা, এবার সুন্দরী মেয়ে,—পাঁচ হাজার টাকা পণ, হাতে হাতে আদায়।' যখন জনশ্রুতির মুখে এই কথাগুলি সুশোভিতা শুনিতে পাইল, সেদিন সে উপযাচক হইয়া বিনয়কুমারকে পত্র লিখিত বসিল। অর্থহীন কত কি লিখিয়া ফেলিল, কত কাটিল, কত অশ্রুজল মুছিল; শেষে খামে ভরিয়া ডাকে দিল। উত্তর আসিল না।

সুশোভিতার ভয় হইল, কি জানি কথা যদি সত্যই হয়। সাথে সাথে রুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদিল, এত উপেক্ষা, এত অনাদর নারী কি সহিতে পারে! প্রাণের সমস্ত ভালবাসা স্বামীর চরণে নিবেদন করিল, সেই স্বামী কালো বলিয়া একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

(৩)

কথা সত্য হইল। যেদিন সুশোভিতা শ্বশুর বাড়ী আসিল, সেদিন নূতন

বৌ ঘর আলো করিয়া বসিল? তাহার দিকে চাহিবে কে? আপনাকে লুকায়াই সে ছাদের উপর গিয়া বসিল। সারারাত্রি বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল; কালো'র জন্য এ অনন্ত বিশ্বে তাহার কি একটুও স্থান নাই? তাহার জন্য কাহারও হৃদয় কাঁদে না? হে অনাথের নাথ, কালো সৃজন করিয়াছ তবে লোকে ঘৃণা করে কেন? শত ধিক্কার আসিয়া তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস।

বিবাহের কোলাহল চলিয়া গেলে সে একদিন শাশুড়ীকে বলিল, "মা, আপনার ঘরে দাসীর মত আমাকে একটু আশ্রয় দিন।" শাশুড়ী কোন কথা বলিলেন না।

সংসার বেশ শান্তিতে চলিতে লাগিল। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ ত্যাগ করিয়া সুশোভিতা সংসারের কোলাহলে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল। প্রত্যেককে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের কোন মূল্য নাই; কোন দিন সে স্বামীর আদর, প্রণয়ের একটী কথাও শুনে নাই, তথাপি স্বামীর সুখেই আপনার সুখ অনুভব করিত। সে মনে মনে ভাবিত, নারীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

(৪)

বিনয়কুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী সবিতা যখন শুভ্র তুষার নিভ রংটী লইয়া প্রাতঃকালে দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিত, সুশোভিতা মুগ্ধনেত্রে দেবীজ্ঞানে মনে মনে তাহাকে প্রণাম করিত। স্বামীর এত ভালবাসা যে পাইতে পারে, সে কি দেবী নয়? কিন্তু সবিতা মনে ভাবিত, তাহার রূপের জন্য সুশোভিতা ওরূপ ভাবে চাহিয়া থাকে। রূপের গর্ব্ব কার না আছে!

তুচ্ছ একটা বিষয় লইয়া সবিতার সহিত একদিন সুশোভিতার রাগারাগি হইয়া গেল। শাশুড়ীও ছোট বো'য়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিলেন। সুশোভিতা মেজের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—হে পৃথিবী, তুমি আমাকে স্থান দাও।

বিনয়কুমার বাড়ী আসিলে এ ঝগড়ার কথা তাহার কাণে গেল, কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না। রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া দেখিল, বিছানা হয় নাই, সবিতা খাটের এক পাশে শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার হয়েছে কি? আজ বিছানা হ'বে না কি?"

সবিতা উত্তর দিল না।

"তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ, যাও খেয়ে এস।"

সবিতা গর্জ্জিয়া উঠিল, "ওগো আমি খেতে চাহি না, তুমি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও; দিন রাত ঝগড়া করতে পারিব না।"

বিনয়কুমার আজ আর অন্যদিনের মত তাহার অভিমান ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল না, নীরবে এক পাশে শুইয়া থাকিল; দুশ্চিন্তায় ঘুম হইল না, সারারাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া মধ্য রাত্রে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন জ্যোৎস্নায় সারা বিশ্ব হাসিয়া উঠিয়াছিল, সব নীরব, নিস্তব্ধ। বর্ষাকালের জ্যোৎস্না, খুব সুন্দর না হইলেও বড় মধুর, বড় প্রাণস্পর্শী। সেই জ্যোৎস্না-লোকে দাঁড়াইয়া সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এত আদর, এত যত্ন, এত ভালবাসাতেও একদিনও সবিতার হৃদয় সে পায় নাই। রূপের মোহ-তাড়নায় আপন কর্ত্তব্য কত ভুল করিয়াছে, পদে পদে কত লাঞ্ছনা সে সহ্য করিয়াছে।

তার পর মনে পড়িল সুশোভিতার কথা। আজ সে দু বৎসরের উপর হইল আসিয়াছে; কৈ বিনয়কুমার তাহাকে ত ভাল মুখে একটী কথাও একদিনও বলে নাই! সে জন্য কি সে কোন দিন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে? কই—না। সে ত প্রতিদিন আপন কার্য্য শেষ করিয়া ক্লান্ত পাখিটীর মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলে নাই!

বিনয়কুমার ধীরে ধীরে নীচের একটী ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—সে ঘরে সুশোভিতা ঘুমাইত। দরজায় আঘাত করিল, শিথিল ছিল, খুলিয়া গেল। সেই প্রথম সাক্ষাতে সুশোভিতার মুখখানি তাহার কাছে বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইল,—এত সুন্দর বুঝি সে নয়। আজ যেন কে তাহাকে 'মূঢ়' বলিয়া কশাঘাত করিতে লাগিল।

(৫)

প্রাতঃকালে সবিতা একবার ঘরের বাহির হইয়াছিল মাত্র। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। বেলা হইল, সবিতা নীচে নামিল না, সুশোভিতা কত ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না। চুপি চুপি স্বামীর উপর সবিতার অধিকারটুকু সুশোভিতা যে কাড়িয়া লইতেছে, সবিতা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এ বেদনা রমণী কেন সহ্য করিবে? সুশোভিতার ভয় হইল, কি জানি সে যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে।

বেলা বেশী হইল, সবিতা তবুও বাহিরে আসিল না দেখিয়া সুশোভিতা

বিনয়কুমারের নিকট সংবাদ পাঠাইল। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বিনয়কুমার আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনয়কুমারের হাত দুটী ধরিয়া সুশোভিতা বলিয়া উঠিল, "ওগো সবিতাকে বাঁচাও।" দরজা ভাঙ্গা হইল, সুশোভিতা ছুটিয়া সবিতাকে জড়াইয়া ধরিল, ডাকিল, "বোন্।" সবিতা চক্ষু মেলিয়া চাহিল, অশ্রুজলে উপাধান ভিজিয়া গেল, বলিল "দিদি, আমাকে ক্ষমা কর, আমি আফিং খাইয়াছি। আমাকে বাঁচাও দিদি, আমার বাঁচিতে ইচ্ছা করে।"

বিনয়কুমার প্রথমে বড় আঘাত পাইল, বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল।

আবার চুপ করিয়া বিনয়কুমার সুশোভিতার গৃহে প্রবেশ করিল। ফুল-শয্যার পর,—কত দিন পরে আবার শয্যার এক পার্শ্ব গ্রহণ করিল, কিন্তু মাঝ খানে ব্যবধান রহিল—সবিতা।

শ্রীজগন্নাথ মজুমদার।

রঙ্গ-বারিধি।

চতুর্থ তরঙ্গ।

বুদ্ধির গৌরব।

(১)

পদ্মলোচন সেন ভারি বুদ্ধিমান লোক। অন্ততঃ এমনটাই তাহার বিশ্বাস। কেহ যদি পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করে—"পদ্ম, তোমার বয়স কত", তাহার উত্তরে পদ্মলোচন দন্ত বিকাশ করিয়া সঙ্কেতে বুঝাইয়া দেয়—"ও বিষয়টা অনুমান করিয়া লও"। লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মলোচন বলিয়া থাকে 'সে কথা কাহারও জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই' তবে তাহার লেখা পড়া নিতান্ত অল্প নহে। পদ্মলোচন ভুল ইংরাজিতে দুই দশটা কথা কহিতে পারে। দুই পাঁচটা সংস্কৃত কবিতা, পাঁচ সাতটা বাঙ্গালা কবিতা অশুদ্ধ ভাবে আবৃত্তিও করিতে পারে। তাহার হস্তলিপি শিশুগণের হস্তলিপিকেও হার মানাইয়া দিয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি ব্যাপারে তাহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। অতএব সাহস করিয়া কে বলিতে পারে যে শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন সেন মহাশয়ের

বিদ্যাবত্তা অসাধারণ নহে! যিনি তাহা বলিতে পারেন, তিনি যে বীরকুলাগ্রগণ্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ পদ্মলোচনের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে হইলে থানা পুলিশ করিতে হয়। যাঁহার সে সাহস আছে, তাঁহাকে বীরাগ্রগণ্য বলিতে হইবে বৈ কি?

তাহার পরে পদ্মলোচনের জাতি হিসাবের ব্যাপারটা অধিকতর ভয়ঙ্কর। পদ্মলোচনকে যদি প্রশ্ন করা হয়—"তুমি কি জাতি" তাহার উত্তরে সে অম্লান মুখে বলিয়া থাকে, কোনও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে তাহার ফর্দ্দমত তাহাদের বাটীতে উইলসন হোটেল হইতে আদ্যশ্রাদ্ধের জিনিস পত্র আসিয়াছিল এবং শ্রাদ্ধ বাসরে ফ্রায়ার জনের এক শিষ্য আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পদ্ম-লোচনের জাতি রহস্যটা যখন নেহাত একঘেয়ে হইয়া পড়ে, তখন বুদ্ধির অবতার পদ্মলোচন গৌরবে স্ফীত হইয়া বলিয়া থাকে, যে তাহাদের পূর্ব্ব পঞ্চম পুরুষ ব্রাহ্মণের সহিত খাস কণোজ হইতে বঙ্গদেশ পবিত্র করিতে আসিয়া-ছিলেন। তবে সে কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া পদ্মলোচন একটু গোলযোগে পড়িয়া যায়। তাহা হইলে কি হয়—নিত্য নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারে পদ্মলোচনের বিশেষ পারদর্শিতা আছে। সেই মুন্সীয়ানার গুণেই পদ্মলোচন বন্ধু মহলে নিস্তার পায়। এ কথাগুলা সমাজে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলে যে "কণোজাগত" সেন বংশধর নিশ্চয়ই সমাজচ্যুত হইত, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা—পদ্মলোচন ভগিনী-ভাগ্যে ভাগ্যবান। তাহার ভগিনীপতি একজন ধনকুবের। ধনবলই জগতে প্রধান বল। বিশেষ সভ্যতার যুগে। সেই বলে সামাজিক লাঠির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যদি পদ্মলোচন উপেক্ষা করিতে পারে তাহাতে কাহারও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

এবম্বিধ বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান শ্রীমান পদ্মলোচন সেন তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া বিশেষ একটু গোলে পড়িয়া গেল। পদ্মলোচনের সাবিত্রী তুল্য সহ-ধর্ম্মিণী শ্যামাসুন্দরীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহার পতিদেবতা সৃষ্টি-রাজ্যে একটী অলৌকিক জীব। সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতিপ্রাণা পত্নী দারুণ মর্ম্মপীড়িতা হইয়া পড়িল এবং স্বামীর বুদ্ধির প্রাখার্য্য একটু ন্যূন করিতে যাইয়া শ্যামাসুন্দরী পদ্মলোচনের সংসারে একটু বিদ্রোহের সূচনা করিয়া ফেলিল। সেইটাই পদ্মলোচনের পক্ষে একটু গোলের কথা। তৃতীয় পক্ষ বিদ্রোহের সূচনা করিলে পুরুষমাত্রেই বোধ হয় সশঙ্কিত হইয়া পড়েন। পুরুষ-প্রবর পদ্মলোচন

কেমন করিয়া সে নিয়মের, সে আশঙ্কার অতীত হইবে? স্বাভাবিক নিয়মের ত ব্যত্যয় হয় না—হইতেও পারে না।

শ্যামাসুন্দরী রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকার্য্যাদি একাই করে এবং অবসর মত পতি-চরণ-প্রান্তে বসিয়া মধুরালাপে স্বামীকে বুঝাইতে চেষ্টা পায় যে অযথা মিথ্যা কথা বলায় এবং মুরুব্বিয়ানার অভিনয় করায় বিশেষ দোষ জন্মে এবং তাহাতে মানুষকে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। শিষ্ট শান্ত বালকের মত পদ্মলোচন পত্নীর নিকট নানাবিধ প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাটীর বাহির হইলেই সে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া যায়। এবং পূর্ব্ববৎ আচরণের গুণেই সে লোকসমাজে ঘৃণ্য হয়। পদ্মলোচন সঙ্গিগুণে কখনও বর্দ্ধণ, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও বা ব্রাহ্মণ দাস। রাজনীতি, সমাজ নীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল নীতিতেই তাহার সমান অধিকার। সে অধিকার রক্ষাকল্পে কখনও সে কাহারও লাঞ্ছনা করে, কখনও বা লাঞ্ছিত হয়। তবে তাহার ভাগ্যে লাঞ্ছনার ভাগই সমধিক ঘটিয়া থাকে। কারণ সে আপনার সম্মান রক্ষা করিতে আপনি জানে না; সে শিক্ষা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার কারণ বন জঙ্গল কাটিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষ সহরে ইমারথ তুলিয়াছিলেন। চাকুরী-স্থলে সেলাম বাজাইয়া তাহাদের মধ্যে এক আদজন এক আদখানা খাস জমিদারী পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অতএব পদ্মলোচনের বংশের মত বুনিয়াদী বংশ বাংলা দেশের কোথাও পাওয়া যাইতে পারে না। সেই গৌরবেই পদ্মলোচন আত্মহারা, সেই কথার আন্দোলনেই পদ্মলোচনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। অতএব পদ্মলোচন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে কখন?

মর্ম্মপীড়িতা শ্যামাসুন্দরী কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া অভিমান-ভরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। সে কাহারও মানা মানিল না। কাহারও কথা শুনিল না; অভিমানিনীর তখন অভিমানের গাঙ্গে জোয়ার আসিয়াছে; সে জোয়ারের স্রোতে তখন পদ্মলোচনের সকল শ্লোক, সকল গাথা, সকল কবিতা, সকল চাটুকারিতা ভাসিয়া গেল। রহিল কেবল বিড়ম্বনা। অভিমানিনী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহার পিত্রালয়ে পৌঁছিল আর পদ্মলোচন উপায়ান্তর না দেখিয়া নীরব ক্রন্দনে ও দীর্ঘশ্বাসে আপনাকে নিতান্ত অনাথ বলিয়া মনে করিল।

(২)

পদ্মলোচন যাহার শ্যালক, ইন্দ্রনাথ তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই সম্পর্কে

ইন্দ্রনাথ পদ্মলোচনকে প্রিয় কুটুম্ব বলিয়াই মনে করিত এবং তদনুরূপ মধুর সম্ভাষণেই তাহাকে পরমাপ্যায়িত করিতে চেষ্টা পাইত। কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইল। পদ্মলোচনের বুদ্ধি ক্ষুরধার। মনে মনে নানা তর্ক করিয়া সে স্থির করিল—ইন্দ্রনাথের এরূপ আত্মীয়তা স্থাপন বিশেষ সন্দেহজনক। কিন্তু সন্দেহের কারণটা যে কি, তাহার মীমাংসা সে কিছুতেই করিতে পারিলনা। অথচ তাহার ধারণা ইন্দ্রনাথের আত্মীয়তা অশেষ দোষে দুষিত। সেই ধারণা বলেই পদ্মলোচন ইন্দ্রনাথের উপর খড়্গহস্ত হইল। খড়্গ ও হস্তের বহর দেখিয়া ইন্দ্রনাথের কৌতুকের আর সীমা রহিল না। সে প্রাণপণে পদ্মলোচনের উপর বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিতে থাকিত। আর পদ্মলোচন তাহার উত্তরে অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালি দিত এবং মধ্যে মধ্যে দ্বন্দযুদ্ধের অভিনয় করিয়া যে ইন্দ্রনাথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিত না, এমন কথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। তাহাতেও কিন্তু ইন্দ্রনাথকে বিরক্ত বা ক্রোধান্বিত হইতে দেখা যায় নাই। ইন্দ্রনাথ বলে কৌতুক করিতে গেলে গালাগালি খাইতে হয়, প্রহৃত হইতে হয়, নতুবা মজা পাওয়া যায় না।

মজা করিবার লোভে মজার ইন্দ্রনাথ সেই দিবস অপরাহ্নে পদ্মলোচনের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অনেক ডাকাডাকি হাকাহাকির পর পদ্মলোচনের দর্শন পাইল। পদ্মলোচনের পদ্মিনী যে অভিমান ভরে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে, সেকথা অবশ্য ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বে জানিত না। কিন্তু বুদ্ধিমান পদ্মলোচন তাহার বুদ্ধির সূক্ষতার দোষেই হউক, আর গুণেই হউক, তাহা অচিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিল এবং শ্যামাসুন্দরীর বিরহে যে তাহার জীবন ভারবহ হইয়া উঠিয়াছে, সে কথাও ইন্দ্রনাথকে জানাইতে পদ্মলোচন বিশেষ কোন দ্বিধা বোধ করিল না। সহানুভূতি প্রদর্শনে পদ্মলোচনকে তুষ্ট করিয়া ইন্দ্রনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল শ্যামাসুন্দরীর সহসা পিত্রালয়ে যাইবার কারণ কি?

তাহার উত্তরে পদ্মলোচন বিশেষ কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না, তবে সে ব্যাপারে, সেই যে প্রাধান দোষী, সে কথা গোপন করিতে পারিল না বা করিল না।

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল—মাভৈঃ তোমার ভয়ের বিশেষ কোনও কারণ নাই। আমার চেষ্টায় তুমি হারানিধি অচিরে ফিরিয়া পাইবে—তবে একটা সর্ত্তে।

উৎকণ্ঠিত পদ্মলোচন ব্যাকুল ভাবে কহিল—সর্ত্তটা কি? ইন্দ্রনাথ গম্ভীর

ভাবে কহিল বিশেষ কিছুই নহে, বিশেষ কিছুই নহে। এই একবার মাত্র আমাকে ভগিনীপতির সন্মান দান।

অন্য সময় হইলে পদ্মলোচন ইন্দ্রনাথের মস্তকটা কাচাই খাইয়া ফেলিত, কিন্তু বিরহ বেদনায় তখন সে বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আর তাহার একটা আশা ছিল যে ইন্দ্রনাথকে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিতে পারিলে মুন্সীয়ানা করিয়া সে শ্যামাসুন্দরীকে ফিরাইয়া আনিতে পারে। সুতরাং এ যাত্রা ইন্দ্রনাথের মাথাটা আর তাহার চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করা হইল না। সে কেবল মাত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নাসিকা স্ফীত করিয়া গলার স্বরটা একটু গাঢ় করিয়া বলিল, ইন্দির কি বল্লি। যা' যা' দুঃখের সময় তোর ও রসিকতা ভাল লাগে না।"

ইন্দ্রনাথ বুঝিল, ব্যাধির তাড়নায় পদ্মলোচন এতটা শান্ত হইয়াছে, নতুবা সে শান্ত হইবার পাত্র নহে। সুযোগ ও অবসর বুঝিয়া ইন্দ্রনাথ পদ্মলোচনকে চাপিয়া ধরিল। বিরহ বিপদগ্রস্ত পদ্মলোচন উপায়ান্তর না দেখিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল—"ভগিনীপতি সব শালাই হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে কোনও শালা এক টুকরা সুতাও পাঠায় না।"

বেদম হাসি হাসিয়া ইন্দ্রনাথ কহিল, এই কথা! এত দুঃখ তোর বাপু। আচ্ছা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ত আজ বাদে কাল মঙ্গলবারে। ঐ দিনেই তোর দুঃখের অবসান হবে।"

বিরক্তভাবে পদ্মলোচন কহিল—"হ্যা, হ্যা, সব শালাই দুঃখের আসান করে।" এখন সুন্দরীকে আজই আনার উপায় কি, তা বল? শ্যামাসুন্দরীকে পদ্ম-লোচন "সুন্দরী" বলিয়াই ডাকিত। সেটা তাহার আদরের ও সোহাগের নাম।

ইন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবাচ্ছন্ন হইয়া কহিল—"দেখ পদ্ম, আজ সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। আজকার রজনীটা কোনও প্রকারে চক্ষু মুদিয়া রন্ধন গৃহের দাওয়ায় অথবা গোশালার গোময়পূর্ণ গৃহতলে পড়িয়া ছট ফট করিতে করিতে বিরহ যন্ত্রণা উপভোগ কর। তারপর কাল প্রাতে তোমার লক্ষ্মীকে তোমার গৃহে হাজির করিব। তখন তোমার সুখের আর অবধি থাকিবে না।"

পদ্মলোচন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনিমেষ লোচনে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিল, আর উৎকর্ণ হইয়া তাহার ওজস্বিনী ভাষায় উৎকট বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল। বেচারীর আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তখন ইন্দ্রনাথ বলিতেছে—

"শোন পদ্ম, অবিমিশ্র সুখ কাহারও হয় না ; মনুষ্য জীবনে সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে—আর চলিবেও। তোমার ভাগ্যেও তাহা না হইবে কেন ? তুমি সুখভোগ করিয়াছ বলিয়াই আজ তুমি দুঃখ পাইলে, আর দুঃখ পাইয়াছ বলিয়াই কল্য প্রাতে তোমার সুখের উষা নিশ্চয় আসিবে, যাও পদ্ম, শরীর গোময় লিপ্ত কর, তাহাতে শরীর পবিত্র হইবে, রাত্রি জাগিয়া প্রিয়ার ধ্যান কর, চিন্তা কর, তবেত আরাধনী শক্তিতে শ্যামাসুন্দরীকে তুমি টানিয়া আনিতে পারিবে। যোগবল—সায়েন্সিক ফোর্স জানিও একটা কথার কথা নহে। চিন্তা, চিন্তা, অহরহ চিন্তা—সেই চিন্তার শক্তিতেই চিন্তা-মণিকে পাওয়া যায় হে, তোমার তৃতীয় পক্ষের শ্যামাসুন্দরী ত বহুদূরের কথা। এখন ভাব, কাঁদ, অনুতাপ কর। শ্যামাসুন্দরী এবার বিশেষ ক্ষেপিয়াছে। ক্ষ্যাপা আবার পতির বুকে না দাঁড়ায়। সাবধান পদ্ম, সাবধান, তোমার সময়টা এখন বড় খারাপ। সাবধান হে সাবধান, কেবল চিন্তা অনুতাপ, অনুতাপ চিন্তা। তোমার এখন আর অন্য চিন্তা নাই।

সাতিশয় বুদ্ধিমান পদ্মলোচন তখন ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া তাহার অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক সে সকল মনোবিজ্ঞানের কথা ! তাহার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

পদ্মলোচন, ইন্দ্রনাথের প্ররোচনায় ও তাহার উপদেশ মত বিরহ শয্যা রচনা করিয়া সে রাত্রিটা কোনমতে যাপন করিল। সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হয় নাই। প্রিয়ার চিন্তাতেই সে রজনী কাটিয়া গেল! শুনা যায়, প্রিয় বস্তুর চিন্তাতেও অনেকের সুখলব্ধি হইয়া থাকে। পদ্মলোচনের ভাগ্যেও সে সুখ ঘটিয়াছিল।

(৩)

সেদিন মঙ্গলবার—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। প্রভাতে শয্যা ত্যাগান্তে ইন্দ্রনাথের উপ-দেশানুসারে বেশভূষা করিয়া বুদ্ধিমান পদ্মলোচন শ্যামাসুন্দরীকে আনিতে চলিল। সে বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া বেশকার ইন্দ্রনাথকেও মনে মনে বেদম হাসিতে হইয়াছিল। তবে সে হাসি ফুটিতে পায় নাই ; ফুটিলে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহা হইলে বুদ্ধিমানের অশেষ বুদ্ধির গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত না।

পদ্মলোচন অবশ্য ভাড়াটিয়া অশ্বযানেই শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল। পদব্রজে যাইলে পথে তাহার অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল, এমন কি তাহার উপর

বালক ও যুবকেরা যে কিছু উৎপাত করিত না, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। সে বিপদ, সে উৎপাতের সম্ভাবনা অবশ্য পদ্মলোচনের পোষাক পরিচ্ছেদের উপরে নির্ভর করিয়াছিল। সে ব্যাপারের জন্ম যে একমাত্র ইন্দ্রনাথই সম্পূর্ণ দায়ী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, অশেষ বুদ্ধির আকর পদ্মলোচন, ইন্দ্রনাথের চাতুরী ও কৌশল আদৌ বুঝিতে পারে নাই। তাহা বোধ হয় বিরহ বিকারে। দারুণ ভয়ে, রজ্জুতে যদি লোকের সর্পভ্রম হয় তবে কল্পমণ্ডিত পদ্মলোচন তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া, বিরহ বেদনায় অপরূপ সজ্জাতেই বা সজ্জিত না হইবে কেন? উৎকট ভাব ও মানসিক ক্লেশেই না মানসিক বিকার জন্মে!

গাড়ীর ভাড়াটা পূর্ব্বেই ইন্দ্রনাথ শকট চালকের হস্তে প্রদান করিয়া গাড়ী ভাড়ার দায় হইতে পদ্মলোচনকে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। আরোহী অবতরণ করিবা মাত্র শকট চালক শকট লইয়া চলিয়া গেল। পদ্মলোচন, ভেকরাজের মত লম্ফে লম্ফে শ্বশুর বাড়ীর অন্দর মহলে প্রবেশ করিল।

বলিতে ভুল হইয়াছে, পদ্মলোচন একটু খঞ্জ। তাহার শ্রীচরণ দুইখানির মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ গোটা; আর একখানি দৈর্ঘ্যে কিছু ছোট, পরিসরে কিছু কম। ইহা যে স্রষ্টার কার্পণ্য এবং বুদ্ধিহীনতার পরিচয় সে কথা সকলকে বুঝাইয়া দিতে পদ্মলোচন সকল প্রকার চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। যাহা হউক তাহাতে পদ্মলোচন কোনরূপেই লাভবান হইল না। পদ্মলোচনের কথা মত বিধাতা দোষী হইলেও পৃথিবীর লোক বিধাতাকে কানা খোঁড়া না বলিয়া সে অর্থটা পদ্মলোচনের স্কন্ধেই চাপাইয়া দিল। দৃষ্টিশক্তির যন্ত্র সম্বন্ধেও পদ্মলোচনের যথেষ্ট দাবী দাওয়া ছিল না—তথাপি সে পদ্মলোচন; কারণ সেটা তাহার পিতৃদত্ত নাম। এ নামের পরিবর্ত্তে পদ্মলোচনকে কেহ অন্য নামে ডাকিলে অবশ্য সে বিলক্ষণ চটিয়া যাইত; কিন্তু তাহাতে বিধাতার বিধান উল্টাইয়া যায় নাই। অথবা অভিভাষণকারিগণেরও কোনও ক্ষতি হয় নাই।

অপরূপ পদসঞ্চালনে পদ্মলোচন যখন অন্দর মহলে প্রবেশ করিল তখন বাটীর মহিলাগণ প্রায় সকলেই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল এবং পুরুষগণও প্রাতঃকালোচিত স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। কেবল খোকা-খুকীর দল প্রাঙ্গণে আনন্দে ছুটাছুটী করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল; তাহারাই চীৎকার ও ক্রন্দন করিয়া গৃহস্থকে জানাইয়া দিল বাটীতে একটী অপরূপ জীব প্রবেশ

করিয়াছে। বাটীর নরনারী সে অপরূপ জীবের অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল! পাড়ায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল!

সমাগত ও সমবেত ব্যক্তিগণের চীৎকার ও শাসন বাক্যে পদ্মলোচন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া সে এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে নাই। তখন সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ তাহাকে পাগল বলিতেছে, কেহ দস্যু তস্করের গুপ্তচর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছে, আর প্রকৃতি দেবীর অনুকম্পায় যাহারা যৌবনগর্ব্বে স্ফীত ও সংসারানভিজ্ঞ তাহারাই কেবল শ্বশুরালয়াগত চিরপরিচিত হইয়াও পরিচ্ছদ দোষে অপরিচিত জামাতাটীকে চপেটাঘাত মুষ্টাঘাত ও কর্ণমর্দ্দনে ব্যথিত করিতেছে।

নষ্টবুদ্ধি ইন্দ্রনাথের উপদেশানুসারে পদ্মলোচনের পরণে তখন জাহাজের মাঝিমাল্লার মত ঢলঢলে উর্দ্দিং, গাত্রাবরণ—সেলাম বাজিতে প্রাপ্ত শালের চোগা ও চাপকান, শিরোদেশে নবাবী আমলের পাগড়ী, চক্ষে রঙ্গিন কাচের চশমা, মুখে মিয়াজানের মত এক মুখ কটা দাড়ি ও কটা গোপ! তাহার উপর ইন্দ্রনাথ নষ্টবুদ্ধি বশে পদ্মলোচনের এক গণ্ডে চূণ ও অন্য গণ্ডে কালি লাগাইয়া দিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের হস্ত কৌশলে পদ্মলোচন অবশ্য সে ব্যপার ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। ইহা ভিন্ন পদুর কপালে জোড়া চন্দন রেখা ছিল নাসিকায় রসকলি ছিল, ভ্রূযুগের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুরের টিপ ছিল, অধরে উৎকট তাম্বুলরাগ ছিল। এই বেশে কন্দর্পকেও বোধ হয় অসুন্দর ও বীভৎস দেখায়—খঞ্জ পদ্মলোচন ত দূরের কথা। তদুপরি পদ্মলোচনের পশ্চাদ্ভাগে একটী অনতিদীর্ঘ লাঙ্গুল লম্বমান ছিল। ইন্দ্রনাথ ডারউইনের মতের পক্ষপাতী কি না তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না; তবে এ লাঙ্গুল যে বুদ্ধিমান পদ্মলোচনের বুদ্ধির জয়পতাকা—এ কথা অনেককেই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াও পদ্মলোচন ইন্দ্রনাথের শিক্ষামত তখনও চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ওগো মেরনা, ওগো মেরনা—ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বিনা নিমন্ত্রণে এসেছি ব'লে আর মেরনা গো মেরোনা।" হাসির তরঙ্গে পদ্মলোচনের আবেদন ও নিবেদন ভাসিয়া গেল। পদ্মলোচন তখনও ভাঁড়ামী করিতে ছাড়ে নাই। ইন্দ্রনাথ পদ্মলোচনকে শিখাইয়া দিয়াছে—"ভাঁড়ামী যত করিতে পারিবে, তৃতীয় পক্ষের মানিনীর মান তত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যাইবে।" কিন্তু প্রহার যখন তাহার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইল, তখন সে দাড়ী গোঁফ সমস্ত

টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিদানের পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল—"বাবা, আমি তোমাদের জামাই বাবা—এই এই ওকে গ্রহণ করতে এসেছি, বাবা—আর মেরনা বাবা।"

রহস্যোদ্ঘাটনে কেহ হাসির হর্‌রা তুলিল, কেহ হাসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উদ্যোগ করিল, কেহ লজ্জায় অধোবদন হইল, আর কেহ বা মরমে মরিয়া গেল। পদ্মলোচনের শ্বশুর, জামাতার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন, তাঁহার কন্যা মানুষের হস্তে পড়ে নাই। শ্যামাসুন্দরী বুঝিল, নির্ব্বোধ স্বামীর উপর রাগ করিয়া পিত্রালয়ে আসিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। হাসির স্রোতে ভাঁটা পড়িতেই শ্যামাসুন্দরী স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া স্বামীর সহিত স্বামী ভবনে চলিয়া গেল। আর তাহার মাতা ও পিতা অধোবদনে ভাবিতে লাগিল, বুদ্ধিহীন জামাতার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাইয়া প্রতিবাসীবৃন্দের নিকট তাহারা কেমন করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিবে।

পদ্মলোচন ও শ্যামাসুন্দরী বাটীতে পৌছিয়াই দেখিল, তাহাদের বাটীর একজন দাসী একথালা মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বামী ও স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে দাসী বলিল—সে ইন্দ্রনাথ বাবুর বাটী হইতে আসিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বাবুর গৃহিণী, তাহার ভ্রাতা পদ্মলোচন বাবুকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তত্ত্ব পাঠাইছেন। কথাটা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু পদ্মলোচনের তাহাতে বিশেষ কিছুই হইল না। পদ্মলোচন কহিল—তা বেশ হয়েছে, তত্ত্ব করেছে তা বেশ করেছে। করবে বৈ কি, বন্ধু মানুষের স্ত্রীও ভগিনীর তুল্যা; তত্ত্ব করবে বৈকি।" মিষ্টান্ন ও বস্ত্রাদি পদ্মলোচন গ্রহণ করিলে দাসী চলিয়া গেল। সেই অবধি পদ্মলোচনের উপর ইন্দ্রনাথের রহস্যালাপের উৎপাত বাড়িল। পদ্মলোচন অবশ্য ইন্দ্রনাথের পত্নীকে ভগ্নী বলিয়া স্বীকার করিত। কিন্তু ইন্দ্রনাথের সহিত কোন সম্পর্ক স্বীকার করিত না। যাহা হউক শ্যামাসুন্দরীর শাসন ও কশাঘাতে পদ্মলোচন ক্রমে বুঝিল তাহার বুদ্ধির দোষ যথেষ্ট আছে। সেই অবধি সে আর বুদ্ধির গৌরব করিত না।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

রত্নময়ী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরপ্রসাদ রত্নময়ীর হাতখানি ধরিয়া অতি ক্ষিপ্রগতিতে সেই মন্দিরের খিড়কী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি কষ্টে প্রায় পোয়াটাক পথ অতিক্রম করিবার পর, সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল মধ্যে অগ্রসর হওয়া যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল।

এই জঙ্গলের পথঘাট তাহাদের উভয়েরই অপরিচিত। রজনী দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথঘাট চিনিবার কোন উপাই নাই। অগ্রসর হইবার পথ ত বন্ধ—আর পিছনে ফিরিলেও বিপদ।

কিসে যে কি ঘটিল, তাহা উভয়ের কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। রত্নময়ীর যে জীবন-রক্ষা হইয়াছে, সে আকাল মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, হরপ্রসাদ এই চিন্তাতেই প্রফুল্ল চিত্ত। যে ঈশ্বরে ভক্তিমান—সে ষোল আনা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, স্থির, ধীর, সুবিবেচক। সে মনে মনে ভাবিল—"যাহা কিছু করিয়াছে সবই সেই ভগবানের কৃপায়। রত্নময়ী যে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাইল, তাহাও সেই হৃষীকেশের অনুকম্পায়। আমিও সে ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া পত্নীকে বলিদান না দিয়া তাহাকে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে লইয়া যাইতেছি—তাহার কারণও সেই মধুসূদন।

হরপ্রসাদ, ভক্তিমাধুরী মাখা চিত্তে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিল—"এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে ক্ষুদ্র পরমাণুবৎ কে আমি? এ সংসারে যাহা কিছু ঘটে, বা ঘটিবে তাহার উপলক্ষ্য হৃষীকেশ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

হে প্রভু! হে জনার্দ্দন! হে মধুসূদন! তুমি আমায় যে কাজে নিযুক্ত করিবে, উপলক্ষ্য রূপে আমি তাহাই করিতেই বাধ্য।

সেই অন্ধকার বেষ্টিত জঙ্গলের মধ্যে, এক সুবৃহৎ বৃক্ষতলে আসিয়া দুইজনে দাঁড়াইল।

রত্নময়ীর চিন্তা অবশ্য বিভিন্ন পথগামী। সে মনে মনে ভাবিতেছে "মন্দের মধ্য হইতে যে অনেক সময়ে ভাল হয়, তাহা আমার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পরিত্যক্তা আমি। স্বামী আমার দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া না যাওয়ায়, অনুতপ্ত চিত্তে আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছিলাম। আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর আদেশেই স্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। একাকিনী শ্বশ্রূ গৃহে গেলে কিরূপ সম্মান পাইতাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু স্বামী যখন নিজে আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন তখন সে বিষয়ে অশঙ্কার কোন প্রয়োজনই নাই। বিধাতার কার্য্য বড়ই অদ্ভুত। কি করিয়া তিনি ঘটনাচক্রের যোগাযোগ করেন, তাহা সামান্য মানব বুঝিতে পারিবে কেন? স্বামী যে এখনও আমার প্রতি স্নেহহীন হন নাই, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার কার্য্যকলাপ। দেখিতেছি এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রের মধ্যে নিষ্পেষিত করিয়াও ভগবান আমার ভাগ্যচক্র আরও সুপথে আনিয়া দিলেন।

প্রকৃতি বক্ষ অন্ধকারময়। বনের অনন্ত নীলিমামণ্ডল অলঙ্কৃত করিয়া অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে। অসংখ্য তারকার সমুজ্জ্বল গাত্র-নিঃসৃত সমবেত জ্যোতিতে অন্ধকারের ভীষণ ভাব যেন অনেকটা অপসৃত হইয়াছে। শ্যামল পল্লব মণ্ডিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় অসংখ্য জোনাকী জ্বলিতেছে। নৈশ-প্রকৃতি কি যেন এক বিরাট গাম্ভীর্য্য পূর্ণ।

দুইজনেই বহুক্ষণ ধরিয়া সেই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়েই তখন চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়াছে, কাজেই কে কাহার তথ্য লয় তাহারা স্থিরতা নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া হরপ্রসাদ বলিল—"রত্নময়ী এখন উপায় কি?"

রত্নময়ী। কিসের উপায় প্রভু!

হরপ্রসাদ। রাত্রি বেশী নাই। দুই এক ঘণ্টা এই স্থানে দাঁড়াইলেই রাত্রি প্রভাত হইবে। উষার আলোকে আমরা পথ ঘাট দেখিতে পাইব। কিন্তু তার পর!

রত্নময়ী। তারপর কিসের ভয়! দিনের বেলা পথ চলিতে ত কাহারও অসুবিধা হইবে না।

হরপ্রসাদ। আমি পথের কথা ভাবিতেছি না।

রত্নময়ী। তবে কি ভাবিতেছ?

হরপ্রসাদ। তোমায় লইয়া কোথায় যাইব, রত্ন!

রত্নময়ী। কেন তোমার গৃহে।

রত্নময়ীর কথা শুনিয়া হরপ্রসাদ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। কেননা, রত্নময়ীর এ কথার উত্তরে যাহা বলিতে হইবে তাহা অতি রূঢ়। সে কথা বলিতে সে আদৌ ইচ্ছুক নহে। কিন্তু না বলিলেও গত্যন্তর নাই।

হরপ্রসাদকে সহসা চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রত্নময়ী বলিল—"কি ভাবিতেছ?"

হরপ্রসাদ। তোমারই কথা।

রত্নময়ী। আমার জন্য এত কি ভাবনা!

হরপ্রসাদ। তোমায় কোথায় রাখিব তাই ভাবিতেছি।

রত্নময়ী। কেন আমার শ্বশুরের ভিটা ত এখনও বর্ত্তমান।

হরপ্রসাদ। সেখানে তোমার প্রবেশ নিষেধ!

রত্নময়ী। কেন?

হরপ্রসাদ। আমার মাতার আদেশ! তিনি তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

রত্নময়ী। অনুতাপে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না?

হরপ্রসাদ। হয়।

রত্নময়ী। একদিন যৌবনের প্রথম বিকাশে, না বুঝিয়া যে অপরাধ করিয়াছিলাম—এত অনুতাপেও কি তাহার ক্ষমা নাই। তাহার মার্জ্জনা নাই।

হরপ্রসাদ। আছে, আমি মার্জ্জনা করিতে পারি। কিন্তু আমার মাতা কঠোর দিব্যি করিয়াছেন। তুমি আমার ভিটায় উঠিলে, তিনি অন্নজল ত্যাগ করিবেন।

রত্নময়ী। এত রাগ তাঁর? আমি তাঁর কন্যা। তিনি শ্বশ্রূমাতা, তাঁর পায়ে ধরিয়া আমি মার্জ্জনা চাহিব।

হরপ্রসাদ। কিন্তু আর এক মহা বাধা আছে যে রত্নময়ী!

রত্নময়ী। কি বাধা।

হরপ্রসাদ। মাতৃ আদেশে আমি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছি।

রত্নময়ী। তাহাতে আমি তিলমাত্র দুঃখিত নহি। মায়ের সুসন্তান তুমি; মাতৃ আজ্ঞা পালনে মহাপুণ্য। লঙ্ঘনে মহাপাপ! ছার আমি। আমার মত তোমার কত মিলিবে। তবে একটী কথা এই, নারায়ণ লক্ষ্মী সরস্বতীকে

লইয়া ঘর করেন। শিব পার্ব্বতী ও সুরধনীকে লইয়া আছেন। আমরা দুজনে তাহা হইলে তোমার চরণ সেবা করিতে পারিব না কেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রত্নময়ীর এই যুক্তিপূর্ণ কথায় হরপ্রসাদের মত পণ্ডিত লোককেও হটিয়া দাঁড়াইতে হইল। হরপ্রসাদ বলিলেন—"রত্নময়ী। আমি মাতৃ আজ্ঞায় তোমায় ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে তোমায় এখনও নির্ব্বাসিত করিতে পারি নাই। তুমি একটী কাজ যদি করিতে পার, তাহা হইলে উপস্থিত সকল দিকই রক্ষা হয়।

রত্নময়ী। কি কাজ!

হরপ্রসাদ। এখন আমি তোমাকে আমার ভগ্নির বাড়ীতে লইয়া রাখিব।

রত্নময়ী। লোকে বলিবে কি?

হরপ্রসাদ। লোকনিন্দা অপেক্ষা আমি মাতার বিরাগকে বেশী ভয় করি।

রত্নময়ী। তাহাই যেন হইল। কিন্তু তোমায় দেখিতে না পাইলে আমি যে দু দণ্ড সেখানে টিকিতে পারিব না।

হরপ্রসাদ। আমি তোমায় মধ্যে মধ্যে দেখা দিব।

রত্নময়ী। তাহাতে আমি স্বীকৃত নহি। আমায় নারায়ণ অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছ। হইতে পারে, আমি তোমার নিকট অপরাধিনী। কিন্তু করুণ কণ্ঠে, অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেও দেবতা ত মহাপাপীকে মার্জ্জনা করেন। যদি তোমার নিকট মার্জ্জনাও না পাই, আমি পত্নীত্বের দাবি ছাড়িব কেন?

হরপ্রসাদ রত্নময়ীর এ উক্তির মূলে একটা বিশেষ যুক্তি দেখিতে পাইলেন না। তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছেন। তখনই ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিলেন, রত্নময়ী যাহা বলিতেছে তাহাই ঠিক। শাস্ত্রমতে রত্নময়ী তাঁহার বা তাঁহার মাতার নিকট এমন কোন অপরাধ করে নাই, যাহাতে তাহার এইরূপ শাস্তি হইতে পারে।

পূর্ব্বের কথাটা কি, একটু খুলিয়া না বলিলে পাঠক পাঠিকা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না—কিসে এমন ঘটিল? হরপ্রসাদের মাতা কেন তাঁহার পুত্রবধূর উপর এত বিরক্ত হইলেন?

হরপ্রসাদ সে কালের লোক। তাহার উপর সুপণ্ডিত! সে মাতৃভক্ত সন্তান। সহসা তাহাকে মলিন মুখে শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিতে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সহসা চলিয়া আসিলি কেন প্রসাদ? বৌমাকে সঙ্গে আনিলিনি কেন?"

হরপ্রসাদ জীবনে কখনও মিথ্যা বলে নাই মায়ের সম্মুখে সে মিথ্যা কথা বলিবে কি করিয়া? কাজেই তাহাদের পতি-পত্নীর মধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা সে সবিস্তারে মাতার নিকট বলিল।

হরপ্রসাদের পিতা বড় তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম রমাপ্রসাদ স্মার্ত্ত-চূড়ামণি। রমাপ্রসাদ যেমন তেজস্বী তাঁহার পত্নীও সেইরূপ। হরপ্রসাদের মাতা তাঁহার পুত্রবধূর এইরূপ আচরণের কথা শুনিয়া বলিলেন—"থাক্ সেখানে পড়ে। দেখি তার কত তেজ! বড় মানুষের মেয়ে বলে চোখে কাণে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না! আমার ছেলেকে অপমান? হরপ্রসাদ আমি তোর মা। অনেক কষ্টে তোকে পালন করেছি! আমার আদেশ—তুই আর রাম-লোচন রায়ের মেয়ের নাম মুখে আন্‌তে পারিবি না। সে যদি আমার ভিটায় আসে তাহা হইলে আমি অন্নজল ত্যাগ করিব। আমি আবার তোর বিবাহ দিব। মনে কর, রামলোচনের মেয়ে মরিয়া গিয়াছে।"

বলাও যা—করাও তা। স্মার্ত্তচূড়ামণী পত্নী, সহজে এ ক্রোধ ত্যাগ করিলেন না। তিনি এক প্রতিবাসী মধ্যবিত্ত লোকের সুন্দরী কন্যাকে নির্ব্বাচিত করিয়া তাহার সহিত পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিলেন! ইহাই হইতেছে পূর্ব্বের ঘটনা।

হরপ্রসাদ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—"রত্নময়ী"!

রত্নময়ী বলিল—"কেন প্রভু!"

কি স্নিগ্ধ কথা! হরপ্রসাদের প্রাণ এই সম্বোধনে স্নেহের বিমল ধারায় পরিসিক্ত হইল। রত্নময়ীর সুন্দর রূপ তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছিল। এত কাণ্ডের পরও তিনি তাহার সমুজ্জ্বল রূপের মোহ এড়াইতে পারেন নাই। যে রত্নময়ীকে তিনি এত কষ্টে, এত কৌশলে উদ্ধার করিলেন, আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইলেন, যে তাহাতে একান্ত সমর্পিতপ্রাণা, তাহাকে তিনি ত্যাগ করিবেন কি করিয়া! কথাটা ভাবিতেও তাহার মনে বৃশ্চিক দংশনের যাতনা উপস্থিত হইল।

তোমার দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, আনন্দ-উল্লাস, যাহাই ঘটুক না কেন, সময় তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে না। এই নিয়মে, বিরহীরও দিন কাটে, নায়ক-বক্ষ সম্বদ্ধা প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধা নায়িকারও সুখের রজনী প্রভাত হয়। রোগীরও দিন কাটে, ভোগীরও দিন কাটে, ভোগীরও দিন ক্ষয় হয়। কাজে কাজেই হরপ্রসাদ ও রত্নময়ীর হৃদয়ে যে প্রবল ঝটিকা উঠিয়া তাহাদের ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল, সেই ঝটিকার সময়টা কাটিয়া গেল। সেই ভীষণ অন্ধকারময়ী রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উষার আলোক ফুটিয়া উঠিল। মসীময়ী প্রকৃতির কৃষ্ণাসন শোভিতা মূর্ত্তি বিলয় হইয়া, উষালোক রঞ্জিত উজ্জ্বল মূর্ত্তি লোকলোচনের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

এইবার হরপ্রসাদ রত্নময়ীর সুন্দর মুখখানি আবার দেখিলেন। দেখিলেন—রত্নময়ী কাঁদিতেছে।

হরপ্রসাদের প্রাণে শেল বিদ্ধ হইল। সে আর সহিতে পারিল না। তাহার হৃৎপিণ্ড কে যেন ভীষণ পাশব শক্তিতে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না।

হরপ্রসাদ বলিল—"রত্ন! এখন কর্ত্তব্য কি?"

রত্নময়ী। কর্ত্তব্য তোমার হাতে! আমায় সঙ্গে লইয়া চল!

হর প্রসাদ। না—তা পারিব না। তোমাকে আমি আমার ভগ্নির বাটীতে এখন রাখিয়া যাইব। এর পর সুযোগ বুঝিলে তোমায় নিজ বাটীতে লইয়া যাইব।

রত্নময়ী। যদি এভাবে আমায় নিগৃহীত করিবে, তবে উদ্ধার করিলে কেন? আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে আমায় বাঁচাইলে কেন? কপালিনী আমার হৃদয়ের শোণিত পানের জন্য, খর্পর লইয়া বসিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার শোণিত তৃষ্ণা নিবারণে বাধা জন্মাইলে কেন! আমায় শাণিত খড়্গ সহায়ে হত্যা করিলে না কেন? না এ পৃথিবীতে অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেও তোমায় ত্যাগ করিব না। আমি এখন স্বামী চিনিয়াছি, পতি সেবার মর্ম্ম বুঝিয়াছি, জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহা জানিতে পারিয়াছি। আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। তুমি যাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছ, তাহাকে তুমি তোমার প্রাণের ভালবাসা ঢালিয়া দাও, স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিতা করিয়া দাও, আদরের রাণী করিয়া রাখ, তাহাতে আমি কোন আপত্তি করিব না। একটুও মর্ম্ম জালাও পাইব না। আমি তাহার দাসী হইয়া থাকিব। কিন্তু তোমায় ত্যাগ করিব না। ঐ উষালোকরঞ্জিত বিমানের অন্তরালে নারায়ণ বসিয়া আছেন। ঐ মেঘের উপর তাঁহার বৈকুণ্ঠ। তিনি আমার মনে ভাব সব বুঝিতেছেন! নারায়ণ সাক্ষী, আমি স্বামী ত্যাগ করিব না। আমায় ত্যাগ করিলে তুমি মহাপাতকী হইবে। আমি দর্পিতা হই; বোধশূন্যা হই, আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি সতীত্ব গৌরবে আমার প্রাণ উজ্জ্বলিত! আমায় ত্যাগ করিও না।"

রত্নময়ী স্বামীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। আমি দর্পভরে স্বেচ্ছায় সে স্থান ত্যাগ করিয়াছি! তুমি যদি আমায় চরণে আশ্রয় না দাও ত এ পৃথিবীতে আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই! আমায় রক্ষা কর—উদ্ধার কর, আর নিপীড়িত করিও না।"

হরপ্রসাদ, আর সহিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া বন্যা প্রবাহ বহিতে লাগিল। সে রত্নময়ীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল—"ভবিতব্য স্রোত কেহ রোধ করিতে পারে না। আমি আর সহিতে পারি না। তোমার জন্য মাতার কোপানলে পড়িতে হয়, মাতৃদ্রোহী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। আমি তোমায় ত্যাগ করিব না! এস—আমার সঙ্গে।"

তখন পথ চলিবার কোন বাধাই নাই। উষালোক প্রদীপ্ত হইয়া সমগ্র বন ভূমির পথ ঘাট অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। হরপ্রসাদ জঙ্গল পার হইয়া একটী ক্ষুদ্র মাঠ অতিক্রম করিলেন। এই মাঠের পরেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম।

গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গ্রামবাসীদের নিকট সন্ধান দ্বারা তিনি জানিলেন সেই গ্রাম হইতে তাঁহার বসতবাটী দুই ক্রোশ। চেষ্টা করিয়া তিনি একখানি ডুলী সংগ্রহ করিলেন। জমীদার কন্যা, নিগৃহীতা ও লাঞ্ছিতা রত্নময়ী প্রফুল্ল মনে সেই ডুলীতে চড়িয়া শ্বশুরালয়ে চলিল। ভবিতব্য এত চেষ্টা করিয়াও তাহার পথে কোন রূপ বাধা দিতে পারিল না।

আর হরপ্রসাদ! তিনি সেই ডুলীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা যেন তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ভীষণ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দৈব প্রেরণায়, হরপ্রসাদ পত্নীকে লইয়া বাটীতে ফিরিল। তখন বেলা নয়টা, কি দশটা।

হরপ্রসাদের মাতা কয়েকদিন যাবৎ পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই ভাবিতা হইয়াছিলেন। তখন দেশে ডাকের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। লোকের দ্বারাই সংবাদের আদান প্রদান চলিত। তখন নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার। সম্রাট ঔরঙ্গজেব, সমগ্র হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা।

হরপ্রসাদের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম প্রভাবতী। প্রভাবতী সুন্দরী বটে, কিন্তু রত্নময়ীর মত নহে। প্রভাবতী গরীবের মেয়ে। রত্নময়ী সুখের ক্রোড়ে বর্দ্ধিতা—প্রভাবতী এক দারিদ্র্যময় সংসারে পালিতা। রত্নময়ী জমীদারকন্যা, কিন্তু হইলে কি হয়, প্রভার হৃদয়ে ভগবান এমন কতকগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা রত্নময়ীর ছিল না।

প্রভা খুব প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে। বাড়ীতে একজন কৃষাণ ও একটী দাসী ছিল। দাসী ঘর দ্বার ঝাট দিত, বাসন মাজিত, ঘর নিকাইত; গোয়লের কাজ করিত, আর প্রভা তাহার সহায়তা করিত। দাসী বারণ করিলেও সে শুনিত না। শাশুড়ী এজন্য খিট্‌খিট করিলে বা বকিলে সে তাহা বড় একটা কাণে তুলিত না। সে ভাবিত, সেই গৃহের গৃহিণী। এ সব তাহার নিত্য কর্ত্তব্য। এখন না হয় অবস্থা ভাল, ঝি রাখিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু অবস্থার কথা ত বলা যায় না। যদি কখনও দুর্দ্দিন আসে, অথবা এই ঝি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সংসারের কাজ করিবে কে?

হরপ্রসাদের গৃহদেবতা শ্রীধরের নিত্য সেবার জন্য জমী বন্দোবস্ত ছিল। রাস, দোল, ঝুলান প্রভৃতি পর্ব্বাহে দুই চারিজন ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। ঠাকুর ঘরের কাজ কর্ম্ম যাহা কিছু প্রভা সবই করিত। শাশুড়ী ঠাকুরাণী ইহাতে বড় আনন্দিত। কারণ ঠাকুর ঘরের কাজ অপর কাহারও দ্বারা করাইবার উপায় নাই।

প্রভার বয়স ষোল বৎসর। সুতরাং কৈশোর-যৌবনের সন্ধি স্থলে সে পরমা সুন্দরী। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহখানি যেন সদ্য প্রস্ফুটিত বাসন্তী কুসুমের মত সুন্দর। সে দেহের সৌন্দর্য্য দেখিলে মনে হয়, যেন বর্ষার গাঙ্গ কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

হরপ্রসাদ প্রভাকে বড় ভাল বাসিতেন। এ ভালবাসা প্রভার রূপের আকর্ষণের জন্য নয়। গুণের জন্য। স্বামীর সেবা করিতে সে খুব মজবুত। স্বামীর মুখরোচক খাদ্য পাক করিতে সে খুব কর্ম্মকুশলা। সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা

লজ্জাবতী লতার মত সে আধ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া চারিদিকে ঘুরিত ফিরিত, তাহা দেখিয়া হরপ্রসাদ বড়ই একটা তৃপ্তি লাভ করিত।

হরপ্রসাদের বাসভবন দ্বিতল। তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। উপরে তিনটী শয়ন কক্ষ। আর ঠাকুর ঘর। নীচের তিনটী কক্ষ মধ্যে একটী ভাণ্ডার গৃহ, অপরটী আহারাদির স্থান। তৃতীয়টী শূন্য। রান্নাঘর স্বতন্ত্র—মাটীর তৈয়ারি! তাহা ছাড়া বাড়ীর উঠানের এক প্রান্তে গোয়াল ঘরও ছিল। আর বাহিরে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ।

প্রভাবতী ঠাকুরঘরের কাজ সারিয়া পাক শালায় প্রবেশ করিয়াছে। রান্না চড়াইয়াছে। প্রথম পাকেই ঠাকুরের ভোগ রান্না হয়। ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে গৃহিণী তাহা প্রসাদরূপে খান। ইহা আতপান্ন। তার পর সে হেঁসেল উঠাইয়া লইয়া আবার সিদ্ধ চাউল ও আমিষের ব্যবস্থা করিত।

তখন বাঙ্গলা দেশ এতটা লক্ষ্মীশ্রী হীন হয় নাই। নবাব সায়েস্তা খাঁর আমল। চাউল তখন খুব সস্তা। চাউল সস্তা হইলেই আর সব জিনিসই সস্তা হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘৃত দুগ্ধ যথেষ্ট। সকলের গোয়ালেই দুই চারিটী গরু। সকল গৃহস্থ গৃহেই চারি পাঁচ সের দুগ্ধ! এই সব দুধ হইতে, ঘৃত, দধি মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। ক্ষীরের ছাঁচ, সর ভাজা, ক্ষিরেলা, ভাবা দই, তখনকার বাঙ্গালীর জলখাবার ছিল। দুধ ক্ষীর আর ঘৃত খাইয়াই বাঙ্গালী তখন কান্তি-পুষ্টি লাবণ্যময় দেহ লইয়া ধরায় বিচরণ করিত। তখন বিলাসিতা ছিল না, বাবুয়ানা ছিল না, সেমিজ জ্যাকেট ছিল না, এত রং বেরঙ্গের নাম ওয়ালা নূতন প্যাটার্ণ-মণ্ডিত, সোণার গহনার জ্যোতি ছিল না। ছিল সৌহৃদ্য, আত্মীয়তা, সারল্য, দেবদ্বিজে ভক্তি ও ধর্ম্মে অনুরক্তি। হায় মা! বঙ্গভূমি, আজ কোন পাপে তোমার সেকালের সেই দেব দুর্লভ সৌন্দর্য্য হারাইয়া আজ তুমি এ দশায় উপনীত হইয়াছ।

গৃহিণী দালানে বসিয়া মালা ফিরাইতেছেন। কাছে বসিয়া প্রভাবতী। মালার উপর গৃহিণী মনসংযোগ করিতে পারিতেছেন না। পুত্রের দীর্ঘকাল অদর্শনে, তাঁহার প্রাণ বড়ই চঞ্চল। গৃহিণী বলিলেন—"বৌমা! সন্তানের মা হওয়ার সুখও যেমন, দুঃখও তেমনি। আমার দশ পাঁচটা নেই, ঐ একটী মাত্র আঁধার ঘরের মাণিক। আজ একমাস হতে যায়, কোন খবরই নেই।"

প্রভাবতী অস্ফুট স্বরে বলিল—"মা! ভগবানকে ডাক! নারায়ণের স্বস্ত-পরমান্ন আজ দেওয়া হয়েছে। কোন ভয় নেই।"

এমন সময়ে হরপ্রসাদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"মা!"

সেই স্নেহময় মাতৃ-সম্বোধন গৃহিণী যে এক মাস শুনেন নাই! গৃহিণী মালা ছড়াটী মাথায় ঠেকাইয়া তাহা একটী পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার জপ তপ ঘুরিয়া গেল। স্নেহ মিশ্রিত তিরস্কারের সহিত বলিলেন—"কি রকম তোমার বুদ্ধি বিবেচনা বাবা! এত দেরী কর্ত্তে হয়!"

হরপ্রসাদ বলিল—"বড় বিপদে পড়েছিলুম মা! সে বড় ভয়ানক কথা!"

ভগবান রক্ষা করেছেন! সে সব কথা তোমায় এর পরে বলবো। তোমার জন্য একটী জিনিস এনেছি মা!

"কি জিনিস?"

"তোমার পুরাতন দাসী।"

"রত্নময়ী প্রবেশ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। হরপ্রসাদই তাহাকে এই স্থানে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলেন। রত্নময়ী অগ্রসর হইয়া উঠান পার হইয়া। শাশুড়ীর চরণ ধূলি লইল।

কিন্তু হরপ্রসাদের মাতা বড়ই উগ্র প্রকৃতির। এই বড় মানুষের মেয়ে, রত্নময়ী, তাহার পুত্রকে অপমান করিয়াছে, এ কথাটা আবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি রত্নময়ীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"চিরায়ুষ্মতী হও।" কিন্তু রুষ্টভাবে পুত্রকে বলিলেন—"এ রামরতন রায়ের মেয়ে না? একে আবার আন্‌লি কেন প্রসাদ!"

"তোমার সেবা করবে বলে মা।"

"আমার সেবার ত কোন অভাব নেই। আমি ওর মুখ দেখ্‌তে চাই নি। আজ এসেছে থাক। কিন্তু আমি ওকে নিয়ে ঘর করবে না। "যে আমার পুত্রের অপমান করে, আমার স্বামীর অপমান করে, এ বাটীতে তার স্থান হবে না।"

হরপ্রসাদ এ কথায় কোন কথা কহিল না। সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল। গৃহিণী রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন। রত্নময়ী আবার তাঁহার পদধুলি লইল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা! কন্যা যদি অপরাধিনী হয়, তাহা হইলে মা কি তাকে মার্জ্জনা করেন না। একদিন মোহের ছলনায় যে পাপ করিয়াছি, এতদিন ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও কি তাহার জন্য মার্জ্জনা পাইব না। মা, এবার আমি নিজে উপযাচিক হইয়া আসিয়াছি। আমার দর্প অভিমান সব চূর্ণ হইয়াছে। আমায় ত্যাগ করিও না মা!"

এই সময়ে সহসা বায়ুভরে রত্নময়ীর মুখের আবরণ খুলিয়া গেল। গৃহিণী দেখিলেন—সেই রত্নময়ী এখন অপ্সরার মত সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াছে। প্রভাবতীও দালানের থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া রত্নময়ীর সেই অপূর্ব্ব কান্তি দেখিয়া মোহিতা হইল। সে মনে মনে বলিল—"হাঁ রূপসী বটে।"

রত্নময়ীর অপরূপ সৌন্দর্য্য ও চোখে জল দেখিয়া গৃহিণীর মন একটু নরম হইল। তিনি প্রভাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৌমা! একে উপরে নিয়ে যাও। থাকা না থাকার কথা এর পর ভেবে দেখ্‌বো।

হরপ্রসাদ উপর হইতে দেখিল যে মামলা তখন একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল। সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আঃ বাঁচা গেল!"

প্রভা আসিয়া রত্নময়ীকে উপরে লইয়া গেল। সে অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, যেন মমতা আসিয়া স্নেহের হাত ধরিয়াছে; উজ্জ্বল দীপ-শিখার পাশে যেন বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে! ক্রমশঃ—

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ   ভাদ্র, ১৩২২ সাল   ৫ম সংখ্যা

মলিনা

বৈশাখ মাস, বেলা প্রায় পাঁচটা, মেঘের অবস্থা দেখে শীঘ্রই ঝড় উঠিবে বোধ হইতেছে। এমন সময় একটী যুবক হন্ হন্ করিয়া মাধবপুরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। যুবক চেষ্টা করিতেছে যাহাতে ঝড়ের পূর্ব্বে সে নিজ বাটীতে পৌঁছিতে পারে—যুবকের বাড়ী শ্রীপুর, মাধবপুরের সংলগ্ন গ্রাম। মাধবপুরের মাঝামাঝি যাইতে না যাইতে পথিমধ্যস্থ বৃক্ষাদি কাঁপাইয়া প্রবল ঝড় উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। যুবক তখন তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত কৈশোরের মধুময় স্মৃতি-সম্বলিত একখানি গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আকাশের অবস্থা দেখিয়া একবার তার সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইবার প্রবল বাসনা হইতেছে, আবার তখনি কি এক মর্ম্মভেদী যাতনার তীব্র তাড়নায় সেখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইবার ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ এত বাড়িয়া উঠিল যে, অনন্যোপায় হইয়া যুবক সেই বাটীতে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া বাড়ীর বামা ঝি “ওরে বিনয় আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, কাল ওলাওঠা রোগে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে রে,” বলে চীৎকার করিয়া উঠিল। বিনয় ত একবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সে ইহার কোন অর্থই উদ্ভাবন করিতে পারিল না। বিনয়ের নাম উচ্চারণ শুনিয়া একটী বর্ষীয়সী রমণী অন্দর হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন ও বিনয়কে আর্দ্রবসনে কাঁপিতে দেখিয়া ঝিকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে একখান কাপড় আনিতে আদেশ দিলেন। বিনয় বস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া, বিনয় কোথা হইতে আসিতেছে, কেমন আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করণান্তর তাঁহাদের বিপদের কথা বলিলেন। বিনয় মলিনার

অদৃষ্টের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। মলিনা বিবাহের দশ মাস পরেই বিধবা হইয়াছে। প্রায় দুই মাস হইল কলেরা রোগে তার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে।

বিনয় কাঁদিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়াছে, তার উপর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, বিনয় মলিনার মার নিকটে বসিয়া থাকিলেও তিনি তাহা দেখিতে পান নাই; বিনয়কে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন বাছা, এই আমাদের বিপদ, মলিনার শাশুড়ী তাকে 'ডাইনী' বলে বাড়ী হ'তে বিদায় করে দিয়েছে, আর কখনও যে সে শ্বশুরালয়ে স্থান পাবে তা আমার বিশ্বাস হয় না। দাদা মলিনার বিবাহের সময় খুব আত্মীয়তা দেখাইয়া দিন কয়েক আমাদের তত্ত্বাবধান করে ছিলেন, এখন এই বিপদে তিনি একবার আধবার মাত্র সংবাদ লওয়া ভিন্ন আর এ দিকে আসেন না। আমাদের অদৃষ্ট-দোষে তুমিও বাবা ক্রমশঃ পর হইতেছ, একবার একবার এসে আমাদের খবর নিও, মলিনাকে একটু সান্ত্বনা করো। বিনয় নিরুত্তর, তার যে একটা কিছু বলা আবশ্যক সেটা উপলব্ধি করিতে ক্ষণিক সময় লাগিল। সে যেন চকিতের মত হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মাসি মা, আমি এখানে ছিলুম না, তাই আপনাদের বিপদের কথা শুনি নাই, এখন বাড়ীতে দু এক দিন থাক্‌বো, সুতরাং মাঝে মাঝে অবশ্যই আস্‌বো ও আমার দ্বারা আপনাদের যা উপকার হ'তে পারে তা করতে আমি অণুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ব না।

মলিনার মা মলিনাকে ডাকিয়া বিনয়ের কাছে বসিতে বলিলেন ও তিনি বিনয়ের জন্য খাবার করিতে গেলেন। বিনয় বৃষ্টি থামিলে বাড়ী গিয়া খাবে বলিলেও গিন্নী শুনিলেন না, অগত্যা ঘণ্টা দুই বিনয়কে থাকিতে হইল।

মলিনা আসিলে বিনয় কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল; তাহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের মর্ম্মব্যথা চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। মলিনার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত, বিনয়ের বক্ষস্থল স্পন্দিত ক্রন্দন প্রয়াসে ঘন ঘন প্রকম্পিত। অবশেষে বিনয় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া 'মলিনা কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করিল, সে ছোট্ট একটী 'ভাল আছি' বলিয়া নীরব হইল। বিনয় যখন দ্বিতীয় প্রশ্ন খুঁজিয়া পাইতেছে না, তখন মলিনা তার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ক্রমশঃ শোকের ও মর্ম্ম ব্যথার তীব্রতা প্রশমিত হইলে পরস্পরের অদৃষ্ট লইয়া কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হইল ও সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল। মলিনার বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা দুজনে একত্রিত হইলে যেমন পরস্পরের কথার শেষ

হইত না ও কোথা হইতে কত প্রশ্ন আসিয়া জুটিত, আজ আর সে ভাব নাই। পরস্পরকে যেন কত চেষ্টা করিয়া প্রশ্নের সৃষ্টি করিতে হইতেছে। যখন তাদের এই অবস্থা, তখন গিন্নী আসিয়া বিনয়কে খাবার জন্য ডাকিলেন। আহারান্তে মাসিমাকে প্রণাম করিয়া মলিনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিনয় বাড়ীর দিকে ছুটিল। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে, কিন্তু এই প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলতা বিনয়ের হৃদয়ের তুলনায় সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। বাটী পঁহুছিয়া বিনয় পিসিমাকে মলিনাদের বাড়ী খাইয়াছে, রাত্রে আহার করিবে না বলিয়া ও পিসিমার কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দিন সমস্ত রাত্রি নানা চিন্তায় ও হৃদয়ের উত্তেজনায় বিনয়ের ভাল নিদ্রা হয় নাই—নিশাশেষে স্বপ্নাবেশে বিনয় দেখিল যেন তার চিরবাঞ্ছিত মলিনা তার গলদেশে ফুল্লবিকশিত যুঁইএর মালা পরাইয়া বলিতেছে, 'আমি চিরদিন তোমারই'। বিনয় নিদ্রাভঙ্গে কি এক অজানা বাসনার তীব্র তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিল।

(২)

এখন আমাদের বিনয় ও মলিনার পূর্ব্ব পরিচয়ের বিষয় কিছু বলিতে হইবে। বিনয় ও মলিনার পিতা দুইজনেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, দেশে এক জায়গায় বাড়ী ছাড়া, তাঁরা দুজনে একত্রে বাঁকুড়া জেলায় চারি বৎসর কার্য্যোপলক্ষে বাস করায় দুই পরিবারের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। মলিনা বিনয়ের মাকে মাসিমাতা বলিত, বিনয়ও মলিনার মাকে মাসিমা বলিয়া সম্বোধন করিত। বিনয়ের এক প্রধান কার্য্য ছিল স্কুল হইতে আসিয়া মলিনাকে পড়ান, বিনয় তখন তের বৎসরের, মলিনা আট বৎসরের, ঐ চারি বৎসরে বালক বালিকার নির্ম্মল নিঃস্বার্থ ভালবাসা কৈশোরে প্রণয়ে পরিণত হইল। মলিনা বৈকালে চারিটা বাজিলে যেন কার আশায় স্কুলের রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিত, আর বিনয় ছুটী হইলে কি এক অজানা আকর্ষণে বাড়ীর দিকে ছুটিত। জল খাইয়া মলিনাদের বাড়ী গিয়া প্রথমতঃ সমস্ত দিন কে কি করিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ হইত, তার পর মলিনার কঠিন শাস্তি আরম্ভ হইত; কারণ মলিনা পাঠে বড় অমনোযোগী, আর বিশেষতঃ একটু বড় হইয়া বিনয়ের ছাত্রী হইয়া পড়িতে তার বিশেষ লজ্জা করিত। বিনয় কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, পড়া ঠিকমত দিতে না পারিলে

তিরস্কার ও অভিমানের জ্বালায় মলিনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত, তাই বেচারা শত অনিচ্ছা সত্বেও বিনয়কে সুখী করিবার জন্ত কষ্ট করিয়া দুপুরে পড়া মুখস্থ করিত। পরস্পরের পিতামাতা দুজনের এ ভাব লক্ষ্য করিতেন ও তাঁহারা পালটাঘর বলিয়া উভয় পক্ষই মনে মনে তাহাদের চিরবন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ কাহাকে মনোভাব প্রকাশ করিয়া জানান নাই। সেবার বাঁকুড়ায় ভয়ানক কলেরার প্রকোপে বিনয় এক দিনেই তার মাতাপিতা হারাইল ও অার পিসিমাকে লইয়া দেশে চলিয়া গেল। মলিনার পিতা, বিনয় এফ, এ পাশ করিলে তাহার সহিত মলিনার বিবাহ দিবেন এই মনে করিয়া কলিকাতায় বিনয়ের এফ, এ, পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মলিনার বয়স তখন ১২, বিনয় সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক। বিনয় যেবার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে সেইবার সেই কাল কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মলিনা ও মলিনার মাকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া মলিনার পিতা চলিয়া গেলেন। শ্রাদ্ধশান্তি সমাপন করিয়া যখন মলিনারা দেশে আসিল, তখন বিনয় কলিকাতায় পড়িতেছে, সে মলিনাকে এক হৃদয় বিদারক সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিল। মলিনা তার উত্তর দিল। তাদের মধ্যে এইরূপে পত্র লেখার সূত্রপাত হইল। দেশে ফিরিলে মলিনার মামা দেখিলেন ভগ্নীর হাতে তেমন পয়সা নাই, মলিনাও বিবাহ যোগ্যা—সুন্দরী কন্তা। তিনি গোপনে স্থানীয় বিপত্নীক জমিদারের সহিত মলিনার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিলেন। জমিদারের বয়স প্রায় চল্লিশ; তিনি মলিনার রূপ ও গুণ বর্ণনা শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত পাগল হইয়াছিলেন। মলিনার মামা ঘোর সংসারী, এই সুযোগে জমিদারের কাছে কিছু ঘটকালী আদায়ের সুবিধা দেখিয়া ও জমিদারকে জামাতা করিতে পারিলে চিরজীবনের জন্ত দেশে একটু ক্ষমতা ও প্রভুত্ব হইবে বুঝিয়া ভগ্নীকে এ বিবাহে সম্মত করিতে প্রয়াসী হইলেন। বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই মলিনার মা বলিলেন যে, বাবুর ও আমার ইচ্ছা ছিল যে বিনয়ের সহিত মলিনার বিবাহ দেই, তাহাদের দুটীতে বড় ভাব সুতরাং বিনয়ের আপত্তি না থাকিলে মলিনাকে তাহার হাতেই দিব। তাঁর দাদা এ বিবাহে ঘোর আপত্তি করিলেন, বলিলেন বিনয় মুরব্বী হীন, তার পিতা যা সামান্ত টাকা রাখিয়া গিয়াছেন তা তার কলিকাতায় পড়ার খরচেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, চাকরীতে কি হইবে সে পরের কথা। আর ততদিন মলিনাকে অবিবাহিতা রাখা যায় না। জমিদারের সঙ্গে বিবাহ হইলে টাকাত লাগিবেই না, অল্প খরচেই মলিনার বিবাহ হইয়া

যাইবে ও মলিনার মার একজন দেশে মুরুব্বী হইবে; মলিনাও রাণীর মত সুখে থাকিবে, বিশেষতঃ জমিদার বাবুর মলিনাকে বড় পছন্দ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের মন—কন্যা সুখে থাকিবে, জামাই বড়লোক হ'বে, অসময়ে তাঁর মুরুব্বীর কাজ করবে, এই সাত পাঁচ ভেবে মলিনার মা বিবাহে সম্মতি দিলেন। গোপনে দিন স্থির হয়ে গেল, বিবাহের দুই দিন আগে মলিনা তার অদৃষ্টের কথা জানিতে পারিল। সে লজ্জাশীলা, মাকে তার হৃদয়ের ব্যথা, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা জানাতে পারলে না, এমন একটী সঙ্গিনী নাই যাকে দিয়া মাকে সে কথা জানাতে পারে, কাজেই যুপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগশিশুর ন্যায় নীরবে সে তার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

নীরবে বিবাহ হইয়া গেল, সাত আট দিন পরে পিসিমার পত্রে বিনয় এ সংবাদ পাইল, তার কতদিনের সঞ্চিত আশা এক কথায় শেষ হইয়া গেল। বিনয়ের পরীক্ষার তখন প্রায় দুই মাস বাকী, তার উদ্যম, উৎসাহ অধ্যবসায় সব এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। শত চেষ্টা করিয়াও সে পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। বাল্যের, কৈশোরের কত দিনের কত স্মৃতি-ছবি নিশিদিন তার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠতে লাগলো। বিনয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল। শ্বশুর বাড়ীতে মলিনা সে সংবাদ পাইয়া একবার কাঁদিল, মনে মনে বলিল বিনয়ের পরীক্ষায় এ নিস্ফলতার জন্য সেই একমাত্র দায়ী, কিন্তু আর কোন উপায় নাই, নিদারুণ যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

বিনয় এফ, এ, পাশ না করিয়া আর দেশে ফিরিবে না পিসিমাকে লিখিল। কিন্তু প্রকৃত কারণ তা নয়, কি আশায় আর সে মাধবপুর গ্রামে যাইবে, সেখানে যাইয়া আর তার চির ঈপ্সিতকে দেখিতে পাইবে না। পরীক্ষার মাস দুই পূর্ব্বে দেশে একটা জমি লইয়া সরিকদের সহিত বড় গোলমাল বাধায় বাধ্য হইয়া বিনয়কে দিন কয়েকের জন্য দেশে আসিতে হইল ও সেইপথে আমরা তাকে বৃষ্টির জন্য মাধবপুরে মলিনাদের বাড়ী যাইতে দেখিয়াছি। পিসিমা সেকালের স্ত্রীলোকের ন্যায় পত্রে অশুভ সংবাদ লেখা খারাপ মনে করিয়া মলিনার স্বামীর মৃত্যুর কথা আর বিনয়কে জানান নাই, তাই সেদিন প্রথম মলিনাদের বাড়ীতেই সে সংবাদ সে জানিতে পারিল।

বিনয় সেদিন মুখ প্রক্ষালনের পর যে কার্য্যের জন্য বাড়ী আসিয়াছিল তাহার মিমাংসার্থে বাহির হইল, ফিরিয়া আসিয়া আহারান্তে মলিনাকে এক

পত্র লিখিতে বসিল। লিখিতে বসিয়া মনে মনে অনেক বাদানুবাদ করিয়া শেষ পত্র লেখাই স্থির হইল। বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে মলিনাদের বাড়ী গিয়া মলিনাকে একাকিনী পাইয়া তার হাতে পত্র দিয়া কাতর চাহনিতে পত্রের উত্তর দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল ও পরদিন বৈকালে উত্তরের জন্য আসিবে তাহাও জানাইয়া গেল।

বিনয় চলিয়া গেলে, মলিনা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিনয়ের পত্রখানি পড়িতে লাগিল; বিনয় লিখিয়াছে—

স্নেহের মলিনা,

তোমায় পত্র লিখছি, আমায় ক্ষমা করো, তোমার বিবাহের পর আর তোমায় পত্র লিখি নাই। মলিনা! জান কি, যেদিন পিসিমার পত্রে তোমার হঠাৎ বিবাহ হওয়া সংবাদ কলিকাতায় পেলুম, সে দিন আমার কি অবস্থা! বিনামেঘে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায়, আমারও তাহাই হইল, এ সংবাদ আমার পক্ষে যে স্বপ্নাতীত ও চিন্তাতীত। আমি হৃদয়ে যে দুরাশা পোষণ করিয়া প্রাণপণে তোমার উপযুক্ত হ'বার জন্য কলিকাতায় থেকে চেষ্টা করছিলুম; আমার সব চেষ্টা ভাসিয়া গেল, শত চেষ্টায়ও পড়ায় আর মনঃসংযোগ করতে পারলুম না, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হ'লুম। মনকে ক্রমশঃ স্থির করে—আবার পরীক্ষায় সফলকাম হ'বার চেষ্টা করছিলুম? হঠাৎ বাড়ী এসে এ কি শুনলুম, এ কি দেখলুম? কেন মলিনা, তুমি আমার হলে না? ভুলে গেছ কি, শৈশবে কৈশোরে আমাদের সেই অকৃত্রিম আবেগশূন্য কথা, বুক ভরা ভালবাসা? জানিনা তুমি আমায় কত ভালবাসতে, কিন্তু আমি যে আমার সব জীবনটা তোমাময় করে ফেলেছিলুম; কুক্ষণে মাতাপিতা হারালুম, অনাথ হ'লুম, আমারই দুরদৃষ্টে মেসোমশায় মারা গেলেন, নইলে তুমি আমারই হ'তে, আমি দেশে থাকলেও মাসীমার পায়ে হাতে পড়ে তোমায় পত্নীরূপে পাবার প্রয়াস পেতুম। এ নৈরাশ শেল যে হঠাৎ বুকে বাজলো! জানিনা মলিনা, তুমি এ বিবাহে সুখী হয়েছিলে কিনা, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে বিবাহিত জীবন ত ভোগ করতে পাও নাই। তার পর তোমার শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা শুনে আমার বুক ফেটে গেছে। চিরকল্যাণময়ী মলিনা আমার,—'ডাইনী'; কে কার ভবিতব্য খণ্ডাইতে পারে? সর্ব্বলক্ষণযুক্তা অন্য কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করলেও তোমার স্বামীর ঐদিনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল; এ কথা কেন তোমার শাশুড়ী বোঝেন না। থাক্ যা হ'বার তাত হয়ে গেছে, এই ভেবে

আমি মনকে প্রবোধ দিয়ে অনেকটা শান্ত করেছিলুম কিন্তু এখানে এসে অবধি আমার মন আবার ভয়ানক অশান্ত হয়েছে।

মাসিমা বুদ্ধিমতী রমণী, তিনি ত উচ্চ শিক্ষিতা, বাল-বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, কল্‌কাতায় ও অন্যান্য অনেক স্থানে খুব সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে এমন বিবাহ অনেক হয়েছে। যদি মাসিমার ও তোমার অমত না হয়, আমি পিসিমার মত করে তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। বল মলিনা, তুমি আমার হবে। বল মলিনা, আমার বাল্যের কৈশোরের সুখস্বপ্ন সফল হ'বে। মলিনা আমায় নৈরাশ করো না, একবার আমার হৃদয়ের দিকে চেও, তুমি আমার হ'লে আমি জীবনকে নূতন ভাবে গঠন করতে পারবো, আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার উপযুক্ত হ'বার চেষ্টা করবো। বল, তুমি আমার হ'বে?

মলিনা! যদি এ পত্রে কোন রকম অসঙ্গত কথা বলে থাকি, তোমার বাল্য-জীবনের, তোমার এতদিনের স্নেহের বিনয় মনে করে তাকে ক্ষমা করো।

তোমার পত্রের উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে, এই মনে করে যেন উত্তর দিও! আসি মলিনা,

তোমার চিরহতভাগ্য—বিনয়।

পত্র পড়িতে পড়িতে মলিনার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে, তার ইচ্ছা হ'ল পত্রখানি আবার পড়ে, কিন্তু কি জানি কি আশঙ্কায় সে চিত্ত দমন করিল। পত্রখানি লইয়া একবারে হৃদয়ে, একবার মাথায় ধারণ করিল, মনে মনে বলিল, তুমি দেবতা, তোমার এ চিত্তচাঞ্চল্য কেন? এ অভাগিনীর জন্য কেন তোমার নিষ্কলঙ্ক বংশে কালিমার রেখাঙ্কিত করিবে? রাত্রে মলিনা পত্রের উত্তর লিখিয়া রাখিল, সমস্ত রাত্রি তার নিদ্রা হয় নাই, কি এক মর্ম্মযাতনায় সে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট করিয়াছে।

পরদিন নির্দ্ধারিত সময়ে বিনয় মলিনাদের বাড়ী উপস্থিত হইল, তার হৃদয়, সন্দেহে দুরু দুরু কাঁপিতেছে, মলিনা কি স্বীকার হইবে, মাসিমা কি মত দিবেন, মলিনা কি পত্রের উত্তর দিবে ইত্যাদি নানা চিন্তায় সে বিভোর। বিনয়কে আসিতে দেখিয়া মলিনা তার উত্তরখানি লইয়া অন্যের অলক্ষিতে বিনয়ের হাতে দিল। বিনয় সেদিন খুব সংক্ষেপে মাসিমার ও বামী ঝির কথার উত্তর দিয়া তার একটা বিশেষ দরকারী কাজ আছে বলে বাড়ীর দিকে ছুটিল, রাস্তায় একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া সে মলিনার পত্র পড়িল, হতাশায় যেমন তার বুক ভাঙ্গিয়া গেল, তেমনি মলিনার পত্রে তার হৃদয়ের উচ্চ ও মহৎভাব দেখিয়া

আনন্দে তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। মলিনার প্রতি এক অভিনব ভক্তিতে তার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে বাড়ী গিয়া পত্রখানি শতবার পড়িল। যতবার পড়ে মলিনার প্রতি তার ভক্তি ততগুণ বৃদ্ধি পায়। মলিনা লিখিয়াছে :—

ভাই বিনয়,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। তোমরা পুরুষ, সাধারণতঃ ধৈর্য্যবান ও কষ্টসহিষ্ণু। বিশেষতঃ তুমি শিক্ষিত, তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া মনের এমন অবস্থা হইলে, সামান্য রমণী আমি কেমন করিয়া হৃদয় বাঁধিব? ভাই বিনয়, ঈশ্বরের যা অভিপ্রেত না, তার জন্য তুমি আমি চেষ্টা করিলে কি হইবে? যদি তোমার আমার বিধিলিপি নির্ব্বন্ধিত হইত তাহা হইলে মেসোমশায় ও পিতার অকাল-মৃত্যু হইত না। আর কেন ভাই, সেই স্বপ্নের কথা ভাবিয়া কষ্ট পাও, জীবন মরুভূমিময় কর! পতি বলে যাঁকে আমি বরণ করিয়াছিলাম, তিনিই আমার স্বামী, দেবতা, হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য, যদিও, অভাগিনী আমি, তাঁর বেশী দিন সেবা করিতে পাই নাই, তবুও তাঁর স্মৃতিতে আমার এই দুর্ব্বল মন মণ্ডিত করিয়া তাঁরই ধ্যানে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিব। বিনয়—ভাইটী আমার, তুমি কি সে পূজায়, সে ধ্যানে বাধা দিতে যাইবে? কখনও না, আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এ বিবাহে সুখী হয়েছিলুম কি না? তা বল্‌বার দিন আজ নয়, আর সে কথা তোমার জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। তুমি আমার শিক্ষাগুরু, কি শিখিয়েছিলে মনে নাই কি?" স্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা, তিনি ধনী হন, নির্ধন হন, রূপবান হ'ন, কুৎসিৎ হ'ন, বিদ্বান হ'ন মূর্খ হ'ন, রমণীর চক্ষে তিনি চিরপূজ্য। আমার স্বর্গীয় স্বামী অধিক বয়স্ক হ'লেও তিনি আমার হৃদয়ের দেবতা। শাশুড়ী আমাকে 'ডাইনি' ঠিকই বলেন, এ অভাগিনীর জন্যই তাঁর অকালমৃত্যু, সেজন্য তোমার দুঃখ করা উচিত হয় না।

ছিঃ বিনয়! বিধবা বিবাহের কথা মাকে বল্‌তে লিখেছ, যদি আমার মত হয়। তোমার কাছে শিক্ষিতা, তোমার স্নেহের মলিনার কি এরই মধ্যে এত অধঃপতন হয়েছে তোমার মনে হয়? না, না, ভাই সামান্য একটা প্রাণের সুখের জন্য স্বর্গীয় স্বামীর উচ্চবংশে, পিতার নিষ্কলঙ্ক নামে, আর তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ ভবিষ্যত জীবনে কালি মাখাইব? মলিনা এখনও এত নীচ, এত স্বার্থান্ধ হয় নাই।

তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব তোমার চিরস্নেহের মলিনাকে জানাইয়াছ

তাতে কোনও দোষ নাই। আমি রাগও করি নাই। তুমি ভাই, ভাইকে পত্র লিখিলে দোষ হয় না বলিয়া আজ এ পত্র লিখিতেছি, আশা করি তোমার স্নেহের মলিনার মনোভাব বুঝিয়া, কোন কষ্টের কথা, কোন দোষের কথা থাকিলে তাকে ক্ষমা করিবে।

শেষ ভিক্ষা, যদি তোমার বাল্যের, কৈশোরের, আদরের, স্নেহের মলিনাকে তুমি এখনও প্রকৃতই ভালবাস, তবে সে যাতে সুখী হয়, যাতে তার এই চিরদুঃখময় জীবনে সে একটু আনন্দ পায়, সে কাজ কি করবে না ভাই? আমার অনুরোধ তুমি এবার দ্বিগুণ উদ্যমে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবার চেষ্টা কর ও পাশ হ'লে একটি সৎবংশের সুন্দরী কন্যা বিবাহ করে সংসারী হও। তোমার স্নেহের মলিনা চিরদিনই তোমার স্নেহের ভগিনী থাকিবে। বল বিনয়, আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিবে কি না?

বিনয়! আমি রমণী, দুর্ব্বলা, অভিভাবক শূন্যা; তুমি আমার ভাই, আমি কুপথগামিনী হ'লে, তুমি আমায় রক্ষা করবে, সুপথ দেখিয়ে দিবে, আর বেশী কিছু বল্‌তে হ'বে কি ভাই?

আসি ভাই, মনে কিছু করোনা, রাগ করোনা, যে স্নেহ এখন পাচ্ছি—যেন তাতে কখনও বঞ্চিত করোনা।

তোমার স্নেহের ভগিনী—মলিনা।

বিনয় দেখিল পত্রখানি অশ্রুসিক্ত। মাঝে মাঝে অক্ষর সব মুছে গেছে, বোধহয় লেখিকার চক্ষু পত্র লিখিতে লিখিতে একবারও অশ্রু শূন্য হয় নাই। বিনয় পত্রখানি এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে কোনরূপ পদস্খলন হইতে অক্ষয় কবচের ন্যায় রক্ষা করিবে মনে করিয়া বড় যত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া দিল।

এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, বিনয় সম্মানের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, কর্ম্ম স্থলে তার পিতা মাতার আকস্মিক মৃত্যু হেতু সে অনাথ হইয়াছিল ও পিতার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়া সে এখন নিঃস্ব ও নিরুপায়—এই কথা বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে, মহামান্য সরকার বাহাদুর বিনয়কে উপযুক্ত দেখিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করিলেন।

সেই বৎসরই বিনয় তাহার দেশের সরকারী উকিলের সুশীলা ও সুন্দরী কন্যা সরযুর পাণিগ্রহণ করিল। বিনয় এখন বড় সুখী, কারণ সে উচ্চ রাজপদে সম্মানিত হইয়াছে, আর পাইয়াছে সরযুর ন্যায় আদর্শ পত্নী। কিন্তু তার এই

সুখের জন্ম সে যে মলিনার কাছে চিরঋণী তা সে কখনও বিস্মৃত হয় নাই। বিবাহের দুই বৎসর পরে সরযু স্বামীর বুকভরা ভালবাসার বিনিময়ে বিনয়কে একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কমনীয় পুত্ররত্ন উপঢৌকন দিয়াছে, তারই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিনয় দেড় মাসের ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছে।

অন্নপ্রাশনে খুব ধুমধাম, দেশের সব কুটুম্বরা আসিয়াছে, মলিনা কাজের দুই দিন পূর্ব্বে আসিয়া খুব খাটিতেছে, আর একটু অবকাশ পাইলেই সে খোকাকে লইয়া দুধ খাওয়াইতেছে, তার গা পরিষ্কার করিয়া পোষাক গহনা পরাইয়া চুম্বনে চুম্বনে তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে; সরযূ তাই দেখিয়া মাঝে মাঝে মলিনাকে বলিতেছে দিদি, খোকাকে তোমার কাছে রেখে যাব, নইলে এত আদর ত আমি ওকে করতে পারব না। সংসার দেখ্‌বো না ওকে তোমার মত আদর করবো। দিদি উনি তোমার কথা রাত দিন বলেন, আমায় বলেছিলেন যে দেশে গলে দেখ্‌বে, কেমন তোমার মলিনা দিদি, তা তোমায় দেখে, তোমার কাছে এই দু'দিন থেকে, তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না দিদি। মলিনা সরযূর অকৃত্রিম স্নেহ, সরলতা মাখান কথাগুলি শুনিয়া মোহিত হইয়া গেল, কিন্তু সরযুর মুখে বিনয়ের নামটা শুনিয়া ও বিনয় তার কথা এখনও রাত দিন বলে জানিয়া তার হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরের একটা বহুদিনের সুষুপ্ত ব্যথা যেন সাড়া দিয়া উঠিল। সে সরযুকে বলিল বৌ, তোমার বরটী ভাল, তাই সে সবারই প্রসংশা করে, তা বিনয়দাকে বলো সে যদি রাজী হয় ত খোকাকে আমি রাখ্‌তে খুব সম্মত আছি, কিন্তু ভাই মুখে ত বলছো, তুমিই বুঝি খোকাকে ছেড়ে থাকৃতে পারবে? যাক্ যে কয়দিন তোমরা আছ আমি মাঝে মাঝে আস্‌বো, ওকে চুমো খেয়ে খেয়ে বিরক্ত করব। তোমরা ভাই রোজ খেতে পাবে। আমার সময় অল্প, ক্ষুধাও বেশী, তাই উপবাসী রোগীর মত ব্যবহার করি, কিছু মনে করো না। সরযূ দেখিল স্বামী যা বলেন সত্য, এ রমণী দেবী, নইলে পরের ছেলেকে এত শীঘ্র এত ভালবাসে এত আদর করে, মলিনার প্রতি ভক্তি ভালবাসায় তার মন ভরিয়া গেল।

বিনয় কোনও না কোন কাজের জন্ম বাড়ীর ভিতর যখনই আসে, তখনই মলিনাকে খোকাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকৃতে দেখে, আর মাঝে মাঝে তার চুম্বনের অত্যাচারটাও লক্ষ্য করে যায়। বিনয় যদি বলে মলিনা বাড়ীতে এত লোক আছে, কেন ছেলেটাকে টেনে টেনে বেড়াচ্ছো, দাওনা আর কাউকে।

অমনি মলিনা তার প্রশান্ত নয়নদুটি তুলিয়া বিনয়ের দিকে চায়, আর সেই পলকবিহীন সুনীল সজল আঁখি দুটী নীরব ভাষায় তাদের অতীত জীবনের নির্ম্মম কাহিনী ব্যক্ত করে।

এত সুখেও বিনয় কেমন একটু অন্যমনস্ক, যেন কোন অব্যক্ত ব্যথায় কাতর। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে যখন বাড়ীর সবাই কাঙ্গালী ভোজনে ব্যস্ত, তখন কাঙ্গালী বিদায়ের পয়সা নেবার জন্য বিনয় তার শয়ন কক্ষে হঠাৎ প্রবেশ করিতে গিয়া দেখে যে মলিনা খোকাকে কোলে করিয়া একবার একবার তাকে চুমো খাচ্ছে, আর এক একবার দেওয়ালে অবলম্বিত বিনয়ের ছায়া-চিত্রের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। বিনয় কক্ষে প্রবেশ করিতেই মলিনা যেন কেমন হইয়া গেল, তার চোখের দিকে চাহিয়া বিনয় দেখে যে আঁখি দুটী অশ্রুপূর্ণ। বিনয় জিজ্ঞাসা করিল মলিনা এ কি! মলিনা উত্তরে বলিল, না চোখে কি পড়েছে, আর খোকা কাঁদ্‌ছিলো বলে তাকে ভোলাবার জন্য এ ঘরে নিয়ে এসে তোমার ছবি দেখাচ্ছি। এই বলে তাড়াতাড়ি ঘর হ'তে বাহির হয়ে গেল। বিনয় মলিনার বুকের ভিতরটার কোন স্থানে ব্যথা আছে বুঝ্‌তে পারলে।

অন্নপ্রাশনের পরদিনই মলিনা বাড়ী ফিরে গেল, সরযূ আর দু'দিন থাকবার জন্য শত অনুরোধ করলেও মলিনা শুন্‌লে না, বিনয় কি জানি কেন অনুরোধ করতে সাহস করলে না।

ইহার দশ দিন পরে বিনয় খবর পেলে যে চারি দিন হ'ল মলিনার বড় জ্বর হয়েছে, জ্বর ছাড়ছে না, আর সেই দিন হ'তে রোগী প্রলাপের মত বক্‌ছে। সংবাদ পেয়েই বিনয় মাধবপুর গেল, গিয়ে রোগীর অবস্থা দেখে অবাক্। মলিনার তখন পূর্ণ বিকার। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, চারি দিনের জ্বরে যে এমন চেহারা হয় তা বিনয় হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারলে না, দেশের মধ্যে যিনি বড় ডাক্তার তিনি প্রায় দুই ক্রোশ দূরে থাকেন, বিনয় তখনই তাকে আন্‌তে লোক পাঠালে ও মাসিমাকে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করে একটু জলযোগ করবার জন্য উঠিয়ে দিয়ে রোগিণীর কাছে নিজে বসিল।

ঘণ্টা দুই পরে মলিনার ক্ষণিকের জন্য সংজ্ঞা ফিরিয়াছে, সে চক্ষু উন্মীলন করে বিনয়কে সামনে বসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'এই যে বিনয় তুমি এসেছ' এই মাত্র তন্দ্রাঘোরে দেখছিলুম যেন তুমি এসেছ, কৈ খোকাকে ত আন নাই, আন—বিনয় খোকাকে আন, যাবার আগে একবার তাকে চুমো খেয়ে যাই। বিনয় তুমি লক্ষ্য করে দেখেছ কি না জানি না, খোকা যেন ঠিক

ছোট্ট তুমি। আনাও বিনয়, তাকে একবার আনাও। বিনয় তখনি একজন লোককে খোকাকে আন্‌তে পাঠাইয়া দিল।

এমন সময় ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মলিনার মাও ঘরে আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লেন যে জ্বরের পূর্ব্বে অত্যধিক মানসিক চিন্তা ও মানসিক কষ্ট হেতু মলিনার মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছিল, তাহার উপর প্রবল জ্বর হওয়ায় অত্যধিক মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া ঠিকমত হইতেছে না। পরে বিনয়কে গোপনে বলিলেন যে রোগিণীর জীবনের আশা বড় কম, এমন কি রাত্রি কাটিবে কি না সন্দেহ।

ভিজিটের টাকা দিতে গৃহিণী উঠিয়া গেলে বিনয় মলিনাকে কি মানসিক চিন্তায় সে শরীরপাত করিয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলে, মলিনা করুণ নয়নে সে সব কথা উত্থাপন করিতে নিষেধ করিল, বলিল—"বিনয় মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আত্মাকে আর ক্লেশময় করিও না, যে সকল বিষয় বিস্মৃতি-সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে তার আলোচনায় আর ফল কি, আমায় ক্ষমা কর। কই খোকা কই—ঠিক এমনি সময়ে সরযূ ও খোকা ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ খোকাকে দেখিয়া মলিনার হৃদয়চাঞ্চল্য হইয়াছিল। তার উপর দুর্ব্বল শরীরে জোর করিয়া উঠিয়া তাকে কোলে করিতে গিয়া সে যেন কেমন ধারা হইয়া গেল, তবু সে খোকাকে ধরিয়া চুমো খাইতেছে। সরযূ খোকাকে সরাইয়া পাখা হস্তে মলিনাকে বাতাস করিতে যাইয়া দেখে—মলিনার চোখে মুখে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে কাঁদিয়া উঠিল—অমনি গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া দেখেন মলিনার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যেন খোকাকে চুম্বন করিবার জন্যই মলিনা জোর করিয়া তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

প্রতিজ্ঞাপালন।

(১)

প্রফুল্ল বাবু বাটীতে পা দিতে না দিতেই প্রমীলা বলিল—"হ্যাঁ গো তুমি কি দিব্বি ক'রেছ যে বিমলীর বের চেষ্টা কর্‌বে না? পাঁচজনের পাঁচ কথা আর যে সহ্য হয় না, বিষ খেয়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে—তোমার জন্যে!"

"আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ, তোমার জন্যে ! তুমি মেয়েটার বের চেষ্টা কর্‌বে না, আর লোকে বলে—"ওরা ব্রাহ্ম !"

"আমি কি আর ইচ্ছে করে কর্‌ছি না প্রমীলা ? কিন্তু কি করি বল—আজ কালকার বাজারে একটা মেয়ের বে দিতে গেলে অন্ততঃ তিনটী হাজার টাকার দরকার ! অত টাকা এখন পাই কোত্থেকে ?" প্রমীলা শ্লেষের ভরে বলিল— "ঘোড় দৌড়ের বাজির বেলা ত বেশ টাকা বেরোয়।"

এই শেষ কথাটায় প্রফুল্লবাবু মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ঘোড়দৌড়ে টাকা দেন—সে কি জন্ম ? লাভের আশায় নয় কি ?—আর প্রমীলা কিনা সেই কথা তুলিয়া খোঁটা দিল ! তিনি ভাবিলেন—ওঃ। দুঃসময়ে স্ত্রীর কাছেও সহৃদয়তা দুষ্প্রাপ্য।" ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলেন—যতদিন না কন্তার বিবাহের একটা উপায় করিতে পারেন ততদিন আর গৃহে ফিরিবেন না ! এই ঘটনার পরদিবস হইতে প্রফুল্ল বাবু বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন !

(২)

গৃহত্যাগ করিয়া প্রফুল্লবাবু চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলেন। যে কয়টা টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা এ কয়দিনে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ! অথচ চাকরীর কোনও সন্ধান মিলিল না ! সে দিন শনিবার। প্রফুল্লবাবু বিমর্ষচিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে গড়ের মাঠের দিকে গেলেন। তখন ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্লবাবুর খেলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু টাকা কোথায় ? তিনি দীনভাবে মাঠের একধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রফুল্লবাবুর বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ দূর হইতে ইহা দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন—"প্রফুল্ল তুমি 'রেস্' খেল্‌ছ না ?"

"তুমি কি জানমা, রেস্ খেলায় আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। অধিকন্তু বাজারে অনেক টাকা দেনা হইয়াছে।"

"জানি। কিন্তু তোমার কি খেল্‌তে ইচ্ছেও হচ্ছে না ?"

"তা হ'লেও অর্থাভাবে সে ইচ্ছেকে দমন ক'রে রেখেছি।"

"তুমি খেল, আমি টাকা দিচ্ছি।"

"আর কেন ভাই আমাকে দেনায় ডুবাও ?"

"এ টাকা যদি কখনও পার শোধ ক'র, নয়ত এ আর শোধ কর্‌তে হবে না।"

পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুরোধ সহকারে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ঐ টাকা পাঠান, ইহা প্রমীলা যেন কোনক্রমে জানিতে না পারে।'

(৫)

এদিকে প্রফুল্লবাবু চলিয়া আসিবার পর প্রমীলার মনে হইল—'হায় কি সর্ব্বনাশ করিলাম—নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিলাম।' সে কত খোঁজ করিল, কিন্তু কোনও সন্ধান পাইল না। অবশেষে দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রফুল্ল বাবুর খোঁজ করিতে অনুরোধ করিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল—"আমি কোন সন্ধান পাই নাই।" দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়া পাঠাইল প্রফুল্ল বাটীতে না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের যাহাতে সংসার চলে, সে তাহার ব্যবস্থা করিবে। এবং তাহাদের খরচ বাবদ মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে লাগিল।

প্রমীলা নিঃসহায়া শুনিয়া অনুজ অভয়চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অভয়চন্দ্র আধুনিক ভ্রাতৃপদের অযোগ্য!—কারণ সে টাকার লোভে আসে নাই—রক্তের টানে আসিয়াছে! সে বিমলার বিবাহের জন্ত প্রাণপণে পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল—তথাপি অল্প মূল্যে পাত্র জুটিল না।

তবে পাত্র যে একেবারে জুটে নাই, তাহা নহে। তিনটী পাত্র জুটিয়াছিল —কিন্তু তাহাদের গুণকাহিনী শুনিয়া অভয়চন্দ্র ও প্রমীলা তাহাদের হস্তে স্নেহের পুতুলী বিমলাকে সমর্পণ করিল না। প্রথমটির বার দুই তিন বিবাহ হইয়াছিল—দ্বিতীয়টির একটি পত্নী ছিল—কিন্তু স্বামীর গুণে সে আত্মহত্যা করিয়াছে! তৃতীয়টি শিবতুল্য;—তাহার জাতিকুলের সন্ধান কেহ রাখে না, —বয়সে সে বড়, কি শিব বড় তাহা ঠিক করিয়া বলা দুঃসাধ্য। তবে দাঁত দেখিয়া বয়স ঠিক করিতে হইলে ইহাকে শিশু বলিতে হইবে! শিবের সকল নেশাই সে বজায় রাখিয়াছে—তবে তাহার বরাতে দক্ষ কন্যা জুটে নাই বলিয়া আজিও সমাজে মিশিতে পারে নাই।

(৬)

একদিন হরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী কমলিনী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দেখ, এই নতুন ম্যানেজার বাবুর নাম কি বলে—প্রফুল্লচন্দ্র বসু?—এঁর বাড়ী কি 'জোড়াসাঁকোয়?

"হ্যাঁ—কেন বল দেখি?"

"এঁকে চেন ?"

"না।"

"এর মধ্যে ভুলে গেলে ? সেই আমরা যখন কলিকাতায় ছিলুম, তখন আমাদের পাশে একজনদের একটী বেশ সুন্দর মেয়ে ছিল,—তার নাম বিমলা না ? সেই আমি বলতুম্—বড় হ'লে মেয়েটির সঙ্গে নরুর বে দেব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আচ্ছা, তা' হ'লে তার সঙ্গে নরুর বে দিলে হয় না ?—বৌটিও ভাল হয়, আর ভদ্রলোকও বেঁচে যান।"

"বেশ ত ; তুমি তা' হ'লে একবার বলে দেখ।"

সেদিন বৈঠকখানায় বসিয়া প্রফুল্লবাবু কি লিখিতেছিলেন, এমন সময় একটি পরিচারিকা আসিয়া বলিল—"আপনাকে বাবু একবার কি জন্যে ডাকছেন।" প্রফুল্লবাবু তাড়াতাড়ি কলমটি রাখিয়া পরিচারিকার সহিত উপরে গেলেন। হরেন্দ্রবাবু প্রফুল্লবাবুকে বিছানার উপর বসিতে বলিলেন। প্রফুল্লবাবু বসিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। তারপর হরেন্দ্রবাবু ধীর গম্ভীরভাবে বলিলেন—দেখুন আপনার কাছে আমার একটি কথা আছে।"

প্রফুল্লবাবু কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"আপনার কোন কাজ কর্‌তে পার্‌লে আমি নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান ক'রব।"

"আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার মেয়েটির সঙ্গে নরুর বে দি।"

প্রফুল্লবাবু স্বপ্নেও কখন এ কথা ভাবেন নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন —"ভগবান এমন দিন কি দেবেন!" তারপর হরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন— "আপনি কি এত অনুগ্রহ কর্‌বেন ?"

"এতে আর অনুগ্রহ কি ? আপনিও কায়স্থ, আমিও কায়স্থ। আপনার মেয়েটি, সে দিন বল্লেন দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল—তাই তাকে পুত্রবধূ করতে ইচ্ছা হয়েছে, আর যদি বলেন অনুগ্রহ—তাহলে সেটা কোন পক্ষ থেকে হয় একবার ভাল করে ভেবে দেখুন,—আপনি মেয়েটি দেবেন, আমি নেব— এতে ত আপনার মহত্ব বেশী। সে যাই হ'ক ২২শে ব'শেখ ভাল দিন আছে —সেদিন, আপনার কি মত ?"

"তা—আমি গরীব, আমার ত কিছু দেবার সামর্থ্য নাই।"

"আমাদের বংশে কেহ কখনও ছেলে বেচেনি।"

"আপনি কোত্থেকে বে দেবেন ?"

"কলিকাতা থেকে। একটা ভাল দিন দেখে সকলে এক সঙ্গে কলিকাতা

গেলে ভাল হয় না ? আপনি তাহলে বাড়ী গিয়ে উদ্যোগ করতে পারবেন ? হ্যাঁ ! ভাল কথা, দেখুন, আপনার কোন বন্ধুকে লিখলে আমার জন্যে একটা বাড়ী ঠিক করে রাখতে পারেন না ?”

হ্যাঁ কেন পারবে না—?—আমি আজই পত্র লিখে দিচ্ছি।”

হরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া প্রফুল্ল বাবু মনে মনে বলিলেন, হায় বঙ্গ সমাজ ! সবাই যদি হরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সহৃদয় হ'ত তা হ'লে সমাজের এ অধঃপতন হইত না। কন্যাদায়েও লোকে সর্ব্বশান্ত হইত না।

প্রফুল্লবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও কলেজ-ষ্ট্রীটের উপর একটি বাড়ী ঠিক করিয়া যথাসময়ে প্রফুল্ল বাবুর পত্রের উত্তর দিল।

* * * * *

৬ই বৈশাখ রবিবার। শুভক্ষণে প্রফুল্ল বাবু ও সপরিবারে হরেন্দ্র বাবু কলিকাতা রওনা হইলেন। ট্রেণ যথাসময়ে হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। প্রফুল্ল বাবু গাড়ী ঠিক করিয়া হরেন্দ্র বাবুদের তুলিয়া দিলেন।

(৮)

সোমবার বেলা ১০টা। প্রমীলা রাঁধিতেছিল। তাহার মনে হইল যেন একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট থামিল। সে বিমলাকে বলিল—বিমলী ! তারার মাকে একবার বেরিয়ে দেখতে বল ত—একখানা গাড়ী এসে আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে থাম্‌লো বলে মনে হ'ল।

তারার মা প্রফুল্ল বাবুদের বাড়ীর বৃদ্ধা দাসী। সে প্রফুল্ল বাবুর বাপের আমল থেকে আছে। তাই সকলে তাহাকে ভয় করিত। বিমলা তাহাকে প্রফুল্ল বাবুর ভগিনীর পদে স্থাপনা করিয়াছিল। মাতার আদেশে বিমলা তারার মাকে গিয়া বলিল—“পিসী, দেখতো গা—মা বল্লেন, আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে যেন একখানা গাড়ী থাম্‌লো !”

তারার মা নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—“তোর মার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—কোথায় কার গাড়ী থামলো তাই নিয়েই ব্যস্ত। ও আর দেখবো কি ? ওই বেনেদের বাড়ীতে কেউ এসেছে বুঝি।”

অগত্যা বিমলা ফিরিল। এমন সময়ে অভয় উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—“বিমলা, বিমলা, দিদি কোথায় রে ?” প্রমীলা পাক করিতেছিল, সসব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রমীলা ভ্রাতার চীৎকার শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইল—কিন্তু

অবিলম্বে সে বিস্ময় দূরীভূত হইল। সে দেখিল—অভয়চন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিতেছে এবং তাহার পশ্চাতে—ইনি কে? এ যে প্রফুল্ল বাবু!

প্রমীলা আর অবাধ্য চোখের জলকে সংযত করিতে পারিল না। তাহার চক্ষে অশ্রু টলমল করিয়া উঠিয়াই কপোল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। অভয়চন্দ্র বলিল—"তার পর, এই এক বছর কোথায় ছিলেন?"

"মির্জ্জাপুরে।"

"আজ কি তা হলে মির্জ্জাপুর থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বোধ হয় কাল সকাল থেকে খাওয়া হয়নি?"

"না, তবে পথে কিছু জল খেয়েছিলুম।"

"তবে শিগ্‌গীর চলুন, নেয়ে এসে দুটি খেয়ে নিন; তারপর সব শোনা যাবে।"

বিমলা হতবুদ্ধি হইয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল,—সে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ছুটিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে আসন তেল ও গামছা আনিয়া দিল। প্রফুল্লবাবু ও অভয়চন্দ্র স্নানান্তে আহারে বসিলেন। এমন সময়ে তারার মা আসিয়া বলিল—হ্যাঁ গো দাদা বাবু, এতদিন কোথায় ছিলে বল দেখি? একখানা পত্তোর লিখেও কি খোজ করতে নেই?"

"আমি বিমলার বে'র চেষ্টায় গেছলুম।"

"তা—কয়টা বর নিয়ে এলে?"

"কেন বিমলার বে'র ত সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে, এই ২২শে ত বের দিন স্থির হয়েছে।"

প্রমীলা রান্নাঘরে ছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া সেইখানে বসিল। বিমলা ইতিমধ্যে নারী-স্বভাব সুলভ লজ্জা বশতঃ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। অভয়-চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—'কৈ কোথায় বের ঠিক হয়েছে?"

প্রফুল্ল বাবু, পাওনাদারের দেনা শোধ, হরেন্দ্র বাবুর ষ্টেটে ম্যানেজারী পদ-প্রাপ্তি, হরেন বাবুর পুত্র নরুর সহিত বিমলার বিবাহের বন্দোবস্ত প্রভৃতি একে একে সমস্ত বলিতে লাগিলেন। প্রমীলা শুনিয়া বলিল—"আচ্ছা জমিদার হরেন্দ্রনাথ মিত্র!—এঁরা না আমাদের পাশের বাড়ীতে ছিলেন? তাঁর স্ত্রী না বলেছিল, বিমলার সঙ্গে তার মেজ ছেলের বে দেবেন?"

প্রফুল্ল বাবুর মনে পুর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—হ্যাঁ তাই ত! বিধির বিধান কে খণ্ডন করবে।"

(৯)

২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার মহা সমারোহে বিমলার বিবাহ হইয়া গেল। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধে পরিণত হইল! বাস্তবিক কি হরেন্দ্রবাবু প্রফুল্ল বাবুকে ভৃত্যের চক্ষে দেখিতেন। না! তা কখনই নয়! তিনি প্রফুল্ল বাবুর সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন যে নূতন কোন ব্যক্তি বলিবে—ইহারা পরস্পরে অকাট্য বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ।

*   *   *   *   *

আজ প্রাতে বিমলা শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁরে বিমলা, তোর শ্বশুরেরা যে এখানে ছিল, এ কথা তাদের মনে আছে?

বিমলা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বলিল—"হ্যাঁ, আমার শাশুড়ীর একান্ত—" বিমলা কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ পশ্চাতে প্রফুল্ল বাবুকে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রফুল্ল বাবু অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি প্রমীলাকে বলিলেন—"আচ্ছা, তা হলে হরেন বাবু সে কথা আমায় বল্লেন না কেন বল দেখি?

"বোধ হয় তুমি তাঁকে চিন্‌তে পারলে কুণ্ঠিত হতে বলে বলেন নি। কিন্তু কমলিনী মুখে যা বলেছিলেন কাজেও তাই করলেন। অমন উঁচু মন না হ'লে চিরকালটা কি অমন সুখে কাটাতে পারে?

শ্রীপ্রবোধলাল ঘোষ

—o—

বুদ্ধির ভুল।

(১)

ঘর্ম্মাক্ত প্রফুল্ল পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে কহিল, "আজকার খেলাটা জমেছিল ভাল। স্কুল টীম্‌কে দুটো গোল দিয়েছি, আরও কিছুক্ষণ খেলা হলে আরও চাপান যেত। কিন্তু—বলি হরেন্, তোর আজ কি হয়েছে রে। দু একটা কিক্ মেরেই তুই ফুটবল ছেড়ে দিলি,

টেনিসও খেললি না। অন্য দিন তোর মুখ দিয়ে কবিতার স্রোত ছোটে, আজ একটিও কথা কচ্ছিস্ না কেন, বল্‌না।"

হরেন্দ্র কোন কথা কহিল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেন্, অসুখ করেছে ?"

হরেন উত্তর করিল "না।"

প্রফুল্ল কহিল, "তবে কি হয়েছে বল্। বোধ হচ্ছে একটা গুরুতর কিছু যেন হয়েছে।"

হরেন্দ্র খানিক চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, "বলছি। একটু ফাঁকা জায়গায় চল্।"

আমরা তিন পুরাতন বন্ধু ও সহপাঠী—তখন কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে এফ্‌্এ ক্লাসে অধ্যয়ন করি। সে দিন বৈকালে কলেজ-মাঠে ফুটবলাদি ক্রীড়া-নান্তর সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিতেছিলাম। প্রফুল্ল ঠিক ধরিয়াছিল—হরেনকে আজ কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক বোধ হইতেছিল।

আমি পশ্চাতে দেখিয়া বলিলাম, "পেছনে আর এক দল আসছে; এখানে হবে না। চল্, সোজা পার্কে যাওয়া যাক্। সেখানে নির্ব্বিবাদ হরেনের অত্যন্ত গোপনীয় কথাটা শোনা যাবে, একটু বিশ্রামও করা যাবে।"

অতঃপর আমরা তিন জন পার্ক অভিমুখে চলিলাম। প্রফুল্ল আগামী শনিবারের ম্যাচের বিষয় বলিতে বলিতে চলিল।

পার্কে পৌছিয়া আমরা একটি নির্জ্জন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় ঘাসের উপর উপবেশন করিলাম। নিকটে কোন লোক ছিল না।

প্রফুল্ল বসিয়া হরেনের দিকে তাকাইয়া বলিল, "এখন তোর রহস্য-যবনিকা উদ্‌ঘাটন কর দেখি।"

হরেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পকেট হইতে রুমালখানি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল বলিল, "আরম্ভ কর্।"। 'একদা—'

হরেন বলিল, "ঠাট্টা করলে আমি বলব না। আমাকে বিরক্ত করিস না, আমার মন ভাল নাই।"

প্রফুল্ল অমনি বলিয়া উঠিল, "মন ভাল নাই! মনে কি হয়েছে? ঘুণ ধরেছে নাকি?"

আমি প্রফুল্লকে বাধা দিয়া কহিলাম,, "চুপ কর্ প্রফুল্ল। তুই আর একটি কথাও কইতে পারবি না। হরেন, বল্।"

হরেন বলিল, "আচ্ছা, তোরা হাসতে পারবি না। হাসলে আমার খুব কষ্ট হবে।"

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আর হাসিবে না, বরং মুখ ভার করিয়া থাকিবে।

হরেন বলিতে আরম্ভ করিল, আজ ভোরে আমি গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলাম—"

প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ওঃ হো, গঙ্গাস্নান! গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলি! রাত্রে মুর্গী টুর্গী খেয়েছিলি না কি ?"

মুর্গী খাওয়াটা অবশ্য মিথ্যা কথা। হরেনের দোষের মধ্যে এই যে বেচারী সাঁতার জানিত না। এজন্য গঙ্গাস্নান করিতে বড় একটা যাইত না।

আমি প্রফুল্লের প্রতি এক বিষম ভ্রূকুটি ও বিরক্তিসূচক এক দীর্ঘ "উ" করিলে সে চুপ করিল, তাহার হাসি থামিল।

তখন হরেন বলিতে লাগিল, "ভোর বেলায় গঙ্গাতীরে কি এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে তা বর্ণনা করা যায় না। মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ, মন্দ মন্দ শীতল বায়ু—"

প্রফুল্ল। নর্দ্দমার সুগন্ধ। আহা! কি কবিত্বপূর্ণ দৃশ্যই এঁকেছিস্—

আমি। প্রফুল্ল, তুই চুপ করবি কিনা বল্?

প্রফুল্ল। হরেন-কবির পাগলামি দেখলে আমি চুপ করে থাকতে পারি না। আমি পারত পক্ষে আর টু শব্দও করব না। কিন্তু তুই ভূমিকা ছেড়ে আসল কথা আরম্ভ কর দেখি।

হরেন। আমি ঘাটে নামব, এমন সময় দেখি যে স্নান করে একটি মেয়ে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাড়ী ফিরছে। জানিনা কি মনে করে বালিকাটি একবার আমার দিকে তাকাল। যখন আমাদের চারি চক্ষু মিলিল, তখন আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুদ্বেগে কি একটা আনন্দস্রোত ব'য়ে গেল তা বলতে পারি না। আমি সেই মুহূর্ত্তে তাকে ভাল বাসিলাম।"

প্রফুল্ল লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "লভ্! রোমান্স! প্রেম! যা বলেছি তাই! বাহবা হরেন, তুই ধন্য। তারপর তারপর।"

হরেন। তারা কোন্ বাড়ীতে থাকে, তাও আমি জানতে পেরেছি।"

প্রফুল্ল। বস্, তবে আর কি, একদিন রুক্মিণী হরণ কর।

আমি। তাদের বাড়ী কেমন করে জান্‌তে পারলি?

হরেন। আমি স্নান করে কালিতলা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি যে তারাও কালীপূজা দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় নিকটেইএক বাড়ীতে ঢুকল।

প্রফুল্ল। আর ভাবনা কি? ওরে, তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন—

আমি প্রফুল্লকে বাধা দিয়া বলিলাম, "চুপ্। দেখ হরেন, পীরিতি বড় বালাই। ও সব পাগলামি ছেড়ে দে—"

প্রফুল্ল কহিল, "যাই বলিস্, আমার কিন্তু হরেনের সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আহা! বেচারার প্রথম ভালবাসা! প্রেম করবার মত বয়সও হয়েছে—"

হরেন বিরক্তি স্বরে বলিল, "আহা থাম্, তোর বক্তৃতায় কাজ নেই। ভালবাসা প্রেম, কি সব বক্‌ছিস্? তারা আমাদের পালটী ঘর, তাও জেনেছি, আমাদের দেশের লোক; মাসীমাকে চেনে। আজ আমি যখন কলেজে, তখন তারা আমাদের বাড়ী এসেছিল। মেয়ের মা আমাকে অনেকবার দেখেছে।"

আমি। বটে! এতদুর গড়িয়েছে? 'লভ' আর কি? বিয়ে করে ফেল। বলিস ত, কালই আমরা সম্বন্ধ উপস্থিত করি।

হরেন। না, এত তাড়াতাড়ি করলে সন্দেহ হবে। ওরা সে দিন মাত্র কাশীতে এসেছে। কিন্তু—কিন্তু—আমি সেই মুখখানি—আমি মেয়েটিকে আর একবার না দেখলে—

প্রফুল্ল। পাগল হবি। অতি সঙ্গত কথা। কিন্তু তার জন্য ভাবনা কি? যখন তোদের বাড়ী যাবে, তখন মনপ্রাণ ভরে দেখিস্।

হরেন। তাও কি হয়! আর তারা দুপুর না হলে আসে না। তখন আমি কলেজে থাকি। রবিবার বহু দূরে,—চা—র দিন।

আমি। তবে কলেজ পালাও।

অতএব স্থির হইল যে, হরেন পর দিন বারটার সময় কলেজ হইতে পালাইবে।

(২)

পরদিবস হরেন বেলা বারটার সময় কলেজ হইতে যথানিয়মে প্রস্থান করিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! সেদিন মেয়েটি তাহাদের বাড়ী আসিল না। বৈকালে

যখন হরেন্দ্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তখন দেখি যে প্রণয়ের সমস্ত লক্ষণ তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা প্রেমিককে নানাবিধ সান্ত্বনা দিলাম। প্রফুল্ল বলিল, শীঘ্রই সম্বন্ধ উপস্থিত করব, বিয়ে ত হবেই। তবে এত চিন্তা কেন? দেখতে চাস্! একটা কাজ করলে দেখ্‌তে পারিস্।"

হরেন আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

প্রফুল্ল। হরিনামের মালা গলায় দিয়ে, তিলক কেটে, নামাবলী গায়ে দিয়ে গণৎকার সেজে তোর প্রণয়িনীর বাড়ী যাবি, তার হাত দেখে বলবি, 'তোমার জন্ম এক যুবক উন্মত্তপ্রায় হয়েছে'। এই বলে কোর্টসিপ আরম্ভ করবি। শেষে তার হাতে একটা চুমো খেয়ে চলে আসিস্।

হরেন। যা। কি ঠাট্টাই করছিস্।

প্রফুল্ল। ঠাট্টা নয়। আমার আইডিয়াটা বল্‌লাম। এতে আপত্তিটা কি?

আমি। আইডিয়াটা মন্দ নয়, রোমাণ্টিক বটে। কিন্তু গণৎকার সাজা হবে না, চট্ করে চিনে ফেলবে।

প্রফুল্ল। তবে সন্ন্যাসী সাজুক। সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষে করবার ছলে যেয়ে একবার শুধু চোখের দেখা দেখে আসুক। এতে কিন্তু একটা অসুবিধা আছে হরেন, চুমো খেতে পারবি না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সন্ন্যাসী সাজাই স্থির হইল। প্রফুল্ল কোন প্রকার "বিশ্বনাথ থিয়েটার সমিতি" হইতে সন্ন্যাসীর পোষাক আনিয়া দিবে। হরেন সন্ন্যাসী সাজিয়া সন্ধ্যার সময় প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে যাইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাওয়া নিরাপদ নহে। আমরা দুই জন নিকটেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিব। সন্ন্যাসী ঠাকুর কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিলে আমরা তাহার সহিত মিলিত হইব—ঠিক মিলিত নহে, হরেন আমাদের কিঞ্চিৎ অগ্রে বা পশ্চাতে থাকিবে, যাহাতে কাহারও সন্দেহ না হয়। পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এক সঙ্গে বাড়ী যাওয়া যাইবে। কিন্তু কোথায় বসিয়া সন্ন্যাসী সাজা হইবে? বাড়ী হইতে একটি নবীন সন্ন্যাসীকে বাহির হইতে দেখিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। একটা নির্জ্জন স্থান চাই। বাগানে অনেক লোক থাকে। মীর ঘাটের নিকট স্থানটা সন্ধ্যার সময় খুব নির্জ্জন থাকে। সেইখানে হরেন সন্ন্যাসী সাজিবে, আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিবে। আমরা সতত হরেনের পশ্চাতে পশ্চাতে অথচ দূরে থাকিব।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া সে দিন স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলাম।

(৩)

পর দিন প্রাতঃকালেই প্রফুল্ল সন্ন্যাসীর পোষাক আনিয়া নিজের ঘরে লুকাইয়া রাখিল।

সে দিন কলেজে আমরা তিন জন কিছুই করি নাই। প্রোফেসারের বক্তৃতার একবর্ণও আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনটি ষড়যন্ত্রকারীর মত আমরা কেবলই সেই এক বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করিয়াছি—এই ভাবে সাজাইতে হইবে, অমুক সময়ে যাইতে হইবে, অমুক করিলে কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। প্রফুল্ল হরেনকে নানা প্রকার উপদেশ দিল, তন্মধ্যে কয়টি তাহার মনে স্থান পাইল জানি না। আমরাও ইহাতে যথেষ্ট আমোদ অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু মনে যথেষ্ট ভয়ও ছিল। যদি হরেনকে কেহ চিনিয়া ফেলে! তাহা হইলে বিষম গোলমাল হইবে। মেয়েদের বাড়ী যাইয়া যদি ধরা পড়ে, মেয়ের মা যদি হরেনকে চিনিয়া ফেলে! যদি পুলিশে ধরাইয়া দেয়! ভাবিলাম, না এ সকল আশঙ্কা মিথ্যা, ভালয় ভালয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

সে দিন বৈকালে আমরা কেহই খেলিতে যাই নাই। সন্ধ্যার সময় ছদ্মবেশ লইয়া আমরা মীরঘাটে গেলাম। স্থানটি নির্জ্জন। একটা বৃক্ষের উপর বসিলাম। সেখানে হরেনকে দীর্ঘ জটা, শ্মশ্রু, গুম্ফ শোভিত করিয়া, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখাইয়া, হস্তে চিমটা দিয়া প্রফুল্ল বলিল—"যাও বাবাজি, বাবাজিনীর তল্লাসে যাও এবং কৃতকার্য্য হইয়া এস।" বাবাজিও চিমটা দোলাইতে দোলাইতে, মাঝে মাঝে অনতি উচ্চস্বরে বম্ বম্ রব করিতে করিতে চলিল।

আমরা কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম।

বাবাজি যথাকালে 'বম্ শঙ্কর, ভিক্ষা মিলে মা' বলিয়া অভিপ্সিত গৃহদ্বারে উপনীত হইল। আমরা পশ্চাতে থাকিয়া এক পাণের দোকানে পাণ অর্ডার দিলাম। প্রফুল্ল সহসা বলিয়া উঠিল, "না, হরেনের কাণ্ডটা কিছুই দেখবো না—এ হতেই পারে না। আমি চল্লাম। হরেনের এই কাপড়চোপড় ধর। এইখানেই থাকিস্, আমি এই আসছি।" এই বলিয়া প্রফুল্ল প্রস্থান করিল।

আমি পাণ খাইয়া এদিক ওদিক করিতেছি, এমন সময়ে প্রফুল্ল ঝড়ের মত বেগে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "ফণি, সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ হয়েছে; পুলিশ ছদ্মবেশী চোর ডাকাত মনে করে হরেনকে ধরেছে! থানায় নিয়ে যাচ্ছে।"

এই বলিয়া প্রফুল্ল আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। বলিলাম, "টানিস্ কেন? কোথায় যাবি?"

প্রফুল্ল। যেখানে হরেনকে নিয়ে যাচ্চে।

আমি। থানায়! চল্, ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল্ দেখি।

প্রফুল্ল। আমি দূর হতে চেয়ে দেখলাম, চাকর হরেনকে ভিক্ষে এনে দিল। ভিক্ষে নিয়ে হরেন নতমুখে যেই বাড়ী থেকে আমার দিকে আসবে,—আমি খুব কাছেই ছিলাম—অমনি সাধারণ পোষাক পরা এক মুসলমান পুলিশ কর্ম্মচারী হরেনের গায়ে হাত দিয়ে বল্লে, 'মশায়, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হচ্চে।' আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। হরেন বল্লে, "কেন মশায়, আপনার সঙ্গে যাব? কোথায় যাব?" পুলিশ কর্ম্মচারী বল্লেন, 'থানায়।' এই উত্তর শুনে আমি ঝাঁ করে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পাল্লাম। বোধ করি হরেনও বুঝেছিল। সে নিরুপায় হয়ে পুলিশের সঙ্গে যেতে প্রবৃত্ত হল। যাবার সময় সে চারিদিকে চাহিল, আমায় কাছে দেখে বল্লে,—এমন করুণস্বরে বল্লে যে আমার কান্না পেতে লাগল—বল্লে, 'প্রফুল্ল, আমায় পুলিশে ধরেছে। আমি নির্দ্দোষ, আমায় আটক করে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার পাগলামির কথা যাতে প্রকাশ না পায়, তাই করিস্।' এ কথা অবশ্য বাঙ্গালায় বলিল। তাই শুনে পুলিশের লোকটী বলে উঠল, 'বাঃ মশায়, আপনি দেখি বাঙ্গলাও বেশ বলেন!'"

আমরা প্রমাদ গণিলাম। পুলিশের হাতে পড়া, আর যমের হাতে পড়া একই কথা।

হরেনের অনতি বিলম্বেই আমরাও থানায় পৌঁছিলাম। প্রফুল্ল গ্রেপ্তারকারী পুলিশ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "একে কি অপরাধে ধরেছেন মশায়?" প্রথমে ত তিনি আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বার বার প্রশ্নের পর, তিনি বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "আপনারা কে মশায়? আসামী এক জন—যাহাকে আপনারা বোমা বলেন, তাই বোধ হচ্চে। ১২১, ১২১ ক ধারায় অভিযুক্ত হইবে।"

প্রফুল্ল। হরেন—বোমা! সে কি মশায়? ১২১, ১২১ক ধারা কি মশায়?

পুলিশ কর্ম্মচারী কহিলেন, "আপনারা বাঙ্গালী, বোমা বোঝেন না! বাঙ্গালা দেশে যা নিয়ে এত ধরপাকড় হচ্ছে! এইরূপ কত ছোকরার যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। আমার বোধ হয় এই ছোকরাও সেই দলের। এই অপরাধে ফাঁসী পর্য্যন্ত হতে পারে।

ইহা শুনিয়া প্রফুল্ল মহা চটিয়া গেল। কি জানি কি বলিতে যাইতেছিল। আমি ইঙ্গিতে বারণ করিয়া বিনীতভাবে পুলিশ মহোদয়কে বলিলাম, "ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়, আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনি যাকে আসামী স্থির করেছেন, সে আমাদের বন্ধু। আমরা তিনজনেই হিন্দু কলেজে পড়ি। আমাদের মধ্যে কোন একটা কথা লইয়া বাজি রাখা হয়। সেই জন্ত হরেন সন্ন্যাসী সাজিয়া ছিল। হরেন বা আমরা কেহই বোমা প্রস্তুত করি না, জীবনে কখনও বোমা দেখি নাই। আমরা রাজভক্ত প্রজা। হরেনকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা করুন।

ইনেস্পেক্টর মহাশয় আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তখন আমি প্রমাণস্বরূপ হরেনের সার্ট, চাদর, জুতা দেখাইয়া কহিলাম, "এই দেখুন হরেনের আসল পোষাক আমাদের নিকট রহিয়াছে।"

ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। ইনেস্পেক্টর মহাশয় মহা উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা দেখছি উত্তম সাক্ষী; এই জামিনে দস্তখত না করিলে আপনাদিগকেও ছাড়িয়া দিব না।' বিপদের উপর বিপদ।

প্রফুল্ল কিছুতেই জামিনে সহি করিবে না। সে বলিল, "আমরা চোর না ডাকাত যে জামিন দিব। সহি করিব না, দেখি না—আমাদের কি করে—"

প্রফুল্ল ইনেস্পেক্টর মহোদয়কে যে মধুর সম্বোধন করিল, বাঙ্গালা হইলেও তিনি তাহা বুঝিলেন। তিনি প্রফুল্লের দিকে কট্‌মট করিয়া চাহিলেন। প্রফুল্ল সে দৃষ্টি গ্রাহ্য করিল না।

"কোর্টে যখন কেস্‌ যাবে তখন আমরা নিশ্চয় নির্দ্দোষ প্রমাণিত হব।"

আমি। তা হব, কিন্তু কোর্টে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তা হলে হরেনের কি দুর্দ্দশা হবে বুঝছিস্ ত। হরেন তোকে কি বলেছে মনে নাই, কথা যাতে প্রকাশ না হয় তা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রফুল্ল। তা হলে কি করতে বলিস?

আমি। জামিনে সহি কর। আমরা বাহিরে থাকলে হরেনকে কোন না কোন উপায়ে রক্ষা করতে পারব। আমি মনে করছি যে প্রথমে আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে যাইব।

প্রফুল্ল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া জামিনে সহি করিল। তৎপরে আমরা দুই জনে থানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

(৪)

থানার বাহিরে আসিয়া আমি বলিলাম, এখন চল প্রিন্সিপালের কাছে যাই, তাঁকে সব কথা খুলে বলি।"

প্রফুল্ল বলিল, হাঁ সেই ভাল। আমাদের প্রিন্সিপাল ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক ক্লাবের লোক, দুজনে খুব ভাব। প্রিন্সিপালের কথা ম্যাজিষ্ট্রেট অবিশ্বাস বা অমান্য করিবেন না। প্রিন্সিপাল আমাদের যেরকম ভাল মানুষ, তাতে তিনি আমাদের পক্ষ সমর্থন নিশ্চয় করিবেন।"

আমরা প্রিন্সিপালের বাংলার দিকে ধাবিত হইলাম। তখন রাত্রি ৮টা। সৌভাগ্যক্রমে প্রিন্সিপাল বাড়িতেই ছিলেন, আরাম চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতেছিলেন। প্রফুল্ল ভাল খেলোয়াড়, প্রিন্সিপাল তাহাকে বড় ভালবাসিতেন।

প্রফুল্ল দ্রুত সমস্ত ঘটনা প্রিন্সপালের নিকট বিবৃত করিল। প্রিন্সিপাল স্মিত-বদনে সব শুনিলেন। শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের বন্ধু কোর্টশিপ করিবার অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছে। যা হোক, আমায় কি করিতে হইবে?

আমি বলিলাম "যাহাতে আমাদের বন্ধু আজ রাত্রেই মুক্তিলাভ করে এবং যাহাতে এই ব্যাপার কোর্টে না যায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাই করিতে হইবে।"

প্রিন্সিপাল ভৃত্যকে ডাকিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন এবং অনতি বিলম্বে আমাদের লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত কথা শুনিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন, "কোন ভয় নাই। তোমাদের বন্ধু এখনই মুক্তি পাইবে এবং এ ব্যাপার কোর্টে যাইবে না। আশা করি তোমাদের বন্ধুর ইহাতেই শিক্ষা হইবে।"

এই বলিয়া তিনি একজন আরদালিকে ডাকিয়া একখানা কাগজে কি লিখিয়া থানায় পাঠাইয়া দিলেন; এবং আমাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বন্ধুকে থানা হইতে লইয়া যাও।

আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলাম।

এই ঘটনার পর হইতে হরেনের প্রেম-জ্বর ঘাম দিয়া ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের মধ্যে আর কখনও এই ঘটনার উল্লেখ হয় নাই।

শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

স্নেহের নির্য্যাতন।

কুমী! ও কুমি!

কুমুদিনী সৎমার চীৎকার শুনিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার পদদ্বয় যেন আর চলিতে চাহিতে ছিল না। ভয়ে জড় সড় হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সে সৎমার সম্মুখে দাঁড়াইল। পশ্চাতে তাহার দুই বৎসরের শিশু মা মা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল। কুমুদিনীর সৎমা প্রথমেই সপ্তমে উঠিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া একেবারে সা-রে-গা-মার শেষ পর্দায় স্বর চড়াইয়া আরম্ভ করিলেন, হ্যালা কানের মাথা কি খেয়েছিস, না অহংকারে আমাদের মত ছোট লোকের কথা কাণে যায় না?"

কুমুদিনী তাহার সৎমার স্বরেই বুঝিয়াছিল যে একটা কাণ্ড না হইয়া যাইবে না, সে কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। তাহার সৎমা সরোজবাসিনী উত্তর না পাইয়া আরও অগ্নিবৎ হইলেন, উচ্চস্বরে বলিলেন, মুখের বাক্যি হ'রে গেছে নাকি?"

সৎমার প্রবল তাড়নায় কুমুদিনীর দুঃখে ক্ষোভে নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিল; সে পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সরোজবাসিনী ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন, "আঃ মর—রাঙ্গা চখে পানি লেগেই আছে, কথা কহিতে না কহিতে চখে জল। আমি কি ডাকিনী যে অমায় দেখলেই কাঁদিস! সতীনের কাঁটা; মাগী মরেছে, তবু আমার হাড়ে জ্বালাতে একটা কাঁটা রেখে গেছে। তুমি কাঁদ আর যাই কর বাপু, এখানে ও সব চলবে না; স্বামী-পুত্র নিয়ে পথ দেখ। আমি আর পারবো না। নিত্যি নিত্যি তোমার গুণধর স্বামীর অত নবাবী আমার বাড়ীতে চলবে না। বুঝলে,—শুধু তোমায় নিয়ে থাকলেইতো আর আমার চলবে না, আমার আরো পাঁচটা আছে!"

পাড়ার পিসিমা কিছু মতলবে আসিয়াছিলেন কিন্তু সরোজবাসিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল, সরোজবাসিনী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "কিগো পিসিমা এমন সময় যে?"

পিসিমা মনের কথাটী চাপিয়া বলিলেন, "তাইতো বলছি মা কুমুদিনীর কথা।"

সরোজবাসিনী সুবিধা পাইলেন, বলিলেন, "দেখ না, বিয়ে যেন আর কারু হয় না, স্বামী পুত্র যেন আর কারু নেই! আমার আদরের ছেলে

কি না, অন্ন খাচ্ছেন, নিচ্ছেন, ওড়াচ্ছেন তার উপর আবার নবাবী। যার ভাত যোটে না, যে স্ত্রী পুত্রকে খেতে দিতে পারে না তার অত বড়াই কেন ?"

পিসিমা একটু করুণ স্বরে বলিলেন "তাইতো মা কুমুদিনীরও জামাইকে দুকথা বুঝাইয়া বলিতে হয়।"

সরোজবাসিনী পুনরায় কুমুদিনীর পানে চাহিয়া বলিলেন "দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, যাও, ঘরে যেয়ে কপাট দাও গে, গোসা ঘরে যেতে হবেতো, নইলেতো আর স্বামীর আদর পাবে না—যাও।"

কুমুদিনী আর অপেক্ষা করিতে সাহস করিল না, সে যাইতে উদ্যত হইলে তাহার সৎমা পুনরায় বলিলেন "মনে থাকে যেন আমার বাড়ীতে আর তোমাদের জায়গা হবে না ;—এ কথা ভাল করে তোমার স্বামীকে বুঝিয়ে বলো।"

কুমুদিনী কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু "মা" পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিল না, তাহার অভিমান-জড়িত অশ্রু আসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিল।

সরোজবাসিনী বলিলেন, "তোমার ও 'মা' শোনবার জন্য ডাকি নি।"

কুমুদিনী আর দাঁড়াইতে পারিল না, সে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কুমুদিনী চলিয়া যাইবার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরোজ-বাসিনী বলিলেন, কি জ্বালা, এমন আপদেও মানুষ পড়ে। নিজের পেটে পাঁচটা হয়নি, কিন্তু একটা সতীন ঝি নিয়ে এত যন্ত্রণা। লোকে বলে মা মরা ছেলে মেয়ে গুলো ধূর্ত্ত হয়, আর মেয়েটা এত বোকা, এত ভাল মানুষ!" সরোজবাসিনীর চক্ষে জল আসিল, পিসিমা বলিলেন, তা বাছা ওর মাও ওই রকম ছিল।

সরোজবাসিনী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, তা আর বলতে হবে কেন, ছা দেখেই মাকে বুঝেছি। তিন তিনটে ছেলের মা হলি, স্বামীকে একটা কথা জোর করে বলতে শিখলি না।

পিসিমা উনানে জল চাপাইয়া আসিয়াছিলেন, এতক্ষণে হাঁড়ী ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে ভাবিয়া, তিনি আর দেরী করিতে না পারিয়া বলিলেন "মা, তাত বটেই, তা এখন আসি, ওবেলা এসে শুনবো।"

সরোজবাসিনী বলিলেন, আজ দশমী না, আসুন গোটা কতক আলু আর দুটী মুগের ডাল নিয়ে যাবেন।

(২)

শিউলী বলিল দাদী, "মা কাঁদছে!"

তখন সরোজবাসিনী কুমুদিনীর দুই বৎসরের শিশুর সহিত আগডুম বাগডুম খেলিতেছিলেন, শিউলীর হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, "মা কাঁদছে, আচ্ছা। চল দেখে আসি, কেন কাঁদছে, তুই মারিস নিতো?

শিউল বলিল—মাইরী দাদী, আমি বাইরে দাদা ভায়ের কাছে বসে ছিলেম।

সরোজবাসিনী বলিলেন, "আচ্ছা তোরা খেলা কর, আমি দেখে আসি।"

ছেলেরা ছাড়িল না, দাদীর সহিত মায়ের কাছে চলিল।

কুমুদিনীর মন্দ অদৃষ্ট সে আবার কতকগুলি ভর্ৎসিত হইল। আসিয়াই গৃহিণী সুর ধরিলেন, তোমায় মেরেছে কে! তুমি যে কাঁদছ। দিন নেই, রাত নেই, ক্ষণ নেই, অক্ষণ নেই তুমি যে ঘ্যান ঘ্যান করবে তা হবে না। আগে স্বামী ঘর বাড়ী করুক, তার পর সেখানে বসে যত পার কেঁদো। এখন ওঠ, উঠে গিলে এস। তারপর জামাই এলে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে সব বলো।

কুমুদিনীর অশ্রু-বেগ আরও প্রবল হইল। সে প্রাণপণ যত্নে বেগ ধারণের চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। গৃহিণী আরও গোটাদুই কথা মিষ্টি মিষ্টি শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। দাদীর কোলে থাকিয়া কুমুদিনীর খোকাও মাকে হাত নাড়িয়া কি বলিল, কেবল শিউলী যেন একটু কেমনতর হইয়া গেল, জননীকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা না, কিন্তু দাদী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। কুমুদিনী ভাবিল, যে স্ত্রীলোকের স্বামীর ঘর নাই, সে বুঝি স্বাধীনভাবে কাঁদিতেও পারে না।

(৩)

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগের পর সরোজবাসিনী নিয়মিতরূপে নিজ শয়ন কক্ষের দ্বারে বসিয়া সাংসারিক ব্যবস্থাদি করিতে ছিলেন। প্রায় আটটা বাজিল তখনও শিউলী আর মেনো বা মাণিক আসিল না, তাহাদের খাবার লইয়া যে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন, অন্য দিন ভোর হইতে না হইতে খাবারের জন্য তাহারা আসিয়া তাঁহাকে মহা বিরক্ত করিয়া তুলে, আজ এত দেরী কেন? তাহাদের খাওয়া হইলে তবে যে তাঁহার স্নান আহ্নিক হইবে। সম্মুখ দিয়া একজন দাসী যাইতেছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ্ তো শিউলী আর মাণিক কোথায়। বোধ হয় ঘুমুচ্ছে, তুলে নিয়ে আয়।"

দাসী চলিয়া গেল, তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, নিজেও যেমন,

ছেলে মেয়ে গুলোকেও তেমনী করবে; না ওর আছে আর থাকলে মাটী হয়ে যাবে। দাসী ফিরিয়া আসিল, বলিল, "দিদিমণির ঘরেতো ছেলেরা নেই।"

সরোজবাসিনী রাগত ভাবে বলিলেন, নেই তো কোথায় গেল? তোর দিদিমণিকে ডাক।

দাসী বলিল "তিনিও নেই।"

সরোজবাসিনী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন তবে তারা গেল কোথায়; তিনি স্বয়ং তাহাদের সন্ধানে কুমুদিনীর গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহে কেহ কোথাও নাই; শূন্যগৃহ—হাহা করিতেছে। সমস্ত বাটীর গৃহ তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলেন, কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলেন না। কর্ত্তাকে তখনই বাহির হইতে ডাকিতে পাঠান হইল, কর্ত্তা আসিবা মাত্র সরোজবাসিনী সকল কথা তাঁহার কর্ণগোচর করাইলেন। সমস্ত শুনিয়া কর্ত্তা বুঝিলেন স্ত্রীলোকের হস্তে সম্পূর্ণ ভারটা দেওয়া ভাল হয় নাই। তিনি তখনই কন্যা ও জামাতার সন্ধানে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

সরোজবাসিনীর চক্ষু শুষ্ক ছিল না, তিনি ভাবিতে ছিলেন কি করিতে কি করিলাম, ভাল করিতে মন্দ হইয়া গেল। কুমু তাঁহার সপত্নী পুত্রী হইলে কি হয়, তিনি যে তাহাকে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছেন। তার না হয় দুইটা ছেলে হইয়াছে, কিন্তু সে যে ভাল করিয়া কথা কহিতে জানে না,—সংসার কি, সে কিছুই বোঝে না। জামাইটে একেবারে ষোল বৎসর বয়সে এই বাটী ঢুকিয়াছে, আর এই ৮।১০ বৎসর সে যে দুঃখের বার্ত্তা জানে না। ছেলে মেয়ে দুইটারই বা কি হইবে। ছিঃ তাহাদেরই সর্ব্বস্ব, আমি কেন বাদী হইলাম। সরোজবাসিনী বড়ই ব্যস্ত হইলেন। কর্ত্তাকে ধরিয়া বসিলেন এখনি লোক পাঠাইয়া তাহারা যেখানে থাকুক ফিরাইয়া আনুন। কর্ত্তা কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

সরোজবাসিনী বুঝিলেন স্বামী নিন্দা প্রহৃতা—কুমুদিনী অভিমান সংক্ষুব্ধা সতীর মত দেহ ভিন্ন সমস্ত নিদর্শন রাখিয়া সকলের চক্ষের অন্তরালে পিতৃগৃহ হইতে আপনাকে অপসারিত করিয়াছে। তাহারা সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে গৃহ ত্যাগ করিয়াছে?"

(৪)

নরেশ কি বলিতে ছিল, সরোজবাসিনী বলিলেন,—"তা নয় বাবা, তুই গোড়া থেকে ব'ল।"

নরেশ সরোজবাসিনীর প্রতিবাসী, গরীবের ছেলে, নূতন জ্যাঠাইমা তাহাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিয়া থাকেন,—সেও নূতন জ্যাটাইমাকে বড় ভক্তি করে। সে কুমুদিনীর খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি সেই সংবাদ দিবার জন্ম নূতন জ্যাটাইমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। সে বলিল সে দিন আমি বৈকালে গোলদিঘীর ধার দিয়া যাইতেছিলাম, দেখি জামাই বাবু একখানা অতি কাল কাপড় প'রে,—একটা অতি ছেড়া জামা ও সেইরূপ একটা জুতা পায়ে হন্ হন্ করে যাচ্ছেন, কুমুদিদি যাইবার পর হইতেই আমি কলিকাতায় প্রায় তাহাদের সন্ধান করিয়া থাকি। সহসা জামাই বাবুকে দেখিতে পাইয়া আমি ছুটিয়া যাইয়া ডাকিলাম,—"জামাই বাবু!"

জামাই বাবু যেন কেমনতর হয়ে গেলেন,—বললেন "নরেশ!"

আমি বলিলাম,—"আপনি কোথায় আছেন,—আমরা আপনাদের চারিদিকে খুজে খুজে হায়রান।"

জামাই বাবু আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলিলেন,—"না,—আমি আর দাঁড়াতে পারি না, আমি চল্লুম।"

জামাই বাবুর অবস্থা দেখে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠলো—মনে হলো যেন তাঁহার কি বিপদ ঘটেছে। আমি তাড়াতাড়ি বল্লেম, "জামাই বাবু এত তাড়া কেন, কি হয়েছে?"

আমার কথায় জামাই বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন,—বলিলেন, "ভাই তোমার দিদিকে হারাতে বসেছি।"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম,—"কি হয়েছে?"

তিনি বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"কয়েক দিন হইতে অল্প অল্প জ্বর হয়, কিন্তু কাল রাত্রি হতে অবস্থা বড় মন্দ। জান ভাই আমি দুঃখী,—বহু কষ্টে একটা ২০৲ টাকা মাইনের চাকরী জুটেয়েছি, তাতে অতি কষ্টে সংসার চলে—ডাক্তার দেখাই কি ক'রে। তবু বাসার কাছে একজন লোক আমায় দয়া করে একজন কবিরাজকে বলে দিয়েছেন, তিনিই কাল থেকে দেখছেন।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম আমি বলিলাম, "চলুন জামাই বাবু,—শীঘ্র চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

জামাই বাবু কেবল মাত্র বলিলেন,—"চল! শেষ দেখা দেখে এস।"

সরোজবাসিনীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি বলিলেন,—"বেঁচে আছে তো?"

নরেশ বলিল,—"আছেন, কিন্তু অবস্থা বড় খারাপ। শুনলাম,—কোন

দিন দিদির খাওয়া জুটতো কোন দিন জুটতো না ;—জামাই বাবু ও ছেলেদের পাতে যা পড়ে থাকতো তাই খেয়েই কাটাতেন,—তার পর স্যাঁত-সেঁতে ঘরে পড়ে থাকতেন, তার উপর সংসারের সব কাজই করতেন; বাসন মাজা, রান্না, জলতোলা। আমি গিয়ে কাছে বসলে, আমায় দেখে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো! জামাই বাবু বল্লেন, কেমন আছ? দিদি বল্লেন, "ভালো।" জামাই বাবু বলিলেন,—ঐ এক কথা যা শিখেছ?" দিদি সেই শীর্ণ মুখে হাসিয়া বলিলেন,—"ভালো থাকলে কি আর মন্দ বলতে হবে। ঐ দেখ তোমার আর ছেলেদের খাবার ঘরের কোণে রয়েছে, তুমি খাও, আর ছেলেদের দাও।" জামাই বাবু কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কুমু এত জ্বরেও উঠে তুমি খাবার করেছ,—তাতেই তুমি ভাল আছ বলে আমায় আফিস পাঠালে,—তাঁর কান্না দেখে আর আমি থাকতে পারিলাম না। আমার চক্ষেও জল এলো।"

নরেশের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"যদি দেখতে চান আজই রওনা হন,—দেরী করিলে দেখা হওয়া অসম্ভব।"

সরোজবাসিনী কোন কথা না বলিয়া কর্ত্তাকে ডাকিতে পাঠাইলেন, কর্ত্তা আসিলে বলিলেন,—"তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, আজই রাত্রে কলিকাতায় চল। কর্ত্তাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি কহিলেন,—তোমার মান অভিমান লইয়া তুমি থাক, আমি যাবই। কর্ত্তা কি বলিতে যাইতেছিলেন, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—"তুমি যা বোঝ তাই কর, আমি রাত্রের গাড়ীতেই যাব। নরেশ বলিয়া গেল কুমু আমার এতক্ষণ আছে কিনা সন্দেহ।"

সরোজবাসিনী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; কর্ত্তার মুখ গম্ভীর হইল, তিনি কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সরোজবাসিনী মা জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—মা! জীবনে কখনও নিজ পুত্র কন্যার প্রার্থনা করি নাই, কুমুকে পাইয়া আমার সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল। তুমি দিয়াছিলে মা, বড় যত্নে তাহাকে পালন করিয়াছি, কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া রুক্ষ ব্যবহারে তাহাকে হারাইতে বসিয়াছি। দেখ মা, মুখ রেখ, কুমুকে বাঁচিয়ে রেখো,—নয়ত সব যাবে, আগু আমার পাগল হবে,—আমার ত সৎমার কলঙ্ক বহন কর্ত্তে হবে।"

তখনও প্রভাত হয় নাই, অরুণোদয়ের প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সেই সময় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী আসিয়া কুমুদিনীদের গলির মুখে দাঁড়াইল। নরেশ প্রথমে কোচবাক্স হইতে লাফাইয়া পড়িল, গাড়ীর ভিতর হইতে নামিলেন,—কর্ত্তা, সরোজবাসিনী ও একজন পরিচারিকা। নরেশ ধীরে ধীরে সেই গৃহদ্বারে কয়েকবার আঘাত করিবার পর শিউলী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সরোজবাসিনী তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া দ্রুত কুমুদিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তা ও গৃহিণী যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের স্নেহের, আদরের, যত্নের—তাঁহাদের সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব কুমুদিনীর একি দশা! সরোজবাসিনী যাইয়া কুমুদিনীর সেই ভূলুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন,—বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, কর্ত্তা বুঝিলেন স্বেচ্ছায় কন্যা হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় বলিল,—"হায়! হায়! গৃহিণী কোথায় তুমি! তোমার কুমুকে আর বুঝি বাঁচাইতে পারি না।"

নরেশ দ্রুত ডাক্তার আনিতে ছুটিল। আশুতোষ রোগীর অবস্থা ভাল নাই দেখিয়া চিকিৎসক ডাকিতে গিয়াছিল। তিনি কবিরাজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন, কুমুদিনীর মস্তক তাহার বিমাতার ক্রোড়ে! শ্বশুরের বক্ষে পুত্র মাণিক পৃষ্টে শিউলী। তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়! তাঁহার মস্তিকের ঠিক ছিল না, কেবল অর্দ্ধ ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "আসুন—দেখুন।"

কবিরাজ মহাশয় বুঝিলেন এঁরা আত্মীয়;—তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"রোগ বড় কঠিন, কি হয় বলা যায় না। বিশেষ সুরাহা দেখিতেছি না।"

আশুতোষ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কুমু কুমু—চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ, কাল রাত্রে যাঁদের দেখতে চেয়েছিলে। কারা এসেছেন দেখ।"

কুমুদিনী চক্ষু মেলিল,—বলিল "মা!"

সরোজবাসিনীর চক্ষু দিয়া তখন অবিরাম জল পড়িতেছিল। কর্ত্তা বালকের মত তাহার বুকের নিকটে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "কুমু, চল মা—ফিরে চল। বাপের উপর রাগ কি মা! তোরই যে সর্ব্বস্ব!

শ্রীমন্মথকুমার রায়।

রাজেশ্বরের বিপদ।

রাজেশ্বর আপন কোষ্ঠি দেখিতে ব্যস্ত। পার্শ্বে তাঁহার পত্নী চপলা, শিশু সন্তানটি ঘরে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজেশ্বর হতাশভাবে স্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন। চপলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেখলে?"

"দেখব আর কি, আমার মাথামুণ্ডু। বলেইছিলাম, রাহুর দশা, শনির অন্তর্দ্দশা। শনি আমার বড়ই খারাপ।"

"আর কতদিন এ রকম থাকবে? দু-চার দিনে কাট্‌বে না?"

দু-চারদিন! শনির অন্তর্দ্দশাই ত এখনও ছয় মাসের উপর থাক্‌বে, তারপর বরং বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় দেখা যাবে।"

"আর ত সংসার চলে না, বাবা কষ্ট ক'রে টাকা দেন, তাতে চলে কি? আর তিনিও বিরক্ত হন, বলেন, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, স্বচ্ছন্দে রোজগার করতে পার, কেন তিনি দেবেন? ঠিক কথাই বলেন, হ'ক তোমার রাহু শনি খারাপ, তিনি যে কাজের যোগাড় করে দিয়েছেন, সেই কাজটি এখন কর গিয়ে, পরে ভাল দশা পড়লে ভাল কাজ ক'রো।"

"সর্ব্বনাশ! এই শনির অন্তর্দ্দশায় আমি কাজ কর্ত্তে যা'ব? পদে পদে বিপদ হ'বে, তারপর জেলেই যেতে হয়,—কি কি হয়, তার ঠিক কি? গ্রহের ফের কি না, তাই তোমার এমন মতি হয়েছে।"

"কিন্তু কষ্টটা একবার ভেবে দেখদেখি।"

"কি করব? গ্রহ যতক্ষণ মন্দ থাকবে, ততক্ষণ এই রকমে যাবেই, তারপর গ্রহ ভাল হ'লে আপনিই কত কাজ এসে জুটবে।"

"আর গ্রহ ভাল হয়ে কাজ নাই, তুমি বাপু কালই সাহেবের সঙ্গে দেখা কর, আমি সাহেবকে ব'লে এসেছি।" অকস্মাৎ শ্বশুরের আগমন ও তাঁহার কথা শুনিয়া রাজেশ্বর একটু সঙ্কুচিত হইলেন, এবং কল্যই সাহেবের সহিত সাক্ষাতের আদেশে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সময়টা বড়ই খারাপ।"

"সময় খারাপ নয় তোমার মাথা খারাপ। এত লেখাপড়া শিখে যখন তোমার দুর্দ্দশা ঘুচিল না, তখন মাথা খারাপ নয়ত আর, কি বলব?"

"এখন কাজে গেলে সুবিধা হবে কি?"

"বেশ সুবিধা হ'বে; আমি সব ঠিক ক'রে দেব; আমাদের আফিসে যখন কাজ করবে, ভালমন্দের দায়ী আমি থাক্‌ব, তুমি ত চুরি ডাকাতি কর্‌বে না, কাজের একটু আধটু গলদ হয়, আমি শুধরে নেব।"

হতাশভাবে রাজেশ্বর বলিলেন, "গ্রহের ফের, অদৃষ্টে যা আছে, তাও হবেহ, বেশ, যাব ; কিন্তু কাল ত আর হবে না।"

"কেন কাল আবার কি হ'লো ?"

"কাল অশ্লেষা।"

"আচ্ছা না হয় পরশু যেয়ো, সাহেবকে ব'লে একদিন রাখতে পারব বোধ হয়।"

"পরশু যে মঘা, আরও খারাপ।"

"তোমার অদৃষ্ট তার চেয়েও খারাপ। ভাল, সোমবার দিন যেতে পারবে কি ?"

"দেখি, সোমবার বোধ হয় ত্র্যহস্পর্শ।" পঞ্জিকা নিকটেই ছিল, পাতা উল্টাইয়া দেখিয়াই বলিলেন, "এই দেখুন ত্র্যহস্পর্শই বটে। শ্বশুর মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া চপলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার দুঃখ ঘুচিবে না, আমি আর খরচ যোগাইতে পারিব না।" বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন।

চপলা অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। এমন সময়ে বাহিরে বাসনের শব্দ হইল, চপলা দৌড়াইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি হ'বে ?" খোকার দুধটুকু সব বেড়ালে খেয়ে গেল, ছেলে খাবে কি ? হাতে একটি পয়সাও নাই।"

"ও কি বেড়াল ? ও খোদ রাহু বেড়াল হ'য়ে দুধ নষ্ট করে গেল।"

খোকাও এতক্ষণ বেশ খেলা করিতেছিল, দুধ পড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া বলিল, "মা ক্ষিদে পেয়েছে।"

"আমাকে খাও বাবা ? বাবাকে খরচের কথা ব'লে পাঠিয়েছিলুম, তিনিও এসে রেগে খরচ দেবেন না বলে গেলেন।"

"সে তোমারই দোষ, প্রতিপদের দিন কুমড়ো রেঁধে খেয়েছ, আমাকেও খাইয়েছ, অর্থ কষ্ট ত হ'বেই।"

চপলা স্বামীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "এখন আমার মরণই ভাল, সবাই না খেয়ে মরবে, দেখবার আগে আমি আত্মহত্যা করব।"

"তাও বিচিত্র নয়, আমার সপ্তমের ঘরে শনির পূর্ণদৃষ্টি।"

এমন সময় চপলার পিতা পুনর্ব্বার আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি রাগ করিয়াও চলিয়া যাইতে পারিলেন না। কন্যা টাকা চাহিয়াছিল, না দিয়া যান কেমন করিয়া ? অপত্যস্নেহ ক্রোধকে ক্ষণকাল মধ্যে জয় করিল। ফিরিয়া

আসিয়া কন্যাকে ডাকিলেন, চপলা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল, উঠিয়া পিতাকে বাহিরে লইয়া গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিল, "কাল আপনি এসে সঙ্গে করে আপিসে নিয়ে যাবেন, আপনি এলে, 'না' বলতে পারবেন না, আমিও কেঁদে কেটে যতদূর পারি রাজি করব।"

পিতার নিকট হইতে টাকা কয়টি লইয়া, খোকার খাবারের বন্দোবস্ত করিয়া স্বামীর নিকট আসিয়া চপলা পুনরায় কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল।

পরদিন আপিসের সময় শ্বশুর মহাশয়কে দেখিয়া রাজেশ্বর বড়ই ভীত হইলেন, বুঝিলেন ; শনি এবং রাহু এই উপায়ে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে সঙ্কল্প করিয়াছে, একজন স্ত্রীর স্কন্ধে, আর একজন শ্বশুরের স্কন্ধে চাপিয়াছে। এই পাপ দশার এইরূপই ভবিতব্য জ্ঞানে এবং চপলার সমস্ত রাত্রি পরিশ্রমের ফলে, রাজেশ্বর শ্বশুরের আগমনের পূর্ব্বেই আহার করিয়া একরূপ প্রস্তুত ছিলেন, শ্বশুরকে দেখিয়া বিষণ্ণ মনে, "মধুসূদন ও দুর্গা নাম স্মরণ করতঃ 'স্বস্তি' বলিয়া দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি অবোধ খোকা "বাবা !" বলিয়া ডাকিয়া ফেলিল। রাজেশ্বরও অমনি গৃহমধ্যে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শ্বশুর হাসি রাখিতে পারিলেন না, পুত্রও কাঁদিয়া উঠিল,—চপলা এক চড় মারিয়াছে। চপলার মুখ শুকাইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "ছেলের ডাকে দোষ নাই, বিশেষতঃ সুমুখ থেকে ডেকেছে।"

রাজেশ্বর এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চলুন, সময় মন্দ হইলে আত্মীয়ও শত্রু হয় জানি, আমার গ্রহ মন্দ আপনি কি করিবেন।" বলিয়া সাশ্রু নয়নে উঠিয়া ভূমিতে তিনবার বাম পদাঘাত করতঃ অগ্রসর হইলেন, শ্বশুর মহাশয় কষ্টে হাসি চাপিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

যখন শ্বশুরের সহিত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন মুহুর্মুহু মধুসূদন নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন, যদিও নিশ্চয় জানেন, যে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সাহেব হয় ঘুসি মারিবেন, নয় চোর বলিয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবেন, তথাপি বিপদকালে মধুসূদন নাম স্মরণ করাটা শাস্ত্রের ব্যবস্থা বলিয়াই স্মরণ করিলেন।

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করার পর দেখিলেন যে, সাহেব মিষ্ট কথায় তাঁহাকে চাকরি দিয়া এবং শ্বশুরের প্রতি দেখাইয়া শুনাইয়া দিবার ভার দিয়া বিদায় দিলেন। রাজেশ্বর অবাক্ হইয়া গেলেন। শ্বশুরের প্রতি সাহেবের

বিশ্বাস থাকার জন্ম অথবা মধুসূদন নামের বলে, না গণনার ভ্রমবশতঃ অথবা ভূমিতে পদাঘাতের জন্য, কি হেতু এইরূপ হইল ঠিক করিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রী যখন বলিয়াছিলেন, "তুমি কি মূর্খ, জোর করিয়া চাকরি করিতে না পাঠাইলে ত চিরকাল কষ্ট পাইতে ?" তাহার উত্তরে রাজেশ্বর বলিয়াছিলেন, "আমার গনণায় বোধ হয় ভুল হইয়াছিল ; যাহা হউক যাহা অনিশ্চিত, তাহার উপর ততটা ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মূর্খের কাজ বটে, কিন্তু সে তোমারই দোষ, তুমি অষ্টমীর দিন নারিকেল খাওয়াইয়া আমাকে মূর্খ করিয়া দিয়াছিলে।

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

রঙ্গ-বারিধি।

প্রথম তরঙ্গ।

রঙয়ের চিঠি।

(১)

১লা শ্রাবণ ১৩২১

প্রিয় পরেশ !

আজ পনের দিন হইল অতি গোপনে আমি বীণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পিতৃমাতৃহীন অনাথিনী বীণার অশ্রুপূর্ণ নয়নের কাতর আশ্রয় ভিক্ষা, নিজে ভিখারী হইয়াও কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। যে দিন মৃত্যু শয্যায় বীণার মাতা বীণাকে আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিলেন সেইদিনই বুঝিয়াছিলাম,—তাহাকে বিবাহ ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। ঈশ্বর প্রেরিত মহার্ঘ দান ভাবিয়া আমি তাহাকে মস্তকে তুলিয়া লইয়াছি।

আমার ঠাকুরদাদা অর্থাৎ পিতার খুল্লতাতের অতুল সম্পত্তির কথা আমার নিকট নিশ্চয়ই তুমি অনেকবার শুনিয়াছ ;—তাঁহার নিজের কোন পুত্র কন্যা না থাকায় তাঁহার সেই সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার অবর্ত্তমানে আমাকেই একমাত্র মালিক করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত, বয়সও প্রায় আশির নিকট পৌছিয়াছে। এ অবস্থায় এ যাত্রা তাঁহার রক্ষা

পাওয়া অসম্ভব। কাজেই আশা করা যায় শীঘ্রই আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, এবং তখন বীণাকে লইয়া মহা সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব। সেই সুখের দিনের আশায়, সেই সম্পত্তির ভরসায় আমি বীণাকে বিবাহ করিতে সাহসী হইয়াছি।

এরূপ গোপনে বীণাকে বিবাহ করিবার কারণ কি জানিবার জন্য নিশ্চয়ই তুমি লোলুপ হইবে? আমার ঠাকুরদাদা মহাশয় অবিবাহিত, বাল্যকাল হইতেই কেমন তাঁহার স্ত্রীলোকদিগের উপর মর্ম্মান্তিক ঘৃণা। বিবাহই মানুষকে পশুতে পরিণত করে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা। তাঁহার প্রতি পত্রেই আমি যাহাতে বিবাহ করিয়া এমন দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম বিচ্যুত হইয়া চতুষ্পদ পশুতে পরিণত না হই সে বিষয়ে বার বার নিষেধ করিয়াছেন। এমন কি আমি যদি পশু হই, অর্থাৎ আমি যদি বিবাহ করি তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইব, সে কথাও ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই। বিবাহের উপর এরূপ ঘৃণা যে, বৃদ্ধ বিবাহিত দেবতাও পূজা করিতে প্রস্তুত নন; সেইজন্য পশ্চিমে তাঁহার বাসার নিকটে এক কার্ত্তিক ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যদি আমি বিবাহ করি তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এই চির-কুমার দেবতা কার্ত্তিককেই দিয়া যাইবেন। বুড়ো তো নিজে বিবাহ করেই নাই, যাহাতে আমিও না বিবাহ করি তাহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। এ অবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত না বৃদ্ধের মৃত্যু হয়, ততদিন এ বিবাহ গোপন রাখাই যুক্তি সঙ্গত। সুখে দুঃখে চলিয়া যাইতেছে এইমাত্র। ইতি :—

তোমার—গণেশ।

(২)

প্রাণের সই!— ২রা শ্রাবণ ১৩২১

নানা গোলযোগে তোমার পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। এ কয় মাস আমার কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা বোধ হয় আর তোমাকে লিখিয়া জানাইতে হইবে না। সকল দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া যে দিন আমাকে মা চিরদিনের মত ফেলিয়া চলিয়া যান; সে দিনের কথা ভাবিলে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় করুণাময়ের করুণায় আজ আমি যেমন সুখী এত সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পূর্ব্ব পত্রে যাঁহার কথা আমি তোমায় লিখিয়াছিলাম, যাঁহার কৃপায় রুগ্ন শয্যায় মায়ের অনাহারে মৃত্যু হয় নাই, তিনি আমার ন্যায় হতভাগিনীকেও

দয়া করিয়া পদে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার অগাধ ভালবাসায় এখন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় পরিপূর্ণ।

আপাততঃ আমাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ। আমার স্বামীর পরিচয় তুমি পূর্ব্বেই পাইয়াছ, তিনি চিত্রকর। তিনি যে সকল চিত্র আঁকেন তাহা আমার চক্ষে অতি সুন্দর বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহা বাজারে কখন কদাচিৎ এক আধখানি বিক্রয় হয় মাত্র।

আমার স্বামীর পশ্চিমে এক অতিশয় কৃপণ ধনবান ঠাকুরদাদা আছেন। সেই বৃদ্ধ প্রতি মাসে খরচের জন্য যে সামান্য টাকা পাঠান, তাহাতে এযাবৎ তাঁহারই অতি কষ্টে চলিতেছিল; এখন আমার জন্য তাঁহাকে প্রত্যহই ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইতেছে। যাহা হউক শীঘ্রই আমাদের স্বচ্ছলতা হইবার সম্ভাবনা,—সেই বৃদ্ধ সম্প্রতি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদের আশা করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার স্বামীই সেই অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। শীঘ্রই যে আমাদের সমস্ত অভাব মিটিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য খবর মঙ্গল; আশা করি তোমরা ভাল আছ। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিতে ভুলিও না। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

(৩)

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২১

কল্যাণবরেষু!—

গণেশ, অতি শীঘ্রই আমি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতেছি। এখানকার স্থানীয় চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে বলেন, স্থান পরিবর্ত্তন ব্যতীত এ রোগ কিছুতেই নিরাময় হইবে না। অনেক চিন্তার পর কলিকাতায় তোমার ওখানে যাওয়াই স্থির করিয়াছি। এ সময় তোমার নিকটে থাকিলে সর্ব্ব বিষয়েই সুবিধা। আগামী শুক্রবার মেলে আমি এখান হইতে রওনা হইব। আমার থাকিবার জন্য একটী ঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিও। অনর্থক খরচ বাড়াইয়া কোন লোক আর সঙ্গে লইলাম না। তুমি আমার পরিচর্য্যার জন্য একটী লোক ঠিক করিয়া রাখিও; কারণ এ অবস্থায় পরিচর্য্যার জন্য একটী লোক সর্ব্বদাই প্রয়োজন। রোগের জন্য যে সকল আমার খুটিনাটী প্রয়োজন হইবে, তাহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়াই সম্ভব। তুমি একটী ধীর প্রকৃতির বৃদ্ধা স্ত্রীলোক

সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও; বেতন যাহাই লাগুক সে জন্য চিন্তা করিও না। স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আমি ব্যয় করিতে কাতর নই। আমার শরীরের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্ব্বল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,—ঠাকুরদাদা।

(৪)

প্রিয় পরেশ !— ৫ই শ্রাবণ, ১৩২১

আজ ঠাকুরদাদার এক পত্রে আমার সকল আশা ভরসা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে বসিয়াছে। এ বিপদ হইতে যে কিরূপে উদ্ধার হইব তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে। আগামী শনিবারে চিকিৎসার জন্য বৃদ্ধ কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁহার বিশ্বাস তিনি আবার নিরাময় হইয়া পূর্ব্ব শক্তি লাভ করিবেন। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা দেখ কি ভয়ঙ্কর! তাঁহার নিরাময়ের জন্য আমাকেই আবার তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে।

গত কয়েক মাস হইতে আমার ছবি একখানিও বিক্রয় হয় নাই, কাজেই বুঝিতে পারিতেছ টাকার আমার কিরূপ প্রয়োজন। এ অবস্থায় কোথায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আসিবে,—না আসিল তাঁহার নিরাময়ের জন্য আগমন সংবাদ। সেজন্যও আমি বিশেষ চিন্তিত হইতাম না, কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা বীণার জন্য। বুড়া যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে আমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবে। আমাকে চিরদিনের মত সত্য সত্যই পথের ভিখারী হইতে হইবে। আমার এমন কোন বন্ধু বা আত্মীয় নাই যেখানে কিছু দিনের জন্য বীণাকে গোপনে রাখিতে পারি, অথবা আমার অবস্থায়ও এমন সচ্ছল নয় যে, অন্যত্র তাহাকে গোপনে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। এই ভয়াবহ বিপদে পড়িয়া আমার মস্তক সম্পূর্ণই বিকৃত হইয়া গিয়াছে;—পত্র পাঠ এখন আমার কি করা সদযুক্তি লিখিয়া জানাইবে। ইতি :—

তোমার—গণেশ।

(৫)

প্রাণের সই !— ৬ই শ্রাবণ, ১৩২১

আজ আমরা বড়ই বিপদগ্রস্ত। আমার স্বামীর সেই ঠাকুরদাদা চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি এইখানেই থাকিবেন। আমাদের

বিবাহের বিষয় তিনি কিছুই জানেন না; এ বিবাহ তাঁহার নিকট গোপন করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয় যে, তাঁহার নাতি বিবাহ করে। তাঁহার ধারণা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ অপেক্ষা বিষধর সর্পের সংস্পর্শও মঙ্গলজনক। তা ছাড়া তিনি যখন শুনিবেন আমার স্বামী তাঁহার অমতে গোপনে বিবাহ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন ও অবিলম্বে মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন। মাসহারা বন্ধ করিলে যে আমাদের অনাহারে মরিতে হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়াও আমরা কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আমরা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম; শেষ বুড়োর পত্রখানা পড়িতে পড়িতে একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে; জানি না তাহা কতদূর সম্ভবপর হইবে। ঠাকুরদাদা মহাশয় তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য একজন বৃদ্ধা দাসী নিযুক্ত করিতে লিখিয়াছেন। আমারা স্থির করিয়াছি, আমার স্বামী আমাকে তাঁহার নিকট সেই দাসী বলিয়া পরিচিত করাইবেন। জানি না ভাই, ভগবানের মনে কি আছে। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

(৬)

১১ই শ্রাবণ, ১৩২১

প্রাণের সই!

বুড়ো আসিয়া পৌঁছিয়াছে;—এরূপ ভয়ঙ্কর গম্ভীর প্রকৃতির লোক জীবনে আমি আর কখনও দেখি নাই। কিছুতেই তাঁহার সন্তোষ নাই;—দিন রাত কেবল খিট্‌খিট্ করিতেছেন। তিনি যে জীবনে কখনও হাসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে তাহাতো বোধ হয় না। আসিয়া পর্য্যন্ত যেরূপ খিঁচুনী ও তিরস্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমার ভয় হয়, বুঝি বা আমাদের সমস্ত মতলবই পণ্ড হইয়া যায়।

সে দিন প্রত্যূষে যখন আমার স্বামী আমাকে দাসী বলিয়া পরিচিত করাইবার জন্য তাঁহার নিকট লইয়া যান, তখন আমার বুকের ভিতর কি হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া তোমায় লিখিয়া জানাইব। যাঁহার জন্য আমি পথের ভিখারিণী হই নাই,—যাঁহার ভালবাসায় আজ আমি এত সুখী, তাঁহার জন্য সামান্য দাসী সাজা কি এতই কঠিন? এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তে যেন দূর হইল, আমি আমার

স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবনত মস্তকে বুড়োর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সত্য কথা বলিতে কি তখনও আমার ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। আমাকে দেখিবামাত্র তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্ত্তাকুবৎ বৃদ্ধ জ্বলিয়া উঠিলেন। আমার স্বামীকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া তখনই আমাকে বিদায় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "এরূপ দাসীর পরিচর্য্যা অপেক্ষা অসহায় ভাবে রোগ শয্যায় পড়িয়া থাকা ভাল। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।" আমার স্বামী, অনেক চেষ্টায়ও বৃদ্ধা দাসী পাওয়া যায় নাই, এবং আমায় দেখিতে যত কম বয়স বলিয়া বোধ হয়, তাহাপেক্ষা আমার বয়স অনেক বেশী, প্রভৃতি নানারূপ মিথ্যা কথা বলিয়া শেষে বহুকষ্টে তাঁহাকে কতক ঠাণ্ডা করিতে পারিয়াছেন। এ সত্বেও বুড়ো অবিলম্বে আমার স্বামীকে বৃদ্ধা দাসীর সন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সাত দিন কেবল আমার কাজ পরীক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহারই মধ্যে দুইবার তিরস্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তিরস্কার করেন, যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যেমন করিয়া পারি বুড়োকে বশ করিবই করিব। দিন রাত্রি আমার বুক দুর দুর করিতেছে,—সম্মুখে আমার ভীষণ পরীক্ষা। ইতি—

তোমারই সই—বীণাপাণি।

(৭)

১৩ই শ্রাবণ, ১৩২১

প্রিয় মথুর!

আমি শনিবারে এখানে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌছিয়াছি। পথের কষ্টে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম; তাছাড়া আমার অবিবেচক নাতিটী আমার স্পষ্ট লেখা সত্বেও আমার জন্য একটী যুবতী দাসী নিযুক্ত করায়, মেজাজ আমার এরূপ খারাপ করিয়া দিয়াছিল যে পৌছান সংবাদটা পর্য্যন্ত তোমাকে যথা সময়ে লিখিতে পারি নাই। যাহা হউক দাসীটাকে আমি যেরূপ ভাবিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা একটু ভাল বলিয়াই বোধ হয়। যুবতী বটে, কিন্তু কোনরূপ বাচালতা নাই; আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান একেবারে নাই এ কথাও বলিতে পারা যায় না। কাজ কর্ম্মও করিতেছে মন্দ নয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না স্ত্রীলোকের সাহায্য ব্যতীত নিজের কাজ নিজে

সমস্ত করিতে পারিতেছি, ততদিন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই। এইকালসর্পীদিগের নিকট হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল   ইতি—

তোমার

শ্রীদুর্গাদাস বসু

(৮)

কলিকাতা, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩২১

প্রাণের সই!

তোমার পত্র পাইলাম, অধিক কিছু লিখিবার নাই। বুড়ো পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু ভাল, শারীরিক তো বটেই, ব্যবহারেও কতকটা। খিট্‌খিটিনী ও তিরস্কারের বিরাম নাই, তবে সুরাহার মধ্যে এতটুকু যে, তিনি যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিবেন আমাকেই স্থায়ীভাবে দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। চেষ্টায় কতক ফল পাইয়া আমি দ্বিগুণ উৎসাহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। ভগবান যদি সহায় হন, তুমি দেখিও আমি বুড়োকে এরূপ বশ করিব যে যখন তিনি শুনিবেন তাহার নাতীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে তখন বিন্দুমাত্র রাগ না করিয়া বরং আনন্দিত হইবেন। ইতি

তোমার সই—বীণাপাণি।

(৯)

১৫ই শ্রাবণ, ১৩২১

প্রিয় মথুর!

পূর্ব্বের অপেক্ষা এখানে আসিয়া আমার শরীর অনেক ভাল! এখানে আমার পরিচর্য্যার জন্য যে দাসীটি নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার উপর আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুল। স্ত্রীলোক যে এত ভাল হইতে পারে, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এখন আমি দেখিতেছি এ সংসারে স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরীহ জীব আর দুটী নাই। আমার সুখের জন্য তাহার যত্ন ও আগ্রহ দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। তাহার যত্নে ও সেবায় আমি এমনই মুগ্ধ হইয়াছি যে, সর্ব্বদাই মনে হয় যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পশ্চিমে ফিরিব তখন তাহার অভাব আমার নিশ্চয়ই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। তাহার সেই সদা হাসিমাখা মুখখানির প্রতি চাহিয়া আমার এক এক বার মনে হয় যদি তাহাকে আরোও ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে দেখিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমার জীবনের প্রবাহ অন্য দিকে

বহিত। কিন্তু তখনই আমার মনে হয় তাহার বহু পরে এ কেবলমাত্র পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মোটের উপর আমাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এত দিন পরে আমি এমন একটী স্ত্রীলোক দেখিলাম যে আমার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিরকালের দৃঢ় ধারণাটাকে একেবারে সমূলে উল্টাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। সে যে কোন উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহার ভাব ভঙ্গিতে কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে না। তথাপি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, সে আমাদের স্বজাতি ও অতি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কেবল অবস্থা বৈগুণ্যে দাসীবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে। ওখানকার সংবাদ সবিস্তারে লিখিবে। ইতি—

তোমার

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

পুঃ—যদি কোনও বৃদ্ধ তাহাপেক্ষা অনেক অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে কি তাহা অতিশয় হাস্যজনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়? সত্যই কি সে সমাজের নিকট ঘৃণিত হয়? আমার তো মনে হয় ইহাতে ক্ষতি কি।

(১০)

১৬ই শ্রাবণ ১৩২১

প্রাণের সই।

ভাই তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে আমারই সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে। বুড়ার আর সে ভাব একেবারেই নাই, এখন তিনি আবার আমার প্রতি তাহার সেই কোটর-নির্মজ্জিত মিটমিটে নয়ন যুগলের প্রেমপূর্ণ অদ্ভুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—দেখি আর মনে মনে হেসে মরি! আমার উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, এখন আমাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিবার জন্যই ব্যস্ত! সন্ধ্যার পর প্রত্যহই আমাকে নিকটে বসাইয়া অতি স্নেহে তাঁহার পশ্চিমের কত গল্প শোনান। নাৎবৌকে লইয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের এইরূপ টানা হেচড়া দেখিয়া আমার স্বামী তো অবাক হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যে সময় বুড়ো আমার সহিত গল্প করে সেই সময় এক দিন তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিয়াছি, কারণ এখনও পর্য্যন্ত আমি আমার জয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হই নাই। ইতি—

তোমার সই—বীণাপাণি।

(১১)

১৮ই শ্রাবণ, ১৩২১

প্রিয় মথুর !

আজ যাহা আমি তোমায় লিখিতেছি ইতিপূর্ব্বেই বোধ হয় তুমি তাহার কটকটা আভাস পাইয়াছ। আমি আমার এই সর্ব্বগুণসম্পন্না দাসীটিকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আজীবন বিবাহে ভয়ঙ্কর ঘৃণা সত্ত্বেও এক্ষণে বিবাহ করিতে অগ্রসর হওয়ায় তুমি নিশ্চয়ই বিশেষ বিস্মিত হইবে, কিন্তু যখন তুমি আমার হৃদয়হারিণীকে দেখিবে তখন তোমার আর বিস্ময়ের কোনই কারণ থাকিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহাকে আমার শূন্য হৃদয়ের অধিশ্বরী করিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন অতি সুখেই কাটাইতে পারিব। সে আমাকে বুঝিয়াছে, এবং আমিও তাহাকে বুঝিয়াছি, তাহাকে যদি জীবন সঙ্গিনী করিতে না পারিলাম তাহা হইলে আর জীবনে সুখ কি ? তুচ্ছ ৫০।৬০ বৎসরের তারতম্যের জন্য কখনই জীবনের এত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে পারা যায় না। হায় ! ইহারই মত আরো কত উচ্চ বংশের ললনা দারিদ্র্য তাড়নে তাড়িত হইয়া চির জীবনের মত চরিত্র কলুষিত করিয়া পাপের অনন্ত স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। যদি ইহাদের একটীকেও রক্ষা করিতে পারি ; তাহা হইতে আর কি মহৎ কাজ হইতে পারে ? এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যদি আমার ন্যায় ব্যক্তি আত্মোৎসর্গ না করে, তবে আর কে করিবে ? হয় ত শেষ জীবনে আমিই একটা এ সংসারে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারিব। যাক আমি তোমাকে অনর্থক যুক্তি দেখাইয়া বিরক্ত করিতে চাহি না। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তাই এ সংকল্প সর্ব্ব প্রথম তোমাকেই জানাইতেছি।

স্ত্রীলোককে চিরকাল তাচ্ছিল্যই করিয়া আসিয়াছি, কাজেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তুমি অনেক নাটক নভেল পড়িয়াছ, জীবনের প্রায় তৃতীয়াংশকাল স্ত্রীলোকের সহিত কাটাইলে, তুমি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। কি উপায়ে এবং কি ভাবে এই সঙ্কল্প প্রকাশ করা যায়,—পত্র পাঠ আমায় লিখিয়া জানাইবে। কোন ক্রমে এ কথা একবার তাহাকে জানাইতে পরিলেই আমি নিশ্চয় জানি, সে আশাতীত আনন্দের সহিত সম্মত হইবে। ইতি—

তোমার

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

(১২)

২০শে শ্রাবণ, ১৩২১

প্রাণের সই !

এখানে ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; বুড়োকে বশ করিতে যাইয়া আমি এত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছি যে, বুড়ো শুধু বশ হয় নাই আমাকে ভালবাসিয়াও ফেলিয়াছে। লজ্জার কথা আর লিখিব কি, ঠাকুরদাদা মহাশয় আমাকে বিবাহ করিতে চান।

কাল রাত্রে যখন তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া নানাবিধ গল্প করিতে-ছিলেন, তখনই তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। বদরসিক বুড়োকে ক্রমেই আমার গা ঘেসিয়া বসিতে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল কিন্তু সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, দোষ নাই ভাবিয়া বহুকষ্টে মনের ভাব মনেই দমন করিতে ছিলাম। কিন্তু আজকে যখন তাঁহার ধন সম্পত্তির কথা তুলিয়া আমাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, তখন সত্যই আমি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম। বুড়োর বিনয় ও মিনতিপূর্ণ বাক্যে আমি বহুকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, আপনার আশ্রয়ে থাকা অপেক্ষা আমার এমন কি সৌভাগ্য হইতে পারে। কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার জন্য আমায় কিছুদিন সময় দেওয়া উচিত। বুড়ো আমার কথায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমাকে চিন্তা করিবার জন্য সাত দিন সময় দিয়াছেন। কি যে হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। শীঘ্রই বুড়োকে জবাব দিতে হইবে। বিবাহে অমত করিয়া তাহার নিকট আর কিছুতেই দাসীগিরী করা চলিবে না ;—তখন নিশ্চয়ই আমাকে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তাহার পর যখন সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ হইবে তখন না জানি, কি ভয়ঙ্কর গণ্ডোগোলই উপস্থিত হইবে। প্রতারণা করা যে কি ভয়ানক অন্যায় কাজ তাহা এক্ষণে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার চারি দিক হইতে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ভাই, আমার অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়। ইতি—

তোমার সই—
বীণাপাণি।

(১৩)

২০শে শ্রাবণ, ১৩২১

প্রিয় দুর্গাদাস !

আজ মফস্বঃল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমার পত্র দুইখানি পাইলাম। বাড়ী না থাকায় পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। কারবারের নানা গোলযোগে আমি এরূপ জড়িভূত হইয়া পড়িয়াছি যে আমার সময় এখন নাই বলিলেই হয়, তথাপি তোমাকে তোমার পাগলামি হইতে নিরস্ত করিবার জন্ম তাড়াতাড়ি এই কয়েক ছত্র লিখিলাম। তুমি লিখিয়াছ, এ বৃদ্ধ বয়সে বিবাহে ক্ষতি কি, আমি বলি ক্ষতি যথেষ্ট।

আমার বিশেষ অনুরোধ বিবাহের মতলব অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। বয়স আধিক্যে ও রূপমোহে তোমার বোধ হয় স্মরণ হয় নাই যে, বিবাহের বয়স তোমার নিকট হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস রোগে তোমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উন্মাদ ভিন্ন এ বয়সে বিবাহের মতলব আর কাহারও হইতে পারে না। ইতি—

তোমার

শ্রীমথুরচন্দ্র দাস।

(১৪)

২২শে শ্রাবণ, ১৩২১

প্রিয় মথুর !

আমি তোমার পত্রের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। আমার মাথা খারাপ হয় নাই, যদি মাথা কাহারও খারাপ হইয়া থাকে তবে সে তোমার। তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই আমি বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলাম, সে আনন্দের সহিত সম্মতি দিয়াছে। তবে প্রস্তাবটা বড় সহসা হওয়ায় সে চিন্তার জন্ম কিছু দিনের সময় লইয়াছে মাত্র। তাহার কথার ভাবে আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি এই সময় লওয়াটা আর কিছুই নয়, ওটা স্ত্রীলোক মাত্রেরই স্বভাব। তুমিত জানই তোমাকেই কতবার বলিতে শুনিয়াছি, 'মেয়েদের বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না;' নিজেদের আত্মমর্য্যাদা কেমন করিয়া রাখিতে হয় তা এরা বেশ জানে। বড়ই দুঃখের বিষয় যাহা কাহারও নিকট হাস্যজনক ও অসম্ভব হইল না, তাহাই কেবল তোমার নিকট পাগলামী হইল। আশা করি ফেরত ডাকে এই বিবাহে তোমার আনন্দ সূচক পত্র পাইব। ইতি—

তোমার

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

(১৫)

২৪শে শ্রাবণ, ১৩২১

প্রাণের সই !

ক্রমে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। বুড়ো নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার খেয়ালে ভাবিয়াছে আমি নাকি বিবাহে সম্মত হইয়াছি। আজ কাল তাহার গৃহে যাইলে তাহার মোরচে-ধরা ভালবাসা ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া নানা প্রকারে আমার সম্মুখে ধরিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। আমার স্বামীতো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। আমাদের আর কোন বুদ্ধিই যোগাইতেছে না। তুমি যদি এখন এ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য তোমার বুদ্ধির থলে হইতে কিছু ধার দিতে পার, তবে বিশেষ উপকার হয়।

তোমার সই—বীণাপাণি।

(১৬)

২৬শে শ্রাবণ, ১৩২১

প্রিয় দুর্গাদাস !

তুমি একেবারে সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গিয়াছ। যে তোমার সন্তানের সন্তান হইবার উপযুক্ত, তাহাকে তুমি কোন হিসাবে বিবাহ করিতে যাইতেছ ? এ কথা লিখিতে তোমার বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। তোমার ন্যায় বৃদ্ধ ;—যাহার জীবনের শেষ ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে,—ইহাতেও কি বুঝিতে পারিতেছ না সে বিবাহে সম্মতি দিয়াছে বটে, কিন্তু সে বিবাহ তোমার সহিত নহে, তোমার সম্পত্তির সহিত। সে তোমাকে চায় না, তোমার টাকা চায়। আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, তোমার বয়সেও লোকে স্ত্রীলোকের ফাঁদে পড়ে। একবারও কি ভবিষ্যৎ ভাবিতেছ না। বৃদ্ধ বয়সে যুবতীকে বিবাহ করিলে বাকী জীবনটা কিরূপ ভয়াবহ দুঃসহ হইয়া উঠিবে! নিজের সমস্ত আরাম-টুকু নষ্ট করিয়া একটা যুবতী রমণীর দ্বারা চালিত হইতে হইবে ; তখন তোমার ওই কালামুখ লইয়া কিরূপে বন্ধুবর্গের সম্মুখে বাহির হইবে ? সমাজে সমস্ত লোক অঙ্গুলী হেলাইয়া দেখাইবে, এই সেই লোক—যে বৃদ্ধ বয়সে এক খেলোয়াড় রমণীর পাল্লায় পড়িয়া একেবারে উজবুক বনিয়া গিয়াছে। সেটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? না একেবারেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ,

একেবারে নাছোড় বান্দা। আমার বিশেষ অনুরোধ এখনও এই বুড়োর পরামর্শ লইয়া সময় থাকিতে সাবধান হও! ইতি—

তোমার

শ্রীমথুরচন্দ্র দাস।

(১৭)

২৯শে শ্রাবণ ১৩২১

প্রিয় মথুর!

তোমার শেষ পত্রে আমায় ভাবিত করিয়াছে; আকস্মিক মোহে সত্যই আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম। বালিকার সেবায় ও যত্নে আমি এমনিই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে অনেক বিষয়ই আমি মোটেই লক্ষ্য করি নাই। বিবাহের কথা পাড়িবার পর হইতেই তাহার ব্যবহারের আকাশ পাতাল তারতম্য দেখিতেছি। এক্ষণে আর সে যত্ন ও সেবা নাই,—প্রতি পদেই অতি সুস্পষ্ট শৈথিল্য প্রকাশ পাইতেছে। আমার নিকট হইতে যাহাতে দূরে দূরে থাকিতে পারে সাধ্যানুযায়ী তাহারি চেষ্টা করে। তাহার এই অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া অতি সহজেই অনুমান হয় যে, সে কেবল আমার ন্যায় বৃদ্ধকে অর্থের লোভেই বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু আমার অবস্থা কতকটা সাপের ছুঁচা গিলিবার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, না পারি গিলিতে, না পারি উগ্‌রাইতে। বিবাহের অলঙ্কারের জন্য সেক্‌রাকে ৫০০৲ শত টাকা বায়না দিয়াছি, পশ্চিমে প্রায় সমস্ত বন্ধুকেই এ বিবাহে যোগ দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছি; মোটকথা বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়ের মধ্যে এ কথা জানিতে আর কাহারও বাকি নাই। এক্ষণে যদি বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে। তা'ছাড়া এরূপ স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মান মর্য্যাদার ভয় একেবারেই রাখে না। এখন বিবাহে পশ্চাৎপদ হইলে সে অক্লেশেই আরোও নানারূপ মিথ্যা কলঙ্ক আমার নামে সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিতে পারে। তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার আর মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। এখন পুরাতন বন্ধুর সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া অবিলম্বে সৎপরামর্শ দানে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর। ইতি—

তোমার

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

(১৮)

২রা ভাদ্র ১৩২১

প্রিয় দুর্গাদাস !

যাহা হউক তোমার যে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাতেই ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বড়ই বিলম্বে। কিন্তু কেলেঙ্কারী হইবার ভয় করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। জীবনের তৃতীয়াংশ-কাল স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া এবং ঘটনাচক্রে বহু স্ত্রীলোকের সম্পর্কে আসিয়া যে টুকু স্ত্রী-চরিত্র বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি কিছু অর্থ পাইলেই এই স্ত্রীলোক তোমাকে সমস্ত কেলেঙ্কারী হইতে রেহাই দিবে। ইহা ব্যতীত তোমার তো আরও এক সহজ উপায় রহিয়াছে,— যদি সত্যই এ বালিকা সদ্বংশের হয়, যদি সত্যই দারিদ্র্য তাড়নে ইহার এ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে ইহার সহিত তোমার নাতির বিবাহ দিতে পার। সত্যই তাহা হইলে সমাজের এক মহৎ উপকার করা হইবে। ইহাতে তোমার বন্ধুবর্গের নিকটেও হাস্যস্পদ হইতে হইবে না এবং বিবাহে উপস্থিত হইয়া তোমার পরিবর্ত্তে তোমার নাতিকে দেখিয়া তাহারা এ রহস্যে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিবে। তোমার পক্ষে এ কার্য্য অতি সহজেই হইতে পারে, কারণ তোমার বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিলে কিছুতেই সে তোমার অবাধ্য হইতে পারিবে না। তবে নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ডস্বরূপ যে দিকেই হউক তোমার কিছু ব্যয় হইবে। ইতি—

তোমার

শ্রীমথুরচন্দ্র দাস।

(১৯)

প্রাণের সই ! ৫ই ভাদ্র ১৩২১

এ দিকে এক মজার ব্যাপার ঘটিয়াছে। ঠাকুরদাদা মহাশয় আমাকে কিছু ঘুষ দিয়া বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি চান। সহসা এরূপ মতের পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি, ব্যাপারটা তোমায় খুলিয়াই লিখি। কাল যখন আমি বুড়োর ঘর পরিষ্কার করিতেছিলাম,—বুড়ো ঘুমাইতেছে ভাবিয়া আমার স্বামী নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া চুপি চুপি আমার পশ্চাৎ হইতে আমাকে চুম্বন করেন। যখন আমরা পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ, সেই সময় পালঙ্কের দিকে

নজর পড়ায় দেখি বুড়ো অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল চোকে আমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছে। আমার স্বামীতো এই দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ হইতে চম্পট;—আমিতো লজ্জায় আড়ষ্ট। বুড়ো কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ না করিয়া, তাঁহাকে বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি দিতে বলিলেন। এবং এই বিবাহের কথা গোপন রাখিবার জন্ত আমাকে যথেষ্ট ঘুষ দিতেও চাহিয়াছেন।

বুড়োকে তাহার এই অলীক বিবাহের ধারণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে আমি পরম আহ্লাদের সহিত সর্ব্বদাই রাজী। টাকাটা লইবার উপায় থাকিলে এরূপ টানাটানির সময় লোভ সম্বরণ করিতে পারিতাম কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু বড়ই ঘৃণার বিষয় যে, ঠাকুরদাদা মহাশয় আমাকে অতি নীচ, চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক ভাবিয়াছেন এবং আমার স্থায় চরিত্রহীনা তাঁহার স্ত্রী হইবার একেবারেই উপযুক্ত নয় বলিয়া আমাকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়া বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছেন। কিন্তু এ দিকে আসল কথা প্রকাশ করিবারও উপায় নাই; আমার স্বামী বাটী ফিরিলেই অতি অবশ্য যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, সে কথা তিনি আমাকে বলিতে বলিয়াছেন। বুড়ো নিশ্চই আমার স্বামীকে বলিবে, আমি অতিশয় কুচরিত্রা ও অর্থলোলুপ স্ত্রীলোক এরূপ স্ত্রীলোককে এক মুহূর্ত্তও বাটীতে স্থান দেওয়া উচিত নয়, অবিলম্বে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক। কি যে করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না,—মহা মুস্কিলেই পড়িয়াছি। ইতি।

তোমার সই—বীণাপাণি।

পুঃ—উদ্দেশ্য মন্দ না হইলেও প্রতারণা করা বড়ই বিপদজনক। ইহা আমি নিজের উপর দিয়াই বেশ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি।

(২০)

৭ই ভাদ্র, ১৩২১

প্রিয় পরেশ!

আজ তোমায় এক মজার খবর লিখিতেছি। আজ দুই দিন হইল আমার একখানা বড় ছবি বিক্রয় হওয়ায় সেই আনন্দ-সংবাদটা বীণাকে দিবার জন্ত তাহার সন্ধানে এ ঘর সে ঘর ঘুরিয়া দেখি সে ঠাকুরদার ঘর পরিষ্কার করিতেছে। বুড়ো ঘুমাইতেছে ভাবিয়া আমি বীণাকে চমকিত করিবার জন্ত নিঃশব্দে পশ্চাৎ হইতে যাইয়া তাহার গণ্ডে চুম্বন করি। কিন্তু

বুড়ো ঘুমায় নাই, দেখি মিট্‌মিট করিয়া চাহিতেছে ;—দেখিবা মাত্রতো আমি তৎক্ষণাৎ সে গৃহ ছাড়িয়া একেবারে বাটীর বাহিরে। তারপর যখন সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিলাম তখনতো বুড়ো আমায় ডাকিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা। "স্ত্রীলোককে চুম্বন করা কত বড় গুরুতর অপরাধ, এই চুম্বন হইতে কত রকম পাপের অনুষ্ঠান হইতে পারে—কত রকম রোগের বীজাণুর আক্রমণ হইতে পারে ইত্যাদি!" আমিতো বর্ণপরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের মত অবনত মস্তক—মুখে একটীও কথা নাই। শেষে বলিলেন যখন তুমি এই স্ত্রীলোককে চুম্বন করিয়া উহার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছ, তখন তোমায় উহাকে বিবাহ করা উচিত। আর তুমি যে পাপ করিয়াছ ; বিবাহই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আমি ভাবিয়াছিলাম একবার বলি আপনি যখন বলিতেছেন তখন আর উপায় কি—ইত্যাদি, আর বুড়োর পয়সায় পুনরায় আর একবার বেশ জাক জমকের সহিত বীণাকে বিবাহ করি, কিন্তু বীণা কিছুতেই রাজী হইল না, সে বলে অনেক প্রতারণা করা হইয়াছে, এবার সব কথা প্রকাশ করিতেই হইবে। তাতে যে ফলই হউক না কেন। কাজে কাজেই বুড়োকে সব কথা বলিতে হইল। আমরা পূর্ব্ব হইতে বিবাহিত শুনিয়া কিছুক্ষণ বুড়োতো বিস্ময়ে আমাদের উভয়ের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে বৃদ্ধ হঠাৎ উল্লাসিতের ন্যায় সহাস্যে বলিলেন, আমি যদি তোমার জন্য পাত্রী পছন্দ করিতাম তাহা হইলে এই পাত্রীকেই পছন্দ করিতাম। আমরা যা ভয় করিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তখনি তখনি মাসহারা ডবল হইয়া গেল, এবং বিবাহের জন্য যে সকল অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছিল, আমাদের বিবাহের যৌতুকস্বরূপ সে সমস্তই বীণাকে প্রদান করিয়াছেন। এতদিন পরে নিশ্চিন্তে বীণাকে বক্ষে তুলিয়া লইতে পারিলাম। ইতি—

তোমার—

গণেশ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

রত্নময়ী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ।

ভালয় মন্দয় সে দিন রত্নময়ীর দিনটা কাটিল। ভালর কথা এই যে প্রভাবতীর সোদরাধিক অতুলনীয় স্নেহ। স্বামীর সঙ্গে দুই একবার দূর হইতে সাক্ষাৎ করা। আর মন্দের মধ্যে—শ্বশ্রূর বিরাগ।

লাভ-ক্ষতির হিসাব করিয়া রত্নময়ী বুঝিল—ব্যাপারটী মন্দের দিকে যায় নাই। ঝাঁটা লাথি, মুখনাড়া খাইয়া শ্বশুর বাড়ীতে দিন কতক পড়িয়া থাকিলেই তাহার আবার সুখের দিন আসিবে। আবার সে শ্বশ্রূর করুণা নয়নে পড়িবে।

আজ-কালকার মেয়ে হইলে হয়ত এরূপে অনাদৃতা ও উপেক্ষিত হইয়া, হয় বিষ খাইত, না হয় কেরোসিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরিত। কিন্তু আমরা প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ সমাজের কথা বলিতেছি। তখন বাঙ্গালীর মেয়ের মধ্যে সহিষ্ণুতা বলিয়া একটা গুণ ছিল।

রূপগৌরবে গরবিনী রত্নময়ীর এ গুণের অভাব ছিল না, কাজেই সে নীরবে সব সহিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল "অবস্থার দাসী হইয়া নারীকে অনেক সহিতে হয়। প্রকৃতির বুকেও যেমন বর্ষা ও বসন্ত আছে। মনের মধ্যে তেমনি বিরাগ অনুরাগ, স্নেহ অনাদর দুই আছে। একটু সহিয়া থাকিলেই পরিণামে আমার জয় হইবে। আমি আবার শ্বশ্রূর নিকট আদর পাইব। আবার এই সংসারে প্রধানা গৃহিণী হইব!

একটা কোন কিছু আশার জিনিষ না পাইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, থাকিতে পারে না। বালকে যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, মানুষও তেমনি আশাকে ক্রীড়নক করিয়া দুঃখ কষ্ট সবই সহ্য করিয়া থাকে। রত্নময়ী এত দিন আশা করে নাই, এখন করিতে শিখিয়াছে। সে এখন গভীর আঁধারের মধ্যে আলো দেখিতে পাইয়াছে।

তবে এত আশার মধ্যে একটা ভাবনা প্রভাবতী। প্রভার সারল্যমণ্ডিত মুখখানা দেখিয়া তাহার বড় একটা মায়া হইয়াছে। প্রভার প্রাণের অকপট ব্যবহারে বুঝিয়াছে তার প্রাণ বড় উঁচু। সপত্নী আশায় সে একটুকও দুঃখিত

নহে, চিন্তিত নহে, বরঞ্চ আনন্দিত। স্বামীত তাহাদের দুজনের। উভয়েরই ত স্বামীর উপর একই প্রকার অধিকার। প্রভা যদি তাহাকে তাহার স্বামীর ভাগ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই বা পারিবে না কেন?

আমাদের বর্ণনা অপেক্ষা প্রভার ও রত্নময়ীর কথোপকথনে, পাঠক প্রভার হৃদয়ের মাহাত্ম্যের অনেকটা পরিচয় পাইতে পারেন। এজন্য গভীর রাত্রে, উভয়ে এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন চলিতেছিল তাহার কতকাংশ আমরা পাঠককে শুনাইতে ইচ্ছা করি।

হরপ্রসাদ রত্নময়ীর আগমনের পূর্ব্বে যখন কোন দেশান্তর হইতে বাটীতে আসিতেন, তখন প্রভাবতীই তাঁহার শয়ন কক্ষ আলো করিয়া থাকিত। কিন্তু রত্নময়ী যে দিন আসিল, হরপ্রসাদ সেদিন বাহিরের ঘরে শয়ন করিলেন। চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন একটী বৈঠকখানার মত কক্ষ ছিল। কক্ষটী অবস্থামত সেকালের রুচি অনুসারে সজ্জিত।

পাছে এক পত্নীকে আশ্রয় করিলে অপরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়, এইজন্য সুবিবেচক সুবুদ্ধিমান হরপ্রসাদ সে দিন বাহিরের কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই নিজের ঘরে না শুইয়া বাহিরে শুইবি কেন?" হরপ্রসাদ তাহার উত্তরে বলিয়াছিল "জানত অধিক রাত্রি অবধি আমার পড়াশুনা করা অভ্যাস। দুই পত্নী যার গৃহে বর্ত্তমান, তার পড়াশুনার অনেক ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।"

হরপ্রসাদের মাতা বুদ্ধিমতী! তিনি এই সামান্য উত্তরের মধ্য দিয়াও তাঁহার পুত্রের সুবিবেচনার পরিচয় পাইলেন। তখন বড় বৌ রত্নময়ীর উপর তাঁহার একটু যেন সহানুভূতি উপস্থিত হইল। সে এতদিন এখানে ছিল না, সেটা স্বতন্ত্র কথা। প্রভাবতী যে ঘরে বাস করে, ধরিতে গেলে সে ঘরও তার। তা হরপ্রসাদ একজনকে তাড়াইয়া দিয়া অপরকে আদর করিয়া সে ঘরে থাকে নাই, তা ভালই করিয়াছে। এজন্য গৃহিণীও পুত্রের ব্যবহারে বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইলেন।

রত্নময়ী যখন শুনিল সে হরপ্রসাদ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সে দিন বাহিরের বৈঠকখানা আশ্রয় করিয়াছেন, তখন সে স্বামীর উপর বড় বিরক্ত হইল। কিন্তু তাহারত কোন ক্ষমতাই নাই। হরপ্রসাদ স্বেচ্ছায় যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ করিবার কোন শক্তিই ত তাহার নাই। কাজেই সে কথাটা মনে মনে চাপিয়া গেল।

রাত্রি তখন দশটা কি এগারোটা। বাহিরের প্রকৃতি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, কিন্তু হরপ্রসাদের শয়ন কক্ষ মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ জলিতেছে। সেই উজ্জ্বল প্রদীপ শীখা, বিদ্যুল্লতা তুল্য রত্নময়ীর মুখে পড়িয়াছে।

প্রভাবতী রত্নময়ীর সম্মুখে বসিয়া আছে। সে এক দৃষ্টে সেই বিদ্যুৎবরণী রমণীর রূপ-জ্যোতির দিকে চাহিয়া আছে।

রত্নময়ীও প্রভার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছিল। রত্নময়ী মুকুর গাত্রে, সরসীর স্বচ্ছ সলিলের উপর কতবার তাহার মোহিনী মুর্ত্তি দেখিয়াছে, কিন্তু সে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুঝিল প্রভাবতীর সেই সারল্য-মণ্ডিত মুখে এমন একটা জ্যোতিঃ, এমন একটা সৌন্দর্য্য আছে, যাহা তাহার নাই।

রত্নময়ী সাদরে প্রভার চিবুকখানি ধরিয়া বলিল "কি দেখিতেছ প্রভা?"

প্রভা তাহার তাম্বুল রাগরঞ্জিত ওষ্ঠ প্রান্তে একটা সরল হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল—তোমার ওই রূপ। আমি তোমাকে দেখিয়া অবধি মনে মনে কেবল ভাবিতেছি—

প্রভা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা যেন তাহার হৃদয় হইতে উঠিয়া ওষ্ঠ প্রান্তে আসিয়া বাধা পাইল।

কিন্তু রত্নময়ী ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে বলিল—কি ভাবিতেছ প্রভা?"

প্রভা এবার আর বিনা উত্তরে অব্যাহতি পাইল না। সে বলিল তুমি এত রূপসী, তোমার কথা এত মিষ্টি, তবু স্বামী কেন যে আমার মত কুৎসিতাকে বিবাহ করিলেন—তাহা বুঝিতে পারি না।"

দর্পিতা রত্নময়ী বলিল—সে কথা একদিন স্বামীকেই জিজ্ঞাসা করিও। আমার চেয়ে তিনি এর ভাল উত্তর দিতে পারিবেন। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব প্রভা? আমার কাছে গোপন করিবে না ত?

প্রভাবতী। গোপন করিব কেন ভাই!

রত্নময়ী। তুমি কি স্বামীকে খুব ভালবাস?

প্রভাবতী। ভালবাসা যে কাকে বলে, তা এখনও ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি, তিনি যখন আমার কাছে থাকেন, তখন খুব একটা আনন্দ পাই। তিনি কোথাও গেলে, আমার বড় কান্না পায়। তিনি আদর করিলেও আমি আত্মগরিমা বোধ করি না, আবার তিনি যদি কখনও আমায় তিরস্কার করেন, তাহা হইলে আমি সেই তিরস্কারটা

বুঝি আদরেরই অন্য কোন রূপান্তর। আমি সেটাকে মনের মধ্যে না আনিয়া উড়াইয়া দিই।"

[illegible]। তাহলে কিসে তুমি এত সুখী?

[illegible]। তাঁর সেবা করিয়া আমার সুখ। তাঁর সংসারে দাসীর কাজ করিলেও আমি মনে ভাবি, আমি রাজরাণী। তাঁহার কোন অসুখ হইলে আমি খুব ভাবি, নির্জ্জনে খুব কাঁদি। আর নারায়ণের কাছে ঘৃত পরমান্ন মানিয়া বলি—"হে ঠাকুর! ওকে নিরাপদে রাখ, সুস্থ করিয়া দাও।

রত্নময়ী। সত্যই তুমি আদর্শ পত্নী। আমার রূপ আছে, গুণ নাই, মনে দুঃখ করিওনা বোন্! তোমার কথা লইয়াই তোমাকে বলিতেছি, তোমার রূপ নাই, কিন্তু নারীর অতি যোগ্য গুণ-গৌরবে তুমি গৌরবময়ী। আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব প্রভা?

প্রভাবতী। কি কথা দিদি!

রত্নময়ী। আমি তোমার স্বামী কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আমায় তুমি এত যত্ন করিতেছ কেন?

প্রভাবতী এ কথায় মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"আমি তোমায় হিংসা করিব কেন, এই যে কত লোকে কত কামনা করিয়া নারায়ণের সেবা করে, পূজা করে, তারা কি হিংসা করে ভাই! তোমার কামনা লইয়া তোমার ইচ্ছামত স্বামীর সেবা কর, স্বামী সোহাগিনী হও। আমার যদি সে শক্তি না থাকে, তা হইলে আমি দুঃখ করিব কেন ভাই।"

রত্নময়ী বুঝিল—"সত্যই এই প্রভা দেবী। রমণীর এত উচ্চ প্রাণ আমি আর কোথায় কখনও দেখি নাই। সে আবেগ ভরে প্রভাবতীর মুখ চুম্বন করিল। তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আয় প্রভা! আজ আমরা নারায়ণ হীন এই শূন্য মন্দিরে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া রাত্রি যাপন করি।"

রাত্রিটা উভয়ের এই ভাবেই কাটিল। পর দিন প্রভাতে আর এক ব্যাপার উপস্থিত।

হরপ্রসাদ তাঁহার বহির্ব্বাটীতে বসিয়া সাংখ্যের সূত্রগুলি পাঠ করিতেছেন, এমন সময় একজন প্রতিবাসী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, প্রসাদ ঠাকুর, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! নবাব দরবার হইতে দুইজন ফৌজ আপনার বাটীর দিকে আসিতেছে।

কথাটা শুনিয়া হরপ্রসাদও একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন। নিরীহ

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি। তাঁহার বাড়ীতে নবাবের ফৌজ কেন? হরপ্রসাদ পুঁথি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময়ে দুইজন সেপাহী তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিল। তাহার একজন হিন্দুস্থানী ও একজন বাঙ্গালী। তখনকার কালে বাঙ্গালী এত নির্জীব জাতি ছিল না! অনেক বাঙ্গালী নবাব ও বাদসাহের ফৌজে কাজ করিত।

বাঙ্গালী সিপাহী দেখিল তাহার সম্মুখে এক তেজপুঞ্জ কলেবর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দাঁড়াইয়া আছেন। সে মূর্ত্তি দেখিলেই মনে একটা ভক্তি আসে। সিপাহী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল "ঠাকুর! আপনার নামই কি হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।"

হরপ্রসাদ সিপাহী সাহেবের এইরূপ বিনয় নম্রভাব দেখিয়া একটু সাহস পাইলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ আমার নামই হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। কিন্তু তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজন কি?

সিপাহী। আপনার নামে একখানা পরোয়ানা আছে!

হরপ্রসাদ। তুমি নবাব দরবার হইতে আসিতেছ?

সিপাহী। না, আমি ফৌজদার সাহেবের পদাতিক, সপ্তগ্রাম হইতে আসিতেছি। আজ মধ্যাহ্নে ফৌজদার সাহেবের দরবার হইবে। সেই দরবারে আপনাকে সস্ত্রীক উপস্থিত হইতে হইবে।

কথাটা শুনিয়া হরপ্রসাদ একটু চমকিত হইলেন। ফৌজদারের দরবারে তাঁহাদের ডাক পড়িল কেন? সে যে বড় ভয়ানক স্থান! না জানি অদৃষ্টে কি ঘটিবে!

হরপ্রসাদকে এইরূপ চিন্তিত দেখিয়া সেপাহী সাহেব বলিল—"এই পরোয়ানা খানা বাঙ্গালায় লেখা। এ খানা আপনারই নামে লিখিত।"

হরপ্রসাদ আগ্রহ বশে সেই পরোয়ানাখানা লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,—"সুবেদারের মহামান্য ফৌজদার আমজাদআলি খাঁ সাহেব, সপ্তগ্রামের সদরে এক দরবার করিবেন। এই দরবারে, সেই দুর্দান্ত দস্যু ভৈরবানন্দের বিচার হইবে। এ কথা প্রকাশ থাকে যে, ফৌজদারের আমিলদার কমললোচন রায় চৌধুরীর চেষ্টাতেই এই ডাকাত গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই ব্যাপারে কমললোচন রায়ের জামাতা তুমি শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও তোমার পত্নী প্রধান সাক্ষী। তোমাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে, তোমরা সরকারের সাক্ষীরূপে যত শীঘ্র পার ফৌজদার সাহেবের হুকুম তামিল করিবে।"

ফৌজদারের হুকুম, অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। হরপ্রসাদ পরোয়ানাখানি পড়িয়া আশ্বস্ত হইলেন। বিশেষতঃ সেই দরবারে যখন রত্নময়ীর পিতা উপস্থিত থাকিবেন তখন ভয়ের কারণ ত কিছুই নাই।

হরপ্রসাদ সিপাহীদের একখানি মাদুর বিছাইয়া দিলেন। বাটী প্রবেশের পূর্ব্বেই সিপাহীরা তাহাদের ঘোড়া দুইটীকে এক বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা সেই মাদুরীতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

হরপ্রসাদ যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম মাত্র তিনক্রোশ। গ্রামের মধ্যে পাল্‌কীও পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ ভৃত্যকে পাল্‌কী আনিতে আদেশ করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে রত্নময়ী ও প্রভাবতী দুইজনে ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। হরপ্রসাদের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানটী ফলবানবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উদ্যানের মধ্যে কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল সলিলপূর্ণ এক দীর্ঘিকা।

এই বাপীতট সন্নিধানে, এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রত্নময়ী, প্রভার হাত ধরিয়া বলিতেছে—"ভাই! তুই বোধ হয় কোন যাদুমন্ত্র জানিস্। আমার স্বামীকে ত তুই বস্ করিয়াছিস। তার পর আমারও দশা এমন করিলি, যে এক দণ্ড তোকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। "বল—প্রভা! কি মন্ত্র জানিলে স্বামী বশ করা যায়?"

উভয়ের মধ্যে বোধ হয় এই ভাবের আরও কথাবার্ত্তা হইত, কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। বাড়ীর পরিচারিকা। বামার মা আসিয়া সংবাদ দিল—"ও বৌমারা! তোমরা শীঘ্র বাটীর ভিতরে যাও। গিন্নী তোমাদের ডাকিতেছেন।"

উভয়ে ত্বরিতপদে বাটীর মধ্যে আসিল। দেখিল হরপ্রসাদ তাহার জননীর সহিত নিবিষ্ট মনে কথোপকথন করিতেছেন। তাহারা উপরে গিয়া কাপড় ছাড়িল।

ইত্যবসরে হরপ্রসাদ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"রত্নময়ী! নবাবের দরবার হইতে পরোয়ানা আসিয়াছে।"

রত্নময়ী একবারে চমকিত হইয়া বলিল—"কিসের পরোয়ানা?"

হরপ্রসাদ। ভৈরবানন্দের আজ বিচার হইবে। তুমি ও আমি তাহার ঘটনার প্রধান সাক্ষী। ফৌজদার সাহেব আমাদের সপ্তগ্রামে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার সিপাহীরা বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্রাম করিতেছে। পাল্কী আনিতে পাঠাইয়াছি, তুমি প্রস্তুত হও।"

হরপ্রসাদ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রত্নময়ী নীচে নামিয়া আসিয়া তাহার শাশুড়ী যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে গেল। শাশুড়ীর চরণ বন্দনা করিয়া বলিল—"মা! আশীর্ব্বাদ করুন। আমরা বড়ই বিপদের মুখে যাইতেছি।"

মাতা প্রসন্ন মুখে বলিলেন—"যদি আমার বাড়ীতে নারায়ণ থাকেন, আর তাহার সেবা আমরা ঠিক করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমাদের কোন বিপদই ঘটিবে না।"

রত্নময়ী শাশুড়ীর পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত, এমন সময়ে শাশুড়ী ঠাকুরাণী ডাকিলেন—"বড় বৌমা!"

রত্নময়ী। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কেন মা?"

গৃহিণী বলিলেন—"শুনিলাম সেখানে তোমরা পিতা উপস্থিত থাকিবেন। দরবার শেষ হইয়া গেলে, তুমি পিতৃগৃহেই যাইও। এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই!"

কথাটা শুনিয়া রত্নময়ী চমকিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল তাহার শাশুড়ীর প্রাণ অতি পাষাণ! এত করিয়া পায়ে ধ'রে, সাধা, কাঁদা, হীনতা স্বীকার করার পরও যখন তাঁহার প্রাণ কোমল হ'ল না, তখন আর সুখের আশা কোথায়?"

শাশুড়ীর এই কথাটা শুনিয়া রত্নময়ীর চোখে জল আসিল। সে সাধ্যমত সেই অশ্রুধারা গোপন করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। প্রভাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"ভাই! তোমার স্নেহের ঋণ আমি এ জীবনে ভুলিব না। আমায় বিদায় দে? রত্নময়ী এই কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রভাবতী বলিল—"দিদি! শাশুড়ী তোমার এই মাত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু দিদি ওঁর বয়স হইয়াছে। কি বলিতে কি বলেন, তার ঠিক নাই। এ তোমারই ঘর-কন্না দিদি! তুমি আবার আসিও। আমি দাসীরূপে তোমার সেবা করিব। তুমি রাজরাণীরূপে এই গৃহে বিরাজ করিবে।

রত্নময়ী প্রভার এই স্নেহময় কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে প্রভাকে বুকে টানিয়া লইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে হরপ্রসাদ সেখানে সহসা উপস্থিত হইলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারও চোখে জল আসিল। সতীনে সতীনে, এক রাত্রের মধ্যে এত ভাব? তবে কি তিনি দুইটী অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছেন!

হরপ্রসাদ বলিলেন—"রত্নময়ী পাল্কী আসিয়াছে। দূরের পথে আমাদের যাইতে হইবে।"

রত্নময়ী বিনা বাক্যব্যয়ে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। নারায়ণের মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, আবার শাশুড়ীর পদধূলি লইয়া পাল্কীতে উঠিল।

হরপ্রসাদ নিজের জন্ত একখানি ডুলি আনাইয়া ছিলেন। নবাবের সিপাহী বেষ্টিত হইয়া, এই পাল্কী ও ডুলি—গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিয়া মাঠের রাস্তায় পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

তখন সপ্তগ্রাম একটী প্রধান বাণিজ্য বন্দর। সরস্বতী তখন এমন ভাবে মজিয়া যান নাই। সপ্তগ্রাম জনাকীর্ণ সহর। রাস্তাঘাট বিপনী, হাট, গঞ্জ, প্রভৃতিতে সমাকীর্ণ সপ্তগ্রাম তখন একটী গণনীয় নগরী। তাহার উপর এই সপ্তগ্রাম মোগল সরকারের একটী প্রধান মহকুমা। এই মহকুমার অধীনে অনেকগুলি পরগণা ছিল। সপ্তগ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা একজন ফৌজদার। এই ফৌজদারের হস্তে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয় ক্ষমতাই ন্যস্ত ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ের ফৌজদার ছিলেন—নবাব আমজাদ আলি খাঁ বাহাদুর।

আমজাদ আলি অতি জবরদস্ত ফৌজদার। তাঁহার ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। অসংখ্য সেনাবল তাঁহার অধীনে। বাঙ্গালার সুবেদার নবাব সায়েস্তা খাঁর তিনি নিকট আত্মীয়। এজন্ত তাঁহার ক্ষমতা প্রতিপত্তি কিছু বেশী।

আমজাদআলি খাঁ বহুদিন ধরিয়া এই ডাকাত ভৈরবানন্দকে ধরিবার চেষ্টা, করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই।

রত্নময়ী যে সময়ে ডাকাত ভৈরবানন্দের হাতে পড়ে, সেই সময়ে তাহার একজন দাসী কোনক্রমে পলাইয়া কমললোচন রায়কে ভৈরবানন্দের গুপ্ত আশ্রয় স্থানের সংবাদ দিয়াছিল।

কমললোচন রায় ফৌজদারের প্রধান আমিলদার। তাঁহার অধীনে দুই শত সেপাহী আছে। ইহাদের পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী ও দেড় শত পদাতিক। কমললোচন ভৈরবানন্দের সন্ধান পাইয়া মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন। তাহাকে জীবিতাবস্থায় ধরিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার, পদোন্নতি ও

খেলাত লাভ হইবে। কমললোচন দাসীর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিলেন—"দুর্দান্ত ডাকাত ভৈরবানন্দকে ধরিবার ইহাই প্রধান সুযোগ।"

কমললোচন স্বয়ং পুরোবর্ত্তী হইয়া এক শত সেনা লইয়া ডাকাত ধরিতে চলিলেন। দাসীই তাঁহার পথ-প্রদর্শক। কি প্রকার অবস্থায় তিনি ভৈরবানন্দের পুরী বেষ্টন করেন, তাহার বিবরণ পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

কমললোচনকে এ বিষয়ে বেশী কষ্ট করিতে হয় নাই, কারণ তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার জামতা হরপ্রসাদ সুরার সহিত আফিং গুলিয়া দিয়া, তাঁহার ভবিষ্যৎ কষ্টের লাঘব করিয়া দিয়াছিলেন। ভৈরবানন্দের দল যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত, নেশায় বিভোর না হইত, তাহা হইলে কমললোচনকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত।

সেদিন ফৌজদারের দরবার খুব জনতাপূর্ণ। স্বয়ং আমজাদআলি খাঁ, বিচারাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দুই পার্শ্বে রাজকর্ম্মচারিগণ। দক্ষিণ পার্শ্বে কমললোচন রায়। কমললোচনের নিকটে দাঁড়াইয়া হরপ্রসাদ। পার্শ্বের একটি কক্ষে রত্নময়ী অপেক্ষা করিতেছিল।

ভৈরবানন্দকে লোকে মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন ও অজেয় বলিয়া বিবেচনা করিত। আবার দরিদ্র লোকে খুব ভালবাসিত। কেননা সে গরীবের মা বাপ ও ধনীর পরম শত্রু!

ভৈরবানন্দ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় প্রহরী বেষ্টিত হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান। নবাব মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন—"ভৈরব ডাকাত, তুমি আমার প্রধান কর্ম্মচারী এই কমললোচন রায়ের কন্যাকে আবদ্ধ করিয়াছিলে? সত্য কথা বল। মিথ্যা বলিলে তোমার দণ্ড অতি শোচনীয় হইবে।

ভৈরবানন্দ যখন দেখিল, হরপ্রসাদ ও রত্নময়ী সেখানে সশরীরে, তাহার অপরাধের জীবন্ত সাক্ষীরূপে উপস্থিত, তখন সে অম্লান বদনে সকল কথাই স্বীকার করিল।

নবাব গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন—"তোমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিব। আজীবন তুমি কারাবদ্ধ থাকিবে।"

দণ্ড ব্যবস্থা শুনিয়া সভাস্থল কাঁপিয়া উঠিল; নবাব আমজাদ আলি বড় জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা। তিনি যাহা বলেন তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না।

এমন সময়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য! অবগুণ্ঠনবতী রত্নময়ী সহসা সভাস্থলে আবির্ভূত হইয়া বলিল—"জনাব! মেহের বান, ধরিতে গেলে আমিই

এ মোকদ্দমায় বাদিনী। হুজুরের দরবারে আমার একটা প্রার্থনা আছে। জনাবালি! "এই ভৈরবানন্দ আমাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল বটে; কিন্তু এ আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছিল। ইচ্ছা করিলে আমার উপর অনেক অত্যাচার করিতে পারিত. কিন্তু তাহা করে নাই। ইহাকে কারাবদ্ধ করিবেন না—অঙ্গহীন করিবেন না—দাসীর এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন নবাব।"

সহসা এই সময়ে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য বশে, রত্নময়ীর অবগুণ্ঠন তাহার মাথা হইতে সরিয়া পড়িল। তাহার সমুজ্জ্বল অপ্সরা কান্তি, নবাব আমজাদ আলির নেত্রগোচর হইল। সে রূপ দেখিয়া নবাবের সমগ্র দেহে যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—কি সুন্দর রূপ—এই কমললোচন রায়ের কন্যা! এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই!"

নবাব রত্নময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার একটি অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে স্বীকার করিতেছি। অপরটী পারিব না। তোমার প্রার্থনায় ইহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করিব না। কিন্তু প্রজার শত্রু, এই রাজ্যের শান্তির শত্রু, এই ডাকাতকে আজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব! এই ব্যাপারে সরকার হইতে যে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, তাহা তোমার পিতা খেলাত পাইবেন ও তাঁহার পদোন্নতি হইবে।"

রত্নময়ী ইতিপূর্ব্বেই তাহার মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল। নবাবের এই আদেশ শুনিয়া একটী সেলাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রত্নময়ীর এই উদারতা ও ক্ষমাগুণ দেখিয়া সভাশুদ্ধ সকলে বিস্মিত হইয়া তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

নবাবের আদেশে তখনই সভাভঙ্গ হইল। জনপূর্ণ সভা জনশূন্য হইয়া পড়িল। নবাব তাঁহার কর্ম্মচারীদের বিদায় দিলেন। সেই দরবার কক্ষে তখন আর কেহই নাই—কেবল কমললোচন, হরপ্রসাদ ও রত্নময়ী।

নবাব প্রসন্ন মুখে কমললোচন রায়কে বলিলেন—"ধন্য তুমি কমললোচন রায়, এমন রূপসী কন্যার পিতা তুমি। এমন সুন্দর রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। ইহার রূপের অপেক্ষা প্রাণের উদারতা আরও বেশী।" আর কিছু না বলিয়া নবাব যেন চিন্তিত মনে দরবার গৃহ ত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ } আশ্বিন, ১৩২২ সন { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আয় মা !

আয় মা জননী বিশ্ব-ধরণী বাজায়ে নূপুর পায়,
রণ-তাণ্ডবে নাচিছে বিশ্ব শান্তিরূপিণী আয়।
কাঁদিছে বাঙ্গালী বাঙ্গালার ঘরে, এক মুটী শুধু অন্নের তরে,
দৈন্যের মাগো হাহাকার রবে আকাশ ভরিয়া যায়,
আয় মা জননী বিশ্ব-ধরণী শান্তিরূপিণী আয়॥

* * *

নির্ম্মল এই শারদ প্রভাতে আশা পথ চাহি তোর ;
দুঃখ দৈন্য ভুলেছে বঙ্গ, মুছিছে নয়ন লোর।
ঢাল মা করুণা আশীষের ধারা, বহুক বঙ্গে শান্তির ধারা,
দুদিনের তরে কাঙ্গালি বাঙ্গালি আনন্দে হউক ভোর,
নির্ম্মল এই শারদ প্রভাতে মুছা মা নয়ন লোর।

অন্নপূর্ণারূপে আসিয়া বঙ্গে, কর মা অন্ন দান,
আয় মা শঙ্করী, এসেছে শরৎ বরষার অবসান।
বঙ্গে আবার আসুখ শান্তি, ঘুচে যাক সব ভুল ভ্রান্তি,
বঙ্গালার তাই ঘরে ঘরে আজ তব আবাহন গান
আয় মা শঙ্করী, এসেছে শরৎ বরষার অবসান।

আত্মদান।

(১)

শীতের সন্ধ্যা কুয়াশায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে গ্রামখানির উপর আলো-আঁধারের একটা অস্বচ্ছ আবরণ ঢাকিয়া দিতেছিল। তখন ফসলের সময়, কৃষকেরা ক্ষেতের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া, কেহবা আগুণ পোহাইতেছিল, কেহবা বিশ্রামের পর পুনরায় কাজে লাগিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কুয়াশা ও ধূমরাশি একত্রে মিলিয়া গ্রামখানিকে নিবীড় অন্ধকারের একটা বিরাট স্তূপে পরিণত করিয়াছিল।

বৃদ্ধ গোপালদাস একা প্রভুর ক্ষেত্রে আগুণ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সে যতই অগ্নিকুণ্ড ঝাড়িয়া দিতেছিল এবং ফুঁ দিয়া চক্ষু লাল করিতেছিল, ততই আগুণ না জ্বলিয়া, কেবল কুণ্ডলী আকারে ধূমরাশি নির্গত হইয়া বায়ু প্রবাহে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

ক্ষেত্রখানি ছোট—চারিদিকে বন্যলতা ও কাঁটা গাছের বেড়ায় ঘেরা, প্রবেশ পথে একটা পুরাতন বাদাম গাছ। গোপালের অবিশ্রাম চেষ্টায় আগুন একবার জ্বলিতে একবার নিবিতে লাগিল, তাহার ক্ষীণ শিখায় বাদামগাছের তলায়—সেই আলো-অন্ধকারে নানা প্রকার ছায়াচিত্রের সৃষ্টি করিতেছিল।

সহসা সেখানে এক দীর্ঘকায় মনুষ্যের ছায়া পড়িল। ছায়া দুই চারিবার হেলিল দুলিল, তার পরে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে সেইখানে আলোক অন্ধকারে-নৃত্যশীল অদ্ভুত ছায়াচিত্রের মধ্যে সেই ছায়া অস্বাভাবিক দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। হঠাৎ অন্য মনস্ক গোপালের দৃষ্টি তাহার প্রতি পতিত হওয়ায় সে ভয়ে বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

চারিদিক নীরব। পার্শ্বে বা নিকটে অন্য কেহ ছিল না,—বন্য-ঝোপ পূর্ণ ফাঁকা মাঠ ও মধ্যে মধ্যে দুই চরিটা বৃদ্ধ বৃক্ষ বিরাটকায় দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া ছিল। গোপালের মনে বড় ভয় হইল, প্রাচীন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে মনে মনে রাম নাম স্মরণ করিতে লাগিল; তাহার বাকরোধ হইল; শিথিল হস্তমুষ্টি হইতে কোদালখানি খসিয়া পড়িয়া গেল।

ছায়া ধীরে ধীরে গোপালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল না, বাদাম তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। গোপাল বিস্ময়ে দেখিল এক

খানি অতি দীর্ঘ হাত তুলিয়া সে তাহাকেই ইসারায় ডাকিতেছে। গোপাল ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিল, অমনি একটা তীক্ষ্ণ শিশের শব্দ হইল—হাতখানি আবার তাহাকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। তখন সাহসে ভর করিয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, কিন্তু আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে তাহার ভয়ের অধিক হইল—বিস্ময়ের মাত্রা শতগুণ বাড়িয়া গেল। তাহার প্রভু অনাথনাথ তাহাকে সেইরূপ ভাবে ইঙ্গিত করিতেছিল।

অনাথনাথের মুখ পাংশুবর্ণ, চক্ষু কোটরাগত, ললাট স্ফীত, কেশ বিশৃঙ্খল। কেমন যেন একটা মহা ভয়ে তাহার মুখশ্রী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল শরীরে যেন মূর্ত্তিমান আশঙ্কা বিরাজ করিতেছিল।

স্তম্ভিত ও বিস্মিত বৃদ্ধ কম্পিতস্বরে বলিল—"এ—এ—এ—কি ?"

চুপ, কথা বলিসনি, খুন করে এসেছি ?" অনাথ সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একবার আপনার চারিদিকে চাহিল।

"সর্ব্বনাশ—খুন—এঁ্যা" বলিতে বলিতে প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইল।"

"হাঁ—খুন—এই মাত্র—এই হাতে। কেউ—কেউ জানে না।

বৃদ্ধের ভূতের ভয় তখন দূরে পলাইয়াছিল, তাহার স্থানে একটা মহা বিভীষিকার চিত্র রক্তাক্ত কলেবরে চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল। সে আর কিছুই দেখিতে ছিলনা—কেবল সেই চিত্র একটা কল্পনার অতীত বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরিয়া চারিদিক হইতে যেন তাহাকে গিলিতে আসিতেছিল। সে আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া অনাথ ধমক দিল—"শুনছিস্—এই গাধা ?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, সব কথা মনে পড়িল, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"এঁ্যা খুন—তুমি—কাকে ?"

"শিবনাথকে, ভূতো বিলের ধারে—এই কতক্ষণ।"

"কি করবে এখন ?

"জানিনা—মাথা গুলিয়ে গেছে। একবার রেণুকার সঙ্গে দেখা করবো, নইলে বুদ্ধি যোগাবে না। পরে যা হয় হবে।"

অনাথনাথ আর দাঁড়াইল না। ভীত—কল্পনাক্লিষ্ট বৃদ্ধকে তাহার মনগড়া বিভীষিকারাশির মধ্যে একা রাখিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

(২)

গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটীর সম্মুখের দালানে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। সেখান হইতে একটি পরিচ্ছন্ন অল্প পরিসর রাস্তা বরাবর সোজা গিয়া প্রাচীর ঘেরা ফটকে মিলিয়াছিল। সেই আলোকে রাস্তার অনেকখানি ও তাহার দুই পার্শ্বের ফুল বাগানের কতক কতক স্থান আলোকিত হইয়াছিল।

দালানের মধ্যস্থলে একটা ছোট টেবিলের সম্মুখে বসিয়া এক প্রৌঢ় দম্পতি চা পান করিতেছিল, পার্শ্বে একখানা আরাম কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া এক যুবতী পুস্তক পাঠ করিতেছিল, বৃদ্ধা দাসী বাগানের এক পার্শ্বস্থ রসুই ঘর হইতে চায়ের উপকরণ সকল একে একে আনিয়া জোগাইতেছিল।

অনাথনাথ ধীরে ধীরে ফটক ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইল সেখান হইতে দালানের সমস্তই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, সেই বেশে ও সেই ভাবে অগ্রসর হইয়া যাইতে সে আর সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে দাসী যখন রান্নাঘর হইতে দালানের দিকে যাইতেছিল তখন সে তাহাকে মৃদুস্বরে বলিয়া দিল—"একবার চুপি চুপি রেণুকে ডেকে দিস ক্ষেমা, বিশেষ দরকার—আমি আর ওখানে যাব না—দেরী হয়ে যাবে।"

রেণুকার কাছে গিয়া ক্ষেমা কিন্তু ঠিক তেমন চুপে চুপে বলিতে পারিল না—কর্ত্তা গিন্নির কাণে কথাটা গেল। তাহারা বলিল—"তা ওখানে কেন, এদিকে এসনা অনাথ।"

অনাথ উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইয়া অতি কষ্টে স্বর সামলাইয়া বলিল—"আজ্ঞে আজ আর না, দেরী হয়ে যাবে। এখুনি আমাকে যেতে হবে, রেণুকে একটা বিশেষ দরকারী খবর দিতে এসেছি।

ততক্ষণে রেণুকা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং কর্ত্তা গিন্নি আর কিছু বলিতে পারিল না। অনাথনাথকে লইয়া ফটকের বাহিরে গেল এবং এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পথে রেণুকা দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেও অনাথ উত্তর করিল না। যুবতী ভাবিল—গোপনীয় কথা পাছে বাটীর কেহ শুনিতে পায়, সেই জন্য সে চুপ করিয়া রহিল।

নির্জ্জন বৃক্ষতলে আসিয়াও অনাথ প্রথমে কথা কহিতে পারিল না। তখন রেণুকার মনে কেমন একটু সন্দেহ জন্মিল, সেই তরল অন্ধকারে সে তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল,—অনাথের বেশ ও মুখ দেখিয়াই সেই সন্দেহ আরো বাড়িল, উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"একি, কি হয়েছে, কি হয়েছে অনাথ?"

"খুন্ করে এসেছি।"

"খুন্—খুন্ করে এসেছ, সে কি—কাকে?" অগ্নিমধ্যে সহসা বিষধর দেখিলে লোকে যত না চমৎকৃত হয়, সে ততোধিক বিস্মিত হইল।

"শিবনাথকে!"

"শিবনাথকে? সে কি, কেন—কোথায় সে?"

"শুন—সব বলছি। জান ত তোমার জন্য সে আমাকে ভয়ঙ্কর ঘৃণা ও হিংসার চক্ষে দেখে। বিশেষ, এবারে তোমার বাপ্-মা আমাদের বিয়ের কথায় সম্মতি দেওয়াতে, তার সেই হিংসা যেন হাজার গুণ বেড়েছে, আমাকে কায়দায় পেলে বোধ হয় নখে ছিঁড়ে ফেলে। তাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি, তবু সে আমাদের নামে নানা কুৎসা রটাচ্ছে। 'ভুতো দীঘির ধারে গিয়ে আমরা যে পড়ো গাছটার উপরে বসি—সেখানে ছুরি দিয়ে খোদাই করে আমাদের নামে নানা অশ্রাব্য কথা লিখেছে। তাও আমি গায়ে মাখিনি—কিন্তু আজ—আজ বড় ভয়ানক কথা—"

রেণুকা চঞ্চল হইল, তাহার সর্বাঙ্গে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"কি, তার সঙ্গে তোমার বাবা ক'লকাতায় পাঠিয়ে দেবে, এই ত?"

"তবে তুমি নিজ মুখে সে কথা স্বীকার ক'চ্ছ? উঃ—" একটা হৃদয়ভেদী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া রেণুকার ললাটে যেন আগুনের হল্কা বহাইল। সে অধিকতর চঞ্চল ও শঙ্কিত হইয়া বলিল,—

"শোন, সব কথা। আমিই এ সর্বনাশের মূল। স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার ছেলেমি বুদ্ধিতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে।"

"বেশ হয়েছে, আর আমার মরতে আপত্তি নেই।" নৈরাশ্য ব্যঞ্জক শ্লেষের স্বরে অনাথ কথা কয়টি বলিল।

"অস্থির হইও না—শুনে যাও। ছুটী নিয়ে আসবার মাসখানেক আগে শিবনাথ ওর বুড়ো বাপকে নিয়ে কলেজে ভর্তি করতে এসেছিল—মোটর এ্যাক্সিডেন্টে (Motor Accident) ওর বাপের নি জয়েণ্ট (Knee Joint) ফ্রাক্চার (Fracture) হয়েছিল। সেখানে আমার (Nurse) করবার ডিউটী প'ড়লো। আমাকে সেখানে দেখে হাতে স্বর্গ পেলে,—ক্রমে বেশী ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করে। আমিও তার মনের ভাব বুঝতে পেরে—মজা দেখবার জন্য খেলাতে লাগলেম। সে রোজ রোজ আমাকে কত উপহার দিতে লাগলো—আমিও নিতেম। শেষে বুড়ো হাসপাতালেই মারা,

শিবনাথকে তার জন্য বিশেষ দুঃখিত দেখা গেলনা,—আমাকে আঁচে ইসারায় বল্লে—সে তার বাপ্‌কে হারিয়েছে বটে, কিন্তু সেইখানে এক অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছে—সেটি আমার প্রেম।

"আমি মনে মনে হাস্‌লেম। শেষে সে আমাকে জানিয়ে গেল যে আগের বারে আমাদের দেশে মাস দুই থেকে এসে তার ব্যায়ারাম ঢের ভাল হয়েছিল, সেই ব্যায়ারাম আবার বেড়েছে—সে শীঘ্রই আবার আমাদের দেশে যাবে। ছুটী নিয়ে বাড়ীতে এসে দেখি শিবনাথ আগে থাকতেই এখানে এসেছে।

তুমি যাবার পর সে রোজই আমাদের বাড়ীতে আসে। পাছে রাগ কর ভেবে তোমাকে বলিনি। তার বিশ্বাস আমি তাকেই ভালবাসি, তাই আমাদের বের কথা শুনবার পর পরশু আমায় বল্লে—চল দুজনে ভোরবেলা পালিয়ে কলকাতায় যাই; রেভারেণ্ড ফাদার সীলের (Rev : father Sil) সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্টতা আছে, তাঁর গির্জ্জাতেই বে করে তখন তোমার বাপ মাকে টেলিগ্রাফ করা যাবে। আমিও বাহ্যিক রাজি হলেম—আজ ভোরেই পালাবার স্থির হলো।

"তবে? থাক্ আর শুনবার দরকার নেই? ছি ছি, কি কল্লুম, কি কল্লুম, হায় হতভাগা শিবনাথ!" অনাথনাথ আবার নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

রেণুকাও দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না না, আমাকে অবিশ্বাস করো না—তাকে খেলিয়ে মজা দেখছিলেম মাত্র, আমার সর্ব্বস্বই তোমার!" এমন ভাবে যুবতী কথা কয়টি বলিল—অনাথের আর অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। সে একটা অশান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"কিন্তু—কিন্তু উপায়? আমি যে খুনে।"

"আর ত কেউ জানে না?"

"না, কেবল বুড়ো গোপালকে বলেছি- সে কাকেও বলবে না।"

"ছি ছি কি সর্ব্বনাশ করেছ—কে জানে কোত্থেকে কিসে কি হয়? পলাও এখনি; একেবারে কলকাতায় গিয়ে উঠ।" রেণুকার মুখভাব অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত, কথা কয়টি সে এমন ভাবে অনাথকে বলিল যে, সে আর মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না—রেণুকার পানে চকিতে একবার মাত্র চাহিয়াই দ্রুতপদে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

রেণুকা অনাথের গমন পথে স্থির নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—পরে আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া হঠাৎ সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া কেবল মাত্র বাহির হইল—উঃ!"

(৩)

নীচ জাতি হইলেও গোবর বিশ্বাস গ্রামের মধ্যে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। হাল, গরু, জমি জমা বিস্তর; সুতরাং চাষের সকল কার্য্য সে একা করিতে পারিত না। পাঁচ সাতজন চাষা রাখিয়া আপনিও তাহাদের সঙ্গে খাটিত। এইরূপে অল্প দিনেই সে বেশ দু পয়সা সঙ্গতি করিল এবং চাষার মহলে মোড়ল হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় একজন পরদুঃখ কাতর পাদরী সেই গ্রামে আসিয়া কৃষকদের দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। সলাইয়া পলাইয়া গোবর মোড়ল ও তাহার অধীনস্থ আরও দুই চারিজনকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া গেল, তাহার ফলে তাহারা কৃষিকার্য্য না ছাড়িলেও, অন্য দিকে একটু চাল চলন বদলাইয়া গেল। গোবর সাহেব, ফটিক সাহেব, রামু সাহেব প্রভৃতি নামের সঙ্গে ঢিলা পাজামা এবং অঙ্গে চায়না কোট উঠিল। নিতান্ত অনভ্যস্ত পকাণ্ড ফাটা চরণে কেহ জুতাটা আর বড় পরিল না, তবে ঘরে টেবিল চেয়ারের স্থলে কেরোসিনের বাক্সের উপর সদা অভ্যস্ত চা এবং আহারাদি চলিতে লাগিল। তখন তাহাদের বাটীতে পাদরী বাবা ও ভগ্নি মেম সাহেবাদের মাঝে মাঝে আনাগোনা পড়িল এবং তাহাদের ছেলে মেয়েরাও তাঁহাদের কল্যাণে ইংরাজী শিখিতে লাগিল। সুতরাং গ্রামের অন্য চাষারা সসম্ভ্রমে দূর হইতে তাহাদের নবীন সুখ সৌভাগ্যের পানে তাকাইয়া রহিল এবং ক্রমে ক্রমে গ্রামখানির সমস্ত কৃষকেরাই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল।

মোড়ল গোবর সাহেবের একমাত্র পুত্র রামধন মিশনারীদের দয়ায় তাহাদের খরচে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিল। পিতার মৃত্যুর পর সে সমস্ত টাকাকড়ি পাইল, তাহাতে পৈতৃক ভদ্রাসনের উপর একখানি ছোট বাগান বাড়ী করিয়া স্বামী স্ত্রীতে একেবারে পুরা সাহেব সাজিয়া বসিল। 'বারে' পশার করিতে না পারিয়া শেষে লোকজন রাখিয়া আপনার পৈত্রিক কৃষি ব্যবসায়েই মন দিল।

মিঃ রামধন বিশ্বাসের একমাত্র সন্তান রেণুকা। নয় বৎসর বয়স হইতেই সে কন্যাকে কলিকাতায় এক মিশনারি বোর্ডিংএ রাখিয়াছিল, সেখানে পাঁচ বৎসর লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া গত দুই বৎসর হইতে সে মেডিকাল কলেজে ছাত্রী বিদ্যা শিখিতেছিল।

মিঃ মহেন্দ্র কোলে অর্থে ও মান সম্ভ্রমে মিঃ বিশ্বাসের সমকক্ষ না হইলেও বিশ্বাস-পরিবারের পরেই তাহার মত অর্থ ও প্রতিপত্তি কাহারও ছিল না। মিষ্টার

বিশ্বাস ও মিঃ কোলের সেই জন্য বন্ধুত্বও খুব বেশী ছিল, কিন্তু তাহা অধিক দিন ভোগ করিতে পাইল না। কোলে স্বামী-স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া হঠাৎ কলেরায় মারা গেল। বিবাহিত কন্যা পূর্ব্বেই শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। পুত্র অনাথ কলিকাতায় লেখাপড়া করিতেছিল। সুতরাং তাহার আর লেখাপড়া চলিল না সে গৃহে আসিয়া আপন ক্ষেত খামার লইয়া বসিল।

বাল্যকাল হইতেই অনাথ ও রেণুকার খুব ভাব ছিল; উভয়ের পিতামাতারও নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, বড় হইলে দু'জনের বিবাহ দিবে। তারপরে কলিকাতায় একই মিশনারি বোর্ডিংএ থাকিবার কালে উভয়ের সেই বাল্য ভালবাসা প্রণয়ে পরিণত হইল। তারপর যখন রেণুকা ধাত্রী বিদ্যা শিখিতে গেল, তার কিছুদিন পরেই অনাথ বাড়ীতে আসিয়া বসিল।

পূর্ব্বে মিষ্টার বিশ্বাস কিছুদিন কৃষ্ণনগরে থাকিয়া প্রাক্‌টিস করিয়াছিল, সেই সময়ে তথাকার এক জন ছোট খাট খৃষ্টান তালুকদারের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়, তাহার একমাত্র পুত্র শিবনাথ।

বাল্যকাল হইতেই শিবনাথের মৃগী রোগ ছিল, তার উপর বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌রোগও দেখা দিল। বহু চিকিৎসাতেও কিছু ফল হইল না দেখিয়া মিঃ বিশ্বাস পরামর্শ দিল যে, তাহাদের গ্রামে গিয়া বাস করিলে জল বায়ুর গুণে শিবনাথের পীড়া সারিতে পারে। শিবনাথ মাস খানেক আসিয়া মিঃ বিশ্বাসের বাটীতে থাকিয়া গেল, তাহাতে সে বিশেষ উপকার পাইল। তখন তাহার পিতা সেই গ্রামের এক প্রান্তে কিছু জমি লইয়া একটি ক্ষুদ্র বাটী করিল। শিবনাথ দুই একজন পুরাতন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে আসিয়া সেই বাটীতে বাস করিত। এইখানেই রেণুকার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হইল।

(৪)

সেই অন্ধকারে গ্রামাপথ বাহিয়া অনাথ উন্মাদের মত ছুটিল। পায়ে কত হোঁচট লাগিল, কাঁটা ফুটিল—গ্রাহ্য নাই, কাঁটা গাছে কাপড় ছিঁড়িল, অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ছুটিল—ভ্রূক্ষেপও করিল না, তাহার চক্ষের সম্মুখেই চারিদিকে ফাঁসিকাষ্ঠের জ্বলন্ত ছবি নৃত্য করিতে লাগিল। সে কোন মতে গ্রামখানি পার হইয়া ভোরের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারিলেই যেন রক্ষা পায়।

কিছুদূর সেই ভাবে গিয়া সে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর এক পাও চলিবার তাহার শক্তি রহিল না। তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল—সে বাধ্য হইয়া বিশ্রামের জন্য এক বৃক্ষমূলে বসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—গ্রামে এতক্ষণ

না জানি কি মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। গ্রাম থানা নয় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও—এতক্ষণে হাওয়ায় ভর করিয়া পুলিশ আসিয়া গ্রামখানিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, ভূতো দীঘি হইতে লাস বাহির হইয়াছে,—রেণুকাকে হয় ত জেরায় জেরায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মন বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আবার ভাবিল, এত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কলিকাতায় পলাইতেছি কেন? পুলিশের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য? আজ পর্য্যন্ত খুন করিয়া কে কোথায় বাঁচিয়াছে? ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। কলিকাতা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে ডিটেক্‌টিভদের কতক্ষণ? সে খুন করিয়াছে, তাহার মুখে চোখে সেই ছায়া অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, যে দেখিবে সেই বুঝিতে পারিবে। অনাথ! সভয়ে আপন হস্ত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে চাহিল।

তবে পলাইয়া ফল কি? সে খুনে—সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও লজ্জার চক্ষে দেখিবে; তাহার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবে; লোকালয়ে তাহার আর স্থান নাই! আর রেণুকা, সেই বা কোন্ সাহসে খুনেকে ভালবাসিবে? তাহার মনে হইল সেই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন একেবারে দুনিয়ার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে—পৃথিবীর সঙ্গে তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—তবে আর পলাইয়া ফল কি?

অনাথ উঠিল, তাহার আর পলায়ন করা হইল না, ধীরে ধীরে আবার গ্রামের দিকেই চলিল। শিবনাথের লাশ আর একবার দেখিবার জন্য তাহার হৃদয়ে অদম্য বাসনা জাগিল, সে কিছুতেই তাহা দমন করিতে পারিল না—কে যেন জোর করিয়া 'ভূতো দীঘির' দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এ দিকে প্রভু চলিয়া গেলে, বৃদ্ধ গোপালদাস বহুক্ষণ সেইখানে অজ্ঞান জড়ের মত বসিয়া রহিল—ভয় ও বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। ক্রমে রাত্রি হইলে, শীতল নৈশ বায়ু তাহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিল। তখন সে সমস্ত অবস্থা আদ্যোপান্ত চিন্তা করিবার অবসর পাইল।

সে শুনিয়াছিল খুন করিলে ফাঁসী হয়,—তবে ত অনাথের ফাঁসী হইবে! আহা সে যে তাহাকে শৈশব হইতে কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার বাপ মা তাহারই হাতে পুত্রের ভার দিয়া মরিয়াছে; অনাথও বড় ভাল ছেলে—আজ পর্য্যন্ত মুখ তুলিয়া তাহার সহিত কথা কহে নাই, হাজার অন্যায় করিলেও তাহাকে কখনও বকে নাই। এখনও সে গোপালজেঠা বলিয়া মান্য করে, গোপালজেঠা ভিন্ন তাহার এক মুহূর্ত্ত চলে না। হায়—একি সর্ব্বনাশ হইল!

স্নেহাতুর বৃদ্ধের হৃদয়ে অনাথের শৈশবের সহস্র সহস্র চিত্র যেন নববেশে জাগিয়া উঠিল। যখন তাহার প্রথম একটি দাঁত উঠিয়াছিল তখন সে কেমন কুট্ করিয়া কামড়াইত, যখন তাহার প্রথম কথা ফুটিল, তখন সে কি নাম বলিত, যখন সে প্রথম হাঁটিতে শিখিল, তখন কেমন টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইত, তাহাকে ধরিতে গেলে কেমন হাসিয়া পলাইত! তার পর এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সে কত যত্নে, কত কষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়াছে,—সেই অনাথ খুনে! ভাবিতেও বৃদ্ধের মাথা ঘুরিয়া গেল।

সে ভাবিয়া দেখিল যে এ কথা প্রকাশ হইলে আর রক্ষা নাই, কিন্তু সে একাই বা কি করিবে, কোন ভাল লোকের পরামর্শ আবশ্যক। বিশ্বাস সাহেব অনাথের ভাবী শ্বশুর, তাহাকে বলিলে হয় না? অনাথও তো রেণুকার কাছে গিয়াছে, কিন্তু কৈ—এখনও ত ফিরিল না। সেইখানে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া যা হয় করা যাইবে। গোপাল অতি কষ্টে কাঁপিতে কাঁপিতে বিশ্বাস সাহেবের বাটীর দিকে চলিল।

ফটকের কাছে আসিতেই গোপাল দেখিল যে বিশ্বাস সাহেব একটা লণ্ঠন হস্তে একাকী সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। সে ভাবিল যে নিশ্চয়ই সব জানাজানি হইয়াছে, নহিলে সাহেব এত রাত্রে লণ্ঠন লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? সে তাড়াতাড়ি কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এঁ্যা তবে কি অনাথ ধরা পড়েছে, পুলিশ তাকে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে?" বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল।

বিশ্বাস সাহেবের মনে ঘোর সন্দেহ জাগিল, কিন্তু কৌশলে বৃদ্ধের নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা জানিবার জন্য, সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—"তা ঠিক জানি না—হতেও পারে। সন্ধ্যার পর একবার চকিতের মত এখানে এসে রেণুকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, দুজনের কেউ ফেরেনি। দূরে একটা গোলমাল শুনে বেরিয়ে আসছি।" সাহেব শেষ কথাটি মিথ্যা বলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে গোপাল বলিল—তবেই হয়েছে গো! তোমার জামাইকে রক্ষা কর—আমি নিশ্চয় বলতে পারি সে ইচ্ছা করে খুন করে নি। স্বচক্ষে দেখেছি শিবনাথ তাকে কত দিন শাসিয়ে গেছে—বাছা আমার মুখে রাটি আনেনি।" কে জানে আজ কি কুক্ষণে হঠাৎ কি হয়ে পড়েছে।"

বিশ্বাস সাহেব অনুমানে ঘটনা এক প্রকার বুঝিয়া লইলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে সাহেবও কাঁপিতে কাঁপিতে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় কোথায়'—শিগ্গির বল্।"

"ভূতো দীঘির বনে"—কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ফটকের ভিতর হইতে চাকর দাসীরা সকলেই কথাগুলি শুনিতে পাইল, তাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া "খুন খুন শব্দে বাড়ী মাতাইয়া তুলিল। "কি সর্ব্বনাশ, খুন করে গা? যাক্ যাক্ ফাঁসীতে ঝুলুক, অমন খুনে জামায়ে কাজ নেই।" বলিতে বলিতে ক্ষেমা বুড়ী চীৎকারে নিকটস্থ দুই চারি ঘর কৃষকের কাণেও কথাটা শুনাইয়া দিল। কৃষকেরা তাড়াতাড়ি শাবল, কোদাল, খন্তা লইয়া বিশ্বাস সাহেবের বাড়ীর দিকে গোল করিতে করিতে ছুটিল।

দেখিতে দেখিতে সেখানে অনেক চাষা জড় হইল, তখন বিশ্বাস সাহেব আলোক হস্তে সকলকে লইয়া লাশ দেখিবার জন্য "ভূতো দীঘির" দিকে চলিলেন। তাহার স্ত্রী এবং দুই চারিজন সাহসী কৃষক পত্নীও সঙ্গে যাইতে ছাড়িল না।

"ভূতো দীঘির" বন নিতান্ত ছোট নহে। এককালে বোধ হয় সেখানে একটা দীঘি ও বাগান ছিল, কিন্তু দীঘিকার অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাগানও অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকেই আগাছা, কাটাঝোপ, জঙ্গল আর তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার বহু পুরাতন ফলের গাছ—সে সব গাছে গ্রামের কেহ কখনও ফল হইতে দেখে নাই।

দীঘিকাও জলশূন্য শুষ্ক—তাহার বক্ষে ঘন দামের আবরণ, আর তাহাদের মধ্যে বন্য কচু ও শর বন। সর্প, শৃগাল, নকুল প্রভৃতি মনের আনন্দে সেখানে রাজত্ব করিত। কিম্বদন্তী আছে—সে বাগানে বড় ভূতের উপদ্রব, তাই গ্রামের চাষারা কেহ কখনও সে দিক মাড়াইত না। কিন্তু আলোক প্রাপ্ত যুবক যুবতীর মনে সে ভয় ছিল না—অনাথ ও রেণুকা সেই স্থানকেই নির্জ্জনে প্রেমালাপের উপযুক্ত ভাবিয়া বেড়াইতে যাইত।

দল বাঁধিয়া গোল করিতে করিতে বিশ্বাস সাহেব সেইখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু হঠাৎ কেহই প্রথমে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। একে অন্ধকার রাত্রি, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোক বারা সে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়াছিল; তাহার উপর ভূতের ভয়, বিশেষতঃ সেখানে সদ্য খুন হইয়াছে!—অতি সাহসীর প্রাণেও কেমন যেন আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সকলেই কম্পিত হৃদয়ে ঘন ঘন চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহাদের মনে হইল যেন কোন বিকট মূর্ত্তি সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া হঠাৎ দেখা দিবে।

বিশ্বাস সাহেবের ভরসায় ক্রমে ক্রমে একে একে সকলে বাগানে প্রবেশ

করিল। লণ্ঠনগুলি উঁচু করিয়া শাবল কোদাল আছড়াইতে আছড়াইতে সকলে চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। একবার—দুইবার কিন্তু হরি হরি, লাশ মিলিল না; লাশ দূরে থাকুক, খুনের কোনরূপ চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল,—তবে কি অনাথ রহস্য করিয়াছে?

বিশ্বাস সাহেবের অনুরোধে আর একবার শেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দূরে একজনের দৃষ্টি পড়িল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, মুখে কথা সরিল না। সে পার্শ্বের ব্যক্তিকে ইসারায় অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল। তখন এ ওকে, ও তাকে সেইরূপে ইসারায় দেখাইতে দেখাইতে সকলেই দেখিল—বৃক্ষমূলে এক দীর্ঘকায় মনুষ্যমূর্ত্তি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

ভয়ে সকলেই নিঃশব্দে পশ্চাৎ হঠিতে লাগিল, তখন বিশ্বাস সাহেব সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন, সুতরাং সকলেই আবার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কাছে গিয়া আলো উঁচু করিয়া দেখিয়াই বিশ্বাস সাহেব চমকিয়া উঠিলেন, মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইল—"একি—এঁ্যা—তুমি—তুমি—অনাথ?"

অনাথের নাম শুনিয়া সকলের ভয় গেল। তাহারা অমনি লাফাইয়া তাহার চারিদিকে ঘেরিল। সেইখানেই সকলে উচ্চকণ্ঠে পরামর্শ করিতে লাগিল—এক্ষণে তাহাকে লইয়া কি করা যায়? আসামী ধরা পড়িল—কিন্তু লাশ কৈ? লাশ না পাইলে খুন প্রমাণ হইবে না, অধিকন্তু তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে। তখন অনাথের উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল, সকলেই খুনের আদ্যোপান্ত জানিতে চাহিল।

অনাথ সকল কথাই বলিল এবং খুনের স্থানটি পর্য্যন্ত দেখাইল, পরে সে ফিরিয়া আসিয়া যে লাশ দেখিতে পায় নাই সেইজন্য অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও বলিতে বাকী রহিল না।

সকলে মিলিয়া নবীন উৎসাহে আবার তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক খুঁজিতে লাগিল—কিন্তু কোথাও লাশের চিহ্নমাত্র মিলিল না। তখন সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল—"শিবনাথ মজা দেখবার জন্য তামাসা করেছে,—খুন্ ফুন্ সব মিছে, চল্ ফিরি।"

সকলেই সেই সিদ্ধান্তে সায় দিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহ অভিমুখে ফিরিল, অনাথ যন্ত্র-পুত্তলিকাবৎ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বিশ্বাস সাহেবের বাটীর কাছাকাছি আসিতেই হঠাৎ ক্ষ্যামাবুড়ী তাড়াতাড়ি আসিয়া একখানি পত্র সাহেবের হাতে দিয়া বলিল—"তোমরা যাবার পরেই

দিদিমণি বাড়ী এসেছিল, এই চিঠি লিখে তোমায় দিতে বলে, তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে।”

সাহেব সেইখানেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন, কিন্তু চিঠি পড়িবার পর তাহার মুখ ভাবের যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল, লণ্ঠনের আলোকে তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মিষ্টার বিশ্বাস পত্রখানি অপর একজনের হাতে দিয়া বলিল—“পড়।” সে এইরূপ পড়িল,—

বাবা—মা,

আমার দোষ মাফ করিবেন। আপনারা অনাথের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন,—সে আমার চক্ষুশূল, আপনাদের খাতিরে এতদিন তাহাকে মিথ্যা প্রতারণায় ভুলাইয়াছি। আমি শিবনাথকেই যথার্থ ভালবাসি, শিবনাথ ভিন্ন অন্য কেহ আমার স্বামী হইতে পারিবে না। এখান হইতে না পলাইলে অনাথের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই ভাবিয়া আমরা দুজনে আজ ভোরেই পলাইব স্থির করিয়াছিলাম বোকা অনাথ আমাদের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার সময় রাগারাগি করিয়া শিবনাথকে যেমন মারিতে গিয়াছিল, সে অমনি চালাকি করিয়া পড়িয়া গিয়া মড়ার ভান করিয়াছিল। অনাথের বিশ্বাস যে সে খুন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। এদিকে ইহাতেই কিন্তু আমাদের মহা সুযোগ উপস্থিত তোমরাও সেই মিথ্যা খুনের তদারকে ব্যস্ত থাকবে সেই অবসরে আমরা পলাইলাম। তোমরা ভাবিও না আমি শিবনাথের সঙ্গে সুখে থাকিব। আমাদের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে বলিয়া শিবনাথ অনাথকে ধন্যবাদ দিয়াছে—আমিও দিলাম—

স্নেহের কন্যা—রেণুকা।

পত্রখানি উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া, হস্তাক্ষরের পরীক্ষা হইল—রেণুকার স্বহস্ত লিখিতই বটে। তখন সকলে উচ্চ হাস্য করিতে করিতে অনাথের পীঠ চাপড়াইয়া বলিল—“আরে ছ্যা—তুমি এমন নিরেট বোকা? কোথাকার একটা বেদেশী ছোঁড়া ‘উড়ে এসে জুড়ে বসে’ তোমার মুখের গ্রাস হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিল? শেষ তুমিই আবার তাদের পলাবার উপায় করে দিলে—ছ্যাঃ?” অনাথ কি বলিবে, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে তাহার মধ্যে গিয়া মুখ লুকায়। তবে তাহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—যে ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, নর রক্তে তাহার হস্ত কলঙ্কিত হয় নাই। সেই হইতে অনাথের মনে স্ত্রীলোকের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিল।

বিশ্বাস সাহেব ও তাহার পত্নী লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। ইহার অপেক্ষা রেণুকার মৃত্যু সংবাদ পাইলে তাহারা অধিকতর আনন্দিত হইত। সেই হইতে তাহারা স্বৈরিণী কন্যার সকল মমতা ছেদন করিল।

মাস দুই পরে আবার একখানি পত্র ও একটি ক্ষুদ্র পার্শ্বেল আসিল। বিশ্বাস সাহেব সকলকে ডাকাইয়া তাহাদের সম্মুখে পত্র পড়িল।

"বাবা—মা", আমরা দুজনে এখানে পরম সুখে আছি। আমার প্রতি শিবনাথের যে যত্ন, যে ভালবাসা, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। সে ইতিমধ্যেই আমাকে হাজার টাকার গহনা ও কাপড় দিয়াছে। আমাদের বিবাহ এখনও হয় নাই, আশা করি শীঘ্রই হইবে।

শিবনাথ বড়ই মহৎ প্রাণ। অনাথ যে তাহাকে মারিতে গিয়াছিল সে জন্য সে আদৌ রাগ করে নাই—বরং খুসী হইয়াছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ সে আপন হস্তের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য সুন্দর হীরার আংটিটি অনাথকে উপহার দিল, এ আংটি সকলেই তাহার হস্তে বহুবার দেখিয়াছে। পার্শ্বেল খুলিয়া অনাথকে দিবেন এবং বলিবেন বন্ধুর উপহার ভাবিয়া সে যেন সর্ব্বদাই সেটি ব্যবহার করে। ইতি—

সেবিকা "রেণুকা"

ঘটনাটা একপ্রকার চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আজ এই কাণ্ডে আবার তাহা নববেশে জাগিয়া উঠিল, আবার অনাথের উপর দিয়া হাস্য-কৌতুক, রঙ্গ-রহস্যের ঝড় চলিল। মর্ম্মাহত অনাথ আংটিটা হাতে লইল বটে, কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গারের মত সেটা যেন তাহার হাত পোড়াইতে লাগিল, সে সর্ব্বসমক্ষে সেটাকে একটা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিল।

তারপর বৎসর কাটিয়া গেল, রেণুকার কোন সংবাদ আসিল না।

(৫)

এই এক বৎসরে গ্রামের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশ্বাস-দম্পতী আর বড় একটা বাটীর বাহির হন না বা গ্রামের কোন সংবাদই রাখেন না। তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে—তাহারা সব বেচিয়া কিনিয়া পশ্চিমে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

অনাথকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না। তাহার কোন বিশেষ পীড়া নাই—অথচ সে দিন দিন শুকাইয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইতেছে। তাহার আহারে রুচি নাই—রাত্রে নিদ্রা নাই, কাহারও সহিত দুইটি ভিন্ন চারিটি কথা কহিতে চাহে না। বৃদ্ধ গোপালদাস সেই হইতে তাহাকে আর চক্ষুর অন্তরাল করে না—সেই এখন অনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথের বাটী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—কোথাকার এক জমিদার কিনিয়াছে; মাসখানেক হইল তাহাদের ম্যানেজার সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিতেছে এবং দেশে যার বা জমীজমা বিক্রয় বা বন্ধক হইতেছে, সব আপনারা রাখিতেছে। ম্যানেজার বাবুকে বড় দেখা যায় না কিন্তু তাহার স্ত্রী সর্ব্বদাই কৃষকদের কুটীরে কুটীরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং লোকের বিপদ আপদে, শোক দুঃখে ব্যায়রামে, বুক দিয়া উপকার করে। তাহার, যেমন গুণ—তেমনি রূপ, দেখিলে মনে হয় বুঝি স্বর্গের কোন দেব-কন্যা পথ ভুলিয়া এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। গ্রামের সকলেই তাহাকে স্নেহ, ভক্তি করে। আদর করিয়া সকলেই তাহার নাম দিয়াছে—"এঞ্জেল।"

সেবার শীতের প্রকোপ বড় বেশী—দিনেও যাইতে চাহে না। গ্রামখানি যেন অস্থিসার হইয়া পত্র-পুষ্পহীন শুষ্ক বৃক্ষগুলাকে ক্রোড়ে ধরিয়া রহিয়াছে উষার রবি আকাশ-প্রাঙ্গণে সিন্দুর ছড়াইয়াছে বটে কিন্তু নিবীড় কুয়াসা জাল ভেদ করিয়া সে জ্যোতি গ্রামখানিকে ছুঁইতে পারে নাই। তখনও অধিকাংশ গৃহেই কৃষককুল সুসুপ্তির ক্রোড়ে বিচেতন হঠাৎ বিশ্বাস সাহেবের বাটীর সম্মুখের পথে, সেই নিবিড় কুয়াসাবরণের মধ্যে একটি রমণীর ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

রমণী—অতিক্ষীণ, দীর্ঘাঙ্গী, সম্মুখদিকে ঈষৎ অবনত; মুখ ও হস্তপদে রক্তের লেশমাত্র নাই, চক্ষু কোটরগত, ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, কেশ রুক্ষ বিশৃঙ্খল; পরিধানে মলিন ছিন্নবস্ত্র, সঙ্গে সম্বলের মধ্যে একটি ছোট পুঁটুলি। দেখিলে বোধ হয় দুঃখ, দৈন্য, অনাহার, পীড়া সজীব মূর্ত্তিতে উহার সর্ব্বাঙ্গে বিরাজমান।

কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া রমণী অতিকষ্টে বিশ্বাস সাহেবের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট খাইয়া পড়িবার আশঙ্কা—আর একবার পড়িলে সে যে পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, তাহার সন্দেহ ছিল তবুও রমণী কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিশ্বাস বাটীর ফটক তখনও খুলে নাই, রমণী আসিয়া কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। দুই চারিবার কড়া নাড়ার পরে ভিতরের অর্গল মুক্ত হইল এবং একটি বিষন্ন মূর্ত্তি শীর্ণা প্রৌঢ়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে, এমন সময়ে কি চাও এখানে?"

উভয়ের চক্ষে চক্ষে মিলিল। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব,—আগন্তুককে চিনিবার জন্য প্রশ্নকারিণী আপন হৃদয়ের স্মৃতিগুলি লইয়া তোলপাড় করিতে লাগিল; কিন্তু তবু ফলোদয় হইল না; তখন আগন্তুক রমণী সহসা ছিন্নমূল বল্লরীর মত প্রশ্নকারিণীর পদমূলে লুটাইয়া পড়িল,—

"মা, মা, অভাগিনী রেণুকে এত শীগ্‌গির ভুলে গেছ ?"

হঠাৎ সাপের ঘাড়ে পা দিলে লোকে যত না চমকিত হয়, বিশ্বাস গৃহিণী ততোধিক চমৎকৃত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য মুখে কথা সরিল না, পরে হঠাৎ আপনার পা টানিয়া লইয়া—অতি কঠোর স্বরে বলিল—"দূর হ, দূর হ, কলঙ্কিনী, আমাদের মেয়ে নেই, রেণু অনেক দিন মরে গেছে।" সশব্দে ফটক পুনরায় ভিতর হইতে বন্ধ হইল।

রেণুকা দুইদিন অনাহারে ছিল, তাহার উপর পথশ্রম; নৈরাশ্য-পীড়িতা অভাগিনী পড়িতে পড়িতে উঠিয়াও উঠিতে পারিল না। পরে অতি কষ্টে কিছুক্ষণ টলিতে টলিতে নিকটস্থ এক পুষ্করণীতটে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পরে একবার সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধে চাহিয়া করযোড়ে বলিল—"তুমি সর্ব্বত্র বিরাজমান, সকল দেখিতেছ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর, কোলে নাও।" রেণু পুষ্করণীতে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিল।

হঠাৎ পিছন হইতে কাহার দুইখানি কোমল হস্ত তাহাকে ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বীণা নিন্দিত মধুর স্বরে বলিল—"ছিঃ বোন, আত্মহত্যা করবে কেন? সে যে মহাপাপ। এস, আমার ঘরে এস, আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম।

স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি রেণুকাকে এক রকম কোলে করিয়াই এঞ্জেল আপন গৃহে লইয়া গেল।

(৭)

উষ্ণ পথ্যে রেণুকার দেহে যেন নবজীবন সঞ্চারিত হইল, পরক্ষণেই সে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। সমস্ত দিনের পরে প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রথমেই যাহা দেখিল, তাহাতে সে আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; বারম্বার চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে চারিদিকে দেখিতে লাগিল, পরে অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিল—"স্বপ্ন—হাঁ নিশ্চয় স্বপ্ন।" রেণুকা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিল।

নির্জ্জন কক্ষ, নিদ্রিত রেণুকার সম্মুখে অল্পদূরে, চেয়ারে বসিয়া অনাথনাথ, ঘৃণা ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক করুণ চক্ষে রেণুকার প্রতি চাহিয়াছিল। এঞ্জেলের সর্ব্বপ্রথম অনুরোধ পত্র তাহাকে সেখানে উপস্থিত করিয়াছিল।

"স্বপ্ন নয় রেণু, সত্যই আমি এসেছি।" রেণুকা চক্ষু মুদ্রিত করিতেই অনাথ এই কথা কয়টি বলিল। সে তখন আবার চাহিল এবং অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল;

কি বলিতে যাইতেছিল—পারিল না, ওষ্ঠের স্পন্দন ওষ্ঠের কোণেই মিলাইয়া গেল অভাগিনী অবনত দৃষ্টিতে চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল।

"বুঝেছি—আর বল্‌তে হবে না, হতভাগা তোমাকে ফেলে সরে পড়েছে ?" এর আর আশ্চর্য্য কি, এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, জেনে শুনে আগুনে হাত দিলে কে না পুড়ে ?" অনাথ যেন এক নিশ্বাসে কথা কয়টি বলিয়া বাঁচিল। ঘৃণা ও বিরক্তিতে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

রেণুকার সর্ব্বাঙ্গ একবার শিহরিয়া উঠিল, চক্ষের জল থামিল, চকিতে সেখানে একবার বিদ্যুৎ খেলিল। সে সভয়ে একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া লইল, তার পর কম্পিত চাপা গলায় ধীরে ধীরে বলিল,—

"জগৎ সংসার তাই জেনে ঘৃণা করছে—পায়ে ঠেলছ, কিন্তু তুমি অমন কথা মুখে এন না। আমার এ দশা কার জন্য—তোমার জন্য।" রেণুকা সভয়ে চাহিতে চাহিতে কথা কয়টি বলিল,—যেন চোর চুরি করিয়াছে।

ঘৃণাপূর্ণ শ্লেষের স্বরে অনাথ বলিল—"তাই, তাই আমাকে বিদ্রূপের স্থল করে রেখে দুজনে গা ভাসিয়েছিলে ?"

"তা নইলে এতদিন তোমাকে প্রকৃতই ইতর প্রাণীরও ঘৃণার পাত্র হয়ে ফাঁসী-কাঠে ঝুলতে হত। রেণুকা আবার সভয়ে একবার চারি দিকে চাহিল।

অনাথের আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। থতমত খাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল —"কেন কেন খুন ত করিনি, বরং তোমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি।" ফাঁ—সী ?—ফাঁসীর ভয় কিসের ?" অনাথ সজোরে কথা কয়টি বলিল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণের মধ্যে কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

অনাথের কাণের কাছে মুখ আনিয়া অত্যন্ত চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া রেণুকা বলিল, "হ্যাঁ খুন করেছ—আত্ম প্রবঞ্চনা করো না। সে দিন সন্ধ্যার ঘটনা বেশ করে মনে কর, মৃত শিবনাথের সাদা মুখ, নিষ্পলক চোখ আর নিস্পন্দ দেহের কথা ভাব। আপন হাতে—"

হঠাৎ অনাথের সর্ব্বাঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল, রেণুকার কথায় বাধা দিয়া ভীত কম্পিত কণ্ঠে দারুণ নৈরাশ্যের সহিত বলিয়া উঠিল—"এ্যাঁ—এ্যাঁ—তবে—তবে ?"

"আমিই তোমার সে অপরাধের বোঝা আমার মাথায় নিয়ে তোমাকে বাঁচিয়েছি। রমণী জন্মের সার রত্ন সুনাম হারিয়ে তোমারই জন্য আজ এ দশায়

পড়েছি, তুমি আমাকে দোষ দিও না।” অভাগিনী অভিমানের অশ্রুজলে আবার বুক ভাসাইতে লাগিল।

অনাথ ভীত, স্তম্ভিত অথচ সন্দিগ্ধ,—ক্ষেপা বলে কি? তাহার কথার ভাব সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, চারিদিক হইতে তাহাকে যেন গোলোক ধাঁধায় ঘিরিয়াছিল। সে অবাক্ হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিয়া রহিল অথচ সাহস করিয়া রেণুকাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

হৃদয়ের বেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, যুবতী আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

“শুন অনাথ, জীবনে যদি কাহাকেও যথার্থ ভালবেসে থাকি, সে তোমাকে, আমার এ ভালবাসার পরিমাণ তুমি—পুরুষ—তুমি করতে পারবে না। তা বলে স্ত্রীলোকের স্বভাব ভুলবো কেমন করে? বাঘ সিঙ্গি খাবার জন্য কটা জীবন নষ্ট করে? পেট ভরা থাকলেও জীব মেরে খেলা করে। মেয়ে মানুষের স্বভাবও অনেকটা সেই রকম। আমি তোমাকেই ভালবাসতেম—আর কাকেও না। কিন্তু যৌবনের চপলতায় অন্য পুরুষকে ভুলিয়ে হাতের মধ্যে এনে খেলাবার আনন্দ ও লোভ সামলাতে পারলেম না। শেষে শিবনাথ তার সঙ্গে কলকাতায় পালাবার জন্য আমাকে মতলব দিলে। সে অন্ধ হয়েছে বুঝে, তাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে মজা দেখবার বড়ই লোভ হলো,—তার কথায় মত দিলেম, সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে চলে গেল; আমিও মনে মনে খুব হেসে তাকে জব্দ করবার মতলব আঁটতে লাগলেম, কিন্তু কেঁচো খুড়তে সাপ বেরুলো।”

“এঁ্যা—তবে সত্যই আমি খুন করেছি?” মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার স্বরে কথাগুলি বলিয়া অনাথ অনবরত আপন হস্ত দেখিতে লাগিল—যেন মর্ম্মভেদ করিয়া সেখানে অতীতের লুপ্ত শোণিত-লেখা আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“যখন তোমার মুখে সেই সর্ব্বনেশে কথা শুনলেম তখন আমার চক্ষু ফুটলো, জ্ঞান হল। আমিই যে তোমার সর্ব্বনাশের মূল তা বেশ বুঝতে পাল্লেম, তখন অনুতাপে মন যেন ভেঙ্গে পড়লো, কিন্তু এখন চিন্তার সময় নেই। কি করি—তোমাকে বাঁচাতেই হবে। ভগবানের দয়ায় ধাঁ করে মাথায় এক মতলব এল—লাশ না পেলে ত আর খুন প্রমাণ হবে না। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তোমাকে সরিয়ে দেওয়া দরকার—কারণ খুনীর মাথা ঠিক থাকে না, মুখ চোখের হাবভাব আপনি প্রকাশ করে দেয়।”

“এঁ্যা—তাই কি?”—অনাথ উন্মাদের মত ঘন ঘন আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রখর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

"স্থির হও—সে ভয় ত আর নেই—চঞ্চল হয়ো না। তোমাকে কলকাতা পলাবার পরামর্শ দিলেম—তুমি পাগলের মত ছুটলে, আমি একটু নিশ্চিন্ত হলেম। তুমি চলে যাবার পর উর্দ্ধশ্বাসে 'ভূতো দীঘির' দিকে ছুটলেম—তুমি গোপাল দাসকে সে কথা বলেছিলে—ভয় হল। এতক্ষণে হয় ত সব জানাজানি হয়ে পড়েছে। এখনই গ্রামের লোক জড় হয়ে লাশ খুঁজতে আসবে।

অনাথ বিস্ফারিত নেত্রে কথাগুলি যেন হাঁ করিয়া গিলিতেছিল, তাহার দেহ হইতে চৈতন্তের লক্ষণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

"তোমার নির্দ্দেশ মত তাড়াতাড়ি গিয়ে লাশ পেলেম;—যেমন বলেছিলে তখনও ঠিক তেমনি অবস্থায় পড়েছিল! তাড়াতাড়ি তার হাতের সব-চেনা হীরের আংটিটা খুলে নিলেম, তার পরে তাকে পাঁজাকোলা করে তোলবার চেষ্টা কল্লেম—টেনে নিয়ে গেলে দাগ পড়তে পারে। কিন্তু বড় ভারি, আমার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়েও তুলতে পাল্লেম না। এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল—লোকের গোলমাল শুনা গেল, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল—কেঁদে ফেললেম। এখনি এসে লাশ পাবে, তোমার সর্ব্বনাশ হবে। কি করি? আকুল প্রাণে কাঁদতে কাঁদতে ভগবানকে ডাকলেম, তেমন বিশ্বাস ভরে আকুল প্রাণে তাঁকে আর কখনও ডাকিনি! দয়াময় ডাক শুনলেন। শরীরে যে [illegible] বল এল—তাকে কোলে তুলে নিয়ে দীঘির পশ্চিম দিকে দামের মধ্যে [illegible] তার চারিদিকে ঘন শরবন, সে রাত্রে হঠাৎ খুঁজে বার করবার ভয় রইল না। তারপর যা মতলব করেছিলুম, তাতে যে এ ব্যাপার একেবারে চাপা পড়বে [illegible] তা বেশ বুঝলুম। দেখতে দেখতে গোলমাল সেইদিকেই আসতে লাগলো, 'খুন খুন' কথাও কাণে গেল, বুঝলেম আমার অনুমান যথার্থ—গ্রামের লোক লাশ খুঁজতে আসছে।

হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে অনাথ বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ—তারপর—তারপর?"

"চুপ্! চেঁচিও না, দেওয়ালেরও কাণ থাকতে পারে। তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য পথ দিয়ে লুকিয়ে বাড়ী এলেম—ভগবানের দয়ায় বাড়ীতে ক্ষেমা বুড়ি ভিন্ন আর কেউ ছিল না। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লিখে তার হাতে দিয়ে, বাবাকে দিতে বলে আমার টাকাকড়ি আর দুচার খানা কাপড় বাক্সে গুছিয়ে নিয়ে, ভগবান স্মরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেম। চিঠি পেলেই যে লাশ খোঁজা বন্ধ হবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম, শুধু গ্রামের বাহিরে এসে জানবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেম। অল্পক্ষণ পরে [illegible] ফিরলো, আমার বোধ হল যেন তারা তোমাকে সম্বোধন করে যাচ্ছে কথা কইতে কইতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

বুঝলেম ভাগ্ ঠিক লেগেছে এবং যে কারণেই হোক—তুমিও ফিরেছ, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে কল্‌কাতায় গেলেম।”

“সেখানে এতদিন কি করে কাটালে?” হঠাৎ কেমন সন্দেহসূচক স্বরে অনাথ কথাটা জিজ্ঞাসা করিল। হায় পুরুষের মন!

কথাটা রেণুকা বুঝিল—তাহার প্রাণে যেন শেল বিঁধিল। ঈষৎ ঘৃণার হাসি হাসিয়া সে বলিল—“ছিঃ! শোন, যত দিন টাকা ক'টি ছিল—এক রকম চল্লো; সেই সময় লোকের বিশ্বাস আরো বাড়াবার জন্য শিবনাথের সেই আংটী ও চিঠি পাঠালেম। কিন্তু কলসীর জল আর কদিন থাকে? তারপর লোকের বাড়ী বাড়ী সারাদিন ঘুরে ছেলে মেয়ে পড়িয়ে, উল্ বুন্‌তে শিখিয়ে কিছু কিছু রোজগার করতে লাগলেম—কিন্তু তাতেও খরচ কুলোয় না তখন সেই পরিশ্রমের উপর রাত দুটো তিন্‌টে পর্য্যন্ত খেটে লেশ্ বুনে, সেমিজ তৈরী করে বেচতে লাগলেম। কোন মতে ঘর ভাড়া আর খাওয়া পরাটা চল্লো; কিন্তু বৎসরাবধি এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে ব্যায়রাম ধ'রলো, চিকিৎসার পয়সা নেই—কি করবো? আর তেমন খাট্‌তেও পারলেম না—রোজগার কমে গেল—কাজেই মরণ ধার্য্য হ'ল, তখন এখানে ফিরে আসতে বাধ্য হলেম! কিন্তু মা আমার এই অবস্থা দেখেও—কলঙ্কিনী মেয়েকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দিলেন। এক দয়াময়ী দেবী আমাকে এখানে এনেছেন, আর আমার পৃথিবীতে কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গাও নেই।” আবার চক্ষুজলে রেণুকার বক্ষ ভাসিল।

এতক্ষণে যেন অনাথের চমক ভাঙ্গিল—হঠাৎ কি কথা মনে পড়িয়া গেল। সে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“কিন্তু আমরা গ্রাম শুদ্ধ লোক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লাশ্ পেলেম না কেন? সে লাশ্ তবে গেল কোথা?”

“সে কথা মাত্র আমরা তিনটি প্রাণী জানি; ‘আমি’ আমার প্রিয়তমা ‘মনীষা’ আর আমার চাকর ‘দামু,’” বলিতে বলিতে এঞ্জেলের হাত ধরিয়া শিবনাথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সেই দণ্ডে সেখানে বজ্রাঘাত হইলে অনাথ ও রেণুকা যত না আশ্চর্য্য হইত, এই ব্যাপারে তাহারা ততোধিক বিস্মিত, স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া গেল, আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অনাথ ত ভয়ে বিস্ময়ে এক প্রকার অস্ফুট শব্দ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, রেণুকা মূর্চ্ছিতের মত শয্যায় পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি এঞ্জেল গিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বাতাস করিতে লাগিল, এবং শিবনাথ অনাথের হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল—“ব'স বন্ধু, ভয় কি—ছিঃ!”

প্রথম মোহের ঘোর কাটিলে অনাথ ও রেণুকা যে কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। উভয়েরই মুখ পাংশুবর্ণ, নয়ন সন্দিগ্ধ অথচ লজ্জিত—দুজনেই হেঁট মুখে নীরব রহিল। বিপরীত ভাবের পীড়নে উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গে এক অদ্ভুতশ্রী ফুটিয়া উঠিল। অবস্থা বুঝিয়া, হাসিতে হাসিতে শিবনাথ বলিতে আরম্ভ করিল :—

"শোন বন্ধু,, তোমরা বোধ হয় জাননা— আমার বাল্যাবধি মৃগীরোগ ছিল। সে রোগ যখন ধরিত তখন অনেক সময় বহুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ থাকিয়া মড়ার মত করিয়া ফেলিত, সেই সময়ে মাথায় জল ঢালিলে বা খাওয়াইলে জ্ঞান ফিরিত। সে দিনও তুমি আমাকে মারিতে উঠিলে যখন দুজনে ধস্তাধস্তি হয় তখন হঠাৎ সেই রোগ ধরিয়াছিল। আমার চক্ষু কপালে উঠিল হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে পড়িয়া গেলাম—বাহ্য দৃষ্টিতে নিশ্বাস পড়িতেছে না ও দেহ শক্ত হইয়াছে দেখিয়া তুমি ভাবিলে আমায় খুন করিয়াছ। পলাবার পরেই আমার ভিতরে ভিতরে জ্ঞান হল, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করবার শক্তি ছিল না, কাজেই তেমনি পড়ে রইলেম কিছুক্ষণ পরে সেই অন্ধকারেও বেশ বুঝলেম যে রেণু এসে আমায় তুলে নিয়ে চল্লো, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত একটি ইন্দ্রিয়ও আমার আয়ত্বে আসেনি, তাই কিছুতেই জানাতে পারলেম না যে আমি বেঁচে আছি। রেণু আমাকে সেখানে ফেলে দিয়ে পালালো সেই স্থানের মধ্যে অল্প পাঁক ও জল ছিল তাইতে জ্ঞান ফিরে এলো। তখন সে রকম অবস্থায় সেখানে পড়ে থাকতে বড় ভয় হল, প্রাণপণ চেষ্টায় একটু একটু করে উপরে উঠলেম।"

"জয় ভগবান তুমিই সত্য!" অনাথ ও রেণুকা দুজনেই আনন্দে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"হঠাৎ দেখি দামু আমাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে উপস্থিত, খুনের খবর প্রচার মাত্রেই আগে হতে পাগলের মত সে দৌড়ে খুঁজতে এসেছিল। সেই খাদ দিয়ে আমাদের বাড়ী যাবার একটা পথ ছিল, দামুর সাহায্যে 'ভূতোদীঘি' হতে বেরিয়ে সেই পথে এলেম, তখন গ্রামের লোক গোলমাল করতে করতে অন্য দিকে এসে উপস্থিত হল। আমরা সেইখানে লুকিয়ে বসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেম, তারপর তারা নিষ্ফল হয়ে ফিরলে, আমরাও চুপে চুপে ঘরে এলেম।"

"মাপ কর ভাই, আমি মহাপাপী" বলিতে বলিতে অনাথ শিবনাথের পদতলে পড়িল—তাহার চক্ষুজলে বক্ষ ভাসিতেছিল।

"থাম থাম ঢের সময় আছে" শিবনাথ তাহাকে তুলিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—

"আমার মনে বিশ্বাস ছিল—রেণু আমায় সত্যই ভালবাসে। আমার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সে কি করে জানিবার জন্য বড়ই কৌতুহল হল—ইহাতে তাহার ভালবাসারও পরীক্ষা হইবে; বিশেষ তখন আমার চিকিৎসারও অত্যন্ত প্রয়োজন হইল। এই দুই কারণে আমি দামুকে নিয়ে পর দিন অতি ভোরে চুপে চুপে কল্‌কাতায় গেলেম—গ্রামের কেউ তা জানতে পারলে না, এখানকার বাড়ী চাবিবন্ধ রইলো। মাসতিন পরে দামুর ভাইকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে এখানকার বাটীর তদারকে পাঠালেম, সে ফিরে গিয়ে রেণুর গৃহত্যাগ, চিঠি, আংটির পার্শ্বেল সমস্ত খবর আমায় শুনালে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলেম—স্ত্রীলোক এমন ভালবাসতে পারে! রেণুর উপর প্রেমের বদলে ভক্তি হল, প্রতিজ্ঞা করেম—যেরূপে হোক এ দুজনের মিলন করাব।"

কচি ছেলের মত রেণুকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া এঞ্জেল তাহার মুখচুম্বন করিল। লজ্জায় রেণুর শুষ্কমুখেও রক্ত-শতদলের সুষমা ফুটিয়া উঠিল।

"তারপর উনি আমার পায়ে বেড়ী পরালেন। ওঁর কাছে এই অপূর্ব্ব কাহিনীর গল্প করেছিলেম, আনন্দে আমার প্রতিজ্ঞাভার আপনার ঘাড়ে নিলেন ওঁরই পরামর্শে ভাল জমীদারের কাছে আমার এই বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল—ওঁর ভাই ওঁর উপরোধে সেই জমিদারের ম্যানেজার হয়ে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে বাস আরম্ভ কল্লেন। আমি প্রায়ই লুকিয়ে রাত্রে আসতেম, যে কয়দিন থাকতেম অন্দরের বার হতেম না। উনি পাড়াবেড়ানি হয়ে তোমাদের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করলেন। এইবার রেণুর খোঁজে কল্‌কাতায় যাব পরামর্শ হচ্ছিল, এমন সময় ভগবান হারানিধি মিলাইয়া দিলেন। এই নেও রেণু—তোমার কলঙ্ক মুক্ত হৃদয়ের চাঁদ। শিবনাথ অনাথের হস্ত লইয়া রেণুকার হস্তে অর্পণ করিল।

"আর এই নাও দাদা, স্বর্গের দেবী, প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা। এঞ্জেল রেণুকার হস্ত অনাথের হস্তের উপর রাখিল।

তখন সহসা সেই ঘরে ম্যানেজার বাবু ঢুকিয়া পুষ্প মালায় উভয়ের হাত বাঁধিয়া তাহার উপর একখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ রাখিল।

"দাদা ওই দেখ আজ থেকে আমি আর একটি ভাই পেলেম, তুমি বড়—উনি ছোট।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

পরিত্রাণ।

পুরোহিতের ছেলে অমরের একটী ছাগ-শিশু লইয়া দুঃখের দিনগুলি কাটিয়া যাইত।

সে দশ বৎসরের বালক মাত্র। তাহার পিতার অকাল মৃত্যুর পর হইতে দূরের প্রায় সমস্ত যজমানই তাহার খুল্লতাতের হইয়া গিয়াছে। দূর গ্রামে সে বড় যাইতে পারে না, যাইয়াও কোন ফল হয় না, কারণ তাহার খুল্লতাত সব যজমানদের বলিয়া দিয়াছেন, অমরটা ভারি অনাচারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কেহ যেন কিছু না দেয়।

গ্রামের যজমানদের মধ্যে দুই এক জন দয়া করিয়া যাহা দিত, তাহাতে কোন রকমে মাতাপুত্রের দুই বেলা দুই মুটা অন্ন জুটিত। সত্য তাহারা বড় গরীব।

অমরের মাতা দৈবাৎ যদি খাবার কিনিবার জন্য তাহাকে দুই একটা পয়সা দিতেন, তাহা দিয়া সে তাহার ছাগশিশুটিকে ছোলা কিনিয়া খাওয়াইত, নিজে কিছুই খাইত না। ভিতরের উঠানে অমর খানিকটা জায়গায় দুর্ব্বাঘাস করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাই তুলিয়া হাতে করিয়া ছাগ শিশুটীকে সে খাওয়াইত। প্রতি দিন বৈকালে যখন সে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত, ছাগ-শিশুটী তাহার পাছু পাছু ছুটিয়া যাইত; সে এক জায়গায় গিয়া বসিত, ছাগশিশুটী তাহার কোলের উপর মুখটি রাখিয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িত।

এমনি করিয়া সেই ছাগশিশুটী বালক অমরের ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু একেবারে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

অমর বড় ভাল ছেলে। নির্ব্বিরোধী বিনয়ী ও বুদ্ধিমান। পড়াশুনায় তাহার ভারি মনোযোগ।

রাত্রে স্তিমিত আলোকের সম্মুখে বসিয়া পার্শ্বে শয়ান ছাগশিশুটীর গায়ে হাত রাখিয়া সে অধ্যয়ন করিত।

সে দিন সন্ধ্যার সময় মাঠের মাঝে ছাগশিশুটি অমরের পাশে মুখ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল। গ্রামের জমিদার সনাতন বাবুর পুত্র তপন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। ছাগশিশুটিকে দেখিয়া তাহার ভারি লোভ হইল! এটা তাহার চাইই।

পর দিন সনাতনবাবুর একজন নায়েব আসিয়া অমরের মাতার নিকট ছাগ-শিশুটিকে দাবী করিয়া বসিল।

অমরের মাতা কিছুতেই সেই ছাগ-শিশুটীকে দিতে স্বীকৃতা হইলেন না। লতা-তন্তুর মত এই ছাগ-শিশুটী তাহার পুত্রের হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া আছে। হৃদয় অক্ষত রাখিয়া সেই ছাগ-শিশুটী অমরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না।

কিন্তু তাহার কোনরূপ অনুরোধ উপরোধ এবং ক্রোধ কিছুতেই কিছু হইল না। জমিদারের লোক বলপূর্ব্বক ছাগশিশুটীকে অমরের নিবিড় বাহু-বন্ধন হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল।

উঠানের সেই সযত্ন-বর্দ্ধিত ঘাসের উপর অমর শুইয়া পড়িল। ছাগশিশুটির করুণ স্বর রহিয়া রহিয়া তাহার কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল।

অমরের জননী ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা ওঠ্।"

অমর উঠিয়া বসিল। দুই হাতে মাতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া চোখের জলে মাতার বুক ভাসাইয়া দিল।

জননীও নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গভীর দুঃখে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কি বলিয়া তাহার সন্তানকে তিনি সান্ত্বনা দিবেন। তিনি বলিলেন, "বাবা আমরা গরীব, বড় লোকের এ সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করিবার অন্যই আমাদের জন্ম।"

এমনি করিয়া সে দিনটা কাটিয়া গেল। অমরকে সে দিন তিনি কিছুতেই খাওয়াইতে পারিলেন না। একগুঁয়ের মত অমর মুখ বুজিয়া পাড়িয়া থাকে নাই, সে মাতার অনুরোধে খাইতে খুবই চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু গলার মধ্যে খাদ্য দ্রব্য তাহার আটকাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার জননীও আর সেদিন পীড়াপীড়ি করিলেন না।

সমস্ত সকালটা অমর শূন্যমনে সেই ঘাসের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত! অদূরে অর্দ্ধভুক্ত ঘাসগুলি পড়িয়া আছে! অর্দ্ধচর্ব্বিত দশবিশটী ছোলা ঐ যে ওখানে পড়িয়া গড়াইতেছে! তাহাকে অমর হাতে করিয়া তুলিয়া না দিলে সে যে খাইতে পারিত না! সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই না খাইয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া আছে। আহা হয় ত খাওয়াইবার জন্য তাহাকে কত মারধর করিতেছে! অমর সমস্ত দেহময় যেন বিষম বেদনা অনুভব করিল। কাতরে কহিল, "মা তাকে বড্ড মারচে, না, মা। সে ঠিক মরে যাবে।"

সকালে অমর বাটীর বাহির হইয়া যাইত। সেই জমিদারবাড়ীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। যদি একবার সে তাহার সেই ছাগ-শিশুটীকে দেখিতে পায়! যদি একবার সে তাহার করুণ স্বর শুনিতে পায়! কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইত।

এই তিন দিন অমর একেবারে আধখানা হইয়া গিয়াছে। তাহার চেহারা দেখিয়া জননী অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন! হা ভগবান!

তখনও সন্ধ্যার ছায়া ধরণীর উপর পড়ে নাই। আকাশের গায়ে একটী তারাও উঁকি ঝুঁকি মারিতে সুরু করে নাই। অমর তখন জমিদার বাড়ীর ফটকের সামনে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইমাত্র যেন তাহার সেই ছাগশিশুর পরিচিত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাহার কাণের মধ্যে আসিয়া বাজিল!

এমন সময় জমিদার বাড়ীর দরওয়ান আসিয়া অমরের হাত ধরিয়া বলিল, "এই ছোক্‌রা, চল্‌ আমার সঙ্গে, আমাদের দাদাবাবু তোকে তলব করেছে।"

অমরকে এক রকম টানিয়া সে উপরে লইয়া গেল। জমিদারনন্দন রুষ্ট স্বরে কহিল, "আরে ছোঁড়া, তোর মতন তোর ছাগলটাও ত কম বজ্জাৎ নয়, দেখ্‌ তার বজ্জাতি দেখ্‌!"

অমর চাহিয়া দেখিল অদূরে মেঝের সঙ্গে মিশিয়া তাহার সেই নিত্যসহচর ছাগশিশুটি মড়ার মত নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার পাশে নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জলপাত্রের সমস্ত জলটুকু তেমনই ভাবে রহিয়াছে। আজ তিন দিন সে জলবিন্দু অবধি স্পর্শ করে নাই। পড়িয়া পড়িয়া বুঝি শুধু মারই খাইয়াছে!

শঙ্কান্বিত অমর দ্রুত গিয়া পার্শ্বে বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিল। তাহার স্পর্শের সঞ্জীবনী শক্তিতে সেই ছাগশিশুটী যেন পুনর্জীবন লাভ করিল। সেই মুকের চাহনিতে তাহার অন্তরের সমস্ত আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। প্রতিবারেই তাহার অবশ পদচতুষ্টয় দুমড়াইয়া যাইতে লাগিল।

অমর জলপাত্র তাহার মুখের সম্মুখে ধরিল। সে কত তৃপ্তির সহিত অনেকখানি জল খাইয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমরের হাত হইতে আবার তেমনি আনন্দে ঘাস্‌ খাইতে লাগিল। অমর ভুলিয়া গেল, সে কোথায় রহিয়াছে! হঠাৎ যখন সেই দরওয়ান আসিয়া আবার তাহার হাত ধরিয়া টানিল, তখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সে কিছুতেই

ছাগশিশুটিকে ছাড়িয়া আসিতে চাহিল না। দুই হাতে তাহাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া জড়ের মত বসিয়া রহিল।

মনিবপুত্রের হুকুমে কিন্তু সেই অল্পশক্তি বালককে দরওয়ান ছাগ-শিশুর বন্ধন হইতে সবলে ছিনাইয়া লইয়া গলা ধাক্কা দিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ-বালকের অপমানহত ক্ষুব্ধ অন্তর, ক্ষোভে দুঃখে ভাঙ্গিয়া শতধা হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চারিদিক হইতে মঙ্গলশঙ্খের ঘন ঘন রোল উত্থিত হইয়া দূর আকাশে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে।

অমরকে যখন গলা ধাক্কা দিয়া জমিদার-বাটী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তখন সবে মাত্র অমরের খুল্লতাত, জমিদার বাটীর সন্ধ্যা-পূজা শেষ করিয়া বাহির হইয়াছেন। অন্ধকারে প্রথম তিনি অমরকে ঠাওর করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁহারই যজমানের দরওয়ান এমনি করিয়া অপমানিত করিয়া পথে বাহির করিয়া দিতেছে, তখন ব্রাহ্মণ ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন। এতদূর দাম্ভিকতা! সেই চিরসম্মানিত ভট্টাচার্য্য পরিবারের এত অধোগতি হইয়াছে যে, সেই বংশের ছেলেকে আজ কিনা যজমানের ভৃত্য অবধি অপমান করিতে সাহস করে!

সস্নেহে অমরের হাত ধরিতেই তাহার খুল্লতাতের নয়নপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল। অমরের মুখ হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত কথা শুনিয়া লইলেন। তারপর অমরকে লইয়া জমিদারবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভৃত্যেরা দূরে সরিয়া গেল

অভিসম্পাত এবং পুরোহিত ত্যাগের ভয়ে সনাতনবাবু অমরকে ছাগশিশুটি প্রত্যার্পণ করিলেন।

(৩)

সে দিন নবমী পূজা। এ কয়দিন গ্রামের মধ্যে কেবলই আনন্দস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। নির্জ্জন গ্রাম লোক কোলাহলে সর্ব্বদাই মুখরিত হইয়া রহিয়াছে।

অমর উঠানের এক ধারে গাছতলায় বসিয়া কি একখানা পুঁথি পাঠ করিতেছিল। ছাগ-শিশুটি তাহার পাশে শুইয়াছিল। নবমী পূজা আরম্ভ হইয়াছে ঢাক, ঢোল, কাঁশির শব্দ চারিদিক হইতে উত্থিত হইয়াছে! ছেলেরা দল বাঁধিয়া বলি দেখিতে ছুটিয়াছে। অমর কোনদিন বলি দেখিতে পারিত না, তাহার বুকটা কেমন করিয়া উঠিত। তাই আজ বাড়ীর মধ্যে চুপ করিয়া পাঠে মনোযোগ দিয়াছিল।

ভিতরের উঠানে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বাগ্দী সাধু ডাকিল, "মাঠাকরুণ!"

সাধুর কণ্ঠস্বরে অমরের মাতা ভীত হইয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে রে সাধু, অমন কচ্ছিস্ কেন?"

সাধু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমার ছেলেটাকে মা ঠাকরুণ আর বুঝি বাঁচাতে পারিনে, আপনি দয়া না করিলে আমি নির্ব্বংশ হব।"

অমরের জননী প্রথমে ভাবিলেন বুঝি সাধুর পুত্রের খুব কঠিনপীড়া হইয়াছে, তাই কিছু অর্থ সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে কিন্তু দীনদুঃখিনী তিনি, কি দিয়া তাহাকে সাহায্য করিবেন! কিন্তু সাধু অর্থের প্রত্যাশী নয়

গত বৎসর এমনি দিনে তাহার একমাত্র পুত্র ওলাওঠায় মরিতে বসিয়াছিল; সে মা দুর্গার সাম্নে গলবস্ত্র হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া মানত করিয়াছিল, মা আমার ছেলেকে ভাল করিয়া দাও, আগামী নবমীতে আমি তোমার সাম্নে একটা ছাগ বলি দিব।

তাহার পুত্র যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ সেই পূজা দিবার দিন। যে ছাগটি বলির জন্য সে কিনিয়া রাখিয়াছিল, ভোররাত্রিতে কে তাহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে সমস্ত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া ফেলিয়াছে কোথাও সে ছাগটিকে খুঁজিয়া পায় নাই; এমন কি সারাগ্রামের মধ্যে টাকা দিয়াও আর একটি ছাগ কিনিতে পাইল না। এখন অমরের ছাগশিশুটি না পাইলে দেবতার অমান্য করা হইবে; তাহার ছেলেটি সে বাঁচিবে না!

অমরের জননী স্তব্ধ হইয়া সব কথা শুনিলেন। এই সে দিন ছাগশিশুটির শোকে তাহার সন্তান মরিতে বসিয়াছিল! কত পুণ্যফলে তিনি অমরকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। কোন প্রাণে আবার তিনি সেই ছাগশিশুটিকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবেন; ওদিকে সাধুর সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে। তিনি কি উপায় করিবেন।

এ দিকে বলির সময় হইয়া আসিয়াছে সাধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিবর্ণমুখে কাঁপিতে লাগিল। দুইটী হাত তাহার অঞ্জলিবদ্ধ, নয়নযুগল হইতে হুহু করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

এমন সময় সাধুর সেই পুত্রটী আসিয়া কহিল, "বাবা তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ, পুরুতঠাকুর যে তোমায় ডাকাডাকি কচ্ছেন।"

সাধু আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা রক্ষা কর!"

অমর এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বিহ্বলের মত বলিল, হাঁরে সাধু, তোর পাঁঠাটা পাওয়া গেল নারে! কিছুতেই গেলি নারে?"

কম্পিত কণ্ঠে সাধু কহিল, "না দাদাঠাকুর।"

অমর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পাওয়া গেল না সাধু?"

ঐ দূরে বুঝি বলির বাজ্না বাজিয়া উঠিল! এখনই বুঝি বলি শেষ হইয়া যায়!

অমর চীৎকার করিয়া উঠিল, "পাওয়া গেল নারে সাধু!"

সাধু ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল!

বারি বর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেমন স্তব্ধ হইয়া থাকে, অমর ঠিক তেমনি ভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

তার পর ধীরে ধীরে সেই ছাগশিশুটিকে লইয়া কহিল, "নিয়ে যারে সাধু! শীগ্‌গির নিয়ে যা"!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

সৎ-মা।

(১)

সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল ঠিক সাপে নেউলের মত। সে নূতন করিয়া নয়,—যে দিন হইতে সুচারু মুখুয্যে-পরিবারে নূতন বাসা বাঁধিয়াছিল, মহিন সেই দিন হইতেই বাসা উঠাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল। পারে নাই শুধু—তাহার পিতার খাতিরে।

সুচারু হয় ত, যদি চেষ্টা করিত, গতি ফিরাইতে পারিত, কিন্তু এমন মেয়ে সে নয়। নরম হওয়া তাহার কুষ্ঠী-বিরুদ্ধ। মহিন যত বাড়াইতে লাগিল, সুচারু তত আসন দৃঢ় করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া পড়িল। তাহা হইলেও, উঠিতে বসিতে সুচারুকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। মহিন অনেক কাজে, অনেক ছুতায় সুচারুকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে সে সুচারুর চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী। ইহা অমান্য করিতে সুচারু কখনই পারিবে না।

যে মহিনের জ্বালায় পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, সুচারু যাহার ভয়ে বেশ একটু শঙ্কিত থাকে, সেই মহিনের বয়স বেশী করিয়া বলিলেও এগারো বছরের বেশী নয়।

তাহার পিতা সুচারুকে বিবাহ করিয়াছেন, এই এক বৎসর। বিবাহের পরদিনই ইঁদুর-কলে হাত চাপিয়া দিয়া মহিন সুচারুকে বলিয়া দিয়াছিল—এখানে আসিয়া সে কাজ ভালো করে নাই।

প্রথম দোষ সুচারুর নয়; প্রথম দর্শনেই সে—আগ্রহভরে মহিনকে কোলে তুলিতে গিয়াছিল, মহিন সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, আর মায়া দেখতে হবে না।

মহিন যদি ধনীর ছেলে বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে, ধনীর স্ত্রী বলিয়া সুচারু কেন গর্ব্ব হইবে না? সুচারু ঘর করিতে আসিয়া দেখিল, এ বাড়ীর কীটপতঙ্গ অবধি মহিনের কথায় উঠে বসে। সুচারু নিজের মার্জ্জিত হস্ত ফিরাইয়া লোকজনকে বুঝাইল, গৃহের কর্ত্রীই সে। জীবনে প্রথম আঘাত মহিন পাইল। রামা খানসামাকে কি একটা কার্য্যে সে পাঠাইবে, রামা সজোরে বলিল—সে গিন্নির জন্য বাজার হইতে ফুলেল তেল আনিতে যাইতেছে। মহিন ধমক দিয়া তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া, বিন্দু ঝির কাছে গিয়া বলিল—আজ আমার পাখীগুলাকে ছোলা দিস্‌নি কেন পোড়ারমুখী?" বিন্দু হাত ঘুরাইয়া, নথ নাড়িয়া বলিল—পারব না বাপু, পারব না। যা খুসী তাই কর

মহিন বেশ স্থিরভাবে বুঝিয়া দেখিল—এ তাচ্ছিল্যের কি কারণ। সে ক্ষেপিয়া উঠিল। কখনো যাহারা কোন বাধা পায় নাই, প্রথমবার বাধা প্রাপ্ত হইলে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে! মহিনও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কাপড়ের প্রান্ত চিবাইতে লাগিল; তাহার পরে সে পাখীর খাঁচা, ফুলের টব, খরগোসের বাক্স—ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

বিদ্রোহ এইখানে আরম্ভ হইল, শেষ হইল না

(২)

মহিনের কোন কার্য্যের জন্য তাহাকে কাহারো নিকট জবাবদিহি করিতে হইত না। আজ সে যখন দুপুর বেলা আপনার ঘরটিতে বসিয়া পাতলা কাগজ জুড়িয়া ফানুষ তৈয়ারী করিতেছিল, সুচারু রক্তবর্ণ চক্ষু লইয়া সেখানে আসিয়া তাহার সুমুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই মহিনের হাত কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হইল; আবার তখনই সে মহাব্যগ্রভাবে কাগজ জুড়িতে লাগিল, সুচারু খুব কর্কশকণ্ঠে বলিল—"স্কুলে যাস্ নি যে?"

মহিন শুধু বলিল—"না।"

সুচারু বলিল—"না, তা দেখতে পাচ্ছি কেন যাস্‌নি, তাই বল।"

মহিন রাগত ভাবে—বলিল—"যাইনি, আমার ইচ্ছে।"

সুচারু তাহার কাণ ধরিয়া বলিল—"ইচ্ছে, পাজী ছেলে, আস্পর্দ্ধা বড় বেড়ে গেছে, না! যত বড় মুখ, তত বড় কথা।" বলিয়া সে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েকটা চড় মারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল! এত শীঘ্র খালাস পাইবে, মহিন তাহা ভাবে নাই, এখন বুঝিল—সুচারু তাহার পিতার সন্ধানে গিয়াছে। কাগজের তাড়ি ফেলিয়া মহিন চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল। বেশী দূর যাইতে হইল না, মধ্যপথে সে ধৃত হইল।

মহিনের পিতা রমানাথ অল্পে চটিতেন না; আর মহিনের প্রতি রাগিতে কেহ কখনো তাঁহাকে দেখে নাই।

রমানাথ বলিলেন—"তোর মা'কে কি বলেছিস্, মহিন?"

এতক্ষণ সে কাঁদে নাই, এবার থাকিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিল—প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—"বেশ করেছি।"

রমানাথের ক্রোধের উদ্রেক হইল; কিন্তু মহিনের আরক্তগণ্ড দেখিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন, বলিলেন—"মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব, পাজী ছেলে! খবর্দ্দার, যেন ও-রকম আর না শুন্তে পাই।"

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মহিন ফানুষ ছিঁড়িল; খাট হইতে বিছানা টানিয়া মেঝের ফেলিয়া দিল; তারপর কাঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; হঠাৎ কি মনে হইল, উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া গিয়া আবার শুইল।

ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, কেহ তাহাকে ডাকিল না। তখন যদি কেহ তাহার হাত ধরিয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত, সে উঠিয়া নিশ্চয় যাইত, কিন্তু কেহ না ডাকিলে ত যাইতে পারে না!

তখন তাহার মনে পড়িল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন সে রাগ করিয়া ঘরে দোর দিয়া শুইয়াছিল, আধ ঘণ্টা পরেই সে দোর খুলিতে বাধ্য হইয়াছিল—সে দিন আর এই দিন!

দুর্দ্দান্ত ছিল বলিয়া কান্নার সঙ্গে তাহার বিরোধ ছিল, সেই ক্রন্দন আজ তাহাকে শান্ত করিল।

(৩)

কোচমানকে গাড়ী জুতিতে বলায় সে বলিল—"হুকুম লেয়াও, বাবু!"

হুকুম! এত বড় কথা সে আর শুনে নাই; হাতের কাছেই দীর্ঘ কশা পড়িয়া ছিল, তুলিয়া সজোরে মহিন কোচম্যানের পৃষ্ঠে বসাইয়া দিয়া একদমে বাড়ীর মধ্যে

চুকি- যেখানে বসিয়া সুচারু চুল বাঁধিতেছিল, সেইখানে আসিয়া বলিল —"তুমি কোচম্যানকে গাড়ী জুততে বারণ করে দিয়েছ ?"

নতমুখে স্বল্প হাসিয়া সুচারু নীরবে বসিয়া রহিল। মহিন আবার জিজ্ঞাসা করিল, উত্তর পাইল না। এবার সে চীৎকার করিয়া বলিল—"শুন্তে পাচ্ছ না ?"

সুচারু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কা'কে বলছিস্, কা'কে ?

মহিন বলিল—"তোমাকে, তোমাকে,—আবার কাকে ! বারণ করে' দিয়াছ, গাড়ী জুততে ?"

সুচারু বলিল—হাঁ।

"কেন ?"

"খুব করেছি।"

"তুমি বারণ করবার কে ?"

"কের্—হারামজাদা, পাজী ছেলে ! সেদিনের কথা এখনই ভুলে গেছ ?"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া মহিন বলিল—"আলবৎ আমি গাড়ী জোতাব, দেখি কে রোখে ?"—সে চলিয়া গেল, সুচারু বিন্দু ঝিকে ডাকিয়া বলিল—কোচম্যানকে বলে আয়, আমি নিমন্ত্রণে যাব, গাড়ী ঠিক করুক

সুচারু নিমন্ত্রণে চলিয়া গেল ; মহিন পাঁচিলের উপর বসিয়া রহিল। রমানাথ ব্যাপারটা সবই শুনিয়াছিলেন, মহিনকে বলিলেন—টাকা দিচ্ছি, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে তুই মোটর চড়ে বাড়ী আসিস ... যা, বেড়াতে যা'।

মোটরে চড়িতে মহিনের অরুচি এই প্রথম দেখা গেল। সে নড়িল না, বসিয়া রহিল।

সুচারু বাড়ী আসিয়া শুনিল, পাচক প্রহৃত হইয়াছে ; বিন্দুর কাপড় ভস্মীভূত, বামার মস্তক টিকিশূন্য হইয়াছে। আর্জি—নালিশ শুনিয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল সে রমানাথের নিকট সব কথা বলিল। শুনিয়া রমানাথ তাহাকে বলিলেন—তোমারই অন্যায় হ'য়েছে সুচারু, ছেলেকে অত করে' শাসন করতে নেই ! তুমি ইচ্ছে করলেই অন্য গাড়ী আনিয়ে নেমন্তন্নে যেতে পারতে ; ওর যখন বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ও জানিয়েছিল

সুচারুর মুখ অন্ধকার হইয়া গেল

(৪)

পরদিন আর সুচারু মহিনের কোন খুঁত খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মনে অনেকগুলি সঙ্কল্প সে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, একটাও সফল হয় না দেখিয়া

বড়ই ম্লান হইয়া পড়িল। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, মহিন নিত্য একটা জামা কাপড় ভাঙ্গে; তাহার জুতা পরিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত সকাল রামাকে অন্য কাজ করিতে দেয় না; স্নান করার ঘরে ঢুকিয়া দু'ঘণ্টা কাটায়, সে সময় নিজস্ব একটা চাকরকে আটকাইয়া রাখে, এই সকল ছুতা ধরিয়া সে আজ মহিনের উপর তাহার হাত দেখাইবে! হইল না, মহিন জামা ভাঙ্গিল না; নিজেই স্কুলের জুতা যোড়া ঝাড়িয়া ফেলিল; কল-ঘরে ঢুকিয়া টপ্ করিয়া স্নান করিয়া বাহিরে আসিল, এমন কি বাহিরে সাবান তোয়ালে লইয়া যে চাকরটা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকেও ডাকিল না। সুচারু অবাক হইয়া গেল।

বাড়ীর লোকজন অন্ততঃ একটা দিনের জন্য বাড়ীতে 'কাক-চিল পড়িল' না দেখিয়া একটু স্বস্তি বোধ করিল। একটু নিশ্চিন্তও রহিল।

কিন্তু এ নিশ্চিন্ততা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কয়েক দিন পরে সুচারুর ভ্রাতা হরিহরচন্দ্র বাবু দর্শন দিলেন। তিনি কিছুদিন কলেজে পড়িয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। সে চিহ্ন এখন চক্ষের উপরে; মাথার চুলে, বেশ ভূষায় গাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। গৌরবর্ণ চেহারা; চখে নিকেলের বায়োফোকেল চশমা; লম্বা টেরি; পরিধানে স্বহস্ত কুঞ্চিত বস্ত্র; সম্মুখের দাঁত দুটি সামান্য বড়—লোকটি আসিয়াই মহিনকে লইয়া পড়িল। মহিন দু একটা মাত্র জবাব দিল, হরিহরচন্দ্র বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। "কতদিন হইতে মহিন চুরুট খাইতেছে; কখনো—কোথায় গান টান শুনিতে গিয়াছিল কি না—"প্রভৃতি প্রশ্নে মহিনকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল। স্কুলের একটা অঙ্ক উত্তরের সঙ্গে মিলিতেছিল না, মহিন হরিহরকে তাড়াইয়া দিল। হরিহর রাগিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সুচারু আসিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিল, আরো বলিল—সে হরিহরকে মামা বলিবে।

মহিন বলিল—আমি ত এ বাড়ীর চাকর দাসী নহি। তাহারাই ওকে মামা বলিবে।

নিজের হাতে মারিলে গোঁয়ার গোবিন্দ পাছে তাহাকেই প্রহার করে, সুচারু শাসন অন্যের হস্তে দিবে জানাইয়া গেল।

মহিনের বাপ সংসারে একটি অদ্ভুত জীব। এই তুচ্ছ কথায় তিনি মহিনকে বেদম প্রহার করিলেন।

প্রভাতে বাড়ীশুদ্ধ লোক সাশ্চর্য্যে দেখিল—শূন্য গৃহ, মহিন নাই!

(৫)

মহিন রামাকে কাছে বসাইয়া বাড়ীর সমস্ত খবর লইল। সংসার একাদশ

বৎসর তাহার অভাবে ঠিক চলিতেছে। যে দিন মহিম গৃহত্যাগ করে, তাহার পর একাদশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে! রামা বলিয়াছে, সংসারে মলিনা নামে একটি বালিকা বাড়িয়াছে, তাহার সতাত বোন্; আর সবই সেই আছে। হরিশ্চন্দ্র কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। পিতার কথা মহিম বার বার জিজ্ঞাসা করিল। রামাকে বিদায় দিয়া, মহিম স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। টেবিলে কয়েকখানা 'ল' বুক ছড়ানো, টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া মহিম বাল্যকালের কথা ভাবিতে লাগিল।

একজন ঘরে ঢুকিল, সে অবনী। গৃহস্বামী অবনী মহিমের সহপাঠী, যাহার গৃহে মহিমের এই এগারো বছর কাটিয়াছে

মহিম অবনীকে দেখিয়াই বলিল—"ওহে আমি বাড়ী যাচ্ছি।

অবনী বলিল—মত বদলেছে, আমি জানতাম ও বদলাবে।

মহিম সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—দু'টি দিনের ছুটি দাও ভাই, দু'টি দিন। আবার তোমার খাঁচায় এসে চুপটি ক'রে ঢুকে বসব।

অবনী বলিল—ময়না না টিয়া কি-হে তুমি?

মহিম বলিল—ও দু'টোর একটাও নই, আমি ছাতার; পুষেছ, আমার ভাগ্যি, নহিলে বনে বনে ঘুরে বেড়ানই অদৃষ্টের লিপি ছিল।

"এখন বাড়ী যেতে চাও কেন?"

"একবার সব দেখে আসি।"

"মনে আছে?"

"একটিও ভুলিনি, ভাই।"

"তবে?"

"এতদিন যা করেছি, আজ আর কিছুতেই তা'কে সমর্থন করতে পারছি না বড় অন্যায় করেছি বলেই মনে হচ্ছে।"

একটু ক্ষুণ্ণভাবে অবনী বলিল—কোন্‌টা সমর্থন করতে পারছ না, এখানে থাকা, না—

মহিম জোরের সহিত বলিল—এত অকৃতজ্ঞ আমি নই যে, তোমার দয়ার কথা ভুলে যাব। আমি আমার যে মতের পোষকতা করতে পারছি না—সেটি এই যে—আমি বাবার উপর অযথা অন্যায় ব্যবহার করেছি।

অবনী চুপ করিয়া রহিল; মহিম কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া, গাঢ় স্বরে বলিল—ভাই একবার যেতে চাই, যদি পূর্ব্বকৃত অন্যায়ের কোন প্রায়শ্চিত্ত

করতে পারি। সেখানে কি ধরণের কিরূপ অভ্যর্থনা পাব, তা'ও আমি ভাবতে চাইনে! নিজের মনের একটা তৃপ্তি, যা হারিয়েছি, একবার খুজে দেখতে চাই। কি বল?

"বেশ যাও।

"আজই যাব?"

"আজ আর কাজ নেই, কাল যেও।"

"বেশ—আবার শীঘ্র ফিরে আসব।"

অবনী স্বর নামাইয়া বলিল—এস-না-এস আমার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

এ রকম কথা অবনীর মুখে আজ এই প্রথম উদ্ভাসিত হইল, ধনুর্নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শর যেন পক্ষীর বক্ষ বিদ্ধ করিল। মহিন ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, স্থিরনেত্রে অবনীর মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল- অবনী?"—তাহার স্বর যেন ভগ্ন কাঁসার পাত্রের মত খন্ খন্ করিয়া উঠিল।

অবনী উত্তর দিল না।

মহিন ব্যস্ত ভাবে বলিল—"উত্তর দাও।"

তথাপি সে নিরুত্তর।

(৬)

বাড়ীতে বেশ একটা সোরগোল হইতেছে, বাহির হইতেই মহিন তাহা বুঝিতে পারিল। অথচ সে গোলমাল যে কোন হর্ষধ্বনি অথবা আনন্দোচ্ছ্বাস বহন করিয়া আনিতেছিল, এমন মনে হল না। বরং গোলমালটা যেন একটু চাপা চাপা বলিয়াই বোধ হইল।

মহিন অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, পরে ঈষৎ কম্পিত চরণক্ষেপে সে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রথমেই সে দ্বিতলের পানে চাহিল। তৎক্ষণাৎ তাহার সে দৃষ্টি বেত্রাহত হইয়া নামিয়া পড়িল। অবনী শুনিতে পাইল—জ্ঞাতি শত্রু কি সাধে বলে? বিপদের সময় হাস্‌তে এসেছে।

সে স্বর চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ফিরিতে চরণে শক্তি নাই, অগ্রসর হইবার পথেও যেন কাঁটা ছড়ান।

সাহসে ভর করিয়া মহিন অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল। তখন গোলমালের কারণ শুনিল। তাহার বৈমাত্রেয় ভগ্নিটি বিসূচিকা রোগাক্রান্তা।

মহিন ঘরে ঢুকিয়াই মলিনার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। একাদশ বর্ষ পরে সে

আসিয়া এই বাড়ীতে আপনার আসন যেন আপনিই এক মুহূর্ত্তে দৃঢ় করিয়া লইল।

প্রথমটা সুচারু কেমন হইয়া গিয়াছিল, একটু পরেই সামলাইয়া বলিল — উঠে এস বাপু, ছোঁয়াচে রোগ, শেষে লোকে বল্‌বে —

কথা শেষ করিতে না দিয়াই, মহিন বলিয়া উঠিল — লোকে ত কত কি বলে ?

এই প্রথম সে ধীর স্বরে কথা কহিল।

সুচারু বলিল — না বাপু, আর সোহাগে কাজ নেই, তুমি এ ঘরে না থাকলেও সেবার কোন ত্রুটী হবে না।

মহিন বলিল — লোকজনের অভাব না থাকলে, যদি সেবার ত্রুটী না হয়, তুমিও ত এ ঘর ছেড়ে যেতে পার ?

এই সময়ে মলিনা জল চাহিল, মহিন চামচে করিয়া অল্প জল দিল ; আবার চাহিল, এবারে শুধু চামচ তাহার অধরে স্পর্শ করাইল।

সুচারু কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই মহিন সহসা বিছানা করিয়া, অতি সযতনে মলিনাকে তুলিয়া শোয়াইল।

বমন করিলে, মহিন স্বহস্তে কাচের পিকদানী ধরিল, তাহা দেখিয়া সুচারু তাহার হাত হইতে সবলে কাড়িয়া লইয়া, বলিল, এত বাড়া ভালো নয়।

মহিন সুচারুর মুখের দিকে বিস্ময়-স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

(৭)

বাড়ীর আত্মীয় লোক যাহারা ছিল, বলিল — ছোঁয়াচে রোগ — এক রক্তে জন্ম — টান যাবে কোথা ?

সুচারু তাহাদের বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিল, বলিল — রক্ত রক্ত করছ ত সব ; এগারো বছর রক্ত শুকিয়ে ছিল না কি ? — ইত্যাদি।

আত্মীয়েরা বলিল ছেলেটার স্বভাব খুব ভাল। তবে মান অপমান সবারই আছে।

এই সময়ে সেই স্থানে সুচারু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখে নাই। তাহারা উপসংহার এইরূপ করিল — শুনেছি, ছেলেটা বলে — উনি — (বলে, সুচারু) সমর্থ ছেলেকে কি বলেছিলেন ; সে সইবে কেন ?

সুচারু জ্বলিয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল — বলেছিল কে, সইত ? কে মাথার দিব্বি দিয়েছিল, আসিতে ? আমি কি পায়ে ধরে ডাক্‌তে গেছলুম না কি ?

তাহাকে দেখিয়া তর্কের প্রবৃত্তি অনেক দূরেই পলাইয়া গিয়াছিল,—কেহ কথা কহিল না।

দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে সুচারু স্বামীর ঘরে ঢুকিল; তিনি একখানা ডাক্তারি বই দেখিতেছিলেন। সুচারু বলিয়া উঠিল—শুনেছ?

বই ফেলিয়া, লাফাইয়া উঠিয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি? কি?

সুচারু বলিল—বস, অত তাড়াতাড়ি করতে হবে না, নলিনা একটু ঘুমুচ্ছে।

"তবু ভালো"— বলিয়া রমানাথ বসিলেন

সুচারু বলিল—নতুন খবর শোন নি?

রমানাথ বলিলেন—আবার কার?

সুচারু বলি—না, না, অসুখ বিসুখ নয়। তোমার ছেলে এসেছেন যে!

"কে মহিন?"—বলিয়া রমানাথ আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুচারু বলিল—হাঁ—তিনিই।

রমানাথ আগ্রহভরে বলিলেন—কই?

সুচারু কহিল—সেখানে বসে আছে।

রমানাথ বলিলেন—কি করছে—এই দিকে ডেকে দাও।

সুচারু বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল—ঢুলছে, ঢুলছে। দরকার হয় সে'খানে গিয়ে দেখে এস—বলিয়া সে ত্বরিতগতিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার পদ শব্দের প্রতি মন রাখিয়া, রমানাথ আবার পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। স্থির করিলেন, বইখানা দেখা শেষ হইলে, মহিনকে দেখিতে যাইবেন, তাহাকে আদর করিবেন, তিরস্কার করিবেন না।

(৮)

ডাক্তার বলিয়াছিল—যদি আজ রাত্রি কাটে, তবে আশা করা যাইতে পারে।

সুচারু বলিয়াছিল—ভরসা দিন।

ডাক্তারের স্বর বাষ্পপূর্ণ, তিনি বলিলেন—"ভরসা তাঁর কাছে চাও মা। আমি ভরসা দিতে গিয়ে একবার বড় ভুল করেছি।"—তাঁহার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—রাত্রিটা খুব সজাগ থেকো, মা।

নগ্নগাত্রে মহিন তথায় আসিয়া ডাক্তারকে বলিল—যদি বেশী 'জল জল' করে বরফ-কুচি দিতে পারি।

ডাক্তার বলিলেন—বাবা কে?

মলিনা—তুমিই সমস্ত রাত আমায় বাতাস করছিলে? মহিন বলিল—তুমি কেমন আছ? শরীর কেমন বোধ হচ্ছে?

মলিনা—তুমি আমার দাদা, তবে তুমি এখানেই থাক্‌বে ত? আমার বড় একলা বোধ হয়—তোমার সঙ্গে খেলা করব। থাকবে ত?

মহিন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে আবার বলিল—তুমি খুব লেখা পড়া শিখেছ, দাদা?—আমায় পড়াবে?"—বলিয়া তাহার সাদা হাত দু'খানি তুলিয়া মহিনের গলা জড়াইয়া ধরিল।

সুচারু ডাকিল—মলিনা! কি অসুখ কচ্ছে মা?

মলিনা বলিল কিচ্ছুনা, মা! বেশ ভালো বোধ হচ্ছে—এইবার আমি সেরে গেছি, না মা? মা!

"কি মা?"—বলিয়া সুচারু মলিনার মুখের উপরে মুখ রাখিলেন। মলিনা পূর্ব্ব হইতেই মহিনকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—সুচারুর চুম্বন মহিনের কপোল স্পর্শ করিল।

মহিন বলিয়া উঠিল—অন্যায় করলে, মা। অন্যায় করলে!—কার গালে চুমো খেলে?

সুচারু বলিল—অন্যায় মানুষ বারবার করে না। ঠিক করেছি, বাবা?

মহিন বলিল—আমায় চুমো খেলে?

সুচারু হাসিয়া বলিল—মার উপর ছেলের এত অভিমান! এই দেখ, তবে—সুচারু আর একটি চুম্বন তাহার গণ্ডে মুদ্রিত করিল।

মলিনা বলিল—দাদা থাক্‌বে?

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

———o———

ধর্ম্মশালা।

(১)

গত বৎসর পশ্চিম বেড়াইতে গিয়া মধ্য ভারতের গাংপুর নামক স্থানে আসিয়া তথাকার বৃহৎ ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। শুনিলাম একজন ধনি মাড়ওয়ারী এই বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এখানে বিদেশীগণ অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারেন, কোন অসুবিধা নাই। বাড়ীটি একতলা বটে, কিন্তু খুব উচ্চ ফ্লোরের উপর গঠিত। সম্মুখে একটী লম্বা বারাণ্ডা তাহার পর সারি সারি বেশ সুন্দর সুন্দর ঘর, পশ্চাতে একটী বিস্তৃত রাস্তা, রাস্তার অপর পার্শ্বে এক ব্যক্তির অট্টালিকার প্রাচীর,—সে দিকে উহার কোন দরজা জানালা নাই। প্রত্যেক ঘরের দরজার গায়ে এক দুই করিয়া নম্বর আটা। একজন কর্ম্মচারী এই অট্টালিকায় অবস্থান করিয়া আগন্তুকদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সম্মুখেই পাকশালা, নিকটে একখানি দোকান, দোকানে সকল প্রকার আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। বাড়ীটী দেখিয়া সত্য আমার আনন্দ হইল, বিদেশে ভাল থাকিবার স্থান পাওয়া দুরূহ। এখানে এই নগণ্য স্থানে প্রথমে ভাবিয়াছিলাম না জানি থাকিবার কতই কষ্ট হইবে, কিন্তু এরূপ বাড়ী পাইয়া সত্যই বেশ একটু প্রাণে আনন্দ হইল। আমি ১২ নং ঘরটী দখল করিয়া বসিলাম; দেখিলাম, আমার পার্শ্বের গৃহে একটী মাড়ওয়ারী বাসা লইয়াছে। সহসা দ্বারের উপর আমার দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম তথায় ১৪নং লেখা রহিয়াছে। ১২ পর ১৪; ১৩ নাই কেন? আমি একটু অশ্চার্য্যান্বিত হইলাম। নম্বরগুলি লিখিতে ভুল হয় নাইতো? অথবা মাড়ওয়ারীরা ১৩নং বড় অশুভ সংখ্যা বলিয়া বিবেচনা করে। ইহার কারণ কি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া মুটের মাথা হইতে জিনিস পত্রগুলি নামাইয়া লইয়া তাহাকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় দিলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়, আমি সত্বর গৃহের আসবাবাদি গুছাইয়া আহারের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইলাম। যখন ফিরিলাম তখন বেশ একটু রাত্রি হইয়াছে, দেখিলাম বারাণ্ডায় একটী আলো জ্বলিতেছে, আমি সে আলোকে আমার ঘরের দরজা খুলিবার চেষ্টা করিলাম, কি আশ্চর্য্য দেখিলাম দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, ভিতরে কে যেন চলাফেরা করিতেছে। আমার ভুল হইয়াছে এটি আমার ঘর নয় ভাবিয়া আমি দরজার উপর নম্বরের দিকে চাহিলাম দেখিলাম

তথায় ১৩ নম্বর লিখিত রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য। আমি কি এতই কানা হইয়াছি যে তখন ১৩ নম্বর দেখিতে পাই নাই। আমার ১২ নম্বরের ঘর পার্শ্বে—আমি দরজা খুলিয়া ভিতরে যাইয়া বাতী জ্বালিলাম, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমার কেমন যেন ঘরটা ছোট ছোট বলিয়া বোধ হইল। আমি চুরুট টানিতে টানিতে জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। রাস্তায় জন মানব নাই, আমার পশ্চাতে গৃহ মধ্যে আলো থাকায় আমার ছায়া রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ বাটীর প্রাচীরে পতিত হইয়াছে। পার্শ্বস্থ গৃহের লোকও জানালায় দাড়াইয়াছিলেন তাঁহারও ছায়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে! সে কোন দীর্ঘ ক্ষীণকায় ব্যক্তির ছায়া, যতদুর বোধ হইল সে ছায়া কোন স্ত্রীলোকের। আমি যখন ধর্ম্মশালায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হই তখন কোন স্ত্রীলোককে দেখি নাই;—মনে মনে ভাবিলাম সম্ভবতঃ কোন স্ত্রীলোক সন্ধ্যার পর আসিয়া ধর্ম্মশালায় বাসা লইয়াছেন। তাঁহার ঘর হইতে যে আলোটা বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সেটা যেন কেমন কেমন বোধ হইল। কোন স্ত্রীলোক আমার পার্শ্বের গৃহে আশ্রয় লইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য আমি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তবে তাহার পরিধান রঙ্গিন বস্ত্রের কিয়দংশ আমার চক্ষে পড়িল। আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম, শয়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। জানালা বন্ধ করিতে গিয়া দেখি গৃহে কেবল মাত্র দুইটী জানালা রহিয়াছে। কি অশ্চর্য্য আমি যখন সন্ধ্যার পুর্ব্বে এই গৃহ দখল করি তখন তিনটা জানালা দেখিয়াছিলাম। আমি একটু বিস্মিত হইলাম, মনে মনে হাসিয়া বলিলাম কি আশ্চর্য্য "আমার কি মাথা খারাপ হইয়া গেল?

(২)

পরদিন প্রাতে উঠিয়া আমি প্রাতঃক্রিয়া সমাধার জন্য বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম আমার পার্শ্বের গৃহের দ্বারে এক নাগরা জুতা রহিয়াছে, আমি মনে মনে বলিলাম বোধ হয় যে স্ত্রীলোকটীকে কাল জানালার ধারে দেখিয়াছি, তাহারই সঙ্গীর এই জুতা। দ্বারের নিকট আসিয়া সহসা নম্বরের দিকে নজর পড়ায় আমি একেবারে বিস্মিত হইয়াগেলাম, দ্বারের উপর লেখা ১৪ নম্বর। ১৩ কোথায়? ছাড়াইয়া আসিয়াছি! আমি আবার ফিরিলাম কিন্তু ১৩ নম্বর কোথায়ও নাই, ১৪র পরই আমার ঘর, নম্বর ১২। কি আশ্চর্য্য! কাল রাত্রে আমি ১৩ স্পষ্ট দেখিয়াছি, তবে এ কি হইল? আমি আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, সর্ব্বনাশ সারি সারি তিনটী জানালা রহিয়াছে, কিন্তু কাল রাত্রে কিছুতেই দুইটীর

দিকে জানালা ছিল না। আমি সত্যই নিতান্ত বিস্মিত হইলাম; ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমার এখানে একদিনের অধিক থাকিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যথার্থ এই বাড়ীর রাত্রে কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না—অথবা আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য আমি আর এক রাত্রি এখানে বাস করিবার ইচ্ছা করিলাম। আমি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় আপনাদের এ বাড়ীতে ১৩ নম্বরের ঘর নাই ?"

তিনি বলিলেন—"না মহাশয় ?"

"কেন ১৩ নম্বর বাদ দিবার কারণ কি ?"

"তাহা আমি বলিতে পারি না, আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত এইরূপই দেখিতেছি। আমার মনিব হয়তো তা জানেন, তিনি এইরূপ নম্বর বসাইয়াছিলেন।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় এই সকল ঘরের পশ্চাৎ দিকে কয়টী করিয়া জানালা আছে ?"

তিনি কিয়ৎক্ষণ অতি বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"কেন আপনি কি তাহা দেখেন নাই, সব ঘরেরই তিনটি করিয়া জানালা আছে।"

ইহাকে আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম না, বলিলাম—"রাত্রে একবার আমার ঘরে আসিবেন ? একলা আছি একটু গল্প করা যাবে ?"

তিনি মহোৎসাহে বলিলেন,—"নিশ্চয় যাইব—নিশ্চয় যাইব—সে কি ?"

আমি সমস্ত দিন একরূপ করিয়া কাটাইয়া দিলাম, যথার্থই আমি রাত্রে ভুল দেখিয়াছি, না প্রকৃতই রাত্রে এই বাড়ীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে ? যাহা অসম্ভব তাহাই আমি ভাবিতেছি ভাবিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম। দেশে অনেককে পত্র লিখিতে হইবে সুতরাং আমি বৈকালে বিছানায় বসিয়া ট্রাঙ্ক হইতে কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলাম। ক্রমে পত্র লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, আমি বাতী জ্বালিলাম। পত্র লেখা শেষ করিয়া, আমি চুরুট ধরাইয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পার্শ্বের গৃহে যে স্থূলকায় গম্ভীর প্রকৃতির মাড়োয়ারী বণিক ছিলেন, এই এক রাত, এক দিনের মধ্যে আমি তাহার মুখের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সে ভাব ভঙ্গি দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা অসাধ্য। তাহার স্পষ্ট ছায়া রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ

বাটীর প্রাচীরের উপর পড়িয়াছে, সেই ছায়া দেখিয়া বুঝিলাম সেই স্থূলকায় মাড়োয়ারী নানা ভঙ্গিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। সে কি মধুর ভঙ্গি।

এই সময় কর্ম্মচারী মহাশয় গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তিনি প্রথম একবার চারিদিকে চাহিলেন, তৎপরে কোন কথা না বলিয়া আমার বিছানার উপর আসিয়া বসিলেন, তখন আমরা দুইজনে নানা কথা কহিতে লাগিলাম। সহসা আমার পার্শ্বস্থিত গৃহের মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গান ধরিলেন,—সেরূপ বিকট, ভয়ানক শব্দ আমি জীবনে আর কখনও শুনি নাই। বিভীষিকাময় শব্দে আমার দেহের সমস্ত শোণিত জল হইয়া গেল। যদি তখন আমি গৃহে একাকী থাকিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই চীৎকার করিতে করিতে এ স্থান হইতে পলাইতাম। কর্ম্মচারী মহাশয়ও বিস্ফারিত নয়নে বিশুষ্ক বদনে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন;—আমরা দুইজনই বাহ্যজ্ঞানহীন,—স্তম্ভিত,—নিস্পন্দ! অবশেষে কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন,—"একি—কি ভয়ানক! কিসের শব্দ? আর এক দিন এই রকম শুনিয়াছিলাম।" আমি বলিলাম,—"শব্দ, দেখিতেছেন না পাশের ঘর হইতে শব্দ আসিতেছে। মাড়োয়ারী বোধ হয় গান ধরিয়াছেন? কি ভয়ানক গান! লোকটা বোধ হয় পাগল?"

তিনি বলিলেন,—"বোধ হয় নয়—নিশ্চয়ই পাগল।"

ঠিক সেই সময় আমরা যাহার কথা বলিতেছিলাম,—সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মহা রাগত হইয়া আমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"বাবু তোমাদের আক্কেল কি? তোমরা কি ভদ্রলোককে ঘুমাইতে দিবে না?"

তিনি আরোও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া নীরব হইলেন। আমরা যে এই ভয়াবহ সঙ্গীতে চারিদিকে বিভিষিকা বিস্তার করিতেছি না, তাহা তিনি বুঝিলেন। আমরাও তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তখনও আমার পার্শ্বের ঘর হইতে সেই ভয়াবহ সঙ্গীত লহরে লহরে উঠিতেছিল। ব্যাপার কি—তবে এ ভয়াবহ গান গাহিতেছে কে? সত্য কথা বলিতে কি আমার বুক দুর দুর করিয়া উঠিল। আমরা সকলেই সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম। মাড়োয়ারী ভদ্র লোক বলিলেন,—"আমার পাশের ঘরতো এই"—তবে কে কোথায় এ রকম শব্দ করিতেছে?"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম—"আপনার ১৪ নম্বর, আমার ১২ নম্বর, মধ্যে ১৩ নম্বর ঘর কি নাই

কর্ম্মচারী দৃঢ় ভাবে বলিলেন,—"না আপনাদের দুই ঘরের মধ্যে কোন ঘর নাই!"

মাড়োয়ারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তবে কোথা হইতে এ শব্দ আসিতেছে?" "শুনিতে পাইতেছ না পার্শ্বের ঘরে কে চীৎকার করিতেছে"—"পার্শ্বে ত আমার ঘর তুমি কি বলিতে চাও,কোন প্রেতযোনিকে আমি ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"আমরা তিন জন এখানে আছি, চলুন দেখি পার্শ্বের ঘরে কে আছে?"

মাড়োয়ারী আরও রাগত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "পার্শ্বের ঘরতো আমার ঘর। আপনি কি বলিতে চাহেন যে, আমার ঘরে লোক আছে?"

আমি বলিলাম,—"না আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কর্ম্মচারী মহাশয় যাহাই বলুন, আমার বিশ্বাস ১৩ নম্বর ঘর এই বাড়ীতে আছে। আসুন দেখা যাক।"

আমি এই ব্যাপারে পূর্ব্বেই জানালা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ঘরে তিনটি জানালা, আর নাই;—দুইটী মাত্র রহিয়াছে। আমি উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,— "মহাশয় দেখুন, ঘরে দুইটা মাত্র জানালা, কিন্তু দিনের বেলায় তিনটা থাকে।"

কর্ম্মচারী মহাশয়ের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, মাড়োয়ারি ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলিলেন,—আমার যেন কাল রাত্রে মনে [illegible]ছিল ঘরটা যেন ছোট হইয়া গিয়াছে।

আমরা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া নম্বর [illegible] হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, আমার ঘরের পার্শ্বের ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলাম, দেখিলাম, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। আমি দরজার নম্বর দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম— "মহাশয় দেখুন, কত নম্বরের ঘর।"

মাড়োয়ারী বলিলেন, 'হাঁ ঐ আমার ঘরের দরজা; আমার জুতা দরজার বাহিরে পড়িয়া আছে। আশ্চর্য্য, দিনের বেলা [illegible] এ ঘর দেখিতে পাই নাই। তিনি কর্ম্মচারী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এ ঘরে কে আছে?"

তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন,—"মহাশয় আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এ ঘর কখনও দেখি নাই।"

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দরজা ঠেলিয়া দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন,—"ঘরে কে আছে, দরজা খোল।"

কেহ দরজা খুলিল না আমরা যেন ঘরের মধ্যে কাহারও অস্পষ্ট হাস্যধ্বনি

শুনিলাম। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বলিলেন, মহাশয় শীঘ্র দুই চারিজন লোক আর একখানা শাবল লইয়া আসুন। দরজা ভাঙ্গিতে হইবে। কর্ম্মচারী মহাশয় কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দরজার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আমার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন,—"ব্যাপার কি মনে করেন ?"

আমি বলিলাম,—"কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার ভিতর একটা কিছু নিশ্চয়ই ভয়ানক কাণ্ড আছে।"

এই সময় সহসা দরজা খুলিয়া গেল, এক বৃহৎ ভয়ানক হাত গৃহ মধ্য হইতে বাহির হইয়া মাড়োয়ারীর চুল ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইতে উদ্যত হইল। কিন্তু আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ধাক্কা দিয়া দরজা হইতে সরাইয়া দিলাম। হাত গৃহ মধ্যে অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। সে হাতের বর্ণনা করা আমার অসাধ্য ; কঙ্কালের হাত—তাহার উপর দীর্ঘ দীর্ঘ রোঁ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গলদঘর্ম্ম ছুটিয়াছিল ; আমার সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমার হস্ত দুই হস্তে ধরিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—চলুন—আর—আর—নয় !"

সেই সময় কর্ম্মচারী মহাশয় তিন চারিজন লোক লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক লোকের সমাগমে আমাদের ভয়ও একটু কমিল,—আমি বলিলাম, "দরজা ভেঙ্গে ফেল, কিন্তু সহসা ভিতরে কেহ যাইও না।"

একজন এক বৃহৎ শাবল আনিয়াছিল, সে দুই হস্তে সবলে সাবল ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু কাঠের উপর পতনের শাবলের শব্দ না হইয়া ইষ্টকের উপর পতনের শব্দ হইল। লোকটাও হাতে শাবল লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, শাবল প্রাচীরে পড়িয়া কতকটা স্থান গর্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে দরজা ছিল, সেখানে আর দরজা নাই। ১৩ নম্বরের দরজা অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার স্থানে প্রাচীর রহিয়াছে, পাশাপাশি আমাদের দুইঘর ১২ ও ১৪ নম্বর।

কিয়ৎক্ষণ আমরা সকলে স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান রহিলাম। আমাদের কাহারও মুখে কথা নাই। বহুক্ষণ পরে কর্ম্মচারী মহাশয় কম্পিত স্বরে বলিলেন, চলুন আজ রাত্রে আমার ঘরে থাকিবেন।

আমি বুঝিলাম তাঁহার একাকী থাকিবার সাহস নাই। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ, আমরা সানন্দ চিত্তে সে রাত্রি তাঁহার গৃহে কাটাইবার জন্য চলিলাম।

নিদার চেষ্টা অনর্থক, আমরা এই ভয়াবহ ব্যাপারের আলোচনায় রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। প্রভাত হইলে দিনের আলোকে আমাদের হৃদয়ে সাহস আসিল। তখন এ সম্বন্ধে কি করা উচিত আমরা তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলাম। দিনের আলোকে আমরা আমাদের দুই ঘর ১২ ও ১০ নম্বর ভাল করিয়া চারিদিক হইতে দেখিলাম, কিন্তু এই দুই ঘরের মধ্যে বেশ বুঝিলাম আর কোন ঘর নাই, দুই ঘরের মধ্যে একটী মাত্র প্রাচীর। ১৩ নম্বর ঘর থাকা অসম্ভব। দুই ঘরে তিনটী করিয়া জানালা আছে, রাত্রে কোন ভৌতিক ব্যাপারে দুই ঘর হইতে একটি করিয়া জানালা লইয়া মধ্যে একটী ঘর হয়, সেই ঘরে তখন কোন প্রেতযোনির আবির্ভাব হয়।

মাড়োয়ারী সেই দিন প্রাতেই তাহার তল্পী তাল্পা লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন, বলিলেন, "মহাশয় মাপ করিবেন ও ভয়ানক স্থানে আমি আর নই।"

সেইদিনই ধর্ম্মশালা পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু এ ভৌতিক রহস্যের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলাম না। আমি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি সেই দিনই আমাকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলে লোকজন দিয়া ১২ ও ১৪ নম্বর ঘরের মধ্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল। প্রাচীর মধ্যে এক সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে কেহ হয়ত জীবিত বা মৃত কাহাকেও এই প্রাচীর মধ্যে ইষ্টক দিয়া গাঁথিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারই কঙ্কাল প্রাচীর মধ্য হইতে বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোন যুবতী স্ত্রীলোকের কঙ্কাল।

*　*　*　*　*

ঠাকুরমার নিকট ভূতের অনেক গল্প শুনিয়াছি,—কিন্তু চক্ষে কখনও দেখি নাই; দূর বাঙ্গালা দেশ হইতে এত সুদূর পশ্চিমে আসিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আর ভূতের কথা গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। ভূতের অস্তিত্ব আছে এ কথা অস্বীকার করিবে কে করে?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল।

রত্নময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রূপের নেশা বড় ভয়ানক, উত্তেজনাময়ী। মদিরার নেশা সহজে কাটিয়া যায় ; কিন্তু রূপের নেশা সহজে ছাড়িতে চাহে না

যে দুর্দ্দান্ত ডাকাত ভৈরবানন্দকে দমন করিতে না পারিলে, ফৌজদার আমজাদ আলিকে সুবেদারের নিকট অপ্রতিভ হইতে হইত, যাহাতে চির গৌরবময় শাসন শক্তিতে কলঙ্ক পড়িত, তাহাকে এইভাবে আয়ত্ত করিয়া তিনি যত না সুখী, কমললোচন রায়ের কন্যা রত্নময়ীর সমুজ্জ্বল কান্তি সন্দর্শনে তিনি তার চেয়েও বেশী প্রফুল্লিত।

বাঙ্গলাদেশের একটা প্রদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, ফৌজদার আমজাদ আলি তাহার আলোকোজ্জ্বল কক্ষমধ্যে বসিয়া চিন্তামগ্ন অবস্থায় রহিয়াছেন। তাহার নিকটে কেহই নাই, আছে কেবল তাঁহার আদেশ অপেক্ষায় দ্বারপ্রান্তে বসিয়া এক বান্দা। আর তাহার সম্মুখে স্ফটিক পাত্রে রক্ষিত লোহিতবর্ণ টলটলায়মান বহুমূল্য বস্রাই সেরাজি।

সুবিস্তৃত তড়াগ সলিলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেই সরসী-বক্ষ যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, আমজাদ আলীর প্রাণের অবস্থাও সেদিন ঠিক সেইরূপ।

আমজাদ সাহেব স্বহস্তে পানপাত্র হইতে রক্তাম্বুদময় সুরা ঢালিয়া তাহা পান করিলেন। নেশাটা একটু জমাট হইলে, তিনি দেখিলেন অসংখ্য আলোকোজ্জ্বল সেই কক্ষটী যেন বেহেস্তে পরিণত হইয়াছে! কিন্তু সেই বেহেস্তের অধিষ্ঠাত্রী কোন সুন্দরী ত সেখানে উপস্থিত নাই!

আমজাদ আলি মনে মনে ভাবিতেছেন—কি সুন্দর রূপ সেই বিবির! আমি এযাবৎকাল দর্প করিয়া বেড়াইতাম যে আমার হারেমের মধ্যে যে সব সুন্দরী বিরাজ করিতেছে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। খোদার এই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রমণী-সৌন্দর্য্যের উপভোগে আমি জীবন সার্থক করিতেছি। কিন্তু কমললোচন রায়ের এই পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে।

কি সুন্দর আকার্ণ বিশ্রান্ত নলিন নয়ন! কি সমুজ্জ্বল কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি, কি সুন্দর ভ্রূযুগ! কি অপূর্ব্ব মাধুরী মাখা অবনত দৃষ্টি! কি মনোজ্ঞ রক্তরাগ

নান সমুজ্জ্বল গণ্ডদেশ। কি সুবঙ্কিম গ্রীবা! এমন সুন্দর কি আর কেউ হয়? হায় খোদা! মেহেরবান! আমার এ কি করিলে প্রভু! এত বড় মুলুকের ফৌজদার আমি—আমার চিত্তকে এত শক্তিহীন করিলে কেন প্রভু!

"কমললোচন রায় একবার আমাকে বলিয়াছিল—"যে তাহার জামাতা তাহার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে! যদি তাহার এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এই সুন্দরী শ্রেষ্ঠাকে আয়ত্ত করিতে আমার বেশী কষ্ট হইবে না! আমার একটী সামান্য ইচ্ছার অসম্পূর্ণতা ঘটিলে যখন আমি প্রলয় ঘটাইতে পারি তখন এত বড় একটা সাধ আমার,, যার জন্য আমার আহার নিদ্রা, বিলাস-বাসন সঙ্গীত, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত ভাল লাগিতেছে না, তাহা অপূর্ণ থাকিবে? আমার অবাহত স্বাধীন শক্তির উপর কলঙ্ক পড়িবে—না—ইহা আমি কোন মতেই সহিতে পারিব না।"

আমজাদ খাঁ এইরূপ অদ্ভুত চিন্তায় অধীর হইয়া, সেই চিন্তানাশের জন্য পুনরায় সেরাজি পান করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সে জ্বালা কমিল না, বরঞ্চ ঘৃতসিক্ত অগ্নির মত আরও বাড়িয়া উঠিল।

আমজাদ আলি কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হায়! আমি কি মূর্খ! নিজের অবাহত শক্তিতে আমার এত সন্দেহ! এই কমললোচন রায়কে আমিই সদর আমিনদারের পদ দিয়াছি। তাহাকে আশ্বাস দিয়াছি, শীঘ্রই তাহাকে সুবেদারের সনন্দ বলে "রাজা" উপাধি দিব তাহাকে পঞ্চশতী মন্সবদারের পদ দিব। এত অনুগ্রহ তাহাকে আমি করিব, কিন্তু তাহার বিনিময়ে সে কি আমার একটী সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিবে না? যদি না করে তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ করিব তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিব।

আমজাদ খাঁ, একটা সুখ-স্বপ্নের খেয়াল সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিতে না পারিয়া বড়ই চঞ্চল চিত্ত হইয়া উঠিলেন। চিত্ত শান্তি আনয়নের জন্য আবার রক্তাম্বদ তুল্য সেরাজী সুন্দরীর সম্বর্দ্ধনা করিলেন তারপর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"কৈ হ্যায়?"

পূর্ব্বে আমরা যে বান্দার কথা বলিয়াছি, সে বেগতিক হুকুমের অভাবে আলস্য জড়িত হইয়া তন্দ্রাসুখ-সম্ভোগ করিতেছিল নবাব সাহেবের ডাকে চমকিয়া উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া আসিল ও একটা আভূমি প্রণত সেলাম করিলে, সুবাদার বলিলেন—"এখনি একজন পণ্ডিতকে এখানে হাজির হইতে বল। বলিস্ বড় জরুরী প্রয়োজন!

বান্দা সেই রাত্রে পদাতিকের সন্ধানে চলিল! পুরীর বাহিরেই সেনানিবাস সে তখনই সেই পুররক্ষী সেনার সর্দ্দারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

ফৌজদার সাহেবের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আভূমি প্রণত একটী সেলাম করিয়া বলিল—জনাব! বান্দা হাজির, হুকুম ফরমাইয়ে?"

আমজাদ আলি বলিলেন—নেয়ামত! তোমায় একটী জরুরী কাজের ভার দিতেছি! এই সপ্ত গ্রামের মধ্যে সদর আমিলদার কমললোচন রায়ের কুঠী বোধ হয় তুমি জান?"

প্রহরী বলিল—জানি বই কি জনাব! এই সে দিন সেই কুঠীতে রায় সাহেবের কাছে আমাকেইত পাঠাইয়াছিলেন।

"বহুৎ খুব! তুমি এখনই গিয়া রায়সাহেবকে সংবাদ দাও, কোন জরুরী প্রয়োজন জন্য আমি তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থী! তাহাকে এখনই এখানে উপস্থিত হইতে বল।

প্রহরী বলিল "রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এরূপ স্থলে—"আমজাদ আলি সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"চুপ রও বান্দা। আমার অধীনস্থ এক জন সামান্য সেনার পরামর্শ মতে আমি চলিতে চাহি না। তোমায় যে আদেশ করিলাম তাহা এখনই পালন করিতে চাও! কমললোচন রায় যদি নিদ্রিতও হইয়া থাকে, তাহাকে জাগাইয়া তুলিবে।"

ধমক খাইয়া প্রহরীর সর্দ্দার তখনই সেই স্থান ত্যাগ করিল। আমজাদ সাহেবের মেজাজ দেখিয়া সে মনে মনে বলিল—"শয়তান যখন একটা আসিয়াছে, তখন আজকের ব্যাপার বড় সহজ নয়!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কমললোচন রায় ঘোর শাক্ত। তাহাতে সেদিন আবার অমাবস্যা। এজন্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি ঠাকুর ঘরে কাল কাটাইয়াছেন। পূজাদি শেষ করিয়া আহারে বসিতে যাইবেন এমন সময়ে, ফৌজদারের পদাতি তাঁহার বাটীর দ্বারে পৌঁছিল।

দ্বারে এক জন দরোয়ান ছিল। দেউড়ীতে পাঁচ সাত জন ছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ খাটিয়ার মধ্যে লম্ববান হইয়া, ভাঙ্গের নেশার খেয়ালে তাহার প্রিয়তম দেশওয়ালীর মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল; কেহ বা মৃদুস্বরে ভজন গাহিতেছিল, কেহবা একমনে তাহাই শুনিতেছিল ও ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিতেছিল।

বাহিরে যে দারোয়ান ছিল, ফৌজদারের পদাতিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"তোম্‌রা মনিব কাঁহা ?"

দারোয়ান ফৌজদারের প্রধান পুরী-রক্ষীকে সহসা তাহার সম্মুখীন হইতে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া একটি সেলাম করিয়া বলিল—"আভি ত রায়সাহেব নিদ্ গিয়া ; রাততো বহুৎ হুয়া সাহেব।

ফৌজদারের সেপাহী বলিল—"তুমি এখনই তাঁহাকে খবর দাও, এক জরুরী কাজ লইয়া ফৌজদার সাহেবের নিকট হইতে তাহার প্রধান সেপাহী আসিয়াছে। ইয়াদ্ রাখিও, ব্যাপার বড় জরুরী।

প্রহরী রায়সাহেবের একজন দাসীকে দেখিতে পাইয়া, তাহার উপরই এই সংবাদদানের ভার দিল এবং একটা বেতের মোড়া আনিয়া সিপাহীকে বসিতে দিল।

রায়সাহেবের আহারের ঠাঁই হইয়াছে। তাঁহার পত্নী ও কন্যা রত্নময়ী অন্ন পার্শ্বে বসিয়া প্রতিমূহূর্ত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে—এমন সময় রায় সাহেব আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

কন্যাকে এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া রায়সাহেব সহাস্য মুখে রত্নময়ীকে বলিলেন—"তুই এত অধিক রাত্রি জাগিয়া আছিস যে রত্নময়ী ?"

রত্নময়ী সহাস্য আস্যে বলিল—"কতদিন তোমার আহারের সময় কাছে বসিতে পারি নাই—আজ কেমন ইচ্ছা হইল, তাই এখনও জাগিয়া আছি।"

রায়সাহেব আসনে বসিয়া সবে মাত্র গণ্ডুষ করিবার জন্য জলের গ্লাসটি বাম হস্তে ধরিয়াছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত দাসী বিমলা খোদ উপস্থিত হইয়া ফৌজদারের সিপাহীর আগমন সংবাদ দিল।

গণ্ডুষের জল ফেলিয়া দিয়া রায়সাহেব আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। পত্নীকে বলিলেন—"তোমরা অপেক্ষা কর। আজ বোধ হয় আমার অদৃষ্টে অন্নভোগ নাই। এত রাত্রে যখন ফৌজদারের সেপাহী আমার দ্বারস্থ, তখন বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। নূতন কোনরূপ বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা ত দেখিতেছি না। আমার বোধ হয়, সেই ডাকাত ভৈরবানন্দ বেটা কারাগার হইতে পলাইয়াছে।

রায়সাহেব, তখনই মুখের আহার ত্যাগ করিয়া নীচে নামিলেন। ফৌজদারের সিপাহী তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা সেলাম করিল।

রায়সাহেব প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—খাপার কি নিয়ামত আলি ?

নেয়ামত। ভিতরে কথা তো কিছু জানি না। নবাব সাহেবের মেজাজ বড় খারাপ বোধ হ'ল।

রায়সাহেব! কেন—কারণ কি?

নেয়ামত! তাহা জানিনা জনাব! তিনি বিনা বিলম্বে আপনাকে তাঁহার নিকট হাজির হইতে আদেশ করিয়াছেন। এখনই এই রাত্রে আপনাকে হাজির দিতে হইবে।

কমললোচন রায় এই জোর তলবের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন!

সেই সিপাহীকে সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন,—"সেই ডাকাত বেটা পলায়ন করে নি ত?"

নেয়ামত বলিল—"না হুজুর! সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! তাহাকে মাটির নীচের এক কয়েদ ঘরে রাখা হইয়াছে। সেখান হইতে পিপড়ারও পলাইবার উপায় নাই, তা মানুষ অতি ছার।"

ব্যাপারটা যে কি, তাহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া কমললোচন সেই পদাতিককে বলিলেন,—"আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এখনি আসিতেছি। তুমি অগ্রসর হইয়া নবাবকে সংবাদ দাও।"

সর্দ্দার সিপাহী এই কথা শুনিয়া রায় সাহেবকে পুনরায় একটী সেলাম করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।

কমললোচন রায় অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন, মনে মনে বলিলেন,—ইহাকেই বলে নবাবী চাকরী। চাকরীর অবস্থা দেখিতেছি কুকুরের চেয়েও অধম! আমি এই প্রদেশের সদর আমিলদার। পাঁচশত সিপাহী আমার অধীনে; আমার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়! কিন্তু তাহা হইলেও আমার দশা এই! উপস্থিত অন্নগ্রাস ত্যাগ করিয়া এই রাত্রে নবাবের আদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার কুঠীতে ছুটিতে হইবে। হায় মা! জগদম্বা, এতও তোমার মনে ছিল মা!

উপরে উঠিয়া আসিয়া কমললোচন তাঁহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভগবান আজ আমার অদৃষ্টে অন্ন মাপেন নাই। ফৌজদার সাহেব বড় জোর তলব করিয়াছেন। আমাকে এখনই একবার নবাব বাটীতে যাইতে হইবে। তোমরা আমার আহার্য্যাদি চাপা দিয়া রাখ।"

আর কোন কিছু না বলিয়া বা তাঁহার পত্নীকে কোন কথা বলিবার অবসর

বিলম্ব না করিয়া কমললোচন রায় তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজদরবারোচিত বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন! তৎপরে তাঁহার গৃহদেবতা কালিকার মন্দির প্রান্তে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বলিলেন,—দেখিস জননী আজ যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে! এই মাত্র আমি তোমার চরণে বিল্বদল অর্পণ করিয়া উপরে গিয়াছি।"

কমললোচন রায় ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পাল্কী প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। পাল্কী-বাহকেরা পাল্কী লইয়া সদর দ্বারে তাঁহার জন্য অপেক্ষা কারে

ভয়কম্পিত হৃদয়ে, আশঙ্কাময় প্রাণে কমললোচন ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। সহসা তাঁহার মাথাটা পাল্কীর উপরের কাঠে লাগিয়া গেল! তাঁহার মস্তক হইতে পাগড়ি খসিয়া ভূতলে পড়িল

কমললোচন পাল্কীতে উঠিবার সময়ে এইরূপ একটা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া বড়ই সশঙ্কিত চিত্তে উষ্ণীষটী কুড়াইয়া লইয়া পাল্কীতে উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে নিকটস্থ এক বৃক্ষশাখা হইতে পেচক কঠোর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে কঠোর চীৎকারে কমললোচনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। এটা যে অতি ভয়ানক দুর্লক্ষণ! এত দিন তিনি নবাব দরবারে যাতায়াত করিতেছেন, কখনও এরূপ অশুভ যোগ ঘটে নাই!

কমললোচন পাল্কীতে উঠিবামাত্র বাহকেরা পাল্কী স্কন্ধে তুলিল। তাঁহার বাটী হইতে নবাবের বাটী তিন চারি রশি পথ। নবাব দরবারে সদা সর্ব্বদা হাজির হইতে হয় বলিয়া তিনি সপ্তগ্রামে এই প্রাসাদ তুল্য এক অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতেই বসবাস করিতেছিলেন।

অমাবস্যার রজনী। চারি দিকে ভীষণ অন্ধকার! সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে সম্মুখের জিনিস দেখা যাইতে ছিল না। প্রকাণ্ড রাজপথ প্রস্তরমণ্ডিত, বাহকেরা চিরপরিচিত। এজন্য তাহাদের অবাধ গমনে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিল না।

নীলাকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল তারকা জ্বলিতেছে। এই কোটি কোটি তারকার সমবেত জ্যোতিতে অন্ধকারটা তত দূর ঘনীভূত হইতে পারে নাই। কমললোচন পাল্কীর মধ্যে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে সেই শিবিকা, নবাবের প্রাসাদ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বারস্থ প্রহরী রায়সাহেবকে দেখিয়া অস্ত্র নোয়াইয়া সম্মান করিল।

আমজাদ খাঁ অতি উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কমললোচন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী সেলাম বাজাইয়া বলিলেন,—"খোদা জনাবের মঙ্গল করুন।"

'এত রাত্রে আমায় স্মরণ করিয়াছেন কেন? কোন জরুরী রাজকার্য্য কি?"

ফৌজদার আমজাদ আলি খাঁ, রায়সাহেবকে নিকটস্থ একটী সোফা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ঐ খানে বসুন। রাজকার্য্য ঠিক নয়, তবে কাজটা আমার নিজের বটে।"

কমললোচন মস্তক হইতে পাগড়ী নামাইয়া আবার একটী সেলাম বাজাইয়া বলিলেন,—"আমার এমন কি সৌভাগ্য যে আমি আপনার কাজে লাগিব?"

আমজাদ আলি এক স্বর্ণময় ক্ষুদ্র গ্লাসে সেরাজি ঢালিয়া তাহা পান করিলেন; তৎপরে বলিলেন,—"কমললোচন রায় আমি তোমাকে না দিয়াছি কি? সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান ও বীরভূম এই তিন তিনটা বড় বড় পরগণার আমিলদারী পদ তোমায় দিয়াছি! যদি পাঁচ বৎসরকাল তুমি একটু বুঝিয়া সুঝিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে তুমি অতুল ধনেশ্বর হইবে।"

কমললোচন একটী সেলাম করিয়া বলিলেন,—"সেটা জাঁহাপনার অনুগ্রহ।"

সেকালে রাজপুত্র ও সম্রাট ভিন্ন আর কাহাকে কেহ জাঁহাপনা সম্বোধন করিত না। কিন্তু ভাগ্যপরীক্ষার্থী, নূতন ধনী কমললোচন ফৌজদার সাহেবের প্রীতিসুখ সম্পাদন ও চিত্তুতুষ্টির জন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে এই ভাবেই সম্বোধন করিতেন। তবে সেটা সকলের সম্মুখে বা প্রকাশ্য দরবারে নহে। নির্জ্জন কক্ষেই তাঁহার সম্মানের প্রবাহ অবাধভাবে ছুটিয়া যাইত।

ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"বাদসাহ থাকেন দিল্লীতে। সেই দিল্লী এই বাঙ্গলা দেশ হইতে কতদূরে। আর সুবেদার কখনও থাকেন ঢাকায়, আর কখনও থাকেন রাজমহলে। ধরিতে গেলে আমিই এই কয়টা বড় বড় পরগণার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। কমললোচন! আমি ইচ্ছা করিলে না পারি কি? তুমি জান, আমি ওরঙ্গজেব বাদসাহার অতি নিকট আত্মীয়; নবাব সায়েস্তা খাঁর জামাতা। আমি শীঘ্রই তোমাকে নবাব সায়েস্তা খাঁকে বলিয়া রাজসনন্দ আনাইয়া দিব!"

কমললোচন রায়ের এ মরজীবনের সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছিল, বাকী ছিল এই রাজা হওয়া। কিন্তু ফৌজদার সাহেবের ভূমিকার আড়ম্বর দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই শঙ্কিত হইলেন। আমজাদ খাঁ, একজন অতি জবরদস্ত লোক, অতি স্বল্পভাষী, তাঁহার মুখে এত বেশী কথা কেন?

আমজাদ খাঁ বলিলেন—"রায় সাহেব! আমি যদি তোমার জন্য এতটা করিতে

না -তাহা হইলে তুমি কি আমার জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিবে না ? যাহাতে আমার প্রাণের তৃপ্তি হয়, আমার মনের একটা শ্রেষ্ঠ বাসনা পূর্ণ হয়, তাহার একটু সহায়তা করিবে না ?

কমললোচন এক মহাসমস্যায় পড়িল। এই দাম্ভিক ফৌজদার যিনি প্রকাশ্য দরবারে তাহার সহিত কাজের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই কন্ না, তাহার এতটা বিনয়, এতটা সৌজন্য কেন ?"

আমজাদ খাঁ আবার সেরাজি পান করিলেন চক্ষু লজ্জার যে সামান্য আবরণটুক ছিল তাহাও কাটিয়া গেল !

আমজাদ খাঁ প্রসন্নমুখে বলিলেন,—"সেদিনকার দরবারে আমি তোমার কন্যাকে দেখিয়াছিলাম। অমন সুন্দর রূপ, আজ পর্যান্ত কখনও আমার চোখে পড়ে নাই। রায় সাহেব ! তুমি ভাগ্যবান্, এমন সুন্দরী কন্যা পাইয়াছ ?

কথাটা শুনিবামাত্রই কমললোচন রায়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমজাদ খাঁ বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যথেচ্ছাচারী। অনেক দুঃখী, নিরীহ গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার তৃপ্তি বিধানের জন্য সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া থাকে ! কি সর্ব্বনেশে কথা আমায় এখনি শুনিতে হইবে, তাহা জানি না।

আমজাদ আলি বলিলেন—"কমললোচন রায়—তোমার কন্যা কেন আমার সম্মুখে আসিয়াছিল ? তাহাকে দেখিয়া অবধি আমি একবারে আত্মহারা হইয়াছি আমার আহারে শান্তি নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই, জাগরণে শান্তি নাই। কন্যা রায় ! কিছু দিন আগে তুমিই আমাকে কথাচ্ছলে বলিয়াছিলে তোমার এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে তোমার জামাতা ত্যাগ করিয়াছে। আমি এই পরিত্যক্তা সুন্দরীকে আমার বেগম করিতে চাই !"

কথাটা শুনিয়া কমললোচন রায় আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমগ্র আকাশমণ্ডল যেন তাহার মাথায় খসিয়া পড়িল ! তাহার পায়ের নীচে ধরিত্রী যেন কাঁপিয়া উঠিল। কমললোচন উদাস দৃষ্টিতে বলিলেন—"কি শুনিতেছি আমি ফৌজদার সাহেব ! এই কথা বলিবার জন্যই কি আপনি আমাকে এরাত্রে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন ?

আমজাদ আলি গম্ভীর মুখে বলিলেন—"সাবধান রায় সাহেব। তোমার মত অধিনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত এরাত্রে রাজকার্য্য সম্বন্ধে যে কোন কথা থাকিতে পারে না, তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখ নাই ?"

কমললোচন রায় বলিলেন—"জনাব আপনি মহাভ্রমে পড়িয়াছেন ?"

আমজাদ। কেন ?

কমললোচন। আমার জামাতা কন্যার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। আজ আমার জামাতার চেষ্টাতেই আপনি ভৈরবানন্দ ডাকাতকে অত সহজে করায়ত্ত করিতে পারিয়াছেন।"

আমজাদ। তোমার জামাতাকে এজন্য আমি পুরস্কৃত করিব। সে সরকারের অধীনে একজন আমিলদার হইবে।"

কমললোচন রায় এ কথার যে কি উত্তর দিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ফৌজদারের মুখে এই ভয়ানক কথাটা শুনিয়া অবধি তাঁহার মস্তিষ্কে একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল !

ফৌজদার সাহেব বলিলেন—"রায় সাহেব ! আমি তোমার কন্যাকে আর একবার দেখিতে চাই। সাত দিন আমি তোমায় সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। আমি এখনই তোমাকে বন্দী করিয়া, তোমার কন্যাকে বলপূর্ব্বক এই রাত্রে এখানে আনাইতে পারি। কিন্তু একটা মুল্লুকের শাসনকর্ত্তা আমি। অতটা আমি করিতে ইচ্ছা করি না। তোমায় সাত দিন সময় দিলাম। এই সাত দিন বিবেচনার পর যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, জানিও তোমার অদৃষ্টে আরও সুখ সৌভাগ্যাদি লাভ হইবে তুমি এই দেশের ও দেশের মধ্যে একজন জানিত ব্যক্তি হইয়া উঠিবে। ফৌজদারের নীচেই তোমার সম্মান প্রতিপত্তি করিয়া দিব। আর যদি তুমি কোন প্রকারে আমার ইচ্ছার প্রতিকূলতা কর, তাহা হইলে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব। কারাগারের মধ্যেই তোমার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব। তুমি সপ্তগ্রাম চাকলায় যে তহবিল তছরূপ করিয়াছ, বীরভূমের মহাজনদের সঙ্গে একযোগে, দুর্ভিক্ষের সময়ে সমস্ত শস্য একচেটিয়া করিয়া কিনিয়া রাখিয়া, বাদসাহের প্রজাদের অনাহারে মৃত্যুর কারণ হইয়াছ ; তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আমি জানি ! মনে জানিও, এই তহবিল তছরূপ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তোমার সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিতে পারি, তোমায় পথের ভিখারী করিতে পারি—তোমার প্রাণদণ্ড করিতে পারি—যাও তুমি এখন। কিন্তু মনে যেন থাকে যেন, সাত দিন পরে আমি আমার প্রস্তাবের অনুকূল উত্তর চাই।"

এই কথা বলিয়া ফৌজদার সাহেব, কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কমললোচনও ভগ্ন হৃদয়ে নিরাশ প্রাণে, চিন্তাকাতরা চিত্তে তাঁহার বাটীতে ফিরিলেন। সেরাত্রে তিনি অন্নজলও স্পর্শও করিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রি কমললোচনের নিদ্রা হইল না। কমললোচন তাঁহার পত্নীর নিকট কোন ঘটনাই গোপন করিলেন না। ফৌজদারের সঙ্গে, এই অভাগিনী রত্নময়ীর সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সবই তিনি পত্নীকে প্রকাশ করিলেন।

তাঁহারপত্নী এই কথাটা শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেলেন। বলিলেন কি সর্ব্বনাশ, উপায় কি? মেয়েটাকে ত বাঁচাইতে হইবে। বংশের নাম সম্ভ্রম গৌরব সবই যে যায়। মা! জগদম্বা! একি করিলে মা!

রত্নময়ী, পার্শ্বস্থ কক্ষে শুইয়াছিল। এই দুইটা কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারটা খোলা থাকিত। রত্নময়ী নিস্পন্দভাবে শয্যার উপর পড়িয়াছিল। [illegible] ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের কন্যা নিদ্রিতা। এজন্যই তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে কথোপকথন করিতেছিলেন।

রত্নময়ী তাঁহাদের সব কথাই শুনিল। তাহার শরীরে যেন বৃশ্চিক দংশন [illegible] উপস্থিত হইল। হরপ্রসাদ সেই দিন প্রভাতে বাটী চলিয়া গিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে স্বামীর সহিত একটা পরামর্শ করিবে [illegible] পথ নাই।

রত্নময়ী মনে মনে বলিল—"স্বামী নিন্দা, স্বামীর প্রতি অভক্তি যে [illegible] মহাপাপ তাহা আজ আমি বুঝিতে পারিলাম। যে স্বামী এত সংসারে স্ত্রীলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা, আরাধ্য ইষ্ট, আমি তাঁহাকে [illegible] অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, [illegible] উপযুক্ত ফল আমি পাইতেছি। যে সংসারে আমি রাজরাণীর মত [illegible] থাকিতে পারিতাম সেখানে আমার সপত্নী আসিয়া জুটিয়াছে। [illegible] ভৈরবানন্দের হাতে পড়িয়া আমার কি না [illegible] ঘটিল। [illegible] যে স্বামীকে আমি অপমানিত করিয়াছিলাম, আমার সেই [illegible] নিবারণ স্বামীই আমাকে আবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন। তারপর আবার এই নূতন বিভ্রাট! [illegible] বিপদ যে সকলের চেয়ে বেশী। দেশের নবাব ফৌজদারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, এমন কি তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে। হায়! আমি চারিদিকে সর্ব্বনাশই দেখিতেছি, রাহুরূপে এই সংসারে জন্মিয়াছিলাম।"

রত্নময়ী আর সহিতে পারিল না। তাহার বুকের ভিতরের গ্রন্থিগুলা কে যেন সবলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। তাহার পঞ্জরাস্থির মধ্য দিয়া যেন জ্বালাময়ী বিদ্যুৎস্রোত ছুটিল।

রাত্রিটা এইভাবে কাটিল। রত্নময়ী প্রভাতে উঠিয়া পূজাদি সমাপন করিল সে মনে মনে ভাবিল—"এ বিপদে আমাকে রক্ষা করিতে পারে এমন ত কাহাকেও দেখিতেছি না। সেই জগন্মাতা আদ্যাশক্তি ভিন্ন আর কেহই নাই যে আমায় এই মহা বিপদ হইতে বাঁচাইতে পারে। যে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন আর্ত্তের আশ্রয়, দীনের পালক, আজ আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের ডাকিব! দেখি—আমার এ বিপদের প্রতিকার হয় কি না?"

কমললোচন রায় তাঁহার সুবিস্তৃত পুরী মধ্যে লক্ষ্মী জনার্দ্দনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে নিত্য সেই যুগল মূর্ত্তির পূজা করিতেন! রত্নময়ী স্নানান্তে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিয়া পুষ্পচন্দন তুলসীপত্রে, পুষ্পপাত্র পূর্ণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল।

সে যে মন্ত্র তন্ত্র, কিছুই জানে না। রত্নময়ী মনে মনে ভাবিল—"সরল ভাষায় ঠাকুরের কাছে মন বেদনা প্রকাশ করি। মন্ত্র তন্ত্রে কোন প্রয়োজনই নাই। সতীর সতীত্ব নাশ। ঠাকুর আমার সর্ব্বান্তর্য্যামি। তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিবেন। আমার দুঃখের প্রতিকার করিবেন। যিনি দৈত্য বিনাশকারী, মধুকৈটভ ধ্বংশকারী তিনি আমায় রক্ষা করিবেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে তাহার মনের কথা জানাইয়া রত্নময়ী মধুসূদন স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। তাহার যুগলনেত্র বাহিয়া ভক্তির অশ্রু-প্রবাহ বহিল। সে বলিতে লাগিল—

ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ শোকাতুরং প্রভোঃ
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন।
দুঃখার্ণব পরিত্রাণাং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর
সংসার ঘোরে মগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন।
নবীন নীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্
যশোদা নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং।
প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দী জলকেলি কলোৎসুকং।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ।
বসন্ত কুসুমামোদ সুরভীকৃত দিঙ্মুখে
গোবর্দ্ধনগিরৌরম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুখং।
ত্বমেব শরণং মমন গতির্ব্বিদ্যতে নাথ
উপস্থিত মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন।

ইষ্টস্তোত্র পাঠান্তে রত্নময়ীর হৃদয় যেন এক স্বর্গীয় তেজে পরিপূর্ণ হইল। কোন অশরীরি যেন তাহার কাণে কাণে বলিল—"ভয় কি মা তোর! যিনি একদিন কুরুসভামধ্যে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই তোকে রক্ষা করিবেন। স্বামীকে নারায়ণ জ্ঞানে তাঁহার শরণাপন্ন হ। তোর কোন ভয়ই নাই।"

প্রাণে একটা নূতন তেজ লইয়া, হৃদয়ে একটা নূতন শক্তি পাইয়া নারায়ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সে সেই দেবমন্দির ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিল—"স্বামী—ইষ্টদেব! এ বিপদের সময় কোথায় তুমি! আমার আর কোন নারায়ণই নাই। তুমি এ বিপদে রক্ষা কর বিপদবারণ মধুসূদন।

ক্রমশঃ—

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

—০—

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩২২ সন { ৭ম সংখ্যা

জলপ্লাবন।

লেখক—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রমেন্দ্রকিশোর দত্ত কায়স্থ—ভারি ধনবান ব্যক্তি—জমিদার। বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর, এখনও অবিবাহিত। চরিত্রবান, আচারবান রমেন্দ্রকিশোরের সংসারে এক বৃদ্ধা পিসিমাতা ভিন্ন রমেন্দ্রকে শাসিত করিবার আর কেহ বড় নাই। কিন্তু পিসিমাতার কঠিন শাসন, পরে অনুনয়, অনুরোধেও রমেন্দ্রকিশোর বিবাহ করিল না। পিসিমাতা তাহাকে বিবাহের কথা বলিলে সে মাত্র হাসিতে থাকে। অনুরোধের প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে পারিলে সে কোনও না কোনও সূত্রে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। বাটীর পুরাতন খাতাঞ্জি মনোহরদাস পিসিমাতার উকীল হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই এক কথা বলিত। সেই কারণে রমেন্দ্রকিশোর মনোহর দাসকেও একটু দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত। সে কথা বুঝিতে পারিয়া মনোহর দাস রমেন্দ্রকে বিলক্ষণ চাপিয়া ধরিত, কিন্তু ফলে তাহার কিছুই হইত না।

উপায়ন্তর না দেখিয়া রমেন্দ্রের পিসিমাতা শিবসুন্দরী অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন। রমেন্দ্রকিশোর শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরের শেষে পিতৃহীন। পিসিমাতার স্নেহাদরেই রমেন্দ্রকিশোর লালিত পালিত। তেমন ক্ষেত্রে শিবসুন্দরী, রমেন্দ্রকে সংসার বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে স্থির হইতে পারেন কি?

কিন্তু তিনি কি করিতে পারেন? বিবাহের কথা উঠিলেই রমেন্দ্র আর তাহার নিকটে পর্য্যন্ত আসে না। এক আহারের সময় ভিন্ন রমেন্দ্র আর বাটীর

মধ্যে বড় প্রবেশ করে না। আহারের সময়ে শিবসুন্দরী কেমন করিয়াই বা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করেন! রমেন্দ্রকিশোর তাহার পিসিমাতাকে বিলক্ষণ চিনিত, তাঁহার স্বভাব সে বিলক্ষণ অবগত ছিল। সেই কারণেই সে বাটীর মধ্যে প্রবেশের ব্যবস্থাটা এইরূপ ভাবে করিয়া রাখিয়াছে।

বিবাহ না করিবার যে কারণটা কি, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই এবং সে সম্বন্ধে কোনও কথা স্পষ্ট করিয়া রমেন্দ্রকিশোর কাহাকেও বলে নাই, অথবা বলিতে চাহে নাই। রমেন্দ্রকিশোরের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সত্যব্রত রায় সেই কথা তুলিয়া বন্ধুকে একদিন বিলক্ষণ চাপিয়া ধরিল এবং কেন যে তাহার বিবাহে এরূপ বীতরাগ তাহার কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বহু তর্ক বিতর্ক সাধ্য সাধনার পরে রমেন্দ্রকিশোর সাশ্রুনয়নে কহিল— অতি অল্পবয়সে যে পিতৃ-মাতৃহীন, সংসার-বন্ধন যার আদৌ নাই, তার আবার সংসার ধর্ম্ম কি ভাই? আমি ভাগ্যহীন, আবার একটা পরের মেয়েকে ভাগ্যহীন কেন করি বল? যে কটা দিন থাকি, সে কটা দিন পরের সেবাই আমার ধর্ম হ'ক। এর অধিক আমার আর কিছুর আবশ্যকতা নাই।

রমেন্দ্রের কথা শুনিয়া সত্যব্রত অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাহার মনোভাব সে বন্ধুকে জানিতে দেয় নাই—পাছে তাহাতে রমেন্দ্রকিশোর উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার মতটাকে অভ্রান্ত মনে করে। সত্যব্রত বরং রমেন্দ্রের তর্ক যুক্তিতে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিল এবং তাহার তর্কযুক্তি যে নিতান্ত ভিত্তিহীন সে কথা স্পষ্ট বলিতেও ত্রুটি করিল না। তর্কের উপরে সত্যব্রত অধিকতর তর্ক করিল, সমধিক যুক্তি প্রদর্শন করিল। তর্ক যুক্তি, অনুনয় বিনয় অনুরোধ ভয় প্রদর্শন ও বহু সাধ্যসাধনাতেও সত্যব্রত রমেন্দ্রকে বিবাহ-মতাবলম্বী করিতে পারিল না। তাহার সেই এক কথা—কথান্তর নাই। সত্যব্রত ক্ষুণ্ণ হইল, নিরাশ হইয়া নিরস্ত হইল; কিন্তু শিবসুন্দরী রমেন্দ্রের যুক্তি তর্কে কর্ণপাতও করিলেন না। ব্যাকুলা শিবসুন্দরীর "জিদ" বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঘটক ডাকাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য একটী সর্ব্বসুলক্ষণা পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য তিনি ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের কথা ভিতরে ভিতরে চলিতে লাগিল।

সে সকল কথা জানিতে পারিয়া রমেন্দ্রকিশোর একদিন ঘটককে পথিমধ্যে "পাকড়াও" করিয়া বিলক্ষণ ধমকাইয়া দিল। কিন্তু বাটীর গৃহিণী যখন ঘটকরাজের সহায় তখন রমেন্দ্রের রোষকষায়িত লোচন দেখিয়া সে ভয় পাইবে কেন? ঘটক প্রবর হাসিতে হাসিতে বলিল—

"বাবু, এখন অমন ক'রছেন, কিন্তু বিবাহের পর আমাকে ডেকে মাসহারা দিতে হ'বে—হাঁ, সে কথাও আমি ব'লে রাখ্‌ছি আমি অমন ঢের দেখেছি বাবু, ঢের দেখেছি। বাবুরা সব বিবাহের পূর্ব্বে একবার তড়্পান; তা'রপর একেবারে গঙ্গাজল।"

অপ্রতিভ হইয়া রমেন্দ্রকিশোর ঘটক ঠাকুরকে নিষ্কৃতি প্রদান করিল। সেই অবধি ঘটক ঠাকুরের ঘট্‌কালির ঘটাটা অপ্রতিহতভাবেই চলিতে লাগিল। রমেন্দ্রকিশোর দেখিয়া শুনিয়াও সে সম্বন্ধে আর কোনও কথাই ক'হিত না। ঘটক ঠাকুরের বিদ্রূপ কৌতুকে সে কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিবাহের কথাবার্ত্তা পাত্রী পক্ষের সহিত যখনই একপ্রকার স্থির হইতে লাগিল, রমেন্দ্রকিশোর তখনই এমন কৌশল করিয়া পাত্রীপক্ষের নিকট বলিয়া পাঠাইতে লাগিল যে পাত্রীপক্ষ সে বিবাহ প্রস্তাবে আর কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারিল না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। কিন্তু রমেন্দ্রের সে চাতুরী, সে কৌশল আর অধিক দিন চলিল না। চতুর ঘটক, রমেন্দ্রের চাতুরী অবশেষে ধরিয়া ফেলিল। শিবসুন্দরী এক দিন শুনিলেন, রমেন্দ্র নাকি কোনও এক পাত্রীপক্ষের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছে,—তাহার রাজ যক্ষা আছে, রাত্রে তাহার অল্প অল্প জ্বর হয়, কাশিও আছে—তেমন পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে কন্যার বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। কথাটা শুনিয়া রমেন্দ্রকিশোরের জননী-রূপিণী শিবসুন্দরী দারুণ বেদনানুভব করিলেন। বেদনার তীব্রতায় তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রমেন্দ্রকে ডাকাইয়া তিনি একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন—

হ্যাঁরে রমি, এই বয়সে এই জলুনী সহ্য করবার জন্য কি আমায় বাঁচতে হ'ল? আমার পেটের একটা নাই যে তা'র মুখ চেয়ে আমি বেঁচে থাকি। দাদা তোকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন—তা' কি এই জলুনী সহ্য করবার জন্য?"

শিবসুন্দরী স্নেহাধিক্যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন একভাবে, রমেন্দ্রকিশোর কিন্তু বুঝিল অন্যভাবে। ইতঃপূর্ব্বে রমেন্দ্রকিশোরের একটু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল—এক্ষণে তাহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। রমেন্দ্রকিশোর একটু বিরক্তভাবে বলিল—

"ও সকল কথায় তুমি থাক কেন পিসি মা? কথায় না থা'ক্‌লে ত আর জ্বালাতন হ'তে হয় না।"

কথা সাঙ্গ করিয়া রমেন্দ্রকিশোর বিরক্তভাবে চলিয়া গেল। বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহার নয়নে সহস্রধারা বহিতে লাগিল। শিবসুন্দরীর রোদন—অভিমানের। তিনি

ভাবিতে লাগিলেন—রমি ত কখনও আমার এরূপ কঠিন কথা বলে নাই; এরূপ আচরণ ত আমার সহিত করে নাই! আজ করিল কেন?

এই ঘটনার দুই দিবস পূর্ব্বে শিবসুন্দরী, তাঁহার দেবর পুত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। অন্য সময় হইলে তিনি হয় ত নিমন্ত্রণ রক্ষায় তেমন মনোযোগিনী হইতেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিমানের বশেই হউক, কিম্বা রমেন্দ্রকিশোরকে একটু শাসন করিবার জন্যই হউক, নিমন্ত্রণ রক্ষায় তিনি শূন্য প্রাণে, শূন্যহৃদয়ে স্বর্গগত স্বামী-গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উৎসব বাটী হইতে দাসী ভৃত্যাদি আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের সমভিব্যবহারে বর্দ্ধমানে—দেবর গৃহে যাত্রা করিলেন। রমেন্দ্রকিশোর তাহার পিসিমাতার সঙ্গে মনোহর দাসকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। শিবসুন্দরী কহিলেন—"আবশ্যক কি—সঙ্গে ত লোক যথেষ্ট আছে।"

ইহাও শিবসুন্দরীর অভিমানের কথা। রমেন্দ্রকিশোর কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিল না। যাত্রাকালে শিবসুন্দরী রমেন্দ্রকে বলিয়া গেলেন—

"আস্‌বার সময় ফরমাস দিয়ে মিহিদানা সীতাভোগ আ'নব।"

সুতরাং রমেন্দ্র কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, তাহার পিসিমাতা ক্রোধ অথবা অভিমান ভরে বর্দ্ধমানে যাইতেছেন। শিব সুন্দরীর মনের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। তিনি ভাবিলেন—কৈ, রমিত তাহার বর্দ্ধমান যাত্রায় কোনরূপ বাধা প্রদান করিল না। তবে কি রমি এখন আর তাঁহাকে তেমন ভালবাসে না, তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে না!

"না" কথাটা ভাবিতে শিবসুন্দরীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। অন্তরে অন্তরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অন্তরে অন্তরে ফুলিয়া ফুলিয়া তিনি রমেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় গ্রহণকালে তাঁহার চক্ষু অবশ্য অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। রমেন্দ্র তাহাতে ভাবিল—এ অশ্রুধারা মায়ার, স্নেহের পাত্রের নিকট বিদায় গ্রহণকালে কাহার চক্ষু আর নিরশ্রু থাকে?

রমেন্দ্র কিন্তু সে অশ্রুজল দেখিয়াও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করিল না। সে ভাবিল—তাহার উৎকণ্ঠা তাহার চাঞ্চল্য, তাহার অশ্রুজল দেখিয়া তাহার পিসিমাতা যদি অধিকতর উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়েন, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!

রমেন্দ্রের উদাসীন্য, রমেন্দ্রের প্রাণ হীনতার ভাব দেখিয়া শিবসুন্দরী কিন্তু দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ত রমেন্দ্রকিশোরের মনের ভাব বুঝিতে পারেন

নাই। তাহাতেই তাঁহার মনে অশান্তি ঝটিকা বহিতে লাগিল। সংসারে এইরূপই হয়। একের মনোভাব অন্যের সহজে অবগত হইবার উপায় নাই বলিয়া সংসারে এত জ্বালা, এত বেদনা, এত নির্দ্দয়তা।

স্নেহময়ী শিবসুন্দরী সমস্ত পথটা নীরবক্রন্দনে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন। তখনও তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা তখন প্রায় দশটা—রমেন্দ্রকিশোর একখানি আরাম-কেদারায় অৰ্দ্ধশয়নাবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার অতীত জীবনের কথা ভাবিতেছে, আর সেই সঙ্গে তাহার করুণাময়ী পিসিমাতার বৰ্দ্ধমান যাত্রা উপলক্ষে একটা দারুণ অভাব অনুভব করিতেছে, একটা অব্যক্ত বেদনা, ব্যাকুলতায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে, এমন সময়ে সত্যব্রত রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে ডাকিল—"রমেন।"

সত্যব্রতের আহ্বানে বিচলিত রমেন্দ্রকিশোর আরাম-কেদারা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যব্রত পুনরায় কাতরভাবে ডাকিল—"রমেন।"

আহ্বানের প্রত্যুত্তর না দিয়াই রমেন্দ্র দ্বিতল হইতে বহির্বাটীতে দ্রুতবেগে আসিয়া পৌঁছিল। সত্যব্রত তখন অৰ্দ্ধ মৃতাবস্থায় একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িয়াছে। রমেন্দ্রকে দেখিবামাত্র সত্যব্রত সাশ্রুনয়নে কহিল।

"রমেন, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। তুমি শীঘ্র এস।"

বিস্মিত রমেন্দ্র ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল

"কি হয়েছে—কি?"

সত্যব্রত সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিল—

"তুমি শীঘ্র জামাটা গায়ে দিয়ে এস; কিম্বা তা'র চেয়ে জামাটা কা'কেও আনতে বল। তুমি আর উপরে উ'ঠ না—তা' হ'লে বড় বিলম্ব হ'বে।"

রমেন্দ্রের ভৃত্য একটা "আধ ময়লা" জামা আনিয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করিল। রমেন্দ্রকিশোরের চরণে চটী জুতা ছিল; সে সেই অবস্থায়, অঙ্গরাখাটী স্কন্ধে ফেলিয়া বলিল—

"চল তবে।"

"যাই"—বলিয়া সত্যব্রত পাগলের মত উদাস দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। সত্যব্রতের সে দৃষ্টি রমেন্দ্রকিশোর তেমন লক্ষ্য করে নাই। রমেন্দ্র আবার বলিল "চল।"

সত্যব্রত উন্মাদের মত বলিতে লাগিল—"নাঃ—আর যা'ব না, গিয়ে আর কি ক'রব! সে হয়ত স্রোতের টানে এতক্ষণ কতদূর ভেসে চ'লে গেছে। বুঝেছ, রমেন, বুঝেছ? তুমি বরং যাও, দেখ যদি কিছু ক'রতে পার।"

দারুণ উৎকণ্ঠায় রমেন্দ্র সত্যব্রতের দক্ষিণহস্তখানি আপনার দুই করে ধারণ করিয়া কহিল—

"কি হয়েছে বল না সতু!" সত্যব্রত একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—

সে সকালে আজ গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরাও তা'র সঙ্গে ছিল। স্নান করতে গিয়ে সেই কেবল জলে ডুবে গেছে।

উৎকণ্ঠিত রমেন্দ্রকিশোর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কে, কে সেতু।"

সত্যব্রত উন্মত্ত-উদাস ভাবে কহিল—

"আহা—পাঁচু, পাঁচু হে, আমার পাঁচু। কি হ'বে ভাই রমেন, কি হ'বে! সে যে পরের ছেলে—তা'র বাপের কাছে আমি কি জবাব দেব। বল রমেন, কি হ'বে বলনা ভাই?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া রমেন্দ্র কেবল মাত্র বলিল—"এস।"

"এস" বলিয়াই সে দ্রুতবেগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সত্যব্রত পুত্তলিকাবৎ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী অনতি দূরেই দণ্ডায়মান ছিল। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। শকট চালক অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে যথাশক্তি দ্রুতবেগে শকট চালাইতে লাগিল।

পাঁচুগোপাল সত্যব্রতের ভাগিনেয়। শৈশবেই সে মাতৃহীন। তাহার পিতা ব্রজেশ্বর পাঁচুগোপালকে পাঁচুগোপালের মাতুলালয়ে রাখাই অত্যুত্তম বিধান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটু কারণ আছে।

ব্রজেশ্বরের দুই বিবাহ। পাঁচুগোপাল, ব্রজেশ্বরের কনিষ্ঠা পত্নীর একমাত্র পুত্র। পাঁচুগোপালের মাতা মৃতা। এক্ষণে ব্রজেশ্বরের সংসারে এমন কোনও স্ত্রীলোক নাই, যাহার দ্বারা পাঁচুগোপাল লালিত পালিত হইতে পারে। ব্রজেশ্বর অবস্থাপন্ন লোক। ইচ্ছা করিলে তিনি দাসদাসীগণের উপরে শিশু পালনের ভারার্পণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্রজেশ্বরের শ্বশ্রদেব ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী বর্ত্তমান থাকিতে দেড়বৎসরের শিশু পাঁচুগোপালকে দাসদাসীগণের দয়ার উপর রাখা হইবে কেন? ব্রজেশ্বর শিশুকে শিশুর মাতুলালয়েই পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থলেই শিশু চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাঁচুগোপালের বয়স যখন

ছয় বৎসরের মাত্র তখন তাহার মাতামহ ভবধাম ত্যাগ করিলেন। তখন হইতে পাঁচুগোপালের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সত্যব্রতের উপর পড়িল। সত্যব্রত ভাগিনেয়কে পুত্রস্নেহে লালন পালন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিত—আপন পুত্রাপেক্ষাও সে পাঁচুগোপালকে অধিকতর স্নেহ করিত। সেই পাঁচুগোপাল ষোড়শবৎসরে পদার্পণ করিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। সত্যব্রত আর কেমন করিয়া স্থির থাকিবে ?

শোকাচ্ছন্ন সত্যব্রত গাড়ীর মধ্যে করুণ বিলাপ করিতে লাগিল। কখনও বা পাঁচুগোপালকে লক্ষ্য করিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল—পাঁচু তুই আয় বাবা ! তুই না খেলে আমি খাই কেমন করে, বাঁচি কেমন করে ?

রমেন্দ্র বুঝিল, সহানুভূতি দেখাইলে সত্যব্রতের শোক, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, শোকের প্রাবল্যে সে আরও নানা উৎপাত আরম্ভ করিবে। নয়নবারি রুদ্ধ করিয়া রমেন্দ্র সত্যব্রতকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—

"তুমি কি হে—আগের কাজ আগে কর ; তারপর না হয় শোকের অভিনয় কর।"

বন্ধুর সহানুভূতি সূচক ভর্ৎসনায় সত্যব্রত কতকটা শান্ত হইয়া বসিল। শকট তখন গঙ্গাতীরে পৌছাইয়াছে।

জলপুলীশের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, নৌকা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া রমেন্দ্র ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ব্রজেশ্বর ও সত্যব্রতের আত্মীয়গণ তখন গঙ্গাতীরে সমবেত হইয়াছে। সকলেই শোকে মুহ্যমান। ব্রজেশ্বর কেবল অটল অচল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রৌঢ় ব্রজেশ্বর তখন স্থির অবিকম্পিত চিত্তে গুরুদেবকে স্মরণ করিতেছে। আর জলমগ্ন আত্মজের উদ্দেশে ইষ্টদেবতার স্তব করিতেছে। গঙ্গাতীর তখন লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। ব্রজেশ্বরের চিত্তস্থৈর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

জলপুলীশ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও জলমগ্ন পাঁচুগোপালের কোনও সন্ধান করিতে পারিল না। সকলেই বলিতে লাগিল—"জোয়ারের স্রোতে সে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—তাহা কে বলিতে পারে ?" ভগ্নহৃদয়ে সকলেই বাটী প্রত্যাগমন করিল। সত্যব্রত প্রতিজ্ঞা করিল সে আর জীবনে গঙ্গাজল স্পর্শ করিবে না, গঙ্গাস্নান করিবে না, গঙ্গা মাহাত্ম্য স্বীকার করিবে না।

বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদির পর রমেন্দ্র ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"প্রতিবৎসরই গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া অনেক বালক, বালিকা, যুবক যুবতী জলমগ্ন হয় বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বাবুঘাটের উত্তর পার্শ্বেই এইরূপ দুর্ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই ঘাটের অনতিদূরে একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকটে আমাদের এই নিবেদন, যেন সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়। কলিকাতার বক্ষের উপর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটা নিতান্তই যে ক্ষোভের বিষয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অনুসন্ধানের ফলে ইহা যদি স্থিরীকৃত হয় যে ঐ স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে, তাহা হইলে তাহার আশু প্রতীকার একান্ত প্রার্থনীয়।

আর একটা কথা—ডিভনসিয়ার প্রভৃতি স্থানে জলমগ্নদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল পদ্ধতি আছে, সেরূপ প্রথা কি কলিকাতাতেও প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায় না? চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আমরা যদি সেইরূপ ভাবে তরী, লোকজন, জাল প্রভৃতির বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে ত অনায়াসেই আমরা অনেক জলমগ্নকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারি। বংশদুলাল ভবিষ্যতের আশাস্থল, এই সোণার চাঁদ ছেলেগুলা যদি এমন করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে দেশ অতি ভাগ্যহীন। কত প্রকারে না কত লোকে কত চাঁদা দিয়া বৃথা যশ, বৃথা সম্মান অর্জ্জন করিতে যত্নবান! আর কলিকাতার ধনকুবেরগণ কি এত বড় একটা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে কার্পণ্য করিবেন? লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা, গভীর পরিতাপের বিষয়।"

প্রবন্ধ প্রেরণান্তে রমেন্দ্র সত্যব্রতের সংবাদ লইবার জন্য সত্যব্রতের বাটী গমন করিল। বন্ধু, বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া বুঝিল, সত্যব্রতের গৃহে যে সকল দ্রব্যাদি আছে, তাহার মধ্যে অনেক দ্রব্যের সহিত পাঁচুগোপালের স্মৃতি বিজড়িত। সত্যব্রতকে সে স্থানে রাখা রমেন্দ্র আর উচিত বিবেচনা করিল না। সে তাহাকে আপন বাটীতে আনয়ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। সত্যব্রত তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রমেন্দ্র স্থির করিল, তাহাকে আপততঃ কোনও তীর্থ স্থানে লইয়া যাইতে পারিলে. অনেকটা কাজ হইতে পারে; সত্যব্রতের আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই উপায়ই প্রশস্ত উপায় বলিয়া রমেন্দ্র স্থির করিল। সত্যব্রতও সে প্রস্তাবে সম্মত হইল।

দুই চারি দিবসের মধ্যেই বৈদ্যনাথ যাত্রার দিন ধার্য্য হইয়া গেল। রমেন্দ্র সঙ্গে যাইবে। রমেন্দ্র সঙ্গে না থাকিলে সত্যব্রতকে শান্ত করিবে কে?

রমেন্দ্রও ভাবিল—"মন্দ কি! পিসিমা'র জন্য মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে। যাই, না হয় দিন কত ঘুরে আসি। নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে পিসিমা'র ফি'রতেও ত এখনও দশ পনের দিন।"

বাটীর ব্যবস্থাদি করিয়া, বিষয় কর্ম্মাদি সম্বন্ধে মনোহর দাসকে যথাবিধি উপদেশ দান করিয়া রমেন্দ্র সত্যব্রতের সঙ্গে বৈদ্যনাথ যাত্রা করিল। তাহার প্রবন্ধের কি ফলাফল হয়, তাহা জানাইবার ভার রমেন্দ্র এক বন্ধুর উপর অর্পণ করিয়া গেল এবং মনোহর দাসকে সে বিষয়ে তদ্বির করিতে বলিল। চাঁদা স্বরূপ, রমেন্দ্রকিশোর দুই সহস্র মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। প্রবন্ধের কিন্তু কোনও ফলই ফলে নাই। প্রবন্ধ পাঠান্তে পাঠকবর্গ কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। কেহ কেহ বা এমনও বলিল—"ইহা উন্মাদের প্রলাপ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবসুন্দরী বর্দ্ধমানে আসিয়া পর্য্যন্ত রমেন্দ্রের কোনও চিঠি পত্র পান নাই। তাঁহার অভিমানের মাত্রা তাহাতে অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তিনিও আর রমেন্দ্রকে কোনও চিঠিপত্র লিখিলেন না।

রমেন্দ্র ভাবিল—পিসিমাতা বহুকাল পরে তাঁহার আপন বাটীতে গিয়াছেন, বহু আত্মীয়-কুটুম্বগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তিনি বোধ হয় চিঠিপত্র লিখিবার অবসর, সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন নাই; কেবল মাত্র পোঁছান সংবাদটুকু দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। শিবসুন্দরী ভাবিলেন—রমেন্দ্র এখন তাঁহাকে গ্রাহ্যমাত্র করে না। সেই কারণে সে পত্রাদি দ্বারাও তাঁহার সংবাদ রাখাও আর উচিত বিবেচনা করে না।

সত্যব্রতকে লইয়া রমেন্দ্র যে এখন কিরূপ বিব্রত, সে সংবাদ শিবসুন্দরী জ্ঞাত ছিলেন না। সে সংবাদ শুনিলে শিবসুন্দরীর অভিমানানলে হয়ত এরূপ ঘৃতাহুতি পড়িত না। ঘটনাচক্রে কিন্তু সকলই বিপরীত হইল। শিবসুন্দরীর অভিমানের আর সীমা রহিল না। শিবসুন্দরীকে একখানাও পত্র লেখা রমেন্দ্রের অবশ্য খুব উচিত ছিল। কিন্তু নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে ও গ্রহবৈগুণ্যে পত্র লেখাটা আর রমেন্দ্রের ঘটিয়া উঠিল না। শিবসুন্দরীর সেইটাই অভিমানের বিশেষ কারণ।

অন্নপ্রাসন উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইবার পর নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণ আপনাপন গৃহে ফিরিয়া গেল, কিন্তু শিবসুন্দরী সে কথার উল্লেখ মাত্রও

করিলেন না। বাটীর অন্যান্য সকলে ভাবিল—বহুকাল পরে তিনি দেশে আসিয়াছেন, দেশটা হয়ত তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, সেইজন্য বোধ হয়, তিনি কিছুকাল দেশে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহাত সুখেরই কথা, সুতরাং সে বিষয়ে আর কেহ কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। বিশেষ শিবসুন্দরীর দেবর অহিশেখরের আদেশে সে সম্বন্ধে কেহ কোনও কথাই কহিতে সাহস করিল না।

অহিশেখর ভ্রাতৃজায়ার উপর সন্তুষ্ট নহে। তাহার কারণ, নগদ টাকাকড়ি ও অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া শিবসুন্দরী এখন পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। সে সমস্ত অর্থ ও অলঙ্কার পত্র শিবসুন্দরীর মৃত্যুর পর যে রমেন্দ্রকিশোরেরই হস্তগত হইবে, তাহা বুঝিতে আর অহিশেখরের বাকী ছিল না কিন্তু ভ্রাতৃজায়া অর্থশালিনী। তাহার স্ত্রীধনের উপর অহিশেখরের কোনও দাবী দাওয়া ছিল না। সুতরাং মুখ ফুটিয়া সে আর শিবসুন্দরীকে কোনও কথা বলিতে পারিত না।

সেই অহিশেখর যখন দেখিল, শিবসুন্দরী বর্দ্ধমানে বসবাস করিবারই অভিপ্রায় করিতেছেন, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, ভগবান বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাই তাহার দেবী তুল্যা ভ্রাতৃজায়া আর পাপিষ্ঠ রমেন্দ্রকিশোরের সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন না। ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অহিশেখরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কুটীল কুটজাল বিস্তার করিতে লাগিল। তাহাতেও কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের প্রতি শিবসুন্দরীর স্নেহ ভালবাসা শিথিলতা প্রাপ্ত হইল না শিবসুন্দরী অবশ্য মিষ্টভাষী দেবরের মনের কথাটা আদৌ বুঝিতে পারিলেন না। তাহা বুঝিলে হয়ত তিনি সেই মুহূর্ত্তেই রমেন্দ্রের নিকটে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেন। কিন্তু অহিশেখর সে সকল বিষয়ে খুব সংযত বাক্। তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া চালচলন দেখিয়া সহসা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, সে কিরূপ প্রকৃতির লোক। সে যাহা হউক, এইরূপে তিন চারি সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তখনও শিবসুন্দরীর কলিকাতায় ফিরিবার কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। অহিশেখর ভগবানকে আবার ধন্যবাদ প্রদান করিল।

শিবসুন্দরীর মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি অনেক সময়ে অনেকের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না—শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকেন। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—শরীরটা তাঁহার ভাল নহে। তাই শয্যাত্যাগ করিতে তাঁহার আর বড় ইচ্ছা হয় না।

তাহার দেবর অহিশেখর যখন বারম্বার শুনিল যে ভ্রাতৃজায়ার শরীরটা ভাল নহে, তখন সে বৈদ্য ডাকাইল। বৈদ্য আসিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—রোগিণীর নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বলা এবং নাড়ীতে অহোরাত্র জ্বর থাকে; জ্বরের তাপ অধিক নহে, তথাপি ইহাকে বিষমজ্বর বলিতে পারা যায়। বৈদ্য এমন কথাও বলিলেন যে রোগিণীর ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ বয়সে সে রোগ হইলে তাহা আরোগ্য করা শিবের অসাধ্য হইবে।

চিকিৎসকের কথা শুনিয়া অহিশেখর একটু উদ্বিগ্ন হইল। এ উদ্বেগ, তাহার ভ্রাতৃজায়ার পীড়ার জন্য নহে, রোগিণীর অর্থগুলি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে। রোগিণী যদি সহসা মৃত্যুমুখে পতিতা হয়, তাহা হইলে অহিশেখরের ভাগ্যে আর অর্থ প্রাপ্তির আশা থাকে না। শিবসুন্দরী ত অর্থাদি সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমানে আসেন নাই। তাঁহার অর্থ ও অলঙ্কারাদি রমেন্দ্রকিশোরের নিকটেই ছিল। অহিশেখর ভাবিল, রমেন্দ্রকে কোনও প্রকারে বর্দ্ধমানে আনাইতে হইবে এবং তাহার সম্মুখে শিবসুন্দরীর দানপত্রের কথা তুলিতে হইবে।

যথোপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অহিশেখর রমেন্দ্রকিশোরকে সবিস্তারে পত্র লিখিল। কিন্তু রমেন্দ্র তখন কোথায়? মনোহর দাস সে কথা পত্রের দ্বারা অহিশেখরকে জানাইয়াছিল। সে কথা শ্রবণ করিয়া শিবসুন্দরী কহিলেন—"আহা থাক,বাছার শরীর খারাপ, সে দিনকতক বৈদ্যনাথেই থাকুক। আমার ত তেমন কিছু হয় নাই।"

সত্যব্রতকে লইয়া রমেন্দ্রকিশোর এখন বৈদ্যনাথ জংসনে অবস্থান করিতেছে স্থান ও বায়ুপরিবর্ত্তনের গুণে সত্যব্রতের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদিও পাঁচুগোপালের শোক সত্যব্রত এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই, তথাপি তাহার শোকের মাত্রা যে বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে। রমেন্দ্রের সেবায় এবং দুই একজন সাধুসন্ন্যাসীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীতে শোকাচ্ছন্ন সত্যব্রতের শোকোপশমোদন হইয়াছে! সে পুনরায় হাস্য কোলাহলে যোগদান করে এবং গল্প গুজবের মজলিসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে

সত্যব্রতের বাটী বৈদ্যনাথ জংসন ষ্টেসনের অনতিদূরে; স্থানটীর নাম "জসিডি"। যে স্থানে বন্ধুদ্বয় বাসা লইয়াছে সে স্থান হইতে দেওঘর বা দেবঘর প্রায় দুইক্রোশ হইবে। বৈদ্যনাথ জংসন হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত রেললাইন আছে। কিন্তু বন্ধুদ্বয় রেলগাড়ীতে না যাইয়া পদব্রজেই দেওঘরে যাতায়াত করে। গল্পস্বল্পে পথ অতিবাহিত করিলে সে দুইক্রোশ পথ অল্পকালের মধ্যেই অতিক্রম

করিতে পারা যায়। তাহাতে ভ্রমণেরও সুখ হয়, আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিবারও সুবিধা হয়। এই কারণেই বন্ধুদ্বয় বাষ্পীয় শকটে যাতায়াত করিতে একবারেই চাহে না।

বাসাবাটী একটী অনতি উচ্চ পাহাড়ের উপর। স্থানটী বেশ নির্জ্জন, বেশ মনোরম। বাটাটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাটীর প্রাঙ্গণে ও নিম্নতলস্থ গৃহে দুই একখানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই এক স্থলে তিন চারি হস্ত উচ্চ এক আধটা প্রস্তর-স্তূপও দেখা যায়। অনেকের ধারণা যে বাটীতে সর্পাদির উৎপাত কিছু অধিক। সেই কারণে সে বাটীতে সহজে কেহ থাকিতে চাহে না! অন্য কোনও বাটীর সুবিধা করিতে না পারিয়া সেই বাটীখানি ভাড়া লইতেই রমেন্দ্রকিশোর বাধ্য হইয়াছিল। সর্পের উৎপাতের কথা লোক মুখে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত সে বাটীতে তাহার কিছুই দেখিতে পায় নাই। তাহাদের উৎকণ্ঠা দূর হইল—বেশ নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতে লাগিল। সর্পভয়ে ভীত বাটীর সত্বাধিকারী অতি অল্পহারেই বাটীখানি ভাড়া দিয়াছিলেন। সেই সুবিধাটুকু করিয়া এবং স্থানটী ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া বন্ধুদ্বয় নির্দ্দিষ্ট সময়েরও অধিক কাল সে স্থানে রহিয়া গেল। পিসিমাতার জন্য রমেন্দ্রের মধ্যে মধ্যে মন খারাপ হইত এবং একটা ব্যাকুলতা আসিত বটে, কিন্তু সত্যব্রত ঝটিতি তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিত।

"যাই যাই" করিয়া আরও কিছুকাল কাটিয়া গেল। এইবার রমেন্দ্র তাহার পিসিমাতার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল। "জেসিডি" তাহার আর ভাল লাগিল না। অথচ সত্যব্রতের অনুরোধও সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। রমেন্দ্র উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গেল।

বাটীর অনতিদূরেই একটা ক্ষুদ্র পাহাড়—আর দূরে, দূরান্তরে শৈল প্রাকার। প্রভাত-সূর্য্য-কিরণে সেই সকল শৈলশ্রেণী তখন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিরণ সম্পাতে ও ছায়ালোকে শৈলরাজি পলকে পলকে তখন নানা বর্ণে বিচিত্র মূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সত্যব্রত কহিল—আরও দুই চারিদিন থাকিয়া ঐ পাহাড়গুলি ভাল করিয়া দেখিয়া, তাহার উপরে উঠিয়া তাহারা প্রত্যাগমন করিবে। ইতিমধ্যে পত্র লিখিয়া পিসিমাতাকে জ্ঞাত করা যাইবে যে বর্দ্ধমান হইয়া তাহারা যাইবে। পিসিমাতা যেন প্রস্তুত থাকেন।

পাহাড়, প্রাকৃতিক শোভা আর রমেন্দ্রকিশোরের ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু

সত্যব্রতের যুক্তি তর্কের নিকট সে পরাজয় স্বীকার করিল। সত্যব্রত নাছোড়বান্দা। তাহাকে আঁটিয়া উঠা রমেন্দ্রের সাধ্য নহে।

দ্বিতলস্থ বারান্দায় বসিয়া বন্ধুদ্বয় এই সম্বন্ধে নানা কথা কহিতেছে, নানা আলোচনা করিতেছে—এমন সময়ে ডাক পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—"বাবু চিঠি"!

সে সময় ভৃত্যেরা—কেহ হাটে গিয়াছিল কেহবা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, আর কেহ কেহ দরিদ্রা সাঁওতাল রমণীগণ কর্ত্তৃক আনীত কাষ্ঠভার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দুই পয়সা সস্তায় ক্রয় করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। কাহারও সাড়া শব্দ না পাইয়া ডাক পিয়ন আবার হাঁকিল—"বাবু চিঠি।" সত্যব্রত উচ্চ কণ্ঠে এক আধবার ভৃত্যগণের নাম ধরিয়া ডাকিল। কাহারও উত্তর না পাইয়া সে স্বয়ং চিঠি লইতে নীচে নামিয়া আসিতেছিল। রমেন্দ্র কহিল—"তুমি চা'র যোগাড় কর, আমি চিঠি আনছি।"

নিম্নতলে রমেন্দ্র নামিয়া গেল, সত্যব্রত কেরোসিন ষ্টোভে চা'র জল চড়াইয়াছিল। অনেকটা সময় উত্তীর্ণ হইতেই রমেন্দ্র যখন ফিরিয়া আসিল না, তখন সত্যব্রত ভাবিল, রমেন্দ্র বোধ হয় কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছে। সে ইতিমধ্যে চা প্রস্তুত করিয়া, চা পাত্রাদি সাজাইয়া রাখিয়া রমেন্দ্রের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। প্রত্যুত্তর না পাইয়া সত্যব্রত নিম্নতলে নামিয়া গেল। নীচে নামিয়া আসিয়া সত্যব্রত দেখিল রমেন্দ্রকিশোর মস্তকে হস্ত দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আর তাহার সম্মুখভাগে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারিয়া দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করিল—"কি রমেন?"

অঙ্গুলি সঙ্কেতে পত্রখানা দেখাইয়া দিয়া রমেন্দ্র কহিল—"পড়।" পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া ভীত বিস্মিত সত্যব্রত তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

বর্দ্ধমান।

প্রিয় রমেন্দ্র,

বহুকাল পরে তোমায় পত্র লিখিতেছি। কোথায় বাটীর কুশল সংবাদ লিখিয়া তোমায় সুখী করিব, না অশুভ সংবাদ লিখিয়া তোমায় অসুখী করিতে হইল। আমার ভ্রাতৃজায়া তোমার পিসিমাতা, বর্দ্ধমানে আসিয়া দিন কয়েক ছিলেন বেশ। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে আমরা বুঝিতে পারি নাই যে রোগ এমন সাংঘাতিক হইবে। কবিরাজ চিকিৎসকগণ বলিতেছেন—তাঁহার রোগ দুরারোগ্য; জীবনের আর আশা নাই। অন্তিমশয্যায় তিনি তোমায় দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছেন। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, তিনি তাহারও

একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা যে উত্তরাধিকারী সূত্রে আমিই তাঁহার বিষয়ের অধিকারী হই।

সে কথা যাউক। যেরূপ অবস্থায় থাক, পত্র পাঠ তুমি চলিয়া আসিবে। বৃদ্ধা তোমায় দেখিবার আশায় জীবিতা আছেন মাত্র।

আশা করি, বৈদ্যনাথে যাইয়া ভাল আছ। তোমার বন্ধুও ভাল আছে বলিয়া আশা করি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

শ্রীঅহিশেখর মিত্র।

পুনশ্চ—কোনও মতে আসিতে অন্যথা করিবে না। তাহা হইলে তোমার সহিত তোমার পিসিমাতার আর সাক্ষাৎ হইবে না।

শ্রীঅঃ—

পত্র পাঠান্তে সত্যব্রতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আর বাক্যোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে রমেন্দ্র কহিল—

"সত্য তুমি লোকজন নিয়ে এখানে থাকতে পারবে ত? আমায় ত আজই দুপুরের গাড়ীতে রওনা হ'তে হচ্ছে।"

এইবার সত্যব্রতের মুখ হইতে কথা বাহির হইল। সে কহিল—

"তা'ও কি কখন হয়? পিসিমার অসুখ—তা' শুনে আমি এখানে চুপ ক'রে ব'স থা'কব কেমন ক'রে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব।"

সেই মতই ব্যবস্থা হইল। ভৃত্যগণ আসিয়া জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি করিতে লাগিল। সেই সময়টুকুর মধ্যে রমেন্দ্রের নামে আবার একখানা টেলিগ্রাফ আসিল। সে টেলিগ্রাফ যে কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া লইতে রমেন্দ্র ও সত্যব্রতের অধিক বিলম্ব হইল না। কম্পিত হস্তে রমেন্দ্রকিশোর টেলিগ্রাফখানা খুলিয়া পড়িল—

"রোগিণী মৃত্যুমুখে শীঘ্র আসিবে—নতুবা আর দেখা হইবে না।"

আহারাদি সে দিবস আর কাহারও হইল না। বৈদ্যনাথের বাসা উঠাইয়া দিয়া বন্ধুদ্বয় বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশেষ তাড়াতাড়িতে দ্রব্যসম্ভার আর সঙ্গে লইল না—দ্রব্যাদি হেপাজৎ করিয়া আনিবার ভার একজন ভৃত্যের উপর প্রদান করিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রত ষ্টেশনে

আসিয়া পৌঁছিল। ট্রেণ তখন আসিয়া পড়িয়াছে। টিকিট কিনিবার আর সময় হইল না—গার্ডের অনুমতি লইয়া বন্ধুদ্বয় তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

রমেন্দ্র তখন বড়ই বিমর্ষ। গাড়ীর একটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া সে কি একটা ভাবিতেছিল। সত্যব্রত তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও সে যখন তাহার কোন সন্তোষ জনক উত্তর পাইল না, তখন অধিক কথা কহিতে তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে আকাশে ঘনঘটা দেখা গিয়াছিল—এইবার বর্ষণ আরম্ভ হইল। প্রবল ঝড়ের মুখে বৃষ্টিধারা গাড়ীর মধ্যে প্রস্রবণের সৃষ্টি করিল। তাহাতেও কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের সমাধি ভঙ্গ হইল না। বৃষ্টিধারায় রমেন্দ্রকে সিক্ত হইতে দেখিয়া সত্যব্রত রমেন্দ্রের স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া কহিল—

ভাই, ভেব আর ফল কি? ভগবানের মনে যা' আছে তাই হ'বে। বৃষ্টিতে তুমি ভিজ না ভাই। এখনও অনেকটা পথ—আর্দ্র শরীরে, আর্দ্র বস্ত্রে অধিকক্ষণ থাক্‌লে অসুখ কর্‌তে পারে।"

উদাস দৃষ্টিতে রমেন্দ্রকিশোর কহিল—"আর অসুখ।"

কথাটা বলিবার সময় রমেন্দ্র একটা তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল। সত্যব্রত বন্ধুর মনোভাব বুঝিতে পারিল এবং সহানুভূতি প্রদর্শনে সে বিশেষ চেষ্টা করিল; কিন্তু মেঘ গর্জ্জন, ঝটিকা স্বনন ও ট্রেণের ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ—ত্রিশব্দ সংমিশ্রিত হইয়া তখন এক প্রলয় কাণ্ড ঘটাইয়াছে, কেহ কাহারও কথা শুনিতে পাইল না। সত্যব্রত গাড়ীর সার্শি খড়খড়িগুলি তুলিয়া দিল।

আকাশে মেঘাড়ম্বর তখন ভরপুর—দিবাভাগে তামস রজনীর ছায়া পড়িয়াছে। নিকটস্থ তরুলতা গুল্ম প্রভৃতি প্রলয়ান্ধকারের ছায়ায় মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি আর চলে না। শ্রাবণ মাসের বেলা—তখন প্রায় চারি ঘটিকা।

সেই অন্ধকার, সেই প্রবল ব্যাত্যা ভেদ করিয়া বাষ্পীয়-শকট আসুরিক-শক্তিতে আপন গন্তব্যপথে ছুটিয়াছে; প্রকৃতির ভীম ভীষণ বিপর্য্যয় দেখিয়া আরোহীবর্গ আতঙ্কিত হইল। উন্মাদিনী প্রকৃতি তখন অট্টহাস্যে দিকদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া, সে গর্জ্জন শুনিয়া কাহার হৃদয় আর অবিকম্পিত থাকিতে পারে?

ট্রেণ অতি দ্রুতবেগে চলিতেছিল—সহসা বজ্রপাত শব্দে একটা ভীষণ ধাক্কা পাইল। আরোহীবর্গের মানসিক অবস্থা তখন যে কিরূপ, তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ

করিতে অক্ষম। ভয়ে কেহ বা চীৎকার করিয়া উঠিল, কেহ বা অবসাদে অবসন্ন হইয়া পড়িল। পলকে প্রলয়-কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সমস্ত ট্রেণখানা ইরম্মদ গতিতে একবার পিছাইয়া. আবার সম্মুখে ছুটিয়া আর একটা প্রবলতর ধাক্কা খাইল। তাহাতে কাহারও মস্তক চূর্ণ হইল, কাহারও হস্ত পদ ভাঙ্গিল, কাহারও চক্ষু বিদ্ধ হইল; আর কেহ কেহ বা গড়াইয়া গড়াইয়া দৈব কৃপায় রক্ষা পাইল। গাড়ীর "খোলা আসনের" উপর আরোহীবৃন্দের যে সকল দ্রব্যাদি রক্ষিত ছিল, তাহা পড়িয়া যাওয়ায় অনেকেরই প্রাণঘাতক হইল।

ট্রেণ তখন একেবারে থামিয়া গিয়াছে—আর নড়ন চড়ন নাই। সকলে বুঝিল, ট্রেণের গতিরোধ হইয়াছে। তখন অনাহত যাত্রীগণের মধ্যে দুই একজন গাড়ীর দ্বার খুলিয়া মুক্ত প্রান্তরে নামিয়া পড়িল। তাহাদের নামিতে দেখিয়া আরও দুই দশ জন নামিতে সাহস করিল। যাহারা অল্প আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারাও এইবার দুই একজন করিয়া নামিতে লাগিল। আঘাত যাহাদের গুরুতর হইয়াছিল, তাহারাই কেবল অসহায় অবস্থায় শায়িত থাকিয়া করুণ বিলাপে ঘটনাস্থল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। জনকয়েক যাত্রী ভাগ্যদোষে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল। তাহাদের আত্মীয়গণ উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে লাগিল।

বৃষ্টি তখনও পড়িতেছে, ঝটিকা তখনও বহিতেছে, অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইতেছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ঝঞ্ঝার বিক্রমে বিপর্য্যস্ত হইয়া ভীত চকিত আরোহিসঙ্ঘ সেই জনহীন, বৃষ্টিঝটিকা বিক্ষুব্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়া জল ভাঙ্গিয়া লক্ষ্যহীন পথে ছুটিতে লাগিল। অনেকের ধারণা ঘটনাস্থল নিরাপদ নহে।

তবে যাহারা সাহসী ও বিবেকী তাহারা পলাইল না। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত সেই শ্রেণীর লোক। আর্ত্তের সেবায় তাহারা স্বার্থচিন্তা ভুলিয়া গেল, পরার্থে তাহারা সেবক সম্প্রদায় ভুক্ত হইল। হৃদয়বান সাহেব যাত্রীগণও স্বেচ্ছায় সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহেব ও ভারতীয় সেবকগণ একতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পরিত্রাণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে কি মহান দৃশ্য!

সেবকগণ দেখিলেন, তাঁহাদের ট্রেণের এঞ্জিন ও তিনখানি গাড়ী মৃত ঐরাবতের মত লৌহ-বর্ত্মের এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে। কাহারও বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে যাত্রী ট্রেণের সহিত মালগাড়ীর সংঘর্ষ হইয়াছিল—তাহার ফলেই এই দুর্ঘটনা। যাত্রীট্রেণখানা মালগাড়ীর পশ্চাতে ধাক্কা মারিয়াছিল—তাহাতেই এই কাণ্ড। সম্মুখ সমর হইলে না জানি আরও কি হইত!

একটা ষ্টেশনের অনতিদূরেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সংঘর্ষের ভীষণ শব্দ

নিয়া ষ্টেশনের লোকজন ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে অন্যান্য ষ্টেশনেও তারের সংবাদে দুর্ঘটনার কথা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল। সকল স্থান হইতেই "সাহেব সুবা" ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ লোক-লস্কর সঙ্গে করিয়া আসিয়া পড়িলেন এবং অচিরে আপনাপন কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান হইলেন। ঘটনাস্থলে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন, যে সাহেব কর্ম্মচারীগণ যখন আর্ত্তসেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট সাহেব কর্ত্তব্য সাধনের শক্তিতেই না ইংরাজ এত বড় জাতি !

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। ট্রেণ সংঘর্ষে একটী দুগ্ধপোষা শিশু দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। একটু দুগ্ধের জন্য শিশুর তখন প্রাণ যায়! শিশুর দরিদ্র পিতা একজন স্বদেশবাসীর নিকট একটু দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়াও পান নাই। দরিদ্রের সম্বল মাত্র যে দশটী টাকা তাঁহার নিকট ছিল, সেই দশটী টাকা, দায়ীত্বহীন, অর্থলোলুপ স্বদেশবাসীর হস্তগত হইলে তবে তিনি অনুকম্পা পূর্ব্বক অর্দ্ধ পোয়া মিশ্রিত দুগ্ধ ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন হীনবুদ্ধি লোকের জন্যই না এদেশ জগতের চক্ষে এত ঘৃণ্য !

যাত্রিগণকে লইয়া যাইবার জন্য অন্য একখানি ট্রেণ রাত্রি দশটার সময় ঘটনা স্থলের অনতিদূরে আসিয়া পৌছিল। কর্দ্দমাক্ত হইয়া, জল ভাঙ্গিয়া যাত্রিগণ সেই ট্রেণে আসিয়া চড়িল।

রমেন্দ্রের বাম হস্তে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল—সত্যব্রত আদৌ আহত হয় নাই। রমেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—ভগবান তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু ভগবানের কৃপায় পিসিমাতা কি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না !

নিরাপদে বর্দ্ধমান পৌছাইবার জন্য বন্ধুদ্বয় ব্যাকুলপ্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সময়ে না পৌছাইলে পিসিমাতার সহিত যে আর তাহাদের দেখা হইবে না ! সেই ভাবনায় তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল।

ট্রেণ হু হু শব্দে চলিতে লাগিল। তখনও ঝড় ও বৃষ্টির বিরাম নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মোহিনীর দেবর রোগিনীকে ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নানা দুশ্চিন্তায় সময়াতিপাত করিতেছেন

—গৃহমধ্যে কি যেন কি একটা অলৌকিক অস্ফুট শব্দ হইল। চতুর্দ্দিকে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে—কোন সময়ে সামান্য শব্দ হইলেই তাহার প্রতিধ্বনি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। সে শব্দ শুনিয়া রোগিনীর দেবর অহিশেখর শঙ্কিত হইল। শঙ্কাপ্রযুক্ত, গৃহশায়িত সে আর একজনকে ডাকিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া সে সবে মাত্র নিদ্রামগ্ন হইয়াছে—কিছুতেই সে আর উঠিতে চাহিল না। অহিশেখর তাহাকে ধাক্কা মারিয়া উঠাইল। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে সে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি—কি—কি হয়েছে?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অহিশেখর, প্রশ্ন কর্ত্তার "গা ঠেলিয়া গৃহের উত্তর পশ্চিম কোণস্থ উচ্চ প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে কি একটা দেখাইয়া দিল। শব্দটা সেই গবাক্ষ পথ হইতেই আসিতেছিল। সে শব্দ শুনিয়া দুই জনেই বিশেষ ভয় পাইল। তবে অহিশেখর অপেক্ষা অপর ব্যক্তিটীর সাহস কিছু অধিক ছিল। সে বলিল—"ও কিছু নয়, ও কিছু নয়—ও পোকা মাকড় কি আর কিছু হ'বে।"

অহিশেখরকে সে সাহস প্রদান করিল বটে, কিন্তু সে অহিশেখরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রহিল।

রোগিনী একটা অমানুষিক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা—"যাই—যাই—যাচ্ছি।"

অহিশেখর দ্রুতপদে আসিয়া শিবসুন্দরীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বৌদিদি—কি বলছ?"

শিবসুন্দরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ—তুমি এসেছ—বেশ করেছ। এই যাই। এতদিন কোথা' ছিলে? যাই, যাই, একটু দাঁড়াও না।"

"বৌদিদি—বৌদিদি।"

"হুঁ হুঁ—রমিকে একবার দেখেই তোমার সঙ্গে যা'ব—একটু দাঁড়াও না!"

রোগিনীর প্রলাপবাক্য শুনিয়া অহিশেখর প্রভৃতি শিহরিত হইল। সেই গবাক্ষপথে অমানুষোচিত শব্দ, আর এই প্রলাপ বাক্যের মধ্যে যে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে, তাহা অবশ্য তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। অহিশেখর ভাবিতে লাগিল, তাহার ভ্রাতৃজায়ার আর জীবনের আশা নাই। ভ্রাতৃজায়ার অর্থালঙ্কারগুলি রমেন্দ্রের নিকট হইতে কেমন করিয়া সে আত্মসাৎ করিবে—সেই চিন্তাই তখন তাহার প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়া রমেন্দ্র

আসিতেছে না দেখিয়া সে মনে মনে তাহাকে অসংখ্য গালি পাড়িতে লাগিল। মৃত্যুকালেও শিবসুন্দরী, রমেন্দ্রের কথা ভুলে নাই; প্রলাপবাক্যের মধ্যেও রমেন্দ্রের নাম বিস্মৃতা হয় নাই দেখিয়া অহিশেখরের ক্রোধের আর সীমা রহিল না সে ভাবিতে লাগিল— রমেন্দ্র যদি না আসে, তাহাতেই বা কি ক্ষতি হইবে; তাহার ভ্রাতৃ-জায়ার অলঙ্কার পত্রাদি আদায় করিয়া লইতে তাহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না।

কয়েকদিন হইতেই ঝড় বৃষ্টি বর্দ্ধমানে খুব হইতেছিল। সে রাত্রে তিন চারি ঘণ্টার জন্য একটু "ধরণ" করিয়াছিল কিন্তু বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে বৃষ্টিপাতের শব্দ সময় বিশেষে সুমিষ্ট হইলেও রোগিনীর রোগশয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সে শব্দ অহিশেখরের আর ভাল লাগিল না নীরবতার মধ্যস্থলে শব্দতরঙ্গ উত্থিত হইলে ভীতির সঞ্চার হয়। অহিশেখরেরও সেই অবস্থা হইল। তথাপি কিন্তু সে তাহার ভ্রাতৃজায়ার অর্থালঙ্কারের কথা ভুলিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, যে সকল পেটারা পুঁটলী তাহার ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে আসিয়াছে, সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া একবার দেখে; তাহার মধ্যে ভ্রাতৃজায়ার অলঙ্কারাদি আছে কি না। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে শিবসুন্দরীর মুখে সে শুনিয়াছিল—শিবসুন্দরীর অর্থালঙ্কারাদি সমস্তই রমেন্দ্রকিশোরের নিকট আছে—এবং রমেন্দ্রের বিবাহ হইলে, শিবসুন্দরী সেগুলি নববধূকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, রমেন্দ্র যদি একান্তই বিবাহ করিতে না চাহে, তাহা হইলে, তিনি ৺ কাশীবাস করিবেন এবং তাঁহার অর্থালঙ্কারাদিই তাঁহার কাশীবাসের সাহায্য করিবে - রমেন্দ্রের দান তিনি গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে তাঁহার পেটারা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াই বা অহিশেখরের লাভ কি? শিবসুন্দরীর উপরেও অহিশেখরের দারুণ ক্রোধ হইল সে মনে মনে বলিতে লাগিল— অলঙ্কার পত্রগুলি কেন তাহার ভ্রাতৃজায়া সঙ্গে করিয়া আনে নাই; তাহা হইলে আজ ত অহিশেখরকে এত ভাবিতে হইত না

কিন্তু ভাবনা স্রোতে তাহার বাজ পড়িল। গবাক্ষপথে বিদ্যুতালোক প্রবেশ করিয়া অন্ধকার প্রায় গৃহ নিমেষের জন্য আলোকিত করিয়া তুলিল। সে আলোকে অহিশেখর দেখিল, তাহার বহুকালের মৃত মাতা তর্জ্জনী হেলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন ভয় ও বিস্ময়ে অহিশেখর চক্ষু মুদ্রিত করিল। হতভাগ্য বুঝিতে পারিল না— ইহা তাহারই পাপের শাস্তি, তাহারই কুচিন্তার ফল, তাহারই মস্তিষ্কের বিকার। সে তর্জ্জনী হেলন দেখিয়াও যদি সে ভবিষ্যৎ জীবনে সাবধান হইত, তাহা হইলেও

তাহার রক্ষার উপায় হইতে পারিত—পাপী কিন্তু সতর্কতার ইঙ্গিত গ্রাহ্য করিল না। সুতরাং তাহার ফলভোগ করিতে হইল।

মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার মধ্য দিয়া প্রভাতালোক ফুটিয়া উঠিল। সে আলোক প্রকারের সঙ্গে সঙ্গে একখানা গো-শকট মিত্রবাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছত্রিওয়ালা গো-শকট হইতে বৃষ্টিধারা-সিক্ত রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত অবতরণ করিয়া বাটীর একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—"পিসিমা কেমন আছেন ?"

ভৃত্য পুরাতন। রমেন্দ্রকিশোরের বাটীতে সে বহুবার গিয়াছে। সে রমেন্দ্রকিশোরকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বহির্ব্বাটীতে গোলযোগ শুনিয়া অহিশেখর বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল এবং রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রতকে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"বড় সময়ে এসেছ। বৌদিদিকে আর বাঁচাতে পারলেম না।"

সে কথা বলিতে বলিতেই অহিশেখরের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে অশ্রু দেখিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রতের চক্ষু নিরশ্রু থাকিল না।

রোগিনীর আনুপূর্ব্বিক অবস্থার কথা বলিতে বলিতে অহিশেখর তাহাদের বাটীর ভিতর লইয়া গেল। আর্দ্রবস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিবার অবসর গ্রহণ না করিয়াই রমেন্দ্র ও সত্যব্রত রোগিনীর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে রমেন্দ্র রোগিনীর রোগশয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিল—পিসিমা !

রমেন্দ্রের সে করুণ আহ্বান শিবসুন্দরীর কর্ণে প্রবেশ করিতেই তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে রমেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি তাহাকে চিনিতেই পারিতেছেন না। আবেগের সহিত রমেন্দ্র কহিল—

"আমি, পিসিমা, আমি—রমি। স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় রোগিনী অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন—

"রমি ! আয়, ব'স।"

রোগিনীর পূর্ব্বরাত্রের সেই চীৎকার, সেই প্রলাপ- এখন আর কিছুই নাই বেশ সহজ জ্ঞানে, বেশ সহজ ভাবে তিনি কহিলেন—

"রমি ! আয় ব'স।" তবে কণ্ঠস্বর অতিক্ষীণ !

অহিশেখর রোগিনীর সে ভাব দেখিয়া মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইল। যাহার এমন সহজ জ্ঞান, তাহার সম্মুখে সে কেমন করিয়া অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিবার প্রস্তাব করে। বিশেষ রোগিনীর স্নেহের পাত্র যখন তাহার সম্মুখেই উপস্থিত

অহিশেখর রোগিনীর গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। সে ভাবিল, সময় বুঝিয়া সে স্বকার্য্য সাধন করিবে।

শিবসুন্দরীর আকৃতি একবারে কঙ্কাল সার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রমেন্দ্রকিশোর বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। সত্যব্রত তাহার হস্ত ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল—শিবসুন্দরী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন - "রমি"

রমেন্দ্রকিশোর আবার ফিরিয়া আসিয়া রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার হস্ত খানি অতি কোমল ভাবে ধারণ করিয়া কহিল –

"কি পিসিমা!"

"ব'স

"বসেইত আছি পিসিমা।"

বসেছিস—আচ্ছা আমি যে মরি রমি - আর তুই কোথা ছিলি রমি?"

রমেন্দ্র সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না নীরবে সে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। শিবসুন্দরীর দৃষ্টি সে দিকে পড়ে নাই। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন - "বিয়ে করবি রমি?"

অনন্যোপায় রমেন্দ্রকিশোর পিসিমাতার তুষ্টি সাধনার্থে তাড়াতাড়ি বলিল,— "করব পিসিমা, তুমি ভাল হবে বল?"

শিবসুন্দরীর অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন — "আঃ বাঁচলেম। তোর জন্য আমি কনে পর্য্যন্ত মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। তোর সঙ্গে বেশ সাজবে। তারা বড় গরীব। তা হ'ক— মেয়েটী বড় লক্ষ্মী, বড় সুন্দরী।"

যে কন্যাটীর কথা শিবসুন্দরী কহিতেছিলেন, সে অহিশেখর মিত্রের এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া। তাহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি। অর্থাভাবে সে বিবাহ যোগ্যা কন্যার বিবাহ দিতে পারে নাই। মিত্রপরিবারের সুবৃহৎ বাটীর অনতিদূরে একখানি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কুটীরে তাহারা বসবাস করে। অহিশেখর মিত্রের তাহারা বিশেষ অনুগত।

শিবসুন্দরী বর্দ্ধমানে আসা পর্য্যন্ত কন্যাটী প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিয়া থাকে তাহার নাম মনোরমা—পিতামাতার আদরের নাম রমা। মনোরমা সুন্দরী ও সুলক্ষণা। মনোরমার সহিত রমেন্দ্রের বিবাহ হইলে রমেন্দ্র যে সংসার পাতিয়া সুখী হইতে পারে, এমন বিশ্বাস শিবসুন্দরীর হইয়াছিল। কিন্তু শিবসুন্দরী তখন অভিমানে আত্মহারা। হৃদয়ের বাসনা তাঁহার হৃদয়েই বিলীন হইল। তৎপরে

তিনি রোগশয্যায় শায়িতা হইলেন। তথাপি রমেন্দ্রকে সংসারী করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার মনের কোণে জাগিয়া রহিল। মৃত্যুকালে রমেন্দ্রকে নিকটে পাইয়া তিনি তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন। তাহাতে বৃদ্ধার মৃত্যুকালেও সুখ। সেই সুখে তাঁহার শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হাসিবার আরও একটু কারণ ছিল। রমেন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"তুমি ভাল হবে বল ?" মরণের রথে আরোহণ করিবার জন্য যিনি বসিয়া থাকেন, এ প্রশ্নে তাঁহার আস্যে হাস্য ফুটিয়া উঠিবে বৈকি ?"

সত্যব্রতকে নিকটে ডাকাইয়া শিবসুন্দরী কহিলেন—সতু, আমার রমিকে তুই দেখিস। তা'রে দেখবার আর বড় কেউ রইল না। সে ভার আমি তোরে দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলেম।

সে কথায় সত্যব্রত আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। তখন তাহার চখের পাতা অশ্রুসিক্ত—তাহার কণ্ঠস্বর নির্গত হইল না।

অহিশেখর সেই সময়ে শিবসুন্দরীর অর্ণালঙ্কার ও তৈজস পত্রাদির কথাটা একবার তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইল। শিবসুন্দরী তখন রমেন্দ্রের কথাই কেবল কহিতেছেন। অন্য কাহারও কথা তিনি আর বড় কাণে তুলিলেন না। অহিশেখরও ভাবিল, এখন আর এ সকল কথা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার আবশ্যকতা নাই। ভ্রাতৃজায়া যদি কুবুদ্ধি বশে দান পত্রে স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সকল দিক নষ্ট হইবে। তাহার অপেক্ষা সময় বুঝিয়া দান পত্রের কথা তুলিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা। আর দান পত্রের ইঙ্গিতটাও আপাততঃ করিয়া রাখিয়াছি। সে কথাও রমেন্দ্র ও সত্যব্রত উভয়েই শুনিয়াছে। সুতরাং বোধ হইতেছে, উহাতেই অনেকটা কাজ হইবে।

স্বার্থপর স্বার্থ চিন্তাতেই মজিয়া রহিল। দানপত্র স্বীকার করিয়া লইবার কিন্তু তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না। বিধাতার ঐরূপই ত বিধান—ঐটুকুই ত কৌতুক, উহাই ত রহস্য !

সমস্ত দিবস শিবসুন্দরী বেশ সুস্থাবস্থায় রহিলেন। পরিজনবর্গ ভাবিল, রমেন্দ্রকে দেখিয়া বৃদ্ধা বুঝি আরোগ্য লাভ করিলেন। সে কথা শুনিয়া রমেন্দ্র আনন্দানুভব করিতে লাগিল বটে, কিন্তু অহিশেখর তাহাতে সহস্র বৃশ্চিক জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। তবে মুখ ফুটিয়া তাহার ব্যথা বেদনার কথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

আহারাদি করিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রত পুনরায় শিবসুন্দরীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। তাহাদের দেখিয়া বৃদ্ধা কহিলেন—"তোরা একটু ঘুমুগে যা—রাত জেগে এসেছিস্, যা একটু ঘুমুগে।" রমেন্দ্র ও সত্যব্রত সে আদেশ শিরোধার্য্য করিল।

অপরাহ্ণে বৈদ্য আসিয়া রোগিনীর অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। অহিশেখর কহিলেন—"কেন, উনি ত আজ আছেন ভাল, কথাবার্ত্তা ও আজ বেশ সহজ!"

কবিরাজ কহিলেন—সেইটাই বিশেষ ভয়ের কারণ। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর অবস্থা বেশ সহজ হয়। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে অধিকতর দীপ্তি প্রকাশ করে।

"বলেন কি—তবে কি—তবে কি"—"কি আর বলিব, রোগিনীর নাড়ী পর্য্যন্ত যে খুঁজিয়া পাইতেছি না! তবে যে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—সেটা কেবল প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে। আমার অনুমান হয়, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত রোগিনী ঐ ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিবেন। আরও আমার অনুমান হয়, রোগিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র যদি আরও দুই দশদিন পরে আসিতেন, তাহা হইলেও রোগিনী জীবিতা থাকিতেন।"

"সে কি রকম?"

"ঐ রকম—মানুষের জীবন-মৃত্যু অনেকটা মানুষের প্রবল—ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রোগিনীর ইচ্ছা এখন পূর্ণ হইয়াছে; জীবনে তাঁহার আর সাধ নাই, মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিবার তাঁহার আর শক্তি নাই—সামর্থ্য নাই, ইচ্ছাও নাই। সুতরাং রোগিনী এইবার মৃত্যু কবলিতা হইবেন। তাঁহার নাড়ীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার অনুমান হয়, অদ্য রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ। রাত্রি যদি কাটে, তবে কল্য বেলা দশ ঘটিকার মধ্যে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিবে—আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন।

কবিরাজ যথোচিত ব্যবস্থাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন। উদ্বিগ্ন আত্মীয়গণ ভারযুক্ত-হৃদয়ে নির্দ্দিষ্টকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অহিশেখর দানপত্রের কথাটা আবার একবার এই সময়ে তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। প্রাণের কথা তাহার প্রাণেই রহিয়া গেল, "বলি বলি" করিয়া তাহার আর কোনও কথা বলা হইল না।

শিবসুন্দরীর আজ আর কথার বিশ্রাম নাই। ভগ্ন-হৃদয়ে রমেন্দ্রের মস্তকে হস্ত

প্রদান করিয়া মরণের যাত্রী কহিলেন—আমার যা'বার সময় হয়েছে, আমি যাচ্ছি তোরা একটু কাঁদ্‌বি বৈ কি। তা কাঁদ কিন্তু দেখিস্ রমি, আমার কথা ঠেলিস্ না—তা হ'লে আমার মরণেও সুখ হ'বে না।

রাত্রি দুইটার সময় যাত্রী কহিলেন—"আমার বুকটা কেমন ক'রছে। রমি আমার মুখে একটু গঙ্গাজল দে।"

রমেন্দ্র তাহার পিসীমাতার মুখে গঙ্গাজল দিতে লাগিল। সত্যব্রত ঔষধের মোড়ক মুখের নিকট ধরিয়া কহিল—"পিসিমা, ঔষুধটা খান্।" অহিশেখরও সত্যব্রতের অনুরোধে যোগ দান করিল। কিন্তু কাহারও কোনও অনুরোধ রক্ষিত হইল না। শিবসুন্দরী কহিলেন—"গঙ্গাজলই আমার ঔষধ।"

শিবসুন্দরী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—তাঁহার পতি দেবতা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনের মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতে করিতে শিবসুন্দরী মহা-প্রস্থানের পথে যাত্রা করিলেন। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত প্রভৃতি কাঁদিয়া উঠিল। বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ তুমুল হইতে তুমুলতর হইতে লাগিল বৃষ্টি খুব অধিক নহে—তবে ঝড়ের জন্য সে শব্দ অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। লোকান্তরিতা শিবসুন্দরীর প্রিয়জনবর্গের আর্ত্তনাদ প্রকৃতির আর্ত্তনাদের সহিত মিশাইয়া গেল। প্রকৃতি তখন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

ক্রমশঃ

মায়ের শাঁখা।

(১)

কমলা তাহার একমাত্র পুত্র মণ্টুর কথা ভাবিয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, মণ্টুকে প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বিশ্বস্ত কাজে পাঠান হইয়াছিল। তখনই ফিরিবার কথা, কিন্তু এখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল, তবুও তাহার দেখা নাই। মণ্টুর স্বভাব অতি শান্ত, সে মায়ের আদেশ পাইলে অতি যত্নের সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিত। তাই কমলার ভয় হইতেছিল নিশ্চয়ই মণ্টুর কোন বিপদ হইয়াছে। মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

ভবানীপুরের দীন-পল্লীর একটি পুরাতন খোলার ঘরের মধ্যে বসিয়া কমলা ব্যাকুল হৃদয়ে পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পুনঃ পুনঃ পথপানে চাহিতেছিল। পাড়ার অবস্থা বড়ই হীন, দুই একখানি মাত্র অর্দ্ধ-ভগ্ন ইষ্টক-গৃহ কালের সহিত প্রাণপাত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের দম্ভ বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কমলার ঘরটা দৈন্য ও অভাবের একখানি সুস্পষ্ট চিত্র। তাহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন ও ধূলিপূর্ণ। দূরে থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। কমলা আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। এখনি যে তাহার স্বামী গৃহে ফিরিবেন? সে একটা তীব্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও গৃহের এক কোণ হইতে একটা হাঁড়ী বাহির করিয়া ঝাড়িয়া তাহা হইতে অতি সামান্য এক মুটী মুড়ি বাহির করিয়া একটা পাথরের বাটিতে রাখিল,—একটা ভাঁড় মুছিয়া একটু গুড় বাহির করিয়া সেই বাটীর এক পার্শ্বে রাখিয়া সে এক ঘটী জল ও একখানা গামছা উঠানের এক পার্শ্বে রাখিয়া আসিল।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, গৃহের সম্মুখস্থিত দাওয়ার এক পার্শ্বে বসিয়া যখন পুত্রের চিন্তায় কমলার সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময় কমলার স্বামী অভয় দত্ত সমস্ত দিন ডকের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী শেষ করিয়া জীর্ণ মলিন বেশে বিড়ি টানিতে টানিতে গৃহে ফিরিল। ভাঙ্গা ছাতাটী গৃহের এক কোণে রাখিয়া, মলিন জামাটা খুলিয়া গৃহের পার্শ্বস্থিত দড়ির উপর যত্নে মেলিয়া দিল। শত তালিযুক্ত জুতা জোড়াটী খুলিয়া হাত মুখ ধুইয়া গৃহের ভিতর হইতে একখানা চৌকি টানিয়া আনিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কমলা সেই মুড়ির বাটীটা স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া গেল। চৌকির উপর বসিয়া পত্নিপ্রদত্ত মুড়া কয়েকটী চিবাইতে চিবাইতে অভয় আজ অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিল। এতক্ষণ অভয়ের কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না, সে এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁগা মন্ট কোথায়।"

কমলা ছল ছল নেত্রে বলিল, "সে অনেকক্ষণ গেছে, আমিও তার জন্যে ভাবছি।"

অভয় বিরক্তির সহিত বলিল, "হুঁ"।

সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর একটু তামাক না টানিলে নয়, অথচ গৃহে এক ছিলিমও তামাক নাই। সে মন্টুকে এক পয়সার তামাক কিনিতে পাঠাইবে বলিয়া খুঁজিতে ছিল, ক্লান্ত দেহে আবার তাহাকে এখনি তামাক আনিতে যাইতে হইবে; কাজেই তাহার মেজাজ বড় রুক্ষ হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জ্জিয়া

উঠিল,—"চুলোও গেছে, লক্ষ্মী ছাড়া, কাজের সময় একদিনও পাবার যো নাই।" বিশেষ বিরক্তির সহিত সে বাটীর বাহির হইল।

অভয় দত্ত মোটা বুদ্ধির লোক, কোন কার্য্যেই তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত না। নিয়তির ক্রূর তাড়নায় তাহাকে আজ কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইতেছে, মাসে যে পনরটী টাকা সে গৃহে আনে, তাহাতে বাটী ভাড়া প্রভৃতি দিয়া অতি কষ্টেই তাহাদের সংসার চলিতেছিল। প্রবল অভাবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিবার জন্যই অভয় ডকে চাকুরী লইয়াছিল। কমলা জানিত যে তাহার স্বামীর বাল্যজীবন মহা সুখের ভিতর দিয়াই অতিবাহিত হইয়াছে, তাই সে ও তাহার পুত্র মণ্টু সর্ব্বদা তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য চেষ্টা করিত।

অভয় ধুমপানের চেষ্টায় গৃহত্যাগ করিলে কমলার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় পুত্রের ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। স্বামীর সাক্ষাতে সে বহুকষ্টে নিজের মনোভাব গোপন করিতে পারিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না, তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। একে ছোট ছেলের নিকট তাহার স্বর্ণ মণ্ডিত শাঁখাটি বাঁধা দিতে পাঠাইয়া সে মোটেই ভাল কাজ করে নাই। সে জানে যে টাকা লইয়া গেলে তবে রাত্রে আহার হইবে, সেতো কিছুতেই এক মুহূর্ত্তও কোথাও বিলম্ব করিবে না। নিশ্চয়ই তাহার কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। কমলা একবার দরজা খুলিয়া রাস্তায় যতদুর দেখা যায়, দেখিতেছিল, আবার হতাশ হইয়া গৃহের ভিতর আসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিল, এমন সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া তাহাদের সেই ভগ্ন কুটীরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। কমলা কম্পিত হৃদয়ে সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া দেখিল, একটী অপরিচিত লোক গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এইটিই কি অভয় দত্তের বাড়ী?"

অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখিয়া কমলার প্রাণ উড়িয়া গেল, তাহার মনে হইল, হয়তো আগন্তুক তাহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসিয়াছে! শোকাতুরা জননীর লজ্জা-সম্ভ্রম মুহূর্ত্তে সমস্তই দুর হইল, ব্যথিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল— "এই বাড়ীই তাঁর। আপনি কি মণ্টুর খবর এনেছেন, বলুন, শীঘ্র বলুন, আমি তার মা।"

আগন্তুক স্থির দৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলার মুখ ভূতল সংলগ্ন। আগন্তুক বলিল,—"মা আমায় চিন্‌তে পারছ না, আমি তোমার দাদার নায়েব—দেবীপ্রসাদ। আমার কোল ছেড়ে তুমি সে এক দণ্ড মাটিতে নামতে না মা।"

কমলা চিনিতে পারিল ও ভূলুণ্ঠিত দেহে প্রণাম করিয়া অভিমানপূর্ণ স্বরে বলিল—'এতদিন পরে কি দাদার আমাদের মনে পড়লো, আমাদের এ দুর্দিনে আপনিও কি আমাদের ভুলে গেলেন।"

কমলার পরিধান বস্ত্র ও গৃহের অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিতেছিল, সে গাঢ় স্বরে বলিল,—"রাগ করোনা মা, সকলইতো জান মা, আমি তোমার দাদার ভৃত্য মাত্র। তাঁর বিনা অনুমতিতে আমার কোন কাজ করা অসাধ্য। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি অভয়ের নাম পর্য্যন্ত কাহাকেও মুখে আনিতে দেন নাই, কিন্তু তিনি আজ আর এ পৃথিবীতে নেই,—মৃত্যুর পূর্ব্বে তার সমস্ত সম্পত্তি তিনি তোমার পুত্র মন্টুকে দিয়ে গেছেন।"

একি কঠিন পরীক্ষা ভগবান। এক দিকে পৃথিবীর একটা অমূল্যরত্ন স্নেহাধার ভ্রাতাকে সরাইয়া লইতেছ, অন্যদিকে অভাবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী করিতেছ। দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"উইল আমার নিকটেই আছে, তোমাদের আদেশ পেলেই সব ঠিকঠাক করে দেবো।"

ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কমলার দাদা বহুপূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়া আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। সামান্য কথায় অভয়ের সহিত তাহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত তিনি অভয়ের নামও মুখে আনিতেন না, ভগ্নীকে দুই তিনবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কমলা স্বামী ত্যাগ করিয়া যাইতে না চাওয়ায় তিনি ভগ্নীরও আর মুখ দর্শন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

একটু পরেই অভয় বিড়ি টানিতে টানিতে গৃহে ফিরিল, কমলা কাতর কণ্ঠে বলিল,—"ওগো দাদা আমাদের মায়া ছেড়ে গেছেন! আর তাঁকে এ জীবনে দেখতে পাব না।" কমলার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দেবীপ্রসাদের মুখে সমস্ত শুনিয়া অভয় কেবল মাত্র দুই তিনবার বলিল—"সমস্ত সম্পত্তি,—সমস্ত সম্পত্তি?"

দেবীপ্রসাদ বলিল,—হাঁ "সমস্ত সম্পত্তিই।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অভয় আবার বলিল,—"তা হইলে কবে থেকে সম্পত্তি হাতে পাবো?"

দেবীপ্রসাদ অতি বিনীত ভাবে বলিল,—"যে দিন থেকে আপনার ইচ্ছা। তালতলার ও আর আর বাড়ী সমস্ত সম্পত্তিই আপনার, এখন সমস্ত বুঝে নিলে আমায় বেহাই দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। দেবীপ্রসাদ চলিয়া যাইবার পর অভয়ের

চমক ভাঙ্গিল ; ভগ্নস্বরে বলিল, পয়সা কড়ি কিছু আছে, আমার কাছে তো একটা পয়সাও নেই, চাল ডাল আস্‌বে কিসে ?”

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“একটাও নাই ?”

কমলার সমস্ত প্রাণ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছিল। তাহার এক মাত্র পুত্র, হৃদয়ের নিধি, এ প্রভূত সম্পত্তির এক মাত্র মালিক মণ্টু শাঁখা বাঁধা রাখিবার জন্য গিয়াছে, এখনও সে ফিরিয়া আসিল না। রুদ্ধ কণ্ঠে কমলা বলিল,—“ওগো মণ্টুর জন্য আমার প্রাণ কেমন করছে। এত রাত্রি হলো এখনও সে এলো না !”

অভয় নীরবে কি ভাবিতে ছিল, সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—“ও। এত টাকা ?”

(২)

গঙ্গার ঘাটে রেঙ্গুন মেল ছাড়িল, চল্লিশজন নাবিক ও সাড়ে তিন শত আরোহী ছিল ; কিন্তু জাহাজে যে আর একজন আরোহী ছিল কাপ্তেন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। তাহার নিকট জাহাজের টিকিট পর্য্যন্ত ছিল না। জাহাজ ভাগীরথির মোহনা উত্তীর্ণ হইবার পর জাহাজের নিচের তলায় স্তূপীকৃত মালের মধ্যে হঠাৎ একটী বাঙ্গালী বালককে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইল ; তখনি কয়েক জন নাবিক তাহাকে ধরিয়া নানা রকম গালি দিতে দিতে কাপ্তেনের নিকটে লইয়া উপস্থিত করিল। বালক সমুদ্র জলে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে সাহেবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “ওগো তোমার পায়ে ধরি আমায় কিছু বলো না, আমি চাকুরী করবো ; সেইজন্য জাহাজে লুকিয়ে ছিলেম, মুটেরা যখন মাল আনে, সেই সময় আমি তাদের সঙ্গে চলে এসেছি।”

বালকের কাতর প্রার্থনায় সাহেবের প্রাণ দ্রব হইল, তিনি পাইপ মুখ হইতে নামাইয়া অতি কমলস্বরে বলিলেন, বালক তোমার কোন ভয় নেই ; তুমি কেন এলে, কোথায় যেতে চাও, আমায় সব কথা স্পষ্ট করে বল।

বালক বলিল, জাহাজ যেখানে যাচ্ছে আমি সেইখানেই যাবো। কত লোক বিদেশে গিয়ে চাকুরী করে কত টাকা আনে, আমিও আনবো। আমাদের বড় কষ্ট, আমাদের একটী পয়সাও নেই।

সাহেবের নিকট আদর পাইয়া সে অকপট চিত্তে সাহেবের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। সে পুস্তকে পড়িয়াছে কত নাবিক বিদেশ হইতে কত স্বর্ণ রৌপ্য আনিয়াছে, কত মণি-মুক্তা আনিয়া ধনকুবের হইয়াছে, তাই তার আশা

সে বিদেশ হইতে টাকা আনিবে। বালকের পকেটে দুইটী টাকা ও তাহার মায়ের স্বর্ণমণ্ডিত একগাছি শাঁখা বন্ধকের একখানি রসিদ ছিল। জীবন প্রভাতে ইহাই তাহার একমাত্র সম্বল।

* * * * *

পাঁচ বৎসর হইল মণ্টু স্বদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সস্ত্রীক অভয় দত্ত একণে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর। তালতলার সুন্দর প্রশস্ত অট্টালিকাতে তাহাদের দোল দুর্গোৎসব বিপুল সমারোহে সম্পাদিত হইতেছে। পাড়ায় সকলে আজ তাহাদের সঙ্গলাভের জন্য লালাইত। প্রতি উৎসবে বন্ধু বান্ধবের নিমন্ত্রণ ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া অভয় দত্ত চারিদিকে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের কথা ভাবিয়া এত সুখেও তাহাদের প্রাণে এক দিনও শান্তি আসে নাই। তাহারা অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল নিশ্চয়ই কোন আকস্মিক বিপদে সে সংসারের মায়া কাটাইয়া চিরদিনের মত তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কমলা সমস্ত হৃদয়ের স্নেহটুকু দিয়া মণ্টুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহার হৃদয় শূন্য; অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত হৃদয় ছাপাইয়া দিন রাত কেবল হাহাকার উঠিতেছে।

(৩)

শরতের মধ্যাহ্ন,—নীল-নভোমণ্ডলে মেঘের লেশমাত্র নাই; ভীষণ রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একটী কিশোর বয়স্ক বালক ভবানীপুরের সেই জীর্ণ কুটীরের দ্বারে আঘাত করিতেছিল। বালকের মুখমণ্ডল স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত, শরীর সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট, পোষক পরিচ্ছদ বেশ পরিচ্ছন্ন। কে বলিবে এই সেই কমলার ছিন্নবাসধারী অভাব ও দৈন্যের মধ্যে পালিত মণ্টু। রেঙ্গুনে এক সাহেবের দোকানে চাকরী করিয়া পাঁচ বৎসর পরে আবার সে দেশে ফিরিয়াছে। সে আজ নিজের শ্রমলব্ধ অর্থ মাতার হস্তে দিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়া অভিনব আনন্দ উপভোগ করিবে। তাহার অদৃষ্টবলে ও কাপ্তেনের আনুকূল্যে রেঙ্গুনে সে এক সাহেবের দোকানে চাকরী পাইয়াছিল। সে দীর্ঘ পাঁচবৎসর অতিকষ্টে অনাহারে মাতার অভাব ঘুচাইবার জন্য সমস্ত অর্থই সঞ্চয় করিয়াছিল। যে সমস্ত পুরস্কার সে প্রভুর নিকট হইতে পাইয়াছিল সে সমস্তই লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। আজ তাহার পিতামাতা তাহার উপার্জ্জিত অর্থলাভ করিয়া কত না তৃপ্তি লাভ করিবেন। কত আনন্দ আবেগে তাহাকে হৃদয়ে তুলিয়া লইবেন।

কম্পিত হৃদয়ে মণ্টু সেই জীর্ণ কুটীরের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

আজ হর্ষ ও আনন্দে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল। বহুক্ষণ দ্বারে আঘাত করিবার পর ভিতর হইতে অপরিচিত নারীকণ্ঠ শুনিয়া সে কম্পিত-স্বরে বলিল—"মা, ওমা দরজা খোল" আমি—মণ্টু।"

রমণী ভিতর হইতে বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"কে তোর মা ?"

আর্দ্রস্বরে মণ্টু বলিল,—ওগো আমার মা এইখানেই ছিল, তার নাম কমলা।"

"ও নামের এখানে কেউ থাকে না ?"

তাহারা ভবানীপুরের বাসা ছাড়িয়া আসিবার সময় আকস্মিক সম্পত্তি লাভের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই; বলিয়া আসিয়াছিল, তাহারা কাশীবাস করিতে যাইতেছে। কাজেই ভবানীপুরের কেহই তাহাদের নূতন ঠিকানা জানিত না।

মণ্টুর মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, তাহার কথা বাহির হইতেছিল না, সে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কোথায় আছে বলতে পার ?"

মণ্টুর কথায় রমণী ভিতর হইতে উত্তর দিল, "না বাছা, কোথায় আছে বলতে পারি না।"

মণ্টু সব শুনিল;—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্ব সংসার, আকাশ পাতাল শূন্যে পরিণত হইতেছে। সে সুদূর রেঙ্গুন হইতে কত আশায়,—কত কষ্টে তাঁহাদের জন্য অর্থ লইয়া আসিয়াছে,—আজ তাঁহারা কোথায় ? সে কোথায় তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবে! এ জীবনে হয়তো আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইবে না।

বালক নিজ বস্ত্রপ্রান্তে অশ্রু মুছিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সদর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে তখন একটা ভীষণ বিদ্রোহের তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা, যত্ন, পরিশ্রম সবই ব্যর্থ। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কত কল্পনা, কত আগ্রহ, কত প্রাণপাতযত্ন—সকলি বিফল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে শাঁখা জোড়াটি লইয়া বাঁধা দিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। কেবল মাত্র দুইটী টাকা সঙ্গে লইয়া মায়ের অভাব মোচনের জন্য সে সুদূর রেঙ্গুণে যাত্রা করিয়াছিল, সেই সমস্ত কথা আজ একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। শাঁখা বন্ধক দিবার রসিদখানি তখন তাহার নিকটেই ছিল। সে তাহার ব্যাগের ভিতর হইতে রসিদখানি বাহির করিয়া দেখিল। অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি যেখানে তাহার মায়ের শাঁখা

...া দিয়াছিল, সেই পোদ্দারের দোকানের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, সে যন্ত্র চালিতের ন্যায় দোকানে প্রবেশ করিল, ব্যাগ হইতে রসিদখানি বাহির করিয়া বন্ধকী শাঁখাটি ফেরত চাহিল! দোকানদার রসিদখানা দেখিয়া বলিল, অনেক দিন হইল—জিনিসটী আছে কি না, বলিতে পারি না, আপনি একটু বসুন, আমি খুজিয়া দেখিতেছি। দোকানদার একটা লৌহ আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিয়া বহু নিম্নে কাগজে মোড়ক করা একটী শাঁখা বাহির করিয়া রসিদের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া বলিল, এই আপনার জিনিষ, সামান্য বলিয়া পড়িয়া আছে, নতুবা এত দিন বিক্রয় হইয়া যাইত। মণ্ট অতি আগ্রহে সুদ সমেত পাওনা দিয়া শাঁখাটী লইয়া ব্যাগে রাখিল। এইটীই তাহার স্নেহময়ী জননীর স্নেহ ও ভালবাসার শেষ নিদর্শন;—তাহাদের দারিদ্র্যতার জীবন্ত প্রমাণ! সে কত আশা করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নোটের তাড়ার সহিত এই শাঁখাটী মায়ের চরণে রাখিয়া বলিবে,—"এই নাও মা তোমার শাঁখা।" কিন্তু আজ এ কি হইল! সে ব্যথিত হৃদয়ে অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

(৪)

শারদীয়া পূজা আসিয়াছে! দীর্ঘ একটা বৎসরের পর মায়ের আগমনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ আজ আনন্দে মাতোয়ারা। সমস্ত কলিকাতা আজ নব সাজে সজ্জিত। দোকানে দোকানে শত সহস্র নূতন জিনিস আমদানী হইয়া নূতন ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। তালতলার একখানি বাড়ীতে মায়ের উদ্বোধনের বিপুল আয়োজন। নহবতের সাহানা-রাগিণীর মধুরস্বর পল্লীটিকে মুখরিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রাঙ্গণে লোকে লোকারণ্য। তখন পূজার দালানে মায়ের আরতি আরম্ভ হইয়াছে।

সম্মুখের পথের উপর দিয়া একটী বালক বিশুষ্ক মুখে চলিয়া যাইতেছিল। মায়ের আরতির বাজনার মধুর শব্দে তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, তাহার চরণ স্থগিত হইল। সে আম্র-পল্লবমণ্ডিত তোরণ পার হইয়া পূজামণ্ডপের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক মনে মায়ের আরতি দেখিতে লাগিল।

আরতি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ডাক পড়িল, "এইবার ছোকরার দল—ছেলেরা সব উঠে এস?" গৃহকর্ত্রী প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পাড়ার ও অভ্যাগত সমস্ত বালক বালিকাগুলিকে অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইতেন। এক জন কর্ম্মচারী মণ্ডপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান বালকটীর হাত ধরিয়া বলিল,—"যাও হে ছোকরা, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?"

বালক চমকিয়া বলিল, "কোথায়? আমিতো এ বাড়ীর নই। আমি ঠাকুর দেখ্‌তে এসেছি, এখনি চলে যাব।"

কর্ম্মচারী মৃদুহাসিয়া বলিলেন, "এ বাটীর হও আর না হও তাতে কিছু এসে যায় না। অভুক্ত বালকের এবাড়ী থেকে যাবার যো নেই, কর্ত্রীর কড়া হুকুম।"

বালক ছাড়ান পাইবার অনেক চেষ্টা করিল, শেষে হতাশ হইয়া কর্ম্মচারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাকে যেখানে লইয়া যাওয়া হইল সেখানে একত্রে এত অধিক বালক বালিকা দেখিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। সে তাহার ব্যাগটী একপার্শ্বে রাখিয়া একখানি আসনে উপবিষ্ট হইল।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় বাটীর গৃহিণী অন্নপূর্ণার ন্যায় সেই বালকবালিকার মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রতি বালকের নিকট আসিয়া মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা আর কি চাই, পেট ভরেছে তো"

গৃহিণীর স্নেহ-সুন্দর মুখমণ্ডলে বালকের পলকবিহীন দৃষ্টি এরূপ আবদ্ধ হইল কেন? এই কি তার সেই মা? সে যে ভবানীপুরের অপঙ্কৃত পল্লীর অর্দ্ধভগ্ন কুটীর—এ প্রকাণ্ড অট্টালিকায় তাহাদের স্থান কি করিয়া হইবে। বালক নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

গৃহিণী বালকের প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এতক্ষণে তাহার কর্ণে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর অতি পরিষ্কাররূপে প্রবেশ করিল। এইতো তাহার জননীর চির পরিচিত অমিয়-জড়িত কণ্ঠ। বালক উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা—মা,"

গৃহিণীর অতীত জীবনের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল; বালকের প্রথম কণ্ঠস্বরেই কমলার হৃদয়ে সেই করুণ-স্মৃতি জাগাইয়া দিল। এ যে তার সেই প্রাণপ্রিয়, তপ্ত হৃদয়ে স্নিগ্ধ প্রলেপ, দুঃখ-সাগরের ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ, অফুরন্ত আনন্দ-নির্ঝর--মণ্টু। বহুদিন পরে সুস্থ দেহে আবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে। কমলার সমস্ত দেহ কম্পিত হইল সে ছুটিয়া বালকের দিকে অগ্রসর হইল। বালক তাহার পকেট হইতে নোটের তাড়াটী ও সেই স্বর্ণ-বাঁধা শাঁখাটী বাহির করিয়া তাঁহার চরণতলে রাখিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"এই নাও মা তোমার শাঁখা।"

কমলা আকুল আবেগে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।

স্বর্ণাঙ্গুরী।

(১)

শেয়ালদহ হইতে রাত্রি ৭টার সময় যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ গোয়ালন্দ যায়, সেই ট্রেনে এক জন যাত্রী তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। যাত্রী যুবক, পরিধানে কালো ফিতে পেড়ে ধুতি, গায় একটী সার্ট, চেইন ঘড়ী, একটি সুন্দর নাম খোদাই স্বর্ণাঙ্গুরী। একখানি গরদের চাদর বামুন পৈতে করে বাঁধা। যুবকের মুখে সিগারেট, হস্তে একটী হ্যাণ্ড ব্যাগ মাত্র। যুবক মধ্যম শ্রেণীতে উঠিলে আর একটী যুবক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল"—পরিমল যে, কোথা যাচ্ছ ভাই?" পরিমল তাহার সহপাঠী রাধিকাকে দেখিয়া তাহার হস্ত মর্দ্দন করিল। রাধিকার প্রশ্নে পরিমল বলিল ভাই, একবার গোয়ালন্দ যাবো, আমার ঢাকায় চাকরী হ'য়েছে শুনেছ ত। বাবা ত কলকাতায় আছেন, এতকাল পরে মা বাপের কাছ থেকে যেতে হ'ল—বড় কষ্টের কথা"। রাধিকা বলিল,—ঢাকায় কি চাকরী হ'ল; আমি ত শুনি নাই! এত দূরদেশে চাকুরী করতে যাচ্ছ।" পরিমল উত্তর করিল,—"বৃদ্ধ বাপ, আর অনেক দিন আফিসে চাকরী করতে পারবেন না, আমি রোজগার করিতে পারিলেই তিনি ছেড়ে দিবেন; আর কষ্ট কেন করবেন? আমাদের কর্ত্তব্য যে বুড়ো বাপকে কষ্ট না দি। আমি একাউণ্ট পরীক্ষায় পাশ করে ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকরী পেয়েছি। উন্নতির আশা আছে।" উভয়ে এক স্থানে বসিয়া নানারূপ গল্প জুড়িয়া দিল, রেলগাড়ী দ্রুতবেগে কত গ্রাম, কত মাঠ, পার হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি হইল, গাড়ী ভোর সময়ে গোয়ালন্দ পৌঁছিবে, অতএব একটু নিদ্রার দরকার। উভয়ে বেঞ্চের উপর শয়ন করিল, এবং বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই অবস্থাতেই গল্প করিতে লাগিল, গ্রীষ্মকাল, ঝুর ঝুর করিয়া হাওয়া বহিতেছে অন্য যাত্রীর সংখ্যা কম, তাই একটু স্বচ্ছন্দে যাইতেছে। উভয়ে জামা খুলিয়া রাখিয়া শয়ন করিল।

গাড়ীখানি শেষ রাত্রে কুষ্টিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিল। প্যাসেঞ্জার গাড়ী, প্রতি ষ্টেসনেই বিলম্ব হয়, কিন্তু লোক সংখ্যা কম। মেলে ভয়ানক ভিড়, তাই পরিমল এই গাড়ীতে উঠিয়াছিল। সঙ্গে কোন জিনিষ পত্র আনে নাই—পাঠাইয়ে দিয়াছে, মাত্র হ্যাণ্ডব্যাগটি সঙ্গে আছে। কুষ্টিয়া হইতে গাড়ী ছাড়িল, ধীরে

ধীরে গাড়ীখানি গড়াই নদীর ব্রিজের উপর উঠিল, এই সময়ে ইঞ্জিন সজোরে পরিচালিত হয়, ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইল। হঠাৎ একটী ভয়ানক শব্দ হইল, ব্রিজ ভাঙ্গিয়া গেল, গাড়ীখানি একেবারে নদীর জলে পতিত হইল; চারি দিকে চীৎকার হাহাকার শব্দ উঠিল—পরক্ষণে সব নিস্তব্ধ। তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল। বড় বড় সাহেব বাঙ্গালী আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যে একটি যুবককে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল, তাহার পকেটে একখানা পত্র ও হস্তে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী, তাহাতে নাম খোদাই আছে পরিমল। পত্র দেখিয়া ঠিক করা গেল, কলিকাতা বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ কৃষ্ণকুমার বন্দোপাধ্যায়ের এক মাত্র পুত্র পরিমল বন্দোপাধ্যায়। তখনই কৃষ্ণবাবুর নিকট সংবাদ গেল এবং সেই স্বর্ণাঙ্গুরী পাঠান হইল। কৃষ্ণ বাবু বৃদ্ধ, তিনি কলিকাতায় বড় একটি আফিসে একাউণ্টের কার্য্য করেন, মাসিক ১০০৲ বেতন পান। তাঁহার স্ত্রী শৈলজাসুন্দরী দিবারাত্রি স্বামীর সুশ্রুষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একমাত্র স্নেহের পুত্র পরিমল ঢাকায় চাকরীর জন্য রওনা হইল। হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে পুত্র মারা গিয়াছে। পিতা অধীর হইয়া পড়িলেন। মাতা তখন ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন, এবং স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বর্ণাঙ্গুরীটি পুত্রের চিহ্নস্বরূপ বৃদ্ধের হস্তে পরাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ চাকরী ছাড়িয়া দিলেন, এবং স্বামী স্ত্রী কলিকাতার বাটী ত্যাগ করিয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন।

(২)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দশ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকুমার বন্দোপাধ্যায় এখন কানপুর সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। শোকে ও রোগে শরীর জীর্ণ। তিনি উপার্জ্জন সময়ে টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই, অতএব এখন সংসার চলা কঠিন। তিনি একাউণ্ট খুব ভাল বুঝিতেন, কানপুর একটি বড় মিলে তাঁহার চাকরী হইল, তিনি মনোযোগের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ বৃদ্ধবয়সে যতদূর সম্ভব পরিশ্রম করিতে ক্রটি করিলেন না; আফিসের ম্যানেজার ও সকলের বিশ্বাসভাজন হইলেন। একটি ক্ষুদ্র বাটীতে স্বামী-স্ত্রীতে বাস করিতে লাগিলেন। মাত্র একটি ঝি রাখিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী পাচিকার কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এই ভাবে গত হইল। কৃষ্ণ বাবু কোনরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকও কমিতে লাগিল। তাঁহার সহ

স্বরূপিণী স্ত্রী স্বামীর জন্য সমস্ত শোক ঢাকিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ঐ মিলে আরও বাঙ্গালী কয়েকজন কেরাণী আছে, সকলেই কৃষ্ণবাবুকে ভক্তি করে। ম্যানেজার বৃদ্ধ, তিনি কর্ম্মঠ লোক, সুন্দরভাবে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন, মিলের বৎসর বৎসর লাভও হইতে লাগিল।

হঠাৎ ম্যানেজারের মৃত্যু হইল, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, অবশেষে এক জন ম্যানেজার কলিকাতা হইতে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার নাম হরিহর বন্দোপাধ্যায়। ইহার অনেক ভাল ভাল সার্টিফিকেট আছে, তাই কোম্পানি ২০০৲ বেতনে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

ম্যানেজার কলিকাতা হইতে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি যুবক, কর্ম্মী। চেহারা লম্বা, বড় বড় চুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু দুটি বেশ দীপ্তিব্যঞ্জক, দেখিলেই বোধ হয় লোকটি কাজ কর্ম্মে অভিজ্ঞ ও পটু। কোম্পানী তাঁহাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কার্য্যভার সম্পূর্ণ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

তিনি আসিয়াই মিলের আয় ব্যয় দেখিলেন। ডাইরেক্টরদিগকে বলিলেন যে বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীতে অধিক লাভ হইতে পারে না। যদি তাঁহার কথা মত কার্য্য হয়, তবে বিশেষ লাভ হইবে। তাঁহারা সম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি সমস্ত কর্ম্মচারীদিগের লিষ্ট দেখিলেন, এত অধিক লোকের কোন প্রয়োজন নাই, কোন কোন স্থলে ১ জনে ২।৩ জনের কার্য্য করিতে পারে, এই ভাবে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ডাইরেক্টরদিগের মঞ্জুরী গ্রহণ করিলেন। ইহাতে অনেকেরই কার্য্য গেল, এবং এই "অনেকের" মধ্যে কৃষ্ণবাবুও পড়িলেন। একউন্টের কার্য্যের জন্য ২ ৩ জন লোকের অনাবশ্যক, বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোক দ্বারা কাজ সুচারুরূপে চলিতে পারে না। কৃষ্ণবাবুকে ও অন্যান্য কর্ম্মচারিকে বরখাস্ত করা হইল, কিন্তু ১৫ দিন সময় দেওয়া হইল, প্রত্যেকের নিকট একখানি অফিসিয়াল পত্র গেল। কৃষ্ণবাবু আফিসে বসিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে পত্রখানি পৌছিল। তিনি পাঠ করিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বিনাদোষে এ ভাবে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইতেছে কেন? তিনি পত্রখানি ২।৩ বার পাঠ করিলেন; তারপর ম্যানেজারের নিকট গিয়া বলিলেন—"এ পত্রখানি কি সত্য? না ভ্রমক্রমে লেখা হইয়াছে?" ম্যানেজার লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আমাকে মাপ করবেন। আপনি নির্দোষী, তবে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি হবে এভাবে কার্য্য না করলে চলবে না ... কৃষ্ণবাবু আর কোন কথা

বলিলেন না, এক বিন্দু অশ্রু চক্ষুর কোণে দেখা গেল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি ছয়টা পর্য্যন্ত আফিসে থাকিয়া তৎপরে বাড়ী আসিলেন।

গৃহিণী তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন কি একটা ঘটনা ঘটেছে। তিনি স্বামীকে বসাইয়া পদধৌত করাইয়া দিলেন, তারপর আহ্নিকের জায়গা ও কিছু জল খাবার আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণবাবু বলিলেন, "আজ আহারে রুচি নাই, সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করেই শয়ন করবো, রাত্রেও কিছু খাবো না।" গৃহিণী এই কথার অর্থ ভাল বুঝিলেন না, কিন্তু কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বামী ভগবানের নামে ব্যস্ত হইলেন।

(৩)

আহ্নিক শেষ করিয়া বৃদ্ধ শয়ন করিলে ব্রাহ্মণী ধীরে ধীরে পদ সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আর এস্থানে থাকা চলবে না, চল ৺ কাশীধামে গিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাই। সেস্থানে অনেক অন্নছত্র আছে, ভিক্ষা আছে, একরূপে দুজনের দিন চলে যাবে।" গৃহিণী বলিলেন "কি হ'য়েছে? খোলসা করেই বল না?" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "আর বলবো কি মাথা আর মুণ্ড, আমার বিনাদোষে চাকরী গেল। এখন আর কি ভাবে চলবে?" গৃহিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "এ ভাবে হঠাৎ চাকরী গেল কেন? বিনাদোষে এরূপ দণ্ড কেন? ইহার কি বিচার নাই?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বিচার আছে কি? খরচ কমায়ে কোম্পানীর লাভ দেখাবে, তাই নূতন ম্যানেজার এসে এ সব কচ্চেন। বিশেষতঃ তিনি যুবক, বৃদ্ধদের পছন্দ করেন না, যুবক কর্ম্মচারী চাই। আমি আর এখন কাজ করতে পারি না। কি করবো, সব অদৃষ্টের লিপি। যদি আজ সে বেঁচে থাকতো তবে আমার আর এ বয়সে কষ্ট করতে হবে কেন? সেই তাহার বৃদ্ধ পিতাকে ভরণপোষণ করতো। হা ঈশ্বর, অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখেছিলে?" বৃদ্ধ পুত্রশোক ভুলিতে পারেন নাই, আজ কাঁদিয়া ফেলিলেন, এতকাল পরে আবার শোকের তরঙ্গ উঠিল।

ব্রাহ্মণী বহু কষ্টে অশ্রু নিবারণ করিলেন। তিনি অবিচলিত চিত্তে বলিলেন—"ভগবানকে দোষ দিও না, আমাদের অদৃষ্টের কষ্ট, তিনি কি করে দুর করবেন? সবই পূর্ব্বজন্মের ফল। তিনি আমাদের দুঃখ দূর করবেন যিনি অসহায়ের সহায়—বিপদকালে যিনি মধুসূদন—যিনি কাঙ্গালের ঠাকুর, তিনি কি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র দুটি জীবকে আহার দিবেন না? এর জন্য কষ্ট করা উচিত নয়। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, সে জন্য ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট

ক'রে লাভ কি ? তোমার দুটি পায় ধরি, আর এরূপ ভাবে মন খারাপ করো না, তা হ'লে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়।" স্ত্রীর এই মধুর বাক্যে বৃদ্ধের জ্ঞান হইল, তিনি জোড় হস্তে ভগবানকে প্রণাম করিলেন, তারপর চক্ষু মুছিয়া একবার ধ্যান করিলেন। ইহাতে যেন তাঁহার সমস্ত কষ্ট দূর হইল, কি একটা শান্তি হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, কিঞ্চিৎ আহার করিলেন, সেই প্রসাদ কিছু তাঁহার স্ত্রী খাইলেন। এই ভাবে রাত্রি কাটিল।

(৪)

দেখিতে দেখিতে পনর দিন গত হইল, শেষ দিন কৃষ্ণবাবু নিজ চেয়ারে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন—শৈথিল্য নাই। তিনি চিন্তাকুল ভাবে বসিয়া আছেন, একজন কেরাণী আসিয়া বলিল—"বেতন পেয়েছেন ত ? আর কেন ? চলুন, এইবার চ'লে যাই। ব্যাটা ম্যানেজার কি পাজী ! ছোকরা ভারি আয় দেখাতে এসেছেন। আমরা এক একজন ১০।১১ বৎসর, কেহ বা ২০।২২ বৎসর চাকরী কচ্ছি, অনায়াসে ছাড়ায়ে দিলে ? বুদ্ধির দৌড় বেশী কি না ? দেখা যাবে।" কৃষ্ণ বাবু বলিলেন "আপনাদের এ বিষয়ে আলোচনা করা ভাল দেখায় না, ম্যানেজার সুনিয়মে কার্য্য চালাইবার জন্যই নিযুক্ত হ'য়েছেন, তিনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ভালই বুঝ্‌বেন। আমাদের স্বার্থে হানী হবে বটে, কিন্তু তা ব'লে তিনি নিজ কর্ত্তব্য হ'তে বিচলিত হবেন কেন ? অযথা দোষারোপ করবেন না।" কেরাণী বলিলেন—"যা'ক, আপনার আর বক্তৃতায় দরকার নাই, আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা এক সঙ্গে সব বেরিয়ে যাই।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "এখনও ৬টা বাজে নাই। এই মাত্র ৩টা বাজ্‌লো। ৬টা বাজলে আমরা যাবো।" কেরাণী বিকৃত স্বরে বলিলেন আহা, কি কর্ত্তব্য জ্ঞান ! আপনি থাকুন, আমরা যাই। এই বলিয়া চটাপট করিয়া সকলে চলিয়া গেল, যাইবার সময় দরজা সজোরে ঠেলিয়া গেল। তাহাতে ভয়ানক কড়্ কড়্ শব্দ হইল। কৃষ্ণ বাবু বসিয়াই থাকিলেন। যেমন ৬টা বাজিল, অমনি উঠিলেন। কৃষ্ণবাবু বড় অন্য মনস্ক, কোন দিকে দৃষ্টি নাই। ইহার পর কোথা হইতে অন্ন জুটিবে এই চিন্তা। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হস্তের স্বর্ণাঙ্গুরীটি খুলিলেন, সেটি অন্যমনস্ক ভাবে দেখিলেন, আবার অঙ্গুলীতে পরিলেন। আবার খুলিলেন। আলমারির মধ্যে তাঁহার নিজের কতক কাগজ ও চিঠি পত্রাদি ছিল, সে গুলি বাহির করিয়া লইতে গেলেন। হস্তের অঙ্গুরীটী সে সময় গড়াইয়া টেবেলের নীচে গেল, কৃষ্ণ বাবু জানিতে পারিলেন না। তিনি কাগজপত্রগুলি আলমারি হইতে বাহির করিয়া একটী বাণ্ডেল বাঁধিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—ম্যানেজার বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তবে কি ম্যানেজারের দয়া হবে ? তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি ঐ কাগজের বাণ্ডেল হস্তে করিয়াই চলিলেন। ম্যানেজারের কামরাটি এক পার্শ্বে অবস্থিত ; সম্মুখে পর্দ্দা টানান, কৃষ্ণ বাবু কামরায় প্রবেশ করিলেন।

ম্যানেজার চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ বাবু উপস্থিত

হইলেন। কৃষ্ণ বাবুকে অপর একখানি চেয়ারে বসিতে বলিয়া—তিনি কিছুক্ষণ নিজের কাজ করিলেন,তারপর মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"আপনার কার্য্যে আমি বড় সন্তুষ্ট। আপনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, অমায়িক, ধার্ম্মিক কর্ম্মচারী, আপনাকে ছাড়ান অন্যায় হইয়াছে। তবে আমি পরের চাকর, যাতে তাঁদের দু'পয়সা আয় হয় আমায় দেখ্‌তে হবে। যদি আমার নিজের কাজ হইত, তবে আপনাকে ছাড়্‌তেম না। আপনার ন্যায় একটী লোক আজকাল পাওয়া কঠিন।" আশা পাইয়া কৃষ্ণ বাবু বলিলেন "তবে কি আমাকে পুনরায় রাখতে ইচ্ছা করেন?" ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন "না। তা হ'লে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা হয়। অথচ আপনার ন্যায় লোককেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি কলিকাতায় যান, তবে আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে পত্র দিতে পারি। সেখানে আপনার একটা সুবিধা হইতে পারে। কৃষ্ণ বাবু কি চিন্তা করিলেন। কলিকাতার নাম শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জল দেখা গেল।

এমন সময়ে একজন দপ্তরী কৃষ্ণ বাবুর স্বর্ণাঙ্গুরীটী লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ম্যানেজারকে বলিল—"হুজুর, এই অঙ্গুরীটি কৃষ্ণ বাবুর চেয়ারের নিকট পেয়েছি, কার জানি না।" ম্যানেজার অঙ্গুরীটি হস্তে লইলেন, দেখিলেন তাহাতে নাম খোদাই আছে "পরিমল" তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"এ অঙ্গুরী কি আপনার?" কৃষ্ণ বাবু বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ, এ অঙ্গুরী আমার পুত্র পরিমলের ছিল, তাহার মৃত্যুর পর আমিই তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখেছি।" ম্যানেজার চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন, উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন—"আপনি কি বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটের কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়?" কৃষ্ণ বাবু বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য।" ম্যানেজার বাবু তখন কৃষ্ণ বাবুর পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন—"পিতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে চিন্‌তে পারি নাই, আমিই আপনার সেই পুত্র পরিমল"। কৃষ্ণ বাবু অবাক হইয়া গেলেন। পরিমল বলিল—"আমি সেই রেল দুর্ঘটনায় মরি নাই। আমার বন্ধু রাধিকা মরে। সে দুর্ঘটনা হওয়ার পূর্ব্বে আমার সার্টটি পরিয়াছিল ও আমার অঙ্গুরীটী হাতে লাগে কি না দেখিতেছিল। সকলে মনে করিল আমার মৃত্যু হইয়াছে। আমি অচেতন হই। একজন ভদ্রলোক আমাকে অনেক চিকিৎসা করাইয়া ভাল করেন। কলিকাতায় আসিয়া দেখি আপনারা বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমি নিরুপায় হইয়া নানা স্থানে চাকরী করি। তার পর এই স্থানে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসি। মা কোথায়?" কৃষ্ণ বাবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, তার পর বলিলেন "তোমার মা বাসায় আছেন, চল।" আফিসের সমস্ত লোক এই ঘটনায় অবাক হইয়া গেল। পরিমল ও তাহার পিতা বাসার দিকে ছুটিল।

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সন { ৮ম সংখ্যা

গল্প-বিভ্রাট।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি লিখিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রমাহসিত শান্ত-শুভ্র শারদীয় রজনীতে সহসা কক্ষের ভিতর প্রলয়-হুঙ্কার শ্রবণে চমকিত হইয়া, সদ্যঃশ্বশ্রূগৃহাগত প্রমথ পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিল, ষোড়শী পত্নী জ্যোৎস্নাবালা পুষ্পপুটতুল্য রক্তাধর ফুলাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার কেশপাশ আলুলায়িত, অক্ষিপল্লব অশ্রুপ্লাবিত, গণ্ডদ্বয় রক্তাভ—মাথার ঘোমটা স্থানচ্যুত। মুহুর্মুহু মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে ও তৎসঙ্গে বন্যার মত অশ্রুধারা দুইগণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে।

পত্নীর হৃদয়-সমুদ্রে এরূপ দুঃখঝড় বহিল কেন, প্রমথ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। ষোড়শী পত্নীর হৃদয়ে এমন কি বেদনা বাজিতে পারে, যাহাতে সে এমন কাতরভাবে রোদন করিতেছে! পিত্রালয়ে পিতামাতা পরিজনপরিবৃতা হইয়া কুশলে আছে, কাজেই ইহা পিত্রালয়ের ভাবনাজনিত শোক নহে; আর সম্প্রতি সে স্বয়ং নিকটে আছে, কাজেই ইহা বিরহব্যথাও নহে। তবে এ আবার কোন শ্রেণীর ব্যথা? প্রমথ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিল, ইহা মানসিক বেদনা নহে,—কোনও প্রকার শারীরিক ব্যথা হইবে! পত্নীর ললাটস্পর্শ করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠস্বরে বলিল—"মাথা ধরেছে নাকি, জ্যোৎস্না?"

জ্যোৎস্না উত্তর করিল না;—অধিকতর প্রবল ভাবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল. নাসিকায় নিঃশ্বাস অধিকতর প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। লাগিল

প্রমথ বলিল—"ওগো, ও জ্যোৎস্না, বড্ড মাথা ধরেছে কি ? একটু গোলাপ-জল দেব, একটু বাতাস কর্‌ব কি ?" সে পত্নীর কাছে সরিয়া আসিল, ধীরে ধীরে বামহস্তে তাহার কপাল টিপিতে লাগিল, দক্ষিণ হস্তে ব্যজন করিতে লাগিল। পত্নী মাথা ছাড়াইয়া লইল, শয্যার একপ্রান্তে সরিয়া গেল। প্রমথ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"জ্যোৎস্না, ও জ্যোৎস্না, বলি বড্ড মাথা কামড়াচ্ছে, একটু 'অডিকলম' মাথায় দেব ? রতনাকে ডাক্তারের দোকান থেকে (icebag) আইস্‌ব্যাগ আন্‌তে বল্‌ব ? দূর ছাই, কি হয়েছে বল্‌বেও না। ডাক্তার ডাক্‌ব ? বল না,—লজ্জা কি ? এত আমার বাপের বাড়ী নয়, তোমারই বাপের বাড়ী। দেখি তোমার (pulse) পালস্, হাতখানা দাও ত একবার।" সে পত্নীর বামহাত খানি লইয়া নাড়ী টিপিতে বসিল।

জ্যোৎস্না জোর করিয়া স্বামীর হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইল। চক্ষের নিমিষে পালঙ্ক ছাড়িয়া নীচে নামিয়া পড়িল;—তারপর, ঘরের ভিতরকার অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে প্রমথ দেখিল, সে অঞ্চল মুড়ি দিয়া ঘরের মেঝে সটান শুইয়া পড়িল। পত্নীর এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে তাহার হাসি আসিল। একবার ভাবিল, নিজেও নীচে নামিয়া মানভাঙ্গাইবার অমোঘ ঔষধ প্রয়োগে অভিমানিনীর মান ভাঙ্গিবে, কিন্তু আজ সূচনা দেখিয়া তার সাহস হইল না। সে নীরবে কখন মান দূর হইবে, সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু সে শুভমুহূর্ত্ত সে রাত্রিতে আর আসিল না।

ঘরের ভিতর দুইটি প্রাণী জাগিয়া, কিন্তু তাহাদের বিশ্রম্ভালাপে শুক্ল রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল না; কেবল চাপা দীর্ঘশ্বাস ও চুড়ির মিঠা আওয়াজের সহযোগে বেখাপ্পা চটাচট্‌ শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক একবার জাগিতে লাগিল। ঘরে মশার উৎপাত কম ছিল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রমথ শয্যার উপর অসাড়ের মত পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল; কিন্তু পত্নীর এরূপ প্রহেলিকাময় ব্যবহারের কোনও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। অবশ্য দুএকদিন যে পত্নী একআধটু মানাভিমানের অভিনয় না করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু এরূপ মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, অবিরল অশ্রুধারা ও পৃথক্ শয্যার বন্দোবস্ত এই আজ প্রথম! দীর্ঘদিনের বিরহের পর এই পূজার ছুটি,—সে বড় আশা করিয়াছিল, মথুরাতে আসিয়া পত্নীর হাস্যোৎফুল্ল বদনকমল দেখিবে, স্বর্গীয় বীণানিন্দিত কণ্ঠের প্রেমালাপ শুনিবে, কিন্তু হায়! তাহার সকল আশা সকল কল্পনা চূর্ণ হইল। বৈকালবেলা শ্বশুরালয়ে

পৌঁছিয়াছে, আর এই ক'টা ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই শ্রীমতীর একি বিপরীত অভিমান! তাহাদের শেষ পত্রও ত প্রেমে ভরপুর, তবে দেখা হইবার পূর্ব্বেই পত্নীর অভিমান হইবার কারণ কি ভাবিয়া প্রমথ আকুল হইল।

এমন সুন্দর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদীয় রজনী, সুবাসিত স্নিগ্ধ বায়ু কেমন ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে, ঐ ত চকোর কেমন উদাসকরা সুরে প্রেমিক শশধরকে প্রেমের কথা জানাইতেছে,—এই শুভ্র রাত্রির এক একটি মুহূর্ত্ত যেন এক একটি মিছরির টুক্‌রা! এমন রাতটাই যে বৃথা যাইতেছে! প্রমথ অধীর হইয়া ফের ডাকিল "জ্যোৎস্না, ও জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না—"অাঁ—!" তাহার মনে হইল, বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে, বুঝি অভিমানিনীর মান ভাঙ্গিয়াছে। সে স্পষ্ট শুনিল, পত্নী মিঠাসুরে উত্তর করিল—"অাঁ।" প্রমথ কাণ খাড়া করিল; কিন্তু পরক্ষণেই কর্ণদেশ মশকের হুলদষ্ট হইল, একটা মশক কাণের কাছে ভন্ ভন্ করিয়া বেড়াইতেছিল। সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া মশকদষ্ট কর্ণদেশে হস্তবিলেপন করিতে লাগিল। মশকেরা বিজয়ী বীরের ন্যায় মরময় বিজয়দুন্দুভি বাজাইতেছিল কাজেই সে আত্মরক্ষার্থ মশারিটা টানিয়া দিল। পরক্ষণেই বুঝিল, নিষ্ঠুর মশককুল এইবার কোমলা জ্যোৎস্নাকে একেবারে আক্রমণ করিয়াছে, তখন সে মশারিটা তুলিয়া রাখিল; তবুও কতকগুলি মশক জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে সে অরাতির প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বিছানার চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিতে হইল এবং একবার চতুর্দ্দশীর চাঁদটার দিকে আর একবার ভূতলশায়িনী পত্নীর দিকে উদাস করুণ-নেত্রে চাহিয়া গভীর ও মর্ম্মান্তিক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অচিরাৎ তাহার নাসিকা নানাবিধ রাগিণী ভাঁজিয়া তাহার গাঢ়নিদ্রার কথা ঘোষণা করিল।

স্বামী নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন জানিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া গবাক্ষ সান্নিধ্যে বসিল। বাহিরের রজতজ্যোৎস্না দেখিয়া তাহার বেদনারাশি আরো উথলিয়া উঠিল, সে অজস্র ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিল, হৃদয়টা দুঃখে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল! এইরূপে বহুক্ষণ কাঁদিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া, অবশেষে সে ঘরের মেঝেয় ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রত্যূষে ঘুম হইতে জাগিয়া প্রমথ দেখিল, জ্যোৎস্না জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে ম্লানমুখে তাকাইয়া আছে। তখনও ভাণ করিয়া ভোরের

আলো ফুটিয়া উঠে নাই, কুয়াসার জালে সমস্ত পৃথিবী আবৃত, বৃক্ষপত্রে শিশির-কণা মুক্তাবিন্দুর মত শোভা পাইতেছিল। প্রভাত-হিল্লোল তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ নিবীড়কৃষ্ণ অলোকাদামের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল, মাথার বস্ত্রাঞ্চল উড়িয়া উড়িয়া স্কন্ধে আসিয়া পড়িতেছিল। কালো কালো থোকা থোকা চুলের পার্শ্বে ম্লান, বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রমথ মুগ্ধ হইয়া পত্নীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,—প্রেমসম্ভাষণের জন্য ওষ্ঠাধরও ঈষৎ কম্পিত হইল। সহসা জ্যোৎস্না উঠিয়া দ্বার খুলিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল, প্রমথের মনে হইল, একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক গৃহাভ্যন্তর হইতে মুছিয়া গেল, গভীর অন্ধকারে কক্ষটা ডুবিয়া গেল। সে প্রহেলিকার আবরণটা কোনমতেই ভেদ করিতে পারিল না। অমন প্রেমময়ী পত্নী, এতদিন যে সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সহসা সে কেন এমনতর হইল, সে কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, স্নানের সময় হইল। কিন্তু পূর্ব্বকার মত পত্নী সুগন্ধি তৈল, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি আনিয়া দিল না। দশম বর্ষীয়া শ্যালিকা বিদ্যুৎবালা ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া দিয়া বলিল—"জামাইবাবু, চান কর্ত্তে যান।" প্রমথ বিষণ্ণমুখে বলিল—"তোমার দিদি কি কচ্ছে বিদ্যুৎ; তাকে ডেকে আন্‌তে পার্‌বে?" বালিকা মাথা নাড়িয়া বলিল—"হু" কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে সোৎসাহে সে দিদিকে ডাকিতে চলিল; কিন্তু পরক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"দিদির বড্ড মাথা ধরেছে।" প্রমথ বলিল—"সে কি কচ্ছে?"—"শুয়ে শুয়ে তেতুল খাচ্ছে। চলুন ভেতরের ঘাটে চান কর্‌বেন চলুন।" প্রমথ মন্ত্রচালিতের মত বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাটে গেল।

মধ্যাহ্নের আহারের সময় শ্বশ্রূঠাকুরাণীই পরিবেষণ করিলেন। পূর্ব্বে জ্যোৎস্না পরিবেষণ করিত, শ্বশ্রূঠাকুরাণী শুধু দুগ্ধাদি ও মিষ্টান্ন দিয়া আসিতেন। তিনি জানিতেন, আজকালকার ছোক্‌রার দল আহারের সময় পত্নীর মিঠা হাতের অঞ্চল-ব্যজন, অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠের বাক্যসুধা পান করিতে না পারিলে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না। মিষ্টান্ন ও দুগ্ধাদি না থাকিলেও কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু পত্নী যদি কাছে না বসে, তাহা হইলে সকল আয়োজনই মাটি হয়। তাই তিনি বুদ্ধিমতীর মত পূর্ব্বোক্তরূপে জামাতা দেবতাকে তুষ্ট করিতেন। কিন্তু আজ জ্যোৎস্না মাথাব্যথার ছুতায় শয্যা

গ্রহণ করিয়াছিল, কাজেই শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বয়ং পরিবেষণ করিলেন। তিনি কাছে বসিয়া এটা খাও, ওটা খাও বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু ব্যঞ্জন, মাছ, মাংস, মিষ্টান্ন, সন্দেশাদি সকলই পড়িয়া রহিল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, জামাতা বাবাজীর নয়নযুগল আকুল ভাবে প্রত্যেক জানালা ও দ্বারের পার্শ্বে ভ্রমিতেছে, চুড়ি ও বলয়ের ঠুং ঠাং শব্দে কর্ণদ্বয় খাড়া হইয়া উঠিতেছে। তিনি উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে যাইয়া জ্যোৎস্নাকে পান সহ পাঠাইয়া দিলেন, নিজে কাজের ছুতায় অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। জ্যোৎস্না কম্পিতপদে ঘরে ঢুকিয়া পানের ডিবাটা একটা টুলের উপর রাখিয়া বিদ্যুতের মত প্রস্থান করিল। প্রমথ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভোজন শেষ করিল।

এ পর্য্যন্ত প্রতিমুহূর্ত্তে সে আশা করিতেছিল, বুঝি এইবার পত্নীর মান ভাঙ্গিবে, প্রহেলিকার যবনিকাটা অপসৃত হইবে। তাহার বিশ্বাস ছিল, জ্যোৎস্না যতই অভিমান করুক না কেন, তাহার ভোজনের সময় অভিমান দূর করিবেই। সে জানিত, সতী স্ত্রী স্বামীকে স্বহস্তে আহার করাইয়া পরম তৃপ্তি-লাভ করে। এ অধিকার কিছুতেই সে অন্যকে দান করে না। কিন্তু আজ যখন দেখিল, পত্নী অভিমানভরে সেই আদর্শ শ্রেণী হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়াছে, তখন তাহার মনে একটু একটু করিয়া অভিমান ও রাগ হইতে লাগিল। পত্নীকে সে বরাবরই আদর্শ রমণীর আসনে স্থান দিয়া আসিয়াছে, আজ সেই পত্নীকে আসনচ্যুত দেখিয়া তাহার অভিমান ও ক্রোধের সঙ্গে কেমন একটা অমূলক ভয় জাগিয়া উঠিল। যে পত্নী বিনা কারণে স্বামীর উপর অভিমান করিয়া এরূপ ভাবে সতীত্বের বিমল দীপ্তি ম্লান করিতে পারে, সেই পত্নীর অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই, হয়ত সে মনের দুর্ব্বলতায়—। প্রমথ শিহরিয়া উঠিল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল!

তরুণ যুবকেরা পত্নীকে যেমন অন্ধভাবে ভালবাসে, আবার সামান্য কারণে তেমনি ধাঁ করিয়া সাংঘাতিক ভাবে অবিশ্বাস করিয়া বসে। তাহাদের মন কাদার মতন, কখন কোন্ মূর্ত্তি ধরিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। প্রমথের মনে নানা কারণে উক্ত প্রকার সন্দেহ জাগিল। প্রথমতঃ, বহুদিনের পর এই তাহাদের মিলন। সেই প্রায় দুমাস পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল, সেই অতীত স্মৃতির কথা কেবলই মনে পড়ে। দীর্ঘ দিনগুলি মেডিকেল-কলেজের নীরস খাটুনী খাটিয়া, শুধু এই ভবিষ্যৎ সুখের আশায় দুই হাতে ঠেলিয়াছে। এম্ বি পরীক্ষা নিকটে, ক্রমাগত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দেহ ও মন

একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, পূজার ক'টাদিন শ্বশুরবাড়ীতে পত্নীর সহিত প্রেমালাপে কাটাইয়া মনঃপ্রাণ একটু সরস করিয়া যাইবে, এই আশায় সে কলেজ ছুটির পর লজ্জার মাথা খাইয়া বরাবর শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। এ সময় পত্নীর এরূপ হৃদয়হীন ব্যবহারে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ভীষণ রাগও হইল। সে স্থির করিল, এমন হৃদয়হীনা অপদার্থের সংসর্গে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা কর্ত্তব্য নহে। উহাকে একটু জব্দ করা, একটু কাঁদান চাই। সে শ্বশুরের নিকট বলিল,—"সহপাঠী বিভূতি আমাকে শীঘ্র কলিকাতা ফিরিতে বলিয়াছে। হস্‌পিটালে এখন ক'টা শব আছে, Dissection কর্‌বার এমন সুবিধা আর মিলিবে না। পরীক্ষার বছর, Dissection করিতে পাইলে সুবিধা হইবে।" শ্বশুর ভাবিলেন, ঠিক কথা। পরীক্ষা শেষ করিতে পারিলে ত সারাজীবনই অবসর। তা' ক'টা দিন একটু কষ্ট করা বৈত নয়। জামাতাটি বেশ সুবোধ।" তিনি আপত্তি করিলেন না। শ্বাশুড়ী আপত্তি করিলেন,—"পূজার দিনটা কেউ কি বাড়ী ছাড়িয়া যায়। লাড়ু, সন্দেশ, সর-ভাজা তিনি স্বহস্তে জামাতার জন্য করিয়াছেন। বাবাজী বিদেশে থাকে, এ সব ত সারাবছর খায় না।" শ্বশুর বুঝাইলেন—"এবারটা পাশ করিলে আর মোটেই বিদেশবাস করিতে হইবে না।" জ্যোৎস্না গোপনে গোপনে আরো বেশি করিয়া কাঁদিল। প্রমথ রাগের মাথায় আর তাহার সহিত দেখা করিল না। ধূমকেতুর মত শ্বশুরবাড়ীতে উদয় হইয়াছিল, ধূমকেতুর মতই চলিয়া-গেল। বাড়ীতে বাপ মা জানিলেন, সে পূজাতে কলিকাতা ছাড়িয়া নড়িবে না, পরীক্ষার বৎসর কি না ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অখিল মিস্ত্রীর লেনে একটা দ্বিতল মেসে থাকিয়া প্রমথ লেখাপড়া করিত। সেখানে মেডিকেল-কলেজের ছেলেই বেশি থাকিত। অধিকাংশ ছেলেই বিবাহিত। চাতক যেমন মেঘের জন্য আকাশের দিকে হা করিয়া থাকে, তাহারাও তেমন পূজার বন্ধটার আশায় এতদিন ধৈর্য্য ধরিয়াছিল। বন্ধ হইবামাত্র তাহারা এসেন্স, সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য, ডাক কাগজ ও সৌখীন দ্রব্যাদিতে কেহ কেহ মাসে মাসে দু-টাকা বাচাইয়া জ্যাকেট বা স্বর্ণালঙ্কারও কিনিয়াছিল ; বাক্স, বোঝাই করিয়া বাড়ী বা শ্বশুর বাড়ীর পানে, যেখানে শ্রীমতীরা আছেন, রওনা হইয়া পড়িল। অবিবাহিত

ছেলেরাও বহুদিন পর মা, বাপ, ভাই ভগ্নীদের দেখিবার আশায় ছুটিল। মেসে রহিল, কেবল দুই শ্রেণীর হতভাগা ছাত্র। এক, যাহাদের পরীক্ষার বৎসর, নিরিবিলিতে পড়া দরকার ; আর যাহারা পত্নীর উপর কোন কারণে বিরূপ। আমাদের প্রমথ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি করিল। মিথ্যা মুখে বলিল, সে প্রথমশ্রেণীর তালিকাভুক্ত। পড়িবার ছুতায় কলিকাতায় [illegible] করিল, কিন্তু তাহার পুস্তকগুলি বাক্স বন্ধ থাকিয়া ছাতা ধরিয়া গেল, কেহ তাহাকে হস্পিটালের ছায়া মাড়াইতেও দেখিল না। সে সকাল সন্ধ্যায় বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কেবলই কি ভাবিত, শরীরখানা ক্রমশঃই কাহিল হইয়া পড়িতে লাগিল। পরিচিত ছেলেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুষ্ককণ্ঠে বলিত,—"বড় খাটুনি পড়িয়াছে!"

সপ্তমী পূজারদিন প্রত্যুষে যখন পাশের পূজাবাড়ী নাগরিকগণের আনন্দ কোলাহলের সহিত মধুর রাগিণীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। তখন প্রমথের মনটাকে যেন একটা বেদনার জ্বলন্ত অঙ্গার চাপিয়া ধরিল। চারিপাশের লোকের প্রফুল্লতা ও জাগ্রত ভাবের সহিত নিজের বেদনাপূর্ণ ভাবটা তুলনা করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে লাগিল। এতদিন মনের ভিতর সে যে সুখকল্পনার মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছিল, আজ পত্নীর দুর্ব্যবহারে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। হায় এই কি পত্নীর ব্যবহার, এই কি প্রেমের প্রতিদান! তখন চাতকের মত শুষ্ক-কাতর কণ্ঠে সে পত্নীর নিকট গিয়াছিল,—পত্নী নির্দ্দয়ের মত মুখ ফিরাইয়া লইল। প্রমথ আকুলহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল বাজনা সব আরম্ভ হইতে লাগিল। দলে দলে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা বিচিত্র সজ্জায় সাজিয়া, আনন্দ-কোলাহলে রাজপথ মুখরিত করিয়া আরতি দেখিতে চলিয়াছে। তাহাদের সোৎফুল্ল মুখে ও বিচিত্র বসনে সপ্তমীর চাঁদের নির্ম্মল কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কেমন হাসিতেছে ; দেখিয়া দেখিয়া প্রমথ অধীর হইয়া উঠিল। আজ সে ত তাহাদের মত আনন্দ করিতে পারিতেছে না, তাহার হৃদয়ের ভিতর যে বেদনারাশি গুমট বাঁধিয়াছে, তাহার ভিতর ত সপ্তমীর চাঁদ উঁকি দিতে পারিতেছে না, ইহার জন্য দায়ী কে? অন্তর মনটা গর্জ্জিয়া বলিল—"পত্নী!" এমন করিয়া পূজার দিনক'টা কাটিল। প্রমথ প্রতিজ্ঞা করিল, ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে ; পত্নী আজ যে দাগা দিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে আজীবন কাঁদাইব, তবে আমার নাম প্রমথ

লোকের মনের ভিতর দুঃখ যখন জমাট বাঁধে, তখন লোক অন্যের কাছে কাঁদিয়া অথবা বিরলে বসিয়া মনের কথা লিখিয়া দুঃখ-মেঘ তরল করে; ইহ জগতের নিয়ম। বন্ধুহীন প্রমথ মনের আবেগ চাপিতে অপারগ হইয়া বিরলে বসিয়া মনের দুঃখ লিখিয়া দুঃখমেঘ কিঞ্চিৎ তরল করিল। তাহার লিখিবার ক্ষমতা ছিল, ছদ্মনামে মাসিক পত্রিকাতে মাঝে মাঝে গল্প ও উপন্যাস লিখিত; করুণভাব ফুটাইয়া তুলিবার তাহার শক্তি আশ্চর্য্য। হৃদয়ের আবেগ লিপিবদ্ধ করিয়া সে মনের ভিতর একটু শান্তি লাভ করিল। লেখার ভিতর এমন স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শী ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা পড়িয়া সে নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেল। এই দুঃখের ভিতরও কাহিনীটি বাণীসম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিল। ইহার এক উদ্দেশ্যও ছিল। "বাণী" প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রিকা, প্রমথের শ্বশুর ইহার গ্রাহক, কাজেই কাহিনীটি জ্যোৎস্না পড়িবেই। তখন জ্যোৎস্না নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইবে,—কাঁদিবে। প্রমথ এইরূপে প্রতিশোধ লইবার ফিকির করিল।

অবশ্য সে পূর্ব্বের ছদ্মনামই ব্যবহার করিল। সম্পাদকের অফিস হইতে অজস্র প্রশংসাধারার সহিত কাহিনীটি ছাপা হইয়া যখন তাহার নিকট পৌঁছিল, তখন অনেক দিন পরে প্রমথের মনে এক অনাবিল শান্তি আসিল। কাহিনীটি পড়িয়া তাহার মনে হইল, সে একটি দ্বিতীয় 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। পত্নী তাহার ছদ্মনামের আবরণ উন্মোচন করিতে পারিবে না, অথচ গল্পটা পড়িয়া বিস্মিত হইবে—ইহা যে তাহারই হৃদয়ের প্রতিবিম্ব! 'কোনও রূপগর্ব্বিতা যুবতী—প্রেমপ্রার্থী স্বামীকে নিরাশ করা; ক্ষুব্ধ, ব্যথিত স্বামীর আত্মহত্যা', এইরূপ করুণ কাহিনীটি পড়িয়া জ্যোৎস্নার হৃদয় ছিঁড়িয়া যাইবে। সে বুঝিতে পারিবে, সেও এইরূপ স্বামীর মনে ব্যথা দিয়াছে। তখন জ্যোৎস্নার মনে অনুতাপ হইবে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবে। প্রমথ মনে মনে একটু সান্ত্বনা লাভ করিল। আশা করিল, কিছুদিন পরেই পত্নী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চিঠি দিবে; চিঠিখানা নয়ন জলে ধৌত করিয়া, হৃদয়ের অনুতাপ-হোমাগ্নিতে পূত করিয়া পাঠাইবে!

কিছুদিন পরে পিয়নের হাতে একখানা এনভেলাপ দেখিয়া প্রমথ বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু খুলিয়া হতাশ হইল, উহা "পুষ্পাঞ্জলি"-সম্পাদকের চিঠী, তিনি "মনের ব্যথা" উপন্যাসটির বাকি অংশ পাঠাইতে লিখিয়াছেন। প্রমথ "মনের ব্যথা" নামে একখানা করুণ উপন্যাস ধারাবাহিক-

রূপে লিখিতেছিল। উপন্যাসখানা পাঠকসমাজে খুব আদৃত হইয়াছিল। প্রমথের বিশ্বাস ছিল, শ্বশুরালয়ে গমনের পূর্ব্বেই উহা প্রেরণ করিয়াছে। সম্পাদকের এবম্বিধ পত্র পাইয়া সে বিস্মিত হইল। বাক্স, জামার পকেট খুঁজিয়া তাহা মিলিল না; কিন্তু তাহার স্পষ্ট মনে পড়িল, ইহা আহার ট্রাঙ্কেই ছিল। খুঁজিয়া চারিখানা পাতা একটা বহির ভিতরে মিলিল, বাকি ক'পাতা মিলিল না। মন ভাল না থাকায় সম্প্রতি আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। ঐ চারিপাতা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়া লিখিল, "শরীর ভাল না থাকায় শেষ করিতে পারিলাম না। বাকি ক'পাতা পরের মাসে পাঠাইব।"

চতুর্দ্দশীর চাঁদ্‌টা বড়ই মধুরভাবে আকাশের নীলিমায় হাসিতেছিল। আকাশ নির্ম্মেঘ, মুগ্ধ চকোর শূন্যে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বায়ুস্তরে স্বরলহরী ছড়াইয়া ক্রমাগত চাঁদের দিকে ছুটিতেছিল। জ্যোৎস্না তাহাদের দ্বিতল বারান্দায় দাঁড়াইয়া একমনে চকোরের উদাসতান শুনিতেছিল, তাহার হৃদয়তন্ত্রীটাও চকোরের সহিত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছিল। হায় সেদিন কি আর ফিরিবে? তাহার মনে অতীত স্মৃতিটা জাগিয়া উঠিল, সেই বিবাহরজনী, শুভদৃষ্টির সময় তাহাদের চারিচক্ষুর মিলন। সেদিন জ্যোৎস্না কি দেখিয়াছিল? দেখিয়াছিল, স্বর্গ হইতে দেবতা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবতা কেমন, সে তাহা জানে না; কিন্তু শুনিয়াছে, দেবতারা পবিত্র, অপরূপ রূপলাবণ্য-সম্পন্ন, সেরূপ ভূতলে মিলে না। জ্যোৎস্না দেখিয়াছিল, তাহার স্বামীরও তাহাই। জমাট বাঁধা জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ ধবধবে বর্ণ, মুখে ফুলের মত লাবণ্য, চক্ষুদুটিতে আমরি মরি কেমন স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি, ও দৃষ্টিতে বুঝি বনের বাঘও বশীভূত হয়। সেদিন লজ্জায় সে স্বামীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই। যতবার জোর করিয়া সেই দেবোপম মুখ দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ততবারই কেমন লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসিয়াছিল। তারপর কেমন সে চুরি করিয়া স্বামীকে দেখিয়াছে! ঘোমটার আড়াল বা জানালার ফাঁক হইতে, অথবা জ্যোৎস্না-লোকে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে সে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। তারপর ক্রমে ক্রমে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিল! বাঁধভাঙ্গা নদীর মত প্রেমতটিনী উত্তমকে

কেমন ছাপাইয়া ফেলিয়াছিল, উভয়ে সেই স্রোতে স্বপ্নের ঘোরে কোন সুখের দেশে ভাসিয়া চলিয়াছিল। * * সহসা জ্যোৎস্নার চমক ভাঙ্গিল। হায় পুরুষ এমনই বিশ্বাসঘাতক! স্বামী নারীর সাধনার ধন, ইহকাল পরকালের দেবতা, সেই স্বামী ভ্রষ্টচরিত্র! হায় কি করিয়া সে তাঁহার পূজা করিবে? স্বামী যদি দেবতার মত নির্ম্মল হইতেন, তবে আজ এই শুভ্ররাত্রে তাঁহার চরণতলে মাথা রাখিয়া সে স্বর্গসুখ অনুভব করিত। কিন্তু হায়, স্বামী ত দেবতা নয়। তাঁহার চরিত্রহীনতার সাক্ষী এইত তাহার কাছে! জ্যোৎস্না একখানা মসীরঞ্জিত কাগজ বাহির করিল। তাহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া মুক্তা-বিন্দুর মত ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হায় কেন এই পাপলিপি তাহার হাতে পড়িয়াছিল; কেন সেদিন সে গোপনে স্বামীর বাক্স খুলিয়াছিল? হায় কেন তাহার ওরূপ দুর্ম্মতি হইয়াছিল? জ্যোৎস্না কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। পালঙ্কের উপর পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। আবার উঠিয়া বসিল, প্রদীপের কাছে যাইয়া লিপিখানা আবার পাঠ করিতে লাগিল।

ইহা প্রমথের হস্তলিখিত। প্রমথ লিখিয়াছে, "প্রাণের মৃণাল, তোমাকে কি আর লিখিব,—লিখিবার মত কিছুই নাই। হতভাগা আমি, আমার মৃত্যুও নাই। তোমার কথা যখন মনে হয়, তখন আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করে। স্বর্গের পুষ্প তুমি, পাপ সমাজের পীড়নে শুষ্ক হইতেছ,—পাপ পৃথিবীর লোক নন্দনকাননের পারিজাতের মর্ম্ম কি বুঝিবে? সূর্য্যমুখী, তার প্রেমাস্পদ সূর্য্য যেদিকেই যায়, সেদিকেই ফিরিয়া চায়,—তুমিও তেমি" লাইনটি অসমাপ্ত। তারপর কতকটা স্থান খালি, বোধ হয় লেখক উহা পরে পূরণ করিবার আশায় রাখিয়াছে। আবার লেখা—

"শুনিলাম, তুমি নাকি অন্তিমশয্যায়। ভাবিয়াছিলাম, আর এই পাপদুঃখের কথা তোমাকে শুনাইব না, কিন্তু তোমার অন্তিমে একবার সমস্তঘটনা তোমাকে না বলিলে তুমি প্রাণে বড় একটা দুঃখের বোঝা লইয়া যাইবে। আমি জানি, তুমি এখনো আমায় ভালবাস, আমার উপর তোমার যে সন্দেহ, একটা কালো-ছায়ার মত জাগিয়াছে, তাহাই তিল তিল করিয়া পিসিয়া তোমাকে মৃত্যুর মুখে টানিতেছে। কিন্তু মৃণাল, তোমার অন্তিম সময়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নয়; এখন আর আমি প্রবঞ্চনা করিব না; ইহাতে আমার স্বার্থ কি? সমস্ত কথা লিখিয়া আমি তোমার নিকট শেষমুহূর্ত্তে ক্ষমা প্রার্থনা

করিতেছি। মনে পড়ে মৃণাল, সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন বিংশবর্ষীয় যুবক, তোমার বয়স চৌদ্দ। তোমাদের দেশে কোন কার্য্যোপলক্ষে যাই, সেই সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রজাপতির অভিশাপ, তাই দুজনে দুজনার সহিত হৃদয়ের বিনিময় করিয়া ফেলিলাম। তোমার মাতা দরিদ্রা, পতিহীনা। তোমার মাতাকে বলিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম। এদিকে আমার পিতামাতা এক ধনীর কন্যার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। আমি মায়ের কাছে সব বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলাম। বাবা বড়ই অর্থপ্রিয়। ব্যাপার শুনিয়া আমাকে ভৎর্সনা করিলেন এবং ওরূপ বিবাহ বিবাহই নয় বলিয়া তিনি জোর করিয়া আমার আবার বিবাহ দিলেন। হতভাগ্য আমি, তখন পলাইতে পারিলাম না, বাপের ক্ষুর ছিল, আত্মহত্যাও করিতে পারিলাম না। তুমি যথাসময়ে সব শুনিলে, তখন পাপিষ্ঠ স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মবলিদানে বদ্ধপরিকর হইলে। পিতা আমায় এমন কড়া পাহারায় রাখিলেন যে, আমার আর তোমাদের ওখানে যাইবার উপায় রহিল না, চিঠিলেখাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।"

মধ্যের তিন পাতা নাই, চতুর্থ পাতায় লিখা "কিন্তু আজ তোমার শেষ মুহূর্ত্তে আমি বলিতেছি, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ শুধু এই জন্মের নহে,—ইহা জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ; তাই ভগবান্ আমাদের মিলন ঘটাইয়াছিলেন। বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মের কোনও অপরাধের ফলে এজন্মে আমরা পূর্ণরূপে মিলিতে পারিলাম না, নিষ্ঠুর সমাজের তাড়নায় এইরূপ কত বালিকা বৃন্তচ্যুত কুসুমকলিকার মত অকালে শুকাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। হায় বঙ্গ সমাজ, কবে তোমার দেহ হইতে এই ঘৃণিত পণপ্রথা দূরীভূত হইবে? পিতামাতা যদিও আমার বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিবাহ নহে। ইহাতে আমার মিলন ঘটে নাই, আমি এ স্ত্রীকে ভাল বাসিতে পারি নাই।

যাও সতী, আনন্দময়ের আনন্দরাজ্যে যাও,—যেখানে তুমি আমি আবার মিলিত হইব, যেস্থানে সমাজের ঘৃণিত পণপ্রথা নাই, যেখানে স্বার্থ-পরতা নাই সেইখানে যাও, সেখানে আমাদের ভিতর কোন ব্যবধান রাখিতে পারিবে না।"

ইহা একখানি পত্রের অংশ। লেখাগুলি যে প্রমথের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জ্যোৎস্না ইহা পড়িয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল; "হায়! এই আমার স্বামী!

আমি ত তাঁহার পত্নী নহি, আমাদের আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটে নাই। হায় আমার কি হইবে ?" এমন সময় রাজপথ দিয়া একটা লোক গাহিয়া চলিয়াছিল "ধরাতে কেউ বা হাসে ভাসে কেহ আঁখি নীরে।" জ্যোৎস্নার বুকটা ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"সই, তুই যে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিস্। মুখে সে হাসি নেই, লাবণ্য মুছে গেছে, বোঁটাঝরা ফুলের মত কেমন মলিন হ'য়ে গেছিস্।"

"না, সই, তোর দেখ্‌বার ভুল। তুই আমায় ভালবাসিস্ কি না ? তাই আমায় কেবল রোগাই দেখিস্।" জ্যোৎস্না একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। পিত্রালয়ে জ্যোৎস্না ও তাহার সই আলাপ করিতেছিল। সই চমকিত হইয়া বলিল,—"এখনো এসব বুঝ্‌বার বয়স যায়নি জ্যোৎস্না। তোর সে স্ফূর্ত্তি নেই, সেই হাসি, গল্প, খেলা কর্‌বার সখ নেই। মুখখানি মলিন, কেবল বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস। বলি সয়ার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয় নি ত ? হয়ে থাকে ত বল্—মিটিয়ে দি। মিছামিছি কেন দেহ পাত কচ্ছিস্। এ বয়সে স্বামি-স্ত্রীতে অমন এক আধটু মন কষাকষি সময় সময় হয় বৈকি !—কিন্তু তা কি মনে করে রাখ্‌তে হয়। আর ওঁদের ওপর অভিমান করে থাকাটা কি আর মেয়েমানুষের পোষায় ! বেচারা বিদেশে থাকে, দোষ হ'লেও তা ধর্ত্তে নেই।"

জ্যোৎস্না উত্তর করিল না, পত্রখানা বাহির করিয়া সখীর হাতে দিয়া ছল্‌ছল্ চোখে বলিল,—"এই দেখ।" সখী আদ্যোপান্ত পড়িয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তাই ত! কিন্তু তুই এমনতর কোন গুজব পূর্ব্বে শ্বশুরবাড়ী কিছু শুনেছিলি ?"বিশুষ্কমুখী জ্যোৎস্না মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না"

সই। কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা ঘটে থাক্‌লে একটা কিছু আন্দোলন সেখানে শুন্‌তিস নিশ্চয়। অন্ততঃ পাড়ার মেয়েরাও গোপনে তোকে বল্‌ত. না হয় তোর সাক্ষাতে নিজেদের ভেতর এক আধ্‌টু আলোচনাও কর্ত্ত,—মেয়ে-মানুষের পেটে কথা থাকে না।

সই মুখে এইরূপ আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহারও সন্দেহ হইল। কি জানি পুরুষজাত কেমন, উহাদের সহজে চেনা যায় না ;—আর

জীবনের এ বয়সটাই খারাপ। সরলা জ্যোৎস্না সখীর মুখে এরূপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া অকূল সাগরে যেন কূল পাইল, সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"তাইত, এতবড় একটা ঘটনা ঘটিল,অথচ সেখানে সে কিছুই শুনতেপেলে না। তিনিও ত এ পর্য্যন্ত আমায় কত আদর করিয়াছেন, কলেজ বন্ধের সময় রকমারি উপহার দিয়াছেন।. সময় সময় স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে, একের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে কত উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার ঐ দেবোপম মূর্ত্তি, সরল চাহনী, অকপট ব্যবহার,—ইহাতে কি প্রবঞ্চনা থাকিতে পারে! ছিঃ কি ছাই সন্দেহ করিয়াছি! আবার মনে কিরূপ সন্দেহ করিয়া বলিল—"কিন্তু এই চিঠীটা কি সখি! এই চিঠী ত তাঁরই হস্তাক্ষর! আর মৃণালও ত পুরুষের নাম নয়। দেখ লেখার স্থানে স্থানে চুপ্‌সে গেছে; বোধ হয় লিখ্‌বার সময় তিনি কেঁদেছেন।"

সখী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সখি, তোর সন্দেহ অমূলক। একটু ধৈর্য্য ধরে থাক্, বৈকাল বেলা আমি তোর বরের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে প্রমাণ করে দিতে পারবো বোধ হয়।" জ্যোৎস্না ম্লান মুখে হাসিয়া বলিল—"ঈশ্বর করুন যেন তা-ই হয়।"

বৈকালবেলা সই হাসিমুখে আসিয়া বলিল—"এই নে জ্যোৎস্না তোর বরের সাফাই সাক্ষী।" সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে খানকয়েক "পুষ্পাঞ্জলি" মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া দিল। জ্যোৎস্না আগ্রহ সহকারে তাহা হাতে লইয়া বিস্মিত ভাবে বলিল—"এতে কি সই?"

সই। "মনের ব্যথা" গল্পটা আগাগোড়া পড় ত শুনি।

জ্যোৎস্না পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া গেল, সইও তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া কখন শেষ হইল, তাহা কেহই টের পাইল না। জ্যোৎস্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আহা কি করুণ গল্পটা; কিন্তু শেষ হয় নি। এ ত আশ্বিন মাসের সংখ্যা; আরও বেরুবে।"

সই বলিল—"আচ্ছা এখন তোর ঐ চিঠীটা পড় ত।" জ্যোৎস্না পড়িল, পড়িয়া বিস্মিত ভাবে বলিল "অ্যাঁ, তাইত! এ যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে। ও গল্পটার শেষাংশের সঙ্গে ত এ চিঠীটা বেশ মিলে যায়, যেন মনে হয় লেখক এর পরে ইহাই লিখ্‌বেন।"

সই। আর এই গল্পের যতীন্দ্র বাবু যে গরীবের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন, তার নামও কিন্তু মৃণাল।

জ্যোৎস্না চমকিত হইয়া সখীর মুখের দিকে চাহিল। সখী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে জ্যোৎস্না! নীরদচন্দ্র লেখকের ছদ্মনাম, আমার মনে হয়, গল্পলেখক আর এই পত্র-লেখক একই ব্যক্তি।"

"অ্যাঁ তবে তিনি— ?"

সই। হাঁ, তিনি তোর বর, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই হ'তে পারে না। বিশ্বাস না হয়ত পুষ্পাঞ্জলি অফিসে খোঁজ নিতে পারিস্।

জ্যোৎস্না। আর কোনও সন্দেহ নেই সই। একবার সন্দেহ করেই খুব জব্দ হয়েছি, সাধে কি লোকে বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।" লেখাপড়া যদি না জান্‌তেম, তা হ'লে এক'টা দিন এ যম-যাতনা ভোগ কর্ত্তে হ'ত না। "এ যেন খাল কেটে কুমীর আনা।"

সই হাসিয়া বলিল—"সোণা পুড়ে পুড়ে খাটি হয় জ্যোৎস্না, আজ এই পরীক্ষায় পড়ে তোর হৃদয়টা ভেঙ্গে চূরে আবার যে ভাবে তৈরি হ'ল, তাতে দেখ্‌বি, তোদের প্রেমের রাজ্যে কখনো বিশৃঙ্খলা হবে না।" হৃদয় তোর বহুমূল্য হীরকখণ্ডে পরিণত হয়েছে, আর তাতে সন্দেহের দাগ পড়্‌বে না।

পরদিন বৈকালে প্রমথের নামে পুষ্পাঞ্জলি আফিস হইতে এক পত্র আসিল। জ্যোৎস্না খুলিয়া পড়িল, সম্পাদক লিখিয়াছেন—"প্রিয় প্রমথবাবু, কার্ত্তিকসংখ্যা দুইফর্ম্মা প্রেসে গিয়াছে। আপনার উপন্যাস "মনের ব্যথার" শেষাংশটুকু এখনো পাই নাই। পূর্ব্বে কলিকাতার ঠিকনায় একখানা চিঠী দিয়াছি। তাহা হস্তগত হইয়াছে কি না জানি না। আপনি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, পূজায় রঙ্গপুর যাইবেন, তাই সেই ঠিকনায় এই চিঠী দিলাম। পত্রপাঠ গল্পের শেষাংশটুকু পাঠাইয়া সুখী করিবেন। আমার বিজয়ার সম্ভাষণ জানিবেন। ইতি।" লজ্জায়, জ্যোৎস্নার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিন পরে একদিন ভোর রাত্রে প্রমথ একটি সুস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল। সে দেখিল যেন জ্যোৎস্না অশ্রুসিক্ত-নয়নে তাহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। জ্যোৎস্না যেন আর সেদিনকার মানুষটি নাই, সে সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সে বলিতেছে, 'আমায় ক্ষমা কর। হীনবুদ্ধি অবলা

আমি না বুঝিয়া তোমার অকলঙ্ক চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলাম। তাই ভগবান্ আমায় খুব শাস্তি দিয়াছেন, তাই আমার এই অবস্থা।' প্রমথ জ্যোৎস্নার দিকে চাহিল। স্বচ্ছ কাচখণ্ডে ভিতরকার জিনিষ যেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায়, প্রমথ তেমনি জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, দাউ দাউ করিয়া অনুতাপাগ্নি জ্বলিতেছে। ব্যথিত প্রমথ সমস্ত অভিমান ভুলিয়া পত্নীকে বুকে তুলিয়া লইল,—অমনি জ্যোৎস্নার হৃদয়ের অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া গেল, সেখানে [illegible] করিয়া একটি নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী বহিতে লাগিল। প্রমথ বিস্মিত হইল!

প্রাতরাশ সমাপনান্তর সে যখন টেবিলের কাছে বসিল, তখন তাহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রমথের মনে হইল, আজ কোন শুভসংবাদ আসিবে। কিছুক্ষণ পরে পিয়ন যখন তাহার নামের ক'খানা চিঠি দিয়া গেল, তখন প্রমথ চিরপরিচিত হস্তের বাঁকা বাঁকা অক্ষরের শিরোনাম-অঙ্কিত একখানা চিঠি পাইয়া পেটুকের মত গিলিতে বসিল। কি মিনতিপূর্ণ চিঠিখানা, যেন [illegible] ঢালিয়া লেখা! ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে কাতরতা যেন উছলিয়া পড়িয়াছে। ইহাপেক্ষা করুণ ভাব বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। চিঠিখানা জ্যোৎস্নার। প্রমথ চিঠিখানা একবার দুবার করিয়া দশবার পড়িল, তবুও তৃপ্তি হইল না। এই প্রমথই ত স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল! [illegible] একখানি চিঠির এমন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা, সে মানুষটি জানি কেমন! প্রমথের রাগ, অভিমান সমস্ত ভুলিয়া গেল। সহসা চিঠির এক অংশ পড়িয়া, সে এন্‌ভেলাপটা খুঁজিয়া আরো একখানা লিপি বাহির করিল। ইহা যে তাহারই হস্তাক্ষর! প্রথমেই সম্বোধন "প্রাণের মৃণাল!" হাঁ। ইহাইত তাহার [illegible] গল্পটির একাংশ। প্রমথ দিনের আলোর মত সমস্ত ঘটনা বুঝিয়া লইল। পত্নীর পত্রের শেষাংশটা আবার গভীর মনোযোগ সহকারে পড়িল। পত্নী লিখিয়াছে, "তুমি এখানে পৌঁছিয়া সন্ধ্যার সময় দাদার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলে। আমার কাঁধে ভূত চাপিল, তোমার বাক্স খুলিলাম—আমার সর্ব্বনাশ হইল, তোমার এই চিঠি পাইলাম। স্বামিন্, আমায় ক্ষমা কর, হীনবুদ্ধি আমি, ইহা পড়িয়া সন্দেহ ও অভিমানে জ্বলিতে লাগিলাম। স্ত্রী নাকি স্বামীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিনে, কিন্তু আমি তোমায় চিনিতে পারিলাম না। সন্দেহে আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। দীর্ঘদিনের পর তুমি আসিয়াছ,—তোমায় আদর অভ্যর্থনা করিলাম না, সেবাযত্ন করিলাম না

মিছামিছি সন্দেহে মনের আগুণে পুড়িতে লাগিলাম, তোমাকেও সেই আগুণে দগ্ধ করিলাম।

স্বামিন্, এখন আমি আমার ভুল বুঝিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া খাটি হইয়াছি, তোমায় চিনিয়াছি। এখন আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি, যদি তুমি সত্য সত্য অমর হইতে, তাহা হইলেও এখন আমি তোমাকে পূর্ব্বের মত ভালবাসিতে পারিতাম। এখন আমি স্বার্থহীন ভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। তোমার উপন্যাসটির হৃত অংশ পাঠাইলাম; বোধ হয় সম্পাদক তোমায় তাগিদ দিতেছেন। ইতি তোমারই পদাশ্রিতা—
"জ্যোৎস্না।"

প্রমথের মনে হইল, আজ যেন সমস্ত বিশ্বে কেমন একটা স্নিগ্ধ আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বময় কেমন শীতল সমীরণ একটা স্বর্গীয় তান লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—জীবনে এমন শান্তি সে কখনো পায় নাই।

ক'দিন পরে বৈকালবেলা প্রমথ সহসা শ্বশুর-গৃহে যাইয়া উপনীত হইল। শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিল "কলিকাতায় বড় প্লেগ দেখাদিয়াছে।" জ্যোৎস্না পুলকে অজস্র অশ্রুধারা ও দীর্ঘনিশ্বাসের ভিতর দিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করিল।

জলপ্লাবন।

লেখক—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিনের দারুণ বর্ষায় ইতঃপূর্ব্বে দামোদর নদে ঢল নামিয়াছিল। তাহাতে নদের জল উচ্ছ্বসিত ও কুলপ্লাবী হইয়া উঠে। বর্দ্ধমানের শাসন-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সে ব্যাপার দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে সে কথা ঘোষিত করা হইল এবং যাহাতে স্থানীয় অধিবাসি-গণ বন্যার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করে, সে বিষয়েও উপদেশ ও পরামর্শ

দান করা হইল। কিন্তু সাধারণ জনমণ্ডলী বিশেষ সতর্ক হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখিতে পাইল না। তাহারা ভাবিল, দামোদরে প্রতি বৎসরই "ঢল" নামে, বন্যা আসে, ইহার জন্য সতর্ক হইবার আবশ্যকতা কি?

বন্যারপ্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রকার গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল—"বল্‌ছিস্ কি রে? তোরা কেউ বড় বানের কথা শুনেছিস? সে বড় বান রে! শোন্ তবে বলি। একটা কাক প্রতিদিন একটা বাঘের মাথায় ব'সে ঠক্‌ঠক্ ঠোকর্ মা'র্‌ত! বাঘ নড়নকুদন ক'রেও বায়সকে ধ'র্‌তে পা'র্‌ত না। তা'রপর—বুঝ্‌লে কি না—তা'রপর কাক তখন কা-কা শব্দ ক'রে বাঘকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। বাঘ মশায় সে যাত্রা বায়স প্রভুর কিছু কর্‌তে না পেরে—বুঝ্‌লে কি না—প্রতিজ্ঞা কর্‌লে—আচ্ছা, কাক এখন কাকের পো, বড় বানটা একবার আসুক, তখন তোমাকে ধ'রে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে তোমার হাড় খাব, মাস খাব, রক্ত খাব। হাঁ, তবে আমার নাম বাঘের বেটা বাঘ।"

তারপর বুঝ্‌লে কি না—তা'পর সত্য সত্যই একদিন বান ডাক্‌ল, বাঁশ গাছ ডুব্‌ল, তালগাছ না'রকেল গাছ ডুব্‌ল। আর বাঘের পো—বুঝ্‌লে কি না—কাক্‌টাকে না ধ'রেফেলে ঘাড়ে এক কামড়। বাস্ কাক প্রভু অজ্ঞান অচেতন নড়ন চড়ন রহিত। তা'র পালকগুলি সব সব ক'রে স্রোতের জলে ভেসে বেরিয়ে গেল। কাক প্রভু তখন বুঝ্‌লে বাঘ কি জিনিস, আর বানই বা কি জিনিস! বুঝলে, একেই বলে বান। বান কি আর গাছের ফল হে, যে ঝর্‌লেই হ'ল? আর বান এসেই বা আমাদের ক'র্‌ছে কি? চারিদিকে বাঁধ,—বাঁধ ব'লে বাঁধ, প্রবল বাঁধ—বুঝ্‌লে কি না—বানে আমাদের ভয়টা কিসের?"

অন্য এক ব্যক্তি মনের সুখে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল

"আমিও যে অমন বানের কথা না জানি তা' নয় হে! একদিন এমন বান এসেছিল—কথাটা মেনে নাও হে, মেনে নাও—যে বানের স্রোতে নগরকে নগর ভেসে বেরিয়ে গেল। একটা দেশ ভেসে গিয়ে আর একটা দেশের সঙ্গে জোড়া লেগে গেল। বাঘ, সিংহ, গো, মহিষ, সর্প, ময়ূর সব একসঙ্গে এক গাছে আশ্রয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরের ভাইবোনের মত হ'য়ে প'ড়্‌ল। আমিও কি আর বানের গল্প জানিনা হে।"

এইরূপ গল্পগুজবে সকলে আপনাপন সাহস ও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আসন্ন বন্যার ভয়ে কেহ আর বিশেষ ভীত হইল না। সকলেই ভাবিল, প্রতিবৎসরের মত বন্যা আসিবে, এক আধ দিন থাকিবে, তৎপরে জল শুকাইয়া যাইবে। তবে দুই দশ জন সতর্ক ব্যক্তি গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে আত্মীয় কুটুম্বের গৃহে চলিয়া গেল। তাহাদের কাপুরুষতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নির্ভীক গল্পগুজবকারিগণ হাসির তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কহিল—"ওঃ লোকগুলার কি ভয়!"

যাহা হউক, গল্পগুজবে কিম্বা হাসির ঘটায়—"বানডাকা" কিন্তু বন্ধ হইল না। গভীর রাত্রে দামোদর সহসা স্ফীত হইয়া রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল। নদ ক্রমেই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত উদ্দাম জলরাশি বাৎসরিক বন্যার নির্দ্দিষ্ট সীমা ক্রমেই অতিক্রম করিতে লাগিল। জলকল্লোলের ভীম ভীষণ নাদ ঝটিকাশব্দের সহিত মিলিত হইয়া নদসন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল! বন্যাস্রোতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। জলরাশি ফুলিয়া ফুলিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকা। গ্রামবাসিগণ সকলেই প্রায় গাঢ় নিদ্রাভিভূত। ক্বচিৎ দুই এক-জন জাগরিত হইয়াছে—আর জাগিয়া আছে, রমেন্দ্র সত্যব্রত প্রভৃতি। রমেন্দ্রের পিসীমাতা শিবসুন্দরী সেই সবে মাত্র প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। শোকব্যথায় শিবসুন্দরীর আত্মীয়গণ তখন হা-হুতাশ করিতেছে।

প্রবল বাত্যায় গৃহস্থিত দীপালোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ভৃত্য পার্শ্বের গৃহ হইতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিবার সময় সভয়ে দেখিল, প্রাঙ্গণে জলতরঙ্গ ছুটিতেছে। চীৎকার করিয়া সে সকলকে আহ্বান করিল। সকলে সে স্থানে সমবেত হইয়া দেখিল, ব্যাপার ভীষণ—প্রাঙ্গণস্থ জল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

প্রভাতালোক ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগ্রামান্তর সহর প্রভৃতি জলমগ্ন হইল। কাঁচা ঘরগুলির প্রাচীর ধসিয়া গেল, চাল উড়িয়া গেল, অবশেষে স্রোতের জলে সমস্ত ভাসিয়া গেল। চালার মধ্যে প্রবল স্রোতে জল প্রবেশ করিতেই অনেক পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ চালের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই জলে ভাসিয়া গিয়াছিল; এইবার যাহাদের চাল ভাসিল, তাহারাও

আশ্রয়চ্যুত হইয়া ভাসিয়া চলিল। যাহাদের একতালা বাড়ী, তাহারা গৃহের ছাদে উঠিয়া পড়িল,যাহাদের দ্বিতল গৃহ,তাহারা একতালা হইতে দ্বিতলে ছুটিয়া পলাইল। কারণ তখন অনেক একতালাও প্রায় জলমগ্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকের অনেক জিনিসপত্র তখন ভাসিয়া গিয়াছে, অনেকের গৃহমধ্যস্থিত খাটপালঙ্কাদি তখন গৃহমধ্যেই ভাসমান। উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তখন অনেকে প্রাণরক্ষার উপায় করিল। কিন্তু অনেক বৃক্ষ মূলোৎপাটিত হইয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল—তাহাতে অনেকেরই প্রাণবিয়োগ ঘটিল। গো, মহিষ এবং অন্যান্য গৃহপালিত ও বন্য জন্তু প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সে কি স্রোত, কি ঘূর্ণাবর্ত্ত, কি তরঙ্গভঙ্গ! ক্রোশের পর ক্রোশ, গ্রামের পর গ্রাম ব্যাপিয়া সে উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি নৃত্য করিতে লাগিল। সকলের মনে হইল, জনপদ বুঝি মহাসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে, দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অনন্যোপায় হইয়া শিবসুন্দরীর আত্মীয়স্বজনগণ শিবসুন্দরীর মৃতদেহ তখন একতালা হইতে দ্বিতলে বহন করিয়া লইয়া গেল। তখন সে বাটীর সকলেই ভাবিতে লাগিল—শবদেহের সৎকার হয় কেমন করিয়া, আর শবদেহের সৎকার না হইলে হিন্দুয়ানী রক্ষাই বা হয় কেমন করিয়া?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—দিবাকরের কিরণ-ধারা আর ধরাতলে নামিতে পারিতেছে না। জমাট মেঘমালা কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া প্রকৃতির দারুণ নির্ম্মমতা প্রকাশ করিতেছে। উপরে ব্যোম-পথে সেই নির্ম্মমতা, সেই প্রলয়কালীন ছায়া, আর নিম্নে—ভূমিতলেও সেই নিষ্ঠুরতা—সেই ভীষণতা, সেই প্রাণহীনতা। কোথায় এখন প্রকৃতির সে শ্যাম-শোভা—লাস্যলীলা? তাণ্ডব নৃত্য, অট্টহাস্য—বিকট শব্দে দিগ্‌দিগন্ত এখন প্রকম্পিত। মহাপ্রলয়ের প্রলয়-তরঙ্গে পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হয়! সে অন্ধকার, সে বাত্যা, সে বৃষ্টি, সে প্লাবন, সে উচ্ছ্বসিত জলরাশি মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া সকলকে বুঝিতে হইল। তখন সকলের আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

জল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেকে মরিল ধনে প্রাণে—আর যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকলেই ভাবিল, সে যাত্রা আর কাহারও রক্ষা নাই।

অসংখ্য জীবজন্তুর মৃতদেহ জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল—জীবন্ত অনেক প্রাণীও ভাসিয়া চলিল। কেবল একটী মৃতদেহ এখনও পর্য্যন্ত গৃহাভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষিত! সে মৃতদেহ শিবসুন্দরীর। রমেন্দ্রকিশোর তাহার মৃতা পিসীমাতাকে লইয়া বসিয়া আছে—সে ভাবিতেছে, মৃতদেহের কেমন করিয়া সৎকার করা যায়। শোকাচ্ছন্ন হইলেও রমেন্দ্রকিশোর আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায় নাই। মৃতদেহের সৎকারের জন্য সে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।

অহিশেখর কহিল—"এ অবস্থায় আর কেমন ক'রে কি করা যেতে পারে। মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়াই আপাততঃ সুবিধাজনক। এখন আপনাপন প্রাণ বাঁচান ভার হ'য়ে উঠেছে—মৃতদেহ গৃহে রক্ষা ক'রে আর ফল কি?"

সে কথায় রমেন্দ্রকিশোর আস্থাবান্ হইতে পারিল না। সত্যব্রতের সহিত পরামর্শ করিয়া সে স্থির করিল—মৃতার মুখাগ্নি কার্য্য করিতেই হইবে।

কিন্তু সে কার্য্য কেমন করিয়া করিতে পারা যায়! ভীষণ জলপ্লাবনে দেশটা যে তখন ডুবিয়া গিয়াছে।

বহু চিন্তার ফলে সত্যব্রত এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিল। একখানা পুরাতন "শালতি"র যোগাড় করিয়া তাহার উপর চিতা সজ্জিত করা হইল। সেই চিতার উপর মৃতদেহ রক্ষা করিয়া রমেন্দ্রকিশোর তাহার পিসীমাতার অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করিল। অগ্নিসংযোগ করিয়া "শাল্‌তিখানাকে" বাহির জলে ঠেলিয়া দিতেই "শাল্‌তিখানা" স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে "শাল্‌তি" আর দেখিতে পাওয়া যাইল না, কেবল ধূম ও ক্ষীণালোক পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর তাহাও আর দৃষ্ট হইল না। রমেন্দ্র ও সত্যব্রত প্রভৃতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দ্বিতল হইতে নিম্নতলে নামিয়া আসিল।

প্রাঙ্গণের মধ্যে যে হ্রদ বা পুষ্করিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জলে স্নান করিয়া সকলে "শুচি" হইল। এই সকল কার্য্য সমাধা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমস্ত দিনের অনাহারের পর সকলে সামান্য "জলযোগ" করিয়া বিশ্রাম করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। সকলেই তখন নিদ্রালু—কিন্তু নিদ্রা বড় কাহারও হইল না। তাহার কারণ দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা—

কেবল শিবসুন্দরীর মৃত্যুর জন্য নহে—দেশে ভীষণ জলপ্লাবনের জন্যও তাহারা চিন্তিত হইল।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যা ততই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। হাহাকারে তখন দেশ পরিপূর্ণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সে ভীষণ জলপ্লাবনের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে কলিকাতায় একটা করুণ সহানুভূতির স্রোত বহিতে লাগিল। কার্য্যোপলক্ষে যাহারা বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেছে, তাহারা বিপন্ন আত্মীয়স্বজনগণের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; বর্দ্ধমানে যাহাদের আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব আছে, তাহারাও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; আর যাহারা বর্দ্ধমানের সহিত একবারে সম্পর্কশূন্য, তাহারাও সহানুভূতি-বশে কাতর হইয়া পড়িল। পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য—বর্দ্ধমানের সংবাদ-শ্রবণের জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল—"বর্দ্ধমানের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে," কেহ বলিল "দশ বিশ সহস্র লোক মারা পড়িয়াছে;" আর কেহ কেহ বলিল, "বর্দ্ধমান একবারে ভাসিয়া যায় নাই, লোকও তেমন মরে নাই—তবে গো, মহিষ, ছাগবংশ একবারে লোপ পাইয়াছে এবং শস্যাদিরও বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে।"

বর্দ্ধমান-বার্ত্তা শ্রবণান্তর বীর্য্যবান্ স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে চাউল, বস্ত্র ও অন্যান্য আহার্য্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহা লইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে রেলপথে যাত্রা করিল। বহু ধনী ও ধনীর সন্তানগণ স্বেচ্ছাসেবকগণের আদর্শে আর্ত্ত-সেবার জন্য জলপ্লাবিত দেশাভিমুখে রওনা হইল। যাহারা দুর্ব্বল, বিলাসী, স্বার্থপর অথবা কাজের লোক তাহারাই মাত্র বসিয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিতে লাগিল, গল্প শুনিতে লাগিল ও শুনাইতে লাগিল। বন্যার সংবাদ নানাস্থান হইতে কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ হইল। তারকেশ্বর, হরিপাল প্রভৃতি স্থান হইতে সংবাদ আসিল—তারকেশ্বরের মন্দির প্রায় জলমগ্ন হইয়াছে।

তৎপরে শুনা গেল, আমতা ডুবিয়াছে, রাধানগর ডুবিয়াছে। মেদিনীপুর, কাঁথি প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়াছে; পাটনা, দ্বারবঙ্গ যায় যায়, শোণ-সেতুর কোল পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। অন্যান্য নানা স্থান হইতেও জল-প্লাবনের সংবাদ আসিতে লাগিল। তাহা শ্রবণান্তর অনেকেরই ধারণা হইল, মহাপ্রলয়ের দিন বুঝি আগত প্রায়, নতুবা এমন হইবে কেন? কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ডায়মণ্ড হারবার ইতঃপূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইতে বসিয়াছিল—দৈব-কৃপায় রক্ষা পাইয়াছে। আবার সংবাদ আসিল, ডায়মণ্ড হারবার আবার যায় যায়, ললিতাকুড়ির বাঁধও প্রায় "ভাঙ্গো ভাঙ্গো" হইয়াছে, এমন কথাও জনরবে প্রকাশ পাইল। অনেকেই ভাবিতে লাগিল—কলিকাতাও বুঝি এইবার যায়। জনরবের লক্ষজিহ্বা ব্যাপারটাকে ভীষণতর করিয়া তুলিল। জননীরূপিণী রমণীগণ সে সংবাদ শ্রবণান্তর নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন ও বিপদ-বারণ মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

দেশের সর্ব্বস্থানেই প্রায় যখন এইরূপ অবস্থা, ক্রন্দনের রোল যখন চারিদিকেই উত্থিত হইয়াছে, তখন কলিকাতার অনতিদূরে কালীঘাটে একটী ভগ্ন দেবমন্দিরে বসিয়া এক জ্যোতির্দীপ্ত সন্ন্যাসী হাসিয়া হাসিয়া তাঁহার একটী তরুণ বয়স্ক শিষ্যকে কহিতেছিলেন—

"মার আমার সংহারমূর্ত্তির কথা ত শুন্‌লি বাবা! মা আমার গড়্‌তেও যেমন, ভাঙ্গ্‌তেও তেমনি। লীলা—লীলা—মা আমার লীলাময়ী।"

শিষ্য সে কথায় কোনও কথা কহিল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা ভাবিতে লাগিল। গুরুদেব—বিমলানন্দ ভারতী, শিষ্যের নাম নবীনানন্দ।

বিমলানন্দ, নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ স্থানটা আর তেমন ভাল লাগ্‌ছে না—না বাবা?"

নবীনানন্দ কহিল—"কি জানি, মনটা যেন কেমন কেমন্ কর্‌ছে।"

"হুঁ, তা'ত কর্‌বারই কথা। তা এখন কোথায় যা'বে বাপু?"

"বাড়ী।"

বিমলানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তা'ত যা'বে। কিন্তু যা'র কাছে যেতে চাও, সে ত এখন জলে ভাস্‌ছে। কা'র কাছে যা'বে বাপ্!" নবীনানন্দ গুরুদেবের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সে জানিত, তাহার গুরুদেব ত্রিকালজ্ঞ, সুতরাং তাহার বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে, তাঁহার কথা অভ্রান্ত—অখণ্ডনীয় সত্য।

বিমলানন্দ কহিতে লাগিলেন—"তোমার বাটী যাওয়ায় আমার আপত্তি নাই। এখন একপ্রকার সুস্থও হয়েছ। তবে—তবে—"

শিষ্য নবীনানন্দ বস্তুতই বয়সে নবীন, অনুমানে বোধ হয় সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শরীর কৃশ। সহসা দেখিলে মনে হয়, সে যেন কোনও দুরন্ত ব্যাধির কবল হইতে কোনরূপে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহার গুরুদেব বিমলানন্দ সুস্থকায়, সবল দেহ—বয়স অনুমান করা সুকঠিন। জীবহিতেই তাঁহার আনন্দ—তাঁহার আর অন্য কাম্য নাই।

জীবহিতাকাঙ্ক্ষী গুরুদেবের মুখে সেই 'তবে তবে" শুনিয়া নবীনানন্দ একটু শিহরিত হইল। তাহার বাটী যাইবার তখন প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু গুরুদেব তাহাতে যেন কতকটা বাধা দিতেছেন। নবীনানন্দের রোগ-শীর্ণ দেহে একটা উত্তেজনা আসিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া বিমলানন্দ হাসিয়া কহিলেন—"সংসারী লোকের বিপদ ওইখানে। তা'রা বুঝে না কিছু, আর বুঝালেও তা'রা বুঝ্‌বে না। হ্যাঁ বাবা, আমি কি তোমার সুখশান্তির হন্তারক ?"

শিষ্য অপ্রতিভ হইল—করযোড়ে গুরুদেবের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। গুরুদেব শিষ্যকে মার্জ্জনা করিলেন না—হাসিয়াই কথাটা উড়াইয়া দিলেন। গুরু ও শিষ্যে আবার কথোপকথন হইতে লাগিল—সে কথা জল-প্লাবন সম্বন্ধে।

নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর, দেশটা কি সত্যই ভেসে গেছে ?

বিমলানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"ভাসা ডোবা কে জানে কেমন।
ভাসা ডোবার কোন্‌টা ভাল
(তাই) ভাবি অনুক্ষণ।
সাধ—ডুবি রূপ-সাগরে
ডুব দিয়ে গো ধরি তা'রে
আবার সে ভেসে যায়,
লুকায় কোথায়
তা'র কতই-গো ছলন ;"

গীতান্তে বিমলানন্দ হাসিয়া কহিল—"হ'বে, তা ভাস্‌তেও পারে, ডুব্‌তেও পারে। তা'তে হ'ল কি ?"

নবীনানন্দ কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া, কতকটা আপনাকে সাম্‌লাইয়া বলিল—

"না তাই বল্‌ছি। আপনি কি বাঁচিয়ে দিতে পারেন না—কেমন আমায় বাঁচিয়েছেন ?"

বিমলানন্দ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে নবীনানন্দ অধিকতর অপ্রতিভ হইল। পরক্ষণেই বিমলানন্দ অতি কোমল ভাবে কহিলেন—"প্রস্তুত হও বৎস, আর্ত্তোদ্ধারে আমাদের যাত্রা কর্‌তে হ'বে। তখন বুঝ্‌বে কে বাঁচে, কে ডোবে। যা' প্রত্যক্ষ কর্‌বার সুবিধা আছে, পরোক্ষে তা'র বিচারের আবশ্যকতা কি ?"

নবীনানন্দের বাটী যাইবার অভিপ্রায় আর রহিল না। সে সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিল। গুরুদেবের সহিত সে আর্ত্তোদ্ধারে যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রে অহিশেখর মিত্রের বাটীর খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল এবং জলস্রোতে তাহা বিলীন হইল। সেই অংশের পার্শ্বস্থ গৃহে রমেন্দ্র-কিশোর ও সত্যব্রত নিদ্রা যাইতেছিল। পতনের শব্দে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শোকে ও ক্লান্তিতে তাহারা তখন অবসন্ন প্রায়। শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাদের আর উঠিতে ইচ্ছা হইল না ; কিন্তু তাহাদের উঠিতেই হইল—গৃহের বাহিরে তখন চীৎকার উঠিয়াছে—

"ঘর ছেড়ে বাহিরে এস, ঘর ছেড়ে বাহিরে এস।" সে আহ্বান অহিশেখরের নহে ; ভ্রাতৃজায়ার অলঙ্কারাদি কিরূপে সে হস্তগত করে, সেই চিন্তাতেই সে তখন আত্মহারা। সত্যব্রত রমেন্দ্রকে টানিতে টানিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা গৃহের বাহির হইতে না হইতেই গৃহখানির অস্তিত্ব জলতলে লুপ্ত হইল। বাটীর পুরাতন অংশ ত্যাগ করিয়া তখন সকলে নূতন অংশে চলিয়া গেল।

সেই অংশের অনতিদূরে অহিশেখরের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। সুতরাং কুটীরবাসেই তাঁহাকে তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। সেই কুটীর-স্বামী হরকুমারের কন্যা মনোরমার

সহিত রমেন্দ্রকিশোরের বিবাহের কথা পরলোকগতা শিবসুন্দরী একপ্রকার স্থির করিয়াছিলেন। পিসীমাতার অন্তিমশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রমেন্দ্র-কিশোর সে বিবাহ-প্রস্তাবে যে সম্মতি দান করিয়াছিল, তাহাও বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে।

যাহা হউক, আপাততঃ তাহা অবান্তর কথা। সেই কুটীর হইতে করুণ বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল। সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া এবং একটা ভারীদ্রব্য পতনের শব্দ শ্রবণ করিয়া রমেন্দ্রকিশোর প্রভৃতির বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে, কুটীরখানি জলতলগত হইয়াছে। হরকুমার তখন চীৎকার করিতেছেন—"কে আছ, ওগো বাঁচাও।"

দারুণ অন্ধকারে সে কুটীরের অবস্থা কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইল না। কেবল করুণ আর্ত্তনাদ সকলকে জানাইয়াদিল, হরকুমারের মাথা রাখিবার আর স্থান নাই—সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে।

সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া রমেন্দ্র ও সত্যব্রত, অহিশেখরের মুখের দিকে একবার চাহিল মাত্র। অহিশেখর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"দেখ, যদি কিছু ক'র্‌তে পার। আমার দ্বারা কিছু হওয়া ত এখন একপ্রকার অসম্ভব।"

রমেন্দ্র ও সত্যব্রতের মধ্যে তখনই কি একটা ইঙ্গিত হইয়া গেল। তাহারা বাটীর প্রাঙ্গণস্থ জল ভাঙ্গিয়া "পালকী ঘর" হইতে "শালৃতি" আনিতে ছুটিল। আর্ত্তনাদের মাত্রা তখন অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। "শালৃতি" অন্বেষণের অবসর ও সুযোগও তাহারা গ্রহণ করিতে পারিল না। আর্ত্তনাদের শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাহারা উভয়েই জলে ঝম্প প্রদান করিল। রমেন্দ্র তখন আর শোকাচ্ছন্ন, অবসন্ন নহে, তাহার শরীরে তখন মত্তহস্তীর বল আসিয়াছে। সত্যব্রতও রমেন্দ্রকিশোরের উপযুক্ত বন্ধু। অভিন্নহৃদয় বন্ধুদ্বয় আর্ত্তনাদের শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই উচ্ছ্বসিত পঙ্কিল জলরাশি মথিত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। অহিশেখর ভাবিতে লাগিল—গয়ার পাপ যদি চিরদিনের জন্য বিদায় হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ভগবানের বিচার আছে।

রমেন্দ্র কিশোর ও সত্যব্রত যখন নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইল, তখন তথায় কুটীরের আর চিহ্নমাত্র নাই।

কুটীরস্বামী চীৎকার করিয়া বলিল—"ও গো বাঁচাও, বাঁচাও ঐ ঐ আমার বমা ভেসে যায়। গেল, গেল, বাঁচাও, বাঁচাও।"

নৈশান্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কেবল অনতিদূরে জলমধ্যে একটা শব্দ হইল—"বাবা।"

সিংহবিক্রমে রমেন্দ্রকিশোর জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিল এবং সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিমজ্জমানা মনোরমার ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সহসা রমেন্দ্রের মুষ্টিমধ্যে কি একটা পদার্থ আসিয়া পড়িল। রমেন্দ্র, মুষ্টি দৃঢ় করিল। সে অনুভবে বুঝিল, তাহা কেশগুচ্ছ। প্রাণপণে রমেন্দ্র তাহা আকর্ষণ করিল। আকর্ষিতা মনোরমা আকর্ষণকারী রমেন্দ্রের মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধা হইল। অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তাহারা জলস্রোতে ভাসিয়া চলিল—স্রোতের টানে তাহারা কূলের দিকে আর আসিতে পারিল না। পিসীমাতার কথা ইরম্মদগতিতে মনে পড়িতেই রমেন্দ্র কিশোর শিহরিত হইল।

হরকুমার ইতিমধ্যে মনোরমার মাতা সাবিত্রীকে লইয়া জলে ভাসিয়া পড়িয়াছিলেন। সত্যব্রত তাঁহাদের সহায়তা করিতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা স্রোতের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমেন্দ্র ও মনোরমা ভিন্ন অন্যান্য সকলেই সাঁতার দিয়া অতিকষ্টে অহিশেখরের বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনোরমার মাতা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"আমার ছেলে ?"

মাতার ক্রোড়ে শয্যাসমেত শিশুপুত্র ছিল। শিশুর শয্যা যেমন ছিল, তেমনই আছে—নাই কেবল শিশুটী। সন্তরণকালে সে স্রোতে জলে ভাসিয়া গিয়াছে। হরকুমার ও সাবিত্রীসুন্দরী অরুন্তুদ রোদনে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। সত্যব্রত চীৎকার করিয়া কহিল—"ওরে আমার পাঁচুও ঐ রকমে ডুবেছে রে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সত্যব্রত প্রভৃতি ভাবিয়াছিল, মৃত্যুমুখে পতিতা মনোরমাকে উদ্ধার করিয়া রমেন্দ্রকিশোর পশ্চাতে সাঁতার দিয়া আসিতেছে। সাবিত্রী ও হরকুমারও সেই আশাতেই এতক্ষণ কথঞ্চিৎ স্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘকাল অতীত হইলেও যখন তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল না, তখন সকলেই তাহাদের

জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমা যে দারুণ বিপদে পড়িয়াছে, সে কথা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। সত্যব্রত রমেন্দ্রের প্রাণ সংশয় বুঝিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। সাবিত্রী সুন্দরী ও হরকুমার পুত্র-কন্যার শোকে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সকলকে তখন সান্ত্বনা দিতে লাগিল—অহিশেখর। রমেন্দ্রকিশোর জলস্রোতে অদৃশ্য হওয়ায় অহিশেখর মনে মনে কিন্তু বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছিল—মধ্যে মধ্যে সে ভাব তাহার চ'খে মুখে যে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল না, এমন কথা বলিতে পারাযায় না। মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ লোকের নিকট তাহা গোপন রাখা বড় কঠিন। অহিশেখর তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যাহা হউক, তথাপি অহিশেখরের শোক ও সহানুভূতি-প্রদর্শনের মাত্রা হ্রাস হয় নাই, ইহাই মানব-চরিত্রের রহস্য। প্রভাতালোকেও রমেন্দ্র ও মনোরমার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন অহিশেখর সকলকে বুঝাইয় দিল—বন্যার স্রোতে তাহারা নিশ্চয়ই ভাসিয়া গিয়াছে এবং জলরাশিমধ্যে তাহাদের জীবন্ত সমাধি হইয়াছে।

ভীষণ জল-প্লাবনে গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর তখন জলমগ্ন। সে জলরাশি জলধির মত অনন্ত-বিস্তার। বন্যার স্রোত ও ঝ্যাত্যা-সংযোগে "জল-তরঙ্গ" তখন দুর্দ্দমনীয়। সেই তরঙ্গাবর্ত্তে পড়িয়াও রমেন্দ্রকিশোর মনোরমাকে পরিত্যাগ করে নাই। তরঙ্গমুখে দুইজনেই ভাসিয়া চলিয়াছে। পরার্থে কিশোরের শরীরে তখন দৈববল আসিয়াছে; জীবনরক্ষার্থে কিশোরী তখন অলৌকিক শক্তিতে শক্তিশালিনী। একখণ্ড কাষ্ঠমাত্র আশ্রয় করিয়া তাহারা স্রোতে কুটার মত ভাসিয়া চলিয়াছে। রমেন্দ্র বুঝিয়াছিল, তাহারা মরণের পথে অগ্রসর। মনোরমা ভাবিতেছিল—যখন সে শক্তিশালী পুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তখন তাহার আর মৃত্যুভয় নাই।

ভাসিতে ভাসিতে তাহারা একস্থানে একটা উচ্চ বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইল। বৃক্ষের কতকাংশ জলে ডুবিয়াছিল। প্রভঞ্জন-বিধ্বস্ত বৃক্ষের কয়েকটী শাখা-প্রশাখা জলোপরি নমিত হইয়া পড়িয়াছিল। রমেন্দ্রকিশোর সেই উচ্চ বৃক্ষের একটী নমিত শাখা আপনি ধরিল এবং মনোরমাকেও ধরিতে কহিল। তৎপরে তাহারা অতিকষ্টে বৃক্ষাগ্রভাগে উঠিতে সমর্থ হইল।

বৃক্ষশাখায় আশ্রয় পাইয়া পরিশ্রান্ত রমেন্দ্রকিশোর পরিশ্রান্তা মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আশ্রয় ত মিলিল, কিন্তু তোমায় রক্ষা করিতে পারিব কি?"

সে প্রশ্নের উত্তরে মনোরমা কোনও কথা না কহিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার চাহিল মাত্র। রমেন্দ্র তাহার আর্দ্রকেশের সরল গুচ্ছ বাম হস্তে ধরিয়া জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল—"ভয় নাই,—আশ্রয় যখন মিলিয়াছে, তখন বোধ হয়, আমরা নিরাপদ।" ইঙ্গিতে মনোরমা সে কথার সমর্থন করিল।

সাবধানে ও সুকৌশলে বৃক্ষশাখায় বসিয়া রমেন্দ্র ও মনোরমা তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

তরুবরের আশ্রয়ে আশ্রয় লাভ করিয়া মনোরমা দেখিতে লাগিল, অসীম জলরাশি—দূরে অতিদূরে আকাশ-মণ্ডলে মিশিয়া গিয়াছে। সে দৃশ্য মহান্ হইলেও ভীতিপ্রদ। মনোরমা যখন জলে ভাসিতেছিল, তখন এ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হয় নাই—তাহা দেখিবার সে অবসর পায় নাই। বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখিয়া সে শিহরিতা হইল। তখন সে বুঝিল, কি ভয়ঙ্কর স্থানে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের পরিণামই বা কি! সে স্থান হইতে বাটী ফিরিবার আশা যে এক প্রকার দুরাশা; তখন সে তাহা এক প্রকার অনুমান করিয়া লইল। ভয়প্রযুক্ত বৃক্ষ-শাখা হইতে কিশোরীর পতনের ভয় ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া রমেন্দ্রকিশোর কিশোরীর কটিদেশ ধারণ করিল। মনোরমা তখন ভয় ও শান্তিপ্রযুক্ত দুর্ব্বল ও ভয়ে মূর্চ্ছিতাপ্রায়। রমেন্দ্রকিশোরও শোকে অনশনে ও সন্তরণ-জনিত অতিরিক্ত পরিশ্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সে পুরুষ— কর্ত্তব্যসাধনে তাহার মানসিক বলও অপরিমেয়। মানসিক বলের সাহায্যে তাহার শারীরিক বলের অভাব দূর হইল। মানসিক বলের এমনই প্রতাপ! ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বিপদ্মুক্ত হইতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

রমেন্দ্রকিশোর ভাবিয়াছিল, কোনও প্রকারে রাত্রিটা যদি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে আর বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে না। রাত্রির মধ্যে যে "জল নিকাশ" হইয়া যাইবে, এমন আশা সে অবশ্য করিতেছিল। তাহা কিন্তু হতাশের আশা! তথাপি জীবন থাকিতে কে আশা ত্যাগ করিতে পারে?

কিন্তু হায়, রমেন্দ্রের সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। যে বৃক্ষে তাহারা আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সে বৃক্ষ আর তাহাদের আশ্রয়-প্রদানে সমর্থ হইল না। জলস্রোতে বৃক্ষমূল শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। অনুভূতি শক্তিতে রমেন্দ্রকিশোর বুঝিল, বৃক্ষকাণ্ড ধীরে ধীরে জলের দিকে হেলিয়া পড়িতেছে।

রমেন্দ্র স্থির করিল, সে বৃক্ষাশ্রয়ে থাকিয়া আর কোনও লাভ নাই বরং আশু প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে। মূলোৎপাটিত হইয়া মহাবৃক্ষ জলে পড়িয়া যাইলে তাহাদের প্রাণ রক্ষার আর উপায় থাকিবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া মনোরমাকে লইয়া সে পুনরায় জলে ঝম্প প্রদান করিতে প্রস্তুত হইল।

রমেন্দ্রের উদ্দীপনায় এবং তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় মনোরমা একটু প্রকৃতিস্থা হইল। মনোরমা যদিও বুঝিল, মৃত্যুর কবল হইতে তাহাদের আর নিস্তার নাই, তথাপি সে জীবন-রক্ষায় ঔদাস্য করিতে পারিল না। জীবের ধর্ম্মই এই। সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে এক "আত্মঘাতী" ভিন্ন অপর কেহ বড় স্বীকার করে না। মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম জীবের স্বভাব-সিদ্ধ, স্বাভাবিক নিয়মে মনোরমা শক্তি সঞ্চয় করিল। রমেন্দ্রকিশোর তাহাকে লইয়া বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশ্রয়দাতা তরুবরও জলশায়ী হইল। তখন জলের স্রোত প্রবল। বৃক্ষও ভাসিয়া, গেল আর রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমাও ভাসিয়া চলিল

একাদশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই জল-তরঙ্গ, আবার সেই অকূল পাথার, আবার সেই সাঁতার! অকূলে কূল পাইতে অনেক প্রাণীই ভাসিয়া চলিয়াছে, অনেক শবদেহও ভাসিয়া যাইতেছে, অনেক বৃক্ষলতা এবং তৃণসংযুক্ত মৃত্তিকাস্তূপ ও ভগ্ন কুটীরের অংশবিশেষ স্রোতোবেগে ভাসিতেছে। তখন দেবতার দয়া নিষ্ঠুরতায় পরিণত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যে বিভীষিকার ছায়া পড়িয়াছে। তখন চেতন ও অচেতন উভয়েরই এক অবস্থা—উঠিতেছে, ডুবিতেছে, মরিতেছে, ভাসিতেছে। তখন আশ্রয়ের জলরাশি উদার হইয়াও অনুদার; দ্রব হইলেও প্রস্তর-কঠিন; হিম শীতল হইলেও জ্বালাময়। কারণ অপ তখন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সংহারব্যাপারে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে—কিন্তু অ-দার্শনিকের তাহাতে সুখ কোথায়?

সেই প্রলয়-পয়োধি জলে ভাসিতে ভাসিতে রমেন্দ্র ও মনোরমা মরণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের জীবনের আশা যে আর নাই, তাহা

তাহারা বিলক্ষণই বুঝিতে পারিয়াছিল। তথাপি আশা কুহকিনী। আশার কুহকে আশায় আশায় তাহারা ভীষণ জলতরঙ্গের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। মরণের পথের পথিক তাহারা,—দিক্‌শূন্য দিগন্তে ভাসিয়া যাইতে আর তাহাদের তেমন ভয় রহিল না।

মনোরমার দৈহিক শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, হস্ত পদ শিথিল হইয়া পড়িতে-ছিল—সে আর সন্তরণ করিতে পারিতেছিল না—রমেন্দ্রকেই তাহাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু রমেন্দ্রও ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সে ভার আর কতক্ষণ সে বহন করিতে পারে? সেও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। শোকে, অনশনে ও দৈবদুর্ব্বিপাকে সে পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া-ছিল, এইবার সে একবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িল। প্রকৃতির ভীষণতার বিরুদ্ধে আপনাকে ও মনোরমাকে সে আর কতক্ষণ রক্ষা করিবে। সে বুঝিল, এই স্থানেই তাহাদের শেষ—এই স্থানেই তাহাদের বিদায়—এই স্থানেই তাহাদের সমাধি।

প্রাণপণে রমেন্দ্রকিশোর দক্ষিণ বাহুমধ্যে মনোরমাকে চাপিয়া ধরিল। তাহার মনের ভাব—মরিতে হয়, তাহারা দুইজন একত্রে মরিবে। মনোরমা তাহার আশ্রিতা—একাকিনী সে জলমগ্না হইবে কেন? যখন মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তখন আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতা একা একা মরিবে কেন—উভয়ের একসঙ্গে মৃত্যুই শ্রেয়। কে জানে ইহা কেমন বন্ধন, কেমন সহানুভূতি, কেমন যুক্তি, কেমন বিচার!

সে যাহা হউক, সকল যুক্তি, সকল বিচার রমেন্দ্র কিশোরের নিকট পরাজয় মানিল। মনোরমার সহিত রমেন্দ্র মরিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে—কে তাহা তখন নিবারণ করে।

কিন্তু নিরুপায়ের উপায় ভগবান্; ভগবান্ তাহাদের রক্ষা করিলেন। স্রোতোবেগে একখণ্ড কাষ্ঠ তাহাদের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রমেন্দ্র কাষ্ঠখণ্ডখানি ধরিয়া ফেলিল এবং মনোরমাকেও তাহা ধরিতে বলিল। মনোরমা তখন মৃতপ্রায়। তথাপি জীবনের আশায় সে বহুকষ্টে ধরিল। কাষ্ঠখণ্ডের উপর দেহের ভার রক্ষা করিয়া তাহারা উভয়ে ভাসিয়া চলিল। অসীম বিস্তৃত জলরাশির উপর ভাসিয়া যাওয়ার তাহাদের আর বিরাম নাই।

কাষ্ঠখণ্ডখানি আশ্রয়স্বরূপ পাইয়া তাহারা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিল বটে,

কিন্তু বিশেষ বল সঞ্চয় করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, শীতাধিক্য বশতঃ তাহারা বরং দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছিল। তবে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহারা কাষ্ঠখণ্ডখানি ধরিয়া রহিল। সেই অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে যাইতে তাহারা উভয়েই ক্রমে চৈতন্য হারাইল। কিন্তু কাষ্ঠখণ্ড তাহারা ত্যাগ করে নাই। আকর্ষণবলে অচৈতন্যাবস্থাতেও কাষ্ঠখণ্ড তাহাদের হস্তমধ্যে আবদ্ধ ছিল। আকর্ষণবলেই আলিঙ্গনাবদ্ধ কাষ্ঠখানি তাহাদের আলিঙ্গন-চ্যুত হয় নাই।

রমেন্দ্র ও মনোরমা যখন সেইরূপ অবস্থায় তরঙ্গের মাথায় মাথায় ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাদের অনতিদূরে কয়েকখানি নৌকার উপরে কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক দাঁড়াইয়া অসহায়ের সাহায্যার্থে আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল। চাউল, বস্ত্র, চিপীটক প্রভৃতি তাহাদের নৌকায় যথেষ্টপরিমাণে সঞ্চিত ছিল। সেই সমস্ত দ্রব্যাদি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিবার জন্য এবং মজ্জমান ব্যক্তিদিগকে জল-সমাধি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পুণ্যাধার সেবকবৃন্দ জলে জলে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন সেবক ভাসমান রমেন্দ্রকে লক্ষ্য করিল এবং তাহার উদ্ধারার্থ তাহারা একখানি নৌকা লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের উদারতায় রমেন্দ্র ও মনোরমা জলসমাধি হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

রমেন্দ্র ও মনোরমাকে যখন নৌকার উপর উঠাইল, তখন তাহাদের শরীর হিম-শীতল, নাসিকারন্ধ্রে আর শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না, তাহাদের জীবনের তখন আর কোনও লক্ষণই নাই। তাহাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডখানি অপসারিত করিতে যাইয়া সেবকগণ দেখিল,—সেখানি কাষ্ঠ নহে—কোনও অভাগার মৃতদেহ। সে দৃশ্যে সেবকগণের মধ্যে অনেকেরই দেহ কণ্টকিত হইল।

যাহা হউক, "শব-কাষ্ঠ" ফেলিয়া দিয়া তাহারা রমেন্দ্র ও মনোরমাকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়াগেল। কারণ তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"এখনও এদেহ জীবনশূন্য নহে।" অন্যান্য সেবকগণ স্ব স্ব নৌকায় থাকিয়া—স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। সে সেবা অলৌকীক, অতুলনীয়।

ক্রমশঃ

প্রায়শ্চিত্ত।

লেখক—শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার বি এল,

ভীমবাঁধের উষ্ণহ্রদের প্রাত্যহিক সন্ধ্যাধূম তখন সবেমাত্র পর্ব্বতগাত্র অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল, অচিরেই চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিবে। পশ্চিমাকাশে লোহিত সূর্য্য পর্ব্বতমালায় কুব্জস্কন্ধের অন্তরালে ধীরপদে অস্ত যাইতেছিল। রঞ্জিতরশ্মি, পর্ব্বতগাত্রসংলগ্ন পথস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড-গুলিকে এবং সেই পথগামী তিনটী মনুষ্যমূর্ত্তিকে তখন পর্য্যন্ত ধূমঘোরে অদৃশ্য হইতে দেয় নাই। অলস, নিশ্চিন্ত, কিন্তু নির্ভীক ও নিয়মিত পদপ্রক্ষেপ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা স্থানীয় সাঁওতালত্রয়।

তীর্থযাত্রীর ন্যায় তাহারা চলিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান সত্ত্বেও বোধ হয় একই দলভুক্ত। একের সহিত অপরের যে বিশেষ সৌহার্দ্দ অথবা ঘনিষ্ঠতা আছে, এরূপ আভাসও পাওয়া যায় না। নীরব গম্ভীর মুখগুলি গোধূলির রক্তিমালোকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রথম, একটি ঊনবিংশ বর্ষীয়া যুবতী, স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের প্রতিমা, অস্তাচলগামী সূর্য্য স্বীয় কিরণে তাহার লালিত্য আরও সুন্দররূপে প্রতিফলিত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয়, একটি সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক—স্বজাতীয় গৌরব। হস্তদ্বারা একটি অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে চলিতেছে। সর্ব্বপশ্চাতে আর একটি যুবতী—বয়স একবিংশতি হইবে। দৈহিক সৌন্দর্য্য বিশেষ নাই বলিলেই হয়। মুখখানিতে কিন্তু এমন একটি ভাব ছিল যে, চাহিয়া দেখিলেই সহানুভূতি দেখাইতে ইচ্ছা হয়। হতাশাকাতর চক্ষুদুটি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট। ভগ্নী বেলাও তাহার পশ্চাদনুগমনে আরও অধিক কাতর ও ম্লান। মুন্নাকে উপেক্ষা করিয়া মেলার দিকে চাহিয়া বেলা কহিল।—"মেলা, পাহাড়ের নীচে ধানের ক্ষেতে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বল্ ত ?"

মুহূর্ত্তমাত্র মুন্নার স্বল্পারক্তমুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ভগ্নীর দিকে চাহিয়া মেলা কহিল—"তা কি জানি ! বোধ হয় নান্নির সঙ্গে।"

"তোর মুণ্ডু, নান্নিই বটে ! দূর্ ! মিকার সঙ্গে রে মিকার সঙ্গে।"

হিংসাপীড়িত কণ্ঠে মুন্না কহিল।—"সে অপদার্থটা সহর থেকে ফিরে এসেছে না কি ?"

বেলা। "অপদার্থ কি রকম? সে এখন বেশটি হয়েছে, পোষাক পরে, সহরের লোকের মত কথা কয়, হাতে আংটি পরেছে। আমার কাপড় ছেঁড়া ময়লা বটে, কিন্তু সে যখন আমার সঙ্গে ডেকে কথা কইলে, তখন আর আমার লজ্জা থাক্‌ল কই, সত্যি বল্‌ছি মুন্না, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।"

মুন্নার মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিল। "সে কি বল্‌ছিল?"

প্রগল্‌ভার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দৃষ্ট হইল। নিরুপায় মেলা নিজবক্ষে হস্তস্থাপন করিল। "আমাকে কি বল্‌ছিল সে কথায় তোমার কাজ্ কি বল ত?"

স্বর ঘৃণাবিজড়িত। ক্ষিপ্রহস্তে পার্শ্বস্থিত তৃণপুষ্প চয়ন করিয়া কুঞ্চিতকেশ-রাশির মধ্যে ঈষৎবক্রভাবে স্থাপন করিয়া বেলা মৃদুস্বরে একটি সুর আলোচনা করিতে করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। মনের আনন্দে সে উষ্ণহ্রদের তীরবর্ত্তী উপলখণ্ড অতিক্রম করিয়া চকিতা হরিণীর ন্যায় লম্ফপ্রদান করিয়া চলিতেছিল। ভয়পীড়িত মুন্না চীৎকার করিয়া কহিল—"বেলা, বেলা, ফুটন্ত জলের ধার দিয়ে লাফিয়ে যেও না, পড়েগেলে, আর দেখ্‌তে পাব না।" অশ্বরজ্জু ত্যাগ করিয়া নিমেষের মধ্যে বেলার নিকটবর্ত্তী হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মুন্না কহিল—"তোমার কি ভয় নেই? পড়েগেলে যে একদণ্ডও বাঁচ্‌বে না, তাকি জান না?"

ভীতনয়নে মেলা একবার সেই উষ্ণহ্রদের দিকে চাহিয়া দেখিল, শিহরিয়া উঠিল, পরে পরিত্যক্ত অশ্বরজ্জু ধারণ করিল, মুন্নার হস্তের উষ্ণতা তাহাতে তখনও বর্ত্তমান। সে উষ্ণতা যুবতীর রক্তসঞ্চালন দ্রুত করিল। কাতরভাবে স্বীয় শীর্ণ কপোল একবার অশ্বের স্কন্ধে স্থাপন করিল, পরমুহূর্ত্তেই লজ্জিত মুখ-খানি উত্তোলন করিয়া, নীরবে অবনতবদনে ভগ্নীর ও ভগ্নীর প্রেমার্থীর পার্শ্ব দিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী দেখিয়া বেলার ক্রুদ্ধ তিরস্কার শান্ত হইল ও মুন্নাকে তাচ্ছিল্য করিয়াই যেন সে ভগ্নীর হস্তমধ্যে স্বীয় হস্তস্থাপন করিয়া চলিয়াগেল। বিচলিত মুন্না সজোরে অশ্বরজ্জু আকর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। অশ্ব বুঝিল, তাহার প্রভু প্রকৃতিস্থ নহেন।

অনতিদূরে একটি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর, অধিকাংশ কৃষকেরা এইরূপ কুটীরেই বাস করিয়া থাকে। সকলেই সেই কুটিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া মিলিত

হইল। মেলা দেখিল মুন্নার মুখশ্রী ক্লান্তিবশতঃ আরও অধিক সুন্দর দেখাইতেছে। মুন্না ক্ষুন্নভাবে কহিল,—"বেলা, আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছিলাম, তোমার কি তাতে রাগ করা উচিত?"

বেলা। মনের ভাব যাই থাকুক, কথাগুলো খুব ভাল বলে আমার মোটেই বোধ হয় নি।

মুন্না। অন্যায়টা কি বলেছিলাম বলত? "ছিপেমাছ গাঁথিলে একটু খেলাইবার ইচ্ছা স্বতঃসিদ্ধ। বক্রদৃষ্টিতে মুন্নার দিকে চাহিয়া বেলা কহিল— "সে কথা মিথ্যে নয় মুন্না, এই বিশেষ অন্যায় যে বল্‌ছিলে তা বল্‌তে পারি কই?"

পার্ব্বতীয় রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হইয়া যুবার নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত এক অদ্ভুত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিল, আর যায় কোথা, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অনুরোধের সহিত মুন্না কহিল,—"তবে বেলা, তুমি রাগ কর নি? বল, তা হ'লে খাবার পর আমার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াবে।"

বেলা তাহার সুগঠিত মুখখানি ঈষৎ বিরক্তির সহিত নত করিল, ভগ্নীর মনোভাব অনুভব করিয়া বেলা ঈষৎ কম্পিত হইল।

মুন্না। তোমার গতিক দেখে বোধ হ'চ্ছে তুমি যাবে না।

বেলা। যাবনা কি?

মুন্না। হাঁ বেলা, যেতেই হবে, নইলে আমি বড়ই দুঃখিত হব।

বেলা। তা, গেলেও হয়—

মুন্না। সত্যি বল্‌ছ? না, তুমি যাবে না, ঠিক্ কাল্‌কের মত আমাকে হতাশ কর্‌বে, পরশুও ত ব'লে শেষে গেলে না।

বেলা। সে রকম আজ না কর্‌তে পারি, কাল ত আর আজ নয় যে, কাল যা করেছি আজ তাই কর্‌তে হবে? উচ্চহাস্যে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া বেলা স্থানত্যাগ করিল ও অচিরে কুটীরমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিহ্বল মুন্না সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ক্রুদ্ধ মেলা দেখিল, মুন্না মন্ত্রমুগ্ধ। ক্ষণেক পরে নীরবে অশ্বরজ্জু ধরিয়া মেলার দিকে না চাহিয়াই মুন্না চিন্তিতবদনে চলিয়াগেল। কুটিরে প্রবেশ করিয়া মেলা দেখিল, বেলা আহারে নিযুক্ত, পার্শ্বস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার আলোকে তাহার মুখখানি একটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বন্যকুসুমের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া সে বেলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ও কর্কশস্বরে কহিল,—"বেলা, আজ ওর সঙ্গে

বেড়াইতে যাবি কি না, ঠিক ক'রে বল্" বেলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভগ্নীর মুখের দিকে তাকাইল। ওরূপ স্বর সে এ পর্য্যন্ত মেলার কণ্ঠে শ্রবণ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না; তার পরে কহিল—"আমি যাই না যাই তাতে তোর কি মেলা ?"

মেলা। আমার জানা দরকার।

বেলা। কেন বল্ত ?

মেলা। আমার ইচ্ছে,—যাবি কিনা তাই বল্।

বেলা। যদি না যাই।

মেলা। তা হ'লে জান্ব যে তুই—একটা তুই—

বেলা। একটা কি ?

মেলা। সত্যি বল্ না, যাবি কি না ?

বেলা। মেলা, আজ তোর হয়েছে কি বল্ ত ? পৃথিবীতে মুন্না ছাড়া আর কি মানুষ নেই না কি ? মেলার রুদ্ধ ক্রোধ নয়নে প্রকাশ পাইল, কাষ্ঠবৎ কঠিন হইয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল—"সত্যি করে বল্।"

বেলা। শুন্বি ? আমি যাব না, ওর জন্যে আমার চোখে ঘুম্ নেই কি না ?

মেলা। সে একলা এই আঁধারে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদ্বে, তাই তুই চাস্, কেমন ?

বেলা। বেশ ত, কাঁদুক না, তাতে আমার কি ?

মেলা। তোকে বোন্ বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা বোধ হয়, তা জেনে রাখ্!"

বেলা। কেন মেলা ? ওকথা বল্লি কেন ? বোধ হ'চ্ছে তুইই ওকে ভালবাসিস্ বলিয়া। বাঁধ ভাঙ্গিল, স্রোতের জল নদী পরিপূর্ণ করিয়াছিল, সামান্যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, অন্তরের প্রবাহ বন্যার ন্যায় বহির্গত হইল, মেলা রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল—"যদি ভালবেসেই থাকি ; তাতে অন্যায়টা কি হ'য়েছে বল্ত ?"

বেলা। ভাল, বেশ বলি কত দিন থেকে এরকম হয়েছে বল্ত ?

মেলা। তিন বছর থেকে, যে দিন প্রথম ঝরণার ধারে ও আমাদের সঙ্গে আলাপ করে, মনে পড়ে কি ? কেবল তোকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আমি চুপ করে বসেছিলাম। সেদিনের একটা কথাও আমি ভুলি নি, সেদিন থেকেই আমি ভালবেসে আস্ছি। শুনলি ত ? একবার মনে ভেবে দেখ্ যে, আমি

কি সুখে এই তিনবছর কাটিয়ে এসেছি। রোজ দেখি, তুই তাকে তাচ্ছিল্য কর্‌ছিস্, আর সে তোর পায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। সে তোর হাতে রোজ চুমো খায়, আমি সেই একটা পেতে মনঃপ্রাণ সব দিতে পারি—শুন্‌লি ? সে যখন হতাশ হ'য়ে তো'র মুখের দিকে চায়, তখন আমার মনে যে কি হয়, তা মুখে বলা যায় না। স্তব্ধ বেলা অবাক হইয়া চাহিয়াছিল, ক্ষণেক পরে কহিল—"তুই ওকে এত ভালবাসিস্ ?"

মেলা। হাঁরে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তার সুখের জন্যে আমি চোখের মণি খুলে দিতে পারি।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বেলা কহিল—

"মেলা, তুই আর আমি ত প্রায় মাথায় সমান নয় কি ?"

মেলা। কেন তাতে কি হবে ?

"দাঁড়া বল্‌ছি" বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষান্তর হইতে একটি মস্তকাবরণ আনয়ন করিয়া বেলা কহিল—"মেলা, বাইরে খুব অন্ধকার, সেও সেখানে একলাই থাক্‌বে, এইটে নে মাথায় দিয়ে নে।"

মেলা। বেলা, বেলা, তুই পাগল্।

বেলা। থাম্ মেলা, ন্যাকা হচ্ছিস্ কেন ? মুন্না সেখানে একলা দাঁড়িয়ে হা হুতাশ কর্‌ছে বই ত নয়! তা যদি সে আমার মুখখানা না পে'য়ে তোর মুখ খানা পায়, ত তার পক্ষে মন্দ হ'বে কি ? তুই চলে যা, আমি ঘরেই থাক্‌ছি। আবরণ বস্ত্রখানি মেলার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বেলা কক্ষান্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মেলার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, আশায়, ভয়ে, উৎসাহে তাহার মুখ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল—"না, বেলা, আমি তা পারব না, কি করি ? যাই ? যা থাকে কপালে, নরকে যাই যাব, এরকম সুবিধে আমি ছাড়্‌তে পারব না।"

নদীবেগাবনত ভূসংলগ্ন তৃণমুষ্টির ন্যায় মেলা প্রেমাবেশে অবনত। ভগ্নীর মস্তকাবরণে আবৃত হইয়া যখন সে অভিসারে অগ্রসর হইল, তখন বহিস্থ অন্ধকার তাহাকে সাহায্যার্থ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কাহারও সাধ্য ছিল না, সহসা সে পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারে। দ্রুতপদে উচ্চ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছে, পার্থিব বস্তুর সহিত তাহার যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা সে বিস্মৃত হইয়াছিল। একবিংশতি বৎসর ধরিয়া সে জনসমাগম-রহিত দুর্গমপ্রদেশে বিজন বিপিনস্থিত বন্যপুষ্পের ন্যায় ক্রমিত, পুষ্পিত ও

বিকশিত হইয়াছে, প্রকৃতির শোভায় পরিবেষ্টিত হইয়া সে স্বকৃত স্বোপার্জ্জিত মনো জগতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যে অপূর্ব্ব সংযমে সে এতকাল ধরিয়া বিনষ্ট হয় নাই, তাহা সকলের নিকট সহজে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শৈশবে স্বভাবের শোভায় লালিত পালিত হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালা নিজ হৃদয়ে যে স্বপ্নরাজ্য গঠিত করিয়াছিল,অজ্ঞাতে সে রাজ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতেছিল, তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিত না, জানিয়াও জানিতে ইচ্ছা করিত না। বোধ হইত যেন এই প্রাকৃতিক শোভা, রূপ, রস, গন্ধ, পর্ব্বত-শিখরস্থ উদয়-অস্ত ব্যতীত অন্য আরও কিছু আছে, যাহা ইহা অপেক্ষাও সুন্দর, ইহা অপেক্ষাও গরীয়ান্। প্রথম উপলব্ধিকালে কপোলযুগল রক্তিমাভ হইত, নির্ম্মল সূর্য্যকিরণে ছায়ার ন্যায় চক্ষের দৃষ্টি ক্ষণেকের তরে ম্লান করিত, কখনও বা অন্ধকার রাত্রে সুদূর পার্ব্বত্যধূমে মনোরম আলোকচ্ছটা আলেয়ার ন্যায় তাহাকে আকৃষ্ট করিত। ক্ষুধিত এই নবভাব বহির্জগতের সংস্রবে আসিতে চেষ্টা করিয়াও আসিতে পারিল না বটে, কিন্তু রুদ্ধ জলপ্রপাতের ন্যায় তাহার মনোজগতে একটি সতেজ, গভীর, পরিণত প্রেমনদী সৃষ্টি করিল। স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাহার স্নেহপুত্তলিকা অদ্য অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া দিবালোকে বহির্গত হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া মেলা দেখিল সম্মুখে বিশালকায় উষ্ণহ্রদ ধূম-রাশি উদ্গীরণ করিয়া ক্রমশঃ চতুর্দ্দিক্ ভীষণতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছে, মেলার হৃদয় বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, মস্তকাবরণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া স্থির নীরব নারীমূর্ত্তি প্রেমিকের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ; দ্রুত নিশ্বাস আরও দ্রুত হইল। অদূরে অন্ধকার হইতে শব্দ হইল। "মেলা, মেলা আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ? সত্যিই কি তুমি এসেছ ?"

রুদ্ধকণ্ঠে মেলা উত্তর করিল।—"হাঁ মুন্না, আমি এসেছি।" দুষ্ট ঠাকুরটি উভয়েরি বুদ্ধির উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিল। পার্থিব পার্থক্য তখন অপসৃত হয় নাই কিরূপে বলা যায় ? মেলার পক্ষে ত তখন তাহাদের তৃণকুটীর, বৃদ্ধা পিতামহী, এমন কি বেলার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বপ্নের গল্পবৎ বোধ হইতেছিল। উষ্ণহ্রদের ক্ষুদ্র বীচিমালা পাষাণে চলিয়া প্রেমগীতি গাহিতেছিল, কৃষ্ণ মেঘমালা কৃষ্ণ পর্ব্বতকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিতেছিল।

"মুন্না আমিই এসেছি, আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না।"

মুন্না। তোমাকে চিন্‌ব না ত কাকে চিন্‌ব বল, তবে মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে।

তুমি আস্‌বে আমি তা সম্ভব বলে ভাব্‌তে পারি নি তাই—তাই ; এস, ওখানে, আর দাঁড়িয়ে থেক না। এস জলের ধারে ওই বড় পাথরটার ওপর বসি, আমি এতক্ষণ ওখানেই বসে তোমার আশাপথ চেয়েছিলাম।” মস্তকাবরণ আরও দৃঢ়রূপে ধৃত হইল।

মেলা। এ কয়দিন ধরে তা হ'লে রোজই তুমি আমার অপেক্ষায় ছিলে ?

সোহাগভরে মেলার হস্ত ধারণ করিয়া মুন্না কহিল—“হাঁ বেলা. আমি রোজ তোমার অপেক্ষায় বসে থাক্‌তাম।” অতি যত্নে তাহাকে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসাইয়া মুন্না কহিল—“বেশী ধারে যেও না, জলে পড়ে যাবে, এস এদিকে সরে এস” হস্তাকর্ষণে অবশদেহ স্বতঃই সরিয়া আসিল। উভয়ে নীরব, উভয়েই বুঝিল, কি এক অজ্ঞাত শক্তিতে উভয়েই অবশ। “বেলা তোমাকে কত ভালবাসি তা তুমি জান কি ?”

মেলা। বল মুন্না, কত ভালবাস, একবার বল।”

মুন্না। শুন্‌বে! যখন মাটি খুঁড়ি, কোদাল তুলেই চেয়ে দেখি,চোখের সাম্‌নে তোমার মুখখানি, হাতের কোদাল হাতেই থাকে, মাটী দেখ্‌তে পাইনে। যখন আকাশের দিকে চাই,দেখি তুমি চারদিক্ ছেয়ে রয়েছ,আকাশ দেখ্‌তে পাইনে, আর যখন পূজো কর্‌তে বসি, তখন সম্মুখে তোমাকেই দেখি পূজোটা দেবতার উদ্দেশে হয় কই ? পৃথিবীতে তুমিই আমার সব বুঝ্‌লে ? কথাগুলি বলিতে মুন্নার মুখ এত নিকটে আসিয়াছিল যে, তাহার নিশ্বাস মেলার ওষ্ঠ স্পর্শ করিতে-ছিল, মেলা সে স্পর্শে কম্পিত হইতেছিল—“বল বেলা, তুমি কি আমাকে সেই রকম ভালবাস ?” কম্পিতহস্তে মুন্না মেলার মস্তকাবরণ স্পর্শ করিল, অন্ধকারে তাহার চক্ষের ভাষা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। অজ্ঞাতে মেলার হস্ত মুন্নার সে চেষ্টায় বাধা দিল, মেলার অবস্থা বর্ণনাতীত, পর্ব্বত, হ্রদ, অন্ধকার, ধূমরাশি তখন আর সে কিছুই দেখিতেছিল না। তাহার হৃদয়ভরা প্রেম ও তাহার প্রেমিকের অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য উপলব্ধি তাহার লোপ পাইয়াছিল।

“বল বেলা, তুমি কি আমাকে সেই রকম ভালবাস ?”

মুন্না আরও নিকটে আসিল, তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাহার স্পর্শে অনু-ভূত হইতেছিল, বোধ হইল নীরব, স্তব্ধ, আঁধার পৃথিবী উত্তরের অপেক্ষায় নিশ্চল রহিয়াছে--

“বল বেলা, বল একবার বল”

বেলা মৌনভাবে রহিল দেখিয়া মুন্না তাহার উভয় হস্ত ধারণ করিল।

"বল বেলা, তুমি ঠাট্টা করছ না বল"

স্তব্ধ নিশ্চল মেলা নড়িল না, মুন্নার প্রেমাতুর কণ্ঠস্বর তাহাকে স্পন্দরহিত করিতেছিল,কেবল হৃদয়ের স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুততর হইতেছিল "বল বেলা বল।"

হঠাৎ কৃষ্ণ মেঘের বক্ষে বিদ্যুৎরেখা দৃষ্ট হইল, ভীমগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। সে গর্জ্জনে প্রেমিকের প্রেমবহ্নি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"বেলা, বেলা মুখখানি তোল, আমাকে চুমো খাও" অশনিগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ তখনও কম্পিত হইতেছিল, মেলার হৃদয়ে তখন ঘাত-প্রতিঘাত বিষম আন্দোলন উপস্থিত, মেলা আর সহ্য করিতে পারিল না, ধৈর্য্যচ্যুত হইল, মনের আবেগে সে জীবনের সাধ পুরাইল, স্বীয় কম্পিত ওষ্ঠযুগল মুন্নার ওষ্ঠে স্পর্শ করাইল, মেঘ পুনরায় গর্জ্জন করিল। সেই সঙ্গে মেলা কহিল—"আর আমার দুঃখ নেই, আর কি?"

মুন্না। আছে বেলা, আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। মেলা বিষাদের হাসি হাসিল দেখিয়া প্রেমান্ধ মুন্না কহিল—"হাঁস্‌লে যে, আগেকার মত ঠকাচ্ছ না ত?"

মেলা মস্তক হেলাইয়া কহিল—"আমি দিব্য ক'রে বল্‌ছি মুন্না, আগে যাই করে থাকি না কেন, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি, জীবনে মরণে আমি তোমারি।"

মুন্না। তা হ'লে তুমি আমাকে বিয়ে করবে? আমার স্ত্রী হবে? বল।"

মুদিতনেত্রে পর্ব্বতগাত্রে মেলা দেহভার ন্যস্ত করিল, প্রকৃতির ভীষণ অন্ধকারে সে স্বীয় উচ্ছ্বসিত প্রেমের পরিণতি আলোক দেখিতে পাইয়াছে, প্রেমিক তাহার হস্তপ্রার্থী, প্রেমিকের নিশ্বাস ওষ্ঠে অনুভব করিয়াছে, প্রেমাবেশে সে উভয় হস্ত প্রসারিত করিল, মস্তকাবরণ স্কন্ধে পতিত হইল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না, স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ক্ষীণস্বরে মেলা কহিল— "মুন্না, মুন্না, তুমি আমাকে ভালবাস? বল, আবার বল, আর একবার আমায় চুমো খাও" সে করুণ, আর্ত্তস্বর মুন্নার হৃদয় স্পর্শ করিল, তাহার শরীর কম্পিত হইল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল, পুনরায় মেলা ডাকিল "মুন্না—" মুন্না আর স্থির থাকিতে পারিল না, মেলাকে বক্ষে টানিয়া লইল ও জগৎ বিস্মৃত হইয়া উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, মেলার মুখ অনাবৃত, উষ্ণহ্রদের নিবীড় ধূম তখনও উভয়কে আবৃত করিয়া রহিয়াছে—হঠাৎ পুনরায় আকাশে

নিয়তির অগ্নি প্রজ্জলিত হইল। বিদ্যুতালোকে উভয়ে উভয়ের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইল ও পরমুহূর্ত্তেই মুন্না মেলাকে ঘৃণিত কুক্কুরশাবকের ন্যায় পর্ব্বত-গাত্রে নিক্ষেপ করিল। স্থির ভাবে মেলা ক্ষণেক পতিতা থাকিয়া উত্থিত হইল। তাহার সুপ্ত আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্তে জাগ্রত হইল, ধীরকণ্ঠে সে কহিল—"আমাকে চিনেছ?" ক্রুদ্ধস্বরে মুন্না কহিল—"চিনিনি? অনেক বিবেচনা করে তোমার এই কাজের প্রতিশোধ নিচ্ছিনে।"

মেলা। না মুন্না, তোমার প্রতিশোধ নেবার দরকার নেই, আমি নিজেই আমার হীনবুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি। যদি কখনও আমার কথা মনে পড়ে ত তখনি সে ভাবনা দূর করে দিও, সুধু মনে রেখ যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করেছি, আর নিজ ইচ্ছায় করেছি—"বিচলিত মুন্না বুঝিতেও পারিল না, কখন মেলা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে, বিদ্যুতালোকে মেলার অনুপস্থিতি অনুধাবন করিয়া তাহার উত্তেজিত ক্রুদ্ধ ও উত্তপ্ত অন্তঃকরণে তুষারবর্ষণের ন্যায় ভীতির সঞ্চার হইল, ডাকিল, "মেলা এদিকে এস, অন্ধকারে যেও না" দূরে ক্ষিপ্র পদশব্দ ব্যতীত অন্য কোনই উত্তর সে পাইল না, সেই শব্দের দিকে ফিরিয়া সে পুনরায় ডাকিল "এদিকে এস মেলা" পুনরায় বিদ্যুৎ দেখা দিল, ত্বরিৎপদে উচ্চহ্রদের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার অনুমান কার্য্যে পরিণত হইয়াছে—আর্ত্তস্বরে ডাকিল "মেলা, মেলা।" আকাশে গভীর গর্জ্জন মাত্র সে কথার উত্তর দিল, একবিন্দু বৃষ্টি তাহার কপোলে পতিত হইয়া অশ্রুবিন্দুর ন্যায় গড়াইয়া গেল, অন্য কোনও উত্তর সে পাইল না।

শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার

"দেবযানী"।

লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

(১)

সে অনেক দিনের কথা। তখন সমুদ্রমন্থনও হয় নাই—অমৃতও উঠে নাই, সুতরাং দেবগণও অমর নামের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তখন প্রায়ই দেবাসুরে যুদ্ধ হইত। দেবগণের যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহারা আর বাঁচিতেন না, কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের সঞ্জিবনী-মন্ত্র-প্রভাবে দৈত্যসৈন্য যতই কেন মরুক না, আবার সকলে বাঁচিয়া উঠিত; সুতরাং

দিন দিন দেবগণ দুর্ব্বল ও দৈত্যগণ সবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কাজেই দেবগণের বড় চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। পরিশেষে সকলের পরামর্শে দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র পুত্র কচকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সঞ্জিবনী-মন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হইল; কচ্ প্রফুল্ল অন্তরে দেবতাদের মঙ্গলার্থ দেবগণের চিরশত্রু শুক্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চলিলেন।

শুক্রাচার্য্যের একটীমাত্র কন্যা ব্যতীত সংসারে আর কোনও বন্ধন ছিল না। তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যার নাম ছিল দেবযানী। দেবযানী রূপলাবণ্যে অতুলনীয়া। শুক্রাচার্য্য কন্যাগত প্রাণ ছিলেন। বাহিরে শুক্রাচার্য্য যতই কঠিন হউন না কেন, কন্যার নিকটে তিনি তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। তাঁহার সেই একমাত্র সংসারের বন্ধন আদরিণী কন্যার সন্তোষার্থ তিনি না করিতে পারেন এমন কার্য্যই ছিল না।

(২)

দিবাবসানে শুক্রাচার্য্য আদরিণী কন্যা দেবযানীর সহিত বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সৌম্য-দর্শন, সুগঠিত দেহ কিশোর কচ্ তথায় উপস্থিত হইয়া করযোড়ে শুক্রাচার্য্যের চরণে সভক্তি প্রণত হইল। স্বর্গবাসী কিশোর কচের সেই মোহন দেবমূর্ত্তি দর্শনে পিতাপুত্রী যুগপৎ বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। সুতরাং অতি অল্পায়াসেই কচ শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারিলেন। কচ্ বড় ভালছেলে, তিনি যেমন গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, তেমনই গুরুদেবের একমাত্র আদরিণী কন্যা দেবযানীর সন্তুষ্টিবিধানার্থ চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করিতেন না। সুতরাং অতি সত্বরই কচ্ তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কচের প্রাণপণ সেবা যত্নে বালিকা দেবযানী তাঁর বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। দেবযানীর কচ্ না হইলে চলে না; তাঁর প্রতি কার্য্যে এখন কচের সাহায্য আবশ্যক। গুরুগৃহে কচ্‌কে গোপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অবসরসময়ে তিনি দেবযানীর খেলার সামগ্রী, মালা গাথিবার পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া দেবযানীর কোমল বালিকা-মনের উপর বেশ একটা অজ্ঞাত মধুর স্নেহের অধিকার বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সত্বর দেবকার্য্য সমাধায় সক্ষম হন।

দৈত্যগণ যখন বৃহস্পতিপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যভাবে গোচারণরত

দেখিল, তখনই তাহারা বুঝিল, ইহা তাহাদের সঞ্জিবনী-মন্ত্র চুরির অব্যর্থ দেব-কৌশল, সুতরাং তাহারা কচ্‌কে হত্যা করিল। সময়ে কচ্‌কে স্বগৃহে আসিতে না দেখিয়া দেবযানীর বালিকাহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি পিতার মন তদ্দিকে আকর্ষণ করিলেন। ধ্যানযোগে শুক্রাচার্য্য কচের মৃত্যু অবগত হইলে কন্যার আব্‌দারে তাহাকে সে যাত্রায় জীবিত করিলেন। কচের ভক্তিতে শুক্রাচার্য্যও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। আবার একদিন দৈত্যগণ একত্র হইয়া যুক্তি করতঃ কচ্‌কে হত্যা করতঃ ভস্মে পরিণত করিয়া ঐ ভস্ম সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্য্যকে পান করাইলেন, কারণ তাহা হইলে আর কচের জীবনের আশা রহিল না। আবার দেবযানীর আকুল-ক্রন্দনে ও কচের মায়ায় মুগ্ধ শুক্রাচার্য্য তাঁহার মৃত্যু অবগত হইয়া সঞ্জিবনীমন্ত্র প্রভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে নিজ উদরস্থ কচ্ গুরুদেবের উদর বিদীর্ণ করিয়া কি প্রকারে বাহির হইবে এইকথা বলায় গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কচ্, তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবেশ করিলে?" সুরাসহ ভস্মসাৎ কচকে উদরস্থ করিবার সংবাদ অবগত হইয়া ক্রোধান্ধ শুক্রাচার্য্য আরক্ত-নেত্রে শাপ প্রদান করিলেন যে,—"যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে, সে অব্রাহ্মণ" তাই হিন্দুর,—ব্রাহ্মণের,—সুরাপান নিষিদ্ধ। দেবযানীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আপনার প্রাণের টানে পরন্তু দৈত্যগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কচ্‌কে সঞ্জিবনী-মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক নিজ উদর বিদীর্ণ করতঃ বাহির হওয়ার আদেশ দিলেন; কচ্ মুহূর্ত্তে বহির্গত হইয়া পুনঃ সেই গুরুদত্ত অব্যর্থ মন্ত্রপ্রভাবে গুরুদেবকে জীবিত করিলেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে কচ্ যখন গুরুস্থানে স্বর্গ-গমন-বাসনা প্রকাশ করিয়া বিদায়ান্তে দেবযানীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন, তখন দেবযানী বলিলেন—"কচ্, তোমার যাওয়া হইবে না; তোমার অভাবে আমার বড় কষ্ট হইবে।" কচ্ বলিলেন—"দেবযানি, তাকি সম্ভব? আমি যে দেবগণের জন্য সঞ্জিবনী-মন্ত্র লইয়া যাইতেছি; দেবতাদের মঙ্গলই যে আমার একান্ত কাম্য। আমি কি স্বর্গ্ ছাড়িয়া থাকিতে পারি?" দেবযানী বলিলেন,—"কচ্, যদি এমন করিয়া চলিয়া যাইবে জানিতাম, তাহা হইলে তোমাকে দুই দুইবার কি পিতার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও বাচাইতাম? তাহা হইবে না। কচ্, আমি তোমার সঙ্গে না হয় স্বর্গেই যাইব।" কচ্ বলিল,—"সে অসম্ভব দেবযানি, গুরুদেব তোমাকে যাইতে দিবেন কেন? তারপর তোমার ক্রমশঃ

বয়সও হইতেছে, এক্ষণে তোমার বিবাহ দরকার, বিবাহ ও স্বামিসঙ্গে তাঁর গৃহ ব্যতীত অন্যত্র তোমার বাস যে অসম্ভব" ; অবোধ বালিকা দেবযানী কচের বিচ্ছেদ কষ্টদায়ক বিবেচনায় রুদ্ধ-আবেগে বলিয়া উঠিলেন—"তবে কচ্, তুমিই আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমার নিকটেই থাকিব—" "তা যে অসম্ভব দেবযানি, তুমি যে আমার গুরুকন্যা, গুরুকন্যা আর সহোদরা যে একই। ভগ্নি! তোমায় আমায় ভ্রাতা ভগ্নী স্নেহ সম্ভবে ; পতিপত্নী-প্রেম যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; ভগ্নি! আমায় ক্ষমা কর—আমি চলিলাম—" কচের এই নিষ্ঠুর বাক্যে মর্ম্মাহতা দেবযানী ভাবিলেন,—"কি! আমি এত সাধিলাম, তবু থাকিল না ! আচ্ছা !—" প্রকাশ্যে বলিলেন—"কচ্! আমাকে এমনভাবে পদদলিত করিয়া তুমি যেজন্য চলিয়া যাইতেছ—আমার শাপে—তোমার সে মন্ত্র বৃথা হইবে" ; ক্রুদ্ধা ফণিনীবৎ ব্রাহ্মণকন্যার শাপে কচ্ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া পড়িলেন,—ভাবিলেন,—নিরুপায়। কচ্ বলিলেন—"দেবযানি! ব্রাহ্মণকন্যা,—গুরুকন্যা তুমি,—তোমার শাপ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু আমিও কম নহি—তোমার যেমন রজোগুণ প্রধান, তেমনি আমার শাপে—তোমার ক্ষত্রিয় স্বামী হইবে।" হঠাৎ এইরূপ শাপ প্রদানাদির পরই সব শান্ত হইল। প্রবল ঝটিকার পর সমুদ্র, বায়ু, সমস্তই স্থির হইল। দেবযানী বলিলেন—"কচ্, আমায় ক্ষমা কর—না বুঝিয়া তোমার অন্তরে আঘাত করিয়াছি, উপযুক্তই হইয়াছে ; থাক্। তোমার মুখে মন্ত্র না ফলিলেও তোমার শিষ্যগণের মুখে মন্ত্র অব্যর্থ ফলপ্রদান করিবে ; যাও তুমি,—দেবতার কল্যাণে দেশে যাও, কিন্তু ভগিনী বলিয়া মনে রাখিও ভাই!—" দেবযানী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, সুতরাং দিন ঠিক নিয়মিতই যাইতেছে। দেবযানীরও দিন বেশ কাটিতেছে ; কচের অভাবে আর তাঁর কষ্ট হয় না। এখন দেবযানীর বয়সও হইয়াছে। একদিন দেবযানীও দৈত্যরাজ-কন্যা স-সখী সরোবরে স্নানাদি করিতেছেন, এমন সময় একটি প্রবল বাতাসের ঝাপ্টায় সকলের তীরে পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি উড়াইয়া দেওয়ায় ত্বরিতচরণে সকলে তীরে উঠিলেন। ব্যস্তভাবে ভ্রমক্রমে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায় ক্রুদ্ধা দেবযানী তাহাকে গালি দিলেন। রাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার এই দীন ব্রাহ্মণকন্যার বাক্য সহ্য হইল না, তিনিও তীব্র কটুবাক্যে দেবযানীকে উত্তপ্ত করিলেন ও ক্রমশঃ মাত্রা অধিক হওয়ায় স-সখী শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে ধরিয়া নিকটস্থ একটী কূপমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ গৃহে চলিয়া গেলেন। দুর্ব্বলা

ব্রাহ্মণকন্যা,—তাহার কথা আর কেহ ভাবিল না। প্রবলে দুর্ব্বলের নির্য্যাতন করিয়াছে, তার আর কি ভাবিবে! সুতরাং দেবযানী সেই কূপের মধ্যেই রহিলেন।

(৩)

চন্দ্রবংশীয় নহুষের একমাত্র পুত্র যযাতি তখন ভারত-সম্রাট্। যযাতি বড় ধার্ম্মিক, তিনি তবুও মৃগয়াদি করিতেন, মৃগয়াক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত যযাতি জল অন্বেষণে ক্রমশঃ একটী কূপ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন। কূপমধ্যে পতিতা অসামান্যা সুন্দরী দেবযানীর কাতর ক্রন্দনে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বালিকাকে উদ্ধার করিয়া অন্যস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কন্যা অদর্শনে চিন্তিত শুক্রাচার্য্য চতুর্দ্দিকে দাসদাসী প্রেরণ করতঃ দেবযানীর অনুসন্ধান করিতেছেন। একজন দাসী দেবযানীকে বনমধ্যে সরোবরের অদূরে চিন্তিতা ও ক্রুদ্ধাভাবে উপবিষ্টা দর্শনে যখন ডাকিতে আসিল, তখন দেবযানী—আর সে দৈত্যপুরী যাইবেন না—ইহাই বলিয়া দাসীকে বিদায় দিলেন। পরিচারিকার মুখে সংবাদপ্রাপ্ত শুক্রাচার্য্য তৎক্ষণাৎ আদরিণী কন্যা সমীপে আগমন করিয়া সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে শ্রবণে তৎক্ষণাৎ স-কন্যা দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগের সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সংবাদ প্রকাশ হইতে বড় অধিক বিলম্ব হইল না। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। দৈত্যরাজ আলুলায়িত বেশভূষায় ত্বরায় আসিয়া গুরু ও গুরুকন্যার চরণে পতিত হইলেন। দৈত্যরাজের বহু সাধ্য-সাধনায় ও কাতর ক্রন্দনে পরিশেষে দেবযানীর রমণীহৃদয় যেন ঈষৎ কোমলভাব ধারণ করিল, কিন্তু ঈর্ষ্যা গেল না—তাই তিনি প্রকাশ করিলেন,—যদি শর্ম্মিষ্ঠা দাসীগণসহ দেবযানীর নিকট দাসীপণে বিক্রীতা হইতে পারে, তবে তাঁহারা দৈত্যরাজ্যে থাকিতে পারেন। মর্ম্মাহত দৈত্যরাজ অনন্যোপায় হইয়া কন্যার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা যখন গর্ব্বিতা দেবযানীর প্রস্তাব শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল,—কিন্তু পরক্ষণেই যদি তিনি দেবযানীর নিকট দাসীপণে বিক্রীতা না হন, তাহা হইলে পিতৃগুরু রাজ্য-ত্যাগ করিবেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দেব-বলে দৈত্যকুল অচিরাৎ ধ্বংস হইবে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দৈত্যবংশ রক্ষাকরণাভিলাষে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট আত্ম-বিক্রয়ে কৃতসংকল্প হইয়া দেবযানীর দাসীত্ব মাথা পাতিয়া লইলেন। শর্ম্মিষ্ঠার আত্মত্যাগ, শর্ম্মিষ্ঠার নারীহৃদয়ের মহত্ত্বে দৈত্যকুল সে

যাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করিল। যে শর্ম্মিষ্ঠার অজ্ঞানকৃত-দম্ভে দৈত্যবংশ ধ্বংস হইতে বসিয়াছিল, সেই শর্ম্মিষ্ঠারই আত্মত্যাগে আবার দৈত্যগণের মুখে হাসি ফুটিল। শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্ব স্বীকারে—তার সর্ব্বনাশে—দেবযানী উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দেবযানী সগর্ব্বে দেখাইলেন যে,—তিনি কত বড়! রমণী অন্যাপেক্ষা সহজে ছোট হইতে চায় না—তাই দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠাকে দাসী করিলেন, কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার মহত্ত্বে জগৎ মুগ্ধ হইল—শর্ম্মিষ্ঠার ত্যাগে দৈত্যকুল পবিত্র হইল। শর্ম্মিষ্ঠা রমণী-কুল-শিরোমণি—দৈত্যকুল-মুকুট-মণি!

(৪)

দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা ও দাসীগণ সহ প্রমোদোদ্যানে ক্রীড়ারত। যৌবন-শ্রীতে তাঁর শরীর উৎফুল্ল, এখন সেই যৌবনের লীলাভূমি দর্শনে মুনিমনও ব্যাকুল হয়। একদিন মাত্র যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতির প্রোজ্জ্বল বীরশ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তি দেবযানীর সেই বিষম বিপদে উদ্ধারকর্ত্তারূপে দেখা দিয়াছিল—আজ হঠাৎ আনন্দোৎফুল্লা ক্রীড়ারতার সম্মুখে অযাচিতভাবে আবার সেই মূর্ত্তি দর্শনে সত্য সত্যই দেবযানী জগৎ বিস্মৃত হইলেন। আত্মহারা যযাতি যেমন এই সখিগণ পরিবৃতা আমোদরতা পূর্ণযৌবনা রমণীর কমনীয় অঙ্গ-সঞ্চালনে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ বা চুম্বকাকৃষ্ট লৌহবৎ তদ্দিকে একদৃষ্টে ধীর-পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন—যুবতী দেবযানী তেমনি সেই রাজশ্রীমণ্ডিত বীরত্বব্যঞ্জক সমুন্নত দেহীর মন্থর-গমনে আত্মহারা অবস্থায় ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া রহিলেন। দেবযানীর পরিচয় প্রাপ্তে ব্রাহ্মণকন্যা অবগত হইয়া যেমন যযাতির মুখমণ্ডল বিবর্ণভাব ধারণ করিল—যযাতির পরিচয় প্রাপ্তে কচের শাপ-স্মরণে দেবযানীর মুখমণ্ডল তেমনি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এবার দেবযানী বুঝিলেন যে—যিনি তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এ তিনি। যযাতিকে বিমুখ দেখিয়া দেবযানী রমণীর লজ্জাশীলতার আবরণ উন্মোচন করিয়া যযাতিকে বলিলেন—"মহারাজ! একদিন যে হস্ত আপনার হস্তের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, সে সম্মিলন চিরস্থায়ী না করিয়া অন্যের সংস্পর্শে কলুষিত করাই কি ব্যবস্থা?" যযাতি উত্তর করিলেন—"ভদ্রে! আমি ক্ষত্রিয়! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়া কি আপন দুহিতা ক্ষত্রিয়-করে সমর্পণ করিতে সম্মত হইবেন? নচেৎ ঐ দেবদুর্ল্লভ রত্নলাভে কাঁহার অনিচ্ছা হইতে পারে?"—"সে ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হউন মহারাজ!" বলিয়া দেবযানী নিস্তব্ধ হইলেন। প্রণয়ে

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ভেদবিধি মানে না বলিয়াই বোধ হইতেছে, তাহা না হইলে কেন এমন হইবে ? যাহা হউক, উভয়ে তখন সলজ্জভাবে শুক্রাচার্য্য সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে তৎপদে প্রণাম করিলেন। শুক্রাচার্য্য কচের শাপ হইতে সমস্ত বিষয় ধ্যানযোগে অবগত হইয়া সস্নেহে উভয়কে আশির্ব্বাদ করতঃ বলিলেন,—"বৎস যযাতি! তোমার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী নিষ্ঠাবান্ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। তোমাকে কন্যাদানে আমার কোনও আপত্তি নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণে কিছু আসে যায় না। অতএব আমি সানন্দচিত্তে আমার একমাত্র আদরিণী কন্যাকে তোমার করে সমর্পণ করিতেছি; কিন্তু বৎস! ঐ শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যরাজদুহিতা—দেবযানীর পরিচারিকা হইলেও উহার প্রতি কখনও অসম্মান প্রকাশ করিও না, ইহা আমার আদেশ।"—যযাতি চমকিয়া উঠিয়া একবার শর্ম্মিষ্ঠার পানে চাহিয়া মস্তক নত করিলেন মাত্র।

মহাসমারোহে দেবযানী যযাতির উদ্বাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। রাজা সস্ত্রীক রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। দাসীপণে আবদ্ধা শর্ম্মিষ্ঠাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজা দেবযানীর নিকট শর্ম্মিষ্ঠা-ঘটিত সমুদয় ব্যাপার শ্রবণে বাস্তবিকই একটু দুঃখিত হইলেন, অলক্ষ্যে তাঁহার প্রাণ শর্ম্মিষ্ঠার দুঃখে গলিল। কিন্তু দেবযানীর তেজ প্রভৃতি দর্শনে কিছুই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। ইহাই জগতের বুঝি নিয়ম! যিনি যত বড় বীর হউন না কেন, স্ত্রীর নিকটে সকলেই শিষ্ট-শান্ত।

মহাসুখে দেবযানী স্বামীসহ কালাতিপাত করিতেছেন.—কিন্তু তিনি শর্ম্মিষ্ঠাকে বেশ যত্ন করিয়া রাজঅন্তঃপুর হইতে দূরে রাখিয়াছেন, পাছে—স্বামীর অন্তর তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়,—এই আশঙ্কা।

(৫)

বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়—বড় চিরদিন ছোট হইয়া থাকিবে, ইহা ভগবানের ইচ্ছা নহে। মহত্ব নীচতার নিকট যতই উৎপীড়িত হউক না কেন, সময়ে আপন গৌরবে মস্তকোত্তলন করিবে, তাহা বিধাতারই ইচ্ছা।—

একদিন কি ক্ষণে জানিনা—দেবযানী, যযাতি ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে উদ্যানমধ্যে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। মহানন্দে হাসিখেলায় বেশ চলিতেছে—এমন সময় হঠাৎ আরও কয়েকটী ছোট ছোট ছেলে আসিয়া "বাবা, বাবা!" বলিয়া মহারাজ যযাতিকে বেষ্টন করিল। দেবযানী বিস্মিত—যযাতি

সন্ত্রস্ত ! সম্মুখে বজ্রপাত হইলে বা তাঁহাকে বিষধর সর্পে দংশন করিলেও বোধ হয় যযাতির এত ভয় হইত না—যত ভয় হইল এই শিশুগণের পিতৃসম্বোধনে ! দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ ! এ কি ব্যাপার ?" মহারাজ নিরুত্তর। পুত্রগণ সরিয়া দাঁড়াইল। দেবযানী সেই শিশুদের নিকট হইতে যখন অবগত হইলেন যে—তাহারা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত এবং মহারাজ স্বয়ংই তাহাদের পিতা, তখন তিনি পুচ্ছবিমর্দ্দিতা ফণিনীবৎ বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, এ কি সত্য ?"—তথাপি মহারাজ নিরুত্তর। এই ভীষণ মৌন ভাব হইতেই দেবযানী সহজেই বুঝিলেন যে,– মহারাজ গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শর্ম্মিষ্ঠাকে তথায় ডাকাইয়া বলিলেন--"ব্যভিচারিণি ! এসব কি ?" রমণীর রমণীত্বে আঘাত লাগিল, তথাপি শর্ম্মিষ্ঠা স্থির ভাবে উত্তর করিলেন—"রাজ্ঞী ! আমি পতিতা নই—আমিও মহারাজের সহিত ধর্ম্মমতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা, বৃথা আমাকে দোষারোপ করিবেন না, তবে মনে রাখিবেন,—আমি আপনারই দাসী ও কনিষ্ঠা ভগিনী ;"—সংযমীর লুপ্ত ক্রোধ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল, অনতিবিলম্বে তিনি বলিলেন--"মহারাজ ! ইহার প্রতিফল পাইবেন,—থাকুন সুখে শর্ম্মিষ্ঠাসনে—আমি চলিলাম—" মুহূর্ত্তে তিনি পিত্রালয় উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। স্ত্রীকে যতদূর বিনয় সম্ভব তাহার অতিরিক্তও মহারাজ করিলেন, কিন্তু দেবযানী কিছুই কর্ণে স্থান না দিয়া ক্রোধভরে পিত্রালয়ে চলিলেন। ভীত যযাতিও তৎক্ষণাৎ শর্ম্মিষ্ঠার উপদেশে শুক্রাচার্য্যভবনে গমন করিলেন।

কন্যা-গত-প্রাণ শুক্রাচার্য্য কন্যার শ্লথবেশভূষা, আকুল ক্রন্দন, আরক্ত চক্ষু প্রভৃতি দর্শনে ও সমস্ত বিষয় শ্রবণে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু যেন প্রলয়কালীনবৎ জ্বলিয়া উঠিল—ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন--"কি ! এতদূর ! যযাতি ! ব্রহ্মচর্য্যের খাতিরেই ব্রাহ্মণকন্যা তোমার স্ত্রী হইয়াছে—এই বুঝি সেই ব্রহ্মচর্য্য ? আচ্ছা" যযাতিও তখনই ভীত-ভাবে কম্পিত-কলেবরে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন--"যযাতি ! যৌবন-গর্ব্বান্ধ হইয়া তুমি ব্রাহ্মণবাক্য—শুক্রাচার্য্যের আদেশ অমান্য করিয়া আমার কন্যা—তোমার সহধর্ম্মিণীর—যে অপমান করিয়াছ, তাঁহার ফলভোগ কর,—যে যৌবনে উন্মত্ত হইয়া তুমি কিছুই গ্রাহ্য কর নাই—সেই যৌবন তোমার লুপ্ত হউক--তুমি জরাগ্রস্ত স্থবিরে পরিণত হও—এই তোমার শাস্তি।" দেখিতে

দেখিতে নশ্বর-কায় যযাতির রাজদেহ স্থবির গলিত বৃদ্ধদেহে পরিণত হইল।

কম্পিত কলেবরে বসিয়া পড়িয়া করযোড়ে যযাতি বলিলেন—"প্রভো! এই আমার শাস্তি? ক্ষমা! ক্ষমা"—আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। স্থবির হইয়া পড়িয়া গেলেন। দেবযানী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, এইবার তাঁহার রমণী-হৃদয় আরাধ্যদেব স্বামীর দুরবস্থা দর্শনে কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সেই জরাজীর্ণ স্বামীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ রোষ-পূর্ণ কঠিন নারী-হৃদয় মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইল—কোমলতা আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। গলদশ্রুলোচনে কাতরে করযোড়ে পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ! এ কি করিলেন! রক্ষা করুণ! ক্ষমা করুণ!—"আর বলিতে পারিলেন না। কথা জড়াইয়া আসিল। শুক্রাচার্য্যেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল—ভাবিলেন এ—কি করিলাম!—এখন উপায়! ভগ্ন স্বরে বলিলেন—"দেবযানি! ঈর্ষার ফলভোগ কর, আমি কি করিব? ভগবান্ তোমায় উচ্ছৃঙ্খল ঈর্ষাপরায়ণ রমণীবৃত্তির উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়াছেন।" "বাবা! বাবা!! উপায় করুণ বাবা!!! আজ হইতে আমি আমার সমস্ত রাগ-দ্বেষ, হিংসা, অভিমান, গর্ব্ব,—সমস্তই বিসর্জ্জন দিতেছি, শর্ম্মিষ্ঠার দাসী হইয়া তাঁর সেবা করিতেও প্রস্তুত আছি। বাবা! আমি। সমস্তই সহ্য করিতে পারি—কিন্তু স্বামীর দুর্দ্দশা দর্শন করিতে পারিব না। রাগের বশে একদিন কচকে অভিসম্পাত করি, তারই ফলে মহারাজ যযাতি আমার স্বামী—গর্ব্ব ও ঈর্ষাভরে শর্ম্মিষ্ঠাকে চিরদাসী করিয়াছিলাম—তারই বিষময় ফলে আজ আমি স্বামী হারাইতে বসিয়াছি। পিত! ক্ষমা করুণ—অপরাধিনী কন্যার সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যান। শর্ম্মিষ্ঠা আমার ভগিনী,—সে রাণী,—আমি দাসী—সবই পারিব, বাবা! স্বামী ফিরাইয়া দিন—"দেবযানীর কঠিন অন্তরে স্নেহ-প্রীতি-স্রোতে প্রবলবেগে প্রবহমাণ দর্শনে শুক্রাচার্য্যের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি সস্নেহে বলিলেন—"বৎস যযাতি! মা দেবযানি! অলঙ্ঘ্য শুক্রের বাক্য আর ফিরিবে না—তবে যদি তোমাদের পুত্রগণের কেহ ঐ জরা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়, তবে পুনরায় যৌবন লাভ ঘটিতে পারে। ইচ্ছাক্রমে যখন ইচ্ছা আবার বিনিময় করিতেও পারা যাইবে—এই মাত্র আমার বর্ত্তমানের ক্ষমতা। কিন্তু উভয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে, এই জরা যে গ্রহণ করিবে, সেইই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে।"

(১০)

দেশময় একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। একে একে সমস্ত পুত্রগণকে সমস্ত বলা হইল। কেহই জরাগ্রহণে স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পুরু বলিলেন—"পিতঃ! আমি আপনার জরা গ্রহণ করিতেছি; যে পিতার জন্য এই সংসার দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে—সেই পিতাকে যদি সুখী করিতে না পারিলাম, তবে আর জীবনে ফল কি? তবে পিতাপুত্র সম্বন্ধ কিসের?

"পিতাঃ স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

যযাতি, দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা সস্নেহে পুত্রের মস্তক চুম্বন করিলেন। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ভগিনি! আজ আমার জন্ম সার্থক হইল যে, এমন পুত্রের জননীকে ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলাম! রাজমাতা তুমি, তুমিই রাজমহিষীর যোগ্যা, ক্ষমাকর ভগ্নি—আমি ব্রাহ্মণকন্যা, তোমার পিতৃগুরু-কন্যা—আর তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীবোধে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর—" এই বলিয়া সস্নেহে যযাতির হস্তের সহিত তাহার হস্তের মিলন করিয়া দিয়া রমণীহৃদয়ের প্রকৃত রমণীয়তা দেখাইলেন।

কতদিন পরে মহারাজ যযাতি পুরুকে তাহার যৌবন প্রত্যার্পণ করতঃ রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করেন।

রত্নময়ী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কমললোচন সে রাত্রে পত্নীর একান্ত অনুরোধ সত্বেও কোন কিছু আহার করিলেন না। দুগ্ধ সন্দেশ ফল-মূলের ত অভাব নাই। কিন্তু তিনি জলমাত্রও স্পর্শ না করিয়া শয্যা-আশ্রয় করিলেন!

নিদ্রাতেও তাঁহার সোয়াস্তি নাই। রজনীর শেষযামে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল বটে—কিন্তু সে তন্দ্রা ভীষণ স্বপ্নপূর্ণ।

তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—"যেন তাঁহার ঘর-দ্বার লুণ্ঠিত হইয়াছে। ফৌজদারের সিপাইগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফৌজদারের নিকট হাজির করিয়াছে। রত্নময়ী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার মৃতদেহ তাঁহার খিড়কীর পুষ্করিণীতে ভাসিতেছে। আর কল্যাণী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। কল্যাণীর শবদেহ দালানে পড়িয়া আছে।

তারপর ফৌজদার তাঁহাকে দেখিবামাত্রই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, সরোষে বলিলেন—"কই কমল রায়, তোমার কন্যা কই?"

কমললোচন বিকট হাস্য করিয়া উন্মাদের মত উদাসচ্ছবিতে ফৌজদারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমজাদ খাঁ—শয়তান! আমার কন্যাকে তুমি পাইতে পার। কিন্তু ইহলোকে নয়। সে তোমার জন্য পরলোকে অবস্থান করিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া ফৌজদার যেন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিল! জল্লাদকে হুকুম দিল "এখনই ইহাকে হত্যা কর! এই শয়তানের ছিন্নমুণ্ড আমায় আনিয়া দেখাও।"

এই সময়ে সহসা তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল! তিনি শয্যার উপর বসিয়া বসিয়া, দুর্গানাম স্মরণ করিলেন। ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, কল্যাণী সেই গৃহের অপর এক শয্যায় নিদ্রিতা। আর রত্নময়ী তাহার বহুপূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া ঠাকুরঘরের কাজ করিতেছে।

পিতাকে জাগ্রত দেখিয়া, রত্নময়ী তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দালানে একখানি চৌকীর উপরে সে তাঁহার প্রাতঃকৃত্যের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। এই চৌকির পার্শ্বেই ভৃঙ্গারপুর্ণ সুবাসিত জল।

কমললোচন রায়ের আরক্ত চক্ষু ও কান্তিহীন মুখমণ্ডল দেখিয়া রত্নময়ী বড়ই ভয় পাইল। সে পূর্ব্বরাত্রির সকল ঘটনাই দ্বারের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া শুনিয়াছিল। সেও অনিদ্রা উদ্বেগে রাত্রি কাটাইয়াছে। কিন্তু সে করিবে কি! এ ব্যাপারেত তাহার কোন হাতই নাই।

রত্নময়ীকে দেখিয়া কমললোচনের মনে সেই ভীষণ স্বপ্নের স্মৃতি পুনরাবির্ভাব হইল। কমললোচন অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন—"তুই মরিস নাই রত্ন, তুই জলে ডুবিয়া মরিস নাই! আঃ বাঁচিলাম। কি ভীষণ স্বপ্ন!"

রত্নময়ীর কাণে কথাটা গেল। সে মনে মনে বলিল, "আহা! তাহা হইলে সকল বিপদ্ আপদ্ কাটিয়া যাইত, কিন্তু এখনও ত আমার মরণের সময়

হয় নাই। মৃত্যুত মেয়ে মানুষের খেলার জিনিস। প্রয়োজন হইলেই আমি মরিব।

রত্নময়ী কিছু না বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়াগেল! অতি প্রাতে উঠিয়া সে রাখালের সাহায্যে গাভী দোহন করাইয়াছিল। উনুনে আগুন দিয়া দুধ জ্বাল দিল। সে জানিত পিতা পূর্ব্বরাত্রে কিছুই আহার করেন নাই। ইহার পূর্ব্বেই সে তাহার সন্ধ্যাবন্দনাদির সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছিল!

কমললোচন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া স্নান করিতে গেলেন। প্রতিদিনই তিনি সপ্তগ্রামপার্শ্ববাহিনী সরস্বতীতে স্নান করিতেন। সেদিন আর তাহা গেলেন না। বাড়ীতেই স্নানাদি শেষ করিলেন।

তখনও সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই। সবেমাত্র উষার আলোকে দিকমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত। বিহঙ্গমগণ সবেমাত্র বৃক্ষরাজির ঘনকান্তরালে বসিয়া বসিয়া, ললিত ভৈরবীর আলাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

স্নানাদি সমাধানান্তে তিনি শক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার দৈনিক দেবতা। কিন্তু তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। তিনিও পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া একমনে পূজায় নিমগ্ন হইলেন।

একঘণ্টার মধ্যে পূজা পাঠ শেষ করিয়া তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, কল্যাণী ইতিমধ্যেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন। আর রত্নময়ী পিতার জন্য নানাপ্রকার জলখাবার তৈয়ার করিয়া একখানি আসন পাতিয়া জল রখিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে!

কমললোচন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, রত্নময়ী বলিল—"বাবা! কালরাত্রে তুমিত কিছু খাও নাই! আমি নিজের হাতে এগুলি তোমার জন্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। আমার দিব্য, বাবা এগুলি তোমার খাইতেই হইবে।"

"এত স্নেহভরা প্রাণ! এত পিতৃভক্তি! এত আদর যত্নমাখান কোমল হৃদয়খানি আমার এই কন্যা রত্নময়ীর? হায়! আমিই না গতরাত্রে ইহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। এরূপ স্নেহময়া কন্যার রাক্ষস পিতা আমি।" এইসব কথা ভাবিতে গিয়া কমললোচনের চক্ষে জল আসিল। তিনি অতিকষ্টে প্রাণের উচ্ছ্বাস দমন করে আসনে উপবেশন করিলেন।

স্নানান্তে তাহার দেহ অনেকটা স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছিল ইষ্টদেবতার

পূজা করিবার পর তাহার প্রাণে একটা নূতন শক্তি জাগিয়াছিল। স্নেহময়ী কন্যার আদরযত্নে প্রাণের মধ্যে তখনও যে একটা চাঞ্চল্য ভাবছিল, তাহা যেন অনেকটা শান্ত হইল। কল্যাণী কাল বলিয়াছিল "এতদিন ঐশ্বর্য্যের উপাসনাই করিয়াছ—ভগবানের ত উপাসনা কর নাই।" একথা সম্পূর্ণ সত্য ভাবিয়া রায়মহাশয় আজ প্রাণ ভরিয়া একান্তচিত্তে সেই শক্তিস্বরূপিণী ভবানীর উপাসনা করিয়াছেন।

এখন কল্যাণী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক অনুরোধ করিয়া তিনি স্বামীকে কিছু জলযোগ করাইলেন। তিনিও পূর্ব্বরাত্রে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই।

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে, এই স্নেহময়ী কন্যা আর একান্তানুরক্তা পত্নী কল্যাণী এখন যেন তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহাদের সংসর্গ যেন অতি বিষময়! তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে আর তাঁহার সাহস হয় না! যখন তিনি মনে ভাবেন, এই শারদ-নলিনী-সম প্রফুল্লমুখী কন্যা তাঁহার, ফৌজদারের দ্বারা লুণ্ঠিত হইবে, তখনই যেন তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে একটা ভীষণ আগুনের হলকা বহিয়া যায়।

কমললোচন জানিতেন যে তাঁহার পত্নীও পূর্ব্বরাত্র হইতে অভুক্তা। এজন্য তিনি তাহাকে জলযোগ করিবার আদেশ দিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বাহিরের মহলে আসিয়াই কমললোচন রায় যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল!

তিনি দেখিলেন—তাঁহার প্রবেশদ্বারে দুইজন সশস্ত্র প্রহরী। বেশ ভূষায় বুঝিলেন—যে তাহারা ফৌজদারের সেনা!

আগে ফৌজদারের সেনারা তাঁহাকে দেখিলে সম্মানের সহিত দূরে দাঁড়াইত। এই প্রহরীর সহিত তাঁহার চখোচখী হইল, তথাপি সে তাঁহাকে কোনরূপ সেলাম বা অন্য কোন প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিল না।

কমললোচন ইহাতে বড়ই শঙ্কিত হইলেন। তাহাকে নিকটে ডাকিলেন।

প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপার কি বাপু! তুমি কি ফৌজদার সাহেবের নিকট হইতে কোনরূপ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছ?

প্রহরী বলিল—"না সাহেব! আমরা আপনার এই বাটী চৌকী দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি!"

কমললোচন রায় "আমরা" এই কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমরা বলিলে যে? তুমি ছাড়া আরও কেউ আছে নাকি?"

সিপাহী বলিল—"আছে বই কি? আরো সাত জন লোক আপনার বাটীর চারিদিকে পাহারা দিতেছে।"

কমললোচন। তাহা হইলে আমি নজরবন্দী!

সিপাহী। আজ্ঞে—তাই বই কি!

কমললোচন। এ হুকুম দিল কে?

সিপাহী। মুলুকের মালিক, স্বয়ং ফৌজদার সাহেব!

কমললোচন। আমার অপরাধ!

সিপাহী। তাহা তিনি আর আপনি জানেন! আমরা হুকুমের চাকর।

কমললোচন। তোমাদের তিনি কি হুকুম দিয়াছেন?

সিপাহী। আমাদের উপরে এই হুকুম আছে, যেন কেহ এই বাটী হইতে বাহির হইয়া না যায়, বা প্রবেশ করিতে না পারে।

এই কথা শুনিয়া কমললোচন রায়ের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল! তিনি বুঝিলেন—রাজকারাগারে না হইলেও, নিজের বাটীতে তিনি বন্দী হইয়াছেন। স্বাধীনতা, সম্মান, পদগৌরব সব যে অতলজলে ডুবিল। লোকে ভাবিবে কি? তাঁহার পদোন্নতি ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি দেখিয়া অনেকেই যে তাঁহার শত্রু হইয়াছে। এখন সকলেই যে তাঁহার অধঃপাত দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দ বোধ করিবে, তাঁহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবে! হায়! কি সর্ব্বনাশই হইল! তিনি পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন।

কমললোচন ধর্ম্ম পূজায় ভালরূপ মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। যখনই তিনি ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিতে যান, তখনই তাঁহার চোখের সম্মুখে রত্নময়ী জাগিয়া উঠে। আর জাগিয়া উঠে এক ভীষণ দর্শন চিত্র। সে চিত্র আর কিছুই নয়—যেন এক নির্জ্জন কক্ষে তিনি বন্দীভাবে আনীত এবং দুর্দ্দান্ত আমজাদ খাঁ তাহার সম্মুখেই তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে!

কমললোচন পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভীষণ দর্শন চিত্র দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া

উঠিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া বদ্ধাঞ্জলি কৃতবাসে বলিলেন "কি করিলি মা পাষাণি! আমি যে এতদিন স্বহস্তে রক্তজবা ও বিল্বদল তুলিয়া তোর চরণে দিলাম—এই কি তার পরিণাম ?"

পূজা শেষ হইল। পত্নীর একান্ত অনুরোধে তিনি আহারে বসিলেন। কিন্তু সে কেবল ভাতে হাত! রামলোচন আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

কল্যাণী স্বামীর পাতে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। অতি ভক্তির সহিত নিত্যই দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে স্বামীর প্রসাদিত অন্ন খাইতেন। কিন্তু সেদিন তাঁহার অন্ন রুচিল না। অভক্তিতে নহে—ভয়ে ও চিন্তায় তিনি অতি সামান্য মাত্র অন্ন উদরস্থ করিলেন। কন্যা রত্নময়ীর দশাও সেইরূপ!

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কমললোচন তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া দিন কাটাইলেন। আলস্য রাখিবার জন্য একটু শয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই নিদ্রা স্বপ্ন-বিভীষিকাময়।

সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার গৃহে নিত্য শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি হয়। সে দিন সেই সুগম্ভীর শঙ্খঘণ্টারব যেন তাঁহার পক্ষে বলিদানের বাজনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বাদ্য-কোলাহল স্থির হইলে তিনি যেন একটা শান্তি লাভ করিলেন।

আর রত্নময়ী—সেও নানা দুর্ভাবনায় দিন কাটাইয়াছে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিছানা ভাসিয়াছে। কিন্তু কাঁদিলেত বিপদ দূর হয় না।

রত্ন মনে মনে ভাবিল—"আমার পিতার না আছে কি ? রাজ্যপদ রাজসম্মান, তিন মহল বাড়ী, শান্ত্রী সিপাহী, দাস দাসী, অতুল ঐশ্বর্য্য না আছে কি ? কিন্তু এই অভাগিনীর জন্য তাঁহার সে সবই যাইতে বসিয়াছে। তাহার প্রাণ ও ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। একদিন এই ঐশ্বর্য্য মদে অধীরা হইয়া দরিদ্র স্বামীকে অপমান করিয়াছিলাম, এইবার কি তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন উপস্থিত ?"

"আমি মরিব। মরিতে আমার কোন দুঃখই নাই। মরিবার জন্য বিষ আনিব কাহাকে দিয়া ? নবাবের প্রহরীরা কাহাকেও যে বাটীর বাহিরে যাইতে দেয় না! হায়! তাহা হইলে কি মরা হইবে না ?"

"একটা উপায় আছে। সে শাণিত অস্ত্র। পিতার কাছে একখানি শাণিত ছুরিকা দেখিয়া ছিলাম। সে খানি রত্নখচিত। ভূতপূর্ব্ব নবাব

রফান খাঁ, বাবাকে সেই অস্ত্রখানি শিরোপার সঙ্গে উপহার দেন। কিন্তু সে ছুরিকাও বাবার বাক্সে আছে। তাঁহার নিকট চাহিতে গেলে কখনই তাহা পাইব না। নিতান্ত প্রয়োজন বুঝি, সেখানি যে উপায়ে পারি, অন্ততঃ চুরি করিয়াও সংগ্রহ করিব।

"এ বিপদ সময়ে কোথায় আমার সেই বিপদবারণ, মধুসূদন স্বামী! আমি যদি মরি, তাহা হইলে আর ত তাঁ'র সঙ্গে দেখা হইবে না। প্রহরী-বেষ্টিত পুরী হইতে ত কাহাকেও বাহিরে পাঠাইবার উপায় নাই! কি করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিব।"

রাত্রিকালে নির্জ্জন শয্যায় শুইয়া, রত্নময়ী এইসব ভীষণ চিন্তায় নিমগ্ন। সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে।

শুইয়া শুইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, রত্নময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর।

গভীর রজনী। সমস্ত প্রকৃতি চন্দ্রকরোজ্জ্বল। প্রকৃতির সে হাস্যময়ী মূর্ত্তি—কমললোচন রায়ের প্রাণে একটুও শান্তি আনিয়া দিল না!

পত্নী কল্যাণী সেই কক্ষমধ্যে নিদ্রিতা! কমললোচন রায় ধীর পদবিক্ষেপে শয্যাত্যাগ করিয়া বাতায়নপথে আসিলেন। এই বাতায়ন নিম্নেই তাঁহার খিড়কীর উদ্যান! এই গভীর নিশীথে তিনি প্রাচীরের বাহিঃপার্শ্বে নবাবের প্রহরীদের কথোপকথন শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

তিনি ধীরপদ বিক্ষেপে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া, অতি সন্তর্পণে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, পার্শ্বস্থ এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উন্মাদের মত—চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না,কোন উপায়ই নাই। রত্নকে কলঙ্ককালিমা হইতে রক্ষা করিবার আর কোন উপায়ই নাই।"

রত্নময়ী একটু আগে অন্য কক্ষে শুইয়া যে ছুরিকার কথা ভাবিতে ছিল, কমললোচন এক সুবৃহৎ বাক্স হইতে সেই ছুরিকাখানি বাহির করিলেন। পিশাচের ন্যায় বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন—ঠিকই হইয়াছে। স্বর্গীয় নবাব ইরফান খাঁ, এ খানি আমায় উপহার দিবার সময় বলিয়াছিলেন—"কমল রায়, আশাকরি—বাদসাহপ্রদত্ত এই ছুরিকাখানি সামান্য হইলেও কোন না কোন সময়ে তোমার কাজে লাগিবে।" তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। এর চেয়ে এই রত্নখচিত ছুরিকার আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে।"

কমললোচন তখন ঘোর উন্মাদ। রাত্রির দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইতে যায়, তবু তাঁহার চোখে নিদ্রা নাই! তিনি উন্মাদের মত বিকট দৃষ্টিতে একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন, তৎপরে রত্নময়ীর কক্ষের নিকট নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে উপস্থিত হইয়া দরোজায় মৃদুভাবে ধাক্কা দিবামাত্র তাহা খুলিয়া গেল!

রত্নময়ীর স্বভাব এই, সে কখনও দ্বার বন্ধ করিয়া শুইত না। কমল-লোচন চোরের ন্যায় অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সে কক্ষে তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

রত্নময়ী নিদ্রিতা। সেই শুভ্র শয্যার উপর সে নিস্পন্দভাবে শুইয়া আছে। তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছিল, কে যেন সেই শুভ্র শয্যায় একরাশ চাঁপাফুল ছড়াইয়া দিয়াছে। মস্তক অবগুণ্ঠনমুক্ত। শুভ্র মুখমণ্ডলে প্রদীপের জ্যোতি পড়িয়াছে। তাহা যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

কমললোচন রায় একদৃষ্টে সেই মাধুরীময় দেবীপ্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন! মনে মনে অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"যে পিতা বলিতে অজ্ঞান হয়, যাহাকে লইয়া আমার সংসার, যে এই সংসারনন্দনের একমাত্র শুভ্র পারিজাত, তাহাকে আমি হত্যা করিব? পিতা হইয়া চণ্ডালের মত কন্যার শোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিব? ওঃ কি ভয়ানক কল্পনা।"

সহসা আবার প্রাচীরপার্শ্বস্থ মোগলপ্রহরীদের কঠোর চীৎকার তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি এ চীৎকার শুনিয়া আবার উন্মাদের মত হইলেন। দৃঢ়হস্তে শাণিত ছুরিকাখানি ধরিয়া কন্যার দিকে অগ্রসর হইলেন।

ভীষণ ভ্রুকুটী ভঙ্গী করিয়া তিনি বলিলেন—"আর না। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে আমার এ সুদৃঢ় সংকল্প ভাসিয়া যাইবে। ঐ সুন্দর স্নেহভরা মুখ যতই দেখিব, ততই আমার হস্তের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া উঠিবে। আর—না! রত্নময়ী, আজ তোর শেষ দিন। আজ তোর পিশাচ পিতা, তোর বক্ষের শোণিতে শয়তান আমজাদ খাঁর--সকল বাসনা ডুবাইয়া দিবে।"

হঠাৎ রত্নময়ীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে শয্যার উপর উঠিয়া অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় দেখিল, যে তাহার পিতা এক শাণিত ছুরীকা হস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান। যে ছুরীকা সংগ্রহের জন্য সে একটু পূর্ব্বে অত্যন্ত ব্যাকুলিতা দেখাইয়াছিল—তাহা তাহার পিতার হস্তে। যে শাণিত ছুরীকার

সহায়তায় সে তাহার নিজের মৃত্যু নিজেই ঘটাইত. তাহার স্নেহময় পিতা. তাহাকে সেই মৃত্যুই দিতে আসিয়াছেন।

রত্নময়ী ইহাতে একটুও না ভয় পাইয়া বলিল---"বাবা"—কমললোচন পিছু হাটিলেন। তাঁহার দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইল। হাত কাঁপিতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে একটা মহা ঝড় উঠিল। সে ঝড়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন নিষ্কাষিত হইতে লাগিল।

রত্নময়ী বলিল—"কিসের ভয়—কিসের সঙ্কোচ পিতা! আমার বুকে ঐ ছুরী বসাইয়া দাও। আমি ত তোমার এই সর্ব্বনাশের মূল। ভুলিয়া যাও আমি তোমার স্নেহময়ী ও একমাত্র কন্যা রত্নময়ী। ভুলিয়া যাও, এ সংসারে তোমার বলিয়া কেউ তোমার গৃহে আসে নাই। তোমার বংশের গৌরব, আমার নারীসম্মান যাহাতে রক্ষা হয়—তাই কর। আমি একটুও ভয়ে কাঁপিব না। একদিন ভবানীর সেবার জন্য. ভৈরবের মন্দিরে এ দেহ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু মা, সেদিন বলি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আজ সেই শুভাবসর উপস্থিত। দাও বাবা,—মায়ের শূন্য খর্পর, তোমার এই চির অভাগিনী কন্যার হৃদয়ের শোণিতে পূর্ণ করিয়া দাও।

কোমললোচন রায় উদাসনেত্রে রত্নময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া সব শুনিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। মুষ্টি একবারে শিথিল হইয়া গেল। ছুরিকাখানি মহাশব্দে হর্ম্ম্যতলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি প্রভঞ্জন-বেগে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রত্নময়ী এ ব্যাপারে একটু ভীত হইল না। সে মনে মনে ভাবিল—নারায়ণ মধুসূদন—এইরূপে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই ছুরিকাখানির জন্য একটু পূর্ব্বে আমি বড়ই ভাবিয়াছিলাম! তিনিই তাহা আমাকে আমার পিতার হাত দিয়া দিয়াছেন। আমার সকল চিন্তাই এখন লোপ হইল। এই অস্ত্রই আমার নারীসম্মান রক্ষা করিবে। সাধ্য কি, সেই পিশাচ আমজাদ খাঁ আমার অঙ্গস্পর্শ করে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভবিতব্যের বিধান বিফল হইবার নহে। দেখিতে দেখিতে তিন দিন কাটিয়া গেল। তবুও কমললোচন রায় তাঁহার কন্যাকে ফৌজদারের হাতে সমর্পণ করিবেন কি না, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এদিকে রত্নময়ীর সুন্দর রূপের ছবিখানি ফৌজদার আমজাদ আলির প্রাণে খুব একটা দাগ করিয়া দিয়াছিল। যতই দিন যাইতেছে—ততই তিনি অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার তোষামোদকারী পারিষদবর্গ, যাহারা কমললোচন রায়ের ঘোর শত্রু, তাহারা তাঁহাকে ভয় দেখাইল—"হিন্দুকে বিশ্বাস নাই। আর কমল রায় বড় ধড়িবাজ লোক। সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিলে, সে তাহার কন্যাকে নিশ্চয়ই সরাইয়া দিবে।"

কথাটা ফৌজদার আমজাদ আলির মনে লাগিল। তিনি ইতি পূর্ব্বেই কমল রায়ের সর্ব্বনাশের সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার মনের সংকল্প তিনি পরদিনের গুপ্ত দরবারে কার্য্যে পরিণত করিলেন।

সেই সবংাদে কমল রায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য দুই রাজকর্ম্মচারী আরজী পেশ করিল। কমল রায় নাকি বাঁকুড়ার প্রজামহল শাসন করিতে গিয়া, সরকারের লক্ষ্যাধিক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ। ফৌজদার এতদিন এই কমল রায়ের উপর নেকনজর করিতেন, কাজেই তাহার শত্রুরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই ছিল। এখন উপযুক্ত অবসর দেখিয়া তাহারা আরজী পেশ করিল।

এ আরজীর হুকুমদার স্বয়ং ফৌজদার। তাঁহার হুকুমের উপর কথা কহিবার কেহই নাই। সুতরাং এই অভিযোগকারীরা কমল রায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সামান্যরূপ সাক্ষ্য সাবুদ লইয়া এবং কমল রায়কে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবসর না দিয়া—ফৌজদার সাহেব আদেশ দিলেন। "কমল রায়ের যথাসর্ব্বস্ব সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। এখনই তাহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে রাখা হউক।"

সরকার হইতে অত্র আদেশপত্রের বলে বলিয়ান্ হইয়া একজন সেনাপতি, পঞ্চাশজন ফৌজ লইয়া কমল রায়ের বাড়ীতে গেল।

কমল রায় তখন বাহিরের বৈঠকখানাতেই ছিলেন। সেনাপতি সাহেবকে বেশী কষ্ট করিতে হইল না। তিনি অতিসহজেই নিরস্ত্র কমললোচন রায়কে বন্দী করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সরকারী গারদখানায় আনিয়া পুরিলেন।

কমল রায়ের যে সব শান্ত্রী সিপাহী ছিল, তাহারা বাদসাহের নিকট হইতে তলব পাইত! পাছে কোন হাঙ্গামা উপস্থিত হয় ভাবিয়া, ফৌজদার সাহেব, একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া সরকারী খাজনা চালানের প্রহরীরূপে, সমস্ত হিন্দু

সিপাহীকেই রাজমহলে পাঠাইয়া দেন। বাকি যাহারা রহিল, তাহারা মুসলমান। ফৌজদার জানিতেন—ইহারা কখনই কমল রায়ের সহায়তা করিবে না।

কমলরায় যখন গ্রেপ্তার হইলেন—তখন, বেশী ভাবনার কথা কিছুই নাই। সেই দিনই তাঁহার কন্যাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিলে—তাঁহার সুনামের হানি হইতে পারে। এজন্য তিনি আরও দুই এক দিন অপেক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। তবে কমল রায়ের বাটীর চারিদিকে পাহারার যেমন বন্দোবস্ত ছিল—তাহা দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হইল।

স্বামীর অবরোধসংবাদে পত্নী কল্যাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। রত্নময়ী তাহার সেবায় নিযুক্ত। সে তখনও হৃদয়ের বল হারায় নাই। তাহার তখনও আশা ছিল—ফৌজদার তাহার পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে বটে—কিন্তু কখনই তাঁহাকে হত্যা করিতে সাহসী হইবে না।

রত্নময়ী অনেক কষ্টে মাতার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তাহাকে আশা-পূর্ণ বাক্যে বলিল,—"ভয় কি মা তোমার! বাবাকে আটক করিয়া, বেশী-দিন রাখিতে পারে এমন ক্ষমতা ফৌজদারের নাই।" রোরুদ্যমানা কল্যাণী, কন্যার এই কথায় সাহসে বুক বাঁধিলেন।

দিনটা কাটিয়া গেল। রজনীর প্রথম প্রহরও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কমললোচন রায়ের পুররক্ষী প্রহরীরা মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিয়াছে—যদি কেহ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে হত্যা করিব। প্রাণ থাকিতে তাহাদের যাইতে দিব না। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ারগুলি সংগ্রহ করিয়াও রাখিল।

গভীর রাত্রে জনকয়েক মোগলপ্রহরী বাটীর মধ্যে যাইবার চেষ্টা করায় প্রহরীরা তাহাতে বাধা দিতে গেল। এই বাধা দেওয়ার ব্যাপারে একটা মহা হুলাহুল বাধিয়া উঠিল।

দ্বাররক্ষী প্রহরীদের সংখ্যা আটজন! কিন্তু সেই পুরী বেষ্টনকারীরা প্রায় পঁচিশজন মোগল সেনা ছিল। দ্বারবানেরা যখন দেউড়ীর প্রবেশপথ রোধ করিয়া সঙ্গীন হস্তে দাঁড়াইল—তখন একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধায় ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল।

এই ভীষণ কোলাহল শব্দ মাতা ও কন্যার কর্ণে পৌঁছিল। এই

সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল—"মা, তোমরা এই বেলা পলাও। নবাবের সিপাহীরা অন্দরের মধ্যে আসিতেছে।"

মাতা কন্যা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহারা বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন। পশ্চাতেই খিড়কীর উদ্যান!

এই খিড়কীর প্রাচীরের পার্শ্বেই দুইজন প্রহরী ছিল। তাহারা সাংকেতিক শব্দ শুনিবামাত্রই ঘাটী ত্যাগ করিয়া, দেউড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল।

রত্নময়ী তাহার মাতাকে বলিল—"মা! চল, আমরা খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাই।"

কল্যাণী বলিলেন,—"পলাইবার উপায় কি আছে মা! সেখানেও যে প্রহরী আছে!

রত্নময়ী—থাক প্রহরী! যদি মধুসূদন সহায় হন—মা কালী আদ্যা-শক্তী করুণা করেন—তাহা হইলে দেখিও, তাঁহারাই আমাদের পলায়নের উপায় করিয়া দিবেন।

রত্নময়ী তাড়াতাড়ি আসিয়া অতি নিঃশব্দে খিড়কীর উদ্যানের দরোজাটী খুলিয়া ফেলিল। মুখ বাড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহই তথায় নাই। সে তাহার মাকে বলিল—"মা! শীঘ্র এস! আমার মধুসূদন যে বিপদভয়-হরণ।"

মাতা ও কন্যা সেই খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তা ছাড়িয়া আঁকা বাঁকা পথে চলিতে লাগিল। নিকটেই একটী উদ্যান। তাহারা সেই উদ্যানপার্শ্বে লুকাইল। কেননা—তাহারা পিছনে যেন কাহার পদশব্দ পাইয়াছে!

কিন্তু সেটা ভ্রম। এরূপ ভয়ানক বিপদের সময় এ সব ভ্রান্তি অতি সহজেই ঘটে!

রত্নময়ী বলিল,—"মা, আমি এ পথ জানি! এটা শেঠেদের বাগান। এই শেঠেরা সপ্তগ্রামের মধ্যে মহাধনী। ~~[illegible]~~ বিবাহের পূর্ব্বে আমি পাল্কী করিয়া এই পথেই সরস্বতী নদীতে স্নান করিতে যাইতাম। এই বাগানের ফটকের মত সুন্দর ফটক এ সপ্তগ্রামে নাই। চল আমরা বাগানের পথ বেরিয়ে যাই, তাহা হইলে নদীতীর পাইব!"

মাতা ও কন্যা ধর্ম্মরক্ষার ভয়ে প্রাণপণে দ্রুত চলিতে লাগিল। তাহারা যথাসময়ে সরস্বতীতীরে উপস্থিত হইল!

নদীতীরে অনেকগুলি শিবমন্দির। মধ্যে ঘাট! সরস্বতী তখন পূর্ণ যুবতী। সপ্তগ্রাম তখন বঙ্গের প্রধান বাণিজ্যস্থান।

এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে মাতা ও কন্যা দাঁড়াইয়া সেই গভীর নিশীথে বিশ্রাম করিতে লাগিল!

মাতা কল্যাণী সেই বৃক্ষতলে বসিলেন। সম্মুখে কন্যা রত্নময়ী। গাছের ঘন পল্লব, চন্দ্রকিরণ সমাগম রোধ করিয়াছে, এজন্য স্থানটা অন্ধকারময়!

মাতা কল্যাণী—কন্যা রত্নময়ীকে বলিলেন—"আমাদের অদৃষ্টে এতও ছিল মা।"

রত্নময়ী বলিল,—"মা! ভাবিলে ত আমরা ভাগ্যস্রোত ফিরাইতে পারিব না।"

কল্যাণী। তাঁর কি হইবে! না জানি অদৃষ্টে আরও কি আছে!

রত্নময়ী। তোমায় আমি কি বুঝাইব মা! ভগবানের উপর বিশ্বাস কর। ভগবানের শক্তি যে কত বেশী, তাহা ত বুঝিয়াছ। তাঁর সহায়তা না পাইলে আমরা কি আজ পলাইতে পারিতাম?"

কল্যাণী। কিন্তু কখনও ত আমরা রাস্তায় বাহির হই নাই! কোথায় যাইব? কে আমাদের আশ্রয় দিবে!

এমন সময়ে কে যেন, সেই বৃক্ষান্তরাল মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল—"মধুস্দনের এই বিশাল সংসারে, আশ্রয়স্থানের অভাব কি মা? তোমাদের সব কথা আমি শুনিয়াছি! তোমরা আমার কন্যা, এস আমার সঙ্গে!"

যে কথা কহিল তাহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। যথেষ্ট সহানুভূতি মাখা। সে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কল্যাণী ও রত্নময়ী দেখিলেন—এক ভৈরবী মূর্ত্তি। তাঁহারা বিনা সংকোচে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

এই সময়ে কারাবাসের মধ্যে কমললোচন রায় কি ভাবিতেছেন, তাহা একবার আমাদের দেখা উচিত।

এক প্রস্তরবেদীর উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তিনি উপবিষ্ট। চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার সুন্দর কান্তি এই কয় ঘণ্টায় অতি মলিন হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পাচকদ্বারা আনীত খাদ্যাদি তাঁহার সম্মুখে। কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শও করেন নাই।

কমললোচন রায়, ওষ্ঠে ওষ্ঠ নিষ্পীড়িত করিয়া বলিলেন,—"মধুস্দন!

মরিতে আমি একটুও কাতর নহি। কিন্তু আমজাদ খাঁ কিছুতেই আমার কন্যাকে তোর মত শয়তানের করে অর্পণ করিব না। নবাব সায়েস্ত খাঁ যখন সুবাদার, তখন এ অত্যাচারের প্রতীকার আমি পাইবই পাইব।”

তৎপরক্ষণেই তাঁহার গৃহের কথা মনে পড়িল। তিনি যেন মানশ্চক্ষুর সাহায্যে দেখিলেন, মোগলসেনা তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। কল্যাণী ও রত্নময়ীকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে।”

কমললোচন রায় উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“কি বিভীষিকা দেখাইতেছ আমায় মধুসূদন।”

এই কথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই বেদীর উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ।

উপায়হীনা

সে অনেক ইতিহাস। সাত বছরে বিবাহ হইল, আট বছরে বিধবা হইল। নয় বছরে শ্বশুর মরিল, শাশুড়ী মরিল। ভাসুর-পোর এক ছেলে অন্ধের যষ্টির মত সম্বল রহিল। তুলসীর আর কেহই থাকিল না। ছেলেটিকে লইয়া পাড়ার মুখুয্যে মশাইএর দয়ায় জাতমান লইয়া আজও ভিটায় টিকিয়া আছে।

ভাসুর-পো গোবরগণেশ গোপালচন্দ্র বিবাহ করিবার পরই রকমারী চাল চালিতে লাগিল। কাকীমাকে আর আগের মত যত্ন আদরও করে না। আগের মত তার সঙ্গে মিষ্টমুখেও কথা কয় না।

বৌয়ের হুকুমে কাকী-মা যতই খাটে, বৌ ততই যেন আরও তাঁকে খাটাইতে চায়। রান্না করা, বাসন মাজা, বৌয়ের বড় আদরের খোকাকে রাখা, তার উপরে নিজের সন্ধ্যাপূজা, স্তবস্তুতি, আর সেই বেলা দুটোর সময় পোড়া পেটের জন্য মুঠোখানেক আতপচালের শ্রাদ্ধ করা। কাকীমার শরীর খারাপ হইতেছে দেখিয়া ও পাড়ার পিসীমা একদিন বলিলেন, “কি লো বৌ, দিন দিন তোর এমন ছিরি হ'চ্ছে কেন! সোমত্ত বয়সে এত শরীর খারাপ কেন রে?” কাকীমা বাজে পাঁচ কথা বলিতেন, কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিতেন না।

বৌয়ের চুল বাঁধিতে বাঁধিতে একদিন কাকীমা ভাসুর-পোকে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন।

বৌ শুনিয়া একটু হাসিল—কোন কথাই কহিল না। রাত্রে স্বামীকে বলিয়া সকালে কাকামাকে তিরস্কার শুনাইল। সে এমন কি করিয়াছে, যা লোকের কাছে বলিয়া ফিরিবে।

কাকীমা অপ্রতিভ হইলেন, জবাব না দিয়া একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

"বাপ্‌রে বাপ, এত ঘুম! এমন হ'ল চল্‌বে ক দিন" বলিয়াই বৌ সুধামুখী একটা মুখ ঝাম্‌টা দিল।

কাকীমা সহসা ঘুম হইতে উঠিয়া বুঝিলেন, তারই উদ্দেশে সুধাবর্ষণ হইতেছে। জাগিয়াই কাকীমা বলিলেন, শরীরটা আজ বড় খারাপ হয়েছে—তা নইলে আমি কি দিনে ঘুমাই?

সুধা—কবে না ঘুমান আমিত দেখ্‌তে পাই না!

কাকীমা বলিলেন,—"রোজই তুমি আমায় ঘুমুতে দেখ?"

সুধা।—বুঝি আমার চক্ষের দোষ।

কাকীমা চুপ করিয়া আবার শুইলেন। মনে তাঁর বড় কষ্ট হইল।

দুঘণ্টা পরে ভাসুর-পো গোপেশ বাড়ী আসিতেই সুধা সুধাবর্ষণ আরম্ভ করিল। গোপেশ কাকীমাকে বলিল,—"তুমি যখন একা ছিলে, এমনত তুমি ঘুমুতে না, এখন নাকি রোজ ঘুমাও। এত খাট্‌তে পার্‌তে, আর এখন নাকি বসে থাক্‌তেই ভালবাস, এসব কিরকম বল দেখি কাকীমা?"

কাকীমা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "এ সব রকম বাবা, আমার কপালে লেখা আছে, তাই হচ্ছে।"

গোপেশ বলিল,—"তা যাই বল কাকীমা, ও ত আর দিন রাত্রে খাট্‌তে পারে না—আমি মুখ ফুটেই আজ তোমায় বলে দিচ্ছি।"

কাকীমা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন,—"আমিত বরাবর বলে আসছি, ছেলেটি নিয়ে তোমার অসুবিধা হবে, তুমি খোকাকে রাখ, আমি সব কাজ কর্ম্ম করব।"

সুধামুখী বলিল,—"তা আমারই অনিচ্ছা—আমার বড় সাধ যে আমি দিন রাত্তির গাধার মত খাটি।" কাকীমা বলিলেন, যাক, হয়ত আমারই দোষ, এখন থেকে আমিই সব কাজ কর্ম্ম করবো—সময় মত খোকাকেও রাখব—সব করব। বৌ! একটা কথা বলি, যা যখন তোমাদের অসুবিধা হবে,

আমায় মুখ ফুটে বলো, কখনও আমার উপর রাগ করো না। মিষ্ট মুখে আমি সব পারবো।"

সুধামুখী বলিল,—"কে আপনাকে কটু কথা বলে, তাত জানি না।"

কাকীমা বলিলেন,—"বল তা বল্‌ছি না। যদি কখনও কটু কথাটি বল।"

কাকীমা দিনরাত্তির খাটিয়াও সুধামুখীর মন পাইয়া উঠেন না। গোপেশের বাক্যযন্ত্রণা যে দিন হইতে পড়িয়াছে, সেইদিন হইতে কাকীমা রোজই শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ কাঁদেন, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়েন।

আজ তাঁর একাদশী, আজও তাঁকেই রাঁধিতে হইবে। খোকার আবার মাছ না হইলে খাওয়াই হয় না। খোকার খাওয়া হইবে না জানিয়াই কাকীমা সে দিন মাছ রাঁধিতে গেলেন, কিন্তু একাদশীতে মাছ ছোঁয়া তার কোন দিনই ইচ্ছা ছিল না।

কাকীমার ভাল কাপড়খানাও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবুও আর একখানা আনিয়া দেওয়ার নাম নাই। খোকা 'ভাত ভাত' বলিয়া কাঁদিতেছে, তাড়াতাড়িতে সে দিন রাঁধিতে রাঁধিতে হাঁড়িতে টান লাগিয়া কাপড়খানা একেবারে ছিঁড়িয়া গেল। বৌত দেখিয়াই রণচণ্ডীমূর্ত্তি হইয়া বলিল,—"কাপড় কিনতে পয়সা লাগে।"

সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে—দিন রাত্রি বৌয়ের খাওয়ার খোঁটা, পরার খোঁটা আর সহ্য হয় না। রাত্রিতে বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে। শোবার আগে লজ্জার মাথা খাইয়া বৌকে বলিয়াছিলেন, "বৌ! আমার বড় মাথা ধরেছে, আমি আর বসতে পাচ্ছি না। সকালের জন্য একটা কিছু যোগাড় করে রেখ।"

বৌ মুখে কিছু বলিল না, মনে মনে বলিল, সে জন্য আমার ঘুম হচ্ছে না।

বৌ শুইয়াছে, গোপেশ শুইয়াছে। কাকীমা ভোরে উঠিয়া দেখিলেন, তার জন্য কিছুই রাখা হয় নাই। 'ও ভগবান্' বলিয়া কাকীমা আসিয়া আবার শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার মত উপায়হীনার জন্য এ সংসারে কি এক ফোঁটা জলেরও বন্দোবস্ত নাই?

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

লেখা পড়া শিখিবার জন্য স্ত্রীলোকের বিবাহ বন্ধ থাকে ?

সিন্দুপ্রেম ৫৫৫৫ ১৩৮ পৃঃ
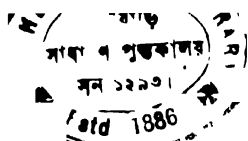
গল্পলহরী

৩য় বর্ষ, { পৌষ, ১৩২২ সাল। } ৯ম সংখ্যা

স্বপ্ন-বিভ্রাট।

[লেখক—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্, সি]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যদি বলি নায়কের নাম বংশীধারী ও নায়িকার নাম কালীতারা,—দোয়াতের মত মিচ্‌মিচে কালো রং, চেপ্টা নাক, ঠোঁট মোটা, মূলার মত দন্তপাটি, চোখ ছোট ও টেড়া, কাণে খাট, পঙ্গু ইত্যাদি,—তাহা হইলে উপাখ্যানটি শুনিবার পূর্ব্বেই নবীন পাঠক-পাঠিকা ভগবানের নিকট আমার কলম ভোঁতা হইবার আর্জ্জি পেশ করিবেন, এমন কি অনেকে শাস্তির ব্যবস্থাটা স্বহস্তে লইয়া সুযোগ মত—থাক্, মানে মানে "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" অবলম্বন করি; লিখিতে আসিয়া অকারণে অপদস্থ হইব কেন!

পাঠকপাঠিকা, আপনারা হতাশ হইবেন না—আমাদের নায়কের নাম প্রণয়কুসুম ও নায়িকার নাম হেনা। নায়কের বয়স বড় জোর বিশ কি বাইশ। দিব্য ফ্যাসানদুরস্ত চেহারাটি, মুখে চোখে তীব্র চটুল হাস্যপূর্ণ ভাব—ইতস্ততঃ ভ্রমায়মান। চশ্‌মা আটা উজ্জ্বল আঁখি,—ইয়া নাক, ইয়া টেড়ী, ইয়া গোঁপ। প্রণয় গোঁফ কামাইত না,—সে জর্ম্মাণ সম্রাট্ কেইসারের মতাবলম্বী, কাপড়ে চোপড়ে এসেন্সের ভুর্‌ভুরে গন্ধ। ইংরাজি পড়া, উপন্যাসে গড়া যুবকটি। আর নায়িকা হেনা স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-কোরকের মত যৌবনে ঢল ঢল—ঢেউ আসিয়া কেবল লাগিয়াছে। জমাটকরা জ্যোৎস্নার মত ধব্‌ধবে রং, মৃণালের মত কোমল বাহুলতা,—যেন স্বপ্নরাজ্যের একটি

সজীব প'রী ধপাস্ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে! তারপর, দু'জনে দু'জনার প্রেমে ডগমগ,—এত সুধা সমুদ্র-মন্থনেও বুঝি উঠে নাই

বসন্তকাল। প্রকৃতি নানাবর্ণ-রঞ্জিত ওড়না গায়ে পৃথিবীতে আসিয়াছে। বনে-জঙ্গলে, অরণ্যকান্তারে, যেখানে সেখানে ফুলের উৎসব লাগিয়াছে। অভ্যাগত পক্ষিগণ গান গাহিয়া কালোয়াতী করিয়া উৎসব জমাইয়া তুলিয়াছে; কিন্তু উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা জমিয়াছিল মাসিক পত্রিকাতে! তাহা নীরব বটে, কিন্তু তাহার কবিতার কি করুণ ভাব, কি প্রাণস্পর্শী ভাষা! পড়িয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। সে সকল করুণ কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে আর কাঁদাইতে ইচ্ছা করি না। প্রণয়কুসুম ও হেনা একটি প্রশস্ত কক্ষের ভিতরে সুকোমল গালিচায় মুখামুখী ভাবে বসিয়াছিল। ফুলের গন্ধ মাখান বাসন্তী সমীরণের সোহাগপূর্ণ কোমলস্পর্শে উভয়ে পুলকে ডগমগ, হৃদয়ের ভিতরকার প্রেম-সাগরেও ঢেউ উঠিয়াছিল। বাহিরে নীলাকাশের চতুর্দ্দশীর চাঁদ ফুটিয়া রজতধারায় সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল; তাহার কিরণাংশ উন্মুক্ত গবাক্ষপথে আসিয়া প্রণয়ি-যুগলের মুখে পড়িয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। যুবক যুবতী মুগ্ধ-নয়নে একে অন্যকে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতেছিল—"কে বেশী সুন্দর—চাঁদ না প্রেমাস্পদ?" আকাশের উপর দিয়া খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণমেঘ দ্রুতবেগে ছুটাছুটি করিতেছিল, সহসা একখণ্ড মেঘ চাঁদের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল,—হাস্যো-দ্দীপ্ত জগৎ ম্লান হইয়া গেল, তাহাতে প্রণয়ীর সুখকল্পনায়ও যেন একটু বাধা পড়িল। হেনা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায় জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যায় না। জীবন-আকাশে দুঃখ-মেঘের উদয় হইয়া সুখ শান্তি সব বিনষ্ট করে। দুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি, দুটিদিনও আনন্দ ভোগ করিতে পাইব না!—ঈশ্বরের একি অবিচার!—"

প্রণয় গম্ভীরভাবে বিজ্ঞ লোকের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—"সুখ দুঃখ মনের বিকার মাত্র। তুমি যাহা সুখ ভাব, অন্যে হয়ত তাহাই দুঃখ বলিয়া মনে করে। দেখ এই চন্দ্রমা-হসিত, মলয়-সেবিত জ্যোৎস্না-প্লাবিত যামিনী, আজ প্রণয়ীর মনে কত উল্লাস কত আনন্দ; কিন্তু বিরহবেদনা-ক্লিষ্ট হতভাগ্যের কাছে এই মধুময় নিশিও বিষের মত বোধ হইতেছে। সেইরূপ সুখদুঃখ হৃদয়ের জিনিস, বাহিরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যাহার হৃদয়ে বল আছে, দুঃখ তাহার কিছুই করিতে পারে না।" এতবড় তত্ত্ব-

বচন আওড়াইয়াও প্রণয় পত্নীর কাছে আজ বাহাবা পাইল না। কিন্তু সে দমিয়া পড়িবার লোক নয়, মূল কথাটা টিকাটিপ্পনী করিয়া বুঝাইবার প্রয়াসে বলিল, "কালিদাস বলিয়াছেন—

"দুঃখস্যান্তরং সুখম্ সুখস্যান্তরং দুঃখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ॥"

অর্থাৎ কি না এই যে সুখ-দুঃখ ইহা গরুরগাড়ীর চাকার মত ঘুরিতেছে। কখন কাহার বুকের উপর দিয়া যাইবে ঠিক নাই। তবে যাহার হৃদয়ে বল আছে, যেমন রামমূর্ত্তি, তাহার এই পেষণেও কিছু হয় না।

তাহা হইলে দেখ ত আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কি না, তুমি আমার "হিয়ার শান্তি" কবিতাটা পড় নাই বুঝি?—এ মাসের "কল্পতরুতে" বাহির হইয়াছে। ওঃ কবিতাটি পড়িয়া অনেকে কিন্তু ঠিক বুঝিতেই পারে নাই, এমন কঠিন ভাব! শুনিবে,—পড়িয়া শুনাইব?" প্রণয়ের ইচ্ছা ছিল, কবিতাটা পড়িয়া শুনায়! কিন্তু হেনা কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিল না, তাহার মুখ আজ মেঘের মত অন্ধকার, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতেছিল। প্রণয় ইহা লক্ষ্য করিল, পত্নীকে প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত বলিল—

"আজি এই মধুমাসে হের লো চন্দ্রমা হাসে,
চকোর চকোরী দোঁহে প্রেমেতে মগন,
গাহে কত প্রেমগীতি, কেন বিষাদিত সতী,
দুঃখ-মেঘ ঢাকি কেন মানস গগণ?"

হেনা নিরুত্তর, মুখ পূর্ব্ববৎ অন্ধকার,—হাস্য বিজলী-বিহীন; প্রণয় তখন অভিনেতার ভঙ্গীতে হেনার হাত ধরিল, মুখের কাছে মুখ লইয়া বিচিত্র ভঙ্গী-সহকারে গাহিল।

"বউ কয়না কথা অভিমানে।" –

তবুও কিন্তু হেনা কথা কহিল না, হাসিল না,—একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। প্রণয় চমকিত হইল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"তোমার কি হইয়াছে বল ত? হঠাৎ এ রকম হ'লে কেন?" পুনরায় সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হেনা বলিল—"আমার যা হইয়াছে তাহা কাহারও হয় না।" বিস্মিত হইয়া প্রণয় বলিল—"কি বল ত শুনি।" হেনা ম্লান-মুখে বলিল—"একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি, ওঃ তা ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়, শুনিয়া কাজ নাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক'দিন পূর্ব্বের কথা। হেনা একটা সোফায় অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল। বেলা দ্বিপ্রহর, প্রণয় অফিসে চলিয়া গিয়াছে। বিরহ-বেদনাক্লিষ্ট হেনা এই দীর্ঘ দ্বিপ্রহর কালটা উপন্যাস পড়িয়া কাটাইতেছিল। উপন্যাসখানার নাম "বহুরূপী," প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺জ্যোৎস্নাকুমারের অমর-লেখনী প্রসূত। গল্পের প্লট এইরূপ—"বাইশ বৎসরের যুবক চম্পক ষোড়শ বৎসরের যুবতী চামেলীকে বিবাহ করিয়াছিল। অষ্টপ্রহর পত্নীকে আদর সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। যদি কোনও দিন পত্নী-বিচ্ছেদ ঘটে, তবে আজকালকার লোকের মত আর বিবাহ করিবে না, আজীবন পত্নীর সুমধুর স্মৃতি বহন করিবে—ঘণ্টায় দশবার এবম্বিধ প্রতিজ্ঞা করিত। বিবাহ একবার বই দুইবার হয় না,—পতিপত্নীর সম্বন্ধ জন্মজন্মান্তরের ইত্যাদি কত তত্ত্বকথা আওড়াইত। কিন্তু বিধির বিধানে কঠিন ব্যায়রামে পত্নীর চেহারা বিশ্রী হওয়াতে চম্পক আবার এক সুন্দরী ষোড়শীকে বিবাহ করিল। উভয়ে প্রথমা পত্নীর উপর অমানুষিক ব্যবহার করিতে লাগিল,—ফলে চামেলী আত্ম-হত্যা করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইল।"—ইত্যাদি। প্লট সামান্য বটে, প্রতিদিন এই প্রকার কত ঘটনা আমাদের চক্ষুর উপর ঘটিতেছে। কিন্তু প্রতিভাশালী লেখক অপূর্ব্ব শক্তিবলে ভাবগুলি এমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, চিত্রগুলি এমন প্রাণস্পর্শী করিয়া আঁকিয়াছেন যে, উপন্যাসটি পড়িয়া বাস্ত-বিকই মনে হয়, পুরুষ বহুরূপী ও হৃদয়হীন। সরলা নারীকে মৌখিক আদরে ভুলায়, তাহাদের নিকট নিজকে কত প্রেমপ্রবণ বলিয়া প্রতিপন্ন করে, কিন্তু ঘটনার পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে। * *

হেনা পাঠ শেষ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে পুস্তকখানা বন্ধ করিল। বহিখানি কোলের উপর রাখিয়া ক্ষুদ্র মস্তকটি সোফার পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ভাবিতে লাগিল। নায়িকার জন্য সমবেদনায় হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল, হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ চাপা নিঃশ্বাস বহিতেছিল।

"বাস্তবিক পুরুষেরা কি এতই বিশ্বাসঘাতক?—তাহাদের প্রেম, যত্ন, ভালবাসা কি সকলি বাহ্যিক, সকলি ছলনা, চাতুরীময়? তাহা হইলে কি তিনি—? না, না, ইহা অসম্ভব। তিনি কি এমন হইতে পারেন! দূর্ ছাই, আমি একি ভাবিতেছি? একটা গল্প পড়িয়া আমি সব সত্য ভাবিয়া লইতেছি। দূর হউক, আর উপন্যাস পড়িব না।—"হেনা উপন্যাসখানা

মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মনকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের ন্যায় মনটা কিছুতেই বশে আসিতে চাহিল না। ক্রমাগত মনের সহিত লড়িয়া লড়িয়া ক্লান্ত হইয়া হেনা তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। তন্দ্রাভিভূত হইয়া এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।—দেখিল, "জ্বর হইয়া চেহারাটা যেন—মাগো—একেবারে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে! সেই মেমেদের মত আলতা গোলা রং, সেই চাঁদপানা মুখ, পটলচেরা চোখ, গৃধিনীর চঞ্চুর মত নাসিকা, মোমের পুতুলের মত গঠন—কিছুই নাই। এখন চেহারাটা ঠিক দাসীবাঁদীর মত দেখায়! তাই স্বামী বিরক্ত হইয়া আবার বিবাহ করিয়াছেন। বউটি দিব্য সুন্দরী, কত তাহার আদর! স্বামী তাহাকে রান্নাঘরে যাইতে দেয় না, একটু ঘামিলে বাতাস করে। আর হেনা, তাহার দু'বেলা পাক করিতে হয়, সব কাজকর্ম্ম করিতে হয়, আবার অবসর সময় নূতন বধূর সেবাও করিতে হয়—তখন তাহার বড় কান্না আসে। স্বামীর সেবা সকলেই করে, কিন্তু সতীনের সেবা কেউ কি করে গা? কিন্তু নিরুপায়, না করিলে স্বামী তিরস্কার করেন, প্রহার করিতে আসেন। হেনা একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে জিজ্ঞাসিল,—"আবার বিবাহ করিলে কেন? আমায় কত ভালবাস বলিতে, তবে আমায় ত্যাগ করিলে কেন?" স্বামী শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"যখন তোমার চেহারা ভাল ছিল, তখন ভালবাসিতাম। এখন তোমার চেহারা কুৎসিৎ হইয়াছে,—দেখিয়া ঘৃণা হয়। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়। দেখ ত নূতন বৌ কেমন সুন্দর। ইহাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব মনে করি!" হেনা কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নের প্রভাব তখনো দূর হয় নাই, সতীনের উদ্দেশ্যে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন উঠিয়া আরসীর কাছে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিল চেহারা পূর্ব্বের মতই সুন্দর আছে, উত্তেজনায় গণ্ডদ্বয় রক্তিমাভ হইয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে। তখন লজ্জা হইল "ছিঃ স্বপ্ন দেখিয়াও লোকে এমন করিয়া কাঁদে। যাক্ জলের কাছে বলিলেই কুস্বপ্ন খণ্ডন হইবে।" হেনা কক্ষ ছাড়িয়া পুকুর-ধারে উপনীত হইয়া জলের কাছে স্বপ্নের কথা বলিল। কিন্তু, কি জানি কেন মনের ভিতর যে একটা দাগ বসিয়াছিল, তাহা একেবারে মুছিলনা।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হেনার মনে হইল, একবার নিকষাদিদিকে স্বপ্নের কথাটা বলিতে হইবে। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র যেরূপ জানেন, তাহাতে সহজেই শান্তি বিধান করিতে পারিবেন।

সংবাদ পাইয়া নিকষা ঠাকুরাণী আসিলেন। তাঁহার বাড়ী প্রণয়কুসুমের বাড়ীর সন্নিকটে। শ্বশুরবাড়ীর লোক হইলেও হেনা তাহার সহিত ঠানদিদি নাতনী সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল, কারণ পাঠিকা রাগ করিবেন না, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী অপেক্ষা বাপের বাড়ীর সম্পর্কটা অনেক আপন মনে করে। নিকষা ঠাকুরাণীর শ্বশুরালয় কোথায় তাহা জানি না, কারণ পঞ্চাশ বৎসরবয়স্কা বৃদ্ধাকে কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। তবে বৃদ্ধা নিজমুখে অনেক সময় বলেন, তাঁহার দাদাশ্বশুরের প্রপিতামহ একজন প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে সকল তন্ত্রমন্ত্র ও গণনা বিদ্যা শিখিয়াছেন, তাহা ঐ শ্বশুরকুলের আশীর্ব্বাদে! স্বামীর মৃত্যুর পর নিকষা ঠাকুরাণী পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেছেন। গ্রামে কাহারও গরু হারাইলে, কাহারও কিছু চুরি হইলে, কাহারও বধূ গর্ভবতী হইলে গ্রামারমণীরা তাহার নিকট আসিয়া ফলাফল গণাইত। তিনি মাটীতে খড়ার রেখা টানিয়া বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া মৃত্তিকায় ঘন ঘন ফুৎকার দিয়া গণিতেন। তাহাতে প্রাপ্তি বিলক্ষণ হইত, কিন্তু বলাতে নাই, শতকরা নিরনব্বইটি গণনাই মিথ্যা হইত। আর শ'এর ভিতর একটা মাত্র গণনা সত্য হওয়াতে গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে দেবীর মত ভক্তি করিত। একবার এক 'নব্যবাবু' তাঁহার গণনার ভুল ধরিয়াছিল, কিন্তু তিনি সম্মার্জ্জনীহস্তে সাক্ষাৎ চামুণ্ডারূপে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া প্রতিপক্ষকে "রণং দেহি" বলিয়া এরূপ বজ্রনির্ঘোষে আহ্বান করিয়াছিলেন যেন যুবক বেচারা ভয়ে কাতর হইয়া "মা মা" বলিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল। সেই হইতে অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

নিকষাঠাকুরাণী আসিলে হেনা দুইতিনবার ঢোক গিলিয়া, একটু কাশিয়া ভরা গলায় বলিল—"নিকষাদি কাল একটা কুস্বপ্ন দেখেছি।" তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া নিকষাঠাকুরাণী স্বপ্নের কথা অনেকটা আন্দাজ করিলেন। হেনার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"বরের সম্বন্ধে বুঝি?" হেনা নীরবে মাথা নাড়িল!

"বুঝি প্রণয় আবার এক পরী বিবাহ করেছে, আর তুই তার পা টিপ্‌ছিস। কেমন তাই দেখেছিস ত?" হেনা বিস্ময়াভিভূতা হইল। আশ্চর্য্য এমন শক্তি! ঠিক্ ভাবে সব কথা বলিতে পারে! কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল—"স্বপ্ন কি ফলে নিকষাদি?" নিকষাঠাকুরাণী তাহার অবস্থা

দেখিয়া বলিলেন,—দূর তা ফলিবে কেন রে পাগ্‌লী! কি দেখিয়াছিস বল্‌ত?" হেনা বাষ্পাকুলকণ্ঠে সব বলিল—"কখন স্বপ্ন দেখিয়াছিস?" "আজ দুপুর বেলা—দেড়টায়।"

"আঃ, দিবাস্বপ্ন!" অধিকতর ভীত হইয়া হেনা বলিল—"হাঁ। তাতে কি হয়?" নিকষাঠাকুরাণী আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"আজ অমাবস্যা তিথি,—রিক্তাদোষ,—পশ্চিমে দিক্‌শূল। প্রণয়ের অফিসটা পশ্চিমে বটে। কুস্বপ্ন ফলিবারই সম্ভাবনা। আচ্ছা জলের কাছে স্বপ্নের কথা বলিয়াছিস?" হেনা মাথা নাড়িল, মনে একটু আশার সঞ্চারও হইল। "মনে মনে ত; জিহ্বায় উচ্চারণ কর নাই ত?" হেনার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল।

সে হতাশ ভাবে বলিল—"তা ত করিয়াছি।" নিকষাঠাকুরাণী উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন,—"বেশ করিয়াছ। কতবার সাবধান করিয়াছি, কুস্বপ্নের কথা জলের কাছে মনে মনে বলিও, জিহ্বায় উচ্চারণ করিও না। এখন কি আর করিব বাপু?" হেনা রোদন-বিহ্বলকণ্ঠে বলিল—"খণ্ডন করবার কোনও উপায় নাই।" নিকষা ঠাকুরাণী ধীরভাবে বলিলেন—"দাঁড়াও দেখি। আচ্ছা বৌটা কি যুবতী, কচি খুকীও নয়, বৃদ্ধাও নয়। মাথার চুল কালো, নীলবর্ণ নয়।" হেনা বিস্মিত ভাবে মাথা নাড়িল। "কপালে সিন্দূর, গায়ে গহনা, পরিধানে সধবার মত পাড় দেওয়া কাপড়, পায়ে আল্‌তা, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়াছিল, ডিগ্‌বাজী খাইতেছিল না। মৃদু হাসিতেছিল, অথবা কাঁদিতেছিল, ভেঙচাইতেছিল না।" ক্রমাগত মাথা নাড়িতে নাড়িতে হেনার মাথা ধরিয়া গেল। নিকষাঠাকুরাণী হর্ষমিশ্রিত চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আছে, ইহার শান্তিবিধান আছে। আটজোড়া নারিকেল, এক ধামা সুপারী, দু'বিড়া পান, আধমণ ছোলার ডাল, একমণ আতপ চাউল। দশটি টাকা ইত্যাদি।"

এখন নবীন পাঠিকারা রাগ করিবেন না, হেনা যদিও অনেক উপন্যাস নবন্যাস পড়িয়াছিল, তবুও নেহাৎ সত্যি কালের মেয়ের মত নিকষা ঠাকুরাণীর বিধিমত গোপনে শান্তিকার্য্য করিল। অবশ্য এরূপ কুসংস্কারের জন্য সে দণ্ডার্হ, কিন্তু তাহার পক্ষে এটুক বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না, অবস্থাভেদে লোকের মানসিক অবস্থাও ভিন্ন ধাতের হয়। ঈশ্বর না করুন, আপনাদের ভিতর কেহ এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে কি করেন, তাহা একবার বিরলে বসিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।

বলাবাহুল্য স্বস্ত্যয়নের উপকরণগুলি নিকষাঠাকুরাণীর গৃহে যথাসময়ে উপস্থিত হইল!

শান্তি-বিধান করিয়া হেনার মনটা একটু পাত্‌লা হইল! সে দুঃস্বপ্নের কথা প্রণয়কে জানাইল না, "ছিঃ এমন ছেলেমানুষী কথা শুনিলে তিনি হাসিবেন। আমার বড় লজ্জা করিবে।" সোমবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল। মঙ্গলবার শান্তিবিধান করিল। বুধ বৃহস্পতিবার নিরুপদ্রবে কাটিল। শুক্রবার দ্বিপ্রহরে হেনা সেই সোফায় শুইয়া একটা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে লাগিল। কি জানি উপন্যাস পড়িলে যদি আবার স্বপ্নদর্শন ঘটে! হেনা নীরস ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল! আবার সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চীৎকার-শব্দে বাড়ীর বৃদ্ধ ঝি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—"কাঁদ কেন মা, ভূতপেরেতের স্বপ্ন দেখ নাই ত? একটু নুন আনিয়া দিব?" হেনা ভ্রূকুটি করিল, ঝি অপ্রস্তুত হইয়া প্রস্থান করিল।

হেনা নীরবে সোফায় বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সেদিনকার ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড আজ প্রলয়মূর্ত্তিতে তাহার মনটা ছাইয়া ফেলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সারাসপ্তাহের আফিসের খাটুনীর পর আজ রবিবার, চব্বিশটি ঘণ্টা ছুটি, কোনও কাজ নাই। প্রণয় ভোর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তর ড্রইং রুমে বসিল। আলমারী খুলিয়া কবিতার খাতা বাহির করিল। কোন্ কোন্ কবিতা হেনার কাছে আবৃত্তি করা যায়, মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকবর্গ যে চিঠি লিখিয়াছেন, সে গুলোও বাহির করিল। এ গুলি তাহার বহুমূল্যের সম্পত্তি। ইস্, এ গুলি দেখিলে হেনা একবারে অবাক হইবে। এমন গণ্যমান্য লোকেরা আমার কবিতার প্রশংসা করিয়াছে।

সহসা প্রণয়ের মনে এক নূতন সঙ্কল্পের উদয় হইল। "আচ্ছা এক মজা করা যাক্। এই ধর আমি যেন লক্ষ্ণৌ বেড়াইতে যাইয়া গোপনে এক বিবাহ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু হেনার ভয়ে তাহাকে আনিতে পারিতেছি

না! মাসে মাসে তাহাকে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাই। সে যেন তাহাকে আনিবার জন্য মিনতি করিয়া চিঠী লিখিয়াছে। আচ্ছা, চিঠীটা টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিব, যেন বাক্সে রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাহা হইলে চিঠীটা হেনার হাতে পড়িবে। আমি মুখখানা চূণ করিয়া সব অস্বীকার করিব, পরে হেনার হাত ধরিয়া সব স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিব। হেনা সব বিশ্বাস করিবে,—হয়ত কাঁদিবে, নয়ত রাগিয়া বাপের বাড়ী যাইতে চাহিবে। তখন সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। হেনা লজ্জায় মরিয়া যাইবে। প্রণয় বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী চুষিতে চুষিতে এই মৎলব আঁটিয়া ফেলিল। মাঝে মাঝে মুখটা উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বাজে কাগজে চিঠীর একটা মুসাবিদা করিল, তৎপরে হাতবাক্স হইতে রঙ্গিন ডাক কাগজ বাহির করিয়া বাম হাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে নকল করিল। চিঠীটা অবিকল এইরূপ—— "লখ্নৌ।

শ্রীচরনে দাশির সত সহস্র প্রণাম যানিবেন? তারপর আপনী দাশিকে ভুলিলেন কেন, যানি না, আমি জে শ্রীচরনে কি অপরাধ করিয়াছি যানি না। আপনি লখ্নৌ বেড়াইতে আসিয়া দুঃখীনিকে গ্রহণ করিলেন? বাঙ্গালায় জাইয়া একটা কার্জের জোগাড় হইলেই দাশিকে লইয়া জাইবেন বলিআছিলেন কিন্তু অভাগিনির কপালের দোসে হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন। সবই অদিষ্টের দোস। কি আর করীব; বিদেসে য়াছি, লোকযন কেহ নাই জে সাহার্জ্য করে, বাবা গরীব মানুস। আমাকে দিয়া আসিবার মত শামথ্যও নাই। আর আপনার পত্তর না পাইয়া সাহস করেন না। শীঘ্র পত্তোত্রর দিবেন। অভাগিনি পথের দিকে চাহিয়া রহিল? সত সহশ্র প্রোণাম জানিবেন, আপনার পেরিত ২০৲ টাকা পাইআছি। অরো ১০৲ পাঠাইবেন, আপনার জ্ঞাত কারন লিখিলাম।"

প্রণয় চিঠীখানা তিন চারিবার পড়িল, উৎসাহে তাহার চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। লক্ষ্ণৌ হইতে এক বন্ধু চিঠী লিখিয়াছিল, ভাগ্যক্রমে ঠিকানাটা পেন্সিলে লেখা ছিল। এন্ভেলপের নাম ও ঠিকানাটা রবারে ঘসিয়া বাম হাতে ঠিকানা লিখিল। চিঠীখানা এন্ভেলপের ভিতর পুরিল। বাক্স হইতে এসেন্সের শিশি বাহির করিয়া চিঠীখানাতে মাখাইল, তারপর টেবিলের উপর খোলা ভাবে রাখিয়া হৃষ্টমনে শিস দিতে দিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া, শূন্যে আকাশের দিকে তাকাইয়া হেনা কি ভাবিতে-ছিল। তাহাকে দেখিয়া প্রণয় ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হেনা ত্বরিত-পদে সরিয়া গেল,—পুরুষদের হাসি সোহাগ সব ছলনা, সব চাতুরী। সে আর এই ছলনায় ভুলিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাটী ফিরিয়া প্রণয় দেখিল, হেনা মাথায় হাত দিয়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া রহিয়াছে। তাহার পদ্মপলাশনয়ন দুটি জবাফুলের মত লাল, দুই গণ্ডে অশ্রুধারার দাগ; মাথায় কাপড় নাই, চুলগুলি মুখে, স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রণয় মনে মনে বড়ই আমোদ অনুভব করিল; আবার একটু কষ্টও হইল, আহা বেচারাকে এমন করিয়া কাঁদাইল। কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ইহা ত আর সত্যি নয়,—একটু রগড় মাত্র। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া পরে হেনাও কত হাসিবে, আর মাঝে মাঝে এই গল্প বলিয়া তাহাকে কেমন জব্দ করিব।

কিন্তু অভিনয় এখনো শেষ হয় নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে মুখের হাসি লুকাইয়া, মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত ভার করিয়া প্রণয় ব্যস্ত ভাবে টেবিল, ড্রয়ার, আলমারী খুঁজিতে লাগিল। তারপর কম্পিতকণ্ঠে হেনাকে জিজ্ঞা-সিল—"একখানা চিঠী পাইয়াছ,—লাল এন্‌ভেলেপ?" হেনা নিরুত্তর, মুখের অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিল। অধিকতর ব্যস্ত ভাবে প্রণয় বলিল "কই দাও। বড় জরুরী চিঠী।" হেনা একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্চলের ভিতর হইতে চিঠীখানা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। প্রণয় তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল "পড় নাইত?" হেনা নিঃসন্দেহ হইল, উঠিয়া কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল।

প্রণয় চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল, দুই হাতে পেট টিপিয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল, তাহার দম আট্‌কাইবার উপক্রম হইল। ওদিকে হেনা শয়নকক্ষের দ্বারে খিল দিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

হায়! তাহার কপালে এই ছিল! মধ্যাহ্নে আহার করিল না, প্রণয় প্রমাদ গণিল। পরিহাস করিতে যাইয়া এইরূপ কাণ্ড ঘটিবে, সে মোটেই ভাবিতে পারে নাই। নিজে সমস্ত কথা বলিল, নিজের বাম হস্তের লিখা দেখাইল, কিন্তু হেনা কিছুই বিশ্বাস করিল না। প্রণয় হেনার স্বপ্নের কথা কিছুই জানিত না। তাহার একটু অভিমান হইল—ছিঃ হেনা তাহাকে এত নীচ মনে করে! সে আর হেনার কাছে ঘেঁসিল না, অভিমান হইয়াছিল, ভাবিল, দু'দিন বাদেই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া রাগ পড়িবে।

কিন্তু দু'দিন গত হইতে পারিল না। পরদিন বৈকাল বেলা অফিস-প্রত্যাগত প্রণয় দেখিল হেনা ঝি ও তাহার ছোটভাই কেতকীর সহিত পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে প্রণয় শ্বশুরের এক পত্র পাইল। শ্বশুর মহাশয় রাগে অভিমানে কোনও সম্বোধন বা পাঠ লিখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"তুমি মনে করিয়াছ, একটি কন্যার ভরণপোষণের ভার বহন করিতে আমি অক্ষম, তুমি কি মনে করিয়াছ, স্ত্রী বলিয়া তাহার উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে, তুমি কি মনে করিয়াছ, দ্বিতীয়া পত্নী সহ তুমি সুখে বাস করিবে, তুমি কি মনে করিয়াছ ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত না করিয়া আমি ছাড়িব—ইত্যাদি।" প্রণয় হাসিয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিল, সে শ্বশুরকে লিখিল,—"আমি ঐরূপ কিছুই মনে করি নাই। ব্যাপার কিছুই না। সে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক লিখিল। কিন্তু কোনই ফলই হইল না। কেহ তাহা বিশ্বাস করিল না। প্রথমে সে হাসিল, কিন্তু পরে রাগ হইল. আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক-গুলা এমন নির্ব্বোধ, সামান্য ঠাট্টাটাও ধরিতে পারে না? দু'দিন পর শ্বশুরের আর এক চিঠী আসিল। "তোমার চিঠী পড়িয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলাম কিন্তু তাহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হইল। হেনা উপর্য্যুপরি দু'দিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল। দিবা স্বপ্ন,—সময় ক্ষণ ইত্যাদি বিচার করিয়া এখানকার প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীকালী নারায়ণ জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বলিলেন ওরূপ স্বপ্ন না ফলিয়া পারে না। তোমাদের ওখানকার নিকষা ঠাকুরাণীও তাহাই

বলিয়াছেন। তার পরই তোমার চিঠী ধরা পড়ে। অতএব তোমার কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে।"

প্রণয় চিঠীখানা পড়িয়া একটু ভাবিল। নিকষাঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়া আসিল, তৎপরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া এক মৎলব স্থির করিয়া ফেলিল।

পূর্ব্বের মত হেনাকে বাম হস্তে এক চিঠী লিখিল "শ্রীচরনেসু—দিদি আমি য়াপনার চরণে অপরাধ করিয়াছি আমাকে সাস্তি দেন, কিন্তু আমার কারণে স্বামীর উপর রাগ করিতেছেন কেন। উহার দোষ কি। লক্ষৌ বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমার বিবাহ হয় না, পিতা গরীব! কাঁদিয়া কাটীয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়েন, তাই দয়া পরবশ হঈয়া তিনী আমাকে গ্রেহণ করেন। আমি য়াপনার দাশি যানিবেন। য়াপনি চলিয়া যাওয়াতে তিনি মরমাহত হইয়াছেন। শরিল ভাঙ্গিআ পড়িয়াছে, রাত্রী জোগে জ্বর হয়। য়ামি হঠাৎ আসিয়া পড়িআছি, নতুবা তাঁহার শেবা চলিত না। তাঁহার শরিল বড় খারাপ, সব সময় য়াপনার নাম করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন আপনি না আশিলে হয় ত তিনি——। অধীক কি আর লিখিব।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অভিমান চলে না, বিশেষ তিনি অনুতপ্ত। আপনি আসুন' আপনার স্বামী আপনি বুঝিয়া লউন.—আমি হতভাগিনি যেখানে চক্ষু যায় চলিয়া যাইব।—

ইতি আপনার দাসী মাধবী!—"

হেনা এই চিঠী পাইয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিল। আজি তাহারই কুব্যবহারে স্বামী পীড়িত, স্বামীকে সে এমন করিয়া দাগা দিয়াছে। কেন অনেকের স্বামীত বহু বিবাহ করে, তাই বলিয়া কি স্ত্রীর এমন অভিমান করিতে হয়। স্বামী যাহাতে সুখী হন, প্রত্যেক স্ত্রীর তাহা করা উচিত! হায় সেত তাহার বিপরীত করিতেছে, সেত কেবল আত্মসুখ খুঁজিতেছে। যে তুচ্ছ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না, সে আবার সতী বলিয়া বড়াই করে। হায় হায় আমার জন্য স্বামী আজ রোগশয্যায় শায়িত। হেনার পতিভক্তি প্রবল হইল।

আসিয়া দেখিল, স্বামী বাহিরের ঘরে ম্লান-মুখে বসিয়া আছে ও ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছে! হেনা ছুটিয়া যাইয়া স্বামীর বুকে ঝাপাইয়া পড়িল, আবেগে বহুক্ষণ উভয়ের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রথম মিলনের আবেগ

কাটিলে পর প্রণয় বলিল—"আমার অসুখের কথা মিথ্যা। আমি জানি স্ত্রী যতই অভিমান করুক, স্বামীর পীড়ার কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে না।"

হেনা ধীরে ধীরে বলিল—"আমার ছোট বোন্‌টি কোথায়? তাহাকে এবার হইতে সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিব।"

প্রণয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—"সব মিথ্যা। তোমাকে রাগাইবার জন্য ওরূপ করিয়া ছিলাম; কিন্তু তুমি যে তাহাতে এত কষ্ট পাইবে ভাবি নাই, আমায় ক্ষমা কর।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রহেলিকার যবনিকাখানি হেনার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল, সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লজ্জাবনত মুখে বলিল,—সমস্ত দোষ আমার। আমি স্বপ্নকে সত্য ভাবিয়া ঐ পত্র সত্য বলিয়া ভাবিয়া ছিলাম। হায় এতদিন এই বুকের উপর মাথা রাখিয়াও তোমার হৃদয় চিনিতে পারি নাই। স্বামিন্, প্রভো, আমায় ক্ষমা কর, ইহা স্বপ্ন-বিভ্রাট। আর কখন স্বপ্নে বিশ্বাস করিব না।"

প্রণয় পুলকভরে পত্নীকে বক্ষে তুলিয়া লইল, এবং তাহার বিম্বাধরে একটী প্রীতিপূর্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। হেনা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই সুখের পূর্ণতা উপভোগ করিল। তাহাদের শান্তি আবার ফিরিয়া আসিল।

সরলভেদী বটিকা।

লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ।

মিঃ বসু ট্রেণের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি ধূমপায়ী, অতএব দেখিয়া শুনিয়া যে কামরায় ধূমপানের বাধা নাই, সেই খানেই উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া বেশ আরাম করিয়া গদির উপর বসিলেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধের দোকান পাল এণ্ড কোম্পানির দোকানে বিজ্ঞাপনবিভাগে কায করেন; ইংরাজীতে যাহাকে বলে Advertising Agent, তিনিও একজন তাই। দোকানের সত্বাধিকারী "সরলভেদী বটিকা" নামে সম্প্রতি এক নূতন পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন; গোবিন্দপুরে গিয়া এই ঔষধের প্রচারকল্পে চেষ্টা করাই

মিঃ বসুর রেলযাত্রার উদ্দেশ্য। সে দেশের লোকেরা এই ঔষধ সম্বন্ধে তখনও কিছু শুনে নাই।

বসু সাহেব একজন পরিশ্রমশীল বুদ্ধিমান্ যুবক। তাঁহার মাসিক মাহিনাও খুব মোটা! সেইজন্যই জীবনের ছোটখাট সুখস্বচ্ছন্দগুলি উপ-ভোগ করা তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ট্রেণে তিনি সর্ব্বদাই প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হোটেলে আহার করিতেন এবং বর্ত্তমান ফ্যাসান অনুযায়ী বহুমূল্য ইংরাজী পোষাক পরিচ্ছদে নিখুঁত ভাবে সজ্জিত থাকিতেন। ইংরাজী আদব কায়দাও তাঁহার বেশ দুরস্ত ছিল।

মিঃ বসু যখন গাড়ীতে ঢুকিলেন, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। কিন্তু ট্রেণ ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে আর একটি হ্যাটকোটধারী ভদ্রলোক সেই কামরায় প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকটি মিঃ বসুরই সমবয়স্ক ; দুজনের আকৃতি ও গঠনে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। একটি খানসামা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেঞ্চির উপর চামড়ার একটি ছোট ব্যাগ রাখিয়া গেল। তারপর সে গাড়ীর দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি চাকরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"পারি ত দশটার গাড়ীতেই ফিরিবার চেষ্টা করবো। যদি আমার দেরি হয়ে যায়, তা হ'লে মিসেস চৌধুরীকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করো।" খানসামা উত্তর করিল,—"যো হুজুর।" এবং যাইবার সময় মনিবকে বিশেষ আদব কায়দার সহিত সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। মিঃ বসু বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহযাত্রী একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

টিকিট-কলেক্টর যথাসময়ে টিকিট দেখিতে আসিল। সে দুজনেরই টিকিট দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়া গেল,—"সেওড়াপুলিতে আপনাদের দু'জনকেই গাড়ী বদলে তারকেশ্বরের গাড়ীতে উঠতে হবে।" তাহার কথায় মিঃ বসু জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের দুজনেরই গন্তব্য স্থান এক।

মিঃ বসু চুরুট ধরাইয়া নিজ মনে নানাকথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযাত্রীও একটি সুন্দর রৌপ্য-নির্ম্মিত কেস হইতে একটি 'হাবানা' চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে দুজনেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

বসু সাহেব পূর্ব্বে কখনও গোবিন্দপুরে যান নাই। তাঁহার সহযাত্রী

কি কার্য্যে সেখানে যাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। কিন্তু ভদ্রলোককে হঠাৎ সে কথা জিজ্ঞাসা করা ইংরাজী সভ্যতার বাহিরে; কাজেই তিনি মনের কৌতূহল মনে চাপিয়া সংবাদপত্র-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিলেন কাগজের এক স্থলে লেখা রহিয়াছে,—"অদ্য অপরাহ্নে গোবিন্দপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ চৌধুরী এই চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।"

ইহা পড়িয়াই মিঃ বসুর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সহযাত্রীর সহিত আর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না! তাঁহার স্বভাব-সুলভ মিষ্ট স্বরে সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোবিন্দপুর বোধ হয় একটি ছোট গ্রাম।" সহযাত্রী উত্তর করিলেন,—"আমারও সেই রকম বোধ হয়। আমি পূর্ব্বে কখনও সেখানে যাইনি। এই প্রথম যাচ্ছি।"

মিঃ বসু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি সেখানে কি নূতন হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন কর্‌তে যাচ্ছেন?"

সহযাত্রী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু আপনি জান্‌লেন কি ক'রে, আমি সেখানে যাচ্ছি? বোধ হয় আপনি সেখানকার লোক!"

মিঃ বসু বলিলেন,—"না। আমি এ সংবাদ এইমাত্র ষ্টেট্‌সম্যানে পড়্‌লাম। মহাশয়ের নামই বোধ হয় মিঃ চৌধুরী।"

সহযাত্রী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমারই নাম। এই গ্রামের নামও আমি পূর্ব্বে জান্‌তুম না। কিন্তু এ প্রকার দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপনে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে, শুনে সেখানকার লোকেরা আমাকে এ কাজের জন্য ভারি পীড়াপীড়ি করে ধরেছে। আমি তাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে সেখানে যাচ্ছি। অন্য দরকারী কাজ সব ফেলে, অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আমাকে এ কাজ কর্‌তে যেতে হচ্চে। তা ছাড়া আমার শরীরটাও আজ তত ভাল নয়। খালি ঘুম পাচ্ছে!"

মিঃ বসু বলিলেন,—"আপনার শরীর অসুস্থ শুনে বড়ই দুঃখিত হ'লাম। বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রমে এ রকম হয়েছে।"

মিঃ চৌধুরী বলিলেন,—"না ঠিক তা নয়। আমার লিভারের দোষ ঘটেছে বলে মনে হয়। এ রকম প্রায়ই আমাকে ভুগ্‌তে হয়।"

মিঃ বসু উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"এর জন্য আপনাকে এত কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয় ? এ অসুখ ত, সহজেই সেরে যায়। আপনি সরল-ভেদী বটিকা সেবন করে দেখুন। দু'চার দিনের মধ্যে একেবারে নীরোগ হয়ে যাবেন। এ বটিকা লিভারের পক্ষে অমোঘ ঔষধ। আমার কাছে এক বাক্স আছে। আপনি দয়া ক'রে একটী বড়ি নিলে বিশেষ বাধিত হব।"

মিঃ চৌধুরী ধীরে ধীরে বলিলেন—"না আপনার কথা রাখ্‌তে পার্‌লাম না, মাপ কর্‌বেন! আমি পেটেণ্ট ঔষধের উপর একেবারে চটা। ওসবে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই।" কিন্তু মিঃ বসু নাছোড়বান্দা. তিনি জিদ করিতে লাগিলেন—"কিন্তু মহাশয় এ বড়িগুলির গুণ অসাধারণ। এ যেমন তেমন পেটেণ্ট ঔষধ নয়। এর বিস্তর কাট্‌তি, একবার পরীক্ষা করেই দেখুন!"

চৌধুরী সাহেব বলিলেন—"কই পূর্ব্বে ত এ ঔষধের নাম কখনও শুনিনি। আজ এই প্রথম আপনার নিকট শুন্‌লাম।"

মিঃ বসু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—এঁ্যা, বলেন কি মহাশয়? এর নাম শোনেন নি? এ বটিকার বিজ্ঞাপন ত সর্ব্বত্রই দেওয়া হয়েছে।"

চৌধুরী সাহেব একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ওঃ বিজ্ঞাপন। সে ত আমি পড়িই না। বিশেষতঃ ঔষধের বিজ্ঞাপন। ঐ সব হাতুড়ে ডাক্তারের তৈরি ওষুধের নাম শুন্‌লেই ভয় পায়।"

এই উত্তর শুনিয়া মিঃ বসু হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। চৌধুরী সাহেবও তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। একজন অপরিচিত লোক তাঁহার শরীর লইয়া এরূপ অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে, তিনি তাহা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দুজনেই গুম খাইয়া গেলেন।

মিঃ বসুর সহিত আর কথা বলিবার ইচ্ছা না থাকায় বা পেটের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ায়, যে কারণেই হউক চৌধুরী সাহেবের তন্দ্রা আসিল। তিনি গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ট্রেণ যথাসময়ে সেওড়াফুলি ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। চৌধুরী সাহেব তখনও ঘুমে অচৈতন্য!

মিঃ বসু গাড়ী থামিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! ঘুমন্ত ব্যারিষ্টরের প্রতি

একবার তাকাইলেন, তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। পেটেন্ট ঔষধের উপর তাঁহার সহযাত্রী যে ঘৃণাব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, একথা তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি পেটেন্ট ঔষধের এজেন্ট, সেই পেটেন্ট ঔষধকে তাচ্ছিল্য করা আর তাঁহাকেই তাচ্ছিল্য করা একই কথা। এই কথাই বারবার তাঁহার মনে হইতে ছিল। তিনি ইহার জন্য আপনাকে বড়ই অপমানিত বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নিজে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব অঘোরে ঘুমাইতেছেন। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আবার ৫০ মাইল পরে গাড়ী থামিবে। সহযাত্রীর অবস্থা ভাবিয়া মিঃ বসু বড়ই উৎফুল্ল হইলেন। ভাবিলেন, অপমানের ঠিক প্রতিশোধ লওয়া হইল।

(২)

মিঃ বসু অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী গোবিন্দপুর ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি প্লাটফর্ম্মে নামিয়া দেখিলেন ষ্টেসনটি সুন্দর পতাকা ও লতাপাতায় সাজান হইয়াছে। নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তিনি খানিকক্ষণ অব্যবস্থিতচিত্তে প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদেশে তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন, কোন দিকে যাইবেন, কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না; এমন সময় একজন বৃদ্ধলোক, বোধহয় দেশের জমিদার, ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, আপনার নামই বোধহয় মিঃ চৌধুরী?"

হঠাৎ একটা ফন্দী বসু সাহেবের মাথার ভিতর খেলিয়া গেল, তিনি এক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে স্থির করিলেন! যদিও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু এমন ভাব দেখাইলেন যেন যদিও মিঃ চৌধুরী।

সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সভামণ্ডপে লইয়া গেল। হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য শেষ হইলে, তিনি সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও স্থানীয় সংবাদদাতাদের সম্মুখে ইংরাজী ভাষায় এক সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতৃগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ঘন ঘন করতালী দিতে লাগিল। বক্তৃতার শেষ

অংশ টুকুতে সকলের মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেটুকু আমরা নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিলাম,—

"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার এখনও দরকার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আর কিছুদিন পরে ইহার কোঁন প্রয়োজনিতা থাকিবে না। তখন ইহা অতীতের স্মৃতি স্বরূপ আমাদের মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে। সেদিন আসবার আর বেশী বিলম্ব নাই। মানুষের ক্ষমতা ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ বিকাশের ফল স্বরূপ পাল এণ্ড কোংর "সরলভেদী বটিকার" সৃষ্টি হইয়াছে; সেই বটিকারই কথা আমি বলিতেছি। আপনারা তাহা বোধহয় বেশ বুঝিতে পারিতেছেন! এই ঔষধের নাম আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই অদ্ভুত আবিষ্কার সকলেই একমুখে প্রশংসা করিতেছেন। ইহা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার শেষ ফল যে কি হইবে কেহই বলিতে পারেন না। এই বড়ী সেবনে প্লীহা যকৃৎ. জ্বর, পেটব্যথা, অম্বল, অগ্নিমান্দ্য, মাথাধরা, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, সর্দ্দি, কাশী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগই আরোগ্য হয়! এক কথায়, ইহা মনুষ্যকে নবজীবন দান করে। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুর যাবতীয় রোগে ইহার ফল অব্যর্থ। চিকিৎসা-জগতে ইহা অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। ইহার অসম্ভব কাটতি; লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্র। মোটের উপর পৃথিবীর সবাই যখন এই ঔষধ সেবন করিবে, তখন পৃথিবীতে রোগ তাপ জরা বার্দ্ধক্য থাকিবে না। এই ঔষধের গুণ দেখিয়া স্বয়ং চিত্রগুপ্তকেও চিন্তিত হইতে হইবে। ধরাতল সুখ ও শান্তির আগার হইবে। সকলেই চিরযৌবন ভোগ করিবে। তখন আর এরূপ দাতব্যচিকিৎসালয়ের কোন প্রয়োজনই থাকিবে না।

কিন্তু সেজন্য আমাদের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ এই সকল হাঁসপাতাল বাড়ী তখন লাইব্রেরী, যাদুঘর ও সাধারণ পাঠাগারে পরিণত হইয়া দেশবাসীকে কর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবে। মানুষের তিমিরাচ্ছন্ন কুসংস্কারপূর্ণ মনকে সত্য ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবে। নরনারীর স্বাস্থ্যের সহিত তাহাদের শিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট বলাই বাহুল্য। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, সে শুভদিন আসিবার বেশী বিলম্ব নাই। এই সরলভেদী বটিকা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবে।"

মিঃ বসু আসন পরিগ্রহ করিলেন। ঘন ঘন করতালিতে সভামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল। তারপর জমীদার মহাশয় মিঃ বসুকে গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলেন। জমীদারবাবু যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। তিনি যে তাঁহার অশেষ কাজ ফেলিয়া এতটা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাদের সভায় যোগদানপূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই মহত্ত্বের পরিচায়ক। তজ্জন্য তিনি যে আমাদের ধন্যবাদার্হ তাহা বলাই বাহুল্য। জমীদার মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে একজন পিওন একখানি টেলিগ্রাম লইয়া মিঃ বসুর দিকে অগ্রসর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—"আমারই টেলিগ্রাফ বোধ হয়, দেখি।" পিওন স্বহস্তে তাহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল।

টেলিগ্রামখানি জমীদারের নামে সম্বোধন করা হইয়াছিল। তাহাতে লেখাছিল,—"বড়ই দুঃখের কথা, যে ট্রেণে দুর্ঘটনা ঘটায় যথাসময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না। আজ আর ওখানে উপস্থিত হবার কোন সম্ভাবনা নাই। সবিশেষ সংবাদ পত্রযোগে জানাইতেছি। আমার ত্রুটি আপনারা মার্জ্জনা করিবেন— ইতি মিঃ বি, সি, চৌধুরী।"

মিঃ বসু টেলিগ্রাম পড়িয়া জমীদারকে বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে মিসেস চৌধুরীর নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়াছেন। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আপনারা কিছু মনে করিবেন না।"

এই বলিয়া তিনি ষ্টেসনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহার স্ত্রীর অসুখের কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখ জানাইলেন। পথে যাইতে যাইতে মিঃ বসু ভাবিতে লাগিলেন। আজ আমার কি সুদিন। আশ্চর্য্য-প্রদীপের গল্পের মত একদিনের জন্য সভাপতি হ'য়ে কতই না আদর-অভ্যর্থনা উপভোগ করা গেল। তার সঙ্গে আমার যা কাজ ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচার করা তাও চূড়ান্তভাবে হ'ল;—আজ একঢিলে দু পাখিই মারিলাম।"

পরদিন প্রাতঃকালে মিঃ চৌধুরীর পত্র জমীদার মহাশয়ের হস্তগত হইল। তাহা পড়িয়া তথাকার লোক হাসিয়াই অস্থির। তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল ক্রমেই এই মজার কথা সকলে ভুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু

সেই "সরলভেদী বটিকা"র কথা কেহই ভুলিতে পারিল না। বিশেষতঃ চৌধুরী সাহেবের প্রাণে প্রাণে তাহা গাঁথা রহিল। জীবনে এমন বেয়াকুব তাঁহাকে আর কখনও হইতে হয় নাই। যে জিনিষ লইয়া তাঁহার উপর দিয়া এতবড় একটা পরিহাস হইয়া গেল, তাহা কি ইহজীবনে ভোলা যায়!

অনুরোধে।*

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

[১]

"তা হ'লে তুই কি বল্‌ছিস্, তোর কথায় এখন কি আমায় এ সুযোগ ত্যাগ ক'র্ত্তে হ'বে? না আমি তোর কোন কথা শুন্‌তে চাই নি। তা'কে আমি কিছুতেই ছাড়্‌ব না।" ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রকে এ কথা বলিয়া বেণীমাধব তাহার শেষ অভিপ্রায় জানিবার আশায় মুখের দিকে তীক্ষ্ণ কঠোর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

হেমেন্দ্র তাহার জ্যেষ্ঠের এরূপ কর্কশ উত্তেজিত স্বর আর কখনও শোনে নাই। চিরকালই সে ভ্রাতার নিকট হইতে পিতার অধিক স্নেহ পাইয়া আসিয়াছে! ভ্রাতার স্নেহের মধ্যেই সে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতামাতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ভ্রাতাই তাহাকে লালন-পালন করিয়াছেন। আজ প্রথম ভ্রাতার মুখ হইতে এই ভাবের কথা শুনিয়া ভ্রাতার একান্ত অনুরক্ত হেমেন্দ্র কিছুকাল যেন স্তম্ভিতের মত রহিল। সে বুঝিল, ভ্রাতাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে সহজে ফিরাইতে পারিবে না। ভ্রাতার কথায় তাহার হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তবু একটু সাম্‌লাইয়া যতটা সম্ভব বিনীত ভাবে সে বলিল—"আমি আর কি বল্‌ব, তুমি যা করবে, তার ও'পর আমি আবার কি বল্‌তে পারি। তবে তবে—।" সাহস করিয়া হেমেন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিল না।

বেণীমাধব পূর্ব্বাপেক্ষাও কঠোর পরুষ স্বরে বলিলেন—"আমি যা করব

* একটি ইংরাজী গল্পের ভাব লইয়া লিখিত।

তাতে তো'র কিছু বল্‌বার নেই। আবার "তবে তবে" ওসব আমি পছন্দই করি না, যা বল্‌তে হয়, পরিষ্কার ব'লে ফেল, তোরা এখন নবাবাবু, নব্য রুচি তোদের! আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করাট, কি আর তোদের এখন পোষাবে!"

হেমেন্দ্র এবারে আরও দুঃখিত হইল। লজ্জায় ও ক্ষোভে তাহার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। আজ পর্য্যন্ত যে সে ভ্রাতার মুখের উপর একটা উচু কথা ব'লে নাই। দাদা যাহা বলিতেন, মাথা নীচু করিয়া সে তাহাই শুনিয়া যাইত। ভ্রাতার আজ্ঞা তাহার সর্ব্বথা পালনীয় বলিয়া মনে হইত। পিতার ন্যায় ভক্তিভাজন ভ্রাতার উপর ভার দিয়া আজ পর্য্যন্ত সে সংসারের সমস্ত কার্য্যে সম্পর্ক-হীন ছিল। এবারে পত্নী কমলার ন্যায্য অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই সে একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠ বেণীমাধবও তাহাকে পুত্রাপেক্ষা ভালবাসিতেন, তিনি যাহা করিতেছেন, সে সমস্তই তাহাদের জন্য, ইহাও হেমেন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। কনিষ্ঠের কোন অসুখ অসুবিধা না হয়, এজন্য যে তাহার ভ্রাতা প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাহাও হেমেন্দ্রের বিশেষ ভাবেই জানা ছিল। কিন্তু আজ সেই দাদার মুখে এসকল কথা শুনিয়া সে প্রাণে বিষম আঘাত পাইল। সে বুঝিল, এ সঙ্কল্প হইতে দাদাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইলে দাদার সেই অনাবিল, মুক্ত স্নেহ হারাইতে হইবে। হেমেন্দ্র সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, ভ্রাতার স্নেহ, ভ্রাতার ভালবাসা সে ত্যাগ করিতে পারে না। দাদাকে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কাজেই ভীতিজড়িত অথচ ব্যথিতকণ্ঠে সে বলিল—"দাদা, আমি বল্‌ছিলাম, কাজটা কি ভাল হ'বে? বেচারারা বড় গরিব, তাদের ও'পর জুলুম ক'ল্লে তারা যে প্রাণে মারা যায়।"

হেমেন্দ্রের কথায় বেণীমাধবের অভিমানদৃপ্ত হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ে তিনি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন—"না ভাল হ'বে কেন, বড় মন্দই হবে! গরিব—গরিবের আবার এত অহঙ্কার—এত দেমাক! একটু ভাব্‌বার অবকাশ নেই, যা'র তা'র বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই যেন হ'ল, আমার ক্ষতি ক'ত্তে চেষ্টা করেছিল না? এখন দেখে নিক্ একবার, আমি কেমন বেণীমাধব ঘোষ!"

হেমেন্দ্র দেখিল, আর কথা বাড়ান বৃথা, দাদা কোন প্রকারেই এ পথ ত্যাগ করিবেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জোর করিয়া কোন কথা বলিবার

মত সাহসও তাহার ছিল না। কাজেই সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বেণীমাধবও ভাবিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্র যে তাঁহার কত আদরের, কত স্নেহের ; কি জানি, যদি ভাই মনে কষ্ট পায়, কিন্তু স্ত্রীর কথায় যে হেমেন্দ্র তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইয়াছে, এই কথা মনে হইবামাত্র তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। ক্রোধ ও বিস্ময় যুগপৎ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

(২)

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেই স্ত্রী কমলা হেমেন্দ্রকে ধরিয়া বসিল। বলিল,—"কি ক'ল্লে ওদের ?"

হেমেন্দ্র দেখিল, মহাবিপদ, একদিকে তাহার দাদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অপরদিকে পত্নী কমলাও জেদ ধরিয়া বসিয়াছে। সে কমলার আরও নিকটে আসিয়া একটু চিন্তা করিয়া কৃত্রিম কঠোরতার সহিত বলিল—"তা'দের জন্য তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন ? মেয়েমানুষের অত সাত-সতেরর মধ্যে থাক্‌বারই বা দরকার কি। দাদা যা কর্‌বেন, তাই হ'বে।"

কমলা বিবাহের পর আজ পর্য্যন্ত স্বামীকে কোনও অনুরোধ ক'রে নাই, স্বামীর নিকট এই তা'র প্রথম প্রার্থনা। তাহাতে স্বামীর মুখে এই কঠোর উত্তর শুনিয়া তাহার কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, নেত্রদ্বয় ছলছল করিয়া উঠিল। সে করুণকণ্ঠে বলিল—"তা হ'লে দেখ্‌ছি, তা'রা সত্যি পথে বস্‌বে। তুমি তা'দের হ'য়ে দুটো কথাও বল্‌তে পার্‌বে না? দাদা যা কর্‌বেন, তা ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছি, হয়ত কালই ক্রোক এনে ঘটিবাটি যা কিছু আছে নিয়ে ছেলেপিলে শুদ্ধ তা'দের পথে দাঁড় করিয়ে দেবেন।" বলিতে বলিতে কমলার দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

হেমেন্দ্র অন্তরে বিষম আঘাত পাইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া আবার বলিল—"কমলা, তুমি বুঝ্‌ছ না, তাই বৃথা দুঃখ কচ্ছ, আমি দাদাকে বল্‌তে ত্রুটি করি নি, তিনি নিতান্ত নারাজ! এর জন্য তাঁ'র সঙ্গে একটা জোরজবরদস্তি করা ত যায় না। তা হ'লে লোকেই বা কি বল্‌বে?"

হেমেন্দ্রের এই ন্যায্য কথার উত্তরে কমলাও হঠাৎ আর কিছু বলিতে পারিল না। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনোমালিন্য ঘটিতে পারে জানিয়াও স্বামীকে সে কি করিয়া অনুরোধ করিবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চাপাগলায় সে বলিল—"তা হ'লে কোন উপায়ই তাদের হবে না ?"

হেমেন্দ্র খানিকক্ষণ মৌনভাবে কি চিন্তা করিয়া নৈরাশ্যজড়িত স্বরে বলিল—"সেই রকমত, দেখ্‌ছি, দাদা ওদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। অবশ্য চটবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। জান ত নীরদ কি ব্যবহারটাই করেছিল।"

কমলা বলিল—"তা ত জানি, কিন্তু মানুষ একদিন একটা ভুল ক'রে ফেলেছে বলে, তা'র কি আর ক্ষমা নেই?"

হেমেন্দ্র এবার হাসিয়া বলিল—"তুমি যেমন বুঝ্‌ছ, এমন যদি পৃথিবীর সবাই বুঝ্‌ত, তা হ'লে আর ক্ষমার জন্য ভাব্‌তে হ'ত না! আর জানত সে ভুলটাও একটা যা তা নয়, টাকার জোর না থাক্‌লে নীরদের জন্য আমাকে সেবার জেলে পচ্‌তে হত।"

কমলা স্বামিসম্বন্ধে এতবড় একটা অনিষ্টের কথা মনে করিতেও যেন শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার বুকটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। সে আকুলকণ্ঠে বলিল,—"দেখ ও কথা আর তুলো না।" তারপর একটা ঢোক গিলিয়া বলিল,—"যা হ'য়ে গেছে সে ত গেছে, এখন তা'দের ক্ষমা কর, নীরদবাবু নিজের কাজের জন্য এখন অনুতপ্ত, তোমার নিকট অনেকবার ক্ষমাও চেয়েছেন।"

এত বড় শত্রুর ও'পর এত দয়া! পত্নীর উদারতায় হেমেন্দ্র বিস্মিত ও পুলকিত হইল। সে পত্নীকে আপন বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—"তোমার সব কথাই ত বুঝ্‌ছি। আমি যদি পার্‌তুম, তবে তোমাকে এত সুপারিস্‌ কত্তে হ'ত না। আমার ত তাদের ও'পর আর কোন রাগ নেই; কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে কৈ? দাদা বল্‌ছেন, 'প্রতিশোধ নেব তবে ছাড়্‌ব।' দাদার মত না হ'লে আমি কি কর্‌ব? জানত, আমি সব পারি, কেবল পারি না, দাদার কথার প্রতিবাদ কত্তে।"

(৩)

সন্ধ্যাবেলা মুরলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল ভাই?"

মুরলার বিষাদ-মলিন মুখ দেখিয়া কমলার মুখও শুষ্ক হইয়া গেল, তাহার হৃদয়ে সহানুভূতি যেন জাগিয়া উঠিল। কাল সে মুরলাকে বলিয়াছিল,—সে যে ভাবে হউক, তাহাদের রক্ষা করিবেই, এখন সে আবার কি করিয়া বলিবে,—"আমি কিছু করিতে পারিব না ভাই!" তাই প্রকৃত কথা বলিতে কমলার সাহসে কুলাইল না। সে জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"তার জন্যে অত ভাব্‌ছিস্‌ কেন? আমি ত বলেছি, যে ভাবেই হউক, তোদের যাতে ভিটামাটি না যায় তা ক'র্‌ব।"

মুরলা অনেকটা আশ্বস্তা হইয়া বলিল—"তা হ'লে ভাই, আমি এখন যাই। খোকার বড্ড জ্বর হ'য়েছে, বড্ড ছট্‌ফট্ কচ্ছে। এ সংবাদটা জান্‌বার জন্যে বড্ড ব্যস্ত ছিলেম। আর উনিও বার বার ব'ল্‌তে, লাগ্‌লেন, তাই খোকাকে একা রেখেই এসেছি।" বলিয়া মুরলা চলিয়া গেল। কমলা মুরলাকে আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু কি করিয়া সে কথা রাখিবে, তাহা কিন্তু ভাবিয়া পাইল না।

মুরলা ও কমলা একই গ্রামের মেয়ে। শৈশব হইতে উভয়ের মধ্যে খুব একটা সখ্য ভাব ছিল, উভয় উভয়কে সহোদরার মত ভালবাসিত। বিধাতার নির্ব্বন্ধে আবার একই গ্রামে উভয়ের বিবাহ হইল।

মুরলার স্বামী নীরদের অবস্থা পূর্ব্বে মন্দ ছিল না, কিন্তু চরিত্রদোষে সে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। বিবাহের পর বহুদিন অতীত হইয়াছে। মুরলা ও কমলা সর্ব্বদা দেখা শুনা করিয়া মিলিয়া মিসিয়া নিজেদের সে পূর্ব্বপ্রীতি পূর্ব্ব ভালবাসা বজায় রাখিয়াছিল। কমলা বড় ঘরে পড়িয়াছিল বলিয়াও মুরলাকে কোন দিন অবজ্ঞা না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও বরং বেশী ভালবাসিতে আরম্ভ করিল।

কিছুদিন পরে নীরদ তাহাদের এই একটানা ভালবাসার স্রোতের মুখে প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিল। বেণীমাধবের কোন সরিক ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া পূর্ব্ব শত্রুতা উদ্ধারের জন্য একজন প্রজা দাঁড় করিয়া হেমেন্দ্রের নামে জবরদস্তির এক মোকদ্দমা খাড়া করিল। নীরদ তাহাতে সাক্ষী হইল। ঘটনাচক্রে ঐ মোকদ্দমা একমাত্র নীরদের মিথ্যাসাক্ষ্যে এমন ভাব ধারণ করিল যে, হেমেন্দ্রের জেল না হইয়া আর যায় না। তখন বেণীমাধব পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া বহু চেষ্টায় হেমেন্দ্রকে রক্ষা করিলেন।

বেণীমাধবের প্রকৃতি খুব মন্দ ছিল না, তিনি নিজে বড় কাহারও সহিত লাগিতে যাইতেন না। কিন্তু টাকাটাকে তিনি বেশ ভালরূপে চিনিতেন। যে কেহ কোন কারণে তাঁহার দু'পয়সা লোকসান করাইলে তিনি তাহার প্রতিশোধ যে ভাবে হউক লইয়া তবে ছাড়িতেন। নীরদের ব্যবহারে তিনি একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। একে ভ্রাতার উপর এই পাশব অত্যাচার, তার উপর এক সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা খরচ! তাঁহার সমস্ত ক্রোধ সরিককে ছাড়িয়া নীরদের উপর গিয়া পড়িল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ভাবে হউক, নীরদকে জেলে পুরিয়া তবে ছাড়িবেন। তাহার পর চক্রান্ত করিয়া তিনিই আর একজনের

হাত দিয়া নীরদকে দুইশত টাকা ঋণ দিলেন এবং সেই খত ক্রয় করিয়া আদালতে নীরদের নামে তিনি সায়সুদ তিনশত টাকার ডিক্রী করিয়াছেন। নীরদ এখন নিঃস্ব,—কপর্দ্দক-শূন্য, টাকা শোধ করিবার কোন সম্ভাবনাই তাহার নাই, বেণীমাধবের ইচ্ছা, এ সুযোগে নীরদকে ভিটামাটী ছাড়া করিবেন।

স্বামীর ব্যবহারে—স্বামীর অসচ্চরিত্রতায় মুরলা বরাবরই প্রাণে প্রাণে দুঃসহ যাতনা অনুভব করিতেছিল, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিত না; অশ্রুসিক্ত নেত্রেই তাহার দিন অতিবাহিত হইত। এত কষ্টের মধ্যেও মাঝে মাঝে কমলার সহিত দেখা করিয়া তাহার বড় স্নেহের—বড় আদরের কমলার সুখে সে অনেকটা শান্তিলাভ করিত; কিন্তু যখন সে শুনিল, তাহারই স্বামী কমলার স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন সে আর নীরব থাকিতে পারিল না; কিন্তু তখন তাহার অনুনয়, বিনয়, তিরস্কার কিছুতেই কিছু হইল না।

এখন কিন্তু নীরদ একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। মুরলার গুণেই কিনা জানি না, এখন নীরদ অসৎসংসর্গকে সাপের মত ভয় করে। অসতের নিকট হইতে কোন সহায়তা লাভকেও সে এখন ঘৃণার চক্ষে দেখে। অসৎ-সংসর্গের ফল কিন্তু বেশ ভালরূপেই ফলিয়াছিল;—একদিন যে অর্থ সে দুই হাতে উড়াইয়াছে, আজ সে অর্থের জন্য সে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অভাবগ্রস্ত নীরদের দিনগুলি বড়ই দুঃখে—বড়ই কষ্টে অতিবাহিত হইতেছিল। এ বিপদ্‌সময়ে তাহার আর আপনার বলিবার কেহই ছিল না।

স্বামীর সেই ব্যবহারের পর হইতে মুরলা আর নিজের কালো মুখ লইয়া কমলার কাছে যাইতে সাহস করিল না। বহুকাল উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। কমলা সেই ঘটনা হইতে মুরলাকে কোন্ ভাবে দেখিতেছে, তাহাও মুরলা জানিত না; তথাপি আজ স্বামি-পুত্রের ভবিষ্যৎবিপৎপাতের চিত্র সম্মুখে দেখিয়া সাধ্বী আর স্থির থাকিতে পারিল না—মান-অভিমান, লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিয়া স্বামি-পুত্রের রক্ষার জন্য বাল্যসহচরী কমলাকে গিয়া ধরিয়া বসিয়া আশঙ্কা ও উদ্বেগপরিপূর্ণ হৃদয়ে ছল ছল নেত্রে বলিল,—"ভাই, আমার স্বামী তো'দের কাছে ঘোর অপরাধী জানি, তো'কে তাঁ'র জন্যে কোন অনুরোধ করা অসঙ্গত, তাও জানি, কিন্তু তুই যদি এ যাত্রা রক্ষা না করিস্, তা হ'লে আমরা যে একেবারে পথে বস্‌ব।" বলিতে বলিতে

যখন মুরলা কমলার হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; তখন স্বামীর প্রতি নীরদের পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা ভুলিয়া কমলা এতটুকু হইয়া গিয়া হাসিমুখে মুরলাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"এ কথা বল্‌তে তুই এত কুণ্ঠিত হচ্ছিস্ কেন ভাই? এ ত আমার নিজের কাজ, তুই ভাবিস্ নি, যাতে তো'দের কোন বিপদ্ না হয়, তা আমি কর্‌ব।"

দুপুর-বেলায় কি একখানা বই লইয়া হেমেন্দ্র বড় মনোযোগের সহিত পড়িতেছিল। হঠাৎ "কাকাবাবু" বলিয়া যেন কে ডাকিল, সে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভিতরের দরজা দিয়া নীরদের অষ্টমবর্ষীয় মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একদৃষ্টিতে বালিকার দিকে চাহিয়া হেমেন্দ্র দেখিল, তাহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত, মুখ মলিন, বিষণ্ণ। বালিকা ব্যথিতকণ্ঠে বলিল,—"কাকাবাবু, মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

হেমেন্দ্র বিস্মিত হইল; সে জানিত, তাহার স্ত্রী কমলা ও মুরলার মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কিন্তু মুরলা তাহাকে হঠাৎ কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাই বিস্মিতের মতই বলিল,—"কে ডাক্‌ছে তোর মা?"

বালিকা বলিল,—"হাঁ কাকাবাবু, মা ডাক্‌ছেন, খোকার বড্ড অসুখ করেছে, বড্ড ধড়্‌ফড়্ কচ্ছে, বাবা ডাক্তার ডাক্‌তে গেছেন, খালি বাড়ী, মা ও কাকিমা কাঁদ্‌ছে, তাদের বড্ড ভয় কচ্ছে, তাই মা আপনাকে একবার আস্‌তে বল্লেন?" বলিয়া বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার রৌদ্রতপ্ত রঞ্জিত গণ্ড বহিয়া নেত্রজল গড়াইয়া পড়িতেছিল। হেমেন্দ্র পুস্তকখানা শয্যার উপর ফেলিয়া উঠিয়া পড়িয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ভয় কি লক্ষ্মী মা আমার, চল আমি যাচ্ছি,—খোকার অসুখ করেছে, তা ত আমি শুনিও নি, তোর কাকিমাও ত আমায় বলে নি! কি অসুখ করেছে মা তার?"

বালিকা বলিল—"বড্ড জ্বর হয়েছে কাকাবাবু, বড্ড ভুল বক্‌ছে। কবিরাজমশায় দেখছিলেন, তিনি ডাক্তার দেখাতে বল্‌লেন, বাবা তাই ছুটে গেল।"

অনতিবিলম্বে হেমেন্দ্র নীরদদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। তখন নীরদও ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ডাক্তার নাড়ী-টিপিয়া, থার্ম্মোমেটার লাগাইয়া, লক্ষণ দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, এবং হেমেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ নহে।"

(৪)

নীরদ ও হেমেন্দ্র মুখামুখি হইয়া রোগীর কথা ভাবিতেছিল। উভয়ের মুখ চিন্তা-মলিন, বিষণ্ণ; নীরদ মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের গুরু ভার হাল্কা করিতেছিল। হঠাৎ তাহারা দেখিল, বেণীমাধব আদালতের পেয়াদা ও আর পাঁচসাতজন লোক লইয়া নীরদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। দেখিয়া নীরদ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, সম্মুখে প্রাণ-প্রিয় পুত্র মৃত্যুশয্যায়, কখন মারা যায়, তাহার স্থিরতা নাই, তার উপর আবার এই বিপদ! উদ্যতফণ বিষধর দেখিয়া লোক যত ভীতত্রস্ত না হয়, নীরদ তদপেক্ষা বেশী ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাহার মাথার উপর যে আবার এমন ভীষণ কাল-মেঘ বজ্র লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এতক্ষণ তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। হেমেন্দ্রও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। তাহার দাদা যে, এতশীঘ্র এতটা করিয়া বসিবেন, তাহা সে কল্পনা করিতেও পারে নাই। সে জানিত, দাদা যদিও একটা কিছু না করিয়া ছাড়িবেন না, তথাপি তিনি তাহাকে অবশ্য এবিষয়ে আর একবার জিজ্ঞাসা করিবেন। হেমেন্দ্র হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, এখন কি কর্ত্তব্য!

নীরদ এতক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়াছিল; এখন সে কি ভাবিয়া হঠাৎ অগ্রসর হইয়া বেণীমাধবের পায়ের উপর আছাড়াইয়া পড়িল। বেণীমাধব দুই পা পিছাইয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষু আরক্ত, ক্রোধে ওষ্ঠাধর কম্পিত।

নীরদকে শাস্তি দিতে বেণীমাধব পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। পাঁচ হাজার টাকার শোকে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিস্তর যেন দগ্ধ হইতেছিল। প্রতিশোধ ভিন্ন শান্তির আর কোনও উপায়ই বেণীমাধব দেখিতে পাইতে-ছিলেন না। ইহার উপর আবার হেমেন্দ্র যখন স্ত্রীর অনুরোধে তাহার প্রতি-বন্ধকতা জন্মাইবার চেষ্টা করিল, তখন যেন আগিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। প্রতিশোধপরায়ণ বেণীমাধবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বাধা পাইয়া সজোরে যেন ঘাড় উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর আজ ঘটনাস্থলে হেমেন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের মাত্রা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি ঠিক করিলেন, হেমেন্দ্র তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্যই এ সময়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। বেণীমাধব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া নীরদকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"ধর একে।"

বেণীমাধবের কথায় পেয়াদা নীরদের নিকট অগ্রসর হইল। হেমেন্দ্র ও

নীরদ পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুল ও বিহ্বল হইয়াছিল। বেণীমাধবের এ কথায় তাহারা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতটা হইবে তাহা যে তাহারা ভাবিতেও পারে নাই।

নীরদের সেই আট বৎসরের মেয়েটি পিতার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপারটা কি এতক্ষণ সে ভাল বুঝিতেই পারে নাই। মাঝে মাঝে অনির্দ্দিষ্ট বিপদের আশঙ্কায় বালিকা আকুলনয়নে কখনও পিতার, কখনও হেমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতেছিল। 'ধর' এই কথা শুনিয়া এবং পেয়াদাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আট বৎসরের মেয়েরও বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে বাকী রহিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তোমরা আমার বাবাকে ধর না, ধর না।"

কমলা রোগীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিল। মুরলা মুমূর্ষু পুত্রের মুখের উপর মুখ রাখিয়া অজস্র অশ্রুধারায় বসনাঞ্চল আর্দ্র করিতেছিল। আসন্নমৃত্যু পুত্রের মাতার এখন আর বাহ্যিক অন্য কোন চিন্তাই ছিল না। বাহিরের এ ঘটনা কমলা বা মুরলা কেহই এতক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারে নাই। বালিকার ক্রন্দনশব্দে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উভয়েই ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যাকুল অন্তঃকরণে বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইল, পেয়াদা নীরদের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুরলা আর সহ্য করিতে পারিল না। চিৎকার করিয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের মত সে ভূমিতে পড়িয়া গেল।

কমলাও স্তব্ধ হইয়া গেল। হেমেন্দ্র নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল ; কমলা সমস্ত সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া কহিল,—"এমনই ক'রে কি একজনার সর্ব্বনাশ করতে হয়! গায়ে কি মানুষের চামড়াও নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা মানুষের সর্ব্বনাশ দেখ্‌ছ। মানুষকে এ ভাবে মাল্লে কখনও কি ভাল হবে? ভেবেছ ভগবান্ ইহা নীরবে সহ্য করবেন!"

কমলার কথায় হেমেন্দ্রের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তাই ত! বেণীমাধবের নিকট অগ্রসর হইয়া "দাদা" বলিয়া ডাকিতেই বেণীমাধব ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহাকে বলিলেন,—চুপ্—দেখি তোদের দৌড় কতদূর! জোট বেধে পরামর্শ ক'রে এখানে আমায় জব্দ কত্তে এসেছ। আচ্ছা দেখ্‌ছি!'

হেমেন্দ্র মনেও ভাবিতে পারে নাই, বেণীমাধব তাহার সম্বন্ধে এমনই ধারণা করিয়া বসিবেন। এখন তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া লজ্জায়, দুঃখে,

ক্ষোভে সে যেন মরিয়া গেল, সে দাদাকে আর কিছু বলিল না. নির্ব্বাক নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে কমলার হৃদয় যেন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। উত্তেজিত স্বরে কমলা বলিল—"নিজেরও ত টাকা আছে, টাকা দিয়ে এ যাত্রা এদের রক্ষা কর ?"

হেমেন্দ্র তথাপি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে দাদার সম্মুখে সে কোন দিন মুখ তুলিয়া কথা অবধি বলিতে পারে নাই, আজ কি করিয়া সে সেই দাদার সঙ্গে বিবাদ বাধাইবে! কি করিয়া সে দাদাকে বুঝাইবে, দাদাকে জব্দ করিবে এ কল্পনা সে যে মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান দেয় নাই!

কমলা ব্যগ্র হইয়া কহিল,—"তোমার পায়ে প'ড়ে বল্‌ছি, তুমি এদের রক্ষা কর।"

হেমেন্দ্র এবারও কোন কথা বলিল না। মাথা নীচু করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা বুঝিল, স্বামীর কোন সাহায্য পাইবার আশা নাই। তাহার অস্থির মন পদ্মপত্রস্থিত জলের মত একবার এদিক্ একবার ওদিক্ হেলিতেছিল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে ঠিক করিল, যে ভাবে হউক, স্বামী ও ভাশুরকে এ পাপকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেই। সে সমস্ত সঙ্কোচ ও সরমের বাধা ভাঙ্গিয়া নীরদের মেয়েটির হাত [illegible]রিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া ভাশুরের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার পর খুকীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"বল্ খুকী, আমি টাকা দিচ্ছি, তোর বাবাকে ছেড়ে দিক্।"

ভ্রাতৃবধূর এই দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে বেণীমাধব আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এতদিনের মধ্যে যে ভ্রাতৃবধূর কণ্ঠের স্বর পর্য্যন্ত তিনি একদিনের জন্যও শুনিতে পান নাই, আজ প্রকাশ্যে সে যে এমন ভাবে কথা বলিতে পারিবে, ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত; কিন্তু এত আয়োজন অর্থব্যয়ের পর তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম এমনই ভাবে পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। এত লোকের সম্মুখে তাঁহাদেরই বাড়ীর বধূ তাঁহার অপমান করিবে! তাই তিনিও উগ্র হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা দেখি, কি করে টাকা দেয়।"

কমলা আর কোন কথা না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল এবং পনর মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিল। হেমেন্দ্র

দেখিল, কমলা নিরাভরণা, তাহার আভরণহীন অবয়ব হইতে যেন মাধুরিমার একটা নূতন শোভা, নূতন তেজ ছড়ুরিত হইতেছে।

টাকা পাইয়া বেণীমাধব বিষহীন ভগ্নদন্ত সর্পের মত নিষ্ফল আক্রোশে সে সস্থান ত্যাগ করিলেন।

[৫]

ডাক্তারের চিকিৎসায় সন্ধ্যা হইতে নীরদের ছেলেটি একটু ভালর দিকে গেল। রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিতে কমলা বাড়ীতে ফিরিল।

বেণীমাধব স্ত্রীপুত্রহীন, আজ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর ব্যবহারে তিনি অন্তরে বিষম আঘাত পাইয়াছেন। মনটা যেন তাঁহার বড়ই অধীর অস্থির বলিয়া বোধ হইতেছিল। আজ সমস্তই যেন একটা কেমন নূতন ভাবে তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছিল। তাই অস্থিরচিত্ত লইয়া বেণীমাধব শয্যায় গা ঢালিয়া নানা চিন্তায় ছট্‌ফট্ করিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার ঐ নিষ্ঠুর আচরণের জন্যও যেন অজ্ঞাতে তাঁহার অন্তরের মধ্যে জ্বালা করিয়া উঠিতেছিল। কাজটা যে খুব ভাল হয় নাই, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ যে অপমান করিতে গিয়াও তাঁহাকে আজ একটা মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে, ইহা কে যেন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণ হেমেন্দ্র বা তাহার স্ত্রী একবারও এদিকে আসে নাই; বেণীমাধব আর ভাবিতে পারিল না। ভাইই যে তাহার সব, সেই একমাত্র ভ্রাতার স্নেহ হারা হইবার কথা মনে হইতে তাঁহার নেত্র আর্দ্র হইয়া উঠিল। তবুও কিন্তু এতগুলি লোকের সম্মুখে সে অপমান তাঁহার হৃদয়কে বৃশ্চিকদংশনে দষ্ট করিতেছিল।

এমন সময় কমলা ও মুরলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বেণীমাধব চমকিয়া সেই দিকে চাহিতেই মুরলা আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"আমারই জন্যে আজ আপনি বড্ড অপমানিত হয়েছেন—অভাগিনীকে রক্ষা করেছেন, ভগবান্ অবশ্য আপনাকে দয়া কর্‌বেন। বলুন, আমাদের দোষ মার্জ্জনা কর্‌লেন।"

বেণীমাধব যেন কথা বলিতে পারিতেছিলেন না, ক্রোধ ও অভিমানমিশ্রিত ভাবগুলি তাঁহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল। তিনি একবার পা সরাইয়া নিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মুরলা তেমনইভাবে পা ধরিয়া পড়িয়া

রহিল। একটু পরে করুণকণ্ঠে সে বলিল—"আগে বলুন, ক্ষমা কল্লেন। যতক্ষণ না ক্ষমা কচ্ছেন, ততক্ষণ কিছুতেই পা ছাড়্ছি না।"

হঠাৎ বেণীমাধবের পায়ের ওপর দুই ফোটা তপ্ত অশ্রু পতিত হইতেই বেণীমাধব চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার বড় স্নেহের—বড় আদরের ভ্রাতৃবধূ কমলা পায়ের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। কমলার অশ্রুপূর্ণ মুখ দেখিয়া বেণীমাধবের হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সস্নেহে বলিলেন—"পাগ্লী মা আমার, তোদের উপর কি আমি রাগ্ কত্তে পারি। মান-অপমান, সে সবত তোদেরই।" বেণীমাধব আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন; হঠাৎ কমলার শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি থামিয়া গেলেন; তার পরে গাঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—"মা, গয়নাগুলি কি কল্লে?"

কমলা ভীতিজড়িতস্বরে বলিল—"ও বাড়ীর কাকিমার কাছে রেখে টাকা এনেছি।"

বেণীমাধবের মুখ পুনর্ব্বার মেঘাচ্ছন্ন হইল। খুড়ীমা ও খুড়ামহাশয় যে তাঁহাদের পরম শত্রু। বেণীমাধবের পিতার মৃত্যুর পর হইতে এই খুড়ামহাশয়ই যে তাঁহাদের সর্ব্বনাশের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। আজ কি না তাঁহারই বাড়ীতে গহনা বন্ধক। বেণীমাধবের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

কমলা সব বুঝিল, সকল জানিয়াও নিরুপায় হইয়াই সে একাজ করিয়াছিল, সে রমণী—ঘরের বৌ, টাকার জন্য তখন আর কোথায় যায়। মনের ভাব গোপন করিয়া কমলা ভীতচিত্তে বলিল—"তা খুড়ীমা আমায় বরাবরই খুব ভালবাস্তেন, আপনাদের ঘরওয়া বিবাদের জন্যে কোনদিনও কিন্তু আমায় তিনি কোন রূঢ় কথা বলেন নি, আজ্কেও আমি গিয়ে দাঁড়াতেই মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না ক'রে তিনি টাকাগুলো দিয়ে দিলেন।"

বেণীমাধব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হাঁ মা, সব বুঝেছি, তাঁদের ভালবাসা আমি খুব জানি, এও আমায় জব্দ করবে বলেই দিয়েছে। জান ত, তাঁ'রাই আমার হেমন্দ্রকে জেলে পর্য্যন্ত দিতে চেষ্টা—"

মুক্তদ্বার-পথে গৃহে প্রবেশ করিয়া বাধা দিয়া মাঝখানে কে বলিল—"অন্যায় করেছি বেণী, অন্যায় করেছি, সেজন্য এখন আমরা গুরুজন হ'য়েও তোর কাছে ক্ষমা চাইতে এয়েছি। এমন মা লক্ষ্মী যা'র ঘরে, তার সঙ্গে

আবার ঝগড়া! তা ক'ল্লে যে লক্ষ্মী আমাদের প্রতিকূলা হবেন। বেণী, আমরা এক হ'য়েও অনেককাল মহাশত্রুর ন্যায় ছিলাম, বল্ আজ তুই আমাদের ক্ষমা কল্লি। আবার বহুদিন পরে আয় আমরা যেমন ছিলাম, তেম্‌নি থেকে, আমাদের শেষ কালটা একটু সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দি।"

বিস্মিত বেণীমাধব মাথা তুলিতেই দেখিল, সম্মুখে তাঁহার খুড়া বিন্দুমাধব ও খুড়ী উমাসুন্দরী। বেণীমাধব মুখ তুলিতেই উমাসুন্দরী অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—"বেণী, তুই আমার পেটের ছেলের মত, সরিকি-বিবাদে এতদিন আমরা সে সম্বন্ধ শুদ্ধ ভুলেছিলাম, কিন্তু আর তা থাক্‌ছি না; তোকে আর কোন কথা বল্‌তে দিচ্ছি না; আয় নেমে আয়, তোর কাকাকে নমস্কার কর, আগেকার সব কথা ভুলে যা।"

বেণীমাধব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার শরীর পুলককণ্টকিত হইল। ভালবাসার নিকট এতকালের এতবড় একটা প্রকাণ্ড শত্রুতা ভাসিয়া কোথায় গেল। বহুদিনের বিবাদ-বিসম্বাদ এক মুহূর্ত্তে মিটিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার খুড়া ও খুড়ীমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে দিতেই তাঁহারা তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

উমাসুন্দরী সস্নেহে কমলাকে বলিলেন—"আয় মা, তোর গয়নাগুলি পরিয়ে দি। অমন সোণার মত বৌ কি শুধু গায়ে থাক্‌লে ভাল দেখায়।" বলিয়া উমা সুন্দরী একে একে সমস্তগুলি গয়না কমলার গায়ে পরাইয়া দিয়া বেণীমাধবকে বলিলেন—"বেণী, তোমার বে'র সময় আমরা বৌকে কোন যৌতুক দিতে পারি নি, আজ তাই এ গয়না কখানা বৌমাকে যৌতুক দিলুম, এতে কিন্তু তুই কিছু বল্‌তে পার্‌বি নি।" তারপর কমলাকে বলিলেন—"যাও ত মা, দেখে এস, হেমা ওপরে আছে না কি? তাকে তবে ডেকে দিও, অনেক দিন তাকে দেখিনি।"

কমলার মহত্বের নিকট বিন্দুমাধবের দর্প-দ্বেষ এইভাবে নত হইয়া রহিল, আর বেণীমাধব, তিনি যেন কমলার প্রতি নূতন এক অনুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া স্নেহডোরে আবদ্ধ হইলেন।

(৬)

কমলা শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিল, স্বামী ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে। এত চিন্তিত যে কমলার উপস্থিতি পর্য্যন্ত সে জানিতে পারে নাই।

আজিকার এই ব্যবহারের পর হেমেন্দ্রের মনটা নানা চিন্তায় বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, সে ভাবিতেছিল ; সে নিজে ত সাধ্যমত ভ্রাতার আজ্ঞা পালনই করিয়াছে, কমলা উত্তেজনার বশীভূত হইয়া কাজটা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কি তাহাকে অপরাধী করা যায় ? হেমেন্দ্র কমলার কোন দোষ না দেখিয়া বরং তাহার কার্য্যের জন্য মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যেষ্ঠের ভবিষ্যৎ ব্যবহার কি হইবে ভাবিয়া সে আকুল হইতেছিল। কমলা ধীরে ধীরে তাহার স্বামীর আরও নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার কার্য্যের ফলে কি দাঁড়াইবে, সে চিন্তা কিছু পূর্ব্বে তাহাকে আকুল করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এইমাত্র যে অঘটন সংঘটিত হইয়া গেল, তাহাতে আর তাহার মনের মধ্যে আশঙ্কার চিহ্নমাত্রও রহিল না। হেমেন্দ্রের ভয়-ভাবনাও যে সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদূরিত হইয়া যাইবে, ইহাও সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে সে স্বামীর দেহ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইল ; সেই মৃদুস্পর্শে হেমেন্দ্র চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কমলা সহাস্য-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। কমলার কুন্তলদাম এলাইত, স্রস্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তাহার আভরণহীন শরীর পুনর্ব্বার আভরণ-ভূষিত হইয়া যেন নূতন একটা সজীবতা লাভ করিয়াছে। হেমেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া কমলাকে দেখিতে লাগিল ; কোন কথা বলিতে পারিল না।

কমলা হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—"বলি হাগো পুরুষসিংহ, খুব বীরত্ব ত দেখিয়ে এলে ; একজনের কি সর্ব্বনাশই না হ'তে বসেছিল।"

হেমেন্দ্রও একটু হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"তা'ত যেন বুঝ্লেম, কিন্তু দাদা কি কর্বেন, তা কি ভেবেছ !"

কমলা হাসির লহর তুলিয়া বলিল—"ভাইও যা কর্বেন, দাদাও কি তার চেয়ে নূতন একটা কিছু কত্তে পারেন ?"

কমলার কথায় হেমেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। কমলার গায়ের গহনাগুলি দেখিয়া সে পূর্ব্ব হইতেই একটু সন্দেহ করিতেছিল, হয় ত কমলা ঘটনাটার একটা কিছু কূলকিনারা এতক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে ; এখন আরও একটু আশা হইল, তথাপি পূর্ব্বভাবেই সে বলিল—"না কমলা, দাদাকে তুমি চেন না—"

কমলা বাধা দিয়া বলিল—"খুব চিনি গো মশাই খুব চিনি, তুমিই নিজের ভাইকে চেন না, তাই বল,—যা হ'ক সেজন্যে মশায়কে আর ভেবে ভেবে মাথা খারাপ কত্তে হবে না।"

হেমেন্দ্র আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—"কি রকম ?"

কমলা স্বামীকে সমস্ত খুলিয়া বলিল, খুড়ামহাশয়ের কথা বলিতেও সে ভুলিল না। শুনিয়া হেমেন্দ্র মুগ্ধ, বিস্মিত প্রশংসমাননেত্রে কমলার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলিল—"কমলা, তোমায় কি বলে সম্বোধন করব বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।" আহ্লাদে, হর্ষে হেমেন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিল না।

কমলা স্মিতমুখে বলিল—"তা দেখ, সম্বোধনের জন্যে যদি একটা নূতন কিছু আবিষ্কার কত্তে পার ত মন্দ কি ?"

সাদরে কমলার মস্তক ক্রোড়ে টানিয়া আনিয়া হেমেন্দ্র বলিল—"সত্যি কমলা, তুমি যে কি ভাবে এ গুরুতর বিষয়ের এত শীঘ্র মীমাংসা কল্লে, তা এখনও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, তুমি বলে পেরেছ, আমাদ্বারা এ সম্ভবই হ'ত না।"

আত্মপ্রশংসা শ্রবণে কমলা লজ্জিতের মত ঘাড় নীচু করিয়া উপহাসের স্বরে বলিল—"থাক্ হুজুর, আর বক্তৃতা কত্তে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে !"

হেমেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল—"ভাবছ, তোমায় উপহাস কচ্ছি, তা নয় কমলা, দাদা কি করবেন ভেবে ভেবে আমি যে মনের মধ্যে ছট্‌ফট্ কচ্ছিলাম।"

হেমেন্দ্রের চিন্তার ধারা কি ভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল, কমলা তাহা বুঝিয়াছিল ; এখন তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর শান্ত চিন্তাহীন দেখিয়া সে পূর্ব্ববৎ উপহাসের স্বরেই বলিল—"এটা আর মশায়ের পুরুষ-বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে কুলাল না ! তিনি যে তোমার দাদা, তিনি কি আর আমাদের ওপর রাগ করতে পারেন।"

কথাটা হেমেন্দ্রের প্রাণে আরও লাগিল, কত উচ্চপ্রাণ কমলার ! হেমেন্দ্র পত্নীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহার কমনীয় গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া হাস্যবিকসিত মুখে বলিল—"না, আমার পুরুষ-বুদ্ধিতে ত এতটা কুলোয় নি, তাই ভাবছিলুম, কিছু ধার নেব।"

কমলা হাত নাড়িয়া বলিল—"আমি কিন্তু ধারটার দিই না, জানত সুদ-শুদ্ধ আদায়টাকে আমি মহাপাপ মনে করি. তবে যদি নেহাৎই তোমার আবশ্যক হ'য়ে থাকে ত, দয়া ক'রে একটু শিখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি।"

হেমেন্দ্র এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—"আচ্ছা একটা কাজ কল্লে হয় না ?"

কমলা গলবস্ত্র হইয়া মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কহিল,—"আজ্ঞে করুন হুজুর !"

হেমেন্দ্র গম্ভীর ভাবেই বলিল—"তোমার সঙ্গে পরিচ্ছদটা পরিবর্ত্তন কল্লে হয় না।"

কমলা অতি তাড়াতাড়ি যেন হেমেন্দ্রের মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলিল—"আমি তাতে খুবই রাজি, তবে একটা মস্ত ভাবনার কথা আছে।"

হেমেন্দ্র স্মিতমুখে বিস্মিতের মত কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা হাসিয়া বলিল,—"পেটে ছেলে ধর্‌তে পার্‌বে ত?"

কমলার উত্তরে হেমেন্দ্র ভারি জব্দ হইল; কোন উত্তর না করিয়া চট্ করিয়া কমলার কপোলদেশে একটা ছোট রকমের চড় বসাইয়া দিতেই কমলা স্বামীর পায়ের নিকটে গিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলিল—"উচিত জবাব পেলেই প্রভুদের বড্ড রাগ হয়, না? তা যেমন লাগ্‌তে এস, তারই ফল।"

ঠিক এই সময়ে মুরলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বাঃ বেশ মজার লোক ত যাহ'ক! কাকাবাবু যে ডাক্‌ছিলেন, বুঝি ভুলেই গেলে।"

রঙ্গ-বারিধি

[ষষ্ঠ তরঙ্গ]

বর-ধরা।

লেখক—শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

(১)

বংশীধর ও মুরলীধর দুই সহোদর, নিবাস নবগ্রাম। বংশীধর একমাত্র কন্যা কুমুদিনীকে রাখিয়া অল্পবয়সে তনুত্যাগ করেন। মুরলীধরেরও একমাত্র কন্যা প্রমোদিনী। মুরলীধরের কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, নিজে তাহার কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সরস্বতী দেবীর সেবায় কিছু অধিক সময় অপব্যয় করায় লক্ষ্মী-দেবীর সেবার ত্রুটী হইত, নচেৎ তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির আরও বৈষয়িক উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। তিনি কন্যাদ্বয়কেও সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা রীতিমত দিতে ত্রুটী করেন নাই; উভয়েই

রূপবতীও ছিল। যথাকালে কুমুদিনীকে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করেন। জামাতা সত্যচরণ এখন মফঃস্বলের হাকিম।

প্রমোদিনীর বয়স যখন আটবৎসর মাত্র, তখন দেবগ্রামের জমীদার নীলকণ্ঠ বাবুর ত্রয়োদশ বর্ষীয় একমাত্র পুত্র শীতিকণ্ঠের সহিত প্রমোদিনীর বিবাহ হয়। মুরলীধর যে এত অল্পবয়স্কা কন্যার কেন বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়, তাহার উপর মুরলীধরের পত্নী অনেক দিন ধরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, জামাতা দর্শনের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এরূপ পাত্র হাতছাড়া করিতে পারিলেন না।

তবে এই বিবাহের সময় বড় একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রিয়াবাটীর নানারূপ অনিয়মে, বিবাহের রাত্রে প্রমোদিনীর মাতার অবস্থা এত ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, লোকে মনে করিল, সেই রাত্রেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে, সুতরাং বিবাহের পর দিন তিনি জীবিতা থাকিলেও মুরলীধরবাবু কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারিলেন না। এদিকে নীলকণ্ঠ বাবু একে অত্যন্ত কোপন-স্বভাব, তাহার উপর পাড়াগেঁয়ে জমীদার। পুত্রকে বিবাহান্তে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে শ্বশুরালয়ের দিক্ দিয়াও যাইতে দিলেন না, মুরলীধরবাবুর লোক আসিলে যথেষ্ট অপমান করিয়া তাড়াইতেন, অধিকন্তু মুরলীবাবুও একবার জামাতাকে আনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাকেও যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার কন্যা আসিলেও সেইরূপ অবমানিত করিয়া বিদায় করিয়া দিবেন, বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। কিন্তু পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহও দিলেন না।

মুরলীধরবাবুও তেজস্বী লোক ছিলেন, ক্ষোভে, ক্রোধে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে না পাঠাইয়া লেখাপড়া রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কন্যা রীতিমত শিক্ষা পাইলে স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারিবে।" তাঁহার অধ্যাপনার গুণে ও কন্যার প্রতিভাবলে প্রমোদিনী অল্প বয়সেই বিদুষী হইয়া উঠিলেন। এমন কি, মুরলীধর তাহাকে সরস্বতী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই কন্যার মাতৃ-বিয়োগ হয়।

(২)

সত্যচরণ বাবু আলিপুরে বদলি হইয়াছেন। আলিপুরে যাইবার পূর্ব্বে কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া নূতন কর্ম্মস্থানে গেলেন। কুমুদিনী একদিন

প্রমোদিনীকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁলা পিষী! তোর বয়স ত পনের ষোল হ'তে গেল, স্বামীর ঘর কর্‌বি নি!"

"সেরকম গতিক ত' দেখ্‌ছি না।"

"এই রকম ক'রেই কি চিরকাল কাট্‌বে?"

"কাট্‌বে নাই বা কেন?"

"শীতিকণ্ঠ যদি আবার বিয়ে ক'রে?"

"করেছে কিনা সে খবরই বা কে রাখ্‌ছে?"

"আমি রাখ্‌ছি, সে এখনও বিয়ে করেনি, তবে বি. এ পাশ করেছে, এম, এ পড়্‌ছে, বোধ হয় আইনও পড়্‌ছে। তোর শ্বশুর মারা গিয়েছেন শুনেছিস্?"

"হাঁ, আর বৎসর দিনকত হবিষ্যান্ন খেয়েছিলাম।"

"তার পর বাবা জামাই আন্‌তে পাঠান নি?"

"উত্তর পেয়েছিলেন যে, তাঁর জামাই বিবাহের কথা কিছুই জানেন না।"

"বটে—বেশ, আমি সব সন্ধান রাখি, তোর শ্বশুরের কল্‌কাতায় বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে সে এখন থাকে, দেশে বড় একটা যায় না, কথাটা ভাল হ'চ্ছে না, কল্‌কাতা বড় খারাপ জায়গা।"

"বড় পেট ফাঁপে না কি? না মাথা ঘোরে?"

"সুধু মাথা কেন? মুণ্ডু ঘুরে যায়। সে যাক্, তুই দেখ্‌ছি—লেখা পড়া শিখে জেঠিয়ে উঠেছিস্। নে, ও সব রাখ, আমি একটা মতলব ঠাউরেছি, তোকে সেই মত কায কর্‌তে হ'বে।"

"সে মত্‌লবটা কি?"

"সে পরে বল্‌ব, আগে কাকাকে বলি।"

"বাঁচ্‌লাম, এখনই ত সেইমত কায কর্‌তে হ'বে না? তবে ততক্ষণ আমি একটু যোগবাশিষ্ঠ পড়্‌তে পারি?"

"বড় ফাজিল হ'য়েছিস্, রস্. তোর যোগবাশিষ্ঠ পড়া ঘুচুচ্ছি; তোর ভগিনীপতিকে বলেছি, যে ঠিক শীতিকণ্ঠের বাড়ীর সম্মুখে বাসা করা চাই, যেমন ক'রে হ'ক্, নইলে আমি কল্‌কাতায় যাব না।"

"তবে এখন আর কল্‌কাতায় যাওয়ার ইচ্ছা নেই দেখ্‌ছি. বেশ, দিনকত থাক না।"

"থাক্‌তে বড় বেশিদিন হ'বে না। বাসা এতদিন বোধ হয় ঠিক হ'ল।

একবার কাকার সঙ্গে কথাটা ঠিক করি।" কাকার সঙ্গে পরামর্শ ঠিক হইল, এদিকে যথাস্থানে বাসা ঠিক হইয়াছে, সংবাদ আসিল।

[৩]

কলিকাতায় একটি নাতিবিস্তীর্ণ, অনতিসংকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে দুই অট্টালিকা। এক পার্শ্বের অট্টালিকায় দ্বিতলের একটি গবাক্ষে প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে দুইটি তরুণী রমণী পথের দিকে চাহিয়া পথিকাদি দেখেন ও পরস্পর হাস্য পরিহাস করেন। অপর পার্শ্বের বাটীর সম্মুখে বারান্দা, তাহাতেও ঐ সময়ে একটি যুবক পাদচারণ করেন। যুবকের দৃষ্টি বড় একটা পথের দিকে থাকে না, তরুণীদ্বয়ের প্রতি, বিশেষতঃ কনিষ্ঠার দিকে প্রায়ই আকৃষ্ট থাকে; যদি দৈবাৎ তরুণীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও দৃষ্টি যুবকের দিকে ক্ষণকালের জন্য একবার পড়ে, যুবক তৎক্ষণাৎ নির্বিষ্টচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া দেখেন এবং যখন বয়োজ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে চিমটি কাটিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরান, তখনই যুবকের দৃষ্টি পুনর্ব্বার কনিষ্ঠার রূপরাশিতে নিবদ্ধ হয়। কেবল যুবক চিমটি দেখিতে পান না; কারণ, সেটি অতি সংগোপনে প্রদত্ত হয়। সন্ধ্যার পর জ্যেষ্ঠা একদিন কনিষ্ঠাকে বলিলেন,—"দেখ্ দেখি, আমরা না হ'য়ে যদি এই রকম আর কেও এ বাড়ী ভাড়া নিয়ে এই রকম কর্‌ত?"

"কর্‌ত—কর্‌ত। আমাদের এ লাঞ্ছনা পোয়াতে হ'ত না, তারাই পোয়াত।"

"তোমারও যে আশা ভরসা ঘুচে যেত।"

"আমি কোন আশা ভরসার ধার ধারি না। স্ত্রীলোকে মনে কর্‌লে অনায়াসে ব্রহ্মচর্য্য ক'রে জীবন কাটাতে পারে, পুরুষগুলো দেখ্‌ছি নেহাত অপদার্থ জীব; পুরুষের উপর আমার যা কিছু শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, একেবারে ডানা মেলে উড়ে গিয়েছে।"

"যাক্, আবার হুস্ ক'রে উড়ে আস্‌বে। তখন পুরুষকে সার পদার্থ বলেই মনে হ'বে।"

"তুমি সার বুঝে থাক্‌বে, আমি বুঝিও নাই, বুঝ্‌তে বড় একটা ইচ্ছাও নেই।"

এমন সময় সত্যচরণ বাবু গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"কি বুঝ্‌তে ইচ্ছা নাই?"

• এখানে বলিয়া রাখি যে বুদ্ধিমান্ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, এই দুইটি

কপোতী কুমুদিনী ও প্রমোদিনী, কুমুদিনী পিতৃদত্ত সরস্বতী নামেই এখানে পরিচিতা, সত্যচরণ বাবুও সরস্বতীর ভগিনী বলিয়া কুমুদিনীকে কমলা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাম দুইটি পরিবর্ত্তনের একটু বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে কুমুদিনী অথবা কমলা বলিলেন,—"সরস্বতী পুরুষকে অপদার্থ জীব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।"

"আর তুমি ?"

"আমিও কতকটা তাই, তবে তুমি সে শ্রেণীর বহির্ভূত কি না, তা এবার বোঝা যাবে, এখন তোমার পালা, আমরা চারে এনেছি, এবার গাঁথতে হ'বে তোমায় ?"

"গাঁথবেন তোমার ভগিনী, না পারেন, তুমি গেঁথে দিও, আমি উত্তর সাধক থাক'ব মাত্র।"

"ওঃ! কি কঠোর ত্যাগ!"

প্রমোদিনী। সত্যবাবু! আপনাদের কি আর অন্য কাজ নেই ?

সত্য। আপাততঃ হাতের কাযটা মিটে যাক্, তার পর অন্য কায খুঁজে দেখা যাবে। উপস্থিত ক্ষুধার উদ্রেক হ'য়েছে, তার একটা প্রতিকার কর। তখন সহসা সভাভঙ্গ হইল।

(৪)

কিছুদিন পরে, বড় অধিক দিন নয়, অল্পদিনের মধ্যেই, সম্মুখের বাটীর যুবকের অর্থাৎ শীতিকণ্ঠের সহিত, প্রথমে সত্যচরণ বাবুর আলাপ-পরিচয় হইল। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা,—এত ঘনিষ্ঠতা, যে শীতিকণ্ঠ অন্তঃপুরে সত্যবাবুর স্ত্রী ও শালিকার সহিত আলাপ করিয়া চরিতার্থ হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। একদিন রবিবার, সত্যবাবুর বাটীতে শীতিকণ্ঠের নিমন্ত্রণ হইয়াছে; বাটীর সম্মুখেই বাটী, ঠিক আহারের সময় গেলেই চলিত, কিন্তু শীতিকণ্ঠ বোধ হয় সেটা ভদ্রতা হয় না মনে করিয়া সকাল সকাল স্নান করিয়া আটটার মধ্যেই সত্য বাবুর বাটীতে উপস্থিত। সত্যবাবু মনে মনে হাসিলেন, এবং শীতিকণ্ঠকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। কমলা ও সরস্বতী নিমন্ত্রিতের জন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এত অসময়ে নিমন্ত্রিতের উপস্থিতিতে ব্যস্ত হইয়া সে ব্যবস্থার ভার লোকজনের উপর অর্পণ করতঃ প্রথমে কমলা আসিয়া বসিলেন। সত্যবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সরস্বতী কোথায় ?"

"সে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কচ্ছে।" বলিয়া চতুরা কমলা শীতিকণ্ঠের

মুখের দিকে চাহিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সরস্বতীর পরিবর্ত্তে অন্য কেহ সে ব্যবস্থা করিলে ভালই হইত এইরূপ যেন শীতিকণ্ঠের মনের ভাব। বলিলেন—"সে এখনই আস্‌বে।"

শীতিকণ্ঠের মুখের একটু ভাবান্তর হইল, অনতি বিলম্বেই সরস্বতী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, অন্ধকার গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিবামাত্র গৃহ যেমন প্রসন্ন ভাব ধারণ করে, শীতিকণ্ঠের মুখও তদ্রূপ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল।

একথা সেকথার পর কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার পিতা ত বড় মানুষ ছিলেন, আপনিও বাপের একমাত্র পুত্র শুনিতে পাই, আপনার পিতা আপনাকে এতদিন অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য ত?"

শীতিকণ্ঠ একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটু ঢোক গিলিয়া উত্তর করিলেন,—"আমার লেখাপড়া শেষ হইলে বোধ হয় বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল।" পরে একটু সামলাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"আমি পুরুষ মানুষ, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনার ভগিনী স্ত্রীলোক, তাঁহার আজিও বিবাহ হয় নাই, এটা অধিক আশ্চর্য্য।"

প্রশ্ন শুনিয়াই কমলার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সরস্বতী হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আমি যে স্ত্রীলোক,তাহা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন দেখিতেছি, লেখাপড়া শিখিয়াছেন কি না? তা আমিও লেখাপড়া শিখিতে ছিলাম কি না, তাই বোধ হয় আমারও বিবাহ হয় নাই।"

শীতি। "লেখাপড়া শেখার জন্য স্ত্রীলোকের বিবাহ বন্ধ থাকে!"

সর। কেন থাকিবে না? পুরুষের বন্ধ থাকিতে পারে, আর স্ত্রীলোকের থাকিতে পারে না! যদি পঁচিশটায় আপনার বিবাহ হইত, তাহা হইলে আমারও হইত। চাইকি আপনার সঙ্গেই হয়ত আমার বিবাহ হইয়া যাইত।"

সরস্বতীর এই প্রগল্‌ভ বাক্যে শিতিকণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। সত্যবাবু শীতিকণ্ঠকে উদ্ধার করিবার জন্য কমলাকে বলিলেন, —"তোমার ভগিনীর দেখিতেছি শীতিকণ্ঠ বাবুকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।"

সরস্বতী বলিলেন,—"পুরুষ মানুষকে?"

কমলা উত্তর দিলেন, "তা নয়ত, মেয়ে মানুষকে বিয়ে করবি না কি?"

সর। পুরুষের না আছে বুদ্ধি, না আছে মেধা, তার চেয়ে স্ত্রীলোককে

বিবাহ কর্‌লে সংসারটা বোধ হয় ভালরকম চলে, স্ত্রীলোক যেমন মেধাবিনী, তেমনই বুদ্ধিমতী। একটা ঘোড়ায় একখানা গাড়ি টেনে আগে যেতে পারে, না, দুটো ঘোড়া বোঝা না নিয়ে আগে যেতে পারে?" এইরূপ বাক্যালাপে দ্বিপ্রহর অতীত হইল, আহারান্তেও শীতিকণ্ঠের বাটী ফিরিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিলেন; কিন্তু মন সরস্বতীর নিকট রহিয়া গেল।

ক্রমে এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, শীতিকণ্ঠ এম, এ পরীক্ষা দিতে পারিবেন এমন আশা রহিল না। তাঁহার সহপাঠী বন্ধুগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"পড়্‌তে বস্‌লেই মাথা ঘোরে, কাজেই এবার বোধ হয় পরীক্ষা দেওয়া হ'য়ে উঠ্‌লো না।"

ক্রমে তাঁহারা ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, একদিন একজন বিশেষ বন্ধু, নাম পরেশ, বলিলেন, "শীতিকণ্ঠ! কাযটা বড় ভাল হ'চ্ছে না, তুমি বিবাহিত, অথচ এই স্ত্রীলোকের প্রণয়ে তোমার এত অধঃপতন হয়েছে যে, লেখাপড়া ছাড়্‌লে; কিন্তু শেষে চিরকালটা কষ্ট পাবে যে—"

শীতি। কেন? এম্ এ পাশ না কর্‌লে খেতে পাব না?

পরেশ। খেতে কষ্ট পাবে কেন? যথেষ্ট পৈতৃক বিষয় আছে, কিন্তু মনের কষ্টটা আজন্ম পাবে।

শীতি। কেন?

পরেশ। ওকেত আর বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না।

শীতি। কেন পার্‌ব না?

পরেশ। তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তে তুমি আবার বে কর্‌বে? ওরাই বা জান্‌লে বে দেবেন কেন?"

শীতি। আমার বে হ'য়েছে কে বল্লে? আমি সে বের কিছুই জানি না। আমি ওঁদের বলেছি যে, আমার বে হয় নি।

পরেশ। তোমার এত অধঃপতন হ'য়েছে যে, তুমি যা'কে ভালবাস, যা'কে বে কর্‌তে যাচ্চ, তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কচ্ছ! আমরা তা হ'তে দেব না, আমি ওঁদের বলে দেব।

শীতিকণ্ঠের মুখ শুকাইল, তিনি পরেশকে জানিতেন, পরেশের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"দেখ পরেশ? তোমায় কিছু বল্‌তে হ'বে না, যা বল্‌বার আমিই বল্‌ব, তার পর যা হয় হ'বে, কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখ্‌ছি, সরস্বতীর সঙ্গে বে না হ'লে আমি আত্মহত্যা কর্‌ব।"

যখন এই সকল কথা হইতেছিল, তখন সত্যবাবু শীতিকণ্ঠের নিকট আসিতেছিলেন, শেষের কথাগুলি বাহির হইতে শুনিয়া তিনি আর শীতিকণ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই বাটী ফিরিয়া গিয়া কুমুদিনীকে সমস্ত বলিলেন। কুমুদিনী "আর না, যথেষ্ট হইয়াছে" বলিয়া অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতে শীতিকণ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া কমলা বলিলেন,—"শীতিকণ্ঠ বাবু! আমরা আপাততঃ একবার দেশে যাব, বিশেষ দরকার।"

শীতিকণ্ঠের মুখ গত রাত্রের দুশ্চিন্তায় মলিন হইয়াছিল, আজ কমলার কথায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া পড়িল, বলিলেন,—"দেশে! কবে আস্‌বেন?"

কমলা। তা ত বল্‌তে পাচ্ছি না, সরস্বতীরও ত একটা পাত্র দেখ্‌তে হ'বে।

শীতিকণ্ঠের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল, তিনি চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইলেন, বোধ হয়, যেন দাঁড়াইতে আর পারেন না। কমলা আবার বলিলেন,—"আপনি আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চলুন না, আমার ইচ্ছা, যদি আপনার অমত না হয়—আর কাকার মত হয়, তবে—"

"কমলা কি বলিল? তবে— তবে কি?" তাহার পর যাহা, তাহা না বলিলেও শীতিকণ্ঠ বুঝিলেন; এদিকে পরেশের কথাও তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কমলা বলিলেন,—"চুপ ক'রে রইলেন যে,—আপনি যাবেন না?"

"না, যাব না কেন? তা বেশ, চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়া আসি।"

কমলাও তাই চান, বলিলেন,—"তবে প্রস্তুত হ'ন, আজই যাব।"

সত্যবাবু সকলের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। যথাকালে ট্রেণ চন্দননগর ষ্টেশনে পৌঁছিলে সকলে নামিলেন এবং একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলে তাহাতে উঠিলে, নবগ্রামে যাইতে আদেশ করিলেন। শীতিকণ্ঠ বিবাহ করিয়াছিলেন চন্দননগরের নিকট কাঁটাপুকুর গ্রামে। মুরলীধরবাবুর বাটী কাঁটাপুকুর ও নবগ্রামের সীমানায়। শীতিকণ্ঠ তাহা জানিতেন না। কিন্তু বিবাহের রাত্রে চন্দননগরের ষ্টেশনে নামিয়া যেদিকে গিয়াছিলেন, গাড়ীও বোধ হইল সেই দিকেই যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কাঁটাপুকুর কোন্ দিকে?"

কমলা বলিলেন,—"নিকটেই; কেন? কাঁটাপুকুর জানেন না কি?"

"না, তাই জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি, শুনেছিলাম, এখানে কাঁটাপুকুর ব'লে একটা জায়গা আছে।"

"হাঁ, আছে, কিন্তু সে একে পুকুর, তাতে আবার কাঁটা, এ নবগ্রাম সবই নূতন, কাঁটাও নেই, খোঁচাও নেই।"

গাড়ী রেলের তল দিয়া সরু পথে চলিল, পথটা যেন পরিচিত, সত্যবাবু গাড়ওয়ানকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া যথাকালে মুরলীধরবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

সত্যবাবু বাটীর খিড়কীর নিকট গাড়ী দাঁড়করাইয়া ছিলেন, সুতরাং শীতি-কণ্ঠ বিবাহের সময় বাটীর সম্মুখে যে বারন্দা দেখিয়াছিলেন, তাহা'ত দেখিতে পাইলেন না, বরং অন্যরূপ দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

গাড়ী থামিবামাত্র কমলা ও সরস্বতী নামিয়া সত্বর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সত্যবাবু গাড়ীর ভাড়া দিয়া ধীরে ধীরে খিড়কী দিয়াই বাটীতে প্রবেশ করিয়া সদরে আসিলেন, এবং শীতিকণ্ঠকে লইয়া একটি ছোট ঘরে বসিলেন। পূর্ব্বদিন সত্যবাবু লোক পাঠাইয়া মুরলীধরবাবুকে সংবাদ দিয়াছিলেন, এবং যাহা যাহা করিতে হইবে, কমলা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের নবগ্রাম অর্থাৎ কাঁটাপুকুর পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল, গৃহ-প্রবেশের পরই বাটীর প্রাচীন শালগ্রামের আরতি আরম্ভ হইল। আরতির শেষে ভৃত্য আসিয়া সত্যবাবুকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি শীতিকণ্ঠকে লইয়া অন্তঃপুরে দ্বিতলের একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এইবার শীতিকণ্ঠ বড়ই গোলে পড়িলেন। বিবাহের রাত্রে যে গৃহে তাঁহার বাসর হইয়াছিল, যে গৃহে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, এ ঠিক সেই গৃহের ন্যায়, ঠিক সেই রাত্রের ন্যায় সজ্জিত, ঠিক সেইরূপ আস্তরণ, সেই সকল ছবি! বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন। কিছু বলিতেও পারিলেন না। দেখিলেন, সত্যবাবু স্মিতমুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

অনতিবিলম্বে মুরলীধরবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করায় সত্যবাবু উঠিয়া প্রণাম করিলেন, দেখাদেখি শীতিকণ্ঠও প্রণাম করিলেন, মুরলীধর উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া শীতিকণ্ঠকে কহিলেন,—"বাবাজী এসেছ দেখে বড়ই আনন্দিত হ'লাম, ভাল আছ ত?" "আজ্ঞা হাঁ" বলা ভিন্ন শীতিকণ্ঠ আর উপায়ান্তর দেখিলেন না। "তোমরা বস, পরে দেখা হ'বে" বলিয়া মুরলীধর প্রস্থান করিলেন। সত্য-চরণকে বলিয়া গেলেন,—"বাবাজীকে জলটল খাওয়াও।"

শীতিকণ্ঠ জল খাইবেন কি, ভ্যাবাচাকা খাইয়া তাঁহার পেট ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

মুরলীধর চলিয়া যাইবামাত্র কমলা অবগুণ্ঠনবতী সরস্বতীকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এই যে প্রমোদিনীর বর এসেছে, আমাদের ভাগ্য বড় প্রমোদিনী! বস্ এখানে, আমি সরস্বতীকে ডাকি।" প্রমোদিনীর পরিধানে একখানি চেলী। বিবাহের রাত্রে যে বর্ণের চেলী পরিয়াছিল, এও ঠিক সেই বর্ণের। প্রমোদিনী সরস্বতীর ন্যায় চতুরা বোধ হইল না, কিছু জড়সড়। কমলা "সরস্বতীকে ডাকি" বলিতেই শীতিকণ্ঠের মুখ শুকাইল। শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, বুঝিতে বাকী ছিল না, এবং বোধ হইয়াছিল যে, সরস্বতীই প্রমোদিনী, কিন্তু অবগুণ্ঠনাবৃতা প্রমোদিনী পার্শ্বে, আর সরস্বতী অনুপস্থিত, এত বড় ভয়ঙ্কর কথা! এ যে হরিষে বিষাদ! মনে করিলেন প্রমোদিনী ত বিবাহিতা, তখন অবগুণ্ঠন খুলিয়াই সন্দেহ দূর করি না কেন? এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় প্রমোদিনী স্বয়ং অবগুণ্ঠন খুলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"দিদি! তোমায় ডাক্‌তে হ'বে না, আমিই ডাক্‌ছি, তাকে তোমার ভগিনীপতির পছন্দ হ'য়েছে, তাকেই বিয়ে করুন!" বলিয়া উঠিতে উদ্যতা হওয়াতে শীতিকণ্ঠ বলিলেন,—"আর ডাক্‌তে হ'বে কেন? তোমরা সব পার। কিন্তু সরস্বতী স্ত্রীলোক বিবাহ করবে,—সে পুরুষ চায় না! তোমরা আমাকে খুব বোকা বানিয়েছ!"

প্রমো। দিদি! দেখ্‌লেত, আমি কি মিথ্যে বলেছিলাম, যে পুরুষের না আছে মেধা, না আছে বুদ্ধি। যে বিয়ে ক'রে সে কথা একেবারে ভুলে যায়, তার মেধা কিছুমাত্র নাই, আর বুদ্ধি যে নাই তা নিজেই স্বীকার কর্‌ছে, কেমন?

শীতি। নিশ্চয়।

জলপ্লাবন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদসর্ব্বাধিকারী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সত্যব্রত যখন বুঝিল, রোদনে বা হা-হুতাশে কোনই ফল নাই, তখন সে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিল এবং লোকজন সংগ্রহ করিয়া নৌকারোহণে বন্ধুর অন্বেষণে বহির্গত হইল। নৌকা যখন "বাহির জলে" বাহির হইয়া যায়, তখন মনোরমার শোকসন্তপ্তা মাতা সত্যব্রতের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া কহিলেন—দেখিস্ বাবা, আমার দুটীকেও যেন ফিরিয়ে আন্‌তে পারিস্।" "দুটী" অর্থে মনোরমা ও তাহার শিশুভ্রাতা।

সত্যব্রত অশ্রুসিক্তনয়নে কহিল—"তাই আশীর্ব্বাদ কর মা, তাই যেন হয়। একজনের সন্ধান পেলেই হয়ত সকলকে পা'ব।" দ্রুতবেগে নৌকা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। শোকাতুরা জননী তখনও চীৎকার করিয়া সত্যব্রতের উদ্দেশে বলিতেছেন—"তা'দের ফিরিয়ে আনিস্ বাবা ? বেলা অনেক হ'ল, এখনও তা'রা মুখে জল দেয় নাই।"

অভাগিনী এখন উন্মাদিনী। হরকুমার আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। হায়! প্রিয়জন-শোক! সে নিদারুণ শোকের বেদনা মানুষকে পাগল করিয়া দেয়।

নৌকারোহণে সত্যব্রত চতুর্দ্দিকে রমেন্দ্র ও মনোরমার অন্বেষণ করিল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে নানা কথা, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার কোনও ফলই ফলিল না। জল-বিস্তার তখন অসীম—অনন্ত ; শবের সংখ্যা তখন অগণ্য—জীবন্মৃতের সংখ্যা গণনা করিবার উপায় নাই—স্রোতের টানে মৃত ও জীবন্ত সব ভাসিয়া যাইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকগণের উদ্যম ও চেষ্টায় অনেকেই মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রমেন্দ্র, মনোরমা বা তাহার শিশু ভ্রাতার সন্ধান পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কেমন করিয়াই বা সে সংবাদ পাওয়া যাইবে। দেশ তখন জলে জলময়—দিকে দিকে স্বেচ্ছাসেবকগণ আপনাপন কর্ম্মে নিযুক্ত। সকল স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত সত্যব্রতের

অবশ্য সাক্ষাৎ হয় নাই—তাহা হওয়াও সম্ভব নহে। সুতরাং রমেন্দ্র ও মনোরমার যে কি হইল, তাহারা কোন্‌দিকে ভাসিয়া গেল, তাহারা এখনও জীবিত কি মৃত তাহা নিরূপণ করা কেমন করিয়া কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে ?

সত্যব্রতের, যখন মনে ধারণা হইল যে, রমেন্দ্র ও মনোরমা অগাধ জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের উদ্ধার করা এক প্রকার সাধ্যাতীত, তখন সে চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বোধ করিতে লাগিল। এতক্ষণ তাহার আশা ছিল, রমেন্দ্র জীবিত আছে এবং সে কোথাও না কোথাও ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথবা কেহ না কেহ তাহাকে জল হইতে উঠাইয়াছে। রমেন্দ্র বিশেষ সন্তরণপটু। সে যে প্রান্তরের জলে সহসা ডুবিয়া যাইবে, এমন কথা সত্যব্রত কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারে নাই, অথব সে কথা ভাবিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বহু চেষ্টা ও বহু অন্বেষণের ফলেও যখন তাহাকে পাওয়া গেল না, তখন সে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমেন্দ্রকিশোরের মত বন্ধু হারাইলে সত্যব্রতের আর কি থাকিবে, কি লইয়া সে আর সংসার করিবে! রমেন্দ্র তাহার পরামর্শে মন্ত্রী, আজ্ঞাপালনে দাসানুদাস, আজ্ঞাদানে প্রভু, স্নেহে সহোদর, নিরাশায় আশা, অন্ধকারে আলোক; সুখে, সম্পদে, দুঃখে, বিপদে রমেন্দ্র তাহার সর্ব্বস্ব, রমেন্দ্র তাহার জীবন, রমেন্দ্র তাহার প্রাণারাম; রমেন্দ্র ভিন্ন তাহার বাঁচিয়া সুখ নাই, বুঝি বা মরিয়াও শান্তি নাই। এমন বন্ধু হারাইয়া সত্যব্রত স্থির থাকিবে কেমন করিয়া? সত্যব্রতের আশা ভরসা যাহা কিছু ছিল, তাহা রমেন্দ্র; সুখ, শান্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা রমেন্দ্র; সম্পদ, গৌরব যাহা কিছু ছিল তাহা রমেন্দ্র। তাহাদের পরস্পরের স্নেহ উদার অনন্ত; ভক্তি, বিশ্বাস অকৃত্রিম; বন্ধুত্ববন্ধন অলৌকিক। তেমন বন্ধু হারাইয়া—সত্যব্রতের মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে ?

মৃতপ্রায় হইয়া সত্যব্রত নৌকার উপর পড়িয়া রহিল। নৌকাবাহিগণ ও নৌকাস্থিত অন্যান্য লোকজন সতর্কতার সহিত নৌকা চালাইয়া মিত্রবাটী অভিমুখে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না।

সত্যব্রতের এক ক্ষীণ আশা ছিল, রমেন্দ্র, হয়ত এতক্ষণ ভাসিয়া ভাসিয়া বাটীতে আসিয়া পৌঁছাইয়া থাকিবে। সেই আশায় তাহার শরীরে অনেকটা বল আসিল। কিন্তু সে আশা বৃথা!

নৌকা যখন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল, তখন সে স্থানের লক্ষণাদি দেখিয়া তাহাকে বুঝিতে হইল, তাহার আশাপ্রদীপ নিরাশার ঝঞ্ঝাবাতে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। সত্যব্রত নৌকামধ্যে অচেতন হইয়া পড়িল—অন্যান্য সকলে ধরাধরি করিয়া নৌকা হইতে তাহাকে বাটীতে লইয়া গেল। তখন সাবিত্রী সুন্দরী পা ছড়াইয়া বসিয়া শিশু পুত্রকে স্তন্য পান করাইবার অভিনয় করিতেছেন, আর বলিতেছেন—"রমা ব'স মা, ব'স; খোকাকে খাইয়ে দাইয়ে তোকে ভাত্ দিচ্ছি মা, ব'স।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যখন সকল চেষ্টা বিফল হইল, সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল, সকল আশা নির্ম্মূল হইল, তখন সত্যব্রত আর বর্দ্ধমানে বৃথা কালক্ষেপ করিতে চাহিল না। সে স্থান তাহার পক্ষে তখন কারাপেক্ষাও ভীষণতর হইয়া উঠিল। অহিশেখর তাহার প্রতি সাতিশয় সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল এবং তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু সে মিষ্টালাপে ও সহানুভূতিতেও তাহার মন আর মানা মানিল না, হৃদয় আর বেদনা মুক্ত হইল না। রমেন্দ্রময় সত্যব্রত রমেন্দ্রকে হারাইয়া আত্মহারা হইয়াছে। সংসারের কোনও সুখ, কোনও সম্পদ, কোনও আশা তাহাকে যে কখনও আর আশান্বিত করিতে পারিবে, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া তাহা আর মনে করিবার উপায় রহিল না। বিশেষ সাবিত্রীর ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ, হাস্য, নৃত্য, অনুনয়, অনুরোধ এবং অন্যান্য প্রলাপবাক্য সত্যব্রতকে অধিকতর ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তুলিল। সন্তানশোক সন্তপ্তা উন্মাদিনী জননীকে শান্ত করিবার চেষ্টা মনোরমার ধৈর্য্যশীল পিতা যথেষ্টই করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টার কোনও ফল ফলে নাই। উন্মাদিনীর উন্মত্ততা বরং তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছিল। সে শোকদৃশ্যে শোকাতুর সত্যব্রতের শোকোচ্ছ্বাসও তটবিঘাতিনী প্রবাহিনী বক্ষোপরি ফেনিল তরঙ্গমালার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সত্যব্রতের মনের অবস্থা বুঝিয়া অহিশেখরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। সত্যব্রতকে সে বাটীতে রাখা অহিশেখর আর কোনও প্রকারে সমীচিন বলিয়া মনে

করিতে পারিল না। তবে জলপ্লাবননিবন্ধন যে কয়দিবস বাটী হইতে বহির্গত হওয়া অসম্ভব হইল, সেই কয়দিবস মাত্র অহিশেখর তাহাকে মৌখিক যত্ন দেখাইয়া বাটীতে স্থান দিল। বন্যার স্রোত হ্রাস হইতেই অহিশেখর সত্যব্রতের বাটী যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সত্যব্রত যখন অহিশেখরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তখন সাবিত্রী-সুন্দরী পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া হরকুমারের সম্মুখে অভিনব অঙ্গভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকে ছেড়ে দিলে যে?" হরকুমার বিস্মিতনেত্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"কাকে?"

সাবিত্রী-সুন্দরী সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া কহিল—"ওকে, ও যে ছেলে চোর। ব্যাকুল স্বামী উন্মাদিনী পত্নীকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন—"না, না ও তা নয়, তা নয়। ও সত্যব্রত, রমেন্দ্রের বন্ধু, ও আজ বাড়ী গেল। তুমি চল, ঘরে চল। এমন ক'রে বা'রবাড়ীতে স্ত্রীলোকের কি আসতে আছে।"

পাগলিনী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"নাও যাও যাও, আমি ঘরে যা'ব না; আমি বর দে'খ্‌ব, বর দে'খ্‌ব। রমার বর, রমার বর। আয় খোকা আয়—বর দেখ্‌বি আয়।"

সন্তানহারা জননী কল্পনায় সন্তান ক্রোড়ে ধারণ করিল, কল্পনায় সন্তানের মুখ চুম্বন করিল, কল্পনায় সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া "রমার বর" দেখিতে ছুটিল। হরকুমার তাহাতে বাধাপ্রদান করিতে অগ্রসর হইলে সে সে বাধা অতিক্রম করিতে পাগলিনী বিশেষ চেষ্টা করিল।

সত্যব্রতকে একটু আগাইয়া দিয়া অহিশেখর বাটী প্রবেশ করিবার পথে সে দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অহিশেখরকে দেখিয়া হরকুমার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুযোগে উন্মাদিনী সাবিত্রী—"ধর্ ধর্ ছেলেধরা" বলিয়া ছুটিয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল। অহিশেখর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাটীর দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিল, হরকুমার তাঁহার পাগলিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ধরিতে ছুটিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রমেন্দ্রকিশোরের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল—সম্পর্কে সে রমেন্দ্রের খুল্লতাত। তবে খুল্লতাত মহাশয়কে দত্তবাটীতে পূর্ব্বে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। অনেকে তাহার অনেক প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

খুল্লতাতের নাম মধুসূদন ঘোষ। মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের পিতার দূর সম্পর্কীয় মাতুলপুত্র। বয়স তাহার অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি বয়সের অনুপাতে নিতান্ত হীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মধুসূদন দেখিতে যেরূপ কুৎসিত, তাহার মনও সেইরূপ কুৎসিত। তথাপি রমেন্দ্র-কিশোরের স্বর্গগত পিতৃদেব তাহাকে সুপথগামী করিবার এবং তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। উদার পুরুষের উদার চেষ্টার কিছু ফলও ফলিয়াছিল; কিন্তু তাহার বিপরীত ফলও যে ফলে নাই, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। হীনবুদ্ধিসম্পন্ন পরশ্রীকাতর মধুসূদন দেবভাবাপন্ন মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। উদারহৃদয় সত্যেন্দ্রকিশোর তাহা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া মর্ম্মপীড়িত হইলেন। কিন্তু তিনি মধুসূদনকে আর শাসনও করিতে পারিলেন না এবং তাহাকে তাঁহার আশ্রয় হইতে বঞ্চিতও করিতে পারিলেন না। স্বরোপিত বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটিত করা অনেকের সাধ্যায়ত্ত নহে। মধুসূদন সেই হিসাবে বাচিয়া গেল এবং তাহার জীবিকার্জ্জনের একটা বিশেষ সুবিধা করিয়া লইল!

বহির্দৃষ্টিতে মধুসূদনকে কুলোক বলিবার উপায় নাই। সে পূজাপাঠ করে, ভিক্ষার্থীকে দু' পয়সা ভিক্ষা দেয়, লোকজনের সহিত শিষ্টালাপ করে, আত্মীয়কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবগণের বাটীতে যাইয়া বাটীর কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করে এবং অবসর মত সাহিত্যদর্শনাদির অনুশীলন যে না করে, এমন কথাও বলিতে পারাযায় না। এই সকল কারণেই অনেকের ধারণা মধুসূদন বড় মধুর প্রকৃতির লোক এবং সে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের পথিক।

বস্তুত সে সে প্রকৃতির লোক নহে! কাহারও শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনিলে

মধুসূদনের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, আহারে রুচি থাকে না এবং তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। প্রতিষ্ঠাবানের বিপদ ও দারিদ্রের কথা অবগত হইলে সে আর্ত্তজনের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু মনে মনে যার পরনাই আনন্দানুভব করে। পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়, মধুসূদন তাহার সদাশয় আশ্রয়দাতা আত্মীয়েরও সর্ব্বনাশসাধনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই মধুসূদনের উপযুক্ত পুত্র বিশ্বনাথও নাকি পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অন্য এক অধম ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিয়া রমেন্দ্রকিশোরের পিতৃদেব সত্যেন্দ্রকিশোরকে একটা মিথ্যা মোকদ্দমায় বিজড়িত করিবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি বলিয়া সত্যেন্দ্রকিশোর সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

মধুসূদনের অনন্ত গুণ যখন অনন্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন সে স্বয়ংই দত্ত বাটীতে যাতায়াত বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। সত্যেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরে মধুসূদন মধ্যে মধ্যে বেড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু গৃহস্থ নিদ্রিত নহে বুঝিতে পারিয়া সে আর সে পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে নাই।

সেই মধুসূদন যখন শুনিল, রমেন্দ্রকিশোর বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং এতাবৎকাল তাহার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় নাই, তখন তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তবে সে আনন্দ মনে মনে—বাহিরে তাহা আর ফুটিয়া বাহির হইল না।

রমেন্দ্রের শোকে মধুসূদন অনেক কাঁদিল, মৃতের গুণকীর্ত্তন করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল, শোকানলে তাহার হৃদয় যে ভস্মীভূত হইতেছে, সে কথা সে শতবার শতপ্রকারে সকল লোকের নিকটে অভিনয়ভঙ্গীতে বুঝাইয়া বলিল। তৎপরে সে পরমাত্মীয়ের মত রমেন্দ্রকিশোরের বাটী পরিদর্শনাদি করিবার সঙ্কল্প করিল এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহার সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিল। বাটী পরিদর্শনাদির পরে সে সেই বাটীতেই তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করিল এবং সেইখানেই রহিয়া গেল। অবশেষে একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, রমেন্দ্রকিশোরের লোহার সিন্দুক হইতে একখানা উইলপত্র বাহির হইয়াছে। সে উইলের বলে, মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের উত্তরাধিকারী এবং রমেন্দ্রের প্রভূত সম্পত্তি মধুসূদনেরই প্রাপ্য।

উইলের কথা শুনিয়া অনেকে হাসিল, অনেকে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তবে সে কথায় কেহ আর বিশেষ কোনও কথা কহিল না। রমেন্দ্রের বিষয়-সম্পত্তিতে দাবী করিবার অন্য আর কেহই ছিল না; সুতরাং মধুসূদনের দাবীই বজায় রহিল। মধুসূদন তখন শিকড় গাড়িয়া রমেন্দ্রের বাটীতে বসিয়া পড়িয়াছে—অর্থবলে তাহার লোকবলও তখন যথেষ্ট। অতএব কোন্ ভদ্র-সন্তান আর তখন কথায় কথা বাড়াইয়া অভদ্রের সহিত অভদ্রতা করিতে অগ্রসর হইবে! পাপের তখন জয় হইল, পুণ্যের পরাজয় হইল। মধু-সূদনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তখন আর কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। নির্ব্বিবাদে মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের সম্পত্তিগুলি ভোগ করিতে লাগিল।

সত্যব্রত সকল কথা শুনিল এবং শুনিয়া রুদ্ধদ্বার গৃহকোণে বসিয়া অবিরলধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে অশ্রু, রমেন্দ্রের বিষয়-সম্পত্তি পরহস্তগত হইবার জন্য নহে—রমেন্দ্রের বিরহে। সত্যব্রতের তখন মর্ম্মদাহ হইতেছে; সত্যব্রত তখন রমেন্দ্রকিশোরের চিন্তায় বিভোর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অহিশেখর বর্দ্ধমানে বসিয়া মধুসূদনের বিষয়াধিকারের কথা শুনিল। সে কথা শুনিয়া সে অবশ্য স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার স্বর্গগতা ভ্রাতৃজায়া—রমেন্দ্রের পিসীমাতা শিবসুন্দরীর কিছু তৈজসপত্র, কিছু অর্থা-লঙ্কার, কিছু বহুমূল্য বস্ত্র রমেন্দ্রকিশোরের নিকট গচ্ছিত হইল। গচ্ছিত ধন শিবসুন্দরীর ইচ্ছানুসারে অবশ্য রমেন্দ্রকিশোরেরই প্রাপ্য। কিন্তু রমেন্দ্রকিশোর যখন জীবিত নাই, তখন কোন্ অধিকারে প্রবঞ্চক মধুসূদন তাহা গ্রহণ করে? রমেন্দ্রকিশোর যে উইল করিয়া যায় নাই, সে কথা অন্য সকলেও যেমন বুঝিয়াছিল, অহিশেখরও সেইরূপ বুঝিল। মধুসূদন যে একখানা জাল-উইলের বলে রমেন্দ্রকিশোরের অগাধ সম্পত্তির মালিক

হইয়াছে, তাহা অহিশেখর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু সহ্য না করিয়াই বা আর উপায় কি? সকলেই সকল কথা যে না বুঝিয়াছিল, এমন নহে; তবে দুর্ব্বৃত্ত মধুসূদনের বিরুদ্ধে যে কেহ দণ্ডায়মান হয় নাই, তাহার কারণ রমেন্দ্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া আর কাহাকেও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া-যায় নাই।

উপায়ান্তর না দেখিয়া অহিশেখর তখন ভাবিতে লাগিল,—উইলের শক্তিতেই হউক, আর উত্তরাধিকারসূত্রেই হউক, মধুসূদন যদি কেবলমাত্র রমেন্দ্রকিশোরের সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু অহিশেখর যখন জীবিত, তখন তাহার ভ্রাতৃ-জায়ার অর্থালঙ্কারাদি তাহার হস্তচ্যুত হইবে কেন?

সে সমস্ত অর্থালঙ্কারাদি ফিরিয়া পাইবার আশায় অহিশেখর উপায় চিন্তা করিতে লাগিল এবং সে সম্বন্ধে মধুসূদনের নিকট একখানা পত্রও প্রেরণ করিল। মধুসূদন কিন্তু প্রথমে সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। কিন্তু যখন সে বুঝিল, অহিশেখর কোনও অংশে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ব্যক্তি নহে, তখন মধুসূদন বিনয়নম্র পত্রোত্তরে লিখিল—"শিবসুন্দরীর অর্থ ও অলঙ্কারের কথা সে বস্তুতই অবগত নহে এবং উল্লিখিত অর্থালঙ্কারাদি তাহার নূতন অধিকৃত বাটীর কোনও স্থানে পাওয়া যাইতেছে না এবং তাহা পাইবারও সম্ভাবনা নাই।"

অহিশেখরও ছাড়িবার পাত্র নহে। বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধারসাধনে সে বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিল। উদ্যোগপর্ব্বের ঘটা দেখিয়া মধুসূদন বুঝিল, অহিশেখর আদৌ সরল বা কোমলপ্রকৃতির লোক নহে; সুতরাং তাহার সহিত বাদ-বিষম্বাদ করা মধুসূদনের পক্ষে খুব সহজ হইবে না। আর অহিশেখরের যেরূপ অভিযোগ, তাহার বিচারফলে যে মধুসূদনের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বিচারালয়ে প্রকাশ পাইবে—গুপ্তকথা ব্যক্ত হইবে, সে কথা বুঝিতেও মধুসূদনের বাকী রহিল না। অগত্যা মধুসূদন অহিশেখরের সহিত একটা "মিটমাট" করিতে বাধ্য হইল এবং শিবসুন্দরীর পরিত্যক্ত সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি মিত্রবাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিল।

অহিশেখর মনে মনে হাসিয়া শিবসুন্দরীর সম্পত্তি গ্রহণান্তর আর একটা নূতন চাল চালিল। ভয়ে তখন অহিশেখরের প্রতি মধুসূদনের প্রবল ভক্তি

হইয়াছে। সে সহজেই স্বীকার করিল, রমেন্দ্রকিশোরের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অহিশেখরের একটা অংশ থাকিবে। মধুসূদন, প্রবঞ্চক—কাপুরুষ। চতুর অহিশেখরের চাতুরীর কথা বুঝিতে পারিয়াও সে আর তাহার বিরুদ্ধে কোনও কথা কহিতে পারিল না। কারণ তাহাতে মধুসূদনের বিপৎপাতের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বিষয়সম্পত্তির অংশবিভাগের কথা যখন স্থির হইয়া গেল, তখন মিত্রজ ঘোষজের বন্ধু হইয়া পড়িল। সে বন্ধুত্ব অবশ্যই মৌখিক। যাহা হউক, তাহাতে কোনও পক্ষেরই বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না। চতুরতা তখন চলিতে লাগিল—চতুরে চতুর।

অ-লাভ হইল মনোরমার পিতা হরকুমারের। অহিশেখর ও মধুসূদনের বিষয়াধিকারের কথা শুনিয়া হরকুমার অহিশেখরকে দুই পাঁচ কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে হরকুমারকে বর্দ্ধমান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। উন্মাদিনী সাবিত্রী সুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন—তখন তিনি নিরাশ্রয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যাঁহাদের সদাশয়তায় রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমার চেতনাবিহীন দেহ জলরাশি হইতে নিরাপদ স্থলে আনীত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কালীঘাটের সেই পূর্ব্বকথিত বিমলানন্দ ভারতী ও তাঁহার শিষ্য নবীনানন্দকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। জলপ্লাবনে লোকের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া হৃদয়বলে বিমলানন্দ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। সেবাধর্ম্মে তাঁহার প্রবল আস্থা। আর্ত্তগণের জন্যই তিনি কালীঘাট হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপন্নদিগের সেবা করিতেছিলেন। নবীনানন্দও তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছিল। বিমলানন্দ ও নবীনানন্দের সেবা ও যত্নে যে সে যাত্রা অনেকেরই জীবন রক্ষা হইয়াছিল—এ কথা বলিলে তাহা অতিরঞ্জিত হইবে না। বিমলানন্দকে সাহায্য করিবার জন্য বিস্তর লোক ভারতীয় দলে যোগদান করিয়াছিল। সেই কারণে সেবাকার্য্যে বিমলানন্দের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমাকে যখন জল হইতে উঠান হইয়াছিল, তখন যে তাহাদের সংজ্ঞা ছিল না, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহাদিগকে স্থানান্তরে—একটী উচ্চভূমি স্থিত কুটীরে লইয়া যাইয়া উদ্ধারকর্ত্তা তাহাদের সেবা ও শুশ্রূষার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং ঔষধ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হইল। অগ্নির তাপে এবং ঔষধের গুণে মুমূর্ষুদ্বয় জীবন ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইতে তাহাদের কিছুকাল কাটিয়া গেল। সেই সময়ের মধ্যে মধুসূদন রমেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তি অধিকার করিয়া কেবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং অহিশেখর চতুরতাগুণে সে বিষয়সম্পত্তিতে কিছু ভাগ বসাইয়াছে।

মনোরমার যখন প্রথম জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন সে চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেখিল, সে একটী মলিন শয্যায় শায়িতা এবং অদূরে আর একটী শয্যায় তাহার জীবনরক্ষক শয়ন করিয়া আছে। তাহারা যে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, সে কথা মনোরমা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেই জলোচ্ছ্বাস, জলতরঙ্গ তাহার মনে তখনও জাগিতেছিল। মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়া নিরাপদ স্থলে অবস্থান এবং শয্যা ও সুশ্রূষার ব্যবস্থা দেখিয়া সে প্রথমে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ প্রদান করিল এবং তৎপরে জীবনদাতার উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম করিল। বিমলানন্দ এবং তাঁহার শিষ্য নবীনানন্দ যে তাহাদের অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, সে কথা সে আদৌ অবগত ছিল না। মনোরমা জানিত, রমেন্দ্রকিশোরই তাহার রক্ষাকর্ত্তা এবং রমেন্দ্রই তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া আসিয়াছে।

চারি পাঁচ দিনের পর মনোরমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এখনও বড় দুর্ব্বল—তাহার শরীরে দারুণ বেদনা—উত্থানশক্তি আদৌ নাই। নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া সে বাটীর কথা, পিতা-মাতার কথা, শিশুভ্রাতাটীর কথা, ভীষণ বন্যার কথা ভাবিতে লাগিল।

বাটীর কথা মনে পড়িতেই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, তাহার নেত্রযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদে কুটীর তখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলানন্দ আসিয়া মনোরমাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবীনানন্দও ভারতীর সঙ্গে ছিল—তবে একটু দূরে দূরে।

অপরিচিত পুরুষদ্বয়কে সেই স্থানে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার ক্রন্দন

ইতঃপূর্ব্বেই থামিয়া গিয়াছিল। বিমলানন্দ তাহা লক্ষ্য না করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"কাঁদ কেন মা, ভয় কিসের অচিরেই আমি তোমাকে তোমাদের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিব। একটু সুস্থা হও মা,—তারপর আমি সকল ব্যবস্থা কর্‌বার অবসর পাব।"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মনোরমা সন্ন্যাসীর সহানুভূতিসূচক কথার কোনও উত্তরই দিতে পারিল না। ঔদাসীন্যবশতঃ সে সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া নবীনানন্দ একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছিল। তাহার মনের ভাব—জীবনরক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকল সময়েই বিধেয়। বিশেষ জীবনদাতা যখন সংসারত্যাগী—সন্ন্যাসী। নবীনানন্দ আরও ভাবিল,—যখন তাহার সম্মুখে তাহার গুরুদেব যথোচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই, তখন স্থানত্যাগ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

সে স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছিল। বিমলানন্দ শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া কহিলেন—

"অসহায় অবস্থায় পতিত প্রাণীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করা হীনতা অথবা বাতুলতার লক্ষণ। আর একটা কথা—তুমি আমায় ভক্তি শ্রদ্ধা কর ব'লেই যে সকলকে তা' ক'র্‌তে হ'বে, এমন বিধিনিয়ম ত কিছু নাই। আর সন্ন্যাসীর আবার পদই বা কি, আর মর্য্যাদাই বা কি? ভগবানে আত্মসমর্পণ যা'র ধর্ম্ম, তা'র নিকট আবার ক্ষুদ্র, মহৎ কি? কথাটা বুঝ্‌লে কি বাবা?"

গুরুদেবের শাসন-ইঙ্গিতে অপরিণতবয়স্ক শিষ্যের সে মনোভাব অপনোদিত হইল এবং তাহার বুদ্ধিহীনতা এবং অনভিজ্ঞতার জন্য সে অতিমাত্র অপ্রতিভ হইল। গুরুদেবের মিষ্টবাক্যে শিষ্যের সে অপ্রতিভ ভাব অবশ্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। নবীনানন্দ ভাবিল—সে দিন তাহার বৃথায় যায় নাই—কারণ সেদিন গুরুদেবের নিকট হইতে সে কিছু উপদেশ লাভ করিয়াছে।

গুরু ও শিষ্যের কথাবার্ত্তা শ্রবণানন্তর সদ্যঃ চৈতন্যপ্রাপ্তা মনোরমা যেন কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। কোনও কথা, কোনও বিষয় সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই; তবে তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহার কথা লইয়া একটা গোলযোগ বাধিয়াছে এবং একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

দারুণ কাতরতার সহিত সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং সন্ন্যাসিদ্বয়কে অভিবাদন করিবার উদ্দেশ্যে করযোড় করিল। বিমলানন্দ হাসিয়া বলিলেন—

"আমাদের ব্যবহারে তোমার প্রাণে আঘাত লাগিবারই কথা মা, যা "হ'ক, তুমি অচিরে সুস্থ হও, জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।"

রমেন্দ্রকিশোরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বিমলানন্দ কহিলেন—

"উনি ত শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। উভয়ের আরোগ্য লাভের নিমিত্ত আমি অহর্নিশি ভগবৎসমীপে প্রার্থনা কচ্ছি।"

বিমলানন্দের কথায় যে মনোরমা সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছিল, তাহা তাহার মুখভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণনয়নে সে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল, আর একবার রমেন্দ্রকিশোরের দিকে চাহিল। তৎপরে সে তাহার যুক্তকর আপন বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে কাহার উদ্দেশে যে কত কথাই বলিতে লাগিল, তাহার স্থিরতা নাই।

সুন্দরী মনোরমার তৎকালীন মুখভাব অতি রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা অবলোকন করিয়া বিমলানন্দ অনন্ত সৌন্দর্য্যরচয়িতা অনন্তদেবের চিন্তার ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইলেন। নবীনানন্দ তখন কুটিরের বহির্দ্দেশে বসিয়া মুক্তাকাশ দেখিতে দেখিতে গাহিতেছে——

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নি বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥"
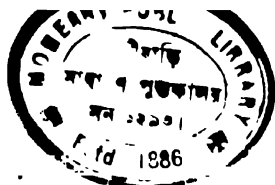
গল্পলহরী

৩য় বর্ষ, { মাঘ, ১৩২২ সাল। } ১০ম সংখ্যা

তীর্থ

জানালা খুলিয়া আকাশের জলভরা মেঘের পানে চাহিয়াছিলাম। কয়দিন ধরিয়া খুব গরম পড়িতেছিল, তাই আমার চোখে মেঘখানা বড়ই মিষ্টি লাগিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পায়ের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মা আসিতেছেন। তিনি আসিয়া বসিলেন, আমাকেও টানিয়া লইয়া কোলের কাছে বসাইয়া আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন,—"পুরুত ঠাকুর ত পাঁজি দেখে বলে গেলেন, পরশু যাত্রার দিন ভাল পরশুই যাত্রা ক'রব, ভাবছি। এক বৎসর আমি বাড়ী থাক্‌ব না,—বড় বৌমা ত তার ছেলে ক'টি নিয়েই অস্থির,—ঠাকুর সেবা আর ঘরের সব দেখাশুনোর ভার তোমার ও'পরই দিয়ে গেলাম, ছোট বৌমা! তুমিও ত এখন আর ছেলে-মানুষটি নও।"

তারপর একটু খানি হাসিয়া বলিলেন,—"এই পাঁচবছর যা শিখিয়েছি, এক বছর পরে এসে তার পরীক্ষা নেব, দেখ্‌ব, তুমি কেমন গৃহস্থালী শিখেছ।"

পূর্ব্বেই জানিতাম, মা এক বছর গঙ্গাতীরে বাস করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি যে এত শীঘ্র তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন, তাহা ভাবিতে পারি নাই। ভাবাটা আমার পক্ষে সহজও ছিল না। দুনিয়ায় যখন মানুষের একটির বেশী অবলম্বন থাকে না, তখন সে সেই অবলম্বনটাকেই প্রাণের সমস্ত জোর দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। তাহার বিচ্ছেদ-চিন্তাও মানুষের পক্ষে শঙ্কাজনক। তাই আমি মা'র বিচ্ছেদ-চিন্তাটাকে ঠেলিয়া

ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলাম ; কিন্তু সে বিচ্ছেদ বুঝি আজ মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ! আমি কিছু বলিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মা আমার নতমুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"কথা বল্‌ছ না কেন মা ?"

আমি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম,—"কেন মা, সবাইকে ছেড়ে যেয়ে এক বছর সেখানে থাক্‌বেন ?"

"বলে কি পাগলের মেয়ে ! বুড়ো হয়েছি, আর ক'দিনই বা বাঁচ্‌ব ? যেদিন মরণের ডাক আস্‌বে, সেদিন কি তোদের সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে না ? এতদিন তোদের কাজ কর্‌লুম, এখন কি আমার পরকালের কাজ কর্‌তে দিবিনে ?"

"আমায় কেন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান না মা !"

"তোমার কি এখন তীর্থ কর্‌বার সময় ? সংসারই যে এখন তোমার তীর্থ "

তাঁহার কোলের উপর পড়া আঁচলখানা আমার দীর্ঘতপ্ত শ্বাসে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চমকিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গেই যেও।"

"না, মা, দিদির অসুবিধে—"

"কিছু অসুবিধে হবে না তার। আমি সব ঠিক ক'রে রেখে যাব।"

মা উঠিয়া গেলেন। কি লজ্জা ! তিনি হয়ত মনে করেছেন, সংসারের উপর আমি বীতরাগ হয়েছি। মনে করিবার দু'একটা কারণও ছিল।

আমার বাহিরের দিক্‌টা দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে করিত, সংসারে আমার কোন আকর্ষণ থাকিবার কথা নাই। তেরোর গণ্ডী পার হইয়া আমি যখন চৌদ্দতে পা দিলাম, তখনই আমার নিঃস্ব বিধবা মা'র দারুণ দুশ্চিন্তায় সামান্য হবিষ্যান্ন ক'টিও জীর্ণ হইত না। আজি কালিকার শিক্ষিত সমাজ যেমন কোন কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের প্রতি দয়া দেখান অত্যন্ত দুর্ব্বলতা মনে করেন, কালও বুঝি তেমনই মনে করে, তাই সে আমাকে অবিচল দৃঢ়তার সহিত চৌদ্দর সীমাটিও পার করাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মা'র অজীর্ণ ও অনিদ্রা বাড়িয়াই চলিল। এমনি সময়ে একদিন মা'র সঙ্গে আমার শ্বশুরের দেখা হইল। উভয়ের মাতুলালয় এক গ্রামে। শিক্ষা মানুষকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলে। শুনিয়াছি, আমার শ্বশুর নাকি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না, তা ছাড়া স্ত্রীসুলভ একটুখানি দুর্ব্বলতাও নাকি তাঁর

ছিল। তাই তিনি মার অবস্থা দেখিয়া প্রস্তাব করিয়া বসিলেন, তিনি তাঁহার বি, এ, পাশ করা কনিষ্ঠ পুত্রটির জন্য আমাকে গ্রহণ করিতে চান। কথাটা শুনিয়া উপহাস মনে করিয়া মা হাসিলেন। সম্পন্ন গৃহস্থের বি. এ. উপাধি-ধারী পুত্র, এ যে ধনীর কল্পনার সুখ! তারপর শ্বশুরের কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া মা'র কোটরগত চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দুইমাস পরে শ্বশুর আমাকে বধূত্বে বরণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। আজ কাল এমন নির্ব্বুদ্ধিতাও কেউ করে! পণ না হয় না-ই লইতেন, ধনীর কন্যা আনিলেও ত তাহার সঙ্গে অযাচিত হইয়াও বহু টাকার যৌতুক আসিত! একজন সহৃদয়া প্রতিবাসিনী শাশুড়ীকে বলিলেন,—"তোমাদের কর্ত্তার ত কোন দোষ নেই, তোমার বেয়ান মাগী নিশ্চয়ই ডাইনী। তা'র মায়ায় উনি ভুলে গিয়েছেন।" আমি তখন শাশুড়ীর পাকা চুল তুলিতেছিলাম। তিনি আমার ঘোমটায় আধ-ঢাকা কাতর মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আমার বেয়ান ত ডাইনী নন্, তবে তিনি চোখের চাওনিতে তাঁর বেয়াইকে ভুলিয়েছেন—তাতে সন্দেহ নেই। কি বল মা, লক্ষ্মী?" আমি পাড়াগাঁয়ে মেয়ে, তাঁহার রসিকতায় অশ্লীলতার খোঁজ না পাইয়া নতমুখে একটু হাসিলাম। প্রতিবাসিনী উঠিয়া গেলে তিনি আমার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"ওদের কথায় কিছু দুঃখ করোনা মা। তোমার সীঁথির সিন্দূর অক্ষয় হোক্, তুমি আমার চারুর আদরিণী হও, সেই আমার সব সেরা সুখ।"

মা, 'সেরাসুখ' ভোগ করিতে পারিলেন কি না জানি না, আমি ত তাঁহার পুত্রের আদরিণী হইতে পারি নাই। শ্বশুরঘরে পা দিয়াই বুঝিয়াছিলাম, স্বামী নিজের একান্ত অনিচ্ছায় পিতামাতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহের গোল চুকিয়া গেলেই তিনি নানা অজুহাতে একবছর বিদেশেই কাটাইলেন। এক বছর পরে তিনি বাড়ী আসিলেন। আসিয়া কিছুদিন পরে একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সারাদিন অসুখে কাটাইয়া তিনি যখন সন্ধ্যার পর ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন মা আমাকে তাঁহার বিছানার পাশে ডাকিয়া হাতের পাখাখানি আমার হাতে দিয়া উঠিয়া গেলেন। আমি ধীরে ধীরে বিছানার এক ধারে উঠিয়া বসিলাম বটে, কিছু সঙ্কোচ ও দ্বিধা যেন আমাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিল। যিনি আজ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একটি

কথাও বলেন নাই, আজ কি করিয়া তাঁহার সেবার ভার লইব? খানিক পরে তিনি যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ করিয়া পাশ ফিরিলেন, তখন কোন মতে সঙ্কোচটা কাটাইয়া পাখা নাড়িতে লাগিলাম। আমি কোনদিন তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া দেখি নাই, আজ প্রথম দেখিলাম, সেই মুখে, সেই ললাটে যেন কিসের একটা দ্বন্দ্ব সুগভীর বেদনা ও ক্লান্তির ছাপ দিয়া রাখিয়াছে। আমি অন্যমনে ভাবিতে লাগিলাম। "একি! তুমি মৃণাল!" শুনিয়াই চকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, তিনি উঠিয়া বসিয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই আমি মুখ নীচু করিলাম। তাঁহার মুখে এই প্রথম আমার নাম শুনিলাম! কিন্তু এ স্বরত স্নেহমধুর বা আবেশ কম্পিত নয়! ইহাতে যে পরিপূর্ণ বিস্ময়! তিনি বলিলেন,—"পাখা রেখে দাও, তোমার কষ্ট হচ্ছে।"

কিছু বলিলাম না. নিঃশব্দে পাখা লইয়াই বসিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন,—"আমি তোমায় কিছু দিতে পারিনি. তোমার কাছ থেকে কিছু পাবার অধিকারও আমার নেই।" তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি বলিতে দিলাম না। আমার আত্ম-বোধকে কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়া সজাগ করিয়া দিল। আমি মৃদু স্পষ্ট কণ্ঠে বলিলাম, "আমি তোমার কাছে কিছু চাইতে আসিনি. মা ডেকেছেন. তাই এসেছি।"

কিছু কাল তিনি অবাক থাকিয়া কাতরভাবে শুইয়া পড়িলেন। এইরূপে আমার প্রথম স্বামিসম্ভাষণ হইল।

আমার বিবাহের বছর দুই পরেই শ্বশুরের মৃত্যু হইল। ভাসুর নিকটবর্ত্তী সহরে ওকালতী করিতেন, প্রত্যেক শনিবারে বাড়ী আসিতেন। স্বামী গরিবের ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বাড়ীতে এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন। বাকি সময়টা নিজের পড়াশুনা লইয়াই কাটাইতেন। নারীজীবনে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও দুঃখ স্বামীর উপেক্ষা। আমি এ অপমানজনক দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতাম না। কোন ক্ষোভও মনে ঠাই দিতে চাহিতাম না। আমিও হাসি গল্পে প্রফুল্লতায় তাঁহার উপেক্ষাকেও উপেক্ষা করিয়া চলিতাম। আমি কিসে তাঁর অযোগ্য? পরীর মত সুন্দরী বা তাঁর মত বিদ্বান্ আমি নই. তাই বলিয়া কি উনি আমাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কত শিক্ষিত বড়লোকের শীক্ষিত রূপে গুণে আমার চেয়ে বড় নয়! কৈ, তাহারা ত স্বামী-উপেক্ষিতা নয়। আমার মন তবু মাঝে মাঝে অবাধ্য হইয়া লতার মত তাঁহার পায়ে লাগিয়া থাকিতে চাহিত।

যখন তিনি সেবকরূপে দরিদ্র রোগীর শিয়রে সারা রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া স্মিতমুখে মায়ের মৃদু তিরস্কার শুনিতেন, তখন আমার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া দেহটাকে তাঁহার সেবার জন্য জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিত। ওগো, তুমি একবার ডাক! তোমার আহ্বানগঙ্গা আমার অভিমান-ঐরাবত ভাসাইয়া লইয়া যাক্! একি! প্রলাপ বকিতেছি নাকি? যাক্, মা'র কাছে কিছুই লুকাইতে পারা যাইত না। তিনি সবই বুঝিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আমি খুব ভাল বৌ,—অনেকের ভাগ্যে এমন জুটে না। তাঁর ছেলের দুর্ভাগ্য বলিয়া এমন স্ত্রীর মূল্য বুঝিল না। আমি যদি খুব ভালই না হইতাম, তবে স্বামীর অনাদরে রাগ করিয়া বাপের বাড়ী যাইয়াও ত থাকিতে পারিতাম। এখন আমার ভাই বেশ দু'পয়সা উপায় করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার প্রতি তাঁহার ছেলের উপেক্ষা যেমন তাঁহাকে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি আমার প্রতি তাঁহার মমতার মাত্রাটাও দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিল। তিনি আমার সব আবদার অকাতরে সহ্য করিতেন। তাই আজ যখন তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলাম, প্রায় বিনা আপত্তিতেই তিনি তাহাতে রাজি হইলেন।

২

গঙ্গাতীরে আমাদের থাকিবার জন্য যে বাড়ী খানি ঠিক করা হইয়াছিল, সে খানি দেখিয়া আমার চিত্ত তৃপ্তি ও স্বস্তির উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। বাড়ী-খানি ছোট, কিন্তু ছবির মত সুন্দর। আমাদের বাড়ীর পাশেই আর একখানা বাড়ী, দুই বাড়ীর মাঝখানে ব্যবধান রাখিয়াছিল, সবুজ গালিচার মত দুর্ব্বায় ঢাকা ছোট এক টুকরা জমি। সে বাড়ীতেও বেশী লোকজন ছিল বলিয়া মনে হয় না, তপোবনের মত শান্ত। খুব কাছে আর লোকালয় ছিল না। পিছনে আর দুই পাশে মাঠ, সম্মুখে পতিতপাবনী সন্তাপহারিণী গঙ্গা, মাঠের ওপারে লোকালয়। আত্ম-গোপনের ব্যর্থ-প্রয়াস এখানে আর আমাকে ক্লিষ্ট বিব্রত করিয়া তুলিতে পারিবে না। রুদ্ধগতি অশ্রুপ্রবাহ গতিশীল গঙ্গা-প্রবাহে মিশাইয়া চিত্তের ভার লঘু করিতে পারিব।

নূতন বাড়ীতে আসিয়া নূতন সংসার পাতাইতে পাঁচ সাত দিন গেল। এই পাঁচ সাত দিনের মধ্যে বাহিরের কিছু ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পারিলাম না। আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই গঙ্গায় যে বাঁধাঘাট ছিল, সেই ঘাটে গৃহস্থের কন্যা, বধূ ও গৃহিণীরা আসিয়া স্নান, সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি করিত সকাল ও

সন্ধ্যায় হাসি গল্পে ঘাটখানি মুখর হইয়া উঠিত, মাঝে মাঝে সেখানে ঝগড়ার ঝঙ্কারও শুনা যাইত। আমিও সেই ঘাটে স্নান করিতাম। কিন্তু সব চেয়ে আমার কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই ঘাটের একটি নিত্য স্নানার্থিনী বিধবা মেয়ে। সে যাচিয়া কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিত না, জিজ্ঞাসিত হইয়াও স্মিত মুখে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া যাইত। তাহার অন্তরের গভীর প্রশান্ত উজ্জ্বল দীপ্তি যেন তাহার বাহিরের উচ্ছ্বলিত যৌবন শ্রীকেও ম্লান করিয়া দিতেছিল। এই দীপ্তিটাই আমার চোখে একেবারে নূতন লাগিতেছিল। মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ করিবার ইচ্ছা খুবই প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মিতভাষিতা আমাকে বাধা দিত।

সে দিন সকাল বেলা আমি স্নান করিতে গিয়াছিলাম। ঘাটে যাইয়া দেখিলাম, একটি কৃষ্ণবর্ণ মলিন বসন বালক ঘাসের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছে। আমি কি করিব ভাবিতে না ভাবিতেই দেখিলাম, সেই মেয়েটি সন্ধ্যা ফেলিয়া উঠিয়া দ্রুতপদে আসিয়া দুইহাতে বালকটিকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইল। দেখিয়া বুঝিলাম, আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় বালকটির পায়ের অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে; কর্ত্তিত স্থান হইতে দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল। মেয়েটি ক্ষিপ্রহস্তে নিজের গামছাখানি ছিঁড়িয়া বালকের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। তারপর নিঃশব্দে আমার হাতের জল ভরা ঘটিটা লইয়া এক হাতে ক্ষত স্থানে জল ঢালিতে লাগিল, দুই একটি সান্ত্বনার কথা বলিয়া অন্য হাত ধীরে ধীরে বালকের পিঠে বুলাইতে লাগিল। বালকের কান্না থামিলে সে বলিল, "তুমি বোস একটু, আমি আমার চাকরকে ডেকে নিয়ে আসৃছি; সে তোমাকে বাড়ী রেখে আসবে।" বলিয়াই সে চলিয়া গেল। দেখিলাম, সে আমাদের পাশের বাড়ীতেই ঢুকিল। তবে সে আমার প্রতিবাসিনী? আমি কিন্তু এতদিন তাহা জানিতে পারি নাই। সে চলিয়া গেলে শুনিলাম, ঘাটের স্ত্রীলোক কয়টি কিছু সময়ের জন্য সন্ধ্যা বন্ধ রাখিয়া বলাবলি করিতেছে,—"দেখ লো মেয়েটার কাণ্ড! বিধবা মানুষ, সন্ধ্যা ফেলে মেথর ছেলেটাকে ছুঁয়ে দিলে!" তাহাদের কথোপকথন আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, মেয়েটি চাকর সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। বালকটিকে চাকরের সঙ্গে দিয়া সে আমার কাছে আসিয়া বলিল,—"আপনার উপর সব জুলুম করেছি, কিছু মনে করবেন না। এখনি আমি স্নান ক'রে আপনাকে জল এনে দিচ্ছি।"

আমি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলাম,—"না, না, আপনি আর কষ্ট কর্‌বেন না, আমিই জল নিয়ে আস্‌ছি। "আপনি ছেলেটির জন্যে—"

সে বাধা দিয়া বলিল,—"আপনারা বুঝি আমার পাশের বাড়ীতেই থাকেন? আপনার নামটি কি?"

"আমার নাম মৃণাল। আপনি ত আমায় মৃণাল বলে ডাক্‌বেন, আমি আপনাকে কি বলে ডাক্‌ব?"

"শান্তা।"

"না, দিদি।"

"বেশ, কিন্তু 'দিদি' বল্‌লে ত 'আপনি' বলা চল্‌বে না বোন। তোমাদের এই বাড়ীতে আর কে কে আছেন?"

"শাশুড়ী আছেন আর ঝি, চাকর, গোমস্তা আছে।" শান্তা আরও দু' একটি প্রশ্ন করিয়া আমার পরিচয়টা মোটামোটি জানিয়া লইয়া আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিল—"তবে ভাই, যাই এখন, আবার দেখা হবে।"

শান্তা চলিয়া গেল। আমিও ঘরে ফিরিলাম।

খোলা মাঠের মাঝের বাড়ীতে আলো-বাতাসের যেমন প্রাচুর্য্য, রৌদ্রেরও তেমন দৌরাত্ম্য। দুপুর বেলা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিয়া ঘরগুলি উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একখানা বই লইয়া বিছানায় দেহ এলাইয়া দিলাম। তাহাও যেন ভাল লাগিতেছিল না, বইখানা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ব্যথা যে আমার কোন্‌খানে, অভাব যে আমার কি, তাহাত বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে চান না, আমিই কি ভিক্ষার্থিনীর মত তাঁকে চাই? না, না, কখনও না। তবে আমার ক্ষুধিত তৃষিত আত্মা কি চায়? কেন সে এমন করিয়া কাঁদিয়া মরে? পরিজন-বর্গের স্নেহ, অন্নবস্ত্র, স্বাস্থ্য কিছুরইত আমার অভাব নাই। কোন্ অজ্ঞাত অভাব জানি না এমনি করিয়া আমার জীবন বিফল করিয়া দিতেছে? বেশী-ক্ষণ ভাবিতে পারিলাম না। মা'র আহ্বান শুনিয়া উঠিয়া তাঁহার ঘরে গেলাম। মা'র কাছে শান্তাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মা তাহা বুঝিলেন; বলিলেন,—"তুমি শান্তাকে চিন্‌তে পারনি বুঝি, এখন বড় সড় হয়েছে, তাই ঘাটে ক'দিন দেখেও ওকে চিন্‌তে পারনি। আজ শান্তা নিজে এসে বল্লে পরে চিনেছি। এখানে শুধু বুড়ী শাশুড়ীকে নিয়ে

থাক্‌তে তোমার বড়ই কষ্ট হ'ত, ভগবান্‌ তোমার একটি বেশ সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন। শান্তা বড় ভাল মেয়ে। শুনেছি ও—"

মাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই শান্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—"এখানে আপনি কত দিন থাক্‌বেন মাসি মা?"

"ভাব্‌ছি ত এক বছর, এখন মা গঙ্গা কি করেন জানিনে।"

"আপনার শরীর বড্ড কাহিল দেখ্‌ছি যেন।"

"আর মা, শরীর! এটা এখন না থাক্‌লেই বাঁচি।"

"আমার মনে হয়, বেশীদিন বাঁচাটা মন্দ নয়। পৃথিবীতে বার বার আসার চেয়ে একবার বেশীদিন থেকে সব কাজ শেষ ক'রে যাওয়া মন্দ কি?"

"মা, তোমার বয়স অল্প. আমার চুলের মত তোমার পরমায়ু হোক্‌, ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্‌। কিন্তু আমার আর বাঁচবার সাধ নেই।"

মা আমার দিকে চাহিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না। তাঁহার স্বভাব খুব চাপা, কাহাকেও পরিবারিক অশান্তির কথা বল্‌বার মেয়ে তিনি নন্‌। কিন্তু দেখিলাম, সেই ক্ষুদ্র নিশ্বাসটিও শান্তার কাণ এড়াইতে পারিল না। সে স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি আমাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল, আমি একটা কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলাম।

৩

তিন চারি মাসে শান্তার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় খুব পাকিয়া উঠিল। সে যেন নিঃশব্দে আমার অনিচ্ছায় জোর করিয়া আমার চিত্তটা তাহার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। আজ যখন চিঠি লিখিতে লিখিতে কালিশুদ্ধ দোয়াতটা আমার কাপড়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়া জড়ের প্রতি নিষ্ফল ক্রোধে আমার মনকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল, তখন চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া শান্তার কাছে চলিয়া গেলাম। শান্তা তাহার ময়লা বিছানাটির উপর বসিয়াছিল, তাহার আশে পাশে কতকগুলা সুন্দর বাঁধান সোণার জলে নাম লেখা ঝক্‌ঝকে বই ছড়ান। অন্য আসনে একটি বর্ষীয়সী রমণী বসিয়া তাহাকে বলিতেছিল,—"দেখ মা, টাকা শোধ্‌বার উপায় ত আমাদের নেই, আমার ছেলে বল্‌ছে, তুমি আমাদের জমি টুকু নিয়ে আমাদের ঋণমুক্ত ক'রে দাও। তোমার উপকার আমরা কখনো ভুল্‌বো না। তুমি সে দিন যদি বিনা লেখাপড়ায়

অত তাড়াতাড়ি তিন শ' টাকা না দিতে, তা হ'লে আমার ছেলেকে জেলে যেতে হ'ত।"

আমি যে দরজায় দাঁড়াইয়া আছি, শান্তা তাহা দেখিতে পায় নাই। সে একখানা বই লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে বলিল,—"তোমার ছেলেকে বলো, জমি আমি নোব না। জমি নিলে তোমরা খাবে কি? যখন পার, টাকা দিও, না পার, দিও না। ভগবান্ আমাকে যা দিয়েছেন, আমার পক্ষে তাই ঢের। বলো তাকে, টাকা আমি চাইনে।"

রমণী খানিকক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া ছল ছল চোখে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, শান্তা তাহাকে আর কোন কথা বলিতে না দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া পড়িতে বসিল। আমি যাইয়া পিছন দিক্ হইতে তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। সে বইখানি রাখিয়া হাসিয়া বলিল,—"মৃণাল।"

আমি বসিলাম। বলিলাম,—"তুমি কি মাঝে মাঝে এখানে এসে থাক?"

শান্তা বলিল,—"বছরে তিন চা'র মাস এখানে থাকি। বাবা এই বাড়ীটা করেছিলেন, ছুটিতে এখানে এসে থাকতেন। তিনি এখানে এসে বড় আরাম পেতেন। আমিও সংসার থেকে ছুটি নিয়ে আরাম পেতে এখানে এসে থাকি।"

"দেশেও তুমি তোমার বাপের বাড়ী থাক?"

"না, শ্বশুরবাড়ী থাকি। আমি ছাড়া শ্বশুরের ভিটায় থাক্‌বার ত আর কেউ নেই।"

"তোমার আগেকার কথা আমি কিছুই জানিনে।"

"আমিও তা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি মৃণাল। দুঃখ হোক্, সুখ হোক্ সেটাকে স্বপ্ন বৈ আর কিছুই মনে করতে পা আমার জীবন অবস্থাই—সত্য হোক্, সার্থক হোক্। তা ছাড়া আমি আর কিছুই চাইনে"

শান্তা যেন মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, প্রাণের প্রবল অনুরাগ ঢালিয়া দিয়া কথা কয়টি বলিল। আমি বড় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। কথাটা উঠাইয়া বিধবার ব্যথিত মর্ম্মে আঘাত করিলাম নাকি? শান্তা কিছুক্ষণ পরে সহসা হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"এ কিরে, কাপড়ে কালি মেখেছিস্ কেন?"

"আমি বুঝি মেখেছি? চিঠি লিখ্‌তে দোয়াত পড়ে গিয়ে কালি লেগেছে।"

"কার কাছে চিঠী লিখ্‌ছিলে? চারুদার কাছে বুঝি?"

"তাঁর কাছে কেন লিখ্‌তে যাব?"

"সে কি! তুমি তাঁকে চিঠি লিখ না? তিনিও কি তোমাকে লেখেন না?" ধরা পড়িয়া বলিতে বাধ্য হইলাম, "না।" আমার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ শান্তা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আমিও মুখ ফিরাইয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলাম।

"আমায় ত তুমি ভালবাস মৃণাল, আমার কাছে সব লুকোবে?"

শান্তার কণ্ঠস্বরে আমার হৃদয় আর্দ্র হইল। আমি বলিলাম,—"সত্যি দিদি, তোমায় ভালবাসি, কিন্তু—"

আমি মুখ নত করিলাম, সে আমার নতমুখ তাহার বুকের উপর টানিয়া লইল। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম আমার দুর্ব্বলতা লোকের কাছে আত্মপ্রকাশ করিল। আমার দুই চোখের উষ্ণ জলধারা তাহার বুক ভিজাইতে লাগিল। আমার চোখের জল পড়া থামিয়া গেলে সে ধীর শান্ত স্বরে বলিল,—"কিছু বল্‌তে হবে না আর, সব বুঝেছি আমি। কিন্তু কারু কাছে কিছু চাওয়া বা কাউকে কিছু দেওয়া, সে কি পরের উপকারের জন্যে? সে যে নিজের আত্মার বিকাশের জন্যে। যথার্থ চাওয়া ও দেওয়াতেই জীবনের সব দিক্‌গুলি পদ্মের পাঁপড়ির মত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে। নিজের অপূর্ণতা পূর্ণ কর্‌বার জন্যে পরের কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিতে হয়, আর মানুষের ধর্ম্মপালন কর্‌তে হলে অপূর্ণ মানুষকে কিছু দিয়ে পূর্ণ করে গড়ে তুল্‌তে হয়। এই চাওয়া ও দেওয়াতেই আত্মার ক্ষুধা মিটে—জীবন ধন্য হয়।"

এমন সময়ে বিধু ঝি আসিয়া শান্তাকে বলিল,—"সরকার মশায় এই রাত্তিরের গাড়ীতেই দেশে যেতে চান। তোমার কাছে কি জিজ্ঞেস্ কর্‌বেন ব'লে ব'সে আছেন।"

আমাকে বসিতে বলিয়া শান্তা উঠিয়া গেল। বিধু আপনমনে বক্ বক্ করিতে করিতে সেই ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"আপনি মনে মনে কি বল্‌ছ ঝি?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, কতগুলি কথা বলিতে না পারিয়া তাহার পেট ফুলিয়া

উঠিয়াছে। সে আমার কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল,—"এই যে আমার বৌদিদিকে দেখ্‌ছ, এ একটি নিরেট বোকা। এর শ্বশুরের আর কেউ ছিল না, কিন্তু ঢের টাকা ছিল। তিনি মর্‌বার সময়ে সব টাকাই বৌকে দিয়ে যান। গ্রামের রাস্তা বেঁধে দিয়ে, ইস্কুলের ঘর তুলে দিয়ে, ইস্কুলে চাঁদ দিয়ে, যত মজা পুকুরের মাটি তুলে দিয়ে, আর পূজার সময়ে যত বামুন কাঙ্গালকে খাইয়ে, বৌটি সে টাকা প্রায় শেষ ক'রে এনেছে। বিয়ের ক'মাস পরে বিধবা হলো, একটা পুষ্যিপুত্তুর রাখ্‌লেও জলপিণ্ডি পাওয়ার আশা থাকৃত। তা'ত কিছু কর্‌বে না, টাকাগুলি শুধু নষ্ট কর্‌বে। গাঁয়ের হতভাগা মিন্‌সেরা নাকি মেয়েদের জন্য একটা ইস্কুল কর্‌বে। বৌদির কাছে তার ঘর তোলার খরচ আর পাঁচ টাকা ক'রে চাঁদা চেয়ে পাঠিয়েছে। যেমন গাঁয়ের লোকগুলা নচ্ছার, তেমনই এ বৌটাও বোকা। আমি পঁচিশ বছর এই সংসারে আছি, বৌদির অনিষ্ট হ'লে আমার যেমন লাগে, আর কা'র তেমন লাগে? খোকা বাবুকে আমি হাতে করে মানুষ করেছিলাম গো?"

বিধু আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আবার বলিল,—"তুমি বলো বৌদিকে। সে আমার সব কথা শোনে, কিন্তু টাকা কড়ির কথা বল্‌লেই শুধু হাসে। তুমি বলো তারে, এমন কর্‌লে সে শীগ্‌গিরই ভিকিরী হয়ে যাবে।"

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, বিধুকে আশ্বাস দিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম।

(৪)

সেই রাত্রিতেই মা'র খুব জ্বর হইল। জ্বরের জ্বালায় মা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না; শঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় আমিও ঘুমাইতে পারিলাম না। রাত্রিটা কোন মতে কাটাইয়া ভোরে উঠিয়াই শান্তার কাছে গেলাম। শান্তা তখন ভিজারুখো চুলগুলা পিঠে এলাইয়া দিয়া কুশাসনে বসিয়া চন্দন ঘষিতেছিল। তাহার ধারে সাজান এক থাল ফুল ঘরের বাতাসকে সুরভি করিয়া তুলিয়াছিল। সে পূজায় বসিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া আমি ফিরিতে উদ্যত হইলাম। দেখিয়া শান্তা বলিল,—"ওকি, ফের যে?"

আমি চলিতে চলিতে বলিলাম,—"মা'র বড় জ্বর হয়েছে, পূজা হ'লে একবার দেখে এসো।"

"এখনি আস্‌ছি" বলিয়া শান্তা আমার সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। মাকে দেখিয়া সে বলিল, "মাসিমা, ডাক্তার ডাকি?"

মা হাসিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার কি হবে? এই জ্বরটুকু অম্‌নি সেরে যাবে।" শান্তা আমাকে বলিল, "যাও, ঘরের কাজ সেরে এসো, আমি মাসীমার কাছে বস্‌ছি।"

মা বলিলেন,—"না শান্তা, তুমি পূজা করগে, যাও। আমার কি হয়েছে যে, দু'জনে বসে' পাগলামো আরম্ভ করেছ—যাও।" আমার কাজ সারা না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তা উঠিল না।

রাত্রিতে আবার মা'র জ্বরের উপর জ্বর আসিল। শান্তা তাহার বারণ না শুনিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল। দুইদিন ডাক্তারি চিকিৎসায় কিছুই হইল না। ডাক্তার বলিলেন, "রেমিটেণ্ট্ ফিভার, সাতদিনের কমে জ্বর ছাড়্‌বে না, বেশী দিন ভুগ্‌তেও পারেন।"

শুনিয়া ভয়ে আমি আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। শান্তা শিক্ষিতা শুশ্রূষা-কারিণীর মত নৈপুণ্যের সহিত এবং ধীরভাবে মা'র সেবার ভার লইল। সে সেবা করিত, ঔষধ পথ্য খাওয়াইত, আমি বিহ্বলের মত চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া দেখিতাম। পঞ্চমদিনে সে মা'র নামে আমার ভাসুরকে তার করিল। সেদিন মা'র জ্বরের সঙ্গে অনেকগুলি উপসর্গও বাড়িয়াছিল। ভাসুর আসিতে পারিলেন না, তাঁহার হাতে একটা জরুরি মোকদ্দমা ছিল,—পরের দিনের ট্রেণে আসিলেন স্বামী। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। মা'র অবস্থা তখন একটু ভাল ছিল। তিনি বলিলেন,—"চারু, শান্তাকে তুই চিন্‌তে পারিস নি?"

শান্তা তখন মাকে পথ্য খাওয়াইতে ছিল, সে বিছানা হইতে নামিয়া স্বাভাবিক ধীরকণ্ঠে স্মিত মুখে বলিল,—"এস, চারুদা।" আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাও ওঁর খাবার ঠিক করগে।" আমি উঠিয়া গেলাম। সে রাত্রি শান্তা আর মা'র কাছে রহিল না। স্বামীর সেবা-নৈপুণ্য শান্তার চেয়ে কম ছিল না। পরদিন মা'র জ্বরের বিশ্রাম হইল। ক্রমশঃ তিনি সুস্থ হইতে লাগিলেন। কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া দুপুর বেলাটা আমি শান্তার কাছেই কাটাইতাম। স্তব্ধ মধ্যাহ্নটা ছিল তাহার পড়া শুনার সময়। সে পড়িত, আমি শুনিতাম, কখনো আমি পড়িতাম, সে শুনিত। সেদিন সে হঠাৎ পড়া বন্ধ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ত সারা দুপুরটাই এখানে থাক, চারুদার যদি কিছুর দরকার হয়?" আমি বলিলাম, "বাড়ীতে ঝি আছে, মা আছেন।"

শান্তা বলিল, "তোমার অধিকারটা কি ঝিকে ছেড়ে দিয়েছ?" শান্তা কিজন্য কথাটা বলিল, বুঝিলাম না, কিন্তু তীব্র পরিহাসের মত কথাটা আমার মর্ম্মে বিঁধিল। হায়! তিনি আমাকে কোন্ অধিকার দিয়াছেন যে, আমি ছাড়িয়া দিব? কিন্তু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—"তাঁর সঙ্গে তোমার ছেলে বেলায়ও পরিচয় ছিল নাকি?"

শান্তা শুইয়াছিল; সে উঠিয়া বিছানায় ছড়ান বইগুলি গুছাইয়া রাখিয়া বলিল,—"চারুদা যখন ফোর্থইয়ারে পড়্তেন, তখন গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন, কল্‌কাতা থেকে জ্যেঠাইমা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।" তারপর সে জানালার কাছে যাইয়া বলিল,—"বেলা গেছে দেখ্ছ।"

বুঝিলাম—সে এখন অন্যকাজে যাইবে। আমিও উঠিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পরে মাকে পথ্য দিতে যাইয়া দেখিলাম, দুধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাত্রিতে দুধ কোথায় মিলিবে? দুর্ব্বল শরীরে মাকে আজ উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে। যদি শান্তার কাছে দুধ পাওয়া যায়? আমি ছুটিয়া চলিলাম। কিন্তু আমি তাহার ঘরের কাছে যাইয়াই থমকিয়া দাঁড়ালাম। খোলা জানালা পথে চাহিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে চেয়ারে স্বামী, দরজার কাছে আনত মুখে দাঁড়াইয়া শান্তা। জানি, কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করিবার লোক স্বামী নন। তিনি হয়ত এখনই চলিয়া যাইবেন, পরে আমি শান্তার কাছে যাইব। আমি একটু দাঁড়াইলাম। শুনিলাম, স্বামী বলিতেছেন,—"কেন ডেকেছ, কৈ কিছুইত বল্ছনা শান্তা?"

"বল্‌ছি" বলিয়া শান্তা কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেওয়ালের ছবিগুলি দেখিয়া লইল। তারপর শান্তা চোখ দুটি স্বামীর মুখপানে স্থির করিয়া বলিল, "আমায় একটা ভিক্ষা দেবেন?" "ভিক্ষা! শান্তা, তুমি মুখে বল আর নাই বল, তুমি আমার মন জান, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই।"

"একি বল্‌ছেন আপনি! ভুলে যাবেন না,—আমি হিন্দুবিধবা।" "আমি যখন তোমায় দেখেছিলাম, তখন তুমি কুমারী। জানিতাম না, তার আগেই তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। কিন্তু শান্তা, আজ আমি ভুলে যাচ্ছিনে, তুমি বিধবা, আর আমি বিবাহিত। তবু আমি কোনদিন তোমায় ভুল্‌তে পারব না। তোমার স্মৃতি আমার অতুলনীয় সুখ, দুঃসহ দুঃখ। এই ছয় বছরে একদিনও বলিনি—বল্‌তে পারিনি, জীবনে একদিন—শুধু একটি বার মাত্র—আমায় বল্‌তে দাও, আমি তোমায় ভালবাসি,—বড় ভালবাসি।"

শান্তা উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দয়া কর! দয়া কর! বলো না - ওকথা বলো না! আর ওকথা মনেও ভেবনা। আমি বড় দুঃখিনী—দয়া কর! বল, তোমার স্ত্রীর অধিকার তাকে দেবে, আমায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বান্ধবী আর—আর স্নেহশীলা ভগিনী বলে' মনে করবে। আর কিছু নয়—আর কিছু নয়! বল, প্রতিজ্ঞা কর, নইলে আমার মরণ নিশ্চিত।"

বুঝিলাম, শান্তার অজস্র তপ্ত অশ্রুধারায় স্বামীর পদদ্বয় ধৌত হইতেছে। স্বামী অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীনের মত বসিয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন, প্রতিজ্ঞা করলাম, তাই করতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। ওঠ শান্তা।" বলিয়াই তিনি উদ্দাম ঝঞ্ঝার মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * * * * * *

সকাল বেলা আমি চা তৈয়ারি করিতে ছিলাম। শান্তা আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইল। তার মুখ চোখ সেই তেমনি অচঞ্চল গভীর প্রশান্ত। দেখিয়া আমার মনে হইল, কাল রাত্রিতে আমি বুঝি জাগিয়াই একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। সে বলিল "দেশ থেকে চিঠি এসেছে, দেশে যাচ্ছি। মাসিমা ও চারুদাকে প্রণাম করে এসেছি। তোমায় করতে এসেছি, এ তীর্থ বাস যেন তোমার বিফল না হয়। এখন থেকে নতুন করে, জীবন আরম্ভ করো।"

"ওগো, তোমায় চিনেছি—ভালবেসেছি, এ তীর্থ আমার বিফল হবে না" মুখ ফুটিয়া একথা বলিতে পারিলাম না। আসন্ন কান্না আমার গলা জোরে চাপিয়া ধরিল। আমি তাহাকে নিঃশব্দে প্রণাম করিলাম। সে আমাকে বুকে টানিয়া লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সুখী হও।"

তারপর দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা।

রবি দাদা

লেখক—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটীর অনতিপূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার সময় একটি যুবক, যে ট্রাম এস্প্লানেড হইতে শ্যামবাজারে যায়, সেই ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে নামিতেছিল। ষ্টার থিয়েটারের কাছে, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ও গ্রেষ্ট্রীটের সঙ্গম স্থানে ট্রাম থামাইবার জন্য যুবক পাদানের উপর দাঁড়াইয়া দড়ি টানিয়া ঘণ্টা বাজাইল। কিন্তু সেখানে উঠিবার বা নামিবার অন্যলোক না থাকাতে চালক ট্রাম থামাইল না, কেবল গতি একটু কমাইল মাত্র। অগত্যা যুবক চলন্ত ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। কিন্তু ট্রামের গতির সহিত দেহের ও যে গতি ছিল, সে টুকুর হিসাব না রাখাতে পা মাটিতে লাগিয়া নিশ্চল হইবামাত্র দেহের উর্দ্ধভাগের গতিপ্রভাবে যুবক সম্মুখ দিকে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

ট্রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি মোটর গাড়ী আসিতেছিল। চালক যুবককে নামিতে দেখিয়া, ভেঁপু বাজাইয়া সরিয়া যাইবার সঙ্কেত করিল এবং যুবক সরিয়া যাইবে ভাবিয়া সমানবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। কিন্তু যুবক পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার সরা হইল না। চালক গাড়ী থামাইতে থামাইতে তাহার উপর আসিয়া পড়িল। ট্রামের আরোহিবর্গ ও রাস্তার লোকেরা হাহাকার করিয়া উঠিল।

এরূপ অবস্থায় অনেকানেক মোটরবিহারী বাবু আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, সে কেন তাঁহার চলিবার পথে বাধা জন্মাইয়াছিল, এই অজুহাতে তাহার উপর অজস্র কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে মোটর হাঁকাইয়া প্রস্থান করেন। দু একটা গরিব লোক মরিলে তাঁহাদের কি,—পৃথিবীরই বা কি! কিন্তু এই ভদ্রলোকটি সেই শ্রেণীর 'বাবু' নহেন,—তিনি লম্ফপ্রদানে মোটর হইতে নামিয়া পড়িলেন।

মোটরের ধাক্কা যুবকের দেহের একপার্শ্বে লাগাতে সে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছিল মাত্র,—বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

যুবকের নাম রবিকুমার বসু। বয়স অনুমান আঠার উনিশ,—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল। মুখখানা ঢলঢলে লাবণ্য মাখা,—সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে। এমন অনেক চেহারা আছে—তেমন চোখ ঝলসান রং আহা মরি নাক চোখ কিছুই নাই, অথচ চেহারাখানা যেন ভাল লাগে,—দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। কেন হয়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুখ নাকি মনের বিকাশ, যদি তাহা হয়, বোধ হয় ইহাই কারণ।

তাহার নিশ্চল দেহখানি মাটিতে লুটাইতেছিল,—কলেজের পুথিগুলি ও ছাতাটা রাস্তায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ ধূলাবলুণ্ঠিত,—শরীরের স্থানে স্থানে কাটিয়া রক্ত নির্গত হইতেছিল। চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত, মুখে বিষাদ জড়িত ভাব। ভদ্রলোকটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাস্তার লোকেরা দেখিয়া অবাক্ হইল;—গরীবের দুঃখে বড় লোকের চোখে জল তাহারা আর দেখে নাই। তাহারা অত্যুচ্চস্বরে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতে লাগিল।

এই ভদ্রলোকের নাম রমাকান্ত মিত্র। বীডনষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ী। মস্ত ধনী, দেদার নগদ টাকা,—কলিকাতার সহরের বুকে বিশ পঁচিশ খানা বড় বড় বাড়ী,—তাহাতে মাসিক আট দশ হাজার টাকা আয়। কিন্তু এত বড় ধনী হইয়াও তাঁহার গর্ব্ব ছিল না,—দরিদ্রকে তিনি ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার মত গুণগ্রাহী, দয়ালু পরোপকারক আজকালকার বাজারে পাওয়া কঠিন।

ভদ্রলোক রাস্তার লোকজনের সাহায্যে যুবকের অচেতন দেহ মোটরে তুলিয়া, নিজহস্তে তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া পটি বাঁধিলেন। পথিপার্শ্বস্থ ডাক্তারখানা হইতে ডাক্তার ডাকিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মোটর চালাইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া লোকজন ডাকিয়া অতি সাবধানে মূর্চ্ছিত যুবককে দ্বিতলে লইয়া গেলেন। পত্নী ও বালিকা কন্যা লীলার হস্তে যুবকের শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বড় ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—"ভয়ের কোন কারণ নাই। দু এক দিনেই সারিয়া যাইবে।" তথাপি তাঁহার স্ত্রী ও বালিকা কন্যা আহার নিদ্রা ভুলিয়া সেই অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র যুবকের সেবা করিতে লাগিলেন। যে গৃহের কর্ত্তা স্বয়ং পরোপকারক ও দয়ার্দ্রচিত্ত সে গৃহের সমস্ত পরিজনই পরের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দেয়। হায়, পৃথিবীর প্রত্যেক পরিবার যদি এমন হইত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন জ্ঞান জন্মিল, তখন যুবক দেখিল, সে এক সুসজ্জিত কক্ষে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শুইয়া আছে। ঘরে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে। গৃহের বহুমূল্য আসবাব দেখিয়া বুঝিল, ধনীর গৃহ; কিন্তু ব্যাপার কি সম্যক্ বুঝিতে পারিল না। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার আশায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না,—পার্শ্বে বেদনা অনুভূত হইল। নিকটে একটা টুলের উপর বসিয়া একটি অর্দ্ধবয়স্কা রমণী তাহাকে পাখার বাতাস করিতে-ছিলেন,—একটু দূরে মেঝের উপর বসিয়া একটি টুক্‌টুকে বালিকা পুতুল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে জানিয়া রমণী সানন্দে বলিলেন "একটু আরাম পাচ্ছ ত বাবা?" যুবক বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া জানাইল একটু আরাম পাইতেছে। রমণী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "ক্ষিধে পেয়েছে বাবা, কিছু খাবে কি?" যুবক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। রমণী উঠিয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন, একটু পরে দুগ্ধ ও নানাবিধ ফল আনিয়া যুবককে খাওয়াইলেন। বালিকাও পুতুলক্রীড়া ফেলিয়া রোগীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আহারান্তে যুবক একটু সুস্থ বোধ করিল এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নীরবে আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। রমণী রোগীর সহিত আর কোন কথা কহিলেন না,—ডাক্তারের নিষেধ ছিল। এই রমণী রমাকান্তবাবুর পত্নী, বালিকা তাঁহার কন্যা।

যুবক ঘুমাইলে রমণী ধীরে ধীরে পাখাখানা শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। হস্তসঙ্কেতে বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"লীলা, তুই এখানে বসে বসে পাখার বাতাস কর। মাঝে মাঝে গোলাপ জলে নেকড়া ভিজিয়ে মাথায় পটি দিস্; কিন্তু দেখিস্ যেন ঘুম না ভাঙ্গে! আমি একবার নীচে যাই। তোর বাবার খাবার সময় হয়েছে। তাঁর মনটা বড্ড খারাপ, ওবেলা কিছুই খান নি।" বালিকা নীরবে মাথা নাড়িল। রমণী প্রস্থানোদ্যতা হইলে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ মা একে কি বলে ডাক্‌ব?" রমণী বলিলেন,—"রবি-দা বলে ডাকিস্।"

আনন্দে বালিকার বড় বড় চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—

"রবি-দা,—বেশ নাম! তুমি যে বলেছিলে মা আমার দাদা নেই। এই ত দাদা,—" একে আমি কত ভালবাস্‌ব।"

রমণী হাসিয়া বলিলেন—"তা বাসিস্। কিন্তু এখন গোলমাল করে ওকে জাগাস্ নি।" রমণী চলিয়া গেলেন। বালিকা ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল; আর একদৃষ্টে সুকুমারকান্তি যুবকের লাবণ্যমাখা সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল "রবি—দা! আচ্ছা এতদিন ইনি কোথায় ছিলেন? একদিনও এখানে আসেন নি কেন? একা একা কেউ কি খেল্‌তে পারে? এই পুতুল খেলা;—পুতুলের সম্বন্ধ কর্ত্তে হয়, পুতুলের বে' দিতে হয়। তারপর 'কর' গণিয়া পুতুলের অন্নপ্রাশন আছে, হাতে খড়ি আছে। এ সব কি একা একা হয়! অন্ততঃ দু'জন লোক চাই; একজনের মেয়ে পুতুল, একজনের ছেলে পুতুল। তা' না হ'লে বে হ'বে কি করে? আমি মাকে বলেছিলেম, দত্তবাড়ীর সুধাকে ডেকে আন্‌তে ওর সঙ্গে পুতুল খেলা করব। তা মা ওকে ডাক্‌লে না, বল্লে কি না—"একা একা খেল।" (গালে হাত দিয়া) ওমা! পুতুল খেলা নাকি আবার একা একা খেলা যায়! মা বড্ড বোকা,—কিছু জানে না। যাক্ এবার খেলার সাথী পেয়েছি, রবি-দার সঙ্গে রোজ রোজ পুতুল খেল্‌ব। কি মজা! বালিকা আনন্দে হাততালি দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাততালি দিবার সময় পাখাটি হস্তচ্যুত হইয়া রবির মুখের উপর পড়িয়া গেল,—রবি জাগিয়া উঠিল।

বালিকা আপন মনে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—"কি মজা! রবি-দা পুতুলের বাপ,—আমি পুতুলের মা।" রবি জাগিয়া বিস্মিত ভাবে বালিকার সরল সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল,—একটি জীবন্ত প্রতিমা। ভবশিল্পী যেন নিজহাতে এই প্রতিমাটি মনের মত করিয়া গড়িয়াছেন। এমন সরলতাপূর্ণ, ঢলঢল লাবণ্য মাখা মুখ কোনও কবি এ পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারেন নাই। চম্পক সুগৌর বর্ণ, পরিপুষ্ট সুঠাম গঠন, মৃণালের মত কোমল দেহলতিকা। বিশাল আয়তলোচনে কেমন মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি, রাঙ্গা রাঙ্গা গোলাপের পাপড়ির মত চিকন ঠোট দুটিতে হাসির ঢেউ খেলিতেছে। রবি মুগ্ধ হইয়া বালিকাকে দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সহসা বালিকার সোল্লাসচীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিল, লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। বালিকার কথা তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল, 'রবিদা পুতুলের বাপ, আমি পুতুলের মা।' রবি ভাবিতে

লাগিল, এ বালিকা কে? বালিকা বুঝিল রবিদা জাগিয়াছে; বলিল "রবিদা, তুমি শিগ্‌গির করে সেরে উঠ,—আমি রোজ রোজ তোমার সঙ্গে পুতুল খেল্‌ব।" রবি উত্তর করিল না,—শুধু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ কে? উত্তর না পাইয়া লীলা অধিকতর ব্যগ্র হইয়া বলিল "রোজ রোজ আমার সঙ্গে পুতুল খেল্‌বে,—কেমন?" অগত্যা রবি উত্তর করিল—"আচ্ছা।" এমন সময় রমাকান্তবাবু ও তাঁহার স্ত্রী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, রবির ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছিল। লীলার মাতা বলিলেন "এর ভেতরই লীলা রবির সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছে। দুষ্ট মেয়ে ওকে বুঝি ঘুমুতেও দেয় নি।" রমাকান্তবাবু হাসিয়া বলিলেন—"এতদিনে লীলা পুতুল খেল্‌বার সঙ্গী পেয়েছে। কেমন পুতুল খেলা জানত, রবি?" তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে হাসিতে লাগিলেন;—রবি লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ সংসারে রবিকুমারের আপনার বলিবার কেহ ছিল না। জ্ঞান লাভ করিবার বহুপূর্ব্বে তাহাকে দুঃখদৈন্যপূর্ণ সংসারের এক কোণে নিরাশ্রয় ভাবে ফেলিয়া পিতামাতা কখন এক অজানা সুদূর রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন, রবির তাহা মনে নাই। কেবল তাহার দুটি কৃষ্ণ আঁখির স্নেহপূর্ণ মৌন দৃষ্টির কথা মনে জাগে। যেন কে কোথায় ঐ কৃষ্ণ আঁখির স্নেহভরা দৃষ্টির বন্যায় তাহাকে ভাসাইয়া দিত, সুধার মত স্তন্যধারা পান করাইত, কুসুম-পেলব হস্ত গায়ে বুলাইয়া ঘুম পাড়াইত;—তাহা স্বপ্ন কি সত্য, ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু সেই স্মৃতিটাই সময় সময় তাহার সমস্ত হৃদয়টাকে তোলপাড় করিয়া তোলে।

জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতে রবি নিজকে পরের গৃহপালিতরূপে দেখিতেছে। আপনার বলিতে তিসংসারে কেহ নাই; তাই এক দূর-সম্পর্কীয়া নিঃসন্তানা বৃদ্ধা করুণার বশবর্ত্তী হইয়া শৈশবে তাহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগা, রবি বড় হইবার পূর্ব্বেই সেই অবলম্বনটিকে হারাইয়া ফেলিল। তখন গ্রামের কোন ব্যক্তি দয়া করিয়া উহাকে স্বগৃহে আনিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—রবিকুমার সুশ্রী, বুদ্ধিমান, সদ্‌বংশজাত, স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া সহজেই তাহাকে বিদ্বান্‌ করিয়া তোলা যাইবে,—পরে আজকালকার চড়া বিবাহ-

বাজারে বিনামূল্যে দিব্য একটি পাশকরা জামাতা পাওয়া যাইবে। দয়ালু ব্যক্তির ঘরে একটি ছোট বালিকা ছিল। ভবিষ্যতের সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাবে এই 'ক্ষুদে' মেয়েটিই বড় হইবে, তাহারি একটি রাঙ্গা টুকটুকে পাশকরা বরের প্রয়োজন হইবে,—এই প্রকার নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি রবিকে সযত্নে প্রতিপালন করিতেছিলেন। কিন্তু এম্ এ পাশ করিবার পূর্ব্বেই রবির ভাবী-পত্নীটি পিতামাতার সুখকল্পনা চূর্ণ করিয়া মরণের দেশে চলিয়া গেল। রবিরও শ্বশুরালয়ের বাস সেই হইতে ঘুচিল। তখন সে কলিকাতা আসিল.—আশা করিয়াছিল, কলিকাতা বঙ্গের রাজধানী, আর এত বড়লোক যে স্থানে.সেখানে একটি দরিদ্র বিদ্যার্থী বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য সাহায্য পাইবেই। কিন্তু আজকাল অনেক অবস্থাপন্নলোকের ছেলেও নিজকে দরিদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না।—সেই সাহায্যে থিয়েটার বায়স্কোপ দেখেও পরীক্ষার সময় পরিপাটি-রূপে ফেল করে। মাঝখান হইতে কতকগুলি গরীব ছেলের (যাহারা হয়ত দেশের মুখ উজ্জ্বল করিত). সাহায্য না পাইয়া, পড়া বন্ধ হয়। সহরের দানশীল ব্যক্তিরা অনেকেই এই সকল অপরিচিত সাহায্যপ্রার্থী বিদ্যার্থীদের ভিতর কে বাস্তবিক দরিদ্র, কাহার সাহায্যের প্রয়োজন, জানেন না ; তাঁহারা, যে সকল যুবক তাহাদের 'দারিদ্র্য বিষয়ে সার্টিফিকেট' কোন নামজাদা লোকের নিকট হইতে আনিতে পারে,তাহাদিগকেই সাহায্য দান করেন। কিন্তু অনেক দরিদ্র যুবকই গ্রাম হইতে নূতন আসে,—তাহারা নামজাদা লোকের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারে না, কাজেই সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়। এই কারণে রবিও সাহায্য পাইল না.—পাইল তাহাদের গ্রামের ৺মথুর দত্তের পুত্র অতুল দত্ত, যাহাদের বার্ষিক আয় প্রায় দুই হাজার টাকা। অতুল বাড়ী হইতে খরচ পাইত. অপরের সাহায্যে বাবুগিরি করিত ; আর রবি হাটিয়া হাটিয়া বহুকষ্টে একটা প্রাইভেট টুইশানি যোগাড় করিল,—তাহা দ্বারা দুবেলা আহার করিয়া কোন প্রকারে পড়া চালাইতে লাগিল। এইরূপে কষ্ট করিয়া এল্ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া "প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করিল, এবং শ্যামবাজারের এক ব্যক্তির বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া গণিতে অনার সহ বি এ পড়িতে লাগিল। রবির মনিবের নাম কৃতান্ত কুমারদাস, ধনী হইলেও কৃপণ বলিয়া তাহার এত অখ্যাতি ছিল যে, পাড়ার বৃদ্ধেরা প্রাতঃকালে তাহার নামোচ্চারণ করিত না,—তাহা করিলে সমস্ত দিনটা নষ্ট হইত। কলিকাতায়

কাবুলী হইতে টাকা ধার করিয়া গরিব লোকে যেমন সর্ব্বস্বান্ত হয়, কৃতান্ত কুমারের নিকট হইতে টাকা লইলেও তেমন কড়ার ভিখারী বনিতে হইত। সে অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ্জ দিত এবং ক্রমশঃ সর্ব্বগ্রাসী অনলের মত সহস্রজিহ্বা বিস্তার করিয়া দরিদ্রের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিত। প্রবাদ এইরূপ—কৃতান্ত পূর্ব্বে 'অবাক জলপান' ফিরি করিত, তৎপর সৎ ও অসৎ নানা পন্থা অবলম্বনে ও অদৃষ্টের কৃপাদৃষ্টিতে কালক্রমে বহু অর্থপতি হইয়াছে। কথাটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনও সঠিক প্রমাণ নাই,—তবে পাড়ার লোকেরা পরোক্ষে তাহাকে 'ফিরিওয়ালা চামার' বলিত, আর কলেজের ছোক্‌রারা চশমার ভিতর হইতে ভ্রূকুটিকুটীল দৃষ্টি করিয়া 'সাইলক দি জু' (Shylock the jew) বলিয়া অভ্যর্থনা করিত।

রবি এতদিন কি করিয়া এ বাসায় টিঁকিয়া আছে, আলোচনা করিয়া পাড়ার সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত। কিন্তু যে হতভাগার ত্রি-সংসারে আপনার বলিবার কেহ নাই,—সংসারসমুদ্রে একগুচ্ছ তৃণের ন্যায় লক্ষ্যহীন ভাবে যে ভাসিতেছে—তাহার নিকট আবার আদর অনাদরের প্রভেদ কি! জগতের অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছল্যপূর্ণ ব্যবহারকে তাসে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ভালবাসে।

কৃতান্ত হৃদয়হীন কৃপণ হইলেও তাহার স্ত্রী করুণহৃদয়া ছিলেন. তিনি নিরাশ্রয় বালকের প্রতি স্নেহধারা বর্ষণ করিতেন. তাহাকে ডাকিয়া গোপনে গোপনে সুস্বাদু আহার্য্য খাওয়াইতেন; কিন্তু কৃপণের চোখে বেশীদিন ধূলা দিতে পারিলেন না। কৃতান্ত টের পাইয়া রবিকে অন্দরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। নিজে রাতদিন বাড়ীতে থাকিয়া যক্ষের মত অর্থ পাহারা দিত, কাজেই তাহার পত্নী ইচ্ছা সত্ত্বেও রবিকে ডাকিতে পারিতেন না। তাই অন্দরে ওরূপ করুণহৃদয়া নারী থাকিতেও রবি অবহেলা ও দুঃখের ভিতর জীবন কাটাইতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরোগ্য লাভের পর রবি যখন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে, সাশ্রুনয়নে বিদায় প্রার্থনা করিল, তখন রমাকান্তবাবু আসিয়া ছলছল চোখে বলিলেন "তুমি কোথায় যাবে রবি! তুমি আমাদের এখানে থাক, এখানে থেকে লেখাপড়া কর! তোমাকে যেতে দিব না।" লীলার মাতা আসিয়া চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন "আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পাবে না রবি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। জানিনা তোমার সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের কি সম্বন্ধ ছিল,—তোমাকে আমার পেটের ছেলের মত মনে হয়। তুমি এখানে থাক। লীলা আছে,—ছোট বোন্‌টির সঙ্গে আনন্দে থাক্‌বে।" তিনি লীলাকে ডাকিয়া বলিলেন "আয় লীলা তোর রবি-দার সঙ্গে খেল্‌গে' যা।" লীলা ছুটিয়া আসিয়া রবির হাত ধরিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিল "তুমি কোথাও যেওনা রবি-দা। তোমাতে আমাতে কত খেলা করব।" রবির চোখ জলে ভরিয়া আসিল—জীবনে এই প্রথম সে পিতামাতা ভগিনীর ভালবাসা পাইল। ক্ষুধিত ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য পাইলে যেমন সে সকল আহার্য্য ফেলিয়া নড়িতে পারে না, রবিও তদ্রূপ মুখে মুখে বিদায় চাহিলেও মনে মনে তাহার অন্যস্থানে যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ রমাকান্তবাবু ও তাঁহার পত্নীর অনুরোধ রক্ষা না করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়, অগত্যা রবি রমাকান্ত বাবুর বাড়ীতে রহিল। এই তিনটি প্রাণী স্নেহের বাঁধনে তাহাকে এত শক্ত ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল যে, রবি কোন মতেই সে বাঁধন ছিঁড়িতে পারিল না। চেষ্টাও করিল না। এতদিন পৃথিবীর ঘৃণা ও স্নেহহীন ব্যবহারে তাহার হৃদয়টা দগ্ধ মরুর মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আজ ইঁহাদের প্রাণভরা স্নেহধারা পাইয়া তাহার হৃদয়-মরু উর্ব্বরা হইয়া উঠিল,—হৃদয়ের ভিতর আশার গাছ মুঞ্জরিত হইল। তাহার বিষাদজড়িত মুখ ও অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটির ম্লান দৃষ্টিতে বালিকা লীলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিভূত হইয়াছিল। এসংসারে শিশুরাই অন্যের কষ্ট অধিক বুঝে। বালিকা সর্ব্বদা রবির কাছে থাকিয়া,—নানাপ্রকার গল্প করিয়া, খেলা করিয়া রবিকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত,—রবির মুখে হাসি দেখিলে লীলা প্রাণের ভিতর এক অব্যক্ত আনন্দ লাভ করিত। এইরূপে বাল-সুলভ সারল্যে ও প্রাণভরা ভালবাসায় লীলা রবিকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। রবির মনের ভিতর যে একটা গভীর ক্ষত ছিল, তাহা

লীলার স্নেহ-প্রলেপে ক্রমশঃ সারিয়া উঠিল। এতদিন রবি কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় বীচি-সংক্ষুব্ধ সংসারসাগরে ভাসিতেছিল,—আজ যেন কাহারা, কোন স্বর্গপুর হইতে আসিয়া তাহাকে এক শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া নিল। আজ তাহার মনে হইল সংসারে কত সুখ, কত আনন্দ।

এইরূপ দশ বার দিন অতীত হইল। রমাকান্ত বাবু একদিন রবিকে কলেজে যাইতে বা পাঠ্য পুস্তক পড়িতে দেন নাই, তাঁহার ভয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। মাথার আঘাত,—কি জানি মস্তিষ্ক চালনাতে যদি বাড়িয়া উঠে। সারাদিন পড়া নাই, একটা কাজ ছাড়াও থাকা যায় না, কাজেই রবি বালকের মত লীলার সহিত পুতুল খেলা করিত। প্রথম প্রথম লীলার সহিত মিশিতে যে সঙ্কোচ বোধ হইত, এই কদিনের মেশামেশির ফলে তাহার সেই সঙ্কোচ দূর হইল। রবি লীলার সহিত মিশিয়া মিশিয়া নিজের অবস্থার কথা ভুলিল। সে যে দরিদ্র, পথের ধূলায় কুড়ান নিরাশ্রয় যুবক, আর লীলা ধনীর বাগানের ফুল—স্বর্গের পারিজাত, রবি তাহা ভুলিল। তাহার মনে হইল, তাহাদের ভিতর কোনও প্রভেদ নাই,—এ যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। তাহাদের মেশামেশিতে কোনও বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই। নদী যেমন সাগরে যাইয়া মিশে সেরূপ তাহারাও একে অন্যের সহিত মিশিবে,—ইহা স্বাভাবিক।—দ্বিধা সঙ্কোচ যখন কমিয়া গেল, তখন মান অভিমানের পালা আরম্ভ হইল। খেলিতে খেলিতে কোনও বিষয় লীলার মনঃপূত না হইলে লীলা অভিমান করিত। রবি মান ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিত, সাধিত, কিন্তু লীলার মান ভাঙ্গিত না। তখন রবির অভিমান হইত, সে কাঁদিয়া ফেলিত। লীলা আর স্থির থাকিতে পারিত না, তাহার ইচ্ছাকৃত মান দূর হইত, চক্ষু হইতে জোর করিয়া অশ্রু নামিয়া আসিত। তখন উভয়ে আবার হাসিয়া ফেলিত। এইরূপে হাসিকান্নার ভিতর তাহাদের মান অভিমান মিটিত। রমাকান্ত বাবু ও তাহার স্ত্রী মুগ্ধনয়নে এই দৃশ্য দেখিতেন,—বলাবলি করিতেন—"এই পারিজাত জোড়াতে একটী মালা গাথিলে বেশ হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যখন রমাকান্ত বাবুর বাড়ীতে থাকাই স্থির হইল, তখন পূর্ব্ব মনিব কৃতান্ত বাবুর নিকট একবার বিদায় লইয়া আসা কর্ত্তব্য ভাবিয়া রবিকুমার শ্যামবাজারে গেল।

এমন বিনা পয়সার মাষ্টার (কৃতান্তবাবু সংসারের সকলকার্য্য তাহাদ্বারা করাইতেন) হাতছাড়া হয় দেখিয়া কৃতান্তবাবু বলিলেন "তুমি চলে যেতে চাচ্ছ কেন? তুমি ত দেখ্‌ছি - বুঝ্‌লে কিনা, ভারি অকৃতজ্ঞ হে। কতসুখে খাইয়ে দাইয়ে তোমায় রাজার হালে রেখেছিলাম, আর তুমি আজ বুঝ্‌লে কি না, চলে যেতে চাচ্ছ!" রবি বিনীত ভাবে বলিল "আপনার ঋণ এজন্মে শোধ দিতে পারব না। বিদেশে বিপাকে আপনি আশ্রয় না দিলে আর কোথা পেতাম কি না জানি না। আপনার এখানে ছেলেপুলেদের সঙ্গে আপন বাড়ীর মত আনন্দে ছিলাম।" কৃতান্তবাবু আত্মপ্রশংসায় স্ফীত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকটিকে বলিল—"দেখ জলধরবাবু, আমি; বুঝ্‌লে কি না, নিজের ছেলে, পরের ছেলে বুঝি না। আমার বাড়ীতে রয়েছে, তবে নিজের ছেলে পরের ছেলে তফাৎ রাখ্‌ব কেন! ওরা যা খায়, মাষ্টারও তাই খায়, আর ওরা যা পরে, বুঝ্‌লে কিনা, মাষ্টার ও তাই পরে।" তিনি গজবিনিন্দিত দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া খানিকক্ষন হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ করিয়া হাসিলেন। জলধর কৃতান্ত বাবুকে হাড়ে হাড়ে চিনিত; তবু বড়লোক বলিয়া তাহার আসরে দাবা খেলিতে আসিত ও চাটুবাক্য বলিয় একটু কৃপালাভের প্রয়াস পাইত। তাহার মত ধূর্ত্ত ও খোসামুদে মিলা কঠিন। কৃতান্তবাবুর এ কথায় সে শত সহস্রবার বাহবা দিল।

রবি নম্রতা সহকারে বলিল—"আজ্ঞে আমার পাওনা টাকাটা দিলে উপকার হ'ত।" টাকার নামে কৃতান্তবাবু চক্ষু উল্টাইয়া, ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—"তা-তা টাকাটা নিতে চাচ্ছ; কিন্তু, বুঝ্‌লে কিনা, কল্‌কাতা স্থান খারাপ। টাকাটা রাখ্‌বে কোথায়? তুমি কোথায় থাকবে ঠিক করেছ,—তারা মাইনে টাইনে দিবে কিছু?" রবি বলিল "না মাইনে দেবে না। আমি অমনি থাকব, তাদের কোন কাজকর্ম্ম কর্ত্তে হবে না।" অবাক হইয়া, চোক মুখ ঘুরাইয়া কৃতান্তবাবু বলিলেন—"আঃ মাইনে দেবেনা

আর তুমি অম্নি থাকবে! তুমি ত আচ্ছা বোকা হে! আমি মাসকাবারে তোমাকে মোটা মাইনে দিতাম,—আর তুমি আজ তাই ছেড়ে, বুঝ্‌লে কিনা সেখানে চলে যাচ্ছ।" রবি বলিল "সেখানে খাব দাব, থাকব। কোনও কাজ করব না ত।" নেহাৎ অবিশ্বাসভরে কৃতান্তবাবু বলিল "হেঃ, বোকালোককে কল্‌কাতার লোকে এম্নি করে ঠকায়। এখন এম্নি নিচ্ছে, পরে তোমাকে দিয়ে, বুঝ্‌লেকি না, এঁটো বাসন মজাবে।" তাহাদের নিন্দায় রবির মুখচোখ লাল হইয়া গেল; সে গম্ভীর স্বরে বলিল—"আমায় হিসাব করে টাকাটা দিন্।" এই দুই বৎসরে তাহার শতাধিক টাকা পাওনা হইয়াছিল। কৃতান্তবাবু ভাবিয়াছিল কোনও দিন রবির হাতে টাকাটা দিতে হইবে না। কেমন করিয়া এড়াইবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করে নাই, তবে এই পর্যান্ত স্থির জানিত—তাহার সিন্দুকের টাকা অন্যে বাহির করিতে পারিবে না,—বিশেষতঃ ঐ বোকা মাষ্টার টা! রবির কথা শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "হুঃ টাকা! ক' টাকা তোমার পাওনা?" রবি বলিল "দেড়শ খানেক হতে পারে। হিসাবটা দেখুন না।" কৃতান্তবাবু মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"দে—ড়—শ!—অসম্ভব। দাঁড়াও ত দেখি হিসাবটা।" একটা জীর্ণ মসীলিপ্ত খাতা বাহির করিয়া, তাহাতে খস্ খস্ করিয়া হিসাব করিয়া বলিল "আমার হিসাবে ত বুঝ্‌লে কিনা ঢের কম,—মোট ৮৲ টাকা পাওনা!—"রবি স্তম্ভিত হইয়া বলিল "৮৲ টাকা কি করে হয়!" কৃতান্তবাবু মুখে বিজ্ঞতার হাসি ফুটাইয়া বলিল—"তুমি ত দেখ্‌ছি 'ক, খ' অবধি ভুলে গেছ হে। মাস ৮৲ টাকা হিসাবে দুবছরে কত হয় বুঝ্‌লে কিনা,—তাও কস্‌তে ভুলে গেছ?" রবি বিস্মিত ভাবে বলিল "সেত ১৯৮৲"। কৃতান্তবাবু দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিলেন "হেঃ ১৯৮৲ টাকা—টাকা জল দিয়ে ভেসে আসে কি না? কোনদিন ১০০৲ টাকার মুখ দেখেছ!—" রবির মুখ কালি হইয়া গেল,—সে কৃতান্তবাবুকে চিনিত। হতাশকণ্ঠে বলিল "দেখি হিসাবটা।" "তুমিত বুঝ্‌লে কিনা, একটি প্রথম নম্বরের গাধা। এ হিসেব টুকু মুখে মুখেই করা যায়। তোমায় মাষ্টার রেখেছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার জন্য—৮৲ টাকা হারে; আর তুমি দিনে আধঘণ্টা, রাত্রে আধঘণ্টা এই মোট এক ঘণ্টা পড়াতে। তা হ'লে বুঝেছ কিনা—এক বছরে ১২ মাস, তবে দু বছরে ১২×২=২৪ মাস। মাসে ৮৲ মাইনে, তবে ২৪ মাসে, ২৪×৮=১৯২৲ টাকা আচ্ছা, প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা হিসাবে দুবছরে, ১৯২৲ টাকা, তবে প্রত্যহ ১ ঘণ্টা হারে ১৯২÷২৪=৮৲

টাকা। একুনে এই ৮৲ টাকা হয়।—” কৃতান্তবাবু হাতবাক্স খুলিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া কম আওয়াজ দেয় এইরূপ আটটি টাকা বাহির করিল। হিসাব দেখিয়া রাগে, দুঃখে রবির চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। নিজকে সাম্‌লাইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল “নিজের পড়ার ক্ষতি করে, দু বছরে ছেলে পড়িয়ে পরে এই ক' পয়সা মাইনে!—” নির্ব্বিকার ভাবে কৃতান্তবাবু বলিল “তা বাপু বুঝ্‌লে কি না, ভগবানের রাজ্যে সব বিষয়েরই একটা সঠিক বিচার চাই। তোমার সঙ্গে যা চুক্তি ছিল, তাই ত দিচ্ছি। এখন যদি রাগ হয়—তবে, বুঝ্‌লে কিনা, আমি কি কর্‌ব।” সে টাকা কয়টা রবির হাতে দিতে গেল। রবি হাত ফিরাইয়া বলিল “ও ভিক্ষা আমি চাইনা।” তৎপরে কৃতান্তবাবুর পত্নীর নিকট বিদায় লইতে অন্দরে প্রবেশ করিল। কৃতান্তবাবুর পত্নী বাটীর ভিতর হইতে সব শুনিয়া ছিলেন। রবির পুনঃ পুনঃ বাধা সত্ত্বেও কয়েকখানা নোট তাহার কোঁচায় বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন “পৃথিবীতে এত পাপ সয় না। তোমার প্রাপ্য টাকা আমরা যদি না দি, তাহলে ভগবান্‌ও আমাদের সব টাকা কেড়ে নেবেন।” রবি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। ফিরিবার সময় কৃতান্তবাবু বলিল “ওহে শোন। ৮৲ টাকা তোমার ন্যায্য পাওনা, যাও আর একটা সিকি দিচ্ছি,—নিয়ে যাও।” রবি হাসিমুখে বলিল “না থাক্, টাকাটা সম্প্রতি আপনার কাছেই থাক্।” টাকা কটা দিতে তাহার কলিজা পুড়িয়া যাইতেছিল। আশ্বস্ত হইয়া বলিল—“আচ্ছা বাপু তাই ভাল। বিদেশে বিপাকে কোথা রাখ্‌বে! থাক্ আমার কাছে,—তবে বুঝ্‌লে কিনা, এর সুদ পাবে না কিন্তু।” রবি হাসিয়া স্বীকৃত হইল। বলা বাহুল্য এই আট টাকাও সুদে খাটিতে লাগিল।—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে; লীলাও তেমন রবিকে তাহার প্রতি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাকে ভালবাসা কি প্রেম, কি প্রণয়—ইহার কি নাম জানিনা, ঐ দুটি প্রাণীও তাহা জানিত না। পাঠকপাঠিকা এইরূপ আকর্ষণকে কি নামে অভিহিত করিবেন জিজ্ঞাসা করিতেছি;—লীলা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, রবি বিংশতিবর্ষীয় যুবক। অনেকে বলিবেন ইহা কেবল বয়সদ্বারাই নির্ণয় করা যায় না। কাহার হৃদয় কি বয়সে কতটুকু

পরিপক্কতা লাভ করে তাহা বলা দুষ্কর। অনেক বালিকার হৃদয়ে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই নারীত্ব ফুটিয়া উঠে, আবার কোনও কোনও অঞ্চলে অনেক বালিকা ষোড়শ বৎসর বয়সেও সরল অবোধ শিশু থাকে। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরবয়স্কা লীলা এখনও সরল, অবোধ শিশু, প্রেম ও প্রণয় কি তাহা সে কিছুই বুঝেনা। রবিকে ভাল লাগে তাই সে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত,—কিন্তু সে ভালবাসার সহিত কোন ঔপন্যাসিক ভাব ফুটিয়া উঠে নাই।

এই দুটি বালক বালিকা বিশ্বসংসার ভুলিয়া পরস্পর ভালবাসায় তন্ময় হইয়া গেল। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবার অবসর পাইল না, প্রয়োজনও বোধ করিল না।

লীলা যখন লীলাময়ী তরঙ্গিণীর মত নাচিতে নাচিতে আসিয়া 'রবি-দা' বলিয়া ডাকিত ; রবি তখন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। লীলা খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বলিত "কি দেখ্‌ছ রবি-দা। আমাকে যে গিলে ফেল্‌বে!" রবি অপ্রতিভ হইয়া তাহার রক্ত কপোলে সস্নেহে টোকা মারিয়া বলিত "যাও তুমি বড় দুষ্টু।" এইরূপ প্রতিদিনই ঘটিত। রবি যত দেখিত, ততই দেখিতে ইচ্ছা হইত। এ আকাঙ্ক্ষার যেন নিবৃত্তি নাই। সেই নিবীড় কৃষ্ণ চিকুরদামের ভিতর চম্পকসুগৌর আনন, তাহাতে একজোড়া আয়ত আঁখির তরল দৃষ্টি,—দেখিয়া দেখিয়া রবি আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। ভাবিত কোন এক দেববালা তাহাকে ছলনা করিতে মর্ত্ত্যে আসিয়াছে।

রবি আহারনিদ্রা ভুলিল, পাঠ ভুলিল। সে এফ এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়াছে,—এবারেও সেই গৌরব অটুট রাখা চাই—কিন্তু সে জ্ঞান সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বহি লইয়া বসিয়া প্রত্যেক পাতায় পাতায় কেবল দেখিত একটি সুন্দর প্রফুল্ল আনন ভাসিতেছে,—অমনি পড়া ভুলিত, বিদ্যালয় ভুলিত, পরীক্ষা ভুলিত। দেখিত কেবল বিশ্বসংসারময় ঐ একটি হাসিমাখা মুখ।

এইরূপে রবি মজিল। প্রেম কি, ভালবাসা কি, সে জানিত না। এতদিন ছেলে পড়াইয়া, জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী টাকা রোজগারের চিন্তায় ও কলেজের পড়ায় সে উপন্যাস পড়িবার সুযোগ পায় নাই, কাজেই আধুনিক ছেলেদের মত অর্দ্ধ বয়সেই তাহার মাথায় ঔপন্যাসিক কল্পনা গজাইয়া উঠে নাই,—প্রেমের লক্ষণ কি তাহা সে জানিতে পারে নাই। কিন্তু বই পড়াইয়া, উপদেশ দিয়া কাহাকেও প্রেম শিক্ষা দিতে হয় না, কবির বলেন—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে।—"

রবি এই ফাঁদে আটক পড়িল। এই ফাঁদে পড়িয়া তাহার হৃদয়ে কি জানি কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠিল।—

রবি বুঝিল না তাহার কি হইয়াছে। লীলা যতক্ষণ কাছে থাকিত, তাহার মনে হইত যেন পৃথিবীতে তাহার কিছুর অভাব নাই, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সে অধিক সুখী; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য যদি লীলা কাছছাড়া হইত তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত, তাহার মনে হইত এই সংসারে তাহার কেউ নাই। সংসারে কেউ যে নাই, তাহা সে ত পূর্ব্বাবধি জানিত, কিন্তু লীলার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাহার কাছে এই অভাবটা বড়ই পীড়াদায়ক বোধ হইতে লাগিল। সেই পৃথিবী, সেই হট্টগোল, সেই আত্মীয়-বিহীন অবস্থা, কিছুই এতদিন তাহার মর্ম্মের দ্বারে আঘাত করিতে পারে নাই, ক্রমাগত সহিয়া সহিয়া তাহার হৃদয় ত কৈশোরেই পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, তবে—তবে আজ কেন এই সামান্য কারণে তাহার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠে। রবি ভাবিতে লাগিল—তাহার এ কি হইল ?

তাহার ব্যবহারে লীলাও বিস্মিত হইল, সময় সময় ভয় পাইত। রবি ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখে সে হাসি নাই,—পূর্ব্বের মত গল্প করে না। কেবল হা করিয়া লীলার দিকে চাহিয়া থাকে, সময় সময় চোখ হইতে বর্ষার মত জল পড়ে, পাগলের মত লীলার হাতদুটি নিজের কপালে চাপিয়া ধরে ! লীলা উঠিয়া যাইতে ব্যস্ত হইলে কাতরভাবে বলে আর একটু বস। লীলা অবাক হইয়া ভাবিত—রবি-দার কি হইল।

রমাকান্তবাবু ও তাঁহার স্ত্রী রবির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না ! ভাবিলেন মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা এখনো সারে নাই। তাঁহারা ডাক্তারের পরামর্শ মত পুষ্টিকর ঔষধ আনিয়া দিলেন। লীলা সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন লীলা বলিল,—"রবি-দা, তুমি এমন হলে কেন ? আগের মত হাস না, গল্প কর না। তোমার মাথার ব্যথা বেড়েছে নাকি ? তোমার চোখ দিয়ে কেবল জল পড়ে কেন ?" লীলার চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল ! রবি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"কি জানি তুমি কাছে না থাকলে কেমন মাথাটা বোঁ বোঁ করে, আপনি আপনি চোখে জল আসে।" বালিকা সহানুভূতিতে

গলিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমি সব সময় তোমার কাছে থাকব। তা হ'লে তোমার অসুখ সেরে যাবে ত?" রবি মাথা নাড়িয়া বলিল—"হাঁ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটীর পর সোমবার রবির কলেজ খুলিল। ইহার ভিতর মনে যে একটা দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, রবি তাহা সামলাইয়া লইয়াছে। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, এবারটা ভাল করিয়া পাশ করিতে না পারিলে বাবু ও মা (রবি রমাকান্তবাবুকে বাবু ও লীলার মা কে মা বলিয়া ডাকিত) কি মনে করিবেন? তাহাদের এখানে রাজভোগে থাকিয়া, কর্ত্তব্যে এমন অবহেলা করিব,—ছিঃ। আর,—আর একটি কথা মনে জাগিয়া তাহার চোখ দুটা উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বুকটা ভয়ঙ্কর উদ্বেলিত হইল। যদি বি. এ. টা ভালরূপে পাশ করিতে পারি, তবে—তবে—হয় ত—। রবি দ্বিগুণ উৎসাহে পড়া আরম্ভ করিল। এত পড়িতে রমাকান্তবাবু মানা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উৎসাহিত রবি বলিল—"এ খাটুনীতে আমার কিছু হবে না।"

সোমবার রবি যখন ছাতি হাতে, পুঁথি বগলে কলেজে যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইবে,অমনি পেছন হইতে লীলা ডাকিল "রবি-দা" রবি ফিরিয়া দেখিল নীচের বাগানে রমাকান্তবাবু লীলার হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। চারিদিকে ফুলের গাছে নানারকম ফুল ফুটিয়া হাসিতেছে. মালী ঝারিতে করিয়া গাছের গোড়ায় জল ঢালিতেছে, আর তাঁহারা পিতাপুত্রী হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। বাগানের কাছে খাচার ভিতর একটা পোষা সারি আপন মনে নানারকম বুলি আওড়াইতেছিল সে ও ডাকিল—"রবি-দা।" রবি ফিরিলে রমাকান্তবাবু বলিলেন" এই রৌদ্রের ভিতর হেঁটে যাও কেন রবি? শরীরের দুর্ব্বলতা এখনো সারে নি।" রবি বিনীতভাবে বলিল "আজ্ঞে তা পারব। আগে কতদূর থেকে হেঁটে যেতাম, এখন ত অনেক কাছে।" কথাটা রমাকান্তবাবুর প্রাণে বাজিল. তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না, না আমার নিজের ব্যবহারের জন্য মোটর আছে। গাড়ীটা পড়ে থাকে। তোমাকে গাড়ীতে রেখে আসুক।" তিনি কোচমানকে ইঙ্গিত করিলেন।

রবি আর কি করিবে। গাড়ীতে যাইতে তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল; কিন্তু তাঁহার কথার উপর কথা বলা তাহার স্বভাব নয়। সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। গাড়ী তৈয়ার হইয়া আসিল। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রামাকান্তবাবু নিজহাতে ধরিয়া তুলিয়া দিলেন। সহসা লীলা বায়না ধরিল "আমি রবি-দার সাথে যাব।" রমাকান্তবাবু আদুরে মেয়েকে শান্ত করিতে পারিলেন না, অগত্যা কোচমানকে বলিয়া দিলেন "লীলাকে ফেরৎ গাড়ীতে নিয়ে এসো।"

সারাপথ রবি মাথা গুজিয়া বসিয়া রহিল। লজ্জায় তাহার গণ্ডদ্বয় কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিল. সে রাস্তার দিকে চাহিতে পারিল না, যদি কোন চেনা ছেলের সহিত চোখাচোখি হয়। দুদিন পূর্ব্বে যে দু তিন মাইল রাস্তা হাটিয়া যাইত, আজ কিনা সে পাঁচ মিনিটের রাস্তা গাড়ীতে চলিয়াছে।—উপকারী, মহানুভব ব্যক্তির দ্রব্যে এত বাবুগিরি—ছি ছি! লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। লীলা রাস্তার রকমারি জিনিষ দেখিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। মোটরে সে প্রত্যহই বেড়ায়,—কিন্তু রবি-দার মত সাথী ত আর মিলে না। জলস্রোতের মত জনস্রোত কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়া অবিরাম চলিয়াছে,—কেহ কার্য্যে, কেহ বিনা কার্য্যে, কেহ অকার্য্যে। কাহারো কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র পরিচ্ছদ, কাহারো নানাবর্ণরঞ্জিত আভরণ, আবার কাহারো শতছিদ্র মলিন বসন। কাহারো মুখে সহস্ররশ্মি মরীচিমালীর হাসি, কাহারো মুখে বাদলার অন্ধকার! কাহারো চক্ষুতে দিব্যজ্ঞানস্ফূরক কাচখণ্ড, তাহার প্রসাদে ইহকাল ও পরকাল ইজারা করা নবাবীর চিত্রটা দিব্য ফুটফুটে পরিষ্কার দেখিতে পায়; আর কাহারো কোটরাগত চক্ষু অনাবৃত,—ইহকালের দুঃখময় দৃশ্যই এত কাতর যে পরকালের দৃশ্য দেখিবার আর সাধ নাই। কেহ মোটর হাকাইতেছে, কেহ মোটরের চাকার নীচ হইতে মাথাটা বাঁচাইবার জন্য ফুটপাথের এক কোণে সরিয়া যাইতেছে। রবি আনমনে নতদৃষ্টিতে জনস্রোত দেখিতেছিল, লীলা অবিরাম অর্থহীন ও অসঙ্গত প্রশ্নবৃষ্টি করিতেছিল:—"আচ্ছা রবি-দা, এত লোক সব কোথা যায়? এরা কি সব কলেজে পড়ে? তা হ'লে কলেজে এত লোক ধরে কি করে?" রবির হাসি আসিল, বলিল "দূর, সবাই কি আর কলেজে পড়ে। কেউ পড়ে, কেউ চাকুরী করে, কেউ কারবার করে।"

লীলা। আচ্ছা এই রদ্দুরের ভেতর ওরা হেটে যায় কেন, গাড়ী করে যেতে পারে না ?

রবি। সবাইত আর তোমাদের মত বড়লোক নয়। ওরা গাড়ী পাবে কোথায় ?

লীলা। কেন ওরা বড়লোক হয় না ?

এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নে রবির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বলিল "বড়লোক ত আর ইচ্ছা হলেই হওয়া যায় না।" বালিকা নির্বিকার ভাবে বলিল "ওঃ তা জান না বুঝি! বাবা বলেচেন একটা টাকা বেশ করে ধূয়ে মাটিতে পুতে রেখে রোজ রোজ তার গোড়ায় জল দিলে টাকার গাছ হয়। তারপর গাছে ঝাঁকানি দিলেই টাকার বৃষ্টি হয়। আমাদেরও ত টাকার গাছ আছে।" এবার রবি হাসিয়া বলিল—"তোমার বাবার মত ত সকলের হাত পাকা নয়। টাকার গাছ আছে সত্য, কিন্তু গাছ বাঁচাতে ও বড় করতে তেমন সারও পাকা হাতের দরকার,—বুঝেছ ?" বালিকা কি বুঝিল সেই জানে,—মাথা নাড়িয়া জানাইল বুঝিয়াছে।—

এমন সময় গাড়ী ব্রাহ্মসমাজের কাছে আসিল। রবি মেট্রোপলিটানে পড়িত। এতবড় জুড়ীতে কলেজে যাইতে তাহার বড়ই লজ্জা হইল। কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাছে নামিয়া পড়িল। লীলা সহর্ষে বলিল "বাঃ রবি-দার কলেজটা কেমন সুন্দর লাল, আর মাথায় কেমন গম্বুজ।" রবি নামিয়া দ্রুতপদে ফুটপাথের উপর দিয় চলিল। পেছনে বা অগ্রে মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার সাহস হইল না, পাছে কলেজের কেউ দেখিয়া ফেলে। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সাধারণতঃ সেখানেই অন্ধকার হয়,—পেছন হইতে কে ডাকিল "ওরে রবি, শোন্।" রবি ঘাড় ফিরাইয়া আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল, সহপাঠী অতুলদত্ত তাহাকে ডাকিতেছে, আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ মস্তজুড়ীটাও আসিতেছে। কোচম্যান ফিরিবার হুকুম না পাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতর না যাওয়াতে লীলা বলিল—"রবি-দা কলেজে গেলে না ?"

পেছনের ছেলেটা দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তারপর যাত্রার সুর করিয়া বলিল "পশ্চাতে হেরগো শ্যাম ফুলরাণী রাধা।—হ্যারে রবি, বলি ব্যাপারখানা কি ?" ধরা পড়িয়া রবির মুখ রক্তাভ হইল, সে অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিল "জানিনা।" ছেলেটা রবির কাঁধ জোর করিয়া

ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, তারপর কোচমানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল "এই বাবু গাড়ী থেকে নেবেছে নয় ?" কোচ্মান বলিল "হা।" অতুল রবির দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া লীলাকে বলিল "এ কে খুকি ?" বালিকা ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়াছিল, থতমত খাইয়া বলিল "রবি-দা!" তারপর বড় বড় চোখ দুটি সন্ধিৎসু ভাবে রবির মুখের উপর স্থাপিত করিল।

লজ্জায়, রোষে, অভিমানে রবি অধীর হইয়া উঠিল, কর্কশ স্বরে কোচমানকে ফিরিতে বলিল। কোচ্মান অশ্বে কষাঘাত করিল। বলবান অশ্বদ্বয় রাজপথ কাঁপাইয়া বায়ুবেগে চলিয়া গেল। অতুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"ব্যাপার খানা কি রে রবি ? একটা Romantic কিছু গড়িয়ে তুলেছিস্ দেখ্ছি! ধূলো খেয়ে কলেজে আস্তিস, গাড়ী চাপা পড়্বার ভয়ে ফুটপাথের কোণে সরে থাক্তিস—আর এখন ধূলো উড়িয়ে, রাস্তার লোকজন একধারে তাড়িয়ে প্রকাণ্ড জুড়ীতে উড়ে আসিস্,—তাও সঙ্গে এক পৈরারাণী নিয়ে। বসন্তের দেশ থেকে এই পৈরারাণীর আমদানী হ'ল কবে রে ? বলি দেখ রবি Romantic টা বেশ পাকিয়ে তুলেছিস্ যা হোক। তোকে নায়ক খাড়া করে বেশ একটা নবেল লেখা যায় যে, এভাব ভারতচন্দ্রও ফুটাতে পারে নি।—" কথাগুলি রবির সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ সূচের মত বিঁধিতেছিল, সে ভীষণ বিরক্তিভরে কাঁধ ছাড়াইয়া বলিল—"যাও এসব ফাজলামী ভাল লাগে না।" অধিকতর রঙ্গ করিয়া অতুল বলিল "বলি ভায়া চট কেন ? তোমরা নভেলি কাণ্ড ঘটাবে, আর আমরা কি সে বিষয়ের আবৃত্তি করে একটু রসনার সুখও কর্ত্তে পারব না। কেন হে মাণিক, পৃথিবীটা তোমার একচেটিয়া নাকি ?" রবি নীরবে চলিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া যুবকের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। সে কাছে ঘেসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বল না ভাই ফুলরাণীটি কি স্বর্গের আমদানী, না এই পাপ পৃথিবীর ? কি দাদা পরিচয়টা দাও না একবার,—ভয় নেই বোটাশুদ্ধ তুলব না, শুধু দেখ্বো—দূর থেকে, আর একটু ঘ্রাণ নেব।" রবিকে তথাপি নীরব দেখিয়া যুবক বুঝিল ইহার ভিতর বাস্তবিকই রহস্য আছে। রবি দরিদ্র বালক, তাহার এরূপ কেহ বড়লোক আত্মীয় থাকা অসম্ভব,—তবে রবি যদি ঐ বাবুর বাড়ীর মাষ্টার হইয়া থাকে। কিন্তু রবির মুখের ভাব দেখিয়া তাহার সন্দেহ ঘনীভূত হইল, সে স্থির করিল আজ হউক, কাল হউক ব্যাপারখানা কি জানিতে হইবে। (আগামী বারে সমাপ্ত)

জলপ্লাবন

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

লেখক—শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অহিশেখর মিত্রের সহায়তায়, বিষয়কার্য্য পরিচালনায় মধুসূদনের অনেকটা সুবিধা হইল বটে, কিন্তু অসুবিধাও যে না ঘটিল, এমন কথা বলা যায় না। বিষয়-সম্পত্তি মধুসূদনের কোনও কালেই ছিল না, সুতরাং তাহাকে বিষয়কার্য্যও করিতে হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বিষয়কার্য্যে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না! অগত্যা তাহাকে অহিশেখরের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইল। অহিশেখর যে কিরূপ সুচতুর ও স্বার্থপর ব্যক্তি তাহা মধুসূদনের বুঝিতে বাকী ছিল না। কিন্তু অহিশেখরের বুদ্ধি ব্যতীত তাহার বিষয় রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। এরূপস্থলে অহিশেখরের কুটিলতা বুঝিতে পারিয়াও পরস্বাপহারক মধুসূদনকে চুপ্ করিয়া থাকিতে হইল।

অহিশেখর যে নিতান্ত হীন প্রকৃতির লোক, তাহা বলা ঠিক হয় না। তবে প্রবল স্বার্থচিন্তা ও স্বার্থপরতা তাহাকে হীনতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—সুতরাং অভাগার আর অপরাধ কি? অপরাধ বোধ হয় বিধাতার! সমস্ত দোষটা বিধাতা পুরুষের স্কন্ধে চাপাইয়া অহিশেখর তখন নিশ্চিন্ত মনে পরের সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইল:—হায় যুক্তি!

পূর্ব্বাবধিই সে রমেন্দ্রকিশোরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। রমেন্দ্রের প্রতি তাহার ভ্রাতৃজায়ার অত্যধিক স্নেহ মমতাই এই ঈর্ষার মূল কারণ। উপায়ান্তর ছিল না বলিয়াই এ ঈর্ষা এতদিন ফুটিতে পায় নাই। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন অহিশেখর বিলক্ষণ বুঝিয়াছে যে, রমেন্দ্রের সহিত সম্মুখ-সমরে তাহার জয়ের সম্ভাবনা নাই—অধিকন্তু লোকসমাজে এবং তাহার ধনাঢ্যা ভ্রাতৃজায়ার চক্ষে তাহাকে ঘৃণ্য হইতে হইবে। তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন তাহার লাভের আশা ছিল না। কাজে কাজেই তাহাকে দায়ে পড়িয়া শিষ্ট শান্ত হইতে হইয়াছিল! সুযোগ ও অবসর বুঝিয়া সে আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইল। পথ নির্ব্বাচনে এবং করণীয় নির্দ্ধারণে তাহার একটা বিশেষ সুবিধা হইল। রমেন্দ্রকিশোর তখন তাহার চক্ষে মৃত—ইহা অহিশেখরের পক্ষে বড় অল্প সুবিধার কথা নহে! মনকে প্রবোধ দিবার জন্য আপন মনে

সে আপনি ভাবিতে লাগিল—রমেন্দ্রকিশোর যদি বাঁচিয়া থাকিত সেও বরং এক কথা ছিল। কিন্তু "পর" মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়-সম্পত্তি একা একা ভোগ করে কোন্ অধিকারে ?

তত্ত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া অহিশেখর বিশেষ গোলে পড়িল। ঊর্ণনাভের মত আপনার জালে সে আপনি আবদ্ধ হইল। অদৃষ্ট দেবী অদৃশ্যে থাকিয়া তাঁহার চক্র ঘুরাইতে লাগিলেন। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে তাহার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হইয়া গেল। রহিল মাত্র তাহার কলঙ্ক—আর রহিল মাত্র তাহার কলঙ্কের ঘোষণা !

কলঙ্কিত অহিশেখর অনুমান করিল, তাহার কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে রমেন্দ্রকিশোরের বন্ধু সত্যব্রত। তাহার এরূপ অনুমান করিবার কারণ, সত্যব্রত তাহার গৃহে হরকুমার ও সাবিত্রী সুন্দরীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে। অহিশেখর আবার মনে মনে যুক্তিতর্ক করিল—সে যাহাদের আশ্রয়চ্যুত করিয়াছে, সত্যব্রত তাহাদের স্থান দিবার কে এবং আশ্রয় প্রদান করেই বা কোন্ সাহসে ?

সাহসিকতায় নির্ভর করিয়া অবশ্য সত্যব্রত আশ্রিতদিগকে আশ্রয় প্রদান করে নাই, অথবা অহিশেখরের কলঙ্ক রটনা করে নাই। সে যাহা করিয়াছিল, তাহা মনুষ্যত্ব এবং কর্ত্তব্যের অনুরোধে। মধুসূদন ও অহিশেখর কিন্তু সে অনুরোধ মানিবার লোক নহে। সে অনুরোধ তাহারা মানিলও না। তাহারা বরং পরামর্শ করিয়া সত্যব্রত ও তাহার আশ্রিতগণকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে কথা অবগত হইয়া সত্যব্রত একটু হাসিল। হরকুমার কিন্তু চিন্তিত হইয়া পড়িল। উদ্বেগের কারণ রহিল না কেবল মনোরমার মাতা সাবিত্রী-সুন্দরীর। সে উন্মাদিনী। তাহার উন্মত্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সেবা, যত্ন ও শুশ্রূষাগুণে মনোরমা সারিয়া উঠিল এবং রমেন্দ্রকিশোরও আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। সেবকগণের মধ্যে অনেকেই ভাবিয়াছিল, রমেন্দ্রকিশোরের জীবন রক্ষা আর বুঝি হইল না। কিন্তু করুণাময়ের করুণ

বিধানে এ যাত্রা সে রক্ষা পাইল। তবে সে বড় দুর্ব্বল, বড় অবসন্ন, বড় চিন্তাভারক্লিষ্ট। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীরে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। মলিন-শয্যায় শয়ান থাকায় তাহাকে অধিকতর মলিন দেখাইতেছিল।

যাহা হউক, মনোরমা ভাবিল, রমেন্দ্রকিশোর যে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। সে স্থানে, সে অবস্থায় ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শয্যা আর পাওয়া যাইবে কোথায়? পীড়িতের শয্যা ও আশ্রয়স্থান যে তেমন দুর্দ্দিনেও পাওয়া গিয়াছিল, ইহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। সেবকদলের সাহায্য না পাইলে তাহাদের মৃত্যু যে অনিবার্য্য হইত, সে কথা বুঝিতে অবশ্য কাহারই বাকী রহিল না!

প্রান্তরের জল এখন শুকাইয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে বপন কার্য্যাদিও আরম্ভ হইয়াছে। তবে দুর্দ্দিনের স্মৃতি, প্রকৃতির কলঙ্ক, জনপদ হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। তৃণহীন, বৃক্ষহীন, শস্যহীন নগ্ন প্রান্তর; ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন, ভূমিসাৎ প্রাসাদ কুটীর; প্রাণহীন, শব্দহীন লোকালয়, রৌদ্র দীপ্ত দিবাভাগে ও জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীতে নিঃসঙ্কোচে সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রকৃতি সুন্দরীর করুণাও যেরূপ, নির্দ্দয়তাও সেইরূপ। দেশে দেশে এখন অন্নকষ্ট, রোগকষ্ট, মৃত্যুবিভীষিকা—হাহাকার। সে যাতনা, সে বেদনা সে হতাশ ও হুতাশের রাগিণী শ্রবণে হৃদয়বানের বধির হইতে ইচ্ছা হয়, ভগবান্‌কে নির্দ্দয় বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিধাতার অখণ্ড বিধান অবোধ্য। রাজরাজেশ্বরের কাঠিন্যের মধ্যে কি করুণা, উত্তাল বাপীর গভীর তলদেশে কি অসীম উত্তাল, অনন্ত দেবের অনন্ত প্রকৃতিতে কি অনন্ত লীলা—সৃষ্টিরাজ্যে ক্ষুদ্র কীট আমরা, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিব কিরূপে?

আর্ত্তের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়া বিমলানন্দ ও তাঁহার শিষ্য সেবকগণ অনেক সময়েই দূর দূরান্তরে অবস্থান করেন। রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমাকে দেখিতে আশা এখন প্রায় তাঁহাদের আর ঘটিয়া উঠে না। প্রবীণ কুটীরস্বামীর উপর কিশোর ও কিশোরীর ভারাপণ করিয়া বিমলানন্দ কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সেবাকার্য্য যাহাতে অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নবীনানন্দ মধ্যে মধ্যে আসিয়া কুটীর-স্বামীর নিকট হইতে রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমার সংবাদ লইয়া যায় এবং সেই সংবাদ বিমলানন্দের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। সে কুটীরমধ্যে আর প্রবেশ করে না। কুটিরস্বামীই এখন তাহার সংবাদদাতা! কে জানে ইহা কি রহস্য!

জাতিহিসাবে কুটীরস্বামী বৈষ্ণব, তাহার নাম কিশোরীদাস। কিশোরী দাসের ত্রিকুলে কেহই নাই। সম্বলের মধ্যে তাহার ছিল এক শতচ্ছিদ্র কম্বল, আর এক যুবতী বৈষ্ণবী। কিন্তু বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবচূড়ামণির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া চাতক পক্ষিণীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করত শূন্যে শূন্যে ভ্রাম্যমানা হইয়াছে। কিশোরীদাসের এখন সম্বলমাত্র সেই ছিন্ন কম্বল, আর সেই ভগ্ন কুটীর। ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা—দ্বারে দ্বারে রূপমোহ হইতে এক্ষণে সে কতকটা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। ভিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে এতদিনে হয়ত সে রূপোন্মাদ হইয়া যাইত। একথা সে মুক্তকণ্ঠে বিমলানন্দের নিকট স্বীকার করিয়াছিল। বিমলানন্দ সেকথা শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিলে ভগবতী স্বয়ং বৈষ্ণবী-রূপে বৈষ্ণবের প্রীতি বর্দ্ধন করিবেন এবং তাহার আহারাদির সুচারু ব্যবস্থা করিতেও বিস্মৃতা হইবেন না। সাধনমার্গের কথায় কিশোরীদাস আস্থাবান্ হইতে পারিয়াছিল কি না, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় নাই; তবে রাজভোগ ও বৈষ্ণবী প্রাপ্তির আশায় সে যে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহা তাহার মুখ ও নয়নের ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

সেই অবধি কিশোরীদাস মনোরমার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। বিমলানন্দের কথায় সে বুঝিয়াছিল—সেই বালিকাই বুঝি ভগবতীর প্রীত্যর্থে আসিয়া দেবীরূপ লুকাইয়া এইরূপে তাহাকে দেখা দিয়াছে। তবে রাজভোগটা যে তাহার কিরূপে সংগৃহীত হইবে, বহুচিন্তা করিয়াও সে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। অনন্যোপায় হইয়া সে স্থির করিয়া লইল যে, বালিকার সঙ্গে যে পুরুষটী ভাসিয়া আসিয়াছে, সে কোনও দেশের রাজা বা রাজকুমার হইবে। কালে যে তাহার রাজভোগের অভাব হইবে না, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয়।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিল। সে ভাবিতে লাগিল, ঐ যুবক যদি কোনও দেশের রাজা না হইয়া ভগবতীর আত্মীয়স্বজন হয়, তাহা হইলে উপায়? আর এমনও ত হইতে পারে যে, সুস্থ হইলে যুবক, যুবতীকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিবে এবং বিবাহান্তে তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে। এইবার চিন্তাটা তাহার কিছু গাঢ় হইল। সে চিন্তার ফলে কিশোরী দাসের মস্তক ঘুরিয়া গেল।

কিন্তু আশার মোহিনীশক্তি আছে। সে আবার ভাবিতে লাগিল—

তেমনটা হইবে কেন? ভগবতী যখন তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, তখন কি আর কোনও প্রকারে অসুবিধা হইতে পারে! সকল দিকে সুবিধাই হইবে।

এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও কিশোরীদাস শান্তি পাইল না। তাহার ভাবনা হইল—যদি এই যুবক, যুবতীকে বিবাহ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত তাহার সমূহ বিপদ। সে তখন খঞ্জনী বাজাইয়া একবার বিপদ্‌বারণ মধুসূদনের নাম করিয়া লইল। তখন আশার কুহকে সে আবার ভাবিতে লাগিল—ও সকল দুশ্চিন্তা মাত্র। জলস্রোতে তাহারা ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় আদৌ নাই। সামান্য যে পরিচয় টুকু তাহাদের মধ্যে হইয়াছে, তাহা একত্র বাসজনিত। সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে রাজকুমার নিশ্চয়ই আপন রাজ্যে চলিয়া যাইবে, আর অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা বৈষ্ণবীর "ভেক" গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবসেবায় প্রাণ-মন উৎসর্গ করিবে।

কিন্তু কল্পনা-সুখেও তাহার বাধা পড়িল। কিশোরীদাসের পূর্ব্বসঙ্গিনী বৈষ্ণবরাণীর অভদ্র ব্যবহার ও পলায়ন-কাহিনী তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবীর পলায়ন ব্যাপার বহুদিনের কথা নহে। ক্ষতচিহ্ন বৈষ্ণবের হৃদয় হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। সে কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সে শূন্যনেত্রে শূন্যপথে চাহিয়া রহিল। আশা-বাণী, আশা-মন্ত্র আবার তাহাকে আশান্বিত করিয়া তুলিল। সে ভাবিল—ভয় কি, সন্ন্যাসী যখন বর দিয়াছে, তখন বৈষ্ণবী নিশ্চয়ই মিলিবে।

কিশোরীদাস সেই অবধি মনোরমার পদে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিল। মনোরমার প্রীত্যর্থে সে এখন সকলই করিতে পারে। তাহার সোহাগের সামগ্রীর প্রীতি-সাধনে যত্নবান্‌ হইয়া সে ভিক্ষাবৃত্তিও ত্যাগ করিল। আর সে সময়ে ভিক্ষাই বা দেয় কে? তখন সর্ব্বত্র অন্নকষ্ট, সর্ব্বত্র হাহাকার। তবে বিমলানন্দের আশ্রিতবর্গের মধ্যে কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হয় নাই। অমানুষিক পরিশ্রমে ও উদ্যমবলে বিমলানন্দ অন্ন সংস্থান করিয়াছিলেন প্রচুর। তাহাতে আশ্রিতগণের কোনও কষ্টই হইল না। কিশোরীদাস ভাবিল—ইহাই বোধহয় রাজভোগ।

যাহা হউক লুব্ধ কিশোরীদাস পাপ অভিসন্ধিহৃদয়ে পোষণ করিয়াও মনোরমা ও রমেন্দ্রকিশোরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। সে কায়াটা •

সে করিত—সন্ন্যাসীর ভয়ে। আর সন্ন্যাসীর তরুণবয়স্ক শিষ্য নবীনানন্দেরও সে দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। সেই শাসনেই কিশোরীদাস উদ্ধত ও অত্যাচারী হইতে সাহস করে নাই!

মনোরমা কিন্তু কিশোরীদাসের মনোভাব বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে নাই। সে সরলান্তঃকরণে কিশোরীদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত এবং অবসর মত তাহাকে এক আদটা গীত গাহিতে বলিত। কিশোরীদাস তখন খঞ্জনীতে তাল দিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভাঙ্গা গলায় গাহিত—

"আমা বিনা রাই জানে না।
আমা ছাড়া সেত বাঁচে না॥
এ মুরলী যদি বাজে বনমাঝে
সেকি আর থাকে ছার গৃহকাজে
ছাই দিয়ে লাজে সকালে ও সাঁঝে
না এসে থাকিতে পারে না।
সে ত কা'র মানা আর মানে না॥"

সে আবার গাহিত—

"কালো বড় ভালবাসে রাই।
ত্রিলোকে কালোর তুলনা নাই॥"

এই দুইটি চরণ গাহিয়াই সে আপনার নিভাঁজ কাল অঙ্গের প্রতি সোৎসাহে দৃষ্টিপাত করিত। সে ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনোরমা না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। সেই হাসি ও সেই মাধুরী দেখিয়া কিশোরীদাস খঞ্জনীতে দ্রুতলয় দিয়া পূর্ণ উদ্যমে গাহিত—

"ও রূপ গো কালো নয়,
ও কালো যে আলোময়—
কালোতে মজেছে সখী বুঝে সুঝে তাই,
কালো ভজ, কালো ভজ, কালাকাল নাই।"

এই সময়ে কিশোরীদাস প্রেমোন্মত্ত হইয়া গীতিচ্ছন্দের তালে তালে নৃত্য করিত এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া হৃদয়বেদনা বুঝাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে কিশোরীদাসের এত যত্ন, এত উদ্যম, সে ইহার কিছুই বুঝিত না, কিংবা বুঝিবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করিত না। কিশোরী দাস হাস্যোদ্দীপক অঙ্গচালনা করিলে সে অবশ্য হাসি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে

পারিত না। কিন্তু হাসির মধ্যেও মনোরমার হৃদয়ে চিন্তা-জ্বর লুক্কায়িত থাকিত। তাহার চিন্তা, কবে রমেন্দ্রকিশোর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবে।

মনোরমার কাতর প্রার্থনা ভগবান্ শুনিলেন। রমেন্দ্রকিশোর অচিরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সে একদা বাটী প্রত্যাগমনের প্রস্তাব করিল। বিমলানন্দ সে সময়ে সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন—

"বাটী যা'বে বৈকি বৎস। সুস্থ হও—পরে যথাবিহিত ব্যবস্থা হ'বে। কেন বৎস, এখানে কি তোমার তেমন যত্ন হয় না?"

সে সকল কথার উত্তরে রমেন্দ্রকিশোর আর কোনও কথাই কহিল না। সে বুঝিয়াছিল—তাহার জীবনদাতা কে। জীবনদাতার কথার উপর সে আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। রমেন্দ্রকিশোর যখন বুঝিল, তাহার বাটী যাওয়ার বিলম্ব ঘটিবে, তখন সে অন্য উপায় স্থির করিল। মনোরমাকে ডাকিয়া রমেন্দ্র কহিল,—"আমি তো এখনও উত্থানশক্তিরহিত। তুমি একখানা পত্র আমার বাটীতে লিখে দাও। আর একখানা পত্র সত্যব্রতের নিকট পাঠাও। পত্র অবশ্য আমার নামেই লিখা হ'বে। চিঠি লেখা তোমার অভ্যাস আছে ত?"

রমেন্দ্রকিশোরের প্রশ্নে মনোরমার গণ্ডস্থল লজ্জায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। যাহা হউক তথাপি সে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল, লেখাপড়ায় তাহার অভ্যাস আছে।

কিন্তু লেখা হইবে কিরূপে? কালী, কলম্, কাগজ কিছুইত সেস্থলে নাই এবং পাওয়াও সম্ভব নহে। অতএব পত্র লেখা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিমলানন্দ কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, নবীনানন্দও আর বড় সেস্থানে আসে না। এরূপ ক্ষেত্রে মসী ও লেখনী প্রভৃতি সংগ্রহ করা যায় কিরূপে?

নবীনানন্দকে রমেন্দ্রকিশোর আদৌ প্রত্যক্ষ করে নাই। সে যখন অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, নবীনানন্দ নাকি তখন মনোরমার নিকটে নিকটে থাকিত। কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের জ্ঞানলাভের পর হইতেই সেস্থানে আশা তাহার এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে এখন একটু দূরে দূরে থাকে, দূরে দূরে গান গাহিয়া বেড়ায়, দূরে দূরে থাকিয়াই সে রমেন্দ্রকিশোরের কুশলসংবাদ গ্রহণ করে। তবে কিশোরীদাসের প্রতি সে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছে। বিমলানন্দের এইরূপই আদেশ। যাহা হউক, সে সকল

কথা রমেন্দ্রকিশোর মনোরমা কিংবা কিশোরীদাস কেহই বুঝিতে পারে নাই। রমেন্দ্রকিশোর সেই কারণেই কহিল—"একবার তা'কে ডাক না। তা'কে একবার দেখি, আর কাগজ কলম যা'তে যোগাড় হ'তে পারে সে বিষয়েও তাকে অনুরোধ করিও।"

কিন্তু নবীনানন্দ তখন কোথায়? তাহার সন্ধান করিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে। সে বিলম্ব মনোরমা সহ্য করিতে পারিল না। কিশোরীদাসকে অনুনয়, বিনয় করিয়া কাগজপত্র লেখনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে বলিল। অন্য কেহ সেরূপ অনুরোধ করিলে সে সকল কথা কিশোরীদাসের কর্ণে স্থান পাইত কি না সন্দেহ; কিন্তু মনোরমার আজ্ঞা সে অবনতমস্তকে পালন করিল। গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরিয়া লিখন-দ্রব্যগুলি যখন সে সংগ্রহ করিল, তখন সে পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল, এ দ্রব্যগুলি পাইয়া তাহার ভবিষ্যৎ বৈষ্ণবী হয়ত তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিবে এবং একান্তই তাহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিবে। কল্পনাবলেই সে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

লেখনী প্রভৃতি মনোরমার হস্তগত হইলে মনোরমা অবশ্য কিশোরীদাসকে ধন্যবাদও প্রদান করে নাই, কিংবা আপনার জন বলিয়াও তাহার সহিত আত্মীয়তা করে নাই। কিন্তু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তির পর সুন্দরীর মুখে যে সরল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই লুব্ধ কিশোরীদাস কৃতার্থ হইয়াছিল।

রমেন্দ্রকিশোর পত্রের ভাষা বলিয়া যাইতে লাগিল, মনোরমা অতিকষ্টে তাহা লিপিবদ্ধ করিল। লিপিকুশলতায় মনোরমার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল না। তবে যে সে পত্র লিখিতে স্বীকার করিয়াছিল, তাহা কেবল রমেন্দ্রকিশোরের তুষ্টি সাধনার্থে। যাহা হউক, অনেক কাটিয়া কুটিয়া কালী ফেলিয়া মনোরমা পত্র দুইখানি কোনওরূপে শেষ করিল। ডাকটিকিট কোথায় পাওয়া যাইবে, এইবার সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল! টিকিটের অভাবে পত্র বেয়ারিং হইয়া গেল। অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়া কিশোরীদাস পত্রখানি ডাকঘরের ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। তাহাও অবশ্য সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার লোভে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মনোরমার পিতা হরকুমারের কথা লইয়া সত্যব্রতের সঙ্গে অহিশেখর মিত্রের তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। অহিশেখর বলে—হরকুমার কৃতঘ্ন, পামর, তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়াই উচিত। অন্ততঃ, অহিশেখরের অনুরোধ, উপরোধ রক্ষা করাও সত্যব্রতের অবশ্য কর্ত্তব্য। হরকুমারের কথা —অহিশেখরের নিকটে তিনি কোনও রূপেই দোষী নহে এবং কৃতঘ্ন হইবারও তাঁহার কারণ ঘটে নাই। তিনি আরও বলিয়া থাকেন—অহিশেখর তাঁহার স্বজাতি হইলেও স্বজাতির নিকটে তিনি আদৌ উপকৃত নহেন। বরং স্বজাতি শত্রুতা বলে অহিশেখর অনেক সময়ে তাঁহার অনিষ্টই করিয়াছে। তবে তাঁহার কন্যার সহিত রমেন্দ্রকিশোরের বিবাহ প্রস্তাব হওয়া অবধি অহিশেখর কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমার নিরুদ্দেশ সংবাদ প্রাপ্তির পরেই সে আবার পূর্ব্বের মত অত্যাচারী হইয়া উঠিল।

জলপ্লাবনের সময় অহিশেখর তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতিকে গৃহে স্থান দিয়া বিস্তর উপকার করিয়াছিল বটে; কিন্তু মধুসূদনের পরামর্শে অহিশেখর রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইলে—অথবা এমনত বলা যাইতে পারে যে, অহিশেখরের সাহায্যে মধুসূদন রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়সম্পত্তি হস্তগত করিলে—দুস্থ স্বজাতি হরকুমার তাহাতে বহু বিঘ্ন ঘটাইয়া ছিলেন এবং যাহাতে অহিশেখর সে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে বিষয়েও তাহাকে বিস্তর অযাচিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হরকুমারের সহিত অহিশেখরের বিষম মনোমালিন্য ঘটে এবং হরকুমারকে আশ্রয়হীন হইতে হয়। ইহাতে যদি কৃতঘ্নতা দোষ জন্মে, তাহা হইলে অবশ্য হরকুমারকে সে দোষে দোষী করিতে পারা যায় না।

দুই পক্ষের কথা শ্রবণানন্তর সত্যব্রত ধীর ভাবে কহিল—আশ্রয়হীনকে সে যখন আশ্রয় দিয়াছে, তখন সে কিছুতেই তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিতে পারে না। সে কথার উত্তরে অহিশেখর অনেক যুক্তিতর্ক করিল, মধুসূদন এবং তাহার পুত্র বিশ্বনাথ, অহিশেখরের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্যব্রতকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিল। কিন্তু সত্যব্রত সে সকল তর্কযুক্তি ভয়প্রদর্শন গ্রাহ্য-মাত্রও করিল না। তখন তাহাদের মধ্যে ভীষণ শত্রুতার সৃষ্টি হইল।

সত্যব্রত হরকুমারকে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল—"আপনি নির্ভয়ে এ স্থানে অবস্থান করুন। আপনাকে রক্ষার জন্য আমার ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিল।"

বিবাদটা ক্রমে খুবই পাকিয়া উঠিল। মারপিট্, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রভৃতি করিতে মধুসূদন ও অহিশেখর কোনও ক্রটী রাখিল না। মধুসূদনের পাপিষ্ঠ-পুত্র বিশ্বনাথ সে বিষয়ে তাহার পিতা ও পিতৃবন্ধুকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও সত্যব্রতকে আঁটিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। ধর্ম্মবল সত্যব্রতকে রাজদ্বারে ও অন্যান্য সঙ্কটে রক্ষা করিতে লাগিল।

যখন সকল অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন বিশ্বনাথ সঙ্কল্প করিল, সে তাহাকে হত্যা করিবে। এই বিশ্বনাথ সত্যব্রতের নিকটে নানা বিষয়ে উপকৃত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ একবার ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে যাইয়া অর্থাভাবে এক বিষম বিপদে পড়িয়া যায়। সত্যব্রতের নিকটে সে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহা বিবৃত করিলে সত্যব্রত সেই দণ্ডে তাহার প্রতীকারে যত্নবান্ হইয়াছিল। সে সময়ে সত্যব্রতের হাতে কপর্দ্দক মাত্রও ছিল না। পত্নীর স্বর্ণালঙ্কারের বিনিময়ে সত্যব্রত সে যাত্রা বিশ্বনাথকে সেই দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করে। বিশ্বনাথ এখন সে কথা চেষ্টা করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার পর রোগে, শোকে, অন্নকষ্টে, রাজদ্বারে, শ্মশানে সত্যব্রত যে বিশ্বনাথের এবং বিশ্বনাথের আত্মীয়বর্গের কি প্রভূত উপকার করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিতে হইলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অবতারণা করিতে হয়। সেই বিশ্বনাথের সঙ্কল্প, সে সত্যব্রতকে হত্যা করিবে! আর তাহার নরাধম পিতাও সে প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। লোভের, পাপের, কালের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য!

সে প্রস্তাবের সমর্থন করিল না কেবল অহিশেখর। হত্যাকাণ্ডের প্রস্তাব শুনিয়া সে কল্পনায় কারাগৃহ, ফাঁসিকাষ্ঠ প্রভৃতির চিত্র প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। অহিশেখর, মধুসূদন ও বিশ্বনাথকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া কহিল—"ও সকল খুন জখমে আর কাজ নাই। কি জানি, কিসে কি হ'য়ে যায়।"

অহিশেখরের কথা মধুসূদন ও বিশ্বনাথ অমান্য করিতে সাহস করিল না। তাহাতেই তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইত্যবসরে মনোরমার লিখিত রমেন্দ্রকিশোরের পত্রদ্বয় যথাস্থানে নিরাপদে

পৌঁছিল। তাহাতে একটা নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইল। মধুসূদন ও অহিশেখর প্রভৃতি ভাবিতে লাগিল—সত্যব্রতের ইহা একটা নূতন চাল। আর সত্যব্রত প্রভৃতি ভাবিল—ইহা হয়ত বিশ্বনাথের একটা নূতন নষ্টামী—নূতন বিপদ ঘটাইবার সূচনা।

রমেন্দ্রের পত্রে কাহারও নাম সাক্ষরিত ছিল না। সে পত্রে লিপি কুশলতারও বিশেষ অভাব ছিল। তাহাতে সকলেই মনে করিল যে, এ পত্র খানার কিছুই মূল্য নাই। ডাকঘরের "ছাপও" অস্পষ্ট ছিল। সুতরাং পত্রখানা যে কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে, তাহা দুই পক্ষই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না।

সে যাহা হউক সে ব্যাপার লইয়া দুই পক্ষেই তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল, পত্রপ্রাপ্তির পরে দুই পক্ষই আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুই পক্ষেই অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইল। একপক্ষ ভাবিল—বুঝি সর্ব্বনাশ উপস্থিত; অপর পক্ষ ভাবিল—ইহা বুঝি আশার ক্ষীণালোক!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

রজনী চন্দ্রমাশালিনী। তবে দুই একখানা কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণের মেঘ মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য চন্দ্রদেবকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। তাহাতে জ্যোৎস্নাধারা কলঙ্কিত হইতেছিল বটে, কিন্তু সে কলঙ্কে শোভার ব্যতিক্রম হয় নাই। বরং তাহা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুনীল মহান্ আকাশমণ্ডলে ক্ষপাকর তখন রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, নক্ষত্ররাজি তখন নিস্প্রভ। সেই বিরাট জ্যোৎস্না-রাজ্যে বিপ্লবের সূচনা করিতেছে মাত্র কয়েক খণ্ড শিশু মেঘ। কিন্তু বিপ্লববাদিগণের মনোভিলাস পূর্ণ হইল না। বায়ুস্রোতে তাহারা যে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা আর নির্ণয় করিতে পারা গেল না। দুর্ব্বল জলদদল অচিরে বায়ুমণ্ডলে মিশাইয়া গেল, মেঘনির্মুক্ত কুমুদবান্ধব কৌমুদী ছটায় আবার দিক্‌দিগন্ত সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিল। তখন মনে হইতে লাগিল, যামিনীতে বুঝি রবির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রদীপ্ত রজনীর শোভা তখন নবকিরণোদ্ভাসিত, গীতগানমুখরিত প্রভাতালোককেও পরাজয় করিয়াছে।

সেই জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করিয়া ফুল, পাতা, তরু, লতা, প্রান্তর প্রভৃতি কি যেন একটা নূতন রূপ, অভিনব উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে তাল তমাল তল, কুঞ্জ কুটীর ও অরণ্যানী সে আলোকে তেমন আলোকিত হয় নাই। কিন্তু আলো ও ছায়ার সংমিশ্রনে তাহা অলৌকিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া বুঝি অভাবুককেও ভাবুক হইতে হয়, আর ভাবুককে ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়।

সেই রজতশুভ্র রজনীতে জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া একটী যুবক ও একটী যৌবনোন্মুখী বালিকা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিল। যুবক মুক্ত প্রান্তরের দূর্ব্বাদল শয্যায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় চন্দ্রিকা-সুধা পান করিতেছে—তাহার দৃষ্টি জ্যোৎস্নাপুলকিত আকাশের দিকে; আর বালিকার দৃষ্টি কৌমুদী বিধৌত ভূমিতলে। তবে পরস্পরের লুব্ধনেত্র যে পরস্পরের রূপমাধুরী সুযোগ ও অবসর মত চুরী করিয়া দেখিয়া লইতেছিল না, এমন কথা বলিলে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

যুবক কহিল—"ওটা তোমার মিষ্টালাপ মাত্র। আমার জ্ঞান ও বিবেচনা

মতে বল্‌তে পারি যে, তুমি আমার রোগশয্যাপার্শ্বে না থাক্‌লে এ যাত্রা আমার আর রক্ষা পেতে হ'ত না।

লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাবনতা বালিকা ধীরে ধীরে কহিল—জলে যখন ভেসে গিছলাম, তখন আপনি আমায় রক্ষা না করলে কেমন ক'রে আপনার সেবা ক'র্‌তে পার্‌তাম্‌?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবক বলিল—"সে বিপদে রক্ষাকর্ত্তা বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন।"

সে কথার উত্তরে বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, যুবক তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া কহিল—"যথার্থ বলেছ, তোমায় বাঁচাতে না পার্‌লে বুঝি আমার বাঁচাও আর হ'ত না। আর্ত্তের উদ্ধারে আমার দেহে মত্তহস্তীর বল এসেছিল—তাই কূল পেয়েছি। নতুবা কি হ'ত কে জানে!"

এই কথা বলিয়া যুবক আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে নিশ্বাসের জোরে পূর্ব্বস্মৃতির তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল। যুবকের তরঙ্গায়িত হৃদয় শান্ত করিবার উদ্দেশে বালিকা কহিল—"ও সকল কথায় আর কাজ নাই। চলুন্‌, আপনি গৃহে।"

গৃহে যাইবার অনুরোধ শুনিয়া যুবক ক্ষিপ্র গতিতে উঠিয়া বসিয়া ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে—"চিঠীর উত্তর এসেছে কি?"

"কই না।"

"তবে বাটীর কথা ব'লছ?"

"কই না!"

"এই মাত্র যে বল্‌লে?"

"আমি কুটীরে যাবার কথা বলেছি—অন্য কথা বলি নাই ত!" সম্মুখস্থ কুটীরের দিকে চাহিয়া যুবক কহিল—"ঐ কুটীর, ঐ কুটীর—আমাদের আশ্রয়স্থল ঐ কুটীর! ঐ কুটীরে আমি রোগশয্যায় শায়িত ছিলাম, আর সেই রোগশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্টা হ'য়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলে একা তুমি! ইচ্ছা হয়, আবার রোগশয্যায় শায়িত হই—আবার তুমি আমার সেবা কর। ও রোগশয্যা আমার পক্ষে বড় মধুর, ও রোগশয্যা আমার পক্ষে স্বর্গবাস। অপ্রতিভ হইয়া বালিকা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। সেই সময়ে বনান্তরালে সঙ্গীত রব উঠিল। সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া যুবক, বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে গায়?"

"সেই সন্ন্যাসীর শিষ্য। আমার কাছে এসে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি খান, কি করেন, কেমন থাকেন—সকল কথা জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু সহস্র অনুরোধেও আপনার কাছে আসেন না, আস্‌তে চান্‌ না।"

"কেন?"

"তা' ত জানি না। যে কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে তিনি হাসেন মাত্র।

"সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হ'লে এ কথা জিজ্ঞাসা করব—এর কারণ জান্‌তে চেষ্টা করব। সন্ন্যাসী আমাদের আশ্রয়দাতা, জীবন রক্ষাকর্ত্তা; তাঁর শিষ্য তাঁর দর্শনলাভে আমি বঞ্চিত হব কেন?"

সঙ্গীতের সুর তখন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞাত গায়ক তখন গাহিতেছে—

"মধুর যামিনী মধুর চাঁদিনী
মাধুরী ধরে না আর;
হেন কালে মরি কই সে বাঁশরী
কোথা দেখা পাব তা'র?
সে যে ভালবাসে, থাকি তা'র আশে
সে যে গো আমার সব;
সে বিনা আমার কেহ নাহি আর
সে বিনা আমি গো পর।
আমার সে জন কোথায় এখন
লুকায়ে বসিয়া আছে।
দিবারাতি ঘুরি তা'রি আশে ফিরি
সেও ফিরে মোর পাছে।
শুনি সবে কয় সে গো সর্ব্বময়
তুলনা নাহিক তা'র;
পাইয়াছি ধূল, এ কেমন ভুল
তবু খুঁজি পাছে তা'র।"

সঙ্গীত থামিল—কিন্তু মূর্চ্ছনা ও গমকের ঝঙ্কার তখনও ব্যোমন্তরে ঝঙ্কৃত হইতেছে, ঝিল্লীরবে মুখরিত দিঙ্মণ্ডল সুরের ঝঙ্কার অনুভূতির স্রোতে মধুময় হইল। কিন্তু সে সঙ্গীত মাধুরী যুবক শ্রোতার আদৌ ভাল লাগিল না। বেদনাসঙ্কুচিত হইয়া—আপন মনে সে ভাবিতে লাগিল—এ গানের যে

রচয়িতা সেই কি গায়ক! গীত শুনিয়া মনে হইতেছে, কেহ কাহাকেও ভালবাসে। সে ভালবাসা বড় গভীর, বড় জ্বালাপ্রদ, বড় রহস্যময়। কিন্তু সে ভালবাসায় পরস্পরের সুখ আছে, শান্তি আছে—তবে সে সুখ, সে শান্তি ইহলোকের নহে।

যুবক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল—এ প্রেমোন্মত্ত গায়ক কি তবে তাহারই ভালবাসার সামগ্রীকে ভাল বাসিতে চাহে—ভালবাসে?

সে প্রশ্নের উত্তর সে মনে মনে স্থির করিয়া লইল। সে ভাবিল—ভালবাসাই সম্ভব। গায়ক নিশ্চয়ই যুবকের ভালবাসার পাত্রীকে ভালবাসে। নতুবা সময়ে অসময়ে সে আসিয়া বালিকার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করে কেন?

যুবকের ভালবাসার সামগ্রীকে অপরে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, কল্পনা করিয়া যুবক বিশেষ দ্বেষপরায়ণ হইল। কিন্তু সে আবার ভাবিল, কিন্তু "বালিকা কি গায়ককে ভালবাসে?" এ প্রশ্ন তাহার মনে উদিত হইতেই তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পাঠকগণের বোধ হয় বুঝিতে আর বাকী নাই যে, যুবক—রমেন্দ্রকিশোর; আর বালিকা—মনোরমা। রমেন্দ্রকিশোর মনোরমাকে তখন কি এক নূতন চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছে। রমেন্দ্রকিশোর তখন স্থির জানিয়াছে—মনোরমাই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব, মনোরমা ভিন্ন তাহার জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

এই রমেন্দ্রকিশোরই একদিন বিবাহের নাম শুনিলে আতঙ্কিত হইত, ঘটক দেখিলে তাহাকে তাড়া করিত, আর এই রমেন্দ্রই তাহার পিসীমাতা শিবসুন্দরীর অনুরোধ উপরোধেও বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাতেই শিব সুন্দরীর বর্দ্ধমানে আগমন আর সেইখানেই মৃত্যু! সেই রমেন্দ্র এখন মনোরমার চিন্তায় আত্মহারা। কালের মহিমায় এমনই হয়!

সে যাহা হউক, বহু চিন্তা ও গবেষণার ফলে রমেন্দ্রকিশোর সিদ্ধান্ত করিল, মনোরমা গায়ককে আদৌ ভালবাসে না, ভাল বাসিতে পারে না। সে সিদ্ধান্তের ফলে সে কতকটা শান্ত হইল এবং কুটীরে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। তখন কিশোরীদাস আলোকআঁধারবেষ্টিত তালকুঞ্জে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া রসরঙ্গে গাহিতেছে—

"রাধে গো একবার খালি চাও।

(আমার) প্রাণের কথা, হৃদয় ব্যথা

বলতে মোরে দাও।
রূপে তুমি গরবিনী
মনে করেছ ও মানিনী,
(আমি) এখন দাঁড়াই কোথায়,
ব'লে আমায় দাও।
(তোমার) মানের দায়ে প্রাণ যে গো যায়
এখন আশ্বাসে বাঁচাও।"

কুটীরপথে আসিতে আসিতে মনোরমা ও রমেন্দ্রকিশোর সে গান শুনিল। সে গান শুনিয়া ও গায়কের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া রমেন্দ্রকিশোর হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু মনোরমা তখন বিশেষ গম্ভীর। তাহার এ গাম্ভীর্য্যের একটু কারণ ছিল। দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি অন্ধকারের আশ্রয়ে কিশোরীদাসের পার্শ্বে বসিয়া কি একটা পরামর্শ করিতেছিল।

রমেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসা করিল--"বাবাজী, ওরা কা'রা?" কিশোরী-দাস বলিল—"ওরা—নবাগত; অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এখানে এসেছে।"

রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমা আর সে স্থানে দাঁড়াইল না। তাহারা চলিয়া গেল। কিশোরীদাস তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আগন্তুকদ্বয়ের সহিত কি একটা গভীর পরামর্শ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ—

রত্নময়ী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

লেখক—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবী অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। রত্নময়ী ও তাহার মাতা পশ্চাৎবর্ত্তিনী। তখন জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সুতরাং পথ চলিবার কোন বাধা উপস্থিত হইতেছিল না।

প্রায় তিন চারি রশি পথ অতিক্রম করিবার পর, ভৈরবী গভীর জঙ্গলাচ্ছাদিত এক অট্টালিকার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্রুতগমনসঞ্জাত স্বেদধারা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া বলিলেন—"মা! আর তোমাদের কোন ভয় নাই। এখন আমরা জনার্দ্দনের আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

রত্নময়ী মনে ভাবিল—হয়তঃ জনার্দ্দন কোন দস্যুদলপতির নাম। ইতিপূর্ব্বে এক দিন সে বনমধ্যস্থ এইরূপ এক নির্জ্জন অট্টালিকার মধ্যে আনীত হইয়াছিল। কাজে কাজেই সে একটা স্বভাব-কৌতুহলে প্রশ্ন করিল—"এ জনার্দ্দন কে?"

ভৈরবী বলিলেন—"মা! এ জনার্দ্দন এই জগতের পালক, আশ্রিতের রক্ষক, নারীর সম্মান রক্ষাকারী, মধুকৈটভ, বকাদিকে এই জনার্দ্দনই নাশ করিয়াছেন! শিশুপালকে ইনিই বধ করিয়াছেন। কালিন্দীকূলে কোমল বাঁশরী নিনাদে ইনিই গোপিনীর মনোহরণ করেন।"

রত্নময়ী বলিল—"মা, আর তোমাকে বলিতে হইবে না। এখন বুঝিয়াছি এই জনার্দ্দনই, আমাদের এই মহাবিপদের সময় তোমাকে আমাদের উদ্ধারকারিণীরূপে পাঠাইয়াছিলেন।"

ভৈরবী একথার আর কোন উত্তর না দিয়া সেই জঙ্গলমধ্যবর্ত্তী ভগ্নাট্টালিকার দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিলেন "কাল,—জাগিয়া আছ কি?"

এই আহ্বানে সহসা একজন ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া বলিল—"মা! তুমি যখন বাহিরে আছ, তখন তোমার সন্তান কি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে?"

কালের পূর্ণনাম 'কালভৈরব। কিন্তু ভৈরবী তাহাকে কাল বলিয়াই সম্বোধন করেন। তাহার মূর্ত্তি যমদূতের মত। দেহ মাংসপেশী বহুল ও অতি বলিষ্ঠ, তাহাকে দেখিবামাত্রই মহা বীর পুরুষ বলিয়া মনে হয়।

ভৈরবী বলিলেন—"কাল, মুরারি আজ আমাদের দুইটী অতিথি জুটাইয়া দিয়াছেন। ইহাদের পরিচর্য্যার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবে ?"

কালভৈরব বলিল—"তোমার এ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কোন জিনিষেরই অভাব ত নাই মা! আর যদিও বা থাকে, তাহা হইলে তোমার প্রিয় পুত্র, এই কালভৈরব জীবিত থাকিতে তাহার কোন অভাবই হইবে না।"

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার পূর্ব্ববৎ আবদ্ধ হইল। একটী দর দালান পার হইয়া তাহারা সকলে আর একটী মহলে আসিলেন। এ মহলটী সুন্দররূপে পরিষ্কার করা। উত্তমরূপে চূণকাম করা। প্রকোষ্ঠগুলি মানবের বাসোপযোগী সজ্জায় সজ্জিত! আর সেই চত্বরের সম্মুখেই লক্ষ্মী জনার্দ্দনেরর মন্দির।

নীলকমলহস্তা সুলোহিতা পট্টবাসবিভূষিতা স্ফুরিতাধরা হাস্যমুখী নারায়ণী জনার্দ্দনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। সে সুষমা কত কান্তিময়, কত হাসিমাখা, কত জ্যোৎস্নামাখা, সদ্যঃ প্রস্ফুটিত সরস বাসন্তী কুসুমের মত অতি শুভ্র।

আর কমলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রক্তিমনয়ন, সুবঙ্কিমঠাম, শিখিপাখা-চূড়াবিমণ্ডিত, রক্তোৎফুল্লাধর নারায়ণ। তাঁহার দেহ কারুকার্য্যময় পীতবাস-বিজড়িত। গলদেশে অতি শুভ্র, সযত্নে গ্রথিত শুভ্র ফুলমালা। করকমলে মধুর মুরলী। আর সেই চন্দনচর্চ্চিত, অলকামণ্ডিত, তিলক-শোভিত স্মিত বদনমণ্ডলে কি যেন একটা প্রেমময় হাসি।

কক্ষমধ্যে ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। মৃগমদবাসিত, সুগন্ধি দীপের শুভ্র আলোক সেই মুখের উপর পড়িয়াছে। বিচিত্র মালতীমালার সুগন্ধে সেই দেবমন্দির স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ!

ভৈরবী, মন্দির সম্মুখে আসিয়া রত্নময়ী ও তাহার জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"লক্ষ্মী জনার্দ্দনের চরণে প্রণাম করিয়া তোমরা বিশ্রাম করিবে চল।"

তখন তিনজনেই দেবদেবী চরণে প্রণত হইলেন।

ভৈরবী অতি কোমল ললিত কণ্ঠে—নতজানু হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"অখিল ভুবনৈকভূষণ
মধিভূষিত-জলধিদুহিতৃ প্রাণবল্লভম্,
ব্রজযুবতীহারবল্লী-
মরকতনায়কমহামণিং বন্দেং।"

প্রণামান্তে ভৈরবী সকলকে লইয়া এক নির্জ্জন কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। কালভৈরবের চেষ্টায় সেখানে বেশপরিবর্ত্তনের শ্রান্তিদূর করিবার সমস্ত ব্যবস্থাই হইয়াছে। দুই দিকে দুই খানি অজিনাসন পাতা রহিয়াছে। দুই পাথরের পাত্রে দেবতার প্রসাদি ফলমূল ও মিষ্টান্নাদি, মৃৎপাত্রে গঙ্গাবারি।

ভৈরবী বলিলেন—"আজ তোমরা জনার্দ্দনের অতিথি। তিনিই কৃপা করিয়া আজ তোমাদের এখানে আনিয়াছেন। তিনিই কৃপা করিয়া তোমাদের জন্য এই সমস্ত প্রসাদ পাঠাইয়াছেন। তোমরা আজ শ্রান্ত ও ক্লান্ত। এস্থানে তোমাদের কোনও ভয়ই নাই। এখানে যমদূত আসিতে সাহস করিবে না। এই অজিনাসনে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে নিদ্রা যাও। তোমাদের কোন ভয়ই নাই। কল্য অতি প্রত্যুষে আবার তোমরা আমার দেখা পাইবে।"

আর কোন কিছু না বলিয়া তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। রত্নময়ী তাহার মাকে বলিল—"মা! আমরা কোথায় আসিলাম মা।"

কল্যাণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"জনার্দ্দন আমাদের কৃপা করিয়া যে স্থানে আনিয়াছেন, আমরা সেই স্থানেই আসিয়াছি।"

রত্নময়ী বলিল—"আমরা ত জনার্দ্দনের আশ্রয়ে আসিয়া নিরাপদ হইলাম। কিন্তু—"

কল্যাণী। তোমার পিতার কথা বলিতেছ? জনার্দ্দন ত সর্ব্বব্যাপী। তিনি যখন এরূপভাবে আমাদিগকে আশ্রয় দিলেন, বিপন্মুক্ত করিলেন, সেইরূপ তোমার পিতাকেও বাঁচাইবেন।

রত্নময়ী। মা! আমি তোমার অযোগ্যা কন্যা। কেন আমায় তুমি গর্ভে ধরেছিলে মা! তুমি যে কালরাত্রে রাজরাণী ছিলে। হায় আমার জন্যই ত তোমার এ দুর্দ্দশা!

তাহার প্রাণের মধ্যে দারুণ মর্ম্ম বেদনার একটা প্রবল ঝঞ্ঝা উঠিতেছিল, রত্নময়ী তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার সেই শমকাতর বিশুষ্ক গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রু প্রবাহ বহিল।

কল্যাণী অতীত কষ্টের কথা একবারও ভাবেন নাই বা তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় কোনরূপে চঞ্চল হয় নাই। কিন্তু প্রাণোপমা স্নেহময়ী কন্যার চোখে অশ্রুধারা দেখিয়া তাঁহারও চোখে জল আসিল। তিনি বস্ত্রপ্রান্তে নিজের চোখের জল মুছিয়া, কন্যার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিলেন।

তৎপরে প্রবুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"এ সংসারে সুখ দুঃখ বলিয়া ত আলাদা জিনিস কিছুই নাই মা! দিবা আর রাত্রি যেমন পাশাপাশি থাকে, সুখ ও দুঃখ সেইরূপই থাকে। চিরদিন দিবা থাকে না, চিরদিন রাত্রিও থাকে না। এই জনার্দ্দনের কৃপায় একদিন আমাদের সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছিল, আর হয়ত সুখের বিলাস-বিভ্রমে পড়িয়া আমরা তাঁহার চরণে কোন অপরাধ করিয়াছি, তাই আমাদের আজ এ দুর্দ্দশা হইল। সুখ ও দুঃখ ভগবানের সৃষ্টি। চির শান্তি ও চির প্রেম ভগবানের সৃষ্টি। ভগবানকে ডাক, দুঃখই তোমার সুখ বলিয়া বোধ হইবে।

মাতার এই উপদেশপূর্ণ কথায় রত্নময়ী অনেকটা সাহস পাইল। সে মনে মনে ভাবিল—"আমার গর্ভধারিণী এই কল্যাণী দেবী, কমললোচন রায়ের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী বটে।"

সহসা তাহার দৃষ্টি সেই প্রস্তরপাত্রে রক্ষিত ফলমূলাদির দিকে পড়িল। সে বলিল—"মা! কিছু খাও! তোমার খুব তৃষ্ণা পাইয়াছে—"

কল্যাণী বলিল—"আগে তুমি খাও, তাহা না হইলে আমি কিছুই খাইব না।"

মাতার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া রত্নময়ী একটী প্রস্তরপাত্র হইতে ফলমূল মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া জলপান করিল। তারপর মাকে বলিল—"এইবার তুমি খাও মা!"

কল্যাণী সেই ফলের পাত্র হইতে একটু মিষ্টান্ন ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা মুখে দিলেন ও ঢোঁক ঢোঁক করিয়া এক পাত্র জল খাইয়া বলিলেন—"আঃ—"

রত্নময়ী বলিল—"আর কিছু খাইবে না?"

কল্যাণী। না—

রত্নময়ী। কেন?

কল্যাণী। ভুলিয়াছিলাম কি রত্ন—তোমার পিতা কারাগারে। নিষ্ঠাবান্ [illegible]। সেখানে তিনি যে একটুও জল গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ ত

বোধ হয় না। আর তাহার সুযোগই বা কোথায়? তিনি উপবাসী থাকিতে আমি কিছু খাইতে পারিব না। তাহা হইলে এই বিপদে আশ্রয়দাতা জনার্দ্দন আমার উপর অতি বিমুখ হইবেন!

রত্নময়ী একথার উত্তরে আর কিছু বলিল না। সে তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শুইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল—সতীলক্ষ্মী মা আমার, তোমার গর্ভে জন্মিয়া, তোমার হতভাগিনী কন্যা রত্নময়ী যদি এরূপ অকৃত্রিম পতিভক্তির একটুও শিখিত, তাহা হইলে আজ তাহার এ দুর্দ্দশা হইত না—আর তোমাদেরও বিপদ্ ঘটিত না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দিবা ও রাত্রি কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। রত্নময়ী ও তাহার মাতা কল্যাণীর জন্য অপেক্ষা করিবে কেন?

রাত্রি প্রভাত হইল। পবিত্র উষালোক, মৃত প্রকৃতিকে নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিল। শ্যামা, দহিয়াল, পাপিয়া ইত্যাদি বালার্ক কিরণ রেখা গায়ে মাখিয়া, সকলেই আগে ব্রহ্মাণ্ডের লোচনস্বরূপ সূর্য্যদেবের সম্বর্দ্ধনা করিল, তাহার পর কোমল কাকলী মাখা স্বরে, বায়ুস্তরের বুকে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল।

রত্নময়ী ও তাহার মাতা তখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন, দুই জনেই সেই সুমধুর প্রভাতে চিন্তামগ্ন। রাত্রে দুইজনের কাহারও নিদ্রা হয় নাই।

সেই সময়ে ভৈরবী আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। সেই যুবতী, তন্বঙ্গী, গৈরিকবাস মণ্ডিতা, বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া মাতা ও কন্যা উভয়েই বিস্মিত হইল। বোধ হইল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত।

এতরূপ স্ত্রীলোকের হইতে পারে! বিধাতা কি এরূপের কোন ত্রুটিই রাখেন নাই। ছলান্বেষীর কলুষিত জিহ্বা কি এই পবিত্র রূপের সমালোচনায় একাবারে নির্ব্বাক!

রত্নময়ীর মনে বরাবরই একটা রূপের গর্ব্ব ছিল। ভৈরবীর যৌবন তরঙ্গায়িত মধুর কান্তি দেখিয়া সে দর্প কমিল!

ভৈরবী সহাস্যে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মা! কাল তোমাদের কাহারও নিদ্রা হয় নাই?"

কল্যাণী। কেমন করিয়া জানিলেন মা।

ভৈরবী। তোমাদের মুখ চোখ সবই বলিয়া দিতেছে! জনার্দ্দন যেখানে উপস্থিত, সেখানে কিসের ভয়—কিসের উদ্বেগ! কিসের চিন্তা মা!

কল্যাণী। সত্যই তাই মা! আমরা অতি পাপিষ্ঠা। তোমার মত এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বুদ্ধি আমাদের নাই।

ভৈরবী। কাল রাত্রে তোমাদের পরিচয় লইবার অবসর পাই নাই। এখন জানিতে পারি কি?

কল্যাণী স্বামীর নাম করিতে ইতঃস্তত: করিতেছেন দেখিয়া রত্নময়ী বলিল—"আমি জমীদার কমললোচন রায়ের কন্যা। আর ইনি আমার গর্ভধারিণী।"

ভৈরবী বলিলেন—"কমললোচন রায়ের পত্নী ও কন্যা আজ এই জনার্দ্দনের আশ্রয়ে! কেন-মা, তোমাদের এরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"

তখন কল্যাণী সমস্ত ঘটনা, ভৈরবীকে একে একে বলিয়া গেলেন। ভৈরবী সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন—"ভগবান্ যা করেন, তা ভালর জন্য। সুখ দুঃখকে যদি তোমরা সমান চোখে দেখ তাহা হইলে তোমাদের অনুশোচনার কোন কারণই হইবে না। এই ফৌজদার আমেদ খাঁর অত্যাচারের কথা আমি অনেক জানি। তবে এটুকু জানিও, তাহার অত্যাচারেই আমি পিতৃমাতৃহীনা। কিন্তু আমি তজ্জন্য একটুও দুঃখিত নহি। এই অনাশ্রয়ের আশ্রয় জনার্দ্দনের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়া আমি একটা অসাধারণ শান্তির অধিকারিণী হইয়াছি। আমার মত তোমরাও এই জনার্দ্দনকে তোমাদের সর্ব্বস্ব বলিয়া ভাব, তোমাদের কোন মনঃকষ্টই হইবে না। যখন তোমরা আমাদের এই পবিত্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমাদের কোন আশঙ্কারই কারণ নাই।"

মাতা ও কন্যা এই প্রবোধবাণীতে আশ্বস্তা হইয়া, আসন ত্যাগ করিয়া ভৈরবীর পদবন্দনা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভৈরবী একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"ছি! ও কাজ করিও না। একে আমি ইহজন্মের পাপে এতটা মনঃকষ্ট পাইতেছি, তাহার উপর আর পাপ করিতে চাহি না।"

কল্যাণী বলিল—"জানি না মা, তুমি পূর্ব্বজন্মে আমাদের কে ছিলে? তোমায় একটা অনুরোধ করিব কি?"

ভৈরবী। স্বচ্ছন্দে বল্!

কল্যাণী। আমার স্বামী বিপন্ন। তাঁহার গৃহদ্বার নবাবের প্রহরী বেষ্টিত। এখন তিনি কারাগারে। জানি না সেই নিষ্ঠুর নবাব, তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে কিনা? মা—আমার স্বামীর সংবাদ যদি কোন রকমে আনাইয়া দিতে পার—তাহা হইলে আমি তোমার চরণে চিরবিক্রীত হইয়া থাকিব।"

ভৈরবী। তার জন্য চিন্তা কি? কালভৈরবের মত উপযুক্ত সন্তান যখন আমার আছে তখন একাজে আমার কোন অসুবিধাই হইবে না।

এই কথা বলিয়া ভৈরবী নিকটস্থ এক কুলুঙ্গী হইতে একটি শঙ্খ তুলিয়া লইয়া তাহাতে মৃদুভাবে ফুৎকার দিলেন। গভীর শঙ্খশব্দে সেই নির্জ্জন দেবালয় শব্দায়মান হইয়া উঠিল। আর সেই শঙ্খের শব্দ বায়ুস্তরে বিরাম না হইতে হইতে ভৈরবী দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় পুত্র কাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

কালভৈরব—বলিল "এত প্রভাতে আমায় ডাকিলে কেন মা?"

ভৈরবী সহাস্যমুখে বলিলেন—"তোমাকে একবার সপ্তগ্রামে যাইতে হইবে।"

কাল। কেন?

ভৈরবী তখন কমললোচন রায় সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা কালকে বলিয়া ফেলিলেন।

কালভৈরব বলিল,—"এ আর বেশী কথা কি? তোমার এ অযোগ্য সন্তানের অসাধ্য কি কাজ আছে মা! আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি এ সংবাদ আনিয়া দিব। আর কিছু আদেশ আছে কি জননি?"

ভৈরবী বলিলেন,—"না, তুমি এখনই চলিয়া যাইতে পার।"

কালভৈরব, ভৈরবীর চরণ-বন্দনা করিয়া চলিয়া গেল। ভৈরবী কল্যাণী ও রত্নময়ীকে বলিলেন,—"কাল রাত্রে তোমাদের কাহারও সুনিদ্রা হয় নাই। আহারাদিও ভাল হয় নাই। অদূরে এক নদী আছে। তাহার জল অতিস্নিগ্ধ, জাহ্নবী সলিলের মত স্বচ্ছ। আমাদের এই মন্দির চত্বরের এক ক্রোশের মধ্যে তোমাদের কোন ভয় নাই। যে পথটী বরাবর দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিয়া গেলেই তোমরা এই নদী পাইবে। তোমাদের

প্রয়োজনীয় শুষ্ক বস্ত্রাদি তোমাদের এই কক্ষের মধ্যে ঐ আলনায় আছে। আমার একটা কাজ আছে, তাহা না হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতাম।"

ভৈরবী চলিয়া গেলেন। মাতা ও কন্যা তখন স্নানের একটা বড়ই প্রয়োজন বোধ করিতে ছিলেন। তাঁহারাও সদরদ্বার দিয়া বাহির হইয়া ভৈরবীর নির্দ্দেশিত পথ ধরিলেন।

যে নদীর কথা আমরা বলিতেছি, তাহা সরস্বতীর একটী শাখা মাত্র। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সেই সময়ে সরস্বতী আধুনিক ভাগিরথীর মত প্রশস্তবক্ষা, প্রচুর সলিলসম্পদ শোভিতা ছিলেন। তখন অনেক বড় বড় জাহাজ এই সরস্বতীর বক্ষের উপর দিয়া যাতায়াত করিত। এই সরস্বতীর জন্যই সপ্তগ্রাম এত ঐশ্বর্য্য। আর এই সরস্বতী মজিয়া যাইবার পর হইতেই সপ্তগ্রামের ধ্বংসসাধন হইয়াছিল।

আমরা যে নদীটির কথা বলিতেছি, তাহা সরস্বতীর একটি ক্ষুদ্র শাখামাত্র। এখন তাহার কোন অস্তিত্বই নাই। কালপরিবর্ত্তনে সরস্বতীর যে দশা হইয়াছে, এখন এই শাখার অবস্থাও সেইরূপ।

রত্নময়ী স্বভাবতই চঞ্চলা। চিরদিনই সে জনপূর্ণ সহরে বাস করিয়া আসিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ী পল্লীগ্রামে হইলেও সেখানকার পল্লীসুন্দরীর স্বভাবগত সৌন্দর্য্য দর্শনের সুখভাগিনী সে খুব কমই হইয়াছিল।

তাহার মাতা স্নান করিতে ঘাটে নামিলেন দেখিয়া রত্নময়ী তাহার স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশে পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই জঙ্গলের মধ্য হইতে সুরভিপুষ্প বাস আসিয়া তাহার নাসাগ্রকে তৃপ্তি করায় সে এই বনফুলগুলি তুলিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে আরও একটু অগ্রসর হইল।

কিন্তু জঙ্গলপথের দোষ এই যে তাহা শীঘ্রই পথিকের পথভ্রান্তি ঘটায়। রত্নময়ী সম্মুখের দিকে চলিয়া যাইতেছিল। সহসা সে কিয়দ্দূরে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অদূরেই এক চম্পকবৃক্ষ। ফুল তুলিবার কেহ নাই, এজন্য সহস্র চম্পক-রাজি স্তবক বাঁধিয়া সেই বিটপীর দিকে সুবাস ছড়াইতে ছিল আর এই চম্পকগন্ধে আচ্ছন্ন হইয়াই রত্নময়ী এই জঙ্গলের মধ্যে আসিয়াছে।

তাহার মনে সহসা একটা বাসনা জাগিয়া উঠিল—সে কতকগুলি চম্পক সংগ্রহ করিয়া মন্দিরমধ্যস্থ জনার্দ্দনের পূজা করিবে। স্নানের সময়ে সে

কাচা কাপড় পরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বৃক্ষের তলায় যে ফুলগুলি পড়িয়া ধুলায় লুটাইতেছিল, সে নিবিষ্টমনে তাহাই কুড়াইয়া তাহার নূতন গামছা খানিতে সঞ্চয় করিতে লাগিল।

সহসা এই সময় সে সেই গভীর জঙ্গলমধ্যে যেন কাহারও পদশব্দ পাইল। রত্নময়ী তখন ফুল গুলি বাঁধিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সে দেখিল তাহার অতি সন্নিকটে দুইজন মুসলমান সিপাহী। এই সিপাহীরাই আগে তাহার পিতার অধীনে চাকরী করিত।

তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া রত্নময়ীকে বলিল,—"বিবি! খোদা আমাদের উপর অতি মেহেরবান। নবাব পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, যে তোমাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, সেই পাঁচ হাজার টাকা এনাম পাইবে। আমরা তোমার সন্ধানেই এই জঙ্গলে আসিয়াছি। কাল রাত্রে তোমরা বাড়ী ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছ। এই রাত্রের মধ্যে তোমরা বেশীদূর যাইতে পার নাই, ইহা ভাবিয়াই আমরা এই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। তা আমাদের এতকষ্ট ও পরিশ্রম সফল হইয়াছে।"

রত্নময়ী তখন নিজের বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিল। সহসা একটা চাঞ্চল্যের অধীন হইয়া এই বনপথে প্রবেশ করিয়া সে যে ভয়ানক একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহাও বুঝিল। কিন্তু তখন তাহার সে ভ্রান্তির প্রতিকারের কোন উপায়ই নাই।

এই মহাবিপদের সময় রত্নময়ীর মনে সহসা সেই বিপদবারণ জনার্দ্দনের কথা জাগিয়া উঠিল। ভৈরবীর গতরাত্রের সেই উপদেশবাণী মহাশক্তি বিকাশ করিল। সে মনে মনে বলিল,—"মালা গাঁথিয়া যে জনার্দ্দনকে পূজা করিব বলিয়া আমি এই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুল কুড়াইতেছি, সেই জনার্দ্দনই আজ আমাকে রক্ষা করিবেন।

রত্নময়ী সাহসাবলম্বনে বলিল,—"শয়তান তোরা। বঙ্গীয় রমণীর সতীত্বের তেজ কি তাহা যদি তোরা জানিতিস্, তাহা হইলে এই ঘৃণিত কার্য্যে অগ্রসর হতিস্ না। আমার পিতার অন্নে তোদের শরীর, আর তোরা আজ আমার উপর অত্যাচার করিতে আসিয়াছিস্?"

সেই সৈনিকদের মধ্যে একজন বলিল,—"তোমার পিতা আমাদের অন্ন দেন নাই। নবাবের প্রদত্ত বেতনে আমাদের এ দেহ পুষ্ট, তোমার পিতা তখন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, কাজেই নবাবের আদেশে আমরা তাঁহার মহল রক্ষা করিতাম। এখন তাঁহার সে পদমর্য্যাদা নাই। তিনি এখন কারাগারে। আমরা যদি তোমাকে নবাবের নিকট পৌঁছিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে নগদ পাঁচ হাজার মুদ্রা লাভ করিয়া আমরা আমাদের নসীব ফিরাইয়া লইব।"

এই কথা বলিয়া সেই শয়তান রত্নময়ীর দিকে অগ্রসর হইল। রত্নময়ী তখন বুঝিল, কি ভয়ানক বিপদের মধ্যে সে পড়িয়াছে।

পিতৃপ্রদত্ত সেই ছুরি খানি রত্নময়ীর বক্ষবস্ত্রমধ্যেই ছিল। সে প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ববলে তখনই তাহা বাহির করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বলিল,—

"সাবধান, শয়তান! আর এক পা অগ্রসর হইলেই তোদের মৃত্যু ঘটিবে।"

এই সময়ে সহসা কোথা হইতে একটি অজানিত হস্ত নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া এই দুইজন সৈনিকের একজনকে আহত করিল ও অপর ব্যক্তি প্রাণভয়ে অন্যদিকে পলাইল।

এইরূপ দৈব উপায়ে বিপন্মুক্ত হইয়া রত্নময়ী কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র দেখিল, ভৈরবী তাঁহার দুইজন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। তখন সে বুঝিতে পারিল, কিসে কি হইল!

ভৈরবী তাহার নিকটে আসিয়া তিরস্কারসূচক স্বরে বলিলেন,—"এমন নির্ব্বোধ মেয়ে তুমি? এ বনের মধ্যে কি একা আসিতে আছে?"

এইরূপ তিরস্কারে প্রগলভা রত্নময়ী বিনা বাক্যব্যয়ে ভৈরবীর পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল।

ক্রমশঃ।—

অনাদৃতা।

(১)

দরিদ্রের মেয়ে বড়লোকের ঘরে পড়িলে যেরূপ হয়—লাবণ্যময়ীরও সেইরূপ হইয়াছিল। পিতা বিশ্বেশ্বরবাবু বড় আশায় ভদ্রাসন টুকু বাঁধা দিয়া ও গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া মেয়েকে রায় বাহাদুর অক্ষয় বাবুর ছেলে মোহিনীমোহনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর একমাস যাইতে না যাইতেই তাঁহার আশার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন;—বুঝিতে পারিলেন যে জল এবং অগ্নি যেমন একত্র মিলিত হইতে পারে না, তেমনি ধনী ও দরিদ্রের সদ্ভাব হওয়া অসম্ভব।

বঙ্গদেশের শাশুড়ীগণ সাধারণতঃ যে স্বভাবের হন, লাবণ্যময়ীর শাশুড়াতেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। একেত দরিদ্র,—তার উপর আবার লাবণ্যের তেমন রূপ ছিল না, যে রূপ বড়লোকের ঘরে মানাতে পারে। আর কি রক্ষা আছে! উঠিতে বসিতে তিনি বধূর চৌদ্দপুরুষের বাপান্ত করিতে ছাড়িতেন না! তাহার সমস্ত ক্রোধ একমুখী হইয়া নিরীহ লাবণ্যময়ীর অভিমুখে প্রবাহিত হইত। লাবণ্যের সামান্য একটু ত্রুটি হইলেই গর্জ্জিয়া অনর্থপাত করিতেন, রান্নাবান্না হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত কার্য্যই লাবণ্যকে করিতে হইত। লাবণ্য আসিবার পূর্ব্বে কিন্তু এগুলি দাসদাসীদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। শ্বশুরালয়ে আসার পর লাবণ্য আর পিত্রালয়ে যায় নাই। বিশ্বেশ্বরবাবু দুইবার নিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু রায় বাহাদুরের গৃহিণী নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন।

(২)

আশ্বিন মাস। মহাপূজা নিকটবর্ত্তী, আনন্দময়ীর আগমনে বাঙ্গলার গৃহে গৃহে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত বাঙ্গালী অবসর লাভের অশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়াছে, দৈন্য-দুঃখ-দগ্ধ ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের অমৃত ধারা প্রবাহিত হইতেছে, লাবণ্যের মাতা স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, যেমন করিয়াই হউক এবার পূজায় মেয়েকে আনিতেই হইবে, তিনি কিছুতেই শুনিবেন না, বিশ্বেশ্বরবাবু বিস্তর প্রতিবাদ করা সত্বেও তাহার মত বদ্‌লাইল না। অগত্যা তিনি আর কি করিবেন, আশঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে বেহাই-বাড়ী উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তথায় যখন পৌঁছিলেন, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে একটু হেলিয়া পড়িয়াছেন।

ঘর্ম্মসিক্ত, রৌদ্রক্লান্ত বেহাইকে অক্ষয়বাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, মামুলী কথাবার্ত্তার পর তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিনীতভাবে বিশ্বেশ্বরবাবু কহিলেন,—"এবার মায়ের পূজাতে লাবণ্যকে নিতে ইচ্ছা করি, আর তাহার গর্ভধারিণীও তাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন, এখন আপনার অনুমতি পাইলেই হয়।"

মাথা নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে অক্ষয়বাবু বলিলেন,—"আমার অনুমতির জন্য কিছু আসে যাবে না; 'ওদের' মত হইলেই হয়।" এখন সে কথা যাক্, একবার উঠুন, স্নানাহার কর্‌বেন।

আহারের পর বিশ্রামান্তে বিশ্বেশ্বরবাবু লাবণ্যকে লইয়া যাইবার কথা বলিলে অক্ষয়বাবু 'ওদের' মত লইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে বিষণ্ণ বদনে ফিরিয়া আসিলেন, বিশ্বেশ্বরবাবু তাহার মুখ দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, তিনি কিছু না বলিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেহাই বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

বিশ্বেশ্বরবাবু বাড়ী পৌঁছিলে গৃহিণী উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো? আমার মাকে নিয়ে এলে না? একা ফিরে এলে যে?

প্রত্যুত্তরে বিশ্বেশ্বরবাবু কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাহার মুখ হইতে কোন বাক্য সরিল না।

(৩)

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অভাগিনী লাবণ্যময়ীর কষ্ট কিন্তু বাড়িল বই কমিল না। বিশ্বেশ্বরবাবু নিতে আসার পর হইতেই তাহার শাশুড়ী পূর্ব্বাপেক্ষা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বিশ্বেশ্বরবাবুকে কিছু বলিতে না পারায় তাহার ক্রোধটা গোবেচারী বধূর উপরই গিয়া পড়িল, অবশেষে লাবণ্য আর সহ্য করিতে পারিল না—স্বামীকে সব জানাইল।

পৃথিবীতে একপ্রকার লোক আছে, যাহাদের পিতামাতার প্রতি তাদৃশ ভক্তি না থাকিলেও সময়বিশেষে সুবিধা অনুযায়ী ভক্তির মাত্রাটা খুব প্রবল হইয়া উঠে। আমাদের মোহিনীমোহনও সেই প্রকৃতির লোক ছিল, স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার মাতৃভক্তি উথলিয়া উঠিল। মথা নাড়িয়া উত্তর দিল,—

"তা আমি কি করব বল; মায়ের উপর ত আমার কোন হাত নেই, তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই মেজাজটা অল্পেই বিগড়ে যায়; যদি বা দু একটা গালিই পাড়েন, তোমার সহ্য করে নিতে হবে।" স্বামীর কথা শুনিয়া লাবণ্য আর কিছু বলিল না, মনে মনে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল।

স্বামীর নিকট হইতে কোন প্রতিকার না পাইয়া লাবণ্যময়ীর হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতার বিদায়কালীন অশ্রুপূর্ণ দুঃখ-বিজড়িত —কাতর মুখখানি তাহার যতই স্মরণপথের পথিক হইতে লাগিল, ততই জীবনের প্রতি তাহার দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই পিতার অপমানের মূল মনে করিয়া তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। হায়! কেন সে রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ না হইয়া কোন দরিদ্র কেরাণীর গৃহিণী হইল না। তাহা হইলেত তাহার পিতাকে এই অপমান সহ্য করিতে হইত না।

দিন যায় রাত্রি আসে, সময় কাহারও দুঃখ দেখে না, কাতর ক্রন্দন তাহার কর্ণে পশে না, সংসারের শত বাধাবিঘ্ন তাহাকে ক্ষণেকের জন্যও ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। নদীর স্রোতের ন্যায় সে সদাই বহিয়া যাইতেছে। দুঃখিনী লাবণ্যময়ীকে কাঁদিবার জন্য নির্ম্মম কাল একটুও সময় দিতেছে না— আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে পূজা আসিল। অক্ষয়বাবুর বাড়ী লোকের সোর-গোলে মুখরিত। সকলের মুখেই হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছে, সবাই আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু অভাগিনী লাবণ্যময়ীর হৃদয় দুঃখে ম্রিয়মান। পূজায় বিশ্বেশ্বর বাবু যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্ব প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রায়বাহাদুর-গৃহিণীর প্রীতি উৎপাদনে অসমর্থ হওয়ায় ফেরৎ গিয়াছে। শাশুড়ী পিতৃদত্ত তত্ত্ব ফেরৎ দেওয়ায় ও পিতার প্রতি নানা কটূক্তি বর্ষণ করায় লাবণ্যময়ীর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল।

সপ্তমী-পূজা সমাপ্ত হইতে না হইতেই মুষলধারায় বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাজকর্ম্ম করার দরুণ সেই রাত্রেই লাবণ্যময়ীর কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল, সে কোনক্রমে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। অষ্টমী দিন এইরূপ ভাবে কাটিল, কেহই তাহার একটু খোঁজ নিতেও আসিল না। পরদিন অক্ষয়বাবু ডাক্তার ডাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর ভয়ে তাহা করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

আজ বিজয়া কোন ঔষধপত্র না পাইয়া লাবণ্যময়ীর জ্বর বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠিল, প্রলাপের ঘোরে সে আবলতাবল কত কি বকিতে লাগিল। দেবী বিসর্জ্জনের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, লাবণ্যময়ীর শরীরের অবস্থা ততই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। দেবী বিসর্জ্জনের পর যখন সানাইএর বিষাদসুর শূন্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইতেছিল, সেই সময় লাবণ্যময়ীর প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া সুদূর অনন্তে উড়িয়া গেল। অভাগিনীর ইহ সংসারের সকল জ্বালা জুড়াইল।

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

গল্পলহরী

৩য় বর্ষ } ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২২ { ১১ ও ১২ সংখ্যা

রবি-দাদা

(লেখক—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস, সি)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে কলেজের ছেলেরা রবির আশাতীত সৌভাগ্যোদয়ের কথা শুনিল। জগতে উপকারী পাওয়া কঠিন, কিন্তু অনিষ্টকারী অনেক পাওয়া যায়। অপরের অনিষ্ট করিয়া অনিষ্টকারীর কোনও ইষ্ট না হইলেও অনিষ্ট করিয়াই তাহাদের সুখ। ইহা খলের স্বভাব। হিংস্রক ব্যক্তি, সর্প, উই ও ইঁদুর ইহারা এক শ্রেণীর। রবির অবস্থান্তরে অনেকের হৃদয়ে হিংসার বহ্নিঃ প্রজ্বলিত হইল,—সকলে মিলিয়া নিরীহ রবিকে সেই অগ্নিতাপে পোড়াইতে লাগিল। প্রতিবাদে অক্ষম, কলহে অপটু রবি, অভিমানে লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কলেজ হইতে যখন সে বাড়ী পৌঁছিল, তখন তাহার মুখ মেঘের মত অন্ধকার। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া সে বহিগুলি ঘরের মেঝে ছুড়িয়া ফেলিল, তার পর বিছানায় পড়িয়া দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। আজ তাহার হৃদয়ে বড় ব্যথা বাজিয়াছিল, এমন ব্যথা এতদিন-কার পুঞ্জীভূত দুঃখ, দৈন্য, অভাবেও সে অনুভব করে নাই। আজ তাহার মনে হইল, সে কে আর লীলা কে! তাহাদের ভিতর কত ব্যাবধান, এই ব্যাবধান তাহার এ জনমের শত চেষ্টায়ও ঘুচিবে না। হায়! তাহাদের ভিতর কেন এ ব্যাবধান,—চোখের জলে তাহার বালিশ ভিজিয়া গেল।

বহুক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া হৃদয়ের জমাটবাঁধা দুঃখ একটু তরল হইলে পর

রবির মনে অভিমান ও রাগ হইল। প্রথম হইল রাগ ঐ অতুলের উপর। কেন সে তাহাকে এরূপ নির্ম্মম উপহাসে বিদ্ধ করিল?—তাহার গাড়ী চড়া কি এতই বিষদৃশ্য দেখায়? কেন,—সে মানুষ, বড়লোকও মানুষ। বড়লোকের মত তাহারও রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি আছে। একই ঈশ্বর উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন,—তবে—তবে গাড়ী চড়িলে সকলে তাহাকে উপহাস করে কেন! কিন্তু দোষ ত ঐ অতুলের একা নয়, অনেক লোকে ত তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছে।

রবির মনে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিল। তাহার মনে হইল হায় আমার যদি অর্থ হয়, তাহা হইলে এই হিংসুকগুলিকে একবার দেখাই।

তারপর রাগ হইল রমাবাবুর উপর। কেন তিনি তাহাকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। দরিদ্র সে, পুঞ্জীভূত অবহেলা ও নির্ম্মমতায় জর্জ্জরিত, তাহাকে কেন এই প্রকার লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করা। তিনি ধনী বলিয়া কি দরিদ্রের সহিত এইরূপ উপহাস করিতে হয়। আবার অভিমান হইল লীনার উপর। কেন সে তাহার সহিত আসিয়া মিশে। পথে কুড়ান, আশ্রয়হীন বন্য পুষ্প সে, তাহার সহিত স্বর্গের ঐ পারিজাত কেন এক বোটায় ফুটিতে চায়,—কেন সে বোঝে না যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে ব্যবধান থাকিবেই, ইহা চিরন্তন রীতি। কস্মিন্ কালে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, হইবে না। অবশেষে সমস্ত রাগটা লীনার উপরই পড়িল। মানুষ যাহাকে যত ভালবাসে, তাহার উপরই তত অধিক পরিমাণে অভিমান হয়। রবি এ কয়দিনে অজানিতভাবে একটু একটু করিয়া লীনাকে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিল,—তাই তাহার উপর অভিমান ফুলিয়া উঠিল। কেন সে তার মোহিনী মূর্ত্তি লইয়া তাহার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—দাঁড়াইয়াছিল তবে এতটা দূরের ব্যবধান লইয়া আসিয়াছিল কেন? কেন সে দরিদ্রকন্যা না হইয়া ধনীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

রবি এইরূপ ভাবিতেছিল। বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সমস্ত পৃথিবীটা নিৰ্জ্জীব ও কালিমামাখা মনে হইতেছিল। সম্মুখের উন্মুক্ত জানালাপথে রমানাথবাবুর বিস্তৃত উদ্যান দেখা যাইতেছিল। গাছগুলি প্রবল ঝটিকাবেগে এক একবার মাটীতে লুইয়া পড়িতেছিল, আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছিল। বায়ুভরে বারিবিন্দুগুলি বাষ্পের মত উড়িতেছিল,—দমকা বাতাসের সঙ্গে জলার গন্ধ ধীরে ধীরে

আসিতেছিল। রবি আপন মনে ভাবিতেছিল—"আগেই ভাল ছিলাম। কৃতান্ত-বাবুর বাড়ী দুবেলা আহার পাইতাম, স্যাঁৎসেঁতে ঘরটায় মাথা গুজিয়া থাকিতাম, বিনিময়ে তাদের ছেলেদের পড়াইতাম, ফাই-ফরমায়েস খাটিতাম, তার পর কলেজের পড়া পড়িতাম। অবসর ছিল না, নিজের কথা ভাবিবার সময় ছিল না। কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় চলিয়াছি—জীবনটা কর্ম্মের স্রোতে অনন্তের পানে ধীরে ধীরে বেশ চলিয়াছিল। তার পর—একি পরিবর্ত্তন! দীন অবস্থা হইতে একেবারে রাজপদ! কোনও কাজ নাই, ষোড়শোপচারে খাওয়া, আর কলেজের পড়া, তাতে আর কত সময় লাগে? এখন কেবল চিন্তা। এই বিরাট পৃথিবীতে আমার 'আমার' বলিবার কে আছে! পৃথিবীতে মা, বাপ, ভাই কেহ না কেহ সকলেরই আছে,—আমার কেউ নাই।—' রবির অস্ফুট রোদনধ্বনি ক্রমশঃই ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। হায়, কেন তাহার এরূপ হইল। সংসারে কেউ ছিল না, তাহাতেও ত সে এত অসুখী ছিল না, কিন্তু আজ এত স্নেহ ভালবাসা পাইয়া তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে! একদিন লীলাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, এ ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর কেমন একটু মধুর আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হইয়াছে; মর্ম্মে মর্ম্মে, হৃদয়ের প্রতি কোণে সেই মধুর আশার রশ্মি ফুটিয়া সমস্ত প্রাণটাকে আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই সে আলোক নিবিবে।—একটা ভীষণ অন্ধকার বিরাট দৈত্যের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিবে, আ-জীবন হৃদয়ের ভিতর দাউ দাউ করিয়া দাবানল জ্বলিবে,—তখন সে তাহা কিরূপে সহিবে। রবির বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। হায় ভগবান্ এ কি ভীষণ পরীক্ষা,—এ কি নির্ম্মম উপহাস!

আবার ভাবিতে লাগিল—কেন, আমার বিদ্যা আছে,—সৎস্বভাব, সদ্বংশ, বিনয়, নম্রতা, রূপ,—পৃথিবীতে মানুষের যে যে গুণ থাকা দরকার সবই আছে,—কেবল নাই একটি—সে টাকা। কিন্তু পৃথিবীতে যার টাকা নাই সে ত সকলের নিকৃষ্ট; তার মত হতভাগ্যের সহিত এত বড় ধনিকন্যার—অসম্ভব। রবি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময় ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে লীলা আসিয়া ডাকিল—"রবি-দা!" পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে উদ্যতফণা সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হয়, সহসা লীলাকে সম্মুখে দেখিয়া রবি ততোধিক

চমকিত হইল। লীলা আসিয়া ধপ্ করিয়া রবির চেয়ারে বসিয়া পড়িল, রবি সঙ্কুচিতভাবে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিল। স্থান পাইয়া বালিকা আরও জুড়িয়া বসিল। সরল বালিকা বলিল "একটা গল্প বল না রবি-দা; বাদ্‌লার দিনে গল্প শুন্‌তে বড় মজা।"

সে সময়টা রবির কণ্ঠ ভার হইয়া আসিয়াছিল, চোখের জলের দাগ তখনো মুছিয়া যায় নাই, ধরা পড়িবার ভয়ে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"বড্ড মাথা ব্যথা।" লীলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "তুমি বিছানায় শোও, আমি তোমার গোলাপ জল দি, বাতাস করি।" রবি কাতরকণ্ঠে বলিল—"দরকার নাই।" লীলা বলিল—"না না তুমি শোও রবি-দা, সত্যি সেরে যাবে।" বালিকা ফুলের মত নরম হাতে রবির কপাল টিপিতে লাগিল। রবির সমস্ত দেহে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"না তুমি যাও, যাও,—আর আমার কাছে এস না। আমি একা একা বেশ থাকি। তোমায় আমায় এ ভাব সাজে না। রাস্তার কুড়ান ভিক্ষুকের সঙ্গে রাজকন্যার পরিচয়! সে বড় বিষদৃশ্য, সে বড় উপহাস্যাস্পদ। যাও তুমি, আমাকে সে স্মৃতি ভুল্‌তে দাও।—" রবি লীলার হাত ছাড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। লীলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল "রবি-দার এ কি হইল।"

নবম পরিচ্ছেদ।

অতুল রবির দগ্ধহৃদয়ে নুন ছিটাইয়া প্রত্যহ তাহাকে কাঁদাইয়া তামাসা দেখিত, কিন্তু সহসা তাহার মনে নূতন একটি ভাব জাগিল। "একবার রবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সে কাহার বাড়ীতে এত রাজভোগে আছে, দেখিলে হয় না কি! তার পর বালিকাটিও দিব্য স্ফুটোনন্মুখ গোলাপের মত সুন্দরী,—সেখানে একটু ঘনিষ্ঠতা করিলে মন্দ কি। কে জানে কিসে কি হয়। যদি এত বড় একটা ধনীর মেয়েকে হাসি গল্পে মুগ্ধ করা যায়, তা হ'লে বিবাহও হ'তে পারে। চেহারাটাও ত উপন্যাসের নায়কের চাইতে খারাপ নয়,—বঙ্কিমবাবু বেঁচে থাকলে এতদিনে আমাকে নায়ক ঠাউরে কত উপন্যাস লিখে ফেল্‌তেন;—আর কথা বল্‌বার ভঙ্গী, হাব ভাবও মন্দ নয়,—একবার ঘেঁসে দেখা যাক্ কি হয়। আঃ যদি এই বিবাহটা হয় তবে একবার আমীরির চূড়ান্ত কর্‌ব। এখন খাচ্ছি ছাই রেল্‌ওয়ে, হাওয়াগাড়ী,—তখন এই 'ষ্টেট্ এক্‌স্‌প্রেস' আর 'টেব' ছাড়া কিছুই চোবও না। দু পা রাস্তা

মোটরে যাব, আর কাটলেট্, কাবলী ফল খেয়ে খেয়ে শ্রীমান গণেশচন্দ্রের মত পেটবাবাজী মাথা জাকিয়ে উঠ্‌বেন।'

অতুল মেসে নির্জকক্ষে বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে পাশের ঘর হইতে সহপাঠী দীনেশ দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—"কিরে একা একা এত হাস্‌ছিস্ যে. ব্যাপার কি!" নিজের মৎলব ব্যক্ত করিয়া আবার একটা সঙ্গী জোটান তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; অতুল অন্য কথা পাড়িল।" হাস্‌চি ঐ কৃপণটার কথা মনে করে। দীনেশ আগ্রহ সহকারে বলিল—"কি কি?" "আরে তাও শুনিস্‌নি! কৃপণ কৃতান্তের একটি মেয়ে আছে। মেয়েটা কিন্তু দেখ্‌তে মোটেই বাপের মত নয়। বাপের রং আব্‌লুস্ কাঠ, মেয়ের রং পূর্ণিমার চাঁদ; বাপের নাক গুড়গুড়ির ভূড়ি, মেয়ের নাক তলোয়ারের ডগা; বাপের চোখ জলশূন্য কূপ, মেয়ের চোখ ভরাযৌবনা সরসী; বাপ আফ্রকার আমদানী, মেয়ে ফরাসীর চীজ—" দীনেশ তাহার পিঠ চাপড়াইতে বলিল "ব্রাভো ব্রাভো, আঃ রবিঠাকুরের আগে যদি এই বর্ণনাটা ইয়ুরোপে পাঠাতিস তাহ'লে তোর নোবেল প্রাইজটা আজ নেয় কে?—"

দীনেশের চীৎকারে অন্যান্য ঘর হইতে হরেণ, ধীরেন, সত্যেন নৃপেন প্রভৃতি দৌড়াইয়া আসিল। অতুল গম্ভীরভাবে বলিল —"মাইরি ভাই মেয়েটা যেন গোবরে পদ্মফুল। আঃ তার আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল, এমন নম্রতাভাব দখ্‌লে কোন শালার সাধ্যি যে মোহিত না হয়। দেখ আমি যে প্রত্যেক ক্লাশে পরীক্ষায় বাঙ্গলায় ফেল করি, আমার ভিতরেও কত কবিত্ব ফুটে বেরিয়েছে।"

সত্যেন মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে গল্প লিখিত, সে লাফাইয়া বলিল, "হাঃ কি ভাষার ফোয়ারা—দীনেশ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চোপ রও। romantic storyতে ভাষার ভুলে কিছু যায় আসে না। বলে যাও দাদা কি গল্প বল্‌ছিলে।" অতুল বলিল, "গল্প নয় ভাই, সত্যি।" হরেন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কার কন্যা,— নামটি শুনি, অতুল বলিল. "কৃতান্তের।" "হরেন মুখ এতটুকু করিয়া বসিয়া পড়িল—"রাম, রাম। ভাল বাস্‌তে পারলেমই না, আজকার দুপুরের খাওয়াটাও মাটি কর্‌লি। পোলাও মাংস সব জলে যাবে। আরে তুই না হয় 'ঋতান্ত' বা 'গৃহান্ত' কিছু বল্‌তিস আন্দাজে বুঝে নিতাম। পুরা নামটা এম্নি উচ্চারণ কর্‌লি।—" দীনেশ বলিল "naver mind চক্ষু

বুজে জিভ একটু কামড়াইলেই সেরে যাবে। বল্ অতুল সবটা অতুল বলল "মেয়েটি ফুট্‌ব ফুট্‌ব হয়েছে,—তাই ওর মা বে'র জন্য ব্যস্ত হয়েছে, তা কৃপণ বলে 'এক পয়সাও দেব না। গহনা দান 'সামগ্রী কিছু দিতে পারব না। আমার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের টাকা পরের সুন্দুকে যাবে। —তা হচ্ছে না।' থাক্ মেয়ে চিরকাল আইবুড়ো, তবু টাকা দিয়ে বিয়ে দেব না।' এমন কৃপণের যে কথা সেই কাজ। আয় না ভাই, কৃপণটাকে নিয়ে এই সুযোগে একটু রগড় করা যাক।" সকলে উৎসাহিতভাবে বলিল—"কি, কি ?" অতুল কি একটা আদিরসমিশ্রিত কৌতুক করিল। নৃপেন হুঙ্কার করিয়া বলিল—"থাম stupid." সহসা এরূপ গম্ভীর গর্জ্জন শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল, অন্যে যাহারা আরো দু'একটি রসালো কৌতুক করিতে যাইতেছিল, তাহারা থামিয়া গেল। তাহারা জানিত নৃপেন বরাবরই ভাল ছেলে। নৃপেন প্রভুত্ব ব্যঞ্জকস্বরে বলিতে লাগিল "ভদ্রলোকের ছেলে তোম্‌রা, কলেজে শিক্ষিত বলে বড়াই করে বেড়াও, একজন লোকের যুবতী কন্যার বিষয়ে এরূপ উক্তি কত্তে লজ্জা হয় না। ছিঃ ছিঃ—এমন কথা একটা মূর্খ চাষার মুখেও শোভা পায় না। তোমাদের উচিত—বিপন্না মেয়েটিকে সাহায্য করা। তার বাপের কৃপণতা ও অপরিণামদর্শিতার জন্য মেয়েটি আজীবন একটা দুঃখময় জীবন বহন করবে—আর তোমরা দূরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে তা দেখে হাসিঠাট্টা করবে। ছিঃ লজ্জা করে না। তোমরাই না দেশের ভবিষ্যৎ আশা, তোমরাই না ভবিষ্যতে বিদ্যাসাগর, রামমোহন হবার স্পর্দ্ধা রাখ। তবে এস,—যাতে মেয়েটিকে সাহায্য করা যায়, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন আলোকিত করা যায়, সে চেষ্টা করা যাক। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু আছে, সমস্ত নিয়োগ করে যদি একটা প্রাণীকে একটুকুও সাহায্য কত্তে পারি!"—সাপুড়ের হস্তধৃত ঔষধে যেমন সর্পের মাথা আপনি আপনি নত হয়, তদ্রূপ নৃপেনের বক্তৃতায় সকলে মরমে মরিয়া গেল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, নৃপেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিয়াছে। স্নান করিবার সময় হইয়াছে, চিঠি ডাকে দিতে হইবে, জুতা ব্রাস্ করিতে হইবে ইত্যাদি অছিলায় আস্তে আস্তে সকলে সে ঘর হইতে চম্পট দিল।

কৃতান্তের মেয়ের কথাটা অতুলের স্বকপোলকল্পিত, কিন্তু বাস্তবিকই তাহার গিরিবালা নামে একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। নৃপেন ঠিক

করিল ঐ মেয়েটির একটা উপায় করিতে হইবে। কৃতান্তবাবুর বাড়ী অতুলদের মেসের সন্নিকটে।

দশম পরিচ্ছেদ।

কয়দিন ক্রমাগত ধনী ও দানশীল ব্যক্তিদের বাড়ী হাটিয়া হাটিয়া বহু-কষ্টে পাঁচশ টাকা সংগ্রহ করিয়া নৃপেন কৃতান্তবাবুর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তির মত অন্দরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "মা।" কৃতান্তবাবুর পত্নী রাঁধিতেছিলেন; কাছে বসিয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা গিরি-বালা বাটনা বাটিতেছিল। মাতৃসম্বোধন শুনিয়া কৃতান্তবাবুর পত্নী বাহিরে আসিলেন সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালাও দ্বার পর্য্যন্ত আসিল। কৃতান্তবাবুর পত্নী বাহিরে আসিয়া অপরিচিত যুবককে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন। নৃপেন বলিল—"আমার কাছে লজ্জা কি মা! একটু দাঁড়ান কথা আছে।"—মাতৃসম্বোধন শুনিয়া কৃতান্তবাবুর পত্নীর সঙ্কোচ দূর হইল, তিনি নিকটে আসিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন—"তুমি কে বাবা?" নৃপেন বলিল—"আমি পাশের মেসে থাকি, আমাকে চেনেন না। শুনলুম আপনার বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে,—টাকার জন্যে তার বিয়ে হচ্ছে না।" বিবাহের কথা শুনিয়া গিরি আরক্তমুখে ঘরের ভিতর ছুটিয়া লুকাইল।

কৃতান্তপত্নী। তুমি বুঝি সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ? কিন্তু বাবা, আজকাল মেয়ের বিয়ে দিতে ত কত টাকার দরকার। গিরি ত প্রতিমার মত সুন্দর,—স্বভাব চরিত্রের তুলনা হয় না, আর লেখা পড়ায় মা আমার সাক্ষাৎ সরস্বতী! তা হলে কি হয়, টাকা পাব কোথায়? তুমি পাড়ার ছেলে তোমায় বলতে আর দোষ কি,—কর্ত্তার টাকা যেন বুকের রক্ত,—বিয়েতে একটি পয়সাও দেবেন না।"

নৃপেন। "সেজন্যই এসেছি মা! পৃথিবীতে একজন পাগল হলে সঙ্গে সঙ্গে সবাই যদি পাগল হয় তা হলে পৃথিবীটাত পাগলা গারদ হয়েই দাঁড়ায়। এ বাড়ীর কর্ত্তা পাগল বলে অনেকে শুধু ঠাট্টা করে, কোনও রকম চেষ্টা করে বা সাহায্য করে যে একটা বিহিত করা তা করে না। আমি বলি এই লোকগুলাও পাগল। যারা লোকের বিপদে প্রতিকার কত্তে পারে না,কেবল দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসে তারা সম্পূর্ণ পাগল। এদেশে এমন পাগলার সংখ্যাই বেশী,—তাই দেশের এ অধঃপতন।

নিন্‌ ভিক্ষেসিক্ষে করে এ ক'টা টাকা যোগাড় করেছি, এখন আর কিছু সংগ্রহ করে যদি গিরির বিয়েটা দেওয়া যায়।—"

কৃতান্তবাবুর পত্নীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া আসিল, তিনি সজলনয়নে বলিলেন—"বাবা তোমরা কলেজের ছেলেরা দেবতা, তোমরা—"

নৃপেন বাধা দিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল—"হা কলেজের ছেলেরা দেবতা বৈকি! আজকাল কষাইর মত কাহারা কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগ্য বঙ্গীয় দরিদ্রের বক্ষে পণরূপে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দেয়, আজ কাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া নিরীহ বাঙ্গালী বালিকারা অকালে আত্মঘাতি হইতেছে, কাহাদের নির্ম্মম হৃদয়-হীন ব্যবহারে আজ বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে একটা নিদারুণ অভিশাপ জাগিয়া উঠিতেছে!—

গিরির মাতা দেখিলেন নৃপেণ ভীষণ উত্তেজিত হইয়াছে, তিনি বলিলেন—"বাবা, সে কথা বলে আর ফল কি? এ যুগে টাকারই সুধু আদর,—গুণ গৌরব, স্বভাব চরিত্র সব এক দিকে, আর টাকা এক দিকে। ভগবানের কৃপায় আমাদেরও টাকার অভাব ছিল না, কিন্তু এরূপ টাকা থাকার চাইতে না থাকা ঢের ভাল ছিল। যাক্‌ সে সব কথা। তুমি এসেছ বাবা, এখন একটু বস, বিশ্রাম কর। মা গিরি একটা পিড়ি এনে দেত?"

গিরি লজ্জাবনতমুখে একটা কাষ্ঠাসন গৃহের প্রাঙ্গণে আনিয়া পাতিয়া আবার ঘরের ভিতর যাইয়া লুকাইল। নৃপেন অবনত মুখে চাহিয়া দেখিল, যেন একটি জীবন্ত প্রতিমা বিদ্যুতের মত ঘরের ভিতর যাইয়া লুকাইল। ভাবিল আশ্চর্য্য, এমন মেয়েরও বর মিলে না,—পৃথিবীতে টাকাটা কি এতই লোভনীয়!

গিরির মাতা নৃপেনের কাছে স্বামীর কৃপণতা বিষয়ে অনেক আক্ষেপ করিলেন, একটি ছেলে ও একটিমাত্র মেয়ে। কৃপণতা করিয়া মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিলে সে টাকা থাকা না থাকাতে প্রভেদ কি। আশ্চর্য্য! লোকে ত নিজের পুত্র কন্যার সুখের জন্যই টাকা রোজগার করে। সে টাকা যদি তাহাদের সুখে না লাগিল, সুধু যক্ষের ধনের মত সারাজীবন বদি টাকা পাহারা দিতে গেল তবে সে টাকায় প্রয়োজন! দুদিন বাদে শমনসদনে তলব পড়িবে, অর্থ সঙ্গে যাইবে না, তবে ইহকালে অনাহারে অর্থ জমাইয়া ফল কি? কিন্তু কৃপণেরা এ সকল কোন বিষয়ই ভাবে না। সঞ্চয়ে তাদের সুখ,—এই পর্য্যন্ত।

গিরির মাতা বলিলেন—"বাবা সংসর্গের গুণে মানুষ পশু হয়, আবার পশুও মানুষের গুণ পায়। তোমরা সর্ব্বদা কাছে কাছে থেকে যদি এর স্বভাবটা শোধরাতে পার'?"

এমন সময় কৃতান্তবাবু "গিন্নি, গিন্নি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অন্দরে প্রবেশ করিল। গিরির মাতা উঠিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিলেন। কৃতান্ত দন্তপাটি বিকশিত করিয়া বলিল—"গিন্নি বুঝলে কিনা।" গিরির মাতা কিছুমাত্র উৎসাহিত না হইয়া বলিলেন "কি ?"

কৃতান্ত। "গিরির একটা সম্বন্ধ এসেছে। বর বল্‌ছে, বুঝ্‌লে কিনা, দু'হাজার টাকা নগদ দিবে, গিরিকে গা জোড়া গয়না দিবে। কি বল বেশ সম্বন্ধটা, বুঝ্‌লে কি না—করে ফেলি।" পিতার সাড়া পাইয়া গিরি আসিয়া দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। নৃপেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"বর টাকা দিয়ে বে' কর্‌বে ?"

কৃতান্ত। তা করে না! তবে বুঝ্‌লে কিনা খুঁজতে হয়, না খুঁজ্‌লে কি ভাল সম্বন্ধ মিলে। বুঝ্‌লে কিনা কত খাটছি সম্বন্ধের জন্য।" কৃতান্ত পত্নীকে নিম্নস্বরে বলিল—"এ কে ?"—অর্থাৎ এর কাছে বল্‌তে কিছু বাধা আছে কিনা। কি জানি যদি সম্বন্ধটি লুফে নেয়। গিরির মাতা বলিলেন—ছেলেটি আত্মীয়। গিরির বিবাহের জন্য পাঁচশ টাকা আমাদের দিচ্ছে।" কৃতান্তবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—"পা—চ—শ। তা—তা টাকাটা কই—দেখি।" গিরির মাতা স্বামীকে চিনিতেন, নৃপেনকে ইঙ্গিত করিয়া টাকা লুকাইতে বলিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"টাকা এখনো পায়নি। এত কাটা যোগাড় কত্তেও সময় লাগে।"

কৃতান্ত। "তা—তা যোগাড় হলে আমার হাতে দিও। কি জান টাকার কথা—চোর আছে,—বুঝ্‌লে কিনা জুয়াচোর আছে। কে কোন খান দিয়ে নিয়ে যায়, বুঝ্‌লে কিনা—কে জানে ? নৃপেন হাসিয়া মাথা নাড়িল। কৃতান্ত খুসী হইয়া বলিল—"বর বুঝ্‌লে কিনা নগদ—নগদ দু—হাজার দিবে বলেছে। বয়স একটু বেশী, ষাট হ'তে পারে—তা আট দশটি ছেলে পুলে আছে। তা সেত বুঝ্‌লে কিনা ভালই। লোকজন ঘরে না থাক্‌লে কি ভাল লাগে ? তার বড় নাত বউটি—বুঝলে কিনা গিরির সমান হবে। তখন,—বুঝলে কিনা বেশ হবে। গিরি তার সঙ্গে সই পাতাতে পার্‌বে।" কৃতান্তবাবু দন্ত বিকশিত করিয়া হোঃ হোঃ রবে হাসিতে লাগিল। গিরি

দ্বার ছাড়িয়া ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গিরির মাতা ও নৃপেনের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা প্রায় আগত। অস্তোন্মুখ রবির শেষ কিরণ রেখা কলিকাতার বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত অট্টালিকার গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া হাসিতেছে। সমস্ত নগরীময় একটী সুন্দর কমনীয় ভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এমন সময় রবি তাহার দ্বিতল কক্ষের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আনমনে কি ভাবিতেছিল। দূরবর্ত্তী ট্রামের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ সান্ধ্যমলয়ের সঙ্গে একএকবার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। নিম্নের রাজপথ পথিকদের আনন্দকোলাহলে মুখরিত, কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ রহস্যালাপ করিতেছে। রবি ভাবিতেছিল, ইহারা কত সুখী। সে যদি ইহাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিত। ঐ ত রাজপথ দিয়া কর্ম্মশ্রান্ত মজুরেরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিতেছে,—পরিধানে শতছিন্ন বসন, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদা,—তবু মুখে কেমন সুন্দর হাসি। কেন? এক আশায়, বাড়ী ফিরিয়া দেখিবে মাতা বা পত্নী স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। এই আশায়, এই সুখে এত কষ্টের ভিতরও তাদের এত আনন্দ। হায় সে যদি তাদের মত হইত। এই বিরাট বিশ্বে তাহার কেহ নাই। নিজের জীর্ণ কুটীরে শাকভাত খাইয়া যে সুখ, পরের স্বর্ণ প্রাসাদে উপাদেয় আহার্য্যে তেমন সুখ নাই। তাহাতে লোকে উপহাস করে, গলগ্রহ বলে। তাহার মনে পড়িল বাল্যে পড়িয়াছিল—

"রোগী, চিরপ্রবাসী, পরান্নভোজী, পরাবশথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ॥"

সহসা কাহার ডাকে রবি চমকিত হইল। কে নীচের রাস্তা হইতে ডাকিতেছিল—"রবি, রবি।" রবির মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, সে দ্রুতগতিতে ঘরের ভিতর যাইয়া লুকাইল। কিন্তু পরক্ষণেই সিঁড়িতে খট্ খট্ করিয়া জুতার শব্দ হইল,—রবির ঘরে আসিবার বাহির দিয়া সিঁড়ি ছিল। আগন্তুক আসিয়া ডাকিল "কিরে রবি এই বাড়ীতে থাকিস্? বেশ, বেশ,—বেশ মুরুব্বি পাকড়াও করেছিস্। রমাকান্তবাবু মস্ত ধনী,— তার সুনজরে পড়্‌লে চাই কি তোকে বড়লোক করে দেবেন।" রবির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল,—সে চুপ করিয়া রহিল। আগন্তুক

অতুল বলিল—"যাক্ মাঝে মাঝে তোর এখানে এসে আসর গুলজার করা যাবে,—কি বলিস্?" অতুল বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া ঘরের সাজসজ্জা দেখিতে লাগিল। দেওয়ালগুলি নীলবর্ণে রঞ্জিত, চারিদিকে বড় বড় আয়না টাঙ্গান। ঘরের মাঝখানে বসিলে চারিদিকে কেবল নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়,—ঘরটা লোকে পূর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়। দেওয়াল সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, যুদ্ধের ছবিও মহাপুরুষদের তৈলচিত্রে শোভিত। আজকাল যেমন অনেক বড়লোকের বাড়ী উলঙ্গ সুন্দরী মূর্ত্তিতে ঘর সাজান এক ফ্যাসান, রামকান্তবাবুর বাড়ীর গৃহসজ্জায় তেমন কদর্য্য রুচি দেখা গেল না। অথচ ছবিগুলি এত মনোরম যে ফ্যাসান দুরস্ত সোখীন ব্যক্তিরাও এরূপ সজ্জাকে নিন্দা করিতে পারে না। ঘরের মাঝখানে মার্ব্বেল পাথরের টেবিল, তাহাতে মকমলের আবরণ, চতুর্দ্দিকে গদী-আটা চেয়ার। একধারে সুন্দর আলমারীতে নানাবিধ পুস্তক। একটু দূরে একধারে বৃহৎ একটা অর্গেন। এই কক্ষটি রবির পড়িবার ঘর।

রবিকে নীরব দেখিয়া অতুল বলিল—"কি দাদা আগন্তুক এলাম, একটা মুখের কথাও বল্‌বে না। তাই ত লোকে বলে আজকাল বাঙ্গালাদেশ থেকে আতিথেয়তা উঠে গেছে। অভ্যর্থনা না করলে, দু'একটা গালা-গালি ও না হয় দাও, যেন লোকের কাছে বল্‌তে পারি—কথাটা বলেছিলে।

তাহার কথার ভঙ্গীতে অন্যে না হাসিয়া পারিত না, কিন্তু রবির মনের অবস্থা ভাল ছিল না, বিশেষতঃ অতুলের ব্যবহার তাহার কাছে বড়ই বিশ্রী লাগিল। রবির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

অতুল বুঝিল, বুঝিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে আসিয়াছে নিজের মৎলবে, যে প্রকারেই হউক এই বাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে, ইহাতে বাঁধা দেওয়া বোকা রবির অসাধ্য।

অতুল যাইয়া অর্গেনের কাছে বসিল। ডালা খুলিয়া, পা দিয়া বেলো করিতে করিতে রিডের উপর অঙ্গুলীর মৃদু আঘাত করিল,—অর্গেন মিঠা সুরে বাজিয়া উঠিল। অতুল ভাল বাজাইতে ও গাহিতে পারিত,—বাজাইতে বাজাইতে রবির দিকে চাহিয়া বলিল—"গাব, বাধা নেই ত!" রবির মনটা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। অতুল বায়ুস্বরে সুস্বর ছড়াইয়া গাহিল—

'—তব মুখ-ইন্দু শোভা ভূতলেতে অনুপম,
পুষ্পিত কুঞ্জ কানন নহে ও লাবণ্য সম।—'

সুর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া সমস্ত বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গীতের এমনই সম্মোহিনী শক্তি, বাড়ীময় সকলে সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইল। রমাকান্তবাবু, লীলা বিস্মিত হইয়া বহির্ব্বাটীর এই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—রবি ত কোনও দিন গাহেনা, আজ তাহার ঘরে কে গায়?

অতুল তন্ময় হইয়া গাহিতেছিল। যখন গান শেষ হইল, তখন দেখিল রমাকান্তবাবু একটা কৌচের উপর বসিয়া আছেন, পার্শ্বে বিদ্যুলতার ন্যায় সুশ্রী লীলা বসিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছে।

রমাকান্তবাবুর মুখের ভাব দেখিয়া বুঝা গেল, তিনি গান শুনিয়া সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি রবিকে জিজ্ঞাসিলেন "এ কে?" রবি ম্লান মুখে বলিল—"আমার সহপাঠী অতুল।" রমাবাবু তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি রবির সহপাঠী?" অতুল মাটীর দিকে তাকাইয়া হাতের নথ খুটিতে খুটিতে বলিল "আজ্ঞে হাঁ।"

রমাবাবু। "তুমি তো বেশ গাইতে বাজাতে পার।"

অতুল স্মিতমুখে ঈষৎ হাসিল। রমাবাবু বলিলেন—"তুমি রবির সহপাঠী, তখন তোমার এখানে আস্‌তে বাধা কি। তুমি রোজ রোজ এসে লীলাকে বাজনা শেখাবে। কেমন, কোন আপত্তি নেই ত?" অতুলও ইহাই চায়, ধীরে ধীরে বলিল—"আজ্ঞে আচ্ছা।" রমাবাবু বলিলেন—যখন ইচ্ছা এস, কোন সঙ্কোচ কর না।" রবির হৃদয়ে আরও অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অল্পদিনের ভিতরই অতুল রমাকান্তবাবুর পরিবারে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইয়া ফেলিল। এই সদাপ্রফুল্ল, হাসিমুখ, সুশ্রী চটপটে যুবকটির বাহ্যিক ব্যবহারে এমন মাদকতা ছিল যে, যে তাহার সহিত মিশিত সেই মুগ্ধ হইত,—সে আর তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না। অতুল লীলাকে সুন্দর সুন্দর রহস্যজনক গল্প বলিয়া, গান শুনাইয়া এমন মুগ্ধ করিল যে অতুল একদিন না আসিলে লীলা অস্থির হইয়া পড়িত। ইদানীং রবির ব্যবহার এত গম্ভীর, এত

কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল যে বালিকা আর তাহার কাছে ঘেঁসিতে চাহিত না।

প্রত্যহ অতুল আসিত, অর্গেন বাজাইয়া গাহিত,—লীলা পার্শ্বে বসিয়া মুগ্ধ ভাবে শুনিত, আর রবির হৃদয়ে দাবানল জ্বলিয়া উঠিত, সে হিংসায় অস্থির হইয়া উঠিত। কিছুদিন পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল—আর লীলার সহিত মিশিবে না। রাস্তার ভিক্ষুকের ঐরূপ রাজকন্যার সহিত মিশা শোভা পায় না, এবং ইহা স্থির করিয়া দূরে দূরে থাকা আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু অতুলের আগমনে আবার ঐ প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল। তাহার মনে হইল—লীলা কেন অতুলের সঙ্গে মিশে? একমাত্র তাহার সঙ্গে ছাড়া লীলার আর কাহারো সঙ্গে মিশিতে নাই। কেন নাই, লীলা তাহার কে, এই সকল ভাবনা ভুলিল। তাহার মনে হইল—লীলা একমাত্র তাহারই।

রবি হৃদয়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিলে স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, লীলাকে অতুলের সহিত মিশিতে বারণ করিবে। কিন্তু রমাকান্তবাবু যে অতুলকে আসিবার অনুমতি দিয়াছেন। এখন অতুলকে বারণ করা যায় কিরূপে, বারণ করিলেই বা অতুল তাহার কথা গ্রাহ্য করিবে কেন,—সে এ বাড়ীর কে?

অনন্যোপায় হইয়া রবি লীলাকে অতুলের সঙ্গে মিশিতে বারণ করিবে স্থির করিল। অতুল ত লীলার জন্যই এখানে আসে, লীলা না মিশিলে সে আপনা আপনিই সরিয়া যাইবে। কিন্তু লীলাকে বলিতেও কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। কি অজুহাতে তাহাকে অতুলের সহিত মিশিতে বারণ করিবে! অতুলও ত ভদ্রলোকের ছেলে, সেওত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান সুশ্রী যুবক। যদি লীলার কোনও যুবকের সহিত মিশা দূষণীয় হয়, তাহা হইলে রবি নিজেও ত যুবক, কিন্তু রবি ভাবিল তাহার সহিত আর কাহারও তুলনা হয় না। তার ন্যায় আপনার লীলার কে আছে? কে এমন তাহার জন্য অকাতরে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিবে, কে এমন তাহার দুঃখে কাঁদিতে পারিবে? কিন্তু এ সকল ভাবিলে কি হয়, লীলাকে কিছু বলা হইল না। সরলা বালিকা অবাধভাবে অতুলের সহিত মিশিতে লাগিল ও তাহার ফলে তাহার প্রতি একটু একটু করিয়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন অতুল ঠিক করিল, লীলাকে লইয়া চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে

যাইবে। রমাকান্তবাবু তাহাতে অনুমতি দিলেন। বৈকালে তাহারা মোটরে করিয়া যখন বাহির হইবে, তখন রবি দেখিল। একদিন অতুলের সংসর্গে গান বাদ্য ও স্ফূর্তিতে মত্ত থাকায় লীলা রবির খোঁজ করিতে ভুলিয়াছিল, রবির সহিত তাহার যে কোন পরিচয় ছিল বাহিরের ব্যবহারে তাহাও বুঝা কঠিন। আজ সহসা রবির সহিত চোখোচোখি হওয়াতে লীলার তাহার কথা মনে পড়িল। অতুলকে বলিল—"রবি-দাকে ডেকে আনি—কেমন ?"

অতুল রবিকে আনিতে অনিচ্ছুক, বলিল "সে আসিলে মোটেই আমোদ হবে না। রবি পেঁচার মত মুখ ফুলিয়ে বসে থাকে, তাতে কি আর আমোদ হয়। সে থাক্।" অগত্যা লীলা আর ডাকিল না। রবি উপর হইতে সব শুনিল, শুনিয়া ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তার পর ঘরের ভিতর যাইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

সে দিন হইতে রবি লীলার সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। কথা-বার্ত্তা পূর্ব্বেই প্রায় বন্ধ হইয়াছিল, এখন একদম বন্ধ হইয়া গেল। রবির ভাব দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিতে লীলার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত। রবিও লীলাকে দেখিলে মুখ ফিরাইত, পথে পড়িলে ফিরিয়া দাঁড়াইত।

এইরূপে কয়মাস গেল। চিন্তা করিয়া, কাঁদিয়া বাকি সময়টা একটু আধটু পড়িয়া রবি বি এ পরীক্ষা দিল, কিন্তু অনারে প্রথম হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ ভাবে পাশ হইল মাত্র। অতুল পাশ হইল না,—সে জন্য সে দুঃখিত হইল না। লীলাকে সে আপন করিয়া ফেলিয়াছে,—লীলার সহিত বিবাহ হইলে তাহার অগাধ পিতৃধনে সারাজীবন বাবুগিরি করিয়া কাটাইতে পারিবে, ইহাই জীবনের চরমসুখ, আর কিছু সে চাহে না। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যই লেখা পড়া করা, সেই বন্দোবস্ত যদি হইল, তবে আর মিছামিছি লেখাপড়ার জন্য কে কষ্ট করে? * * *

তাহাদের গান বাজনা, বেড়ান, হাসি গল্প এই কমাসে লীলারও যেন একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল, সে অতুলের ভাবে মসগুল হইয়া পড়িল। রবির মনে হইল লীলা অতুলকে ভালবাসিয়াছে। রবি পাগল হইল। সে দিন সন্ধ্যার সময় লীলা যখন তাহার ঘরে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছিল, রবি যাইয়া কম্পিতস্বরে বলিল "লীলা একটি কথা।" লীলা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি কথা রবি-দা ?" কদিন যাবত রবির ব্যবহারটা তাহার নিকট বড়ই প্রহেলিকাময় ঠেকিতেছিল অস্ফুটস্বরে রবি জিজ্ঞাসিল—"আচ্ছা তুমি

আমার ও অতুলের ভিতর কাহাকে বেশী ভালবাস?" সরলা বালিকা কিছু না বুঝিয়া বলিল "তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছ, তোমাকে ভয় করে,—অতুলকে ভাল লাগে সে কেমন হাসে, গল্প করে।" "অ্যাঁ" রবি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল,—ভীত লীলা দেখিল রবির চোখ দুটা জবাফুলের ন্যায় লাল হইয়াছে—সে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। রবি উন্মাদের মত বলিতে লাগিল "হ্যা—ঠিক। আর কেন?" * * পরদিন রবিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না; বাড়ীর সকলে বিস্মিত ও চিন্তান্বিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নৃপেন ও গিরির মাতা শত বুঝাইয়াও কৃতান্তবাবুকে তাহার প্রতিজ্ঞা হইতে টলাইতে পারিল না। মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের ভয়ঙ্কর চিত্র, নিদারুণ বৈধব্য, আ-জীবন হৃদয়ভেদী হাহাকার, আর্ত্তনাদ, ও শোচনায় মৃত্যুর কথা কিছুতেই অর্থগৃধ্নু কৃপণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিল না। কৃতান্ত নগদ দুই হাজার টাকা হাতে গুণিয়া লইয়া সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিল। বর এক পেন্সন প্রাপ্ত বৃদ্ধ সবজজ্। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স চল্লিশ হইবে; গিরির বয়স বৃদ্ধের নাতনীর সমান। বৃদ্ধের নাম রামরাম গুহ, বাড়ী মনসাপুর। তাহার পুত্র পৌত্র ও আত্মীয়বর্গ বিবাহ ভাঙ্গাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে, তাই বৃদ্ধ তৃতীয় পত্নী বিয়োগের ছমাসের ভিতরও আর সম্বন্ধ জোগাড় করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত জলধরচন্দ্রের সহিত রামরাম গুহের পরিচয় ঘটে। জলধরের মুখে কৃতান্তের সুন্দরী কন্যার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখে লালা ঝরিতে লাগিল। বৃদ্ধ জলধরকে বলিল, এ সম্বন্ধ পাকা করিতে পারিলে তাহাকে নগদ এক হাজার দিবে। জলধর বাপের বয়সে এত টাকা দেখে নাই,—আনন্দে আটখানা হইয়া কৃতান্তের নিকট সম্বন্ধ উত্থাপন করিল। 'অতবড় হাকিম ভূভারতে আর জন্মায় নাই। অমন চেহারা—ইয়া নাক, ইয়া ভুরু, ইয়া কান, ইয়া দাঁত—পৃথিবীতে অন্য কোন লোকের নাই—এমনতর জামাতা সাতজন্মের তপস্যাতেও মিলে না। আর বাবুটি কি মুক্তহস্ত, নিজ মুখে দেড় হাজার নগদ দিবেন বলেছেন।' কৃতান্ত মজিয়া গেল। দাম চড়াচড়ি করিয়া দু হাজারে রফা করিল। জলধর যাইয়া রামরামবাবুকে বলিল "চার হাজারের এক পয়সা কমে কৃতান্তবাবু রাজি হইল না। বলে আমার সোনার মেয়ে বুড়োর হাতে দিব না।"

তিনি বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইলেন। পাঁচ হাজার নগদ জলধরের হাতে দিলেন। জলধর নিজের মজুরী ১০০০৲ জুয়াচুরি ২০০০৲ রাখিল, বাকি ২০০০৲ কৃতান্তের হাতে দিল। বিবাহ এক সপ্তাহের ভিতর স্থির হইল—কেন না 'শুভস্য শীঘ্রং'। গিরি কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইল, ভগবানের উদ্দেশে কত প্রার্থনা জানাইল, গিরির মাতা শালগ্রামের নিকট মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। নৃপেন মেসের ছেলেদের সহিত কি একটা পরামর্শ আঁটিয়া গিরির মাকে আসিয়া বলিল। গিরির মাতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, কৃতজ্ঞতাপূর্ণস্বরে বলিল "বাবা ভগবান্ তোমাদের সুখী করুন, দীর্ঘজীবি করুন; কিন্তু দেখো বাবা তাকে যেন কোন কষ্ট দিও না।" নৃপেন অবাক হইয়া ভাবিল "আশ্চর্য্য বঙ্গনারী! এমন স্বামীর উপরও এত শ্রদ্ধা ভালবাসা!"

ক্রমে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। কৃতান্ত আত্মীয় বান্ধুবান্ধবদের ভিতর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিল না। ২০০০৲ টাকা পূর্ব্বেই তাহার সিন্ধুকের ভিতর আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। বিবাহের দিন বৃদ্ধ রামরাম জলধর সমভিব্যহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। শূলব্যথায় ভুগিতে ভুগিতে বৃদ্ধের অস্থি-চর্ম্ম সার দেহ, দৃষ্টিশক্তি একবারে ক্ষীণ, একটু দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না, হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে। তবু তাহার বিবাহ করিবার সখ। এমন বৃদ্ধ ত আমাদের দেশে কত আছে,—তাহারা কৃতান্তের মত পশুস্বভাবাপন্ন বাপকে টাকা দ্বারা ভুলাইয়া কত সোণার প্রতিমা পুড়াইয়া ছাই করে। একটা প্রেমপূর্ণ হৃদয়, যাহা দ্বারা পৃথিবীর কত উপকার হইত, যে স্নেহধারা পাইয়া পৃথিবীতে কত প্রাণী ধন্য হইত—সেই হৃদয় ভস্মে পরিণত করে! হায় এ দেশের কি অধঃপতন! এ বিষয়ে কত রসিক লেখক কত ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন, কত মনীষী চোখের জলে ভাসিয়াছেন—হায় তবু কি দেশের লোকের চক্ষু ফুটিবে না!!

বালিকা গিরি একবার স্থির করিল আত্মহত্যা করিবে, কিন্তু পারিল না। পৃথিবীর আকর্ষণ কি এত সহজে ছিন্ন করা যায়! এমন স্নেহময়ী জননী,—সারা বিশ্ব খুঁজিলেও ত অমন হৃদয় মিলিবে না। তার পর আর একজন প্রতিদিন আসিয়া মুগ্ধনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, সেই স্নিগ্ধ আঁখি দু'টির অচঞ্চল দৃষ্টি, সেই দেবোপম মূর্ত্তি, তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, মরিলে ত তাঁহাকে আর দেখা যাইবে না। গিরির মরিতে ইচ্ছা হইল না, তবু ত বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আরো মনে হইল, তিনি

যখন সে বিবাহ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন পারিবেনই। পৃথিবীতে তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে কি আছে! তার পর যদি—যদি তাঁহার সহিত—বালিকা আর ভাবিতে পারিল না, এক মধুর আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। নিজের কথা, বিবাহের কথা, পৃথিবীর কথা সব ভুলিল।

এমন সময় নৃপেন আসিয়া ডাকিল—"গিরি।" গিরির মনে হইল যেন সহসা তাহার কাণে বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল, সে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে তাহারই জাগ্রতে স্বপ্নে চিন্তার ধন। প্রাণের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া নতমুখে বলিল—"কি ?" নৃপেন তাহার মুখের দিকে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া বলিল—"তোমাকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব, এখন ভগবানের ইচ্ছা। তুমিও ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কর, আমার চেষ্টা যেন সফল হয়।" গিরি মনে মনে বলিল—"দেবতা আমার, তুমি ছাড়া আমায় আর কে রক্ষা করবে।"

ইতিমধ্যে নৃপেন বিবাহের জন্য অনেক ভাল পাত্র খুঁজিয়াছিল। কিন্তু অল্পটাকায় দুএকটি ভাল পাত্র যদিও বা বিবাহে স্বীকৃত হইল, তাহাদের পিতা মাতা এরূপ সম্বন্ধে মত দিল না। "এম্, এ, পাশ, বি, এ, পাশ ছেলে তাহার বিবাহে ৫।৭ হাজার না নিলে লোকে বলিবে কি! লোকের কাছে মুখ দেখান যাইবে না!—" কি আত্মসম্মান বোধ! * *

তখন নৃপেন অন্য মৎলব করিল। সে পিতৃহীন, নিজেই নিজের মুরব্বি। যথাসময়ে বৃদ্ধ বর আসিয়া বিবাহআসরে বসিল। মেসের ছেলেরা পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া খাটিতেছিল। তাহারা কাহারও নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে নাই। বরের কুলপুরোহিত সঙ্গে আসিয়াছিল; সে মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। কৃতান্ত মেয়ে সম্প্রদান করিতে বসিল। এত বিনা বাধায় কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে, সে কল্পনা করে নাই। বুড়ার কাছে বিবাহ দিতে পত্নী একটুকুও কান্নাকাটি করিল না, আশ্চর্য্য!

পুরোহিত হাঁকিল,—"ক'নে আনা হউক।"

বৃদ্ধ বরের বুকটা নাচিয়া উঠিল, আনন্দে তাহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কয়েকটি ছেলে যাইয়া বিবাহবেশে সজ্জিতা গিরিকে পিড়িশুদ্ধ তুলিয়া আসরের দিকে আনিল। গিরি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কাতরপ্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল,—হায় ভগবান্ বুঝি দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনিলেন

না। যূপকাষ্ঠ-বদ্ধ ছাগশিশু যেমন বলির পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ভীত রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, গিরিও তেমনি নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে পিড়ির উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাহাকে নামাইয়া কয়েকটি ছেলে তাহার মাথায় জল ঢালিতে লাগিল, বাতাস করিতে লাগিল। * * *

এদিকে যখন এই গণ্ডগোল, ওদিকে তখন আর এক কাণ্ড ঘটিল। কয়েকটি মুখোসপরা লোক আসিয়া বর, পুরোহিত ও ঘটককে শূন্যে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। কৃতান্ত হা হা করিয়া উঠিল। মুখোসপরা লোকেরা লাঠি ঘুরাইয়া বলিল,—"চুপ রও। গোলমাল করিলে মাথা ভাঙ্গব।" অগত্যা কৃতান্ত চুপ করিল। মুখোসপরা লোকগুলি প্রস্থান করিলে পর কৃতান্ত নৃপেনকে বলিল,—"এখন উপায়। আমার যাতি যায় যে।" ধীরেণ বলিল,—"মশায়, ঠাকুর্দ্দার সমান বুড়োর কাছে মেয়ের বিবাহ দিলে জাতি যায় না, মেয়ে আইবুড়ো থাকলে জাতি যায়, অমন জাতি থাকার চেয়ে যাওয়া ভাল।" কৃতান্ত হাত কচলাইতে কচলাইতে কাতরস্বরে বলিল,—"একটা বিহিত করে তোমরা আমায় রক্ষা কর।" ধীরেন বলিল,—"তা পাড়ার লোক ডেকে এনে বলি, তোমরা বাগ্‌দত্তা কন্যার 'জামা' বিবাহ না করে চলে গেছে।" কৃতান্ত কাঁদিয়া বলিল,—"রক্ষা কর আমায়,—একশ টাকা দেব তোমাদের।"

যুবকেরা বলিল,—"উহুঁ দুশ' টাকা দিন্, এ আনন্দের দিনে আমরা কিছু খাব।" কৃপণ আর কোন ভয় রাখুক আর না রাখুক, সমাজের ভয় রাখিত (যেমন সকলেই রাখে) দেড়শ টাকা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম।"

সত্যেন, ধীরেন প্রভৃতি ছুটাছুটি করিয়া পুরোহিত ডাকিল, বাদ্যকর ডাকিল,—শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি সহ গিরির সহিত নৃপেনের বিবাহ হইয়া গেল।— নির্ব্বিঘ্ন!

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ ক'দিন হইল রবি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রমাকান্তবাবু ও তাঁহার পত্নী রবিকে আপন ছেলের মত ভালবাসিতেন এবং লীলা একটু বড় হইলে রবির সহিত তাহার বিবাহ দিবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। রবি এইরূপে নিরুদ্দেশ হওয়াতে তাঁহাদের বড়ই ভাবনা

হইল। তাহারা কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। লীলাও অতুলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের সহিত কোন মনোবাদ হইয়াছে কি না, কিন্তু তাহাদের কথাতে সেরূপ কোনও ভাব বুঝা গেল না।

রমাবাবু রবির খোঁজে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। রবির দেশ নীলসাগরে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন যে রবির সংবাদ দিতে পারিবে, তাহাকে দুই হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন, কিন্তু কোনও খোঁজ পাইলেন না।

অতুল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, লীলা ক'দিন বসিয়া বসিয়া ভাবিল। অতুল লীলার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া প্রত্যহ আসিতে লাগিল,—গল্প করিয়া, তাহাকে লইয়া বেড়াইয়া তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। কিন্তু লীলা আর পূর্ব্বের মত প্রফুল্লিতা হইল না।

এইরূপে কয়বৎসর কাটিয়া গেল। লীলা যৌবনে পদার্পণ করিল। রমাকান্তবাবুর স্ত্রী লীলার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রমাকান্তবাবু রবির খোঁজে হতাশ হইয়া দমিয়া পড়িলেন।

অতুল বুঝিল এই উপযুক্ত সময়। সে একদিন রমাবাবুর স্ত্রীর কাছে কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিল,—"লীলা তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সেও লীলাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। কাজেই এই বিবাহ হইলে উভয়পক্ষই সুখী হইবে। অতুলের ব্যবহারে রমাবাবুর পত্নী তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি স্বীকৃতা হইলেন ও রমাবাবুকে ধরিয়া পড়িলেন। রমাবাবু বলিলেন,—"আর কিছুদিন রবির খোঁজ করিয়া দেখিয়া যাহা হয় করিব।" অগত্যা সকলেই ক্ষান্ত রহিল।

একদিন লীলা বসিয়া নিজের ঘরে একটা ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী পড়িতেছিল। এখন সে ষোড়শবর্ষবয়স্কা যুবতি। প্রণয় ও ভালবাসা সকলি বুঝিতে পারে। পড়িতে পড়িতে সমবেদনায় তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু দুটি জলে পূরিয়া আসিল। সে বহি বন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে উদাস নয়নে চাহিল। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া আবার বহি খুলিল, সহসা বহির পাতায় একটা চিঠী দেখিতে পাইল। রবির হস্তাক্ষর। কম্পিতহস্তে চিঠীখানা খুলিল,—চিঠী তাহাকে সম্বোধন করিয়াই লিখিত। চিঠীতে তিনবৎসর পূর্ব্বের তারিখ। লীলা কক্ষের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া চিঠী পড়িতে বসিল। রবি লিখিয়া গিয়াছে ——

"লীলা, চলিলাম,—কোথায় চলিলাম জানি না, এ হতভাগ্যের আবার পৃথিবীতে স্থান কোথায় ? শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয়হীন, এই বিরাট পৃথিবীতে আমার 'আমার' বলিবার কেহ নাই। সংসারের তাচ্ছিল্য অবহেলার ভিতর নিষ্পেশিত' হইতে হইতে একপ্রকার জীবনের খেয়া বাহিয়া চলিয়াছিলাম, এমন সময় তোমার বাবা আমায় ধূলায় কুড়াইয়া পান।

দয়ালু মহাপুরুষ এই পাপীকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পরিবারে স্থান দেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তাহার সেই সরল বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। পাপিষ্ঠ, রাস্তার সেই ঘৃণিত পদদলিত কীট, নন্দনকাননের পুষ্পকে ভালবাসিয়া ফেলে। অবশ্য সে জন্য তাহাকে দোষী করিতে পার না,—অমন সুন্দর স্বর্গীয় ফুল দেখিলে পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে। আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মজিলাম, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে দিলাম না। শুভ্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশায় যখন সে তাহার কুসুমতুল্য দেহখানি আমার হাটুর উপর হেলাইয়া বলিত—'রবি-দা একটি গল্প বল,' তখন আমি মুগ্ধচিত্তে কত কি অর্থহীন অসংলগ্ন গল্প বলিতাম, তাহা অন্য কেহ শুনিলে আমাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া সন্দেহ করিত। তারপর সন্ধ্যা প্রভাতে তাহার মুখপানে চাহিয়া কত সৌন্দর্য্য দেখিতাম। এক একবার মনে হইত তাহার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব,—আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু পারিতাম না। কি এক আকাঙ্ক্ষা আমার হাত দু'টাকে বাঁধিয়া রাখিত। ...তারপর সংক্ষেপে বলি, একদিন জানিলাম, সেই স্বর্গের কুসুম এই হতভাগ্যকে ভালবাসে না। আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিড়িয়া গেল, মনে হইল সমস্ত বিশ্বটা যেন কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে রসাতলের দিকে চলিয়াছে।... তখনি গৃহত্যাগ করিলাম, করিয়া কোথায় চলিলাম জানি না। এ জীবনে তোমায় আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ। কোনও দিন রবিনামে তোমার কেহ পরিচিত ছিল, ভুলিয়া যাইও। এই হতভাগ্যের জন্য কাঁদিও না, তোমার চোখের জল আমি সহ্য করিতে পারিব না,—তাহা আমার বুকে বজ্রের অধিক বাজে। আমার দগ্ধ আত্মার জন্য প্রার্থনা করিও।* * *" * *

লীলা একবার, দু'বার, তিনবার চিঠীখানি পড়িল। স্বচ্ছ স্ফটিক-সলিলা তড়াগের নিম্নস্থ মৃত্তিকা যেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় লীলা আজ রবির হৃদয় তেমনি পরিষ্কার দেখিতে পাইল। রবি কেন গৃহত্যাগ করিয়াছে, ইদানীং তাহার ব্যবহার কেন এত প্রহেলিকাময় হইয়া-

ছিল, লীলা এখন তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিল। এতদিন সে বালিকা ছিল, তাই রবির ব্যবহারে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, আজ বুঝিবার বয়স হইয়াছে। লীলা সব বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। রবিকে সেত বরাবরই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে,—সে ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ। অন্তঃস্রোতা স্রোতস্বিনীর ন্যায় সে প্রেম-স্রোত হৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, উপরে তাহা প্রকাশ পায় না। কিন্তু তাহা রবি বুঝিল না কেন? সে কেন অন্যরূপ ভাবিল। বালিকা বয়সে সকলেই কৌতুকপ্রিয় থাকে। এই স্বাভাবিক প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া রহস্য গল্প করিবার লোক পাইলে তাহার দিকে একটু ঝুকিয়া পড়ে। ইহাতে সন্দেহ করিবার, রাগ করিবার কি আছে?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন নিজের ভিতর গাম্ভীর্য্য আসে, তখন আবার ইহা ভাল লাগে না। রবি যদি ইহা ভাবিয়া দেখিত, তাহা হইলে কোন গোল ঘটিত না। তাহা না করিয়া সে ভ্রূকুটি করিত, মুখ ভার করিত, নিজের ভাব নিজেই মনে বুঝিয়া রাখিত,—বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিত না, ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে সরিয়া থাকিত। আজ লীলার সে কৌতুকপ্রিয়তা দূর হইয়াছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবেও একটু গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে,—এখন আর অতুলের সংসর্গে তেমন লাগে না। পুরুষের ভিতর যেমন গাম্ভীর্য্য, আত্মনির্ভরতা, সারল্য থাকা দরকার, অতুলের তাহা ছিল না। অতুল কুটীল, স্বার্থান্ধ। এখন লীলার মনে হইল, এই অতুলের জন্যই রবি গৃহত্যাগী হইয়াছে। অতুল না আসিলে রবির হৃদয়ে কোনও সন্দেহ হইত না,—রবি গৃহত্যাগ করিত না। লীলার মনে হইল, অতুল কেন এখানে আসে, উহার কি স্বার্থ!

আজ রবির পূর্ব্ব অনুরাগ ফিরিয়া আসিল। অতীত ঘটনাগুলি স্মৃতিপথে জাগিয়া লীলাকে সুতীক্ষ্ণ শূলের মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। হায় রবি কোথায়, তাহার সহিত কি আর দেখা হইবে না! রবি ছাড়া যে তাহার জীবন অন্ধকার ময়,—আর কি জীবনে আলো জ্বলিবে না!? ভগবান্, করুণা কর। লীলা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ক'মাস যাবৎ ইংরাজী বাঙ্গালা সমস্ত পত্রিকাতে শ্যামপুকুরের স্কুলের হেডমাষ্টার সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইতেছিল।—"এমন দানশীল, দয়ালু, লোক আজকালকার ভিতর আর জন্মে নাই। তিনি মাসিক একশত টাকা

বেতনের ভিতর নিজের দুমুষ্টি খাবার আন্দাজ রাখিয়া বাকি টাকা দান ধ্যান' করেন। দরিদ্র বালকদিগকে পড়ার সাহায্য করা, পীড়িত ব্যক্তির সেবার ব্যবস্থা করা, ভিক্ষুদিগকে আহার্য্য দান, কন্যাদায়গ্রস্ত' ব্যক্তির কন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদিতে তিনি সমস্ত অর্থ অকুণ্ঠিতভাবে ব্যয় করেন। প্রতিমাসে এত কাতর প্রার্থনা তাঁহার কাছে আইসে যে, ঐ অল্প টাকায় সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয়। তাই সময় সময় তিনি ছদ্মবেশে মুটে মজুরের মত অন্যের মোট বহিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর পুস্তক লিখিয়াছেন,—ম্যাকৃমিলন কোম্পানি অনেক টাকায় সেই গ্রন্থগুলি কিনিয়া নিয়াছেন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সমস্ত অর্থ শ্যামপুকুরের উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন। শ্যামপুকুর ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে,—আসে পাশে কোন দাতব্য চিকিৎসালয় নাই, ভাল ডাক্তার নাই। দেশে বড়লোক অনেক, কিন্তু গরীবের কাতর ক্রন্দনে এ পর্য্যন্ত তাহাদের পাষাণ হৃদয় গলে নাই। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় স্বীয়কষ্টে লব্ধ অর্থে দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন। তাঁহার এরূপ মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের লাট বাহাদুর সেপ্টেম্বর মাসে স্বয়ং শ্যামপুকুরে যাইয়া হেড্‌মাষ্টারকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, হেড্‌মাষ্টার ভিন্ন দেশীয় লোক অথচ এখানকার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।"

রমাবাবু একদিন এই সংবাদ পড়িতেছিলেন। পার্শ্বে লীনা বসিয়াছিল, বলিল "লোকটি বাস্তবিক মহানুভব। যে ব্যক্তি দরিদ্র, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে, তাহার পক্ষে নিজে না খাইয়া লব্ধ অর্থ দুহাতে বিলান কম শ্লাঘার কথা নহে।" রমাবাবু হাসিয়া বলিলেন "তাদের পক্ষে দান করাটাই বেশী স্বাভাবিক লীনা। ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ কি ব্যথিতের ব্যথা বুঝে? তাই কোন কবি বলিয়াছেন—

"—চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

যে ব্যক্তি চিরকাল সুখের ক্রোড়ে লালিত, সে কি কখন অন্যের দুঃখের কথা বুঝিতে পারে। তার মনে হয় সবাই বুঝি তার মত সুখী।"

লীনা বলিল,—"তবে তুমি কি করে বোঝ বাবা?" রমাবাবু বলিলেন,—সে কথা আমি এতদিন বলিনিরে পাগ্‌লী। আমিও আগে গরীব—ভয়ঙ্কর

গরীব ছিলাম। এমন অবস্থা গেছে যে, এই আমিই একদিন খাবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি।"

পিতার জীবনের অতীত কথা শুনিয়া লীলার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। রমাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"থাক্ মা, শুনে কাজ নেই।" লীলা বলিল,—"না বাবা বল, আর কাঁদ্‌ব না।" রমাবাবু বলিতে লাগিলেন,—"জ্ঞান লাভ করে অবধিই আমি নিজকে পৃথিবীতে নিরাশ্রয় ভাবে ভাস্‌তে দেখিছি। পূর্ব্বে আমার কে ছিল কোথায় ছিল, কিছুই ঠিক কর্ত্তে পারি নি। কেবল যেদিন, বড়লোক হবার পর আত্মীয়স্বজনেরা দলে দলে এসে পরিচয় দিতে লাগ্‌লেন, আমি তোমার পিসতুতো ভাই, আমি খুড়ো, আমি আমি!! ·····অদৃষ্টের লেখা কেউ খণ্ডন কর্ত্তে পারে না। ছেলেবেলা এক ভদ্রলোকের বাড়ী বাজার সরকারের কাজ কর্ত্তাম। একদিন বাবু ৫৲ টাকার বাজার আনিতে দেন। কি মতি হ'ল গঙ্গার ঘাটের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেম। এক নৌকা করকচ নীলামে ৫৲ টাকায় কিন্‌লাম। বাড়ীতে এনে দেখি করকচের সঙ্গে দেদার সাচ্চা মুক্তা। বাবুকে দিলাম। বাবু একপয়সাও নিলেন না, বল্লেন—"ও তোমার বরাতে পাওয়া, তুমি নাও।" বাবু তা বিক্রী করে বিশ হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন 'কারবার কর।' অদৃষ্টের পরতা লাগল, লবণের কারবারে লাখপতি হলেম। বাবুরও ছেলেপুলে বা আত্মীয় আর কেউ ছিল না। মর্‌বার সময় তাঁর সব আমায় দিয়ে গেছেন।..." উপকারী মহানুভব মুনিবের কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

তিনি মৃতের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আজ কাল্‌কার দিনে ওরূপ উদার-হৃদয় মনিবও পাওয়া কঠিন। এখন যেন পৃথিবীটা ক্রমেই কুটীল, স্বার্থান্ধ হয়ে পড়্‌ছে। পরকে ঠকাবে সে আর বেশী কথা কি,—মায়ের পেটের ভাই মায়ের পেটের ভাইকে ঠকিয়ে ঘরে বসে ভাত মাখন খান।—কি কঠিন হৃদয়!—"

লীলা বলিল,—"আমিও ভাবি বাবা, আর ক'বছর পর পৃথিবীর কি দশা হবে!"...এমন সময় দারোয়ান আসিয়া রমাবাবুর হাতে একটা চিঠি দিয়া গেল। তিনি খুলিয়া পড়িলেন,—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আপনার অপরিচিত হইলেও একটী জরুরী সংবাদ লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি।

আপনি রবিকুমার বন্ধুর খোঁজ জানিবার আশায় পূর্ব্বে একবার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। আমি সম্প্রতি তাহার খোঁজ জানিতে পারিয়া জানাইতেছি। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মহামান্য লাট বাহাদুর শ্যামপুকুরের দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিতে যান। লাট বাহাদুরের সঙ্গে আমিও গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, হেড মাষ্টার আমার সহাধ্যায়ী রবিকুমার।—"

রমাবাবু থামিলেন, আনন্দে তাহার মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া গেল।

রমাবাবু পড়িতে লাগিলেন—"আমি তাহাকে আপনার কথা বলিলাম, তাহার সাক্ষাতের জন্য আপনি কেমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন জানাইলাম; কিন্তু তিনি আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন আর দেশে ফিরিব না। জীবনের বাকি অংশটা এম্নি কাটাইব। আমি পীড়াপীড়ি করাতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। জানিনা তাহার হৃদয়ে কিসের দুঃখ, কেন তিনি এ কচি বয়সে আপনাকে পরের জন্য বিলাইয়া দিয়াছেন। .."

এখন আপনি একবার চেষ্টা করিতে পারেন। খবরটা জানান একটা কর্ত্তব্য বিবেচনা হওয়ায় মহাশয়কে জানাইলাম। ইতি—

বিনীত—

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ।—

রমাবাবু চিঠিপড়া শেষ করিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন—"বাস্তবিক হৃদয়ে দাগা না পাইলে কেহ পরের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিতে পারে না।" লীলা আনন্দের আতিশয্যে একটা অর্থহীন উত্তর দিয়া ফেলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন একটি কক্ষে রমাকান্তবাবু, তাঁহার স্ত্রী, লীলা ও অতুল বসিয়াছিলেন। রমাকান্তবাবু বলিলেন,—"এবারে লীলার বিবাহের আয়োজনটা করা যাক।" তাঁহার স্ত্রী বলিলেন,—"তবু যা'হো'ক তোমার এতদিনে যে এ ইচ্ছাটা হ'ল।" লীলা লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেল। অতুল আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিল,—"হা লীলার বয়স হয়েছে—মেয়েদের এ বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত।"

রমাকান্তবাবু বলিলেন.—"আমারও সেই মত। তবে এতদিন দেইনি একটি কারণে। এখন সে কারণ আর নেই, এখন নিশ্চিন্তমনে বিয়ে দেওয়া যাবে।" উৎসাহিতভাবে অতুল বলিল,—"তা আমি ত মাকে পূর্ব্বেই

বলেছিলাম, শুধু আপনি——"। রমাবাবু বলিলেন,—"আমি ভুল কিছু করিনি ত। রবির খোঁজ পাওয়া গেছে। সেই শ্যামপুকুরের হেডমাষ্টার।"

রবি শ্যামপুকুরের হেড্‌মাষ্টার,—সেই মহানুভব লোক,—যাকে উৎসাহিত কত্তে লাটসাহেব নিজে গিয়েছিলেন! রমাবাবুর পত্নী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"হ্যা গো হ্যা,—সেই রবি। এতগুণ বলেইত ওঁকে প্রথম থেকে আমি এত ভালবেসে আস্‌ছি। এখন ওর সঙ্গে আমার বিয়েটা হলেই আমার একটা মস্ত সাধ পূর্ণ হয়।" অতুলের মুখ অন্ধকারের মত কাল হইয়া গেল, সে উঠিয়া এক পা দু'পা করিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি কেহ আর তাহাকে রমাবাবুর বাড়ী দেখে নাই, তাহারাও তাহার খোঁজ করে নাই।

পরদিন তিনি রবিকে আনিতে শ্যামপুকুর গেলেন। রবি অনেক ওজর আপত্তি দেখাইল, কিন্তু রমাবাবুর কথার উপর তাহার কথা চলিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নৃপেনের সহিত গিরির বিবাহের পর একে একে প্রায় চারিটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গিরি ও নৃপেনের নিকট এই চারিবৎসর একদিনের মত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছিল। সুখের দিন বড় শীঘ্র কাটিয়া যায়। দীর্ঘ চারিবৎসর যেন চারিটি মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ কয়দিন যাবৎ গিরি দিনগুলিকে দুইহাতে ঠেলিয়াও বিদায় করিতে পারিতেছে না। নৃপেন গভর্ণর সাহেবের সহিত শ্যামপুকুর গিয়াছে! সে কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সরকারে একটি ভাল কাজ পাইয়াছে। গভর্ণরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কলিকাতাতেই থাকিতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা গিরি দ্বিতলের বারান্দায় রেলিংয়ে দাঁড়াইয়া আনমনে আকাশের দিকে তাকাইতেছিল। লোহিতবর্ণ সান্ধ্যগগণে সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে নাবিয়া আসিতেছে। মৃদু মলয়ের সাহায্যে দূরস্থিত দেবমন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমে আকাশের কালো বুকে দু' একটা তারা ফুটিয়া উঠিল। গিরি ভাবিতে লাগিল "এই তারা ত পৃথিবীর সকলকেই দেখিতে পায়। হয়ত তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছে। আমি এই তারা দেখিতেছি, হয়ত তিনিও দেখিতেছেন : কিন্তু আমরা কেহ কাহাকেও

দেখিতে পাইতেছি না। আহা এই তারাগুলো কত সুখী, ইহারা ত তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে। ক'দিন তাঁকে দেখি না। ইস্ চা–রি—দি—ন যাবৎ তিনি গিয়াছেন। কেন যে চাকুরি করিতে দূরে যাইতে হয়, সে চাকুরি না করিলে কি হয়? আমি যে একমুহূর্ত্তও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। না, এবার তিনি আসিলে আর তাঁহাকে যাইতে দিব না।" আবার ভাবিল—"আচ্ছা সকলের স্বামীই হয়ত বিদেশে চাকুরি করে। স্ত্রীর জন্য কেউ ত আর চাকুরি ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া থাকে না। কৈ তাহারা ত স্বামীর জন্য হাহাকার করে না। তাহারা ত বেশ হাসিগল্প করিয়া দিন কাটায়। তাহারা কি করিয়া থাকে? আমি কেন পারি না? স্বামী স্ত্রীর জন্য ঘরে বসিয়া থাকিলে লোকে হাসিবে যে। না, না,—তা হাসে হাসুক। আমি তাঁকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। উঃ আমার বড় কান্না আসে, বুক ফাটিয়া যায়। না, তাঁকে না দেখিয়া আমি বাঁচিতে পারিব না।"——

এমন সময় একটা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়াইল। নৃপেন গাড়ী হইতে নামিয়া চাকরের মাথায় বাক্স ও মোট দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। গিরি আনন্দে অধীর হইয়া নীচে নামিল। আনন্দের আতিশয্যে বহুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

নৃপেন আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। কৃতান্ত বলিল, —"তা ঐ হেড্‌মাষ্টারের কথাটা বল ত শুনি। গরিব মানুষ তার পক্ষে বুঝেছ কিনা অতগুলি টাকা দান করা ত সহজ কথা নয়? তার চেহারাটা কেমন? ঠিক দেবতার মতই হবে, না; উঃ কি লোক, কি তার কলিজা! বুঝেছ কিনা তাহাতেই ত বড় লাটসাহেব সেখানে গিয়েছিলেন।" নৃপেনের সংসর্গে এই কয়দিনে কৃতান্তের স্বভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

নৃপেন হাসিয়া বলিল,—"তাঁকে আপনি চেনেন। তাঁর নাম রবিকুমার বসু।"

"রবি! এঁ্যা আমাদের মাষ্টার রবি। সেই ছোকরা বুঝেছ কি না এত টাকা দান করেছে? বল কি হে!"

"হঁ্যা সেই রবি, সেই মাষ্টার রবি। বাইরের লোকের চোখে সে গরিব, কিন্তু যিনি দেখতে জানেন, তিনি বলবেন অমন বড়লোক আর হয় না। গভর্ণর সাহেব তাকে চিনতে পেরেছেন, তাই তাকে কোল দিয়েছেন।" কৃতান্ত বিস্মিতভাবে শুনিতে লাগিল। পৃথিবীর মানুষ—ঐ সরল সোজা

মাষ্টারটা এমন গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে! আর তিনি জীবনে কি করিলেন। আজ তাঁহার মনে একটু ধিক্কার জন্মিল।

রাত্রিতে গিরি নৃপেনের নিকট রবির কাহিনী শুনিল। নৃপেন বলিল,—"রবি যে কোনও দিন আমার সমপাঠী ছিল এ কথাটা বলিতে আজ আমি গৌরব বোধ করি। বাস্তবিক কি মহৎ তার হৃদয়।"

গিরি মনে মনে বলিল,—"আর তোমার হৃদয়ই বা কম কি। তুমি যাহা করিয়াছ, এমন মহৎ কাজই বা ক'জন করিতে পারে?"

ক'দিন পরে নৃপেন বলিল,—"রবির বিবাহ স্থির হয়েছে। রমাবাবুর মেয়ে লীলার সঙ্গে তাহার বিবাহ। রমাবাবু নিজে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি নিজেও যেমন অমায়িক ও মহৎলোক জামাতাটিও তেমনই মিলেছে। তোমাকে এ বিবাহে নিয়ে যাব। অমন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও হৃদয় উন্নত হয়।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনেকদিন পরে কলিকাতায় রমাবাবুর বাড়ী আসিয়া রবির কেমন কেমন লাগিতে লাগিল। সেই পুরাতন লুপ্ত স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। রবি আসিয়া দেখিল সমস্ত বাড়ীটা লোকে পূর্ণ, সকলেই ব্যস্ত, সকলের মুখে কি এক আনন্দের ভাব। রবি অবাক হইয়া গেল। তবে কি অতুলের সহিত লীলার বিবাহ! তাহার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিবার জন্য তাহাকে ধরিয়া আনা!—একি নিষ্ঠুর পরিহাস! এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শিল্পী যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই মূর্ত্তি ধূলিতে পরিণত হইবে,—সেই দৃশ্য দেখিতে শিল্পীর নিমন্ত্রণ! রবি বুঝিল, ইহাতে মানবের দোষ নাই, ইহা ভগবানের বিচার,—জন্মজন্মান্তরের পাপের শাস্তি! রবির হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়, পূর্ব্বজন্মে সে এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহার জন্য তাহাকে এমন কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইবে? নির্জ্জনে এক পরদেশে আপনমনে পড়িয়াছিল; পাষাণে বুক বাঁধিয়া, অতীত স্মৃতি ভুলিয়া, পরের কাজে নিজের তুচ্ছ প্রাণটাকে বিলাইয়া দিয়াছিল,—নিষ্ঠুর মানুষেরা তাহার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর পরিহাস করিবার জন্য সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিল! রবির

হৃদয়ে প্রতিহিংসা জাগিল। এ প্রতিহিংসা মানুষের উপর নহে,—এ প্রতিহিংসা ভগবানের উপর। রবি স্থির করিল—সে নাস্তিক হইবে, ভগবান্ মানিবে না। কালাপাহাড়ের মত একে একে সমস্ত দেবতার মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে। ভগবান্ যদি নিষ্ঠুরের মত চিরকাল তাহার সহিত পরিহাসই করিলেন, তবে সে আর ভগবান্‌কে মানিবে কেন? রবি তাহার ট্রাঙ্ক খুলিল, খুলিয়া একে একে দেব দেবীর মূর্ত্তিগুলি বাহির করিয়া ঘরের মেঝেয় রাখিল, তারপর পকেট হইতে ম্যাচ্ বাহির করিয়া ফটোগুলি পোড়াইবার উদ্যোগ করিল। সহসা কে ধীরে ধীরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। রবির চোখ যেন ঝল্‌সাইয়া গেল,—একি স্বপ্ন না সত্য? সুবেশসজ্জিতা লীলা সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইয়া। রবির মনে হইল ইহাও পরিহাস! সে পাগল হইল, উন্মাদের মত বলিল,—"দরিদ্রের সঙ্গে একি পরিহাস! সুদূর দেশে, নিভৃতে নিজের মনে ছিলাম,—সেখান হইতে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ধরিয়া আনা,—একি নির্ম্মমতা! তোমরা ধনী বলিয়া কি দরিদ্রের সঙ্গে এমি ভাবে পরিহাস কত্তে হয়। যাও,—আমার হৃদয়ে এতটুকু বল আছে,—নিজ চোখে আহুবলি দেখতে পারব। যাও,—তোমার জীবনের শুভমুহূর্ত্তে এক জনকে এমিভাবে যাতনায় দগ্ধ কোরো না।..." লীলা কিছুই বুঝিতে পারিল না। দীর্ঘ দিনের অদর্শনের পর এই প্রথম সাক্ষাৎ,—অতি মধুর সাক্ষাৎ,—এতদিনকার আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হইবে, উভয়ে এক পবিত্র স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করিবে,—কিন্তু রবির একি ভাব, একি ব্যবহার! লীলা ভাবিল রবি অভিমানভরে এরূপ কথা বলিতেছে, ধীরে ধীরে আসিয়া রবির পদনিম্নে বসিয়া বলিল,—"আমায় ক্ষমা কর।" রবি চীৎকার করিয়া বলিল,—"যাও তুমি, চলে যাও,—আর আমার কাছে এস না। মানুষের মন বড় দুর্ব্বল,—সে সুপ্তস্মৃতি আর জাগিয়ে দিও না।" লীলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা লীলার দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী, ঠান্‌দিদিগণ রবিকে সাজাইতে আসিল। কেহ কেহ পরিহাস করিল। রবি গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"দরিদ্রের সহিত একি পরিহাস! পৃথিবীতে কি দরিদ্রেরা ধনীর জ্বালায় তার জীর্ণ কুটীরখানিতেও মাথা গুঁজিয়া শান্তিতে থাকিতে পাইবে না?" ঠান্‌দিদিগণ অবাক্ হইল। পরিহাসপটু একজন ঠান্‌দিদি বলিলেন, দেশেই প্রবেশ কচ্ছ। হৃদয়ের ভেতর এখন যে অশান্তির ঢেউ আপনা আপনি খেলছে,—

আমরা তার কি করব ভাই। সে কথা লীলাকে বল, সে এই ঢেউ তুলেছে, আমরা সরল সোজা মানুষ অতশত জানিনা ভাই ?"

রবির কাছে সব যেন কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। লীলা অশান্তির ঢেউ তুলেছে' এ কি বলে!

রবি নীরবে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাবনা-সাগরে কোনও কূল পাইল না,—কেবল উত্তাল-তরঙ্গমালা আসিয়া তাহাকে ভীষণ দোলা দিয়া যাইতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর যখন রবি ও লীলা বাসরঘরে নীত হইল, এবং গভীর রাত্রিতে বাদ্য কোলাহল এবং ঠান্‌দিদি ও শ্যালিকাদের আনাগোনা শেষ হইল, তখন লীলা পূর্ব্ব অভ্যাস মত ডাকিল "রবি-দা।" ডাকিয়াই লজ্জাতে তাহার সারামুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। রবি ইতিমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, ধীরে ধীরে স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মত বলিল—"একি স্বপ্ন না সত্য ?"

লীলা বলিল,—"সত্য, সব সত্য। আবার তোমার দেখা পাব, সে আশা ছিল না,—ভগবান্ সে আশা পূর্ণ করেছেন।"

রবি কিছু বলিতে পারিল না,—আনন্দে, আবেগে, উত্তেজনায় তাহার বক্ষটা ভীষণ উদ্বেলিত হইতে লাগিল! সেই একদিন আর এই একদিন। সে দিন কি বুকভরা যাতনা ও হাহাকার লইয়া সে এই গৃহ ত্যাগ করিয়া এক-খানা অন্ধকার দেশের উদ্দেশে বাহির হইয়াছিল,—আর আজ কি আনন্দ, কি মধুর মিলন! চতুর্দ্দিকে যেন এক স্বর্গীয় তান জাগিতেছে! ভগবান্ যে আবার এই হতভাগ্য কাঙ্গালের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ধন্য তাঁহার স্নেহ, ধন্য তাঁহার করুণা! তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। ধীর কম্পিত স্বরে বলিল,—"লীলা সেই একদিন আর এই একদিন। আমার বুঝিবার ভুল, আমি সম্মুখে সুধাভাণ্ড রাখিয়া হলাহল পান করিতেছিলাম। অন্ধ আমি, এতদিন তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়টি চিনিতে পারি নাই। আমায় ক্ষমা কর।" লীলা আবেগ কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—বুদ্ধির দোষে তোমায় যে যাতনা দিয়াছি, বালিকা বলিয়া আমায়, ক্ষমা করিও। ভগবান্, মঙ্গলময় আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার দয়া অসীম।"

সম্পূর্ণ

জলপ্লাবন

(লেখক,—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ.)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রিতে রমেন্দ্রকিশোর নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিল না—কাজে কাজেই মনোরমারও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল। রমেন্দ্রকিশোর নিদ্রা না যাইলে মনোরমা নিদ্রা যায় কেমন করিয়া? রমেন্দ্র এখন তাহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে।

রমেন্দ্র ভাবিতেছিল—মনোরমা পত্র লিখিল, সে স্বয়ং পত্র লিখিল, তথাপি বাটী হইতে কিংবা সত্যব্রতের নিকট হইতে পত্রের কোনও উত্তর আসিল না কেন? পত্রের উত্তর ত দূরের কথা—পত্র পাইয়া সত্যব্রতের নিজের আসা উচিত ছিল। অথবা কোনও বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া তাহাদের সংবাদ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা হইল না কেন? মনে মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিতেছিল, তাহার কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া রমেন্দ্রকিশোর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তখন তাহার মনে হইল, সত্যব্রতও বুঝি ঘোর দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। সে কথা মনে হইতেই সে শিহরিয়া উঠিল—তাহার অভিমানানল শীতল হইল।

কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের নিজবাটীর সংবাদ কি? সেখানেও কি দুর্ব্বিপাক! রমেন্দ্রকিশোর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে চেষ্টার ফল হইল বিপরীত। দুশ্চিন্তামুক্ত হইবার জন্য সে যত অধিক চেষ্টা করিতে লাগিল, দুশ্চিন্তাভার তাহাকে তত অধিক বিব্রত করিয়া তুলিল।

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ঘুমায় নাই কেবল ঘুম যাহাদের ভাগ্যে নাই।

বিনিদ্র রমেন্দ্রকিশোর তথাপি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভিন্নাসনে উপবিষ্টা মনোরমা তখন অত্যন্ত নিদ্রাকাতরা; তথাপি রমেন্দ্রকিশোরকে ব্যজন করিতে তাহার বিরক্তি বা অবসাদ নাই।

রমেন্দ্রকিশোর সস্নেহে মনোরমাকে কহিল—"যাও, শোওগে—না হ'লে অসুখ ক'রবে।"

মৃদু হাসিয়া মনোরমা বলিল- "আমার ঘুম পায় নাই।"

নিদ্রা সম্বন্ধে রমেন্দ্রকিশোর, মনোরমাকে আর কোনও অনুরোধ করিল না। উদাসীনভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া সে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিল। ভক্তের আরাধনায় দেবী কথঞ্চিৎ তুষ্টা হইলেন। তাহার ফলে একটু তন্দ্রা হইল মাত্র। কিন্তু সুনিদ্রা তাহার আদৌ হইল না। সন্ন্যাসীর শিষ্যের কথা তখন তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে।

গৃহের দ্বার উন্মুক্ত ছিল—উন্মুক্তই থাকে, কুটীরের "দাওয়ায়" কিশোরীদাস নিদ্রা যায়। সুতরাং দ্বার আর বন্ধ করিতে হয় না। আর জীর্ণ ভগ্ন দ্বার বন্ধ করিবারও তেমন উপায় নাই।

সেই মুক্তদ্বারপথে চারি পাঁচজন বলিষ্ঠ লোক প্রবেশ করিয়া নিমেষের মধ্যে রমেন্দ্রকিশোরকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং সে যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে, দস্যুগণ তাহারও ব্যবস্থা করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মনোরমা ভয়ে বিস্ময়ে প্রায় অচৈতন্যা হইয়া পড়িল। দস্যুগণের মধ্যে এক আধজন অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাদের "শীকার"—রমেন্দ্রকিশোর। "শীকার" হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তাহারা সে দিকে আর বড় মন দিতে পারে নাই।

নিমেষের মধ্যে "শীকার" স্কন্ধে বহন করিয়া শীকারীগণ অদৃশ্য হইল। তখনও মনোরমা অচৈতন্যা।

কিশোরীদাস গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মুখে চোখে জলের ঝাপটা মারিয়া মনোরমার চৈতন্য ফিরাইয়া আনিল। জ্ঞানলাভ করিয়াই সে উদাসীন দৃষ্টিতে গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কিশোরীদাসকে জিজ্ঞাসা করিল—"উনি কোথায় ?"

কাহার কথা মনোরমা যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা বুঝিতে কিশোরী-দাসের আর বিলম্ব হইল না। সে প্রশ্নের উত্তরে সে মনে মনে বলিল—"যমালয়ে।" তবে প্রকাশ্যে তাহা বলিতে তাহার সাহস হইল না।

মনোরমার প্রশ্নের উত্তরে কিশোরীদাস অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিল—"তোমারা তাহার কথা আর জিজ্ঞেস্ করোনি গো, জিজ্ঞেস্ করোনি। বেটা ডাকাত, বদমাস্! সে বেটা পাজি, বেটা নচ্ছার, বেটা কা'র বাড়ীতে কি নচ্ছারপনা করেছ্যাল, তা তা'রা এসে নচ্ছারটাকে

পাকড় কোরে নিয়ে গ্যাল। এইবার নচ্ছার বেটা—বুঝ্লে কিনা—এইবার নচ্ছার বেটা ফাঁসির রসিতে ঝুল্তে থাক্বে। আরে ছ্যা, আরে ছ্যা ছ্যা; আরে নচ্ছার বেটার নচ্ছারির কথা জান্তে কি! এই যত গোল বাঁধালে সন্ন্যাসী ঠাকুর। ভাঁস্ত হ'বার ভয়ে তানার কথা শুন্তে হ'ল। শেষে এই বিপত্তি।

কিশোরীদাস যে কতগুলা কথা একটানে বলিয়া গেল, মনোরমার কর্ণে তাহার একটী শব্দও প্রবেশ করিল না। ভয়বিহ্বল চিত্তে সে কেবল ভাবিতে-ছিল, কাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং তাঁহার অদৃষ্টেই বা এখন কিরূপ? মনোরমার চিন্তা কেবল তাহার প্রাণদাতা জীবনসর্ব্বস্ব রমেন্দ্র-কিশোরকে লইয়া। কিশোরীদাসের তর্ক যুক্তি কিছুতেই মনোরমার একাগ্রতা ভঙ্গ করিতে পারে নাই। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীদাস রূপবতী কিশোরীর রূপসুধা পান করিতে লাগিল। রূপ-তৃষা বৈষ্ণবকে পাগল করিয়া তুলিয়া-ছিল। রূপোন্মাদ কিশোরীদাস উন্মত্তভাবে রূপবতী মনোরমার নিকটস্থ হইয়া ব্যাকুলভাবে কহিল—"সে গ্যাছে, যা'ক্ আমি ত রইছি সুন্দরী। ভিক্ষা করে আমি তোমার খাওয়ান্ পরান্ করব। তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি খাও দাও, বগল বাজাও! দয়া করে আমি তোমায় আমার চরণে স্থান দেব!"

কিশোরীদাসের ধৃষ্টতা দেখিয়া মনোরমা অগ্নিতপ্ত হইল। আপন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে প্রস্তুত হইল। তাহার ভ্রূকুটী দেখিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি একটু ভয় পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে সে ভগ্নোৎসাহ হইল না। কিশোরীদাস ভাবিল, প্রথম প্রথম সকলেই অমন চক্ষু রক্তবর্ণ করে।

অশ্রুজলে মনোরমার বক্ষঃস্থল তখন ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবের দয়া বা সহানুভূতির উদ্রেক হইল না। মনোরমাকে সেবাদাসী হইবার জন্য সে সবিশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল—এবং সে যে একজন বিশেষ ভদ্রলোক, তাহার প্রতি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের যে বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সে বিশেষ প্রয়াস পাইল। এমন কথাও কিশোরীদাস প্রকাশ করিল যে, তাহাকে ভজনা করিলেই মনোরমার ভাগ্যে কৃষ্ণভজনার ফল ফলিবে। কিন্তু গর্ব্বিতা মনোরমা সে সকল উপদেশবাণীতে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিল এবং এমনভাব প্রকাশ করিল যে, তাহাতে অনুমান করা যায়, কৃষ্ণানুরাগের সঞ্চার তাহার মনে আদৌ হয় নাই। সে রমেন্দ্রকিশোরের

নিকট যাইতে চাহিল এবং বৈষ্ণবচূড়ামণিকে সংযতভাবে কথা কহিতে বলিল। তখন বৈষ্ণবের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। দুই তিন ঘণ্টাকাল তর্কবিতর্ক, অনুনয়অনুরোধ করিয়াও যখন কিশোরীদাস সিদ্ধকাম হইবার উপায় দেখিতে পাইল না, তখন ক্রোধপরায়ণ না হইয়া সে আর করে কি? আপন ধর্ম্মে বৈষ্ণবের যে বিশেষ আস্থা ছিল, তাহার আচরণ দেখিয়া তাহা মনে করিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে পরের ধর্ম্মরক্ষায় কেন সে যত্নবান্ হইবে?

এইবার মনোরমা সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিশোরীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া কাপুরুষ কিশোরীদাস আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তবে আশাও সে ছাড়িতে পারিল না। তখন বৈষ্ণবকুলমণি রূপতৃষ্ণায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, আর সতীত্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য মনোরমা উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছে। সে দৃশ্য কি বীভৎস এবং কি মধুর!

রাত্রি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম উষার প্রথম বাতাস তখন ধীরে ধীরে বহিবার লক্ষণমাত্র প্রকাশ করিতেছে। জ্যোৎস্নালোক তখন শূন্যে শূন্যে মিশাইয়া যাইবার পথানুসন্ধান করিতেছে, আর সেই সঙ্গে দুই চারিটা রসিক নির্ভীক বিহগ কলকাকলীতে শূন্য মহাশূন্য গাম্ভীর্য্যময় করিয়া তুলিতেছে। পক্ষীর এ রহস্যালাপ, চন্দ্রালোকের প্রতি এ বিদ্রূপ দিবাকরের আগমন সংবাদে। নিশাসমাগমে দ্বিজকুল দৃষ্টি হারাইয়াছিল, দিননাথের উদয়ে তাহারা চক্ষুষ্মান্ হইয়াছে। এই কারণেই তাহাদের সাহস বাড়িয়াছে, জ্যোৎস্নালোককে বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সুদিন পাইলে জীবমাত্রেরই এইরূপ হয়। দোষ দিব কাহার?

উষার বাতাস ও পক্ষিকুলের ঝঙ্কারে পাপী বুঝিল, তাহার পাপাচরণের সময় উত্তীর্ণপ্রায়। অতএব সে অধিকতর উন্মত্ত হইয়া মনোরমাকে অধিকতর বিব্রতা করিয়া তুলিল। অসহায়া মনোরমা বিপদ্‌বারণের নাম স্মরণ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাতরা কিশোরীর কাতর নিবেদন বুঝি করুণাময় শুনিলেন। বিমলানন্দের শিষ্য নবীনানন্দ কুটীরদ্বারে আসিয়া ডাকিল—"বাবাজী?" কৃষ্ণপ্রেমিক "বাবাজী" যখন দেখিল সে স্থানে বলরামের উদয় হইয়াছে, তখন সে বুঝিল সে স্থানে আর নিরাপদ্ নহে। রণে ভঙ্গ দিয়া সে পলায়নের চেষ্টা করিল। কিন্তু বলরামের শালপ্রাংশু মহাভুজ প্রেমিক সেনানীকে ধরিয়া ফেলিল। এখন বৈষ্ণবরাজ

কম্পিত কলেবর এবং ঘর্ম্মাক্ত দেহ। ঘর্ম্মাক্ত হইলে লোকের জ্বর ছাড়িয়া যায় শুনা গিয়াছে; কিন্তু কিশোরীদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে ঘামিয়াই তাহার জ্বর আসিল। নবীনানন্দের মুষ্টি তখন দৃঢ়, চক্ষু তখন রক্তবর্ণ, মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যব্রত ও মধুসূদন উভয়েই মনোরমার পত্র পাইয়াছিল; কিন্তু লেখার দোষে পত্রের সম্যক্ সমাচার কেহই বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে নাই। তবে সে পত্র প্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরেই যে একটা "সাড়া" পড়িয়া-গিয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সে পত্রে নাম ধাম কিছুই ছিল না বলিয়া সত্যব্রত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কেমন একটা "খট্‌কা" লাগিয়া গেল।

মধুসূদনের মনের ভাব তখন কিরূপ এবং সত্যব্রত কিরূপ মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অসুস্থতা হেতু রমেন্দ্রকিশোর স্বয়ং কোনও পত্রাদিই পূর্ব্বে লিখিতে পারে নাই। সেই সুযোগে মধুসূদনের দিন একপ্রকার বেশ সুখে কাটিয়া গেল। তবে সে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই।

ভগবৎকৃপায় ও বিমলানন্দ ভারতী প্রভৃতির যত্নে তৎপরে রমেন্দ্রকিশোর সুস্থ হইল। সুস্থ হইয়াই সে স্বয়ং পত্র লিখিতে বসিল। একখানা পত্র লেখা হইল তাহার নিজ বাটীতে, আর একখানা পত্র গেল সত্যব্রতের নিকটে। পত্র দুইখানি যথাস্থানে পৌঁছাইতে কিছু বিলম্বও ঘটিয়াছিল। জলপ্লাবন হেতু গ্রাম্য ডাকবিভাগের তখনও বেশ বন্দোবস্ত হয় নাই। এই কারণেই পত্র পৌঁছাইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

পত্র যখন যথাস্থানে পৌঁছিল, তখন মধুসূদন ও অহিশেখর উভয়েরই মস্তক ঘুরিয়া গেল। সত্যব্রত সেদিন স্থানান্তরে গিয়াছিল। তাহার পত্র পড়িয়া রহিল।

ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া মধুসূদন ও অহিশেখর বিশুষ্কমুখে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে কোনও কথাই

নির্গত হইল না। উত্তেজনার প্রথম বেগটা কথঞ্চিৎ সাম্‌লাইয়া রমেন্দ্র-কিশোরের পত্রখানা তাহারা পুনরায় পড়িতে লাগিল।

পত্র আসিয়াছিল অবশ্য মনোহরদাসের নামে। মনোহরদাস, রমেন্দ্র-কিশোরের পিতার আমলের লোক। রমেন্দ্র তাহাকে খাতাঞ্জি দাদা বলিত। সে খাতাঞ্জি দাদাকে লিখিয়াছে,—দৈবানুগ্রহে সে রক্ষা পাইয়াছে। আরও অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় কথা লেখা ছিল। পত্রের ঠিকানা প্রভৃতি দেখিয়া মধুসূদন একবার ভ্রূকুটি করিল, তৎপরে অহিংশেখরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। সেই সময়ে মধুসূদনের পাপিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ পরামর্শক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর পরামর্শের পর স্থির হইল, বিশ্বনাথ লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই দিবসই অপরাহ্নে রমেন্দ্রকিশোরের সন্ধানে যাত্রা করিবে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার জ্ঞানবুদ্ধি মত ব্যবস্থা করিবে।

পাষণ্ডের বুদ্ধিমত পাষণ্ড ব্যবস্থা করিল। সে ব্যবস্থায় রমেন্দ্রকিশোর দস্যুহস্তে বন্দী হইল এবং তাহাতে যে তাহার প্রাণের আশঙ্কাও ছিল না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

বৈষ্ণব বাবাজীরও এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, মনোরমার লোভে এবং যৎকিঞ্চিৎ রজতখণ্ডের মহিমায় কিশোরীদাস দস্যুগণের সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। দস্যুসর্দ্দার বিশ্বনাথ মনোরমার জন্য একটু যে যত্নবান না হইয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে তাহা করিলে কিশোরী দাসের সাহায্য পাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িত ; সুতরাং সে যাত্রা তাহাকে সে লোভ সংবরণ করিতে হইল।

মনোহরদাস এখন সত্যব্রতের বাটীতে। রমেন্দ্রকিশোরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া মধুসূদন সে বাটীতে প্রবেশ করিতেই মনোহরদাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। অথবা এমন বলিলেও বলা যাইতে পারে, মধুসূদন তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি তাহার আশ্রয়স্থল সত্যব্রতের বাটী। সুতরাং তাহার পত্র তাহার হস্তস্থিত হয় নাই।

রমেন্দ্রকিশোর-লিখিত সত্যব্রতের পত্রের "শিরোনামা" দেখিয়া মনোহর-দাস চমকিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল—"এ হস্তাক্ষর কাহার! দুর্ব্বলতা হেতু রমেন্দ্রকিশোরের লেখাটা ঠিক মত হয় নাই। সেই জন্যই মনোহরদাস একটু গোলে পড়িয়া গেল। ভরসা করিয়া সে পত্র উন্মোচন করিতে পারিল

না। প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী নিরুদ্দিষ্ট প্রভুর হস্তাক্ষরের সেই সাদৃশ্য দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে আঁখিবারি ফেলিতে লাগিল এবং সত্যব্রতের প্রতীক্ষায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। মনোরমার পিতা হরকুমারও সে ব্যাকুলতা ও সে অশ্রুধারার অংশ গ্রহণ করিল। রমেন্দ্রকিশোর যে তাঁহার ভাবী জামাতা!

তৎপরদিবস সত্যব্রত কার্য্যস্থান হইতে প্রত্যাগত হইল। পত্রখানি তাহার হস্তগত হইতেই তাহার হস্ত কাঁপিয়া উঠিল। পত্র হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। মনোহরদাস তাড়াতাড়ি পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া অধীরতার সহিত পাঠ করিতে লাগিল "অভিন্নহৃদয় ভাই সতু, কল্যাণপুর।

জানিনা এখন তুমি কোথায় এবং কি অবস্থায় আছ। তবে আশা করি, মঙ্গলময় তোমার এবং তোমার আত্মীয়স্বজনকে মঙ্গলে রাখিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় আমি এ যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়াছি। সে বাঁচার বৃত্তান্ত অনেক। সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা মনে করিয়া বলিব।

ইতি পূর্ব্বে আমি তোমাকে এবং খাতাঞ্জিদাদাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। লেখাটা অবশ্য আমার নহে। যাহাকে বাঁচাইতে গিয়া জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলাম, লেখাটা তাহারই। সেও দৈবানুগ্রহে বাঁচিয়া গিয়াছে। জানিনা তাহার পত্র তোমরা পাইয়াছ কি না। জানিনা বলিলাম, এইজন্য—এ পর্য্যন্ত সে পত্রের উত্তর পায় নাই।

যাহা হউক, পত্রপাঠ তোমরা সকলে আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবে। আমি যদিও সুস্থ হইয়াছি, তথাপি অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহা ভিন্ন অর্থাদিও আমার নিকটে নাই! খাতাঞ্জিদাদাকে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিবে। এখানে আমার কিছু অর্থের আবশ্যকও আছে। খাতাঞ্জিদাদার পত্রে সকল কথা লিখিয়া দিয়াছি। তুমি সে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিও।

আমি এখানে এক দরিদ্র বৈষ্ণবের গৃহে আছি। প্রাণ পাইয়াছি এক মহাপুরুষের কৃপায়। সুস্থ হওয়া অবধি তাঁহার, বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্যের আর বড় দর্শন পাই না। আর্ত্তের উদ্ধারে তাঁহারা সততই ব্যস্ত। তথাপি আমাদের প্রতি তাঁহাদের অনুগ্রহ বিলক্ষণ। তাঁহাদের কৃপায় আমরা কুশলে আছি। বৈষ্ণব বাবাজী আমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করে এবং অবসর মত খঞ্জনী বাজায় এবং বেতাল গান করে। তাহাতে আমাদের বেশ আনন্দ হয়।

ভাই, আর একটু গোপনীয় কথা আছে। সে কথা তোমাকে না বলিলে আর কাহাকে বলিব। যাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া আমি অকূল পাথারে পড়িয়াছি, তাহার নাম মনোরমা। স্বর্গগতা পিসীমাতা তাঁহারই সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন—সে কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। পিসীমাতার অভিশাপ এতদিনে আমার ভাগ্যে ফলিয়াছে। আমি তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং তাহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতেও যে স্পৃহা ও ঔৎসুক্য নাই, এমন কথাও এখন আর আমি বলিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ, বোধ হয় তাহার সেবা, যত্ন, আর—আর বুঝি তাহার সুন্দর মুখ-শ্রী, সুন্দর চাহনি আর অতি সুন্দর অতি মিষ্ট সম্ভাষণ। তাহার কথা এত করিয়া বলিতেছি বলিয়া হয়তো তুমি হাসির তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছ। কি করিব ভাই, মানুষ ঘটনাচক্রের অধীন। সে কথা যাউক, তোমরা আসিবে তারকেশ্বরের পথে। কল্যাণপুর তারকেশ্বরের অতি সন্নিকটেই। বর্দ্ধমান হইতে ভাসিয়া আসিয়া কল্যাণপুরে আশ্রয় পাইয়াছি। ইহা বুঝি আমাদেরই কল্যাণের জন্য। তারকনাথ আমাদের দয়া করিয়াছেন। তারকেশ্বরে আসিয়া কল্যাণপুরের সন্ধান করিও—সন্ধান মিলিবে।

মিত্রমহাশয় ও মনোরমার পিতাকে আমাদের সংবাদ জানাইও—তাঁহারা আনন্দিত হইবেন। ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি তোমরা মঙ্গলে থাক। তুমিই আমার জীবনমরুভূমে একমাত্র তরুচ্ছায়া। এ কথায় মেজ-বৌ ও তোমার সোহাগের অর্দ্ধাঙ্গিনীর ক্রোধের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। তাঁহাকে বলিও শীঘ্রই তাঁহার সহচরী মিলিবে। কথাটা শুনিয়া তাঁহার অধর কোণেও হয়ত বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। আবার বলি, কি করিব; আমি নাচার। মানুষ গড়ে—ভগবান্ ভাঙ্গেন।

তোমার সন্তানসন্ততিগণকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ দিও। আর যদি পার, তাহা হইলে দয়া করিয়া মেজ-বৌএর সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়া আমায় ভুলিয়া বসিয়া থাকও। আমি এখন মরিয়া ভূত হইয়াছি কি না?

তোমার চির সুহৃদ্ রমি"

পুঃ—আসিবার সময় তারকেশ্বর হইতে পাল্কী ব্যবস্থা করিয়া আনিও। মেজ-বৌএর ভাবী সহচরী হাঁটিতে পারে না। আর হাটিতে তাহাকে দিবেই বা কে? আমিও দুর্ব্বল। আমারও একখানা পাল্কী চাই। ফিরিবার সময়

তোমাদেরও পাল্কীর দরকার। সে সকল ব্যবস্থা তোমাদের, তোমরা করিও। জলে ভাসিয়া আমি এখন স্বার্থ চিনিয়াছি। কথাগুলা শুনিয়া মেজ-বৌ মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতেছে কি? না হাসিলে বলিব—বহুৎ আচ্ছা। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে সত্যব্রত প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে পুলকিত হইল। মনোরমার মাতাকেও সে সকল কথা শুনান হইল। পাগলিনী সে সকল কথার কিছুই বুঝিল না। তাহার অট্টহাস্যে হরকুমার সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। আহা! রমণী শোকে উন্মাদিনী; আনন্দসংবাদেও তাহার আনন্দানুভূতি হইল না।

কল্যাণপুর যাত্রার তখনই ব্যবস্থা হইল। একদিন বিলম্ব ঘটিয়াছে বলিয়া সত্যব্রতের দুঃখের আর সীমা রহিল না। সে মনোহর দাসকে কহিল—"চিঠিখানা তখনই খুলিয়া তখনই ইহার একটা ব্যবস্থা করিলে না কেন দাদা! শুভকার্য্যে বিলম্ব ঘটিলে কার্য্যহানি হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দী রমেন্দ্রকিশোরকে স্কন্ধে বহন করিয়া দস্যুগণ নিঃশব্দে প্রান্তর পার হইতে লাগিল। যদিও গ্রামগুলি জলপ্লাবনের ভীষণতায় তখন প্রায় জন-মানবশূন্য, তথাপি দস্যুদল গ্রামের পথে চলিতে সাহস করিল না। বিস্তৃত প্রান্তরের উপর দিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া তাহারা নীরবে নিঃশব্দে পথাতিক্রম করিতে লাগিল। ভবিষ্যৎচিন্তায় ও সুদৃঢ় বন্ধন-জনিত যন্ত্রণায় রমেন্দ্রকিশোর তখন অচৈতন্য প্রায়। বিশেষ, তখনও তাহার শরীর দুর্ব্বল।

সে রাত্রে চন্দ্রদেবের কিছু শোভাধিক্য ছিল। রোহিণীপতি প্রিয়তমার প্রিয় সম্ভাষণে বুঝি গলিয়া গিয়াছিল। সুনীল আকাশতলে শশধর-শোভা তখন অপরূপ। প্রেমালাপে মত্ত নিশাকরের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ধরণী তখন সূর্য্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ধকার তখন বুঝি বনান্তরালেও স্থান পাইতেছিল না। চন্দ্রদেবের সে দীপ্তি ও সে হাসি দেখিয়া দস্যুগণ মনে

মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিল এবং ধরা পড়িবে বলিয়া প্রতিপদে আশঙ্কা করিতেছিল।

প্রান্তরমধ্যে তাহারা যে পথ ধরিয়াছিল, সে পথ পশ্চিম মুখে দামোদরের বাঁধের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সে পথের সন্নিকটে লোকজনের বাসও বড় একটা নাই এবং নিশাভাগে সে পথে কেহ বড় একটা যাতায়াতও করে না। তবে দূরে দূরে বসতি আছে। সে সকল গ্রামের সন্নিকটে শ্মশানও দেখিতে পাওয়া যায়। দস্যুগণের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিল, বহুদূরে না যাইয়া নিকটস্থ কোন শ্মশানেই তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। সে প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল।

কিন্তু তাহাতে এক অন্তরায় ঘটিল। দূরস্থ একটা শ্মশানে তখন কোনও শবদেহের সৎকার হইতেছে বলিয়া তাহাদের মনে হইল। চিতাধূমে আকাশ তখন পরিব্যাপ্ত। চিতালোকও বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সুতরাং সে পথে যাইতে তাহাদের আর সাহসে কুলাইল না। তাহারা চাহে জীবন্ত মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে। সমাজশাসনের শক্তিতে লোকচক্ষুর গোচরে ত শ্মশানে জীবন্ত দগ্ধের রীতি নাই। অতএব তাহাদের উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। "জীবন্ত শবকে" বহন করিয়া তাহারা বাঁধের দিকে চলিল। বাঁধের নীচে দামোদরের গর্ভে এক মহাশ্মশান আছে। সে শ্মশানে রাত্রিকালে যাইতে কেহ বড় সাহস করে না। পাপিষ্ঠেরা পাপকার্য্য সাধনের জন্য মহাশ্মশানাভিমুখে উদ্দামভাবে ছুটিল।

দামোদরের বাঁধ একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। রাত্রিকালে সে বাঁধটা পাহাড়ের মতই দেখাইতেছিল। বাঁধের পার্শ্বে ও উপরিভাগে যে সকল স্বচ্ছন্দজাত তরুগুল্মাদি জন্মিয়াছিল, তাহাতে স্থানটার গাম্ভীর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই বাঁধ পার হইয়া তবে শ্মশানে যাইতে হয়। বিপর্য্যয় ব্যাপার দেখিয়া পাপিষ্ঠগণের মধ্যে একজন সে স্থানে যাইতে একটু আপত্তি করিল। সেই পাপিষ্ঠের ইঙ্গিতে দস্যুগণ চালিত হইতেছিল। তাহারই নেতৃত্বে, ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায় দস্যুগণের এই দস্যুতা। সেই পাপিষ্ঠ এইরূপ ভয় পাইয়াছে দেখিয়া অন্যান্য পাপিষ্ঠগণ সমধিক কৌতুকানুভব করিতে লাগিল এবং তাহাকে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিবারও লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু সে নরাধম সে দেশের লোক নহে, রাত্রিকালে মহাশ্মশানে গমন করায় সে আদৌ অভ্যস্ত নহে। সুতরাং বাঁধ পার হইয়া সে কোন

মতেই দামোদরগর্ভে প্রবেশ করিতে চাহিল না। ইতিমধ্যে একটা পেচক ভীষণ রব করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া গেল, দুই তিনটা ভীষণাকার কৃষ্ণবর্ণের কুক্কুর মনুষ্য সমাগম দেখিয়া তীরবেগে বনভাগে প্রবেশ করিল। দূর বনস্থলীতে তখন শিবারব উত্থিত হইয়াছে। গভীর রাত্রিতে এই সকল ব্যাপারের সমাবেশ দেখিয়া সাহসী নেতা আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। বাঁধ তখন অনতিদূরে। কল্পনাবশে সে বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া দস্যুগণ বন্দীকে স্কন্ধদেশ হইতে নামাইয়া প্রান্তরস্থিত তৃণশয্যায় শয়ন করাইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—নেতাকে তাহারা বালকভাবাপন্ন দেখিলে বাধ্য হইয়া তাহারা অবসর গ্রহণ করিবে। সর্ব্বনাশ! —সে ত্রিপান্তরের মাঠে সেরূপ অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া তাহারা স্থানত্যাগ করিলে কি আর রক্ষা আছে! কাজে কাজেই তাহাদের কথায় তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইল। তবে সে সকলের অগ্রে কিম্বা সকলের পশ্চাতে যাইতে চাহিল না। সকলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সে গন্তব্যস্থানে গমন করিতে লাগিল। সকলে যখন বাঁধের উপরে উঠিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল। দামোদর রজত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শান্তভাবে পড়িয়া আছে। জলকল্লোলের সঙ্গীতধ্বনি সেই স্থানটাকে তখন সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য তখন কে বুঝিবে?

অনতিবিলম্বে তাহারা মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। মহানীরবতার মধ্যস্থলে সেই মহাশ্মশান। ঝিল্লীরব ও মধ্যে মধ্যে হিংস্র সারমেয়কুলের বিকট চীৎকার সেই নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে মাত্র।

কৌমুদী শোভা সেই সময়ে কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। খণ্ডবিখণ্ড দুই একখানা মেঘ আকাশপথে ভাসিয়া ভাসিয়া জ্যোৎস্নাধারা একটু মলিন করিয়া দিয়াছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আকাশ যেরূপ মেঘমুক্ত ছিল, এখন আর সেরূপ নহে। প্রকৃতির এইরূপই প্রকৃতি, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

জ্যোৎস্নার মলিনতায় শ্মশানক্ষেত্র অধিকতর বিকট দেখাইতেছিল। শ্মশানভূমিস্থ পাদপশ্রেণীর তলদেশে কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর অন্ধকার জমাট হইয়া কি যেন একটা দুঃখের, শোকের ছায়া বিস্তার করিতেছিল। ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন কলসী, দগ্ধ, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠভার—অঙ্গার, চিতাভস্ম, ছিন্নবস্ত্র, কঙ্কালবিশিষ্ট প্রভৃতি বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া পড়িয়া কি যেন একটা বেদনা

মর্ম্মব্যথার প্রতিমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতেছিল, কি যেন কেমন অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল—আবার কখনও বা ভবিষ্যতের অন্ধকারে অথবা বিস্মৃতিসাগরে চিন্তা-স্রোত মিশাইয়া দিতেছিল। সে দৃশ্যে অনেকেই বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—বিশেষ তাহাদের নেতা। কিন্তু কি করিবে—তাহারা দুষ্কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে। সে কার্য্য তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তিবশে করিতেই হইবে। সুতরাং পরস্পরের উৎসাহে, পরস্পরের পরামর্শে সাহসে ভর করিয়া স্বকর্ম্মসাধনে তাহাদের প্রবৃত্ত হইতে হইল। তাহা ভিন্ন তখন আর তাহাদের উপায় কি ?

দুর্ব্বৃত্তেরা অর্থলোভে কতক পরিমাণে ভয় ত্যাগ করিয়া বন্দীকে জীবন্তদাহ করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। শুষ্কপত্র, বংশদণ্ড এবং অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা তাহারা এক চিতা সজ্জিত করিল এবং হস্তপদ বদ্ধ বন্দীকে সেই চিতার উপরে স্থাপিত করিল। চিতানল প্রজ্বলিত হইলে নিরপরাধী বন্দী প্রাণের মমতায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া বন্ধনা-বস্থাতেও তাহার শরীর চালনা করিবার চেষ্টা করিল। অমানুষিক শক্তি প্রয়োগে চিতা গড়াইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডে সে পড়িয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া—চিতার উপর তুলিয়া দিবার আয়োজন করিতে লাগিল, ঠিক্ সেই সময়ে বনভাগ হইতে জলদগম্ভীর স্বরে কে ডাকিয়া বলিল—"তোমরা কা'রা ?"

অতর্কিত দস্যুগণ সেই মহাশ্মশানের পার্শ্বদেশস্থ বনস্থলী হইতে জলদগম্ভীর স্বর শ্রবণ করিয়া প্রমাদ গণিল। উপদেবতার ভয়ে তখন তাহারা বিলক্ষণ ভীত হইয়াছে। তাহারা অগ্রপশ্চাতে না চাহিয়া যে যেদিকে পাইল, সে সেইদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পলাইতে পারিল না কেবল তাহাদের নেতা। ভয়ে তখন সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ভয়াধিক্য বশতঃ বন্দীর ঘাড়ের উপর সে পড়িয়া গেল। তখন চিতা বেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে বনান্তরাল হইতে জটাজুটমণ্ডিত এক সন্ন্যাসী বহির্গত হইলেন। তিনি অন্য কেহ নহেন—বিমলানন্দ ভারতী।

বিমলানন্দ প্রজ্বলিত চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটী মনুষ্য বন্ধনাবস্থায় পড়িয়া আছে, আর একজন তাহার পৃষ্ঠে দেহভার রক্ষা করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। ভারতী ক্ষিপ্র গতিতে একজনকে সরাইয়া দিলেন এবং আর এক জনের বন্ধন মোচন করিলেন। বন্দী রমেন্দ্র-

কিশোরের মুখ বস্ত্রাবদ্ধ ছিল? তাহাও অপসারিত হইল। ভারতী তখন দেখিলেন, সে ব্যক্তি অপর কেহ নহে—রমেন্দ্রকিশোর। রমেন্দ্রকিশোরও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখিল, তাহার এ যাত্রারও রক্ষাকর্ত্তা—সেই মহাপুরুষ।

রমেন্দ্রকিশোরের তখন অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। দস্যুহস্তে সহসা বন্দী হইয়াই সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। মনোরমার চিন্তাতেও সে নিতান্ত অল্প ব্যাকুল হয় নাই। অবশেষে যখন তাহাকে চিতার উপর স্থাপিত করা হইল, তখন তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। আবার যখন মহাপুরুষের কৃপায় সে বিপদ্‌মুক্ত হইল, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক হর্ষে এবং বিষাদে রমেন্দ্রকিশোর কথঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবসন্ন এবং বিস্ময়াপন্ন রমেন্দ্রকিশোর মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে কেবল মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল কোনও কথা কহিতে পারিল না। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে বিমলানন্দের আর বিলম্ব ঘটিল না। রমেন্দ্রকিশোর বিমলানন্দকে ইঙ্গিতে একটা প্রশ্নও করিয়াছিল। বিমলানন্দ তৃতীয় ব্যক্তিকে সে প্রশ্নের উত্তর করিতে বলিলেন। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি বিমলানন্দের সে কথায় কোনও উত্তর প্রদান করিল না। তাহার দুই কারণ—প্রথম ভয়, দ্বিতীয় বিস্ময়। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু নির্ব্বাক্ হইয়াও সে রক্ষা পাইল না। বিমলানন্দ যখন বুঝিলেন,—সে সহজে উত্তর প্রদান করিবে না, তখন তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূলাগ্রভাগ তাহার বুকের উপর রাখিয়া কহিলেন—

"এইবার বলবে বোধ হয়।"

"ব—ব—ব—বলব।"

"বল।"

বিমলানন্দ সেই ভাবেই ত্রিশূল ধরিয়া রহিলেন—দুর্বৃত্তের মুখে তখন সকল কথাই ব্যক্ত হইল। তাহাতে প্রকাশ পাইল, সে মধুসূদন ঘোষের কৃতী পুত্র বিশ্বনাথ। তাহার পিতার কথায় এবং অহিশেখর মিত্রের পরামর্শে রমেন্দ্রকিশোরের সন্ধানে সে এতটা পথ আসিয়াছিল এবং সন্ধান পাইয়া লোকজন সংগ্রহ করিয়া সে দস্যুতা সাধন করিয়াছে। রমেন্দ্রকিশোরকে যে, সে আর পৃথিবীর বায়ুসেবন করিতে দিবে না, এইরূপই তাহার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

বিশ্বনাথ কিছু তোত্‌লা। "তো—তো" করিয়া অনেক অনাবশ্যকীয় কথার ভণিতা করিয়া অবশেষে সে বৈষ্ণব বাবাজীর কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে সকল কথা শ্রবণান্তর রমেন্দ্রকিশোর শিহরিত হইয়া উঠিল। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বিমলানন্দ শশ্মানভূমি ত্যাগ করিয়া কল্যাণপুর গ্রামাভিমুখে দ্রুতপদে চলিলেন। রমেন্দ্রকিশোর তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল। বিশ্বনাথকেও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে হইয়াছিল—সেটা অবশ্য ত্রিশূলের ভয়ে।

বিমলানন্দ মহাশ্মশানে আসিয়াছিলেন—মহাকালীর অর্চ্চনায়, ইষ্টমন্ত্র সাধনায়। তাহাতে ইষ্ট হইল, শিষ্ট সেবক রমেন্দ্রকিশোরের। গুরুর দয়া থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতালোক তখন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুনীল চন্দ্রাতপতলে সে অপূর্ব্বালোক স্বপ্নরাজ্যের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। শূন্য রাজ্য তখন গৌরব মহিমা-মণ্ডিত—নানা জাতীয় পক্ষিকুলের বৈতালিক গীতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত। দুঃখ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা ব্যথা, বেদনা সে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দূরে অপসারিত হইবারই কথা। তবে যাহাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না, ভাগ্যদেবী তাহাদের প্রতি নিতান্তই অপ্রসন্না।

কিন্তু সে মুহূর্ত্ত বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, হইলেও না। তরুণ তপনকিরণসম্পাতে জলস্থল ব্যোম আবার সৌন্দর্য্যসাগরে ভাসিয়া গেল। আবার নূতন সৌন্দর্য্য-রাজ্যের সৃষ্টি হইল, আবার অভিনবের অভিনবত্বে প্রকৃতি অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিল, আবার ভবরাজ্যে নূতন ঘোষণা ঘোষিত হইল। প্রকৃতি দেবীর ইহাই লীলা, প্রকৃতি সাধকের ইহাই দর্শনীয়, ইহাই চিন্তনীয় আর বুঝিবা ইহাই স্পৃহার সামগ্রী।

সেই মধুর প্রভাতে কিশোরীদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণে কিন্তু বিষাদের ছায়া অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই উজ্জ্বল প্রভাতে, সেই পবিত্রতার মধ্যস্থলে, বিষাদকালিমা, অপবিত্রতার প্রেতমূর্ত্তি তখনও দূরীভূত হয় নাই।

তবে কি বলিতে হইবে, প্রকৃতিরাণীর মোহিনী শক্তির পরাজয় হইয়াছে এই স্থানে? অথবা ইহাও বুঝি প্রকৃতির আর এক প্রকার প্রকৃতি। কে জানে—ইহা কি, ইহা কেমন, কেনই বা এরূপ হইয়া থাকে।

কিশোরীদাস বন্ধনাবস্থায় তাহার সঙ্কীর্ণ অঙ্গনের একপার্শ্বে পড়িয়া আছে, আর মনোরমা আলুলায়িত-কুন্তলা হইয়া তাহাদেরই অনতিদূরে বসিয়া আছে। সুন্দরী মনোরমার মূর্ত্তি তখন অপূর্ব্ব! তাহার বসিবার ভঙ্গীও অপূর্ব্ব।

মনোরমার উপর পূর্ব্বরাত্রে যে উপদ্রব হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। নবীনানন্দ সে সময়ে দৈবানুগ্রহে না আসিলে তাহার ভাগ্যে যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিত হইতে হয়। যাহা হউক, ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার রমণীসুলভ মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও মনোরমার অভিমান টুটে নাই

মনোরমা প্রথমে অনেক কাঁদিল, অনেক দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল! কিন্তু রমণীর অভিমান তাহাতেও ধুইয়া মুছিয়া যাইল না। মনোরমা অবিবাহিতা হইলেও বয়স্থা; এরূপক্ষেত্রে রমণীসুলভ অভিমান, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

সে কাঁদিয়া থামিল বটে; কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরের প্রত্যাগমনের আশা সে পরিত্যাগ করিল, পিতামাতার ক্রোড়ে স্থান পাইবার আশা তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত হইল। তখন সে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। দুষ্টের কবলিত হইয়া তাহার যে ইহকাল ও পরকাল মাটী হইতে বসিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তাহা বুঝিতে পারিয়াই সে শিহরিতা হইল। তখন সে আর কোনও মানা মানিল না, তখন তাহার আর কোনও আশা রহিল না। সে আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল, আত্মহত্যা করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল,—অবশেষে উপায়ও নির্দ্ধারণ করিল।

কুটীরের অনতিদূরেই একটা পঙ্কিল পুষ্করিণী ছিল। জলমগ্না হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার জন্য মনোরমা প্রয়াস পাইল। কিন্তু যে নবীনানন্দ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, সেই নবীনানন্দের যত্ন ও চেষ্টায় মনোরমার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। নবীনানন্দ সমস্ত রজনী জাগিয়া সে কুটীরে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল। মনোরমা তখন উন্মাদিনী,—মনোরমা তখন জীবনে স্পৃহাশূন্যা।

কিশোরীদাস, নবীনানন্দের হস্তে পড়িয়া বন্দী হইয়াছে। প্রথমে সে

পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে অপরূপ জীবটির বিচারভার মহাপুরুষের উপর কল্পনায় ন্যস্ত করিয়া নবীনানন্দ অপরাধীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। কিশোরীদাস তখন কতকটা অনুতপ্ত; সে ভাবিতে লাগিল, এমন প্রলয়কাণ্ডে কেন সে লিপ্ত হইতে গিয়াছিল। সে হতভাগ্য, যাহাকে প্রণয়িনী ভাবিয়া প্রণয়-সিন্ধুতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, সে ত প্রণয়ের ধার'ও ধারিল না। পরন্তু সে সিংহিনী-স্বভাবা। তাহার পর সে যাহার হস্তে বন্দী হইয়াছে, সেও যে বিশেষ কোমল প্রকৃতির লোক, সে কথাও সে মনে করিতে পারিল না। কিশোরীদাস পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—কতকটা প্রণয়ের ঝোঁকে পড়িয়া আর কতকটা অর্থলোভে পড়িয়া সে একটা ভারী অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে অনুতাপ তাহার ক্ষণকালের জন্য। সুতরাং সে অনুতাপে তাহার কোনও লাভ হইল না।

প্রান্তরের দিকে চাহিয়া নবীনানন্দ মনোরমাকে কহিল—

"আপনি স্থির হন। পাপিষ্ঠ ত আপনার উপর অত্যাচার কর্‌বার অবসর পায় নাই। আপনি কেন নিরর্থক কষ্ট পাচ্ছেন, কেন আত্মঘাতী হ'বার চেষ্টা কর্‌ছেন? আত্মহত্যায় কাহারও অধিকার নাই। আমার কথা আপনি শুনুন, ভগবান্ অপনার মঙ্গল কর্‌বেন। আপনাকে অনেক বুঝিয়েছি। সমস্ত রাত্ আপনি আমার বক্তব্য শুনেছেন। একটু স্থির হ'ন। গুরুদেব এসে আপনার কল্যাণের পথ বলে দেবেন।"

কিন্তু সে কথা তখন শুনেই বা কে আর বুঝেই বা কে? তবে বারংবার সে কথা শুনিতে শুনিতে মনোরমা কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিল। মহাপুরুষের আগমন সংবাদ শ্রবণানন্তর সে কতকটা আশ্বস্তা হইয়াছিল। সে তখন ভাবিতে লাগিল—মহাপুরুষ সকলই করিতে পারেন। মনোরমা দীনা—দীনার উপায়ই বা কেন না হইবে?

উন্মাদিনীর শান্তভাব অবলোকন করিয়া উপদেশ-কর্ত্তার হৃদয়ে একটা অব্যক্ত আনন্দবেগ আসিল। আনন্দবেগে আনন্দময় হইয়া সে আনন্দ সঙ্গীত গাহিতে লাগিল—

মা যে আমার মায়ের মত
তুলনা কি মায়ের আছে।
যখন যেথায় থাকি আমি
মা থাকে গো পাছে পাছে।

হাসি কাঁদি মাকে নিয়ে,
আমার যে ভার মাকে দিয়ে
মায়ের কোলে মাকে ভেবে
ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার গেছে।
সার করেছি মায়ের চরণ,
মা যে আমার পরম কারণ,
আর ডেক না, আর ব'ল না
আছি আমি মায়ের কাছে
তা'র বল গো ভাবনা কিসের
মায়ের মত মা যা'র আছে!

গীত গাহিতে গাহিতে গায়কও তন্ময় হইয়া পড়িল, আর মনোরমাও সে গান শুনিয়া ভাবাবিষ্টা হইল। ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, শোক মনোরমার তখন আর কিছুই নাই। মনের স্বচ্ছন্দতা আসে নাই, কেবল কিশোরীদাসের। সে পাপী। প্রভাতে ভৈরবী রাগিণী তাহাকে কোনও সুখ, কোনও শান্তি দিতে পারিল না। পাপ চিন্তানলে তখনও সে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিমলানন্দ, রমেন্দ্রকিশোর ও বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সে সংবাদ নবীনানন্দ কিম্বা মনোরমা প্রভৃতি আদৌ রাখিতে পারে নাই। বিমলানন্দও সে সংবাদদানে বিরত হইলেন। সিদ্ধকণ্ঠ নবীনানন্দ যে গীত গাহিতেছিল, সাধকচূড়ামণি বিমলানন্দ তাহা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গীত থামিয়া গেল। তখন বিমলানন্দ ধীরপাদবিক্ষেপে কুটীর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রমেন্দ্রকিশোর ও বিশ্বনাথও প্রবেশ করিল।

গায়ককে দেখিয়া রমেন্দ্রকিশোর বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। অঙ্গুলী-সঙ্কেতে বিমলানন্দ তাহাকে স্থির হইতে বলিলেন।

মহাপুরুষকে দেখিয়া কিশোরীদাস থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিমলানন্দের মুখ তখন বড় গম্ভীর। মনোরমার ভাবাবেশ তখনও হয় নাই। গীতশব্দে তাহার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। বিমলানন্দ প্রথমে তাহার চৈতন্য সম্পাদনে যত্নবান্ হইলেন। রমেন্দ্রকিশোর একদৃষ্টিতে গায়কের মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল মাত্র। সে তখন নির্ব্বাক্, গায়কও আনতবদন—তাহার মুখেও তখন আর কোনও কথাই নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যব্রত ও মনোহর দাস যখন রমেন্দ্রের উদ্দেশে কল্যাণপুর যাত্রা করে, তখন মধুসূদন ও অহিশেখর রমেন্দ্রকিশোরেরই বাটীতে বসিয়া রমেন্দ্রকিশোরের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সত্যব্রতের কল্যাণপুর যাত্রার কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই বিশেষ চিন্তান্বিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, বিশ্বনাথ যদি বিশেষ সুবিধা না করিতে পারে, তাহা হইলেই ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে।

সেই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক গুপ্ত পরামর্শ চলিল। কিন্তু পরামর্শ করিয়া কেহই কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। তখন মধুসূদন অহিশেখরকে কহিল—

"তুমিই যাওনা না হয়। দেখই না ব্যাপার কি দাঁড়ায়!„

অহিশেখর তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত হইতে হুক্কাটী বামহস্তে লইয়া একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—

"তোমার যাওয়াই ভাল হে। পিতাপুত্রে পরামর্শ ক'রে তবু যা' হয় একটা কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে। তোমাদেরই ত কাজ হে। আমার কি বল?

সে কথায় মধুসূদন দারুণ বিরক্ত হইল। সে বিরক্তির সহিত বলিল—"কি রকম, আমাদের কাজ কি রকম? কেন তুমি কি টাকা কিছু অল্প পেয়েছ?"

অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় অহিশেখর বলিল—"টাকা! কিসের টাকা! পরের টাকায় আমি দিব হাত! পরের জিনিষে আমি ক'র্‌ব লোভ! রাম, রাম, রাম,—তুমি ব'ল্‌লে কিহে! পরের সম্পত্তি গ্রহণ ক'র্‌লে তুমি, আমি নিলেম টাকা! কি বল্‌ছ হে মধুসূদন! টাকার গদীতে ব'সে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি?

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলে লোক যেমন চমকিত হয়, অহিশেখরের কথায় মধুসূদনও সেইরূপ চমকিত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বিশুষ্কমুখে কহিল—

"মিত্রজ, তুমি বোধ হয় রঙ্গ কর্‌ছ—কিন্তু একি রঙ্গের সময় ভাই ? তুমি কি বুঝ্‌ছ না বিপদ তোমারও যেমন, আমারও তেম্‌নি। কি হাস্‌ছ যে ?"

"হাস্‌ছি—তোমার কথা শুনে। আমার আবার বিপদ কিসের ? রমেন্দ্রের বিষয়সম্পত্তি আমিত কিছুই গ্রহণ করি নাই। সে করেছ তুমি। বিপদ হয়, তোমারই হ'বে। আমার কি বল ? টাকা দেয়ই বা কে, আর নেয়ই বা কে ? রাম বল, রাম বল, তুমি অবাক্ ক'রে দিলে ভাই ?"

"তুমি বল্‌ছ কি মিত্রজ ?"

"ঠিক্ বল্‌ছি—চ'ক্ষু মুদে বল্‌ছি—বিষয়গ্রহণ করেছ তুমি, আর বিপদে পড়্‌বেও তুমি। আমি আমার হক্ পাওনা নিয়েছি মাত্র। আমার ভ্রাতৃ-জায়ার দ্রব্যাদি আমি দাবী করেছিলাম। ভয়েই হ'ক্ আর নির্ভয়েই হ'ক্ তুমি সেগুলা আমায় প্রত্যর্পণ করেছ বটে। সেটা তোমর দয়া কিংবা ভয় তা তুমিই জান ভাই ! যা' হ'ক্ আমি আমার পাওনা নিয়েছি। তা' মিথ্যা বল্‌ব না এমন অধর্ম্ম আমি করি না। পাওনা আমার কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পেয়েছি। তা'র বেশী যদি কিছু দিয়ে থাক ভাই, সেটা আমার পারিশ্রমিক—কি বল !"

পরস্বাপহরণকারী মধুসূদন তখন এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সে বিজড়িতস্বরে কহিল,—"পারিশ্রমিক !--পারিশ্রমিক—কিসের ? তুমিত রীতিমত বিষয়ের বখ্‌রা নিয়েছ ?"

"না বন্ধু তা' নয়। তুমি বল্‌ছিলে রমেন্দ্রকিশোর স্বেচ্ছায় তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি দান ক'রে গেছে—তুমি বিষয় দখল কর্‌তে পার্‌ছ না। তাই তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে। সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে পরামর্শ দিয়েছি ও যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। অঁ্যা,—কি বল হে ভাই, সেটা আর অমান্য কর্‌তে পার্‌বে না। সেইজন্য আমার এইপ ারিশ্রমিকের দাবী। আমি যদি জান্‌তেম, তুমি ঠক্, প্রবঞ্চক, রমেন্দ্রকিশোরের বিষয়ে তোমার কোনও অধিকার নাই, কিছুতেই আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হ'তেম না। এখন দেখ্‌ছি, রমেন্দ্র জীবিত—তুমি প্রতারক। অতএব এখন থেকেই তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। তোমার কোনও কথাতে আর আমি থাক্‌ব না।"

অহিশেখরের কথা শুনিয়া মধুসূদনের চক্ষু অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। অহিশেখর বুঝিল, মধুসূদন তখন ব্যাঘ্রবৎ হিংসাপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। তখন তাহার পক্ষে সমস্ত অকার্য্য কুকার্য্য সম্ভবপর। কালবিলম্ব না করিয়া

অহিশেখর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ প্রদান করিয়া মধুসূদন অহিশেখরকে ধরিতে ছুটিল। অহিশেখর তখন প্রাণভয়ে পলায়মান হইয়া দ্রুতগতিতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া সোপান শ্রেণীতে নামিতেছে। মধুসূদন তখন উন্মত্তবৎ। সোপান-শ্রেণী অবলম্বন করিয়া নামিবারও তাহার ধৈর্য্য ও অবকাশ রহিল না। লম্ফপ্রদানে সে অহিশেখরকে ধরিতে গেল। তাহার ফলে বার্দ্ধক্যসীমায় উপনীত প্রায় মধুসূদন দ্বিতল হইতে নিম্নতলে পতিত হইল। আঘাতটা সাঙ্ঘাতিকই হইয়াছিল। বাটীতে একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। ততক্ষণে অহিশেখর আপন বাসস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

অহিশেখরের ভাগ্যও মন্দ ছিল। বিধাতার বিধান তাহার প্রতিও কঠোর হইল। তাড়াতাড়ি অঙ্গণ পার হইতে যাইয়া অহিশেখর লক্ষ্য করে নাই যে দ্বারের পার্শ্বেই "মাছকাটা" একখানা বড় "বঁটি" পড়িয়া আছে। অসাবধানতা বশতঃ পদস্খলিত হইয়া বঁটিখানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহাতে অঙ্গণে রক্তস্রোত বহিল। অহিশেখরের রক্তাক্ত কলেবর। তাহার উদর ভাগ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার আসিয়া তাহাকে হাঁস-পাতালে পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তারের কথা—রোগীর জীবনের আশা অতি অল্প।

সত্যব্রত প্রভৃতি তখন তারকেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। সেখানে পৌঁছাইতে তাহাদের রাত্রি হইয়াছিল। সুতরাং সেদিন আর তাহাদের কল্যাণপুর যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। স্থানীয় লোকেরা কহিল—রাত্রিকালে সে পথে চলা বিপজ্জনক। সুতরাং বাধ্য হইয়া সে রাত্রি তাহাদের সেইস্থানে কাটাইতে হইল। পরদিন প্রভাতে একজন স্থানীয় লোককে সঙ্গে লইয়া তাহারা গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল। যানবাহন কিছুই পাওয়া যায় না। যানাদি ব্যবস্থা করিয়া লইবার জন্য সত্যব্রত একজন লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া গেল।

তাহারা পদব্রজেই চলিল। পদব্রজে যাইতে যাইতে তাহারা দেখিল, পথিপার্শ্বস্থ পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরগুলি ভীষণ জলপ্লাবনের ভীষণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। প্রান্তর ক্ষেত্রেও সে স্মৃতি জাগিয়া আছে বটে—কিন্তু স্থানে স্থানে নবীন শ্যামল শস্যগুচ্ছ কতকটা সান্তনার স্থল হইয়াছে।

কল্যাণপুরে যখন তাহারা উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যকর খরতর হইয়া

উঠিয়াছে। কিশোরীদাসের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যব্রত কুটীরাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিল, তাহাতে সে কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। তৎপরে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া যাইয়া সে রমেন্দ্রকিশোরকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের তখন কি আনন্দ! আনন্দ-বেগে কাহারও মুখে কোনও কথা নিঃসৃত হইল না—আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া তাহারা পরস্পর নীরবে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া বিমলানন্দ ভারতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—কে বলে সংসার নিষ্ঠুর, সংসার মরুভূমি! যে সংসারে এমন বন্ধুপ্রীতি, এমন মানবতা, সে সংসার কি নিরানন্দ হইতে পারে?

মনোহর দাসের নয়নে তখন আনন্দাশ্রু বহিতেছিল। সে রমেন্দ্রকিশোরকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। হারানিধির দর্শন পাইয়া সে যে কি আনন্দসাগরে ভাসিতেছিল, তাহা কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে? তখন মনোহর দাসের চক্ষেও অশ্রুধারা আর রমেন্দ্রকিশোরের চক্ষেও অশ্রুধারা। ধারা নাই কেবল সত্যব্রতের চক্ষে। নয়ন বিস্তার করিয়া কুটীরমধ্যে সে কি একটা অলৌকিক পদার্থ দেখিতেছিল।

বিমলানন্দের পবিত্রস্পর্শে এবং সাতিশয় যত্নে মনোরমার জ্ঞান হইয়াছিল বটে,—কিন্তু রমেন্দ্রকিশোরকে দেখিয়া সে কি যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু রমণীর ধৈর্য্য ও মানসিক বল অমানুষিক। সেই শক্তিবলে সে আপনাকে কতকটা সংযত রাখিতে পারিল। তবে রমেন্দ্রকিশোরের সম্মুখে সে আর থাকিতে পারিল না—কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মানসিক উত্তেজনা তাহার যথেষ্টই হইয়াছিল। তাহারই ফলে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিমলানন্দ ভারতী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি নবীনানন্দকে তাহার সেবার জন্য গৃহমধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গুরুর আদেশে শিষ্য তখন মনোরমাকে ব্যজন করিতে লাগিল।

সত্যব্রত সেই দৃশ্যই একাগ্রচিত্তে দেখিতেছিল। তাহার লক্ষ্য মনোরমা

নহে—নবীনানন্দই তাহার লক্ষ্যস্থল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সত্যব্রত আপনাকে রমেন্দ্ররকিশোরের আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিল। তাহার পর বিমলানন্দ ভারতীও অন্যান্য সকলের মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল। অবশেষে সে ছুটিয়া যাইয়া নবীনানন্দকে আপন বাহুমধ্যে আবদ্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

"পাঁচু, পাঁচু, আমার পাঁচু!"

সত্যব্রতের আর সংজ্ঞা নাই। সজ্ঞাহীন হইয়া সে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া তখন সত্যব্রতের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সেই অবসরে কিশোরীদাস ও বিশ্বনাথ নিঃশব্দে সেস্থান হইতে পলায়ন করিল।

সত্যব্রতের জ্ঞান হইলে, সে দেখিল পাঁচুগোপাল তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে, আর রমেন্দ্রকিশোর ও মনোহর দাস তাহাকে ব্যজন করিতেছে, বিমলানন্দ ভারতী তখন বড় গম্ভীর—গুরুর সে গাম্ভীর্য্য দেখিয়া শিষ্যকেও অগত্যা গম্ভীর হইতে হইল।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সত্যব্রত উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল বিমলানন্দ ভারতী তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন।

এইবার বিশ্বনাথ ও কিশোরীদাসের অনুসন্ধান হইতে লাগিল! কিন্তু তখন তাহারা কোথায়! বিমলানন্দ হাসিয়া বলিলেন—

"মাকড় আপন জালেই আপনি জড়ায়। ভগবানের কি কারখানা!"

সেই সময় রমেন্দ্রকিশোর আসিয়া বিমলানন্দ ভারতীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া ভারতী হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি অন্যের চক্ষে অর্থশূন্য বটে; কিন্তু সে হাসির মধ্যে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল।

রমেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু বাহিরে এলেন যে?"

বিমলানন্দ হাসিয়াই কহিলেন—"রোগে। যা'হক ও রোগীর এখন খবর কি?"

"ভাল।"

"রক্ষা হ'ল। এরূপ অবস্থায় অনেকেরই জীবনসংশয় হয়। সেই জন্যই একটু চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়েছিলাম।"

রমেন্দ্রকিশোর তখন ভারতীকে পাঁচুর "পুনর্জ্জন্মের" কথা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি সে কথার বিশেষ কোনও উত্তর দিলেন না বা দিতে চাহিলেন না। বিমলানন্দ ভারতী কেবলমাত্র কহিলেন—"সে সকল কথার এখন সময় নয়।

হারাধন ফিরে পেয়েছে, সেই ভাল। অত কথার আবশ্যক কি? এই যে তুমি কাল রাত্রে আমায় শ্মশানে দেখ্‌লে, তা'তে তোমার কি উপকার হ'ল না হ'ল সে কথা জিজ্ঞেস্‌ করেছ কি? আমার কাজ হ'ল ঘোরা, দিন্‌ রাত্‌ ঘোরা—বিশ্রাম নাই—অবিশ্রাম ঘোরা; তা'তে কা'রও হয়ত কোনও কাজ হয়ে গেল, কা'রও হয়ত হ'ল না—তা'তে এল গেল কি? মা আমার যা' করেন, তা' জীবের মঙ্গলের জন্য। অত বাজে কথায় কাজ কি বাপু?"

রমেন্দ্রকিশোর অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। বিমলানন্দ তাহার অপ্রতিভভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে একটু দয়া করিলেন। পাঁচুগোপালের সম্বন্ধে তিনি কহিলেন—

"বালক অভিমানভরে গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ কর্‌তে গিয়াছিল। কিন্তু তা'তে সে কৃতকার্য্য হয় নি। অচৈতন্য অবস্থায় সে ভেসে যাচ্ছিল, কালীঘাটের গঙ্গার মুখে আমি তা'কে পেয়েছিলাম। সেই অবধি সে আমার নিকটেই আছে। এখন, তোমাদের জিনিষ তোমরা ফিরে নিয়ে যাও। কি এত কথা তোমার বন্ধুকে ব'ল না। কা'র উপরে অভিমান, কিসের অভিমান—সে প্রসঙ্গ উঠ্‌লে আবার আগুণ জ্বলে উঠ্‌বে। সংসারকে আমি বেশ চিনেছি। তাই ত সংসারে থেকেও থাকি না।"

কথা বলিতে বলিতে বিমলানন্দ ভারতী আবার কুটীরাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রমেন্দ্রকিশোরও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। সত্যব্রত তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। সে পাঁচুগোপাল ও মনোহর দাসের সহিত তখন বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মনোরমা একপার্শ্বে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। সে তখন ভাবিতেছিল, দুই দশ ঘণ্টার ভিতর কত কাণ্ডই না ঘটিয়া গেল।

সত্যব্রত অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঁচু গোপালের নিকট হইতে তাহার সম্বন্ধে কোনও তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে পারিল না। সকল কথাতেই পাঁচু-গোপাল কহিল—"সে সকল কথা মহাপুরুষ জানেন। তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা।"

রমেন্দ্রকিশোর মধ্যস্থ হইয়া সে সকল কথার আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল এবং আহারাদি করিয়া সেই দিবসের অপরাহ্ণেই যে যাত্রা করিতে হইবে, সে কথা শুনাইয়া দিল। কল্যাণপুর আর তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না।

শিবিকা প্রভৃতি ইতিমধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছিল। আহারাদির পর সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। পাঁচুগোপাল তখন বিমলানন্দ ভারতীর

চরণ ধারণ করিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে কহিল—“দয়াময়, আবার কবে দেখা পা'ব ?”

বিমলানন্দ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“দেখা চাইলেই দেখা পাবে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে যাও। কর্ত্তব্যপালন কর, অভিমানবশে আর আত্মহারা হ'য়ো না।”

অভিমানের কথা, আত্মহারা হওয়ার কথা শুনিয়া সত্যব্রত একটু চমকিত হইল। বিমলানন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি অন্য পাঁচ কথায় সে কথা চাপা দিয়া যাত্রাটা যাহাতে শীঘ্র হয়, তাহাই করিতে বলিলেন।

রমেন্দ্রকিশোর ও সত্যব্রত তখন ভারতীকে ধরিয়া বলিল,—তাঁহাকেও তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। বিমলানন্দ কহিলেন—“যা'ব বৈ কি—কিন্তু পরে। এখনও এখানকার কাজ অনেক বাকী। জীবসেবাই আমার ধর্ম্ম ও সেবাই আমার কর্ম্ম। সেবাকার্য্যেই আপাততঃ এখানে আমার অবস্থিতি।”

সে কথার পর আর কেহ সে সম্বন্ধে কোনও কথা কহিতে সাহস করিল না। বিমলানন্দের আদেশে সকলে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিল। ধীরপাদবিক্ষেপে ভারতী প্রান্তরপথে মহাশ্মশানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

বিশ্বনাথ ও কিশোরীদাস পলাইয়া আসিয়া গ্রামান্তরে জনৈক গৃহস্থের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিল। তাহাদের অভিপ্রায় দুই এক দিন সেইস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া পরে অভীষ্টস্থানে গমন করিবে। অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহস্থ অতিথি-দ্বয়কে নিঃসঙ্কোচে সে গৃহে স্থান দিল। অতিথিদ্বয় কিন্তু গৃহস্থের ঋণ পরিশোধের উপায় স্থির করিল চমৎকার।

গৃহস্থের একটী যুবতী কন্যা ছিল। কিশোরীদাস তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া একটু রঙ্গ করিল। বিশ্বনাথও সে রংতামাসায় যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ

হইল না। পিতৃসমক্ষে ও ভ্রাতৃগণের নিকটে কন্যা সকল কথা জ্ঞাপন করিলে, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হইল অনুরূপ। সে ব্যবস্থায় বিশ্বনাথের একটি চক্ষু বিষম আঘাত পাইল এবং কিশোরীদাসের বাম কর্ণখানা খসিয়া পড়িল। তাহাতেও তাহারা নিস্তার পায় নাই। মাথা মুড়াইয়া তাহাদের মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ যখন তাহার পিতৃসমীপে উপস্থিত হইল, তখন তাহার একটী চক্ষু গিয়াছে। তাহার পিতা মধুসূদনও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অহিশেখর মিত্রও যে তাহার পিতার ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রমেন্দ্রকিশোরের দয়ার অন্নে জীবনযাপন করিতেছে, সে কথা শুনিতেও বিশ্বনাথের বাকী রহিল না। বিশ্বনাথ তখন পিতার প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। পুত্র কহিল, "পিতা সজ্জন হইলে তাহাদের আর তেমন দুর্দ্দশা ঘটিত না।"

* * * * *

কিশোরীদাস ভিক্ষুক বৈষ্ণব। দেশান্তরে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া সে জীবনাতিপাত করিতে লাগিল। তবে সাধ্যপক্ষে সে আর পরদারের প্রতি কুটীল দৃষ্টিপাত করে না। তাহার একটা কর্ণ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার নাম হইল কাণকাটা বৈষ্ণব। সেই নামেই সে পরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

* * * * *

পাঁচুগোপাল গৃহে ফিরিল; সকলের আদরেও রহিল বটে, কিন্তু গৃহ আর তাহার ভাল লাগিল না। সুযোগ পাইলেই সে কালীঘাটে তাহার গুরুদেব বিমলানন্দের নিকট চলিয়া যাইত এবং আবশ্যকানুসারে পরিচিত ও অপরিচিতের "ব্যাগার দিত।" তাহার মাতুলানী সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, তাহার মাতুল সত্যব্রত বলিত—"চুপ্ রহো মাগী. উন্‌কা যৌন্ খোসি, তৌন্ করেঙ্গা। জাননা, তোমাদের বুদ্ধির দোষে ওকে একবার হারিয়েছিলাম। আমি সব শুনেছি, সব জানি। তোমরা চুপ্ ক'রে থাক। না থাক ত আমি আবার রেগে হিন্দি কথা বলব—হাঁ। অনেক সাধ্য-সাধনায় আমার হারাধন ফিরে পেয়েছি। ওর যা খুসী ও তাই করবে। কেউ কথা কয়ো না —হাঁ।"

কাজে কাজেই সে কথায় আর কেহ কথা কহিতে সাহস করিল না! পাঁচুগোপাল বিমলানন্দের নিকট প্রায়ই যাইয়া থাকে এবং বিমলানন্দ

ভারতীও মধ্যে মধ্যে সত্যব্রতের বাটীতে আসিয়া সকলের সংবাদ লইয়া থাকেন। তাহাতে সত্যব্রতের কৃতজ্ঞতার আর সীমা নাই।

* * * * *

মনোরমার মাতা সাবিত্রীসুন্দরী,—বিমলানন্দ ভারতীর চিকিৎসাগুণে আরোগ্য লাভ করিল বটে, কিন্তু ভীষণ জলপ্লাবনে তাহার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে দুঃখের স্মৃতি তাহার হৃদয় হইতে আর কিছুতেই ঘুচিল না। তবে মনোরমাকে ফিরিয়া পাইয়া শোকসন্তপ্তা জননী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার শোকের প্রাবল্য হইত। হরকুমার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা অনেক সময়ে বিফল হইত। শোকাতুরার শোক-গাথা হইয়াছিল—"রমা এল, কিন্তু খোকা এল না কেন?"

মনোরমা এখন রমেন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী। বাটী প্রত্যাগমনের পর সত্যব্রত ও সত্যব্রতের পত্নীর ঘটকালিতে শুভোদ্বাহ শুভদিনেই সম্পন্ন হইয়া গেল। রমেন্দ্রকিশোরের সুখের এখন আর সীমা নাই। মনোহরদাসের উপর সমস্ত বিষয়-কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া সে এখন মনোরমার মনস্তুষ্টি সাধনেই যত্নবান্। সত্যব্রত সেই কথা লইয়া কত রঙ্গ বিদ্রূপ করে। কিন্তু রমেন্দ্র তাহাতেও অন্দরমহল ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় না। সত্যব্রত মনে মনে ভাবিল—'হায় পিসীমা, তুমি এখন কোথায়?"

তিন চারি বৎসর এইরূপেই কাটিয়া গেল। একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ছাদে বসিয়া রমেন্দ্রকিশোর ও মনোরমা উভয়ে মিলিয়া একটী শিশু-সন্তানকে আদর করিতেছিল। সেই সময়ে সত্যব্রত আসিয়া নিম্নতল হইতে ডাক দিল —"রমি, আছ?"

উপরতল হইতে উত্তর আসিল—"বড় ব্যস্ত আছি হে, জলধি ছাড়ছে না, তুমিই উপরে এস সতু।"

জলধি অর্থে খোকা—রমেন্দ্রকিশোরের পুত্র। খোকার নাম "জলধি" রাখার একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস সেই ভীষণ জলপ্লাবনের সহিত জড়িত।

সত্যব্রত বুঝিল রমেন্দ্রকিশোরের "জলধি" তাহাকে ছাড়ুক বা না ছাড়ুক্, রমেন্দ্রকিশোর মনোরমাকে ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতে চাহিতেছে না। অগত্যা তাহাকে উপরেই উঠিতে হইল। সত্যব্রতের পদশব্দ শুনিয়া মনোরমা পলাইয়া যাইতেছিল। রমেন্দ্রকিশোর সোহাগে সোহাগিনীর অঞ্চল ধরিয়া বলিল—"সতুর কাছে এখনও লজ্জা!"

সে কথা সত্যব্রত শুনিতে পাইয়াছিল। গম্ভীরভাবে সে কহিল—"সেটা

ন্যায় কি অন্যায় তা'র বিচারের ভার জলধির উপর দাও। জলধি বিচারক ভাল—সে নিশ্চয় এটার সুমীমাংসা করিয়া দিবে।"

জলধি বোধ হয় সে কথা বুঝিল। মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে তাহার মাতার ঘোম্‌টা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল এবং উচ্চহাস্যে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহাতেও ঘোম্‌টাবৃতার ঘোম্‌টা খুলিল না।

মনোরমা এ কালের অনেক সুন্দরীর মত লজ্জাটাকে "শিকায়" তুলিয়া রাখিতে পারে নাই। লজ্জাই রমণীর সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্যে সে বঞ্চিত ছিল না। বাঙ্গালীর মেয়ের ঘোম্‌টা সরিলে আর থাকে কি ?

সত্যব্রত হাসিয়া কহিল—"ঠিক্ বিচার হয়েছে। জলধি না হ'লে এমন বিচার করে কে ?"

জলধি মাতার কোল ছাড়িয়া পিতার কোলে আসিয়া বলিল—"বাব্-বা-তামি।"

পিতা সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিল এবং শশধরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"সতু, মনে পড়ে কি সেই জলপ্লাবন ?"

সত্যব্রত কম্পিতকণ্ঠে কহিল—"পড়ে বই কি ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেন্দ্রকিশোর কহিল,—"সেই জলপ্লাবনই আমাদের অনন্ত দুঃখ, আর সেই জলপ্লাবনেই আমাদের অনন্ত সুখ।"

উত্তেজিত ভাবে সত্যব্রত বলিল,—"নিশ্চয়! সেই জলপ্লাবনের ফলেই পাঁচুগোপালকে আমি ফিরে পেয়েছি, আর সেই জলপ্লাবনের ফলেই তুমি সংসারী হয়েছ।"

সে কথা শুনিয়া রমেন্দ্রকিশোরের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল—তাহার পিসীমাতার স্মৃতিতে; আর দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল সত্যব্রতের নয়নে—আনন্দাবেগে।

মনোরমা আর সে স্থানে দাঁড়াইল না। সে দ্রুতপদে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তাহার চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত। জলপ্লাবনের কথা, তাহার মাতৃভূমির কথা, তাহার ভ্রাতার কথা, তাহাদের গৃহহীন হইবার কথা, তাহার মনে পড়িল—তাহার স্মৃতিসাগর আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিল—বন্যার জলে না ভাসিলে সে ত আজ রমেন্দ্রকিশোরের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারিত না।

চন্দ্রদেব মেঘের আড়ালে লুক্কাইত হইলেন। অন্ধকারের ছায়া দেখিয়া জলধি হস্তবিস্তার করিয়া কহিল,—"বাপি, যা দাব।"

সকলে তখন নীচে নামিয়া আসিল। পাঁচুগোপাল তখন গীত গাহিতেছে—

"যবে মুক্ত গগনে শান্ত পবনে
চন্দ্রকিরণ বহিয়া যায়,
মম চিত্ত-চকোর নৃত্য করে যে
নিত্য পীযূষ ভকিতে চায়!
যবে গভীর গরজে জলদ বাহিনী,
শুনাইতে জীবে প্রলয় কাহিনী,
হুঙ্কারে বায়ু উথলে সিন্ধু
তুঙ্গ শৃঙ্গ খসিয়া যায়;
চমকে চপলা বাঁধিয়া নয়ন,
দীপ্ত প্রখর দ্বাদশ তপন,
দগ্ধ ধরণী লুপ্ত সলিলে
তখনো আমি যে তোমারি ছায়॥
তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ,
সত্য শুধু হে তোমারি চরণ,
কেন সে ভ্রান্তি, কিসের ক্লান্তি
কিসের জন্ম মৃত্যু হায়,
যুক্ত তোমাতে আমি হে মুক্ত
পড়িয়া আছি যে তোমারি পায়॥"

গায়ক, মিশ্র-মল্লার সুরে গীতটী গাহিতেছিল। সে সুর, সে ভাষা—জলপ্লাবনের ছবি শ্রোতৃগণের কল্পনার চক্ষে প্রস্ফুট করিয়া দিল এবং অনন্ত জীবনে অনন্ত সুখের কথাও বিজ্ঞাপিত করিল। তখন সকলে বুঝিল, ভগবৎ পদে গতি থাকিলে, ভগবানের নামে রুচি থাকিলে, তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারিলে জলপ্লাবনেও যে আনন্দ, কৃপাকর ধরাতেও সেই আনন্দ। আনন্দ-গীতিতে তখন সকলে আনন্দময় হইয়া উঠিল। সেই ভীষণ জলপ্লাবনের কথা তখন আর কাহারও মনে রহিল না। পাঁচুগোপালের সেই গীত তাহাদের কাণে দূরাগত বেণুধ্বনির ন্যায় বাজিতে লাগিল। কাণের ভিতর দিয়া তাহা তাহাদের মরমে পশিয়াছিল।

কষ্টি-পাথর

[শ্রীজলধর সেন]

"দেখ ঈশেন, মেয়ের বিয়েতে আমি অত টাকা দিতে পারবো না। কালো মেয়ে ব'লে কি যথাসর্ব্বস্ব বিয়েতেই খরচ কোরতে হবে? তুমি তিন চার শো টাকার মধ্যে একটা ছেলে দেখ।"

"কর্ত্তা, তিন চারশো টাকায় এখন মেয়ের বিয়ে কেন, একটা পুতুলেরও বিয়ে হয় না। লক্ষীর কৃপায় আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, এ দিকে সন্তানের মধ্যে একটী ছেলে, আর ঐ মেয়েটী; মেয়ের বিয়েতে আপনি বিশ হাজার টাকা খরচ কোরতে পারেন।"

কর্ত্তা রামনিধি বসু হাসিয়া বলিলেন, "ঈশেন, তোমরা পাগল! বিশ হাজারে কত টাকা, তার হিসেব আছে? বিশ হাজার টাকার সুদ কত জান? এই ধর, চোটায় খাটালে মাসিক শতকরা তিন টাকা দুই আনা সুদ, যে সে বাপের সুপুত্র হয়ে দিয়ে যাবে। তা হ'লে বছরে শতকরা কত সুদ হ'লো জান? এক বছরে একশো টাকায় সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা——তিন বছরে ডবল। তুমি আমায় ফতুর ক'রবে নাকি?"

ঈশান বলিল, "কি বল্লেন, একে মেয়েটী কালো, তারপর আপনি ভাল ছেলে চান, তার উপর আবার আপনার নাম ডাক আছে।"

কর্ত্তা এইবার রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "মেয়ে কালো ব'লে কি আমি লুঠের মহল হ'য়েছি। দুই হাজার টাকা মেয়ের বিয়েতে দেবো? যারা দু'হাজার টাকা চায়, তারা কোন দিন দু'হাজার টাকা রোজগার কোরেছে? দেখ ঈশেন, তিনশো——বড় জোর চারশো, এরই মধ্যে ছেলে পাও সন্ধান করো, তাতে না হয়,—আমি মেয়ে আইবুড়ো রাখবো। দুই হাজার টাকা গাছের ফল আর কি!"

ঘটক চলিয়া গেল বটে, কিন্তু কর্ত্তা রামনিধি বসুর মনে তখনও সেই দুই হাজার জাগিতেছে। তিনি আপনা আপনিই বলিতেছেন, "বেটা বলে কিনা দুই হাজার! আড়াই হাজার টাকা দিলে মজুমদারদের ঐ বাড়ীখানা মর্টগেজ রাখা যায়। খুব মার্জ্জিন আছে। দুই বৎসরের মেয়াদ, বার টাকা সুদ! আর বেটা বলে কিনা হাবাতে ছেলেকে দুই হাজার টাকা দিই! মেয়ে যদি সাত জন্ম আইবুড়ো থাকে, সেও ভাল, আমি চারশোর উপর এক

পয়সাও খরচ করছি না। বেশ ত, আমার ছ পয়সা আছে,—তাই বলে কি কল্পতরু হ'তে হবে। পাজী বেটারা,—নচ্ছার বেটারা!"

কর্ত্তা বসু মহাশয়ের বক্তৃতা অনেকক্ষণ চলিত ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অন্দর হইতে তলব আসিল ; তিনি অস্পষ্টস্বরে কি বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের পর দুই মাসের মধ্যেই চিত্রগুপ্তের গদীর সুদের হিসাবকারীর পদ শূন্য হওয়ায় কর্ত্তা রামনিধি বসু সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। মজুমদারদের বাড়ীটাও মর্টগেজ রাখা হইল না, দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া কালো মেয়ে সুশীলারও বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল না।

একমাত্র পুত্র প্রশান্তকুমার বিদ্যাসাগরের কলেজে বি, এ, পড়িতেছিল— বেশী পয়সা খরচ হইবার ভয়ে বসু মহাশয় ছেলেটীকে প্রেসিডেন্সি কলেজে দেন নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই তিনি ছেলেটীকে কাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু ছেলের বিশেষ আগ্রহে এবং গৃহিণীর তাড়নায় মাসিক তিন টাকা বেতন প্রদানের গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, বই কিনিবার টাকা ও অন্যান্য খরচ প্রশান্তকুমার অতি গোপনে তাহার মামার নিকট হইতে আনিত।

পিতা মারা গেলেন, সহরের চারিদিকে হাণ্ডনোটে, মর্টগেজে, চোটায়, প্রায় লক্ষাধিক টাকা ছড়ান রহিয়াছে। খরচের ভয়ে বসু মহাশয় উপযুক্ত কর্ম্মচারী রাখেন নাই, সমস্ত কাজই নিজে করিতেন,—সুতরাং মাতুলের পরামর্শ অনুসারে প্রশান্তকুমার পড়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, ছোট আদালত, আর উকিলের বাড়ী যাতায়াতেই তাহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একদিন তাহার মা বলিলেন, "বাবা প্রশান্ত, যা হবার তা ত হ'য়ে গেল। এখন সুশীলার বিবাহের একটা সম্বন্ধ দেখ। কর্ত্তা ত আজ কাল ক'রে স্বর্গে চ'লে গেলেন। মেয়ে কি আর ঘরে রাখা যায়, চোদ্দ পেরিয়ে পনর বছরে পা দিতে গেল যে।"

প্রশান্ত বলিল,—"মা, সে কথা আমি দিন রাতই ভাবছি। এই কাজকর্ম্ম-গুলো একবার দেখে শুনে বুঝে নিয়েই সুশীলার বিবাহের ব্যবস্থা কোরবো। আজ পৌষ মাস, এই সুমুখের ফাল্গুনেই সুশীলার বিয়ে দেবোই, তুমি কোন চিন্তা কোরো না।"

তাহাই হইল। ফাল্গুন মাসেই সুশীলার বিবাহ হইল। বাগবাজারের রামগতি মিত্রের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; কোন এক সওদাগরের আফিসে তিনি একশত টাকা বেতন পান; নিজেদের একটা বাড়ী আছে। তাঁহারই একমাত্র সন্তান দুর্গাগতির সহিত সুশীলার বিবাহ হইল। দুর্গাগতি হেদোর কলেজে তখন এল, এ পড়িত। এ বিবাহে প্রশান্তকুমারকে একটু বেশী টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। রামগতি মিত্রের কিছু ধার ছিল; পাওনাদারেরা ডিক্রী করিয়া তাঁহার বাড়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছিল। প্রশান্তকুমার সেই ডিক্রীর সাত হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন, রামগতির তখন যে বিপদ, তিনি তখন আর কালো মেয়ে বলিয়া আপত্তি করিতে পারিলেন না; ছেলেকে বুঝাইলেন যে, এ বিবাহে অস্বীকার করিলে পথে দাঁড়াইতে হইবে। ছেলেও বোধ হয় তখন বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণী পড়িয়াছিল। সে হয় ত মনে মনে আওড়াইল—

"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা"।

বুড়া রামনিধি যে মেয়েকে চারিশত টাকায় পার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র প্রশান্ত সেই মেয়ের বিবাহে নগদ সাত হাজার, মেয়ের অলঙ্কারপত্রে পাঁচ হাজার এবং অন্যান্য ব্যয়ে তিন হাজার—মোট পনর হাজার টাকা খরচ করিয়া বসিল। তাহার পিতা স্বর্গ হইতে পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া কি ভাবিতেছিলেন বা কি করিয়াছিলেন সে সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বিবাহে খরচটা কিছু বেশী হইল। কিন্তু প্রশান্ত অনেক ভাবিয়াই এত টাকা ব্যয় করিয়াছিল। সে তাহার এই ছোট ভগিনীটীকে বড় ভাল বাসিত। মেয়েটী কালো বলিয়া আর সকলে যখন তাহাকে অনাদর করিত, তখন প্রশান্ত সেই কালো মেয়েটীকে পরম আদরে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইত, সুশীলাকে কেহ কালো বলিলে তাহার প্রাণে বড়ই লাগিত, সে বলিত, "আমার বোন কি শুধু কালো—ও যে কষ্টি-পাথর।" তাহার পিতা যখন যে সে ছেলের হাতে সুশীলাকে দিবার প্রস্তাব করিতেন, তখন প্রশান্ত নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিত; মায়ের নিকট মামার নিকট, বলিত; কিন্তু মা মামা এ ক্ষেত্রে কিছুই করিতে সাহসী হইতেন না। রামনিধি বসুর টাকার তহবিলে হাত দিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। পিতার মৃত্যুর পর যখন এই সম্বন্ধ উপস্থিত হইল, তখন প্রশান্ত ভাবিল, ভদ্রলোক বড়ই বিপদে পড়িয়াছে, এ সময়ে

তাঁহাকে এই ভাবে সাহায্য করিলে সে চিরদিন এ কথা মনে রাখিবে। তাহার কারণ ভগিনীটিকে সে বা তাহার ছেলে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরেও কোন প্রকার অযত্ন করিতে পারিবে না।

সুশীলা স্বামি গৃহে গমন করিবার দশ দিন পরেই হঠাৎ ওলাউঠা রোগে তাহার শ্বশুর রামগতি মিত্র মারা গেলেন। একে কালো মেয়ে দেখিয়াই মিত্র-গৃহিণী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়াছিল, সাত হাজার নগদ ও মেয়ের অলঙ্কার পাঁচ হাজার এই বার হাজার টাকাতেও কালো মেয়ে ঢাকা পড়ে না বলিয়া মিত্র-গৃহিণী বিবাহের পরদিন মেয়ে দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, এই মেয়ে পার করিতে হইলে, মেয়ের মা ভাইয়ের অন্ততঃ পঁচিশ হাজার টাকা ঘুস দেওয়া উচিত ছিল। পরের টাকা আত্মসাৎ করিবার সময় কয় শোতে হাজার হয়, কত টাকায় শত হয় এ কথা অনেক পুরুষেই ভুলিয়া যান—মিত্র-গৃহিণী ত রমণী! তাহার পর বিবাহের দশ দিন যাইতে না যাইতেই যখন মিত্র পরিবারের একমাত্র অবলম্বন রামগতি মিত্র স্ত্রী ও পুত্রকে অকূলে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন, তখন এই কালো মেয়ের দৃষ্টিতেই যে, এমন অঘটন ঘটিয়াছে এ বিষয়ে মিত্র গৃহিণীর মনে অণুমাত্রও সংশয় থাকিল না।

এ দিকে মিত্র-নন্দন দুর্গাগতি পৈতৃক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া কি করিবেন এই ভয়ে, "পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ" নজির স্বরূপ খাড়া করিয়া যদিও বিবাহে সম্মত হইয়াছিল. কিন্তু আজ কালকার কলেজে পড়া সহুরে ছেলে যে মনে মনে তাহার এই পত্নীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল, তাহা যদিও বিবাহের পূর্ব্বে প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনই সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল; ফুলশয্যার রাত্রিতে সে আধ ঘণ্টার জন্য ফুল-বাসরে গিয়া বসিয়াছিল। পরের দিন কোন মতে বৌভাত শেষ করিয়াই সুশীলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দুর্গাগতি নানা অছিলা করিয়া যোড়ে গেল না। তাহার পর অকস্মাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় দুর্গাগতি যেন পৃথিবী অন্ধকার দেখিল, তখন তাহার মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, এই ডাইনি বৌয়ের চোখ লাগিয়াই বাবু মারা গেলেন; ও বৌয়ের দৃষ্টি পড়িলে দুর্গাগতিও উপিয়া যাইবে। সুশীল ও সুবোধ দুর্গাগতি একথা বেশ বুঝিল—সে সুশীলার উপর আরও খড়্গহস্ত হইল।

এই বার চৌদ্দ দিনের ব্যাপার সমস্তই প্রশান্তকুমার জানিতে পারিল। সে

তাহার বড় আদরের ভগিনীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কাতর হইল! প্রতিবিধানের কি উপায় করিবে তাহা সে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে সে স্থির করিল, অর্থ ব্যয় করিয়া সে দুর্গাগতিকে কৃতজ্ঞতার ভারে অবনত করিবে।

রামগতির মৃত্যুর দুই দিন পরেই প্রশান্ত দুর্গাগতিদিগের বাড়ীতে গেল। তাহাকে দেখিয়া দুর্গাগতির মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবু আমাদের পথে বসিয়ে গিয়েছেন; এখন যে আমাদের কি হবে, সেই ভাবনাই প্রধান হয়েছে। ছেলেটার কি হবে, এ সংসার কি ক'রে চল্‌বে, কার কাছে দাঁড়াব।" এই কথা শুনিয়া প্রশান্ত বলিল, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না; রামগতিবাবু চলিয়া গিয়াছেন, আমি আছি। আমি যতদিন খাইতে পাইব, ততদিন আপনাদের কোন অভাব হইবে না। আপনি আমাকে আপনার ছেলে বলিয়া মনে করিবেন। দুর্গাগতির পড়াশুনা যেমন চলিতেছে, তেমনই চলুক। রামগতিবাবু মাসে একশত টাকা বেতন পাইতেন, আমি সে টাকা মাসে মাসে আপনাকে পাঠাইয়া দিব। শ্রাদ্ধের যাহা কিছু ব্যবস্থা তাহা আমি করিব; সেজন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। দুর্গাগতির পড়াশুনা শেষ হইলে সে যাহাতে একটা বড় চাকুরী পায় তাহার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব। আপনি অনুমতি করিলে সুশীলাকে আজই এখানে রাখিয়া যাইবে। এ সময়ে তার ত আমার বাড়ীতে থাকা কিছুতেই উচিত নহে। সে আজ দুইদিন কাঁদিয়া মাটি ভিজাইতেছে; এ দুই দিনের মধ্যে তাহার মুখে একটু জলও দিতে পারিলাম না; সে এই বাড়ীতে আসিবার জন্য জিদ করিতেছে।"

প্রশান্তের এই কথা শুনিয়া মিত্র-গৃহিণীর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া গেলেন। কাতর ভাবে বলিলেন, "বাবা, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন; আমাদের আর কেহ নাই। এ দুই দিন কি আর কিছু মনে ছিল বাবা! তা দেখ আজই বৌমাকে পাঠিয়ে দিও। আমার ত আর লোকজন নেই। আমার কি দুরদৃষ্ট; বৌমা এসে যে দুদিন ছিল, সে দুদিন কি তাকে আদরযত্ন কিছু কর্‌তে পেরেছি। তোমাকে আর কি বল্‌ব বাবা; যাতে আমরা দুবেলা দুমুটো খেতে পাই, আর যাতে ছেলেটার লেখাপড়া হয়, সে ভার তোমার উপর রইল বাবা।"

প্রশান্ত বলিল, "আপনি সে কথা তুলে কেন মনে কষ্ট করছেন। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। সুশীল ছাড়া আমার আর কেউ নেই; আমার যা কিছু সবই তার। তবে এখন আমি আসি; ও বেলায় আমি নিজে সুশীলাকে নিয়ে আসবো। এখন এই পঞ্চাশটা টাকা রাখুন, এতে খরচপত্র চালাবেন। যখন যা দরকার হবে আমাকে ব'লবেন্। আমি আপনার ছেলে, একথা ভুলবেন না।"

"বেঁচে থাক বাবা! তোমার শতবৎসর পরমায়ু হউক", এই বলিয়া মিত্র-গৃহিণী প্রশান্তকে বিদায় করিলেন। প্রশান্ত সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

*　　*　　*　　*　　*

দুর্গাগতি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রশান্ত চেষ্টা করিয়া তাহাকে এক সওদাগরের আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া দিয়াছে। সুশীলা এখন শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে। দুর্গাগতি সুশীলাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না; একদিনও সে ঘরে আসে না। মিত্র-গৃহিণী প্রথম প্রথম বৌয়ের দিক হইয়া ছেলেকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, "প্রশান্তবাবু যদি সাহায্য না করে তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না", একথা তিনি ছেলেকে অনেকবার বলিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গাগতি কোন কথাতেই কর্ণপাত করিত না। কৃতজ্ঞতার খাতিরেও সে সুশীলার সহিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এ কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। এদিকে সুশীলা স্বামীর জন্য কি না করিত। দাদার নিকট হইতে যখন তখন টাকা আনাইয়া বাড়ীর খরচ করিত; তবুও সে স্বামীর মন পাইত না, তবুও স্বামী তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিত না। প্রশান্ত অনেকবার সুশীলাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সুশীলা কাতরতা প্রকাশ করিয়া অস্বীকার করিয়াছে। তাহার উপর দিয়া যত ঝড় বহিতে লাগিল, সে তত স্থির শান্ত হইয়া সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল। এ সহিষ্ণুতা কি বৃথা হইবে। তাহার এ কঠোর সাধনায় কি দেবতার আসন টলিবে না।

এক বৎসরের উপর চলিয়া গেল। একদিন সুশীলা শুনিল, তাহার স্বামী আর একটা বিবাহ করিবেন, তাহারই আয়োজন হইতেছে। এ সংবাদ প্রশান্তও শুনিতে পাইল। সে দুর্গাগতিদিগের বাড়ীতে আসিয়া দুর্গাগতির মাকে অনেক বুঝাইল। মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, "আমি কি কোর্‌বো বাবা! ছেলে কি আমার বশ।" প্রশান্ত তখন দুর্গাগতির নিকট গেল। দুর্গাগতিকে

বুঝাইবার চেষ্টা করিল, দুর্গাগতি প্রশান্তকে অনেক কথা বলিতে লাগিল। প্রশান্ত অনেকক্ষণ সহ্য করিল। শেষে যখন দুর্গাগতি বলিল, "তোমার ভগিনী বাজারে ঘর করিলেও আমার আপত্তি নাই।" তখন প্রশান্ত আর সহ্য করিতে পারিল না। রাস্তাতেই তাহার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; সে ডাকিল, "কৈ হ্যায়!" সহিস দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর!" প্রশান্ত তখন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এই বেইমান্‌কো কাণ পাকাড়্‌কে দশ জুতি আভি লাগাও।" গরীব সহিস প্রভুর এই আদেশ শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল; সে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না।

এ দিকে দুর্গাগতির সহিত প্রশান্তের যখন কথা হইতেছিল, তখন ক্রমেই দুর্গাগতির স্বর চড়িতেছিল। সে স্বর বাড়ীর মধ্য হইতেও শোনা যাইতেছিল। সুশীলা তখন শাশুড়ীর নিকট বসিয়াছিল। মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, "বৌমা, দেখত বৈঠকখানায় কি গোলমাল হচ্ছে।" সুশীলা দ্রুতপদে বৈঠকখানার দিকে গেল। সে বৈঠকখানার পাশের ঘরে পৌঁছিয়া শুনিল, প্রশান্ত বলিতেছে, "লাগাও জুতি বেইমান্‌কো।" কিন্তু সহিস এমন কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস হইল না।

তখন ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রশান্ত নিজেই পায়ের জুতা খুলিয়া দুর্গাগতিকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইল। সুশীলা আর স্থির থাকিতে পারিল না; তাহার লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ সমস্তই চলিয়া গেল। সে "দাদা গো—" বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দুর্গাগতিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল, তাহার তখন জ্ঞান ছিল না।

এই সময়ে মিত্র-গৃহিণী তাড়াতাড়ী সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কি হয়েছে? কিসের গোলমাল?" কে তাঁহার কথার উত্তর দিবে? সুশীলার এই অবস্থা দেখিয়া প্রশান্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার হাতের জুতা পড়িয়া গেল। তাহার কর্ণে শুধু ধ্বনিত হইতে লাগিল "দাদা গো——"। কি করুণ কণ্ঠস্বর! কি মর্ম্মভেদী সেই হাহাকার! প্রশান্ত আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; সে নীরবে চক্ষু মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

কিসে কি হয়, কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু সেই দিন হইতে সুশীলা দুর্গাগতির হৃদয়ে স্থান পাইল; দুর্গাগতি তাহার পর আর বিবাহের কথা মুখেও আনে নাই। সে এত দিনে 'কষ্টিপাথরের' প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিল।

কর্ত্তব্য

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলাম দেখিয়া বাবা বলিলেন—"এখানে থাকিয়া আর সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই ;—তুমি এইবার বিলাত যাত্রা কর। এখানে থাকিয়া লেখা-পড়ার, বিশেষতঃ ডাক্তারি বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুবিধা হইতে পারে না। "এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াই প্রাণে ভয়ঙ্কর সখ হইয়াছিল—বিলাত যাইব—সাহেব হইব। তখন কেবল দিন গণিতাম এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম, কবে বাবার সুমতি হইবে, কবে তিনি আমাকে বিলাত যাইতে আদেশ করিবেন! কিন্তু ক্রমে সে ভাবটা যেন কমিয়া আসিয়াছিল ; তাহার একটু কারণও ছিল। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। মা তখন জীবিতা ছিলেন ; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয় যে আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া সাতসমুদ্র তের নদী পারে লেখা পড়া শিখিতে যাই! তিনি বলিতেন— "কিসের জন্য আমার 'সবে ধন নীলমণি' এত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শিখ্‌তে বিলাতে যাবে? ওর অভাব কি?" বাবা তখন কিছু বলিতেন না ; কারণ, তখন বোধ হয় আমার বিলাত যাইবার সময় হয় নাই! আমি এফ্‌.এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই বাবাকে মা ধরিয়া বসিলেন—"ছেলের বিবাহ দিতে হবে!" বাবা প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু যখন তাঁহার পরম বন্ধু মিঃ এস্‌, সি, মল্লিক অর্থাৎ সত্যচরণ মল্লিক সিভিলিন মহাশয় তাঁহার আদরের কন্যা সরসীবালার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করিলেন,— তখন দায়ে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া মা'র অনুরোধ তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইল! আমার বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে মাতাঠাকুরাণী আমাকে ত্যাগ করিয়া —"সাবিত্রী লোকে" মহাপ্রস্থান করিলেন।

পিতা মহাশয় এন্‌, সি, ডাট্‌ (ওরফে নৃসিংহ চন্দ্র দত্ত) একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার ; বারে তাঁহার যথেষ্ট পসার। সহরে "দত্ত সাহেব" বলিয়া

তিনি আপামরসাধারণের নিকট পরিচিত। আমাদের পৈতৃক বাটী বাগ-বাজারে হইলেও—পিতা বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লাউডন ষ্ট্রীটে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সাহেবী চালে থাকিতেন। তিনি সাহেব সাজিতেন বটে, কিন্তু ম্লেচ্ছাচারী ছিলেন না। বাটীতে তিনি পুরাদস্তর হিন্দু—বাঙ্গালী। কিন্তু সদর বাটীতে তিনি "সাহেব" হইয়া বসিতেন। শুধু হ্যাট্‌কোট্ পেন্টুলেন নেকটাই কলার আঁটা সাহেব নহেন, শুধু বিলাতে গিয়া টাকার জোরে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া সাহেব নহেন, তিনি রীতিমত ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়াছেন ;—তিনি ইংরাজি বিদ্যাকে পুরা দস্তর আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া ইংরাজী লেখা পড়িয়া ইংরাজ জাতিও চমকিত হইত।

পত্নীপ্রেমে বিভোর হইলেও—বিলাত যাইবার বাসনা এবং আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু যখন স্বর্গীয় দূতের ন্যায় "খোকা" আসিয়া কি একটা অলৌকিক অচ্ছেদ্য অদৃশ্য শৃঙ্খলে আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, তখন যথার্থ কথা বলিতে কি—বিলাত যাইবার কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গেলাম।

সুতরাং পিতার এই আদেশে আমি যেন অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলাম! এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় আমি যেন ক্ষণেকের জন্য চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। পিতা আমার মনোভাব যেন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "মনুষ্য-জীবন কেবল কর্ত্তব্যের সমষ্টিমাত্র! যে মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করে,—কর্ত্তব্য যত কঠোরই হোক না কেন, তাহা পালন করিতে সে বাধ্য! কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে কাহারও মুখ চাওয়া উচিত নয়!" আমি বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে থাকিয়া কি ডাক্তারি শিক্ষা চলে না?" পিতা বলিলেন,—"না শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিলাতে যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা যে জাতি, আমাদের যেরূপ দৌর্ব্বল্য, অভাব, তাহাতে আমরা আমাদের মধ্যে থাকিয়া কিছুতেই মানুষ হইতে সমর্থ হইব না।" এরূপ অকাট্য যুক্তির উপর আমার আর কথা চলিল না ; আমি পিতার সহিত তর্ক করিতে আদৌ অগ্রসর হইলাম না। পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, জন্মভূমি ছাড়িয়া, সরলাবালাকে ফোঁটাকতক অশ্রুজল উপহার দিয়া, এবং এক বৎসরের মায়ার পুতলী 'খোকার' কাছে সমস্ত প্রাণটা জমা রাখিয়া এডিন্‌বরা যাত্রা করিলাম। সত্য সত্যই যখন জাহাজ ছাড়িল, তখন কেবল মনে হইতে

লাগিল—"মা! মা! তুমি থাকিলে আজ তোমার আদরের পরেশকে জলে ভাসিতে হইত না!"

এডিনবরা সহরে পিতার কোনও ইংরাজ-বন্ধুর বাটীতে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রহিলাম। মনকে কোন রকমে বুঝাইবার উপায়ান্তর নাই বলিয়া বাধ্য হইয়া মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলাম। অর্থের অনাটন নাই, সেবা-যত্নের ত্রুটী নাই, কিছুরই অভাব নাই। সকল ভুলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম বটে, কিন্তু সকলই কি ভুলিতে পারিলাম? শাণিত কৃপাণ হস্তে কর্ত্তব্য একদিকে, পত্নী পুত্রের বিষম মায়া অন্য দিকে; মধ্যে মধ্যে যখন এই দুইটীর ভীষণ যুদ্ধ বাধিত, তখন আমি যেন নিস্তেজ শক্তিহারা একটা অপদার্থ জীব হইয়া পড়িতাম।

মাসে দুইবার পিতার পত্র আসিত; তাহাতে অন্যান্য উপদেশের পর কেবল এইটুকু লেখা থাকিত—"তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্য ভাবিও না, অথবা উদ্বিগ্ন হইও না; তাহারা কুশলে আছে!" আমি গোপনে সরসীকে পত্র লিখিতাম, সেও আমাকে তাহারই মতন উত্তর দিত! সত্য কথা বলিতে কি সরসীর পত্র না পাইলে আমার পক্ষে এই ভীষণ প্রবাস প্রাণান্তকর হইত। সরসী শিক্ষিতা মূর্ত্তিমতী পতিপরায়ণা—উপরন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণা। আশ্চর্য্য তাহার লিপিচাতুর্য্য! আমি তাহারই পত্রে যেন কর্ত্তব্য পালনে উত্তরোত্তর উৎসাহ লাভ করিতে লাগিলাম। প্রবাসেও আমার মন্দ হরষে দিন কাটিতে লাগিল। আমার পরীক্ষার ফল আশাতীত হইল।

পাঁচ বৎসর অতীত হইল, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি পিতার মুখ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইল, তখন একটা ভীষণ দুর্ভাবনা, উদ্বিগ্নতার বোঝা আমার মস্তকে। পিতা লিখিলেন—"স্কটল্যাণ্ডে প্রাকৃটিশের কোনও প্রয়োজন নাই, শীঘ্র ফিরিয়া এস; বধূমাতা আজ মাসাবধি শয্যাগতা। ডাক্তার বলেন যক্ষা রোগের সূত্রপাত হইয়াছে।"

চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়া কর্ত্তব্য-পালন-পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কর্ত্তব্য পালন করিয়া ফিরিলাম। পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে আশালতামূলে জল সিঞ্চন করিয়াছিলাম, দেখিলাম, তাহা শুষ্কপ্রায়, আর কয়দিন পরেই আমার অদৃষ্টানলে ভস্মীভূত হইবে। রুগ্না ক্ষীণা জীবনসঙ্গিনী সরসী আমার উত্থানশক্তি-রহিতা হইলেও, আমাকে

দেখিয়া, আমাকে পাইয়া, আমার সহিত কথা কহিয়া, পাঁচ বৎসরের দীর্ঘ বিরহক্লেশ বিদূরিত করিল। কিন্তু সে সুখ তাহারই বা কয় দিন, আর আমারই বা কয় দিন? সরসী আমাকে শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ছার পৃথিবীর মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে দিব্য ধামে চলিয়া গেল।

সে যন্ত্রণা, সে ব্যথা কি সামলাইতে পারিতাম? খোকা কাছে বসিয়া শুষ্কমুখে ছল ছল চোখে আমার পানে চাহিয়া ডাকিল—"বাবা!" অন্ধকারসমাচ্ছন্ন অসার সংসার যেন ক্ষণেকের জন্য আবার স্বর্গীয় আলোকে উজ্জ্বল হইল। খোকাকে আবেগভরে বক্ষে চাপিয়া বলিলাম—"কি বাবা!"

পিতা বুঝাইয়া বলিলেন,—"সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা মনুষ্য-মাত্রেরই কর্ত্তব্য! যাহার উপর তোমার কোনও হাত নাই, যাহা তুমি কিছুতেই নিবারণ করিতে পার না, তাহার জন্য অধৈর্য্য হওয়া স্ত্রীলোকের স্বভাবজাত ধর্ম্ম! তোমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমানের অনর্থক শোকপ্রকাশ কি উচিত? ভীষণ কর্ত্তব্য সম্মুখে—পুত্রকে পালন করা। পিতার কর্ত্তব্যপথে একবার অগ্রসর হও।"

আবার কর্ত্তব্য! হাঁ কর্ত্তব্য তো বটেই! সরসী তো গিয়াছে, আর আসিবে না। তাহার সর্ব্বস্বধন তাহার জীবনের জীবন "খোকাকে" যে আমার কাছে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে! সত্যই তো! এ তো মহান্ কর্ত্তব্যভার আমার স্কন্ধে! আমি 'খোকা'কে কোলে লইয়া আবার বুক দৃঢ় করিয়া বাঁধিলাম।

প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল মনে করিয়াছিলাম, খোকার মুখ চাহিয়া সরসীর চিরবিরহব্যথা ভুলিব, একেবারে সব জ্বালা যন্ত্রণার উপশম না হউক, অন্ততঃ কতকটা হইবে! কিন্তু তাহা ত হইল না। খোকা যখন হাসে, খেলা করে, তখন জোর করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার হাসি খেলাতে যোগদান করিয়া দারুণ শোকানল ভস্মাবৃত করিয়া রাখি বটে! কিন্তু হঠাৎ কি জানি কি মনে ভাবিয়া সে যখন আধ আধ কথায় ছল ছল চোখে শুষ্কমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে "বাবা! মা কোথা গেছে, কখন আসবে—" তখন,—তখন এই পাষাণ হৃদয়ে যেন কি একটা মর্ম্মান্তিক শেল বিদ্ধ হয়! সে যে কি জ্বালা—সে যে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা—সে যে কি ভয়ঙ্কর মর্ম্মভেদী, তাহা জানাইবার

ভাষা আমার নাই! আমি একদিন সে ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া অবলা স্ত্রীলোকের মতন, দুর্ব্বল শিশুরও অধম হইয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলাম! খোকা যেন হতভম্ব হইয়া নীরবে আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না! কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কাঁদিয়া যেন বুকের ভারটা অনেক কমিয়া গেল! তবে তো কান্না বড় ভাল! কান্নায় তো শোকের তীব্রতা কমে! অজ্ঞান হইয়া যেন কাঁদিয়াছিলাম; কাঁদিতে কাঁদিতে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, আপনার অস্তিত্বটুকু যেন হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। হঠাৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে দেখিলাম, সৌম্যমূর্ত্তি পিতা খোকাকে কোলে লইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্নেহমাখা হস্তে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিতেছেন—"একটু মুখে চোখে জল দাও, ঠাণ্ডা হও! ওঠো বাবা—ছিঃ! তুমি যে আমার দেবতা ছেলে!" আর কথা না কহিয়া টেবিলস্থ গেলাস হইতে জল লইয়া মুখে চোখে দিলাম। খোকা তাহার দাদাবাবুর কোলে উঠিয়া অনেকক্ষণ সান্ত্বনালাভ করিয়াছিল; আমাকে ক্রন্দনে বিরত দেখিয়া ভরসা পাইয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বাবা, কাঁদ্‌ছিল কেন দাদাবাবু?" খোকা দ্বিতীয় কথা আর না কহিতেই বুদ্ধিমান পিতামহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমার বাবা বড় দুষ্টু ছেলে!" দাদাবাবুর কথা শুনিয়া খোকার যেন একটা মহা আনন্দ হইল! সে উচ্চস্বরে হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিতে লাগিল—"বাবা! তুমি দুষ্টু ছেলে! দাদাবাবু তোমাকে মার্‌বে! হো-হো-হো! বাবা দুষ্টু ছেলে!"

আবার ক্ষণেকের জন্য সকল শোক ভুলিলাম! শোকের প্রাবল্য যদি চিরকাল সমভাবে থাকিত, তাহা হইলে কখনই ঈশ্বরের সৃষ্টি থাকিত না! সরসীকে ভুলিতে পারিলাম না বটে—ক্রমে তাহার বিরহে যে শোকের বাড়বানল হৃদয়সাগরে উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা নিভিয়া গেল। সেটুকু সম্পূর্ণ আমার পিতারই বুদ্ধি-কৌশলে! তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে নির্জ্জনে থাকিতে দিতেন না। বন্ধুর ন্যায় অহোরাত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, মাতার ন্যায় আমার সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে মাতার অভাব বুঝিতে দিতেন না! আমার পুনরায় বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে স্পষ্ট

আমাকে বলিতেন—"বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয় বিবাহ কর—আমি তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইব না! এখন তোমার মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এ সম্বন্ধে আমার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল! তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, তাহা নিঃসঙ্কোচে করিতে পার, আমি প্রাণ খুলিয়া তোমাকে অনুমতি দিতেছি!"

আবার বিবাহ? সরসীবালার মতন স্ত্রী যাহার সমস্ত হৃদয়টুকু চির-জীবনের মত দখল করিয়া লইয়াছে—সেই বড় যত্নে প্রতিষ্ঠিতা সোণার প্রতিমাকে হৃদয়মন্দির হইতে তুলিয়া বিসর্জ্জন দিয়া আবার আর এক মূর্ত্তি, কি জানি কিসের, আনিয়া সেই পবিত্র স্থানে বসাইব? আমি কি পিশাচ—আমি কি লম্পট—আমি কি পশুবৃত্তিপরায়ণ! সরসী যে আমার ধর্ম্মপত্নী! আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী! তাহার সহিত যে আমার ইহলোক পর-লোকের অচ্ছেদ্য অভেদ্য সম্বন্ধ! আমি সেই স্বর্গগতা দেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া, তাহার পবিত্র প্রণয়ের নিদর্শন জীবন-সর্ব্বস্ব "খোকাকে" পর করিয়া অন্য রমণীকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিব? কেন? আমার কি পাপের ভয় নাই? আমি কি ঈশ্বর মানি না? আমি কি মানুষ নই?

খোকাকে লইয়া—পিতৃস্নেহে এক রকমে দিন কাটিতে লাগিল! ডাক্তা-রিতে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় খুবই পসার হইয়া উঠিল! কি জানি কি অদৃষ্টের গুণে এমন হাতযশ হইল যে, আমি নিজেই বিস্মিত হইলাম! মুমূর্ষু রোগী আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে! যাহাকে সকলে জবাব দিয়া যায়, আমি একদিন তাহাকে দেখিলে তাহার বাঁচিবার আশা হয়। শতকরা নব্বই জন বাঁচে! সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার 'কলের বিরাম নাই! ফি অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিলাম, তবু 'কল্' কমে না! শেষে বাধ্য হইয়া অনেকতক লোককে প্রত্যহ বিমুখ করিতাম! না করিলে আমার প্রাণ বাঁচে না!"

বেশ দিন কাটিতেছিল—আবার দুঃসময় আসিয়া দেখা দিল। আমার বিলাত হইতে আসিবার পর বৎসর যাইতে না যাইতে স্নেহময় পিতৃদেব ডায়েবিটিশ রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি—তোমার জন্য যথেষ্ট রাখিয়াও গেলাম। তুমিও এই অল্প দিনের মধ্যে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিলে। এখন আমার এই শেষ অনুরোধ, অর্থের সদ্ব্যয়ের

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসারে কর্ত্তব্য পালন করিতে থাক। চিকিৎসকের কার্য্য—পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দেবতার কার্য্য! অর্থের জন্য চিকিৎসক নির্ম্মম কঠোর হৃদয়হীন পশুরও অধম হইতে পারে; আবার স্বার্থত্যাগ করিয়া দীন দুঃখী দরিদ্রের মুখ চাহিয়া তাহাদের দুঃখে আর্দ্র হইয়া অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে; নরাকারে দেবতা হইয়া অক্ষয় নাম ও দেহান্তে অবিনশ্বর স্বর্গসুখের অধিকারীও হইতে পারে!"

পিতা তখন মৃত্যুশয্যায়;—আর কয়েক দণ্ড পরেই আমাকে শূন্যময় সংসারে একা রাখিয়া জনমের মত চলিয়া যাইবেন! আমি পিতার মৃত্যুতে একসঙ্গে পিতৃহারা বন্ধুহারা আত্মীয়হারা হইব! সে সময় তাঁহার উপদেশ বাক্যে কর্ণপাত করিতে সক্ষম হইলাম না। শোকের উপর শোক! জগদীশ্বর! মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে প্রভু?

৪

পিতার মৃত্যুতে অনেকে শোক প্রকাশ করিল। দেশে সমাজে সত্য সত্যই হাহাকার পড়িল! যে যে গুণ থাকিলে লোক যথার্থ "বড়লোক"—নামে নয়—কাজে "বড়লোক" হইতে পারে,—পিতার সে সকল পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন,—তিনি দয়ার সাগর ছিলেন,—তিনি লোকের দুঃখ—দেশের দুঃখ, আত্মীয় স্বজনের দুঃখ বুঝিতেন—এবং যথেষ্ট প্রতিকার করিতেন। সাহেব পল্লীতে সাহেবী কায়দায়—সাহেব নামে অভিহিত হইয়া তিনি বাস করিতেন বটে, কিন্তু যথার্থ হিন্দুয়ানী, বাঙ্গালীয়ানা ভাব তাঁহাতে যতটা দেখিয়াছি, এতটা বোধ হয় আর কোনও হিন্দু বাঙ্গালীতে দেখি নাই। কত অনাথিনী বিধবা, কত পিতৃহীন অনাথ বালক,—কত কন্যাদায়গ্রস্ত সামর্থ্যহীন পিতা, তাঁহার মুক্তহস্তের দয়ার দানে প্রাণধারণ করিত, তাহা বলিবার কথা নয়! আমি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। অন্ততঃ এইটুকু স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, পিতার মৃত্যুর পর এমন অবকাশ অথবা সুযোগ কাহাকেও দিই নাই, যাহাতে কেহ বলিতে পারে "আমি পিতার অযোগ্য পুত্র!"

সংসারে আমি আর খোকা! আর আপনার জন কেহই নাই। চাকর দাসী দ্বারবান সহিস ইত্যাদির সংখ্যায় আমার প্রাসাদতুল্য বৃহৎ অট্টালিকা সমস্ত দিন রাত্রি যেন সরগরম হইয়া থাকিত। আমরা তো দুইটী প্রাণী, দুই তিন জন চাকর দাসীতে আমাদের পরিচর্য্যা যথেষ্ট হইতে পারিত!

পিতা বলিতেন—"চাকর রাখি বড় মানুষি দেখাইবার উদ্দেশ্যে নয়! তবু যে কয়টা দরিদ্র পরিবার প্রতিপালিত হয়—হউক না!" বাবা রখিয়াছিলেন সুতরাং আমিও রাখিয়াছি।

"ফি" ৩২৲ টাকা করিয়াছি, ইহাতে "কল" অনেকটা কমিলেও বৈকালে অন্ততঃ দশটা "attend" করিতে হইত! তা-ও"না-ছোড়-বান্দা" হইয়া; খোকা প্রায়ই আমার সহিত "মোটরে" থাকিত! শীতকালে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে প্রায় সঙ্গে লইতাম না! রাত্রিকালে কেহ ডাকিলে—মাথা খুঁড়িলেও বাটীর বাহির হইতাম না।

একদিনের ঘটনায় হঠাৎ চৈতন্য হইল,—পিতার শেষ উপদেশের সারাংশ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

বৌবাজারে একটী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাতশ্লেষ্মা বিকার হয়। রোগী দেখিতে গিয়া বুঝিলাম ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা তেমন নয়। সামান্য কেরাণীগিরিতে নির্ভর করিয়া কলিকাতার সহরে বাটীভাড়া দিয়া চারি পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীকে প্রতিপালন করেন। পরিবারস্থ কাহারও কোন অসুখ বিসুখ হইলে, পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নিকট হইতে নামমাত্র ঔষধের মূল্য দিয়া তাঁহার বাটিতে রোগীকে দেখাইয়া কোন রকমে রোগের ব্যবস্থাদি করিতেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ নিজে এই সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। কোন রকমে কাহারও দ্বারা কিছু সুবিধা হইল না দেখিয়া বিপন্না ব্রাহ্মণ-পত্নী প্রতিবেশীবর্গের উপদেশে স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য আমাকে ডাকাইলেন। আমি উপর্য্যুপরি দু'দিন গিয়া রোগীকে দেখিতেছি—ঔষধ দিতেছি, ব্যবস্থা করিতেছি! রোগীর অবস্থা তেমন আশাপ্রদ নয়, তবে দেখি কি করিতে পারি! প্রত্যহ রোগীকে দেখিয়া গাড়ীতে উঠিতে না উঠিতে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটী তিনখানি দশ টাকার নোট এবং দুটী টাকা আমার হাতে দিয়া শুষ্কমুখে বলে "ডাক্তার মশাই! মা ব'লে দিলেন, কাল একবার দয়া করে আস্‌বেন কি?" আমি আনন্দের সহিত বলিলাম,—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসব!" পরদিন ঠিক সময়ে আবার আসিলাম। আজ ব্রাহ্মণের রোগ একটু বাড়িয়াছে; আমি একটী প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিয়া দিয়া তাঁহার সেই ছোট ছেলেটীর হাতে দিয়া দরজার অন্তরালস্থিত ব্রাহ্মণ-পত্নীকে শুনাইয়া বলিলাম,—"এই ওষুধটা এখনি আনিয়ে এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে। পারি যদি—রাত্রি দশটার পর একবার আসিয়া

দেখিয়া যাইব। আর না আসি যদি,—তা'হলে আমার বাটীতে একটা লোক পাঠিয়ে খবর দিলে বড় ভাল হয়।" আমার কথায় কেহ কোন উত্তর দিল না; আর উত্তর দিবেই বা কে? সেই ছোট বালকটী পিতার অবস্থার বিষয় বোধ হয় কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল; তাই ভয়ে বষণ্ণ মুখে নিরুত্তরে আমার মুখপানে কেবল চাহিয়া রহিল। আমার মাথায় সে সময় রোগীর কথাই তোলপাড় হইতেছিল। রোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইতেছি. এমন সময় ব্রাহ্মণের সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রটী তাহার তিন চারিটী ছোট ছোট ভাই বোনের সঙ্গে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণ স্বরে আমাকে বলিল—"ডাক্তার মশাই! মার হাতে আজ একটাও পয়সা নেই; আপনার ভিজিট তাই দিতে পাল্লেন না! লোক জনও কেউ নেই যে, কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে আনবেন! আজ দু'দিন আমরা কয়টী ভাই বোনে মুড়ী খেয়ে কাটাচ্ছি! মা বল্লেন—এই তাঁর হাতের বালা দুগাছি আপনি নিয়ে যদি কারও কাছে আপনার ভিজিট আর ওষুধের দাম——!"

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বর্ষা যেন আমার বুকে কে সজোরে বিঁধিয়া দিল! আমি বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া নিমিষের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম! পিতার অন্তিম শয্যার সেই শেষ কথাগুলি বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

"অর্থের জন্য চিকিৎসক নির্ম্মম কঠোর হৃদয়হীন পশুরও অধম হইতে পারে; আবার স্বার্থত্যাগ করিয়া দীন দুঃখী দরিদ্রের মুখ চাহিয়া অবিনশ্বর স্বর্গসুখের অধিকারীও হইতে পারে!"

আমি উন্মত্তের মতন ছুটিয়া মটরকারে গিয়া বসিলাম ও "শফারকে" বলিলাম—"জলদী ঘর চল!" বাটী আসিয়া লৌহসিন্দুক খুলিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে লইয়া একবার ডিস্পেন্সারিতে গেলাম. তথা হইতে স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া এবং আমার পরিচিতা এক হিন্দু নার্সকে সঙ্গে লইয়া আবার দ্রুতবেগে মোটর চালাইয়া বৌবাজারে সেই রোগীর বাটীতে আধ ঘণ্টার ভিতর ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে ডাকিয়া বলিলাম—"এই স্ত্রীলোকটী হিন্দু; সমস্ত দিন রাত্রি তোমার বাপকে ইনি দেখ্‌বেন—ওষুধ খাওয়াবেন। এইখানে আমার একজন চাকর রাখিয়া দিচ্ছি,—দরকার হ'লে এ আমাকে বাটীতে গিয়ে খবর দিয়ে আস্‌বে। আর

ক'য়টী টাকা তোমার মাকে দাও, তোমাদের সংসারের খরচ পত্র চালাবেন; যত দিন না তোমার বাবা সারিয়া ওঠেন! বোলো—এ টাকা আমি ধার দিচ্ছি না; আমার মা নেই—আজ থেকে তোমার মা আমার মা হ'লেন!"

ব্রাহ্মণপত্নী দরজার অন্তরালে ছিলেন;—আমার কথা শুনিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যোড়হাতে বলিলেন—"বাবা! সত্য কি অনাথের নাথ জগদীশ্বর আমাকে দেখা দিলেন?"

"ছিঃ মা—তুমি ব্রাহ্মণকন্যা,—আমি তোমার দাস; আমাকে অপরাধী কোরো না!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ মোটরে উঠিয়া বসিলাম।

* * * * *

দুই মাসের মধ্যে পিতার নামে একটী হাঁসপাতাল খুলিলাম—"নর্সিং দাতব্য চিকিৎসালয়!" পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত অর্থ এবং খোকার জন্য কিছু রাখিয়া আমার উপার্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ সেই হাঁসপাতালের ব্যয়ভার বহনের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। হাঁসপাতালের সমস্ত কার্য্য আমি নিজেই দেখিয়া থাকি। স্থির বুঝিয়াছি—ইহাই আমার জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য!